# আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

প্রথম খণ্ড



আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
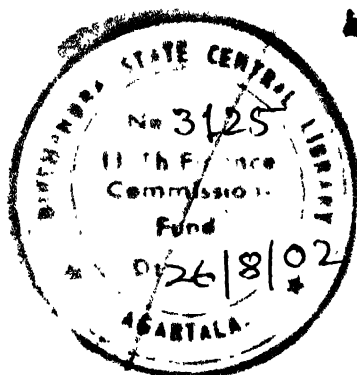


মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

—একশ পঞ্চাশ টাকা—

সম্পাদনা
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : অমিয় ভট্টাচার্য
মুদ্রণ : সানলিথোগ্রাফী



ASHUTOSH MUKHOPADHYAYA RACHANAVALI VOL 1

An anthology of complete works of Ashutosh Mukherjee, Vol 1.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.
10, Shyama Charan Dey Street, Calcutta 700 073

ISBN 81-7293-194-8

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এসসি অফসেট, ৩০/২ বি, হরমোহন ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৮৫ হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

## প্রকাশকের নিবেদন

পঞ্চাশ-উত্তর জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অন্যতম। দীর্ঘ অবর্তমানেও তাঁহার উপন্যাস ও ছোটগল্পের পাঠকসংখ্যা বিপুল, চাহিদা অফুরন্ত। পাঠকমহলে তাঁহার সমস্ত রচনা একত্রিত কবিয়া একটি রচনাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের প্রয়োজন অনেকদিন যাবৎই অনুভূত হইতেছিল। বর্তমান খণ্ড সেই প্রয়োজন মিটাইবার প্রয়াসে প্রথম পদক্ষেপ। এই রচনাবলী প্রস্তুতি ও প্রকাশের কাজে সর্বপ্রথম ঋণ স্বীকার কবিতে হয় লেখক-পত্নী শ্রীমতী মমতা মুখোপাধ্যায়ের নিকট। তাঁহার সক্রিয় সহযোগিতা ও পরামর্শ ব্যতীত আমাদের এই বৃহৎ আয়োজন সম্পন্ন করা অসম্ভব হইত। আর যাঁহাবা এই ব্যাপারে সাহায্যেব হাত বাড়াইয়া দিযাছেন তাঁহারা ঘবের লোক, আপনার মানুষ, সেখানে ঋণ স্বীকার করা বাহুল্যমাত্র।

## সূচীপত্র

# কিছু কথা

।। ১ ।। পাঠক-পরমেশ্বর সমীপেষু,

'নৈবেদ্য'

বেশির ভাগ মানুষেরই নিজস্ব একটি ভগবান থাকে । আমি মনে করি লেখকের সেই ভগবানের নাম 'পাঠক' । যেখানে কোন ফাঁকি চলে না । যেখানে গোঁজামিলের পরিণাম ভয়ঙ্কর । যে অব্যর্থ নিয়তি হয়ে তুলাদণ্ডে লেখকের ভাগ্য নির্ধারণ করে ।

তাই সেই 'পাঠক-পরমেশ্বরের' দরবারেই আমার এই 'নৈবেদ্য' অর্পণ করছি ।

পাঠক, আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন, 'নৈবেদ্য' কেন ? 'বক্তব্য' বা 'রচনা' বা 'প্রবন্ধ' নয় কেন ?

উত্তরে আমি বলব এক ভীষণ, ভী-ষ-ণ স্পর্শকাতর ও কঠিন বিষয় চয়ন করা হয়েছে আমার জন্য । ১৯৯৩, ২৮ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার পাঁচের পাতায় বিজ্ঞাপনটি দেখবেন । রয়েছে "...লেখক ও মানুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখবেন সর্বাণী মুখোপাধ্যায়..."

এমনিতে কোন অসুবিধে ছিল না । এমন তো কতজনেই কতজনের ওপর লেখে —প্রয়াতজনের ওপর জীবিত কোন একজন । কিন্তু আমার ব্যাপারটা শুধুই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ! অনিবার্যভাবে যে এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জনক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও ! আমার অস্তিত্বের মূলে, রক্তের দানায়, শ্বাসে-প্রশ্বাসে, অণুতে অণুতে জড়িয়ে রয়েছে যে মানুষটি চলে গিয়ে বড় আশ্চর্যভাবে এক অদৃশ্য বলয়ে যার দু'হাত আমাকে জড়িয়ে আছে আজও —সেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সেই মানুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সেই লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে আমাকে আপনাদের কাছে 'কিছু কথা' বলতে বলা হয়েছে তার একমাত্র সন্তান হিসেবে ।

বড় কঠিন কাজ নয় ?

তবু আমি বড় খুশি, বড় গর্বিত, বড় তৃপ্ত এ দায়িত্ব পেয়ে । ক'জন এ সুযোগ পায় ? তবে আমার 'কিছু কথা' তো শুধুই 'বক্তব্য' হতে পারে না ! হতে পারে না বৈদগ্ধে ভরা বিশ্লেষণী রচনা বা প্রাবন্ধিকের তাত্ত্বিক লেখা ! আমি তাই নিয়ে এসেছি নিবেদনের ডালা যাতে উজাড় করে দেওয়া যায় রাজগোলাপ থেকে ঘেঁটু ফুল—ব্যথার নীল অপরাজিতা, লাঞ্ছনার ফণীমনসা, তৃপ্তির গন্ধরাজ আর পাতাবাহারের জীবনবাহার ।

অনেকেই চোখের জল, প্রচুর অবমাননা, মর্মান্তিক শোক, অবিশ্বাস্য প্রতারণা, আশ্চর্য অকৃতজ্ঞতা আর ভণ্ডামি—আবার অঢেল ভালবাসা, অযাচিত সাহায্য, নিঃস্বার্থ দরদ, পর্যাপ্ত যশ-মান-খ্যাতির বৈজয়ন্তী—বঞ্চনা ও প্রাপ্তির প্রবল ঠাস-বুনোটে মোড়া যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তাকে আমার সীমিত সাধ্য অনুযায়ী যেমন যেমন পারি তুলে ধরতে বসেছি । আপনাদের কাছে । আপনাদেরই জন্যে ।...

পাঠক-পরমেশ্বর, এই কারণেই এ আমার 'নৈবেদ্য'—আপনাদের উদ্দেশ্যে । এ আমার 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো' সেই লেখক, মানুষ ও জনকটির স্মরণে, যার কথা 'ধার' করেই যাকে

আপনাদের কাছে নিবেদন করছি ।

শুরু করছি লেখক ও মানুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কিছু প্রিয় কথা যা তার একান্ত ব্যক্তিগত খাতা থেকে পেয়েছি এবং এতে জনক-লেখক এই মানুষটি নিজের দুটি ছেলেমেয়েকে যে অটোগ্রাফ দিয়েছিল তাই দিয়ে :—

মেয়ে সর্বাণী মুখোপাধ্যায়কে : আলোর পথ চিনবে
যখন বাবার কথা শুনবে ।
—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৬. ৩. ৭২ (বাবা)

ছেলে জয় মুখোপাধ্যায়কে : মেজাজ ভাল থাকলে
বাবিন ভারী লক্ষ্মী ছেলে ।
—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৬. ৩. ৭২ (বাবা)

খাতার প্রিয় উদ্ধৃতি : 'এর নাম দিয়েছে সে বিচারবুদ্ধি—এর থেকেই বেড়েছে তার ক্ষমতা যে কোনো পশুর চাইতে আরো বড় পশু হবার ।' (ফাউস্ট)

'গাছে নতুন পাতা দেখা দিলেই মালীর চোখে ভাসে ভবিষ্যতের ফুল ও ফলের ছবি ।' (ফাউস্ট)

'সুখি যে যার অন্তরে আজো জাগে/ভুলের সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে ডাঙায় উঠবার আশা ।' (ফাউস্ট)

'জগৎ থেকে কি পাব ? সে তো কেবল বলছে,/ছাড় ছাড় ছাড়

'ওগো বরেণ্য, সুন্দরতর করে আরবার কর সৃষ্টি,/সৃষ্টি করো ভেঙে ফেলা জগৎ তোমার অন্তরে' ।

'প্রেরণা দ্বিধার সহচরী নয় কখনো ।'

'উদ্ধার পেতে চাই এই বস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানবাষ্প থেকে/খৃস্ট হয়েছেন উত্থিত গ্লানির গর্ভবাস থেকে ।'

'বিশ্বসংসারে বেঁচে থাকার শক্তি অদ্ভুত ।'

"যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,/বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায় ।/তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,/চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে ।" (সোনার তরী)

"তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি/কোনো সুলগণে হব না কি কাছাকাছি ।" (সোনার তরী)

'সবেব সত্তা সুখিতা হন্তু, অবেরা হন্তু, অব্যাপজ্ঝা হন্তু...'
সকল জীব সুখি হোক, নিঃশত্রু হোক, অবধ্য হোক ।

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,/আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,/আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ।'

'সেই সর্বব্যাপী আনন্দ থেকে সমস্ত প্রাণীর আবির্ভাব, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই সমস্ত জীব-জীবনের প্রাণের স্পন্দন, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই তার পরিণতি, অনুপ্রবেশ ।'

'ঘরের ছোট আলোটা নিভিয়ে দেওয়া মাত্র পূর্ণিমার আলোর বন্যা নামলো । ক্ষুদ্র স্বার্থের আলোটা নিভিয়ে দাও, জগৎ-জোড়া স্বার্থের আলো তোমাকে টানবে । (একটি আলো এতবড় আলোর প্রতিবন্ধক) ।'

'অসতো মা সদগময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময় ।'—অসৎ থেকে আমায় সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আমায় জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমায় অমৃতে নিয়ে যাও ।

'আবিরাবীর্ম এধি'—হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও ।

'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'—রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো ।

।। ২ ।। লেখক-মানুষ ? না মানুষ-লেখক ?

লেখক-মানুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে 'কিছু কথা' বলতে গিয়ে প্রথমেই যে চিন্তাটা মাথায় আসছে, তা হোল 'লেখক-মানুষ' না 'মানুষ-লেখক' ? কোন্‌টা আগে, কোন্‌টাই বা পরে ? আমার জ্ঞান ফোটা (যদিও সেটি খুব তাড়াতাড়িই ফুটেছিল আর ফুটতে পেরেছিল ওই লোকটিরই জন্যে) থেকেই শেষ দিন পর্যন্ত যাকে দেখেছি সে একাধারে মানুষ, লেখক ও জনক । কারুর থেকেই কাউকে পুরোপুরি আলাদা করে ফেলতে পারছি না । তবুও যদি করতেই হয়, তো বলব, এই তিন সত্তা এক অদৃশ্য সুতোয় জড়াজড়ি করে গাঁথা থাকলেও সবথেকে আগে সে 'মানুষ'—বড়ই বড় মাপের এক মানুষ । তারপর লেখক, যার মাপের বিচারক আপনারা, পাঠক । আর এই দুইয়ের মধ্যেই ফল্গুর মতো নিঃশব্দে নিরুচ্চারে বয়ে চলেছে জনকের দুধসাদা অপত্য-টান । এ 'জনক' শুধু আমার একার নয় । বা কেবল রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়তার দাবীতে 'পিতৃ-প্রতিম' কেউ নয় । এ জনক এক শাশ্বত আশ্বাস যে কি জীবনে কি লেখায়, কি বিশ্বাসে কি মননে, কি আচারে-বিচারে-ব্যবহারে-বাস্তবে সবসময় সব্বাইকে বিশ্বাস করতে বলে, "জীবনের কোন ক্ষতিই চরম বা শেষ নয় । ভুলের সমুদ্র থেকেও ডাঙায় ওঠা যায় । এ আশা না হারালে কোন সর্বনাশই সর্বনাশ নয় ।"...ভয়কে জয় করা, এগিয়ে চলা, আশা রাখা, আর উত্তরণ—এই জীবনদর্শনের মধ্যে একাকার হয়ে গিয়েছে মানুষ, লেখক, ও জনক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ।

যত সহজে এই ভাল ভাল কথাগুলো বলে ফেললাম, ততো সহজে বা ততোটাই চট

করে এ জায়গায় এসে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি এই 'চরিত্রটির' । অনেকই বন্ধুর পথ, কঠিন চড়াই-উৎরাই, এবং প্রচুর প্র-চু-র সহিষ্ণুতা ধৈর্য আর নিষ্ঠার পরীক্ষা দিতে দিতে তবে এইখানে পৌঁছনো । তার এই পৌঁছনোর জায়গায় আমাদের পৌঁছতে হলে তাকে আমাদের ধরতে হবে অনেক বছর আগে থেকে—সেই ১৯২০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, বাংলা ১৩২৭-এর ২২ শে ভাদ্র, মঙ্গলবার—যেদিন প্রখর 'ভাদ্রের রবি'র এক দীপ্ত দুপুরে ঢাকা বিক্রমপুরেব মুখোপাধ্যায় বংশের পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তরুবালা দেব্যার পঞ্চম সন্তানটি জন্মাল । সেদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি ওই মোটাসোটা কালোকোলো ছেলেটাই একদিন সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হয়ে বাংলাসাহিত্যের পংক্তিতে নিজের জন্য একটা আসন করে নেবে । শুধু তখন কেন ? তার অনেক অ-নে-ক পরেও কেউ ভাবেনি । বিশ্বাসই করেনি । কেউ না, কেউ না ।

দোষ দেওয়া যায় না ! কারণ, সে সময়ে সাহিত্যের সেরকম সমঝদার ছিল না তিনকূলের কেউ । বাবার কাছেই শুনেছি, কোনদিন কেউ একটা গল্পের আঁচড়ও কাটেনি বা কবিতার ছন্দ নিয়ে মাথা ঘামায় নি মুখোপাধ্যায় পরিবারে । বালক আশুতোষ, কিশোর আশুতোষ নিজেও জীবনের ওই সময়টার বেশির ভাগই তার বাবার চাকবির সুবাদে সেকালের না-ভাঙা-বাংলার প্রায় সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছে । সে সময় লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলার জগৎটাকে নিয়েই মশগুল হয়ে থেকেছে, বাইরের হৈ-হল্লোড় আর দামালপানায় অস্থির ছিল তার দিনযাপনের রুটিন । কিন্তু ওই বয়সেই অমন দুরন্ত বহির্মুখিতার পাশাপাশি একটা অদ্ভুত নির্জন নিভৃত জগৎ ছিল তার । সেটি তার একান্ত নিজস্ব অন্তঃপুর, সেখানে আর কেউ নেই, নিজের দোসর সেখানে শুধু সে নিজে । রাতকে ভয় পেত দিনের সেই দামাল-দুরন্ত আশুতোষ । রাতে ভালো ঘুম হত না খুব ছোটবেলা থেকেই । দশটি ভাইবোনের মধ্যে পঞ্চম সন্তান খুব স্বাভাবিক কারণেই নিজের মতো করে একান্তভাবে পেত না কোলে-পিঠে-কাঁখে ঝোলা পরপর একটার পর একটা শিশু-সন্তানের ঝামেলায় অস্থির মাকে । কিন্তু তার মন হাহাকার করত, মাকে আঁকড়াতে চাইত, মুখ গুঁজতে চাইত মায়ের বুকের উষ্ণ ওমে । আসলে খুব ছেলেবেলা থেকেই এই ছেলে একধরণের 'ফিয়ার কমপ্লেক্স' আর 'অ-নিরাপত্তায়' ভুগত । আপাত দৃষ্টিতে এর কারণ ছিল না কোনই । কিন্তু সবকিছুই কি কারণ মেনে হয় ? যদি তা হত তাহলে সেদিনের দুরন্ত আশুতোষ রাতে ভাইবোনদের পাশে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারত । নিঃসঙ্গ রাতকে ভয় পেত না । নির্ঘুম রাতগুলোকে জয় করার তাড়নায় নানারকম উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি করত না । আর তাহলে ভবিষ্যতে 'লেখক' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েরও জন্ম হত না । তখনো পর্যন্ত 'লিখব' বলে একটি গল্পের চিন্তাও মাথায় আসেনি, কিন্তু ঘুমহীন রাতের নৈঃশব্দের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে কল্পনার যে মায়াময় জগৎ সৃষ্টি করে চলত দিনের পর দিন, হয়তো বা তখনই, বালক-মনের অনুভূতি একটু ঘন হবার মুহূর্ত থেকেই মগজের মধ্যে অদৃশ্য কালিতে নিঃশব্দে চলত লেখার কারিকুরি, চরিত্র গড়ার কারিগরি, ভাঙাগড়া, কাঁটাছেঁড়া, লেখালেখা খেলা । পরে, বাবার কথা শুনে, আমার মনে হয়েছে আসলে নারীর বুকে (তখন নিজের মা) আশ্রয় নেবার যে চিরন্তন ব্যাকুলতা পুরুষের মধ্যে বাস করে, সে বোধ সেই সময়েই আশুতোষের মধ্যে 'সুপ্তভাবে জাগ্রত' ছিল । এক বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীর কাছে শুনেছিলাম, প্রত্যেক শিশু তার জন্মের মুহূর্ত

থেকে তিনটি বোধ সঙ্গে করে আনে—নিজের নিরাপত্তা, যৌনতা, ও হিংস্রতা—সেলফ সিকিওরিটি, সেক্স, আর ভায়োলেন্স। যেগুলো প্রকাশ পায় ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে ওঠায়, মায়ের বুকে হাত দিয়ে খেলা করায়, সময়মতো খাবার না পেলে চীৎকার করে (কষ্টের কান্না নয়!) উগ্রতা জানিয়ে জননীর স্তনবৃন্ত মাড়ি দিয়ে তীব্রভাবে কামড়ে ধরায়। এগুলো কোন শিশুরই গোচরে থাকে না। বড় হয়েও অনেকেই হয়তো কোনদিনও জানতে পাবে না। আবার অনেকে জানতে চায়ও না। পুরুষ-শিশুর 'অপোজিট সেক্সের' যে দেহের সঙ্গে নিজের শরীরের প্রথম সংযোগ হয়, সেই নারীদেহ তার নিজের মা। মায়ের যোনি-পথ দিয়েই ('নর্মাল-বার্থ' এর কথা বলছি) সে পৃথিবীতে আসে। যে নারীর স্তনে সে সবচেয়ে আগে মুখ রাখার সুযোগ পায়, সে তার নিজের মা। যে নারীর ঠোঁট তাকে সর্বপ্রথম চুম্বনের আস্বাদ দেয়, সেই নারী তারই নিজের মা। যে নারী-বুক সে সর্বাগ্রে ছোঁয়, তা তার মায়ের বুক। তাই মায়ের প্রতি এক অন্ধ জৈবিক টান এবং সমর্পণ সমস্ত পুরুষ-শিশুর ভেতরে জন্ম-মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়ে যায়। এ সত্য ধাক্কা দেয় বলেই হয়তো মানুষ মনের এই গুহামুখের দরজা কখনো খুলতে চায় না। কিন্তু যে ভবিষ্যতে লেখক হবে ? হবে হৃদয়ের কারবারি ? ডুব দেবে বিচিত্র সব মানসিকতার গভীরতম গহনে ? তুলে আনবে যত দুর্লভ-দুষ্প্রাপ্য মণিমুক্তো ? সে কিন্তু ছোটবেলা থেকেই এই সুপ্ত অনুভূতির টানা-পোড়েনে অস্থির হবে। মাকে কাছে না পেলে দিনের দুরন্ত ছেলে রাতে এক না-বোঝা কষ্টের তীব্র পীড়নে চোখের জলে ভিজিয়ে দেবে বালিশ। ভেতরে ভেতরে যে নিঃসঙ্গ অসহায় শিশু-পুরুষ তার একান্ত আপন নারীর নিবিড়তায় একটু জায়গা পাবার জন্যে নিঃশব্দ হাহাকারে মাথা খুঁড়ে চলেছে, সে আর কোনো পথ না পেয়ে তখন নিজের মধ্যে একটা জোরালো আর 'ম্যাগনিফায়েড পার্সোনালিটির' ছেলের জন্ম দেবে। যেই ছেলে সব পারে, কোনকিছুই যে ভয় পায় না, কাউকে তার দরকার হয় না, সমস্ত বাধা যে সদর্পে উত্তীর্ণ হয়ে নিজেই নিজেকে হিরোর আসনে প্রতিষ্ঠা করে। তার একমাত্র দোসর, একমাত্র আত্মজন শুধু সে নিজে।

আর কারুর কথা জানি না। কিন্তু জীবনের একেবারে ভোরের সময়ের এই দিনগুলিতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ঠিক এই মানসিক অবস্থা হয়েছিল। পরে, আমি বড় হতে, বাবা নিজে আমাকে এ কথাগুলো বলছিল। ঠিক এই ব্যাখ্যা, যুক্তি, বিশ্লেষণ দিয়ে। পাঠক, আপনাদের আগেই বলেছি না যে আমি 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো' করতে বসেছি !...

আশুতোষের সেই নিজস্ব জগতে সে প্রবল দাপটে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করত। অত্যাচারীকে মনে রাখার মতো শাস্তি দিত ; দুর্বলকে নিজের প্রাণ দিয়ে রক্ষা করত ; গরীবকে রাশি রাশি টাকা দিত ; মৃতকে বাঁচিয়ে তুলে তার আত্মজনের মুখে হাসি ফোটাত—একাধারে রবিন হুড় এবং তৈলঙ্গস্বামী আর কি !...শুনে তখন হেসে বাঁচি না। কিন্তু আজ এ'সব লিখতে বসে চোখের জল বড় কষ্টে ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে ভাবছি, তার কল্পলোকের বাসিন্দাদের সুখেদুখে বিপদে-আপদের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা আর ওদের নিষ্ঠুর শত্রুর সঙ্গে কঠিন বোঝাপড়া—এই দুইয়ের অন্তর্ঘাতেই এবং অনিবার্যভাবে সত্যম্-শিবম্-সুন্দরমের জয়ে সেই সময় থেকেই সৃষ্ট হয়ে চলেছিল সেই 'সিনথেসিস', যা, পরবর্তীকালে জন্ম দেয় পরম ইতিবাচক ও চরম আশাবাদী 'লেখক-মানুষ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের !

।। ৩ ।। বই থেকে কলম

খেলাধূলার জমাটি আসরের মধ্যমণি, হকি-ক্রিকেট-ফুটবল, গাদা গাদা কাপ-মেডেল ছিনিয়ে আনা এবং তখনকার দিনে একটা টেনিস ক্লাবের পর্যন্ত পত্তন করে ফেলা—খেলাজগতের এই স্মার্ট নায়কটিকে কিন্তু সবার অলক্ষ্যে নিবিড় বাঁধনে বেঁধে ফেলেছিল একেবারে বিপরীতধর্মী একটি বস্তু—বই, গল্পের বই। বড়দের। গল্প-উপন্যাসের প্রতি তের-চোদ্দ বছরের ছেলের অদম্য ঝোকটাও বোধহয় অলক্ষ্যে লেখক হওয়ারই বীজ পুঁতে দিচ্ছিল ছেলেটির নিজেরও অগোচরে। কিন্তু এ সব বই পড়তে হত লুকিয়ে, বিনিদ্র রাতের নির্জনতায়। কারণ এই বয়সের ছেলের হাতে বড়দের বই তখনকার পরিবার, গুরুজন, সমাজ, সবারই চক্ষুশূল। লুকিয়ে অপরাধ-ধর্মী কাজ করার মধ্যে যে আশ্চর্য পুলক-মাখা রোমাঞ্চ আছে, তারই ফলে এই 'অ্যাডাল্ট' বই-পড়া মাদকরসে টইটুম্বুর হয়ে পরম উপাদেয় নেশার বস্তু হয়ে উঠল।...শরৎচন্দ্রের উপন্যাস দিয়ে এই 'নিষিদ্ধ বস্তুর' হাতেখড়ি। শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের দিয়েই সুপ্ত যৌন অনুভূতির প্রথম চোখ-ফোটা। 'কিরণময়ী', 'বিজয়া', 'রমা'-দের আরো দেখতে, আরো জানতে, আরো বুঝতে চাইত কিশোরের মধ্যেকার এক আদিম পুরুষ। আশুতোষকে এদের মধ্যে সবথেকে বেশি আকর্ষণ করত 'চরিত্রহীন'-এর 'কিরণময়ী'!...পাঠক, বুঝুন চোদ্দ বছরের ছেলেকে আষ্টেপৃষ্টে ছেঁকে ধরেছিল এক বিবাহিতা, পরিণত নারী, যে বৈধব্যের চৌকাঠে দাঁড়িয়েও চোখে বিদ্যুৎ খেলায়; যার অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীর ওপর অল্প আলো পড়ে কাঁচাপোকার টিপ চিকচিক করে; যার ঠোঁটের চাপা হাসি বিজলী হয়ে তারই ইচ্ছেমতো যাওয়া-আসা করে; যে নারী ভীষণভাবে তীক্ষ্ণ, তীব্র, উত্তেজক। যার 'সতীধর্ম' নিয়ে মনে সংশয় আসে বারবার। অথচ যে নারী নিজের চারপাশে এক উগ্র গণ্ডি কেটে রেখে একই সঙ্গে কাছে টানে ও দূরে ঠেলে। কিরণময়ীর অদ্ভুত আচরণে কখনো তাকে ঘৃণা করতে ইচ্ছা হয়, কখনো তাকে মহিমাময়ী মনে হয়। কিন্তু তাকে কখনোই নির্লিপ্ত অবহেলায় উদাসীন অবজ্ঞা করা যায় না। আসলে কিরণময়ী চির আকাঙ্ক্ষার সেই রহস্যময়ী ও দর্পিতা নারী যার সামনে পুরুষের অভ্রভেদী শির আপনিই ঝুঁকে পড়ে। যার জন্যে প্রতিটি পুরুষের অন্তরে জাগে 'চরিত্রহীন' হবার এক দুর্মর বাসনা। বালক আশুতোষ এই আশ্চর্য নারীর প্রেমে পড়েছিল। ওই বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্যেই। পরিণত বয়সেও সেই প্রেম অটুট ছিল। ওই একই কারণে। এ সব কথা তার নিজের মুখেই শুনেছি। এরপর পরপর নরেশ গুপ্ত, সৌরীন মুখোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসগুলি হজম করতে গিয়ে যৌন-চেতনার আলো-আঁধারির পর্দাটা একেবারে ছিঁড়েখুঁড়ে সমস্ত ব্যাপারটা প্রকট হয়ে উঠল কিশোর আশুতোষের কাছে।...যৌবন এলো। এ সেই রোমান্টিক সময় যখন নিজেকে পৃথিবীর সম্রাট বলে মনে হয়। হুগলি মহসিন কলেজের সায়েন্সের ছাত্রের তখন বিজ্ঞানের বই দেখলে কান্না পেত। কিন্তু তার বাবার ইচ্ছে ছেলেকে ডাক্তার করার। দিনে খেলাধুলার উদ্দাম জগৎ আর রাতে অ্যাডাল্ট উপন্যাসের হাতছানি—বিজ্ঞানের বই পড়ে ডাক্তার হবার সময় আর ইচ্ছে দুটোরই যে প্রচণ্ড অভাব! এর মধ্যে তখন শরৎ-বঙ্কিম-রবীন্দ্র পেরিয়ে বিদেশী সাহিত্যের জোয়ারে গা ভাসানো শুরু হয়ে গেছে। ফলে পড়ার বইয়ের ওপর ধুলোর পুরু আস্তরণ। কুইনিন গেলার মতো পরীক্ষার ঠিক আগে আগে কোনমতে সেগুলোর ভেতরের বস্তু গলাধঃকরণ করে পরীক্ষায় উতরে গেলেও, পাস করে

বেরুনোর পরে সেই প্রথম বিরোধ বাধল গুরুগম্ভীর পিতৃদেবের সঙ্গে। প্রবলপ্রতাপ বাড়ির কর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই প্রথম সরাসরি জেহাদ—বিজ্ঞান পড়ব না, ডাক্তার হব না। তিক্ত-বিরক্ত বাবা অবাধ্য ছেলেকে কলকাতায় কমার্স পড়তে ঠেলে দিলেন। তখনকার মতো ছেলে তা মেনে নিলেও কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রাণান্তকর অবস্থা। ভালোলাগে না, কিচ্ছু ভালোলাগে না, কোনকিছুই ভালোলাগে না। পরীক্ষা না দেবার জন্যে ইঁটের ওপর ডানহাত রেখে বাঁ হাতে তার ওপর পাথর দিয়ে দমাদ্দম বাড়ি মেরে হাত ঢোল করে বসে থাকত। টেস্ট পরীক্ষায় না বসে পালিয়ে ফুটবল খেলে এসে এক বন্ধুর গাইনোকলজিস্ট দিদির থেকে মেডিকেল-সার্টিফিকেট জোগাড় করেছিল। রাশভারি প্রিন্সিপাল পর্যন্ত হাসি কোনমতে গিলে জেরা করেছিলেন, কী তোমার হয়েছে আশুতোষ, যে একেবারে গাইনোকলজিস্ট দেখাতে হল ? তাও আবার লেডি ডাক্তার !

* * *

১৯৪৩ সালে খুব অপটুভাবে লেখক-সত্তা জাগল। জাগাল নতুন করে আবার পড়া চারটি উপন্যাস—শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' এবং দুখানি ইংরেজি বই —'ইটারনাল সিটি' আর 'ওয়ার ওয়াইন অ্যাণ্ড উইমেন'। এই বইগুলো পড়তে পড়তে নিজের ভেতরে কোথায় যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেল। এই বিপ্লবের নাম কী, চেহারা কেমন, কী চায় এ, তা নিজেও জানে না। শুধু মনে হত নিজেরই ভেতরের একটা দাহ্যবস্তু যেন কিসের ছোঁয়ায় হঠাৎই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল এতদিনে।...আকাশে তখন যুদ্ধের ধোঁয়া, বাতাসে বারুদের গন্ধ, মাটিতে দুর্ভিক্ষের খিদে। এমনই এক পটভূমিতে 'লিখব' বলে এই প্রথম হাতে কলম তুলে নিল যুবক আশুতোষ। বয়স তখন কত ? কুড়ির গোড়ার দিক !

লেখা আর ছিঁড়ে ফেলা। ছেঁড়া আর লেখা। এবার রাত জেগে চলতে লাগল পড়া নয়, লেখা।

...বয়স বাড়ছে, লেখার স্তূপ বাড়ছে, বাড়ছে বাড়ির সবার অসন্তোষও। কারণ এ ব্যাপারটা বেকারের বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু তখন ভাবতে শেখেনি পরিবারের সদস্যরা। লেখার পাতাগুলোকে জঞ্জাল ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি কারুর। সে এক নিদারুণ সময়। ভেতরটা সৃষ্টির তাড়নায় উম্মুখ, কিন্তু প্রকাশের হাত বড়ই কাঁচা। মাথার ভেতর থরে থরে তৈরি হয়ে চলেছে শিল্প-সম্ভার, কিন্তু কলম ধরার আঙুল বড্ড অপটু। বাবা-মা এবং কৃতী ভাইদের সংসারে ওই ছেলে তখন সকলের দুশ্চিন্তার বিষয়। বাতিলের পর্যায়ে। বাড়ির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তার নিভৃতের শিল্পী-মনে নিষ্ঠুর খোঁচা মারত। "আউশা নাকি ল্যাখে ? (আশু নাকি লেখে ?)...তা কী ল্যাখে ? (কী লেখে ?)...গপ্প-ওপিন্যাস ! (গল্প-উপন্যাস !) কিসের গপ্প-ওপিন্যাস ? প্র্যামের ? প্র্যামট্যাম ও শিখল কোত্থিকা ?" (কিসের গল্প-উপন্যাস ? প্রেমের ? প্রেমটেম ও শিখল কোত্থেকে ?) ইস্টবেঙ্গলের ডায়লেক্টে এরকম অজস্র ঠাট্টা-টিটকিরি তখনকার মতো ক্ষতবিক্ষত করলেও স্বধর্ম থেকে কোনদিনও নড়াতে পারেনি সৃজনীমনকে। এ সত্য পরে প্রমাণিত হয়েছে। তবে সে সময়ে বড় কষ্ট পেত কাঁচা বয়সের কাঁচা আশুতোষ। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, আঘাত, হুতাশা, আর বেকার নিরোজগেরে জীবন কুরে কুরে খেত তাকে। রাতে ঘুমোতে পারত না। প্রায়ই নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরের সিঁড়িতে এসে একলা বসে চেয়ে চেয়ে দেখত চাঁদ নিজেকে উজাড় করে জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে,

পৃথিবী বিহ্বল তার প্লাবনে। আহত যৌবন গুমরে উঠত—"চতুর্দিকের এই ভরভরতির মধ্যে শুধু আমিই এমন রিক্ত কেন ? এ যেন ভাদ্রশেষের নিরেট গুমোটে ছটফট করে মরা বন্দী ভবিষ্যৎ, নিঃশ্বাস নেওয়ার হাওয়াটুকুও নেই কোথাও।"...রিটার্ন-স্ট্যাম্প লাগিয়ে বিভিন্ন কাগজে লেখা পাঠিয়ে অসহ্য প্রতীক্ষার পর দেখা যেত প্রায় সব লেখাই ফেরত আসছে। যেগুলো আসছে না সেগুলো নিপাত্তা হয়ে যাচ্ছে। হতাশায় ডুবে যেতে যেতেও একটা সাঙ্ঘাতিক বলিষ্ঠ বোধের চাবুকে নিজেকে টেনে তুলত—"এত লোকের এত লেখা ছাপা হয়, কেবল আমারটাই হয় না কেন ? নিশ্চয় আমারই ভেতরে কোন গলদ আছে !" আসলে নিজের কাছে নিজের এই গলদ না ধরা পড়াটাই ছিল ভাবী লেখকের আসল যন্ত্রণা।

ঠিক এরকম অবস্থায় ভাগ্য বড় নিষ্ঠুর কৌতুক করেছিল আশুতোষের সঙ্গে। প্রথম উপন্যাস 'কালচক্র' প্রকাশের মুখ দেখল। লেখা হল আরও তিনটি উপন্যাস। 'আর্তমানব', 'জীবনতৃষ্ণা', 'চলাচল'। চতুর্থ উপন্যাস 'চলাচল'-এর পাণ্ডুলিপি তখন তৈরি হচ্ছে। সিনেমা কনট্রাক্ট হয়ে গেছে 'কালচক্রে'র। আর 'জীবনতৃষ্ণা' ছাপা শেষ। ঠিক এই সময় নিয়তি নির্দয় হেসে মুখের ওপর সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিল। 'কালচক্র' সিনেমা হতে হতেও হল না, 'জীবনতৃষ্ণা'র প্রকাশক প্রকাশনা বন্ধ করে দিল, যে পাবলিকেশন সংস্থায় নিজে ধার করে বেশ কিছু টাকা ঢেলেছিল, তা দেউলিয়া হয়ে গেল। দেউলিয়া হয়ে গেল আশুতোষ নিজেও। হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখিয়ে তারপর যে আঁধার নামে তার কালিমা আরও দুঃসহ, আরও ভয়ঙ্কর। সেই তমিস্রায় চোখে অন্ধকার দেখছে তখন সদ্য অঙ্কুরিত লেখক-সত্তা। তখনকার দিনে কয়েক হাজার টাকা লোকসান, দেনা, পরপর সাত-আটটা চাকরি ছাড়া। বাড়িতে, বাইরে, নিজের ভেতরে শুধু জমাট বাঁধা নিরেট পাথরের দেওয়াল। আশুতোষকে সে সময় তার বাবা এমন একটি কথা বলেছিল যা সে জীবনে ভোলেনি। তার বাবা বলেছিল, "এই সব ছাইভস্ম লিখে কী হবে ? যে স্ট্যাম্প খরচা দিয়ে লেখা পাঠাচ্ছিস তার দামটাও তুলতে পারবি কখনো ?"

বড় বেজেছিল, বুকে বড় বেজেছিল ওই কথাগুলো। লেখা শিকেয় তুলে এবার চাকরির চেষ্টা, স্থায়ী রোজগারের চেষ্টা, সংসারের প্রাপ্য টাকা দিয়ে সম্মানের ভাত মুখে তোলার চেষ্টা। ফিলিপ্স কম্পানিতে ভাল চাকরি জুটল। কিন্তু তিন সপ্তাহের মাথায় চাকরি ছেড়ে (বাংলার বাইরে যাওয়ার হুকুম শুনে) মাথা নীচু করে আবার ঘরের ছেলে ঘরে। কারুর মুখের দিকে তাকাতে পারেনি সে সময়। শুনতে হয়েছিল, "ও আমাদের শান্তিতে ঘুমতেও দেবে না"; "ভাইদের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে ওকে।" পরে এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের কৃতী-সন্তান, কৃতী-ভাই, কৃতী-পুরুষ সেদিনের এই কথাগুলো হাসিমুখে বললেও, আজ নিজের পরিণত মন দিয়ে বুঝতে পারি রোজগেরে ভাইদের যৌথ সংসারে একটি মাত্র বেকার অকৃতী ছেলে হওয়ার কী দুঃসহ গ্লানি আর অপরাধবোধে জর্জরিত হত মানুষ আশুতোষ। কোন অন্যায় না করেও কী ভীষণভাবে আক্রান্ত হত এক শিল্পী-মন, যে চাকরি-বাকরির অস্তি সাধারণ গৎ বাঁধা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে কিছু সৃষ্টি করার জন্যে ছটফটিয়ে মরছে। যে একই সঙ্গে নিজেকে আর চারপাশের মানুষকে কিছু দিতে চাইছে। বিলোতে চাইছে এক পরম সুস্থ শুভ আনন্দ—সাহিত্য। এ কারণেই বোধহয় জোর করে কখনো আমার ওপর (কারুর ওপরই) কোনকিছু চাপানোর চেষ্টা করেনি পরবর্তী কালের লেখক-মানুষ আশুতোষ

মুখোপাধ্যায় । বারবার বলত, "চারাগাছকে তার নিজের মতো করে বাড়তে দিতে হয়, নরম হাতে তার চারদিকে বেড়া দিতে হয় তাকেই বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, কিন্তু জবরদস্তি কোন ভার তার ওপর চাপাতে নেই ।" আশুতোষের বিশ্বাস—"কে জানে এই চারাই একদিন বড় হয়ে পারিজাত ফোটাবে কি না ! না পারলেও কারুর তো কোন অনিষ্ট করছে না, কিন্তু ফোটানোর সম্ভাবনাই নষ্ট করে দিলে সকলেরই যে বিরাট ক্ষতি !" এ কথা আমার শিশুছেলের প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিল লেখক-মানুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । এই বক্তব্য আসলে তারই নিজের জীবনের সমস্ত প্রতিকূল ব্যবহারের বিরুদ্ধে সশব্দ প্রতিবাদ ।

* * *

পাঠক, চলুন, আবার ফিরে দেখি এরপর কী করল আজকের এই রচনাবলীর গ্রন্থকার !

এবার শুধুই রোজগারের তাগিদে শুরু হল 'যুগান্তর' পত্রিকায় মাঝে মাঝে ফিচার লেখা আর কবিরেজি ওষুধের দোকানে বিজ্ঞাপনের চটকদার বয়ান রচনা । আর বাকি অখণ্ড অবসরে 'ভেতরের লেখকের' কামড় ভোলার তাগিদে তাস (পেশেন্স) খেলা । এ সময়ে যুগান্তর পত্রিকায় 'প্রাসাদপুরী কলকাতা' ফিচারটি খুব জনপ্রিয়তা পায় । এর ফলে 'বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক ডেকে পাঠিয়ে দৈনিকে 'অচল মানুষ' সিরিজ লিখতে দিলেন । এরপর প্রাণতোষ ঘটকেরই প্রেরণায় ও উৎসাহে মাসিক বসুমতী-তে লেখা হল 'নার্স মিত্র', যা পরবর্তী কালে হই হই ফেলে দিয়েছিল বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'দীপ জ্বেলে যাই' রূপে । এর পরের গল্প 'কলঙ্কবতী' । আবারও ওই বসুমতীরই পাতায় । এ দুটি ছোটগল্প থেকে পাঠকের কাছ থেকে যে অভিনন্দন মিলেছিল তা বিস্ময়কর । বসুমতীর সহৃদয় সম্পাদকের হাতেই বোধহয় ছিল লেখক-সত্তাটিকে সঠিকভাবে খুলে দেবার আসল চাবি । তিনি সম্ভাবী লেখকের সামনে মেলে ধরলেন এক নতুন দিগন্ত, আমন্ত্রণ জানালেন উপন্যাস লেখার । দীর্ঘ সাত বছর পরে আবার উপন্যাস লেখায় হাত পড়ল, লেখা হল 'পঞ্চতপা' । এই উপন্যাস পাঠকমহলে দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল, বিদগ্ধ-সমাজে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল । মানুষ-লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হিসেবে 'পঞ্চতপা'র জন্যে সে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে । বইটি তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল । প্রায় দুমাস তাঁর কাছ থেকে কোন সাড়া নেই । তারপর হঠাৎ একদিন নিজে যুগান্তর-এর দপ্তরে এসে এই সদ্য কুঁড়ি-ফোটা লেখককে ধরমার করে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে যেতে যেতে গম্ভীর মুখে জিগেস করেছিলেন, " 'পঞ্চতপা'র ছড়া-পাঁচালিগুলো তুমি নিজে বানাতে গেলে কেন ?"—জবাবে তরুণ লেখকটি মরিয়া হয়ে বলে বসেছিল, " 'কবি' উপন্যাসেও তো অনেক ছড়া-পাঁচালি আছে, কিন্তু 'কবি'র লেখকই বা সেগুলো নিজে লিখলেন কেন ?"—কোন জবাব নেই । এরপর দুরু দুরু বুকে মানী জ্যেষ্ঠের সামনে বেঁফাস কথা-বলা কনিষ্ঠের প্রতীক্ষা । বাড়িতে পৌঁছে তারাশংকর তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "এই হল আশু, ওকে কিছু খেতে দাও ।" তারপর গায়ের জামাটা খুলে ব্র্যাকেটে ঝোলাতে ঝোলাতে বললেন, "এবার আসল দরকারি কাজটা সেরে নিই ।" খালি গায়ে এগিয়ে এসে দু'হাত বাড়িয়ে প্রবীণ লেখক তাঁর উম্মুক্ত বুকে এক নবীন লেখককে সবলে চেপে ধরলেন । মানুষ-লেখক আশুতোষ সবসময় বলত, "সেই স্পর্শ এখনও আমার সারা শরীরে ছেয়ে আছে । বিরাট লেখকের সমস্ত শক্তি আর স্নেহ যেন উজাড় করে আমার মধ্যে ঢেলে দিতে বুকে

জড়িয়ে ধরলেন আমাকে ।"

এখনো কী আছে এমন অসামান্য নবীন-বরণ ? এমন অসাধারণ স্বীকৃতি জানানোর ক্ষমতা ?

জানি না ।

।। ৪ ।। চরৈবেতি

এরপর শুধুই সামনে চলা । লেখা, লেখা, আর লেখা । অজস্র উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধের দু একটি বই, কিশোর সাহিত্য । চলা, চলা আর চলা । বড় উপন্যাসগুলির মধ্যে পড়ে 'কাল তুমি আলেয়া', 'নগর পারে রূপনগর', 'শত রূপে দেখা', 'সোনার হরিণ নেই' (২খণ্ড) এবং 'পরকপালে রাজারাণী' (২খণ্ড) । অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে জনপ্রিয়তার নিরিখে নাম করতে হয় : 'চলাচল', 'পঞ্চতপা', 'সাত পাকে বাঁধা', 'বলাকার মন', 'বাজীকর', রাগশর', 'আনন্দরূপ', 'সেই অজানার খোঁজে' (২খণ্ড), 'যার যেথা ঘর', 'আমি সে ও সখা', 'নগর দর্পণে' 'তিনপুরুষ', 'পুরুষোত্তম', 'মানুষের দরবারে' ইত্যাদির। এছাড়া রয়েছে অজস্র ছোটগল্পের সংকলন, আরও প্রায় শ'খানেকের ওপর বই । এই সময়ে আশুতোষ-সাহিত্য টানা দিয়ে গেছে একের পর এক সুপারহিট সিনেমা । বেতারে ও মঞ্চে অভিনীত হয়েছে নাটক, পড়া হয়েছে ছোট গল্প । তখনো তো টিভি আসেনি !

লেখক হিসেবে আনুষ্ঠানিক কিছু 'প্রাইজ' পেয়েছিল, কিন্তু সেগুলো বড় মাপের কিছু নয় । সেই প্রাইজের লিস্ট আছে কিন্তু এখানে দেবার দরকার নেই । কারণ আজকালকার সরকারী বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রাইজে আস্থা বা বিশ্বাস কোনটাই ছিল না মানুষ-লেখক আশুতোষের । বলত, "পাঠকের-ভালবাসাই লেখকের সবথেকে বড় পুরস্কার । সেটা পেলে আমার আর কোন প্রাইজের দরকার নেই ।" পাঠক, সে পুরস্কার আপনারা লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে দিয়েছেন কি না তা বিচার করার দায়িত্ব তো আপনাদের !

এছাড়া অনুবাদও হয়েছে তার অনেকই উপন্যাস । প্রধানত হিন্দিতে । তাছাড়া ওড়িয়া, তামিল, তেলুগুতেও । এলাহাবাদের হিন্দি অনুবাদিকা মমতা খারেকে লেখক খুব ভরসা করতো তার বইয়ের ট্রানস্লেশনের ব্যাপারে ।

"বেস্ট লেখা কোনটা ?"—লেখক আশুতোষকে এ প্রশ্ন অনেকে অনেকবার করেছে । কোনো বইয়ের নাম না করে এর উত্তর নানাভাবে নানা জায়গায় দিয়েছে লেখক । কিন্তু মানুষ-লেখক-জনক আশুতোষ তার একমাত্র মেয়ের কাছে মনের কথাটা বলেছিল । বলেছিল, "বেস্ট লেখাটা এখনো লেখা হয়নি, কোনদিনও হবে না, অনন্তকাল ধরে লিখে গেলেও মনে হবে, ইট ইজ ইয়েট টু কাম ।" পাঠক হিসেবে এই মানসিকতার লেখককে আমি নমস্কার করি ।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখার মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ আমি এখানে করব না । সে ভার আপনাদের । এ বিচারের সর্বকালের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক আপনারা—পাঠকপরমেশ্বর । তাছাড়া অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় এ বিষয়টির দায়িত্ব নিয়েছেন । তবু আশুতোষ সাহিত্যের (শুধু) পাঠিকা হিসেবে আমি বলব, আমার পছন্দের

বইগুলি হল—'চলাচল', 'পঞ্চতপা', 'কাল তুমি আলেয়া', 'নগর পারে রূপনগর', 'সোনার হরিণ নেই', 'পরকপালে রাজারাণী', 'শতরূপে দেখা', 'আনন্দরূপ', 'সাত পাকে বাঁধা', 'সেই অজানার খোঁজে', 'বলাকার মন', 'তিনপুরুষ', 'বাজীকর' ও 'নগর-দর্পণে' । এর মধ্যেও সবচেয়ে প্রিয়—'চলাচল', 'কাল তুমি আলেয়া', 'নগর পারে রূপনগর' ও 'সোনার হরিণ নেই' । আর ভালোলাগে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের বই 'আবার আমি আসব' । প্রবন্ধের ওপর লেখা 'নিষিদ্ধ বই' । কিশোর উপন্যাস 'ফয়সলা' । ছোটগল্পের মধ্যে—মহাবিহার, মন্তি, ব্যক্তিত্ব, নার্স মিত্র, কলঙ্কবতী, ভ্রূসেরা, চোখ, রাপ্তির ডাক, মিঠা বিল, রোশনাই, পার্বত্য, রাবণ, স্নেহ, অভিরতি ও প্রথমা । আরও একটি গল্প খুব নাড়া দিয়েছিল, যার নাম ভুলে গেছি, যেখানে বক্তব্য ছিল, খ্যাতির একেবাবে চূড়োয় থাকতে থাকতেই 'রিটায়ার' করতে জানার নামই জীবনশিক্ষা । আশুতোষের ছোটগল্প প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, অধ্যাপক ডঃ ওয়াহাব মামুদ তাঁর বন্ধু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সবথেকে বড় ভাইকে বলেছিলেন, "ওয়ালর্ড-এর বেস্ট শর্টস্টোরি-রাইটারদের সঙ্গে ওকে (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে) অনায়াসে এক সারিতে প্লেস করা যায় ।" মামুদ-সাহেবের (আমাদের বাড়িতে ওঁকে এই নামে উল্লেখ করা হোত) এখন এ'কথা মনে আছে কি না জানি না । তবে পাঠক, মনে রাখবেন, ডঃ মামুদও এখানে পাঠক ' আপনাদের সকলের সঙ্গে একই সারিতে বসে রয়েছেন ।

এবার একটা কথা অকপটে বলি । লেখকের সব লেখা আমার ভালোলাগেনি, লাগতে পারেও না । সহস্র-কোটি ত্রুটি সত্ত্বেও সাধারণত মেয়েদের বাবার সবকিছুই ভালো লাগে । মেয়ে হিসেবে আমিও তার খুব একটা ব্যতিক্রম নই । কিন্তু লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত লেখা পাঠিকা সর্বাণী মুখোপাধ্যায়ের পছন্দ হয়নি । এ ব্যাপারে দু'জনের তর্কাতর্কিও হত যথেষ্ট । লেখক-বাপ সময় সময় পাঠিকা-তনয়ার যুক্তি মেনে নিত, কখনো বা এক ফুঁয়ে নস্যাৎ করে দিত । আমার যুক্তি খণ্ডন করলেও যে লেখাগুলো আমার ভালোলাগেনি তো লাগেই নি । এ ব্যাপারে পাঠিকা হিসেবে আমি ইনফ্লুয়েন্সড় হইনি কখনো, আজও হই না । 'সেন্টিমেন্টাল গ্রাউণ্ডে'ও না ।

কিন্তু টোটালিটির বা সামগ্রিক বিচারে আমি আশুতোষ-সাহিত্য ভক্ত । ভাল 'না' লাগা লেখাগুলোও মাঝপথে ছেড়ে দিতে পারিনি কখনো । পড়ে যেতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত । এ সেই দুর্লভ ক্ষমতা—'রিডেবিলিটি'—যা পাঠককে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় । এছাড়া আমি নিজে মেয়ে বলে আশুতোষ সাহিত্যের 'নারী-চরিত্র' আমাকে সম্মানিত করে । পছন্দের অন্যান্য পয়েন্টগুলি হল—গতির মন্ত্র, সামনে এগনো ; অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ ; চরম হতাশার মধ্যেও আশার দৃঢ় অঙ্গীকার ; অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কোন পাপই এমন পাপ নয় যা অনুশোচনার আগুনে পুড়ে ছাই হতে পারে না ; মৃত্যুর থেকে জীবন ছিনিয়ে আনা ; অন্ধতম খনির গর্ভে মণির সন্ধান ; হৃদয়ের গহনে বারেবারে ডুব দিয়ে বিচিত্র সব ঝিনুক তুলে আনা ; ঘন যৌনতার আশ্চর্য শৈল্পিক প্রয়োগ ; এবং সহজ-সাধারণ কিন্তু গাঢ় অনুভূতিময় ভাষা ।

**যে লেখাটি লেখার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হল না, সেটি হল লেখকের নিজের জীবন । এই আত্মজীবনধর্মী উপন্যাসের নামও বাছা হয়ে গিয়েছিল—'কীর্তিনাশার কূলে' । কিন্তু সে সময় লেখককে দিল না 'কাল-সময়' । পদ্মপাতা থেকে জল গড়িয়ে পড়ার মতো পিছলে**

গেল জীবন । এ লেখাটি লেখা হলে, পাঠক, বলতে পারি, আপনারা লেখক-মানুষ আশুতোষকে নিজেরাই প্রতিটি পাতা থেকে তুলে নিতে পারতেন । লেখার সম্পর্কে আর দুটি ঘটনা আপনাদের জানানো উচিত । যে 'চলাচল' উপন্যাস পরে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিল, সেই চলাচলের পাণ্ডুলিপি নিয়ে লেখককে প্রকাশকদের দরজায় ঘুরতে হয়েছে দিনের পর দিন । সবাই ফিরিয়ে দিয়েছিল 'বেশি আবেগপ্রবণ লেখা' বলে । উপন্যাস শেষ হওয়ার অনেকই পরে 'চলাচল' ছাপার অক্ষরে আসে । অথচ এখনো আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পাঠকদের মধ্যে একশো জনের ভিতর নব্বুই জনই জ্বলজলে মুখে চলাচলের নাম করে । আর তখনকার বড় প্রকাশকদের মধ্যে যিনি লেখাটি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই তিনিই বইটি পরে অন্যের ঘর থেকে নিয়ে (অর্থাৎ অন্য প্রকাশনায় 'চলাচল'-এর এডিশন শেষ হয়ে যাবার পর) সাগ্রহে ছাপেন । এ ব্যাপারে রসিক লেখক মজা করে বলেছিল, "যখন ভাল জিনিস দিতে গেলাম তখন পছন্দ হল না, এখন পরের এঁটো খাক ।" অপর ঘটনাটি হল 'পঞ্চতপা' মাসিক বসুমতী-তে অর্ধেক ছাপা হতে না হতেই যুগান্তর সাহিত্য বিভাগে (তখন আশুতোষ যুগান্তর পত্রিকাতে দশ নম্বর চাকরিতে ঢুকেছে) এক বিরাট নামজাদা প্রকাশক এসে হাজির হলেন 'পঞ্চতপা' উপন্যাসের প্রকাশনা-সত্ত্ব উপন্যাস শেষ হওয়ার আগেই নিয়ে নিলেন । 'পঞ্চতপা' যেদিন বই-আকারে দুনিয়ার মুখ দেখল, সেদিন বিকেলবেলায় লেখক ওই প্রকাশনা-সংস্থায় গেলে, গম্ভীরমুখে জবরদস্ত প্রকাশক তার হাতে একখানা 'চেক' ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "একটা শর্ত আছে । এরপর আপনার পরপর ছটি উপন্যাস আমাদের দেবার আগে আর কাউকে দিতে পারবেন না ।" আনকোরা লেখকের নিজের কানদুটোকে বিশ্বাস হচ্ছিল না—ঠিক শুনছে তো ! এতবড় অফার ! এই বিরাট প্রতিষ্ঠানে !... পাঠক, সেই বিরাট প্রকাশক হলেন সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র । সত্যিই বিরাট । বিরাট চেহারা, বিরাট মন, রাজকীয় অন্তর । আর সেই বিখ্যাত প্রকাশনা-সংস্থার নাম 'মিত্র ও ঘোষ' । গজেন্দ্রকুমার মিত্র সেদিন 'পঞ্চতপা'-র কনট্রাক্ট সই করিয়ে বলেছিলেন, "হাঁড়ির একটা ভাত টিপেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছি ।"...আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তার অগ্রজ-প্রতিমের এই বিশ্বাস, লেখক-ও-মানুষ দুইয়ের হিসেবেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রেখে যেতে পেরেছিল ।

পাঠক-পরমেশ্বর, 'পঞ্চতপা' নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘটনাটির সাক্ষী-প্রমাণ আজ আর দিতে পারব না । আপনাদের কাছে এটি 'হিয়ারসে' বা 'শোনা-কথা' হিসেবেই রইল । কিন্তু পঞ্চতপার দ্বিতীয় ঘটনার প্রমাণ সাড়ম্বরে এখনো আপনাদের এজলাসে পেশ করতে পারি । তার দরকার হবে কি ?

### ।। ৫ ।। অন্তরে-অন্তঃপুরে

**সুতরাং পাঠক, আপনারাও দেখলেন আর লেখকেরও নিজের কথায়—সাহিত্যজগতে প্রথম প্রবেশের ব্যাপারে প্রথম অনুভূতিটি আর যাই হোক 'থরথর প্রথম পরশ কুমারীর' মতো কিছু নয় । এই প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ার পেছনে সজাগ মস্তিষ্কের কোন ছক-বাঁধা পরিকল্পনা ছিল না, কোন প্রস্তুতি ছিল না, কোন অনুকূল পরিবেশ ছিল না, বা কোনরকম বৃহৎ প্রেরণার**

ছিটেফোঁটা উৎসও ছিল না। নিজের সৃজনধর্মী মনের ছটফটানি ছাড়া আর কোনকিছুই ছিল না। এ যেন বিনা ছাড়পত্রে হুট করে ঢুকে পড়ে নাস্তানাবুদ হবার মতো ব্যাপার অনেকটা।—

তবু দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষে ক্ষতবিক্ষত যোদ্ধার কপালে জয়ের জয়টীকা পড়ল। মাথায় উঠল শিরোপা—নাম-যশ-অর্থের বহু আকাঙ্ক্ষার চকচকে তাজ।

তারপর ?

পাঠক, চলুন, এ ব্যাপারটি বুঝতে লেখক-মানুষ বা মানুষ-লেখকের অন্তঃপুরের চালচিত্রের দিকে একটু চোখ ফেলি। আবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে হবে তার অপ্রতিষ্ঠার, অপযশের, আর অসাফল্যতার দিনগুলিকে—বিশেষ স্থান-কাল-পাত্র পাত্রীকে—তার সৌভাগ্যকে তার দুর্ভাগ্যকে—তার বাইরের হাসির ছটা আর অন্তরের চোখে জলকে। চলুন, এগোই, ফিরে ফিরে এগোই।

তরুবালা দেবীর দশ-দশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে পাঁচ নম্বর, আশুতোষ, ছেলেবেলায় মাকে সেভাবে আঁকড়াতে না পারলেও জীবনের সবথেকে অন্ধকার সময়ে তাঁর বরাভয়ের স্পর্শ পেয়েছিল। প্রাণঢালা আশীর্বাদ পেয়েছিল। ওই মহিলা দোষে-গুণে মিলিয়েই মানুষ—তারওপর প্রচণ্ড রাগী, গোঁড়া আর দাপুটে। কিন্তু কৃতী সন্তানের পাতে সব-মুড়ো আর অকৃতী ছেলের থালার কোনে ছাই—এ মানসিকতা তাঁর কোনোদিন ছিল না। বরং অসহায়-অপারগ সন্তানের প্রতি জননীর যে অতিরিক্ত মায়া থাকে, সেই সোনার কাঠির ছোঁয়া দিয়ে তিনি তাঁর এই সৃষ্টিছাড়া, বিষাদে-ভোগা, 'অপদার্থ' সন্তানটিকে জীবনের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন বারবার। 'অনেক দোষের' (অনেকেরই কাছে, আজও) এই মহিলাটির একটা বিরাট সম্পদ ছিল—একটা বিরাট বড় মন। মায়ের ব্যাপারে একটি ঘটনা বলতে গিয়ে আশুতোষের চোখদুটো চিকচিক করত, জলে আর আনন্দে।...সে মাসে মাত্র সাতচল্লিশটা টাকা রোজগার হয়েছিল। কিন্তু ক'দিন আশুতোষ লক্ষ্য করছিল মায়ের চশমার একদিকের ডাঁটিটা ভাঙা, কোনমতে সুতো জড়িয়ে সেটা ব্যবহার করছে। চোখের পাওয়ার জানা ছিল। সাতচল্লিশ টাকাটা পেয়েই পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে একটা নতুন চশমা এনে হাজির। বাকি গোটা মাসের জন্যে মাত্র দুটো টাকা পকেটে। এ ভাবে টাকা 'নষ্ট' করার জন্যে ছেলেকে খুব বকল তার মা। কিন্তু তাঁর চাপা গর্ব আর তৃপ্তি ভবিষ্যৎ লেখকের চোখ এড়ায়নি। এ ঘটনার পর একদিন গভীর রাতে লুকিয়ে ঠাকুর-ঘরে ঢুকে (এ বংশে বহু বছরের প্রাচীন নারায়ণ-শিলা ছিল, পাশাপাশি ছিল তরুবালা দেবীর দক্ষিণা-কালীর ছবি, তাঁর নিজস্ব অজস্র দেবদেবীরা) মেঝেতে মাথা ঠুকে কৃতী বাড়ির 'অপদার্থ' ছেলে যখন হতাশায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, তখন মাথায় কার যেন ঠাণ্ডা প্রাণ-জুড়নো হাত। দৈববাণীর মতোই আশুতোষ শুনল, "আশু, ওঠ। আমি বলছি তোর কোনদিন কোন দৈন্য হবে না। তুই যা যা চাস আজ এই ঠাকুর-ঘরে আমার এই ঠাকুরের সামনে চেয়ে নে। আমি বলছি, তোর হবে, তুই যা যা চাস, স-ব হবে তোর.."

জলে ভেজা মুখ তুলে আশুতোষ দেখল, তার গর্ভধারিণী মা। সেই চশমার পেছনে তাঁর চোখদুটি হাসছে।

পরে 'মানুষ-লেখক' মানুষটি তার মেয়েকে বলেছিল, "ঠিক সেই মুহূর্তে এক প্রচণ্ড

জোর পেলাম নিজের মধ্যে । মায়ের প্রতিটি কথা অকপটে বিশ্বাস করলাম । মনে হল মায়ের মুখ দিয়ে 'ছবির ওই জিভ বের করা 'বেটী' কথাগুলো বলল ।"

মেয়ে জানতে চেয়েছিল উদগ্রীব হয়ে—"তারপর ?"

"—চাইলাম । মায়ের সামনে তার আবাধ্যা দক্ষিণ-কালীর কাছে, বংশের নারায়ণের কাছে অর্থ-যশ-খ্যাতি-সাফল্য-নাম সমস্ত চাইলাম । ভাবলাম এগুলো পেলেই তো সবকিছু পাওয়া হয় । কিন্তু..." থেমে গিয়েছিল জনক আশুতোষ । ঠোঁটে ব্যথা-মাখা হাসি নিয়ে মেয়েকে সাবধান করে বলেছিল, "তুই কিন্তু কখনো কিছু চাইতে হলে বলবি 'তৃপ্তি দাও, আনন্দ দাও, আর শান্তি দাও' । এখন বুঝতে পারি এগুলোই আসল প্রাপ্তি । এর বাইরে আর কিচ্ছু নেই, বাকি সব ফাঁকি, ফাঁকা ।"

কেন এ কথা বলেছিল, আশুতোষের মেয়ে সেদিনই বুঝেছিল । কত কষ্টের, কত বেদনার, আর কত যন্ত্রণার ফল এই অভিজ্ঞতা, যার জন্যে সে তার সন্তানকে এই মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিল । তার মেয়ে সেটা অনুভব করতে পেরেছিল, আজও করে চলেছে ।

এবার আর একটি প্রসঙ্গের দিকে চলুন মুখ ফেরাই । একদিকে নিজের মা আর অন্যদিকে অপর যে মহিলাটির নিঃশব্দ-বিপুল অবদান ছাড়া মানুষ আশুতোষের লেখক আশুতোষ হয়ে ওঠা বড় কঠিন ছিল, সেই মহিলা মমতা মুখোপাধ্যায় । আশুতোষ-ঘরণী। ডাকনাম রেণু । আশুতোষ সকলের সামনে ডাকত 'এই যে', 'শুনছ' বলে । আড়ালে কি বলত জানি না কিন্তু চিঠিতে লিখত 'আমার রেণু' । শেষে লিখত 'তোমার ? তোমার কে ? ...তোমার আশুবাবু ।' এর প্রমাণ মমতা মুখোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর দুটি চিঠি ।

পাঠক, আসুন, এবার তখনকার 'হবু লেখকের' বিয়ের গল্পটা আপনাদের বলি । আমি কেমন করে জানলাম ? ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা । না, চোখে দেখিনি, কিন্তু কানে শুনেছি । খোদ ঘোড়ার মুখের খবর । পাত্র নিজে আমাকে বলেছে । দারুণ রসিয়ে, অ্যাকটিং করে করে । বয়স তখন আমার কত ? ষোল, না সতের ?

মমতা (তখন বন্দ্যোপাধ্যায়) লক্ষ্ণৌ-এর প্রবাসী বাঙালী । কলকাতায় এসেছিল নাকি কর্পোরেশন স্কুলে (হিন্দী খুব সম্ভবত) পড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে । তার কাকা ওই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত তখন ; সেই ভাইঝিকে নিয়ে এসেছিল । আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বউদির সঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বড়বৌদির বাপের বাড়ির আত্মীয়তা ছিল । ফলে যোগাযোগ । পাত্র এমনিতেই ছন্নছাড়া, মাথায় লেখার ভূত, তারওপর বয়স তিরিশ ছাড়িয়েছে তখনকার দিনে । আর কিছু হোক আর না হোক বিয়েটা দিয়ে ফেলতে হবে তো ? বাঙালির ছেলের বিয়ে কোনকিছুর জন্যে আটকায় ?... কিন্তু ! ভয় যে খোদ পাত্রকেই ! মেয়ে দেখানোর ব্যাপারটা তাকে জানানোই হল না । যদি পিটটান দেয় ? কোন এক নির্দিষ্ট দিনে তার বড়দাদার বাড়িতে তাকে অতি জরুরী 'নিমন্ত্রণ' করা হল । কিন্তু সে বাড়ির কাছাকাছি যেতেই ষড়যন্ত্রের গন্ধ নাকে লাগল । বছর দশেকের ভাইপো বাদল তার 'মোস্ট আনপ্রেডিকটেবল' "মণিকাকাকে" দেখা মাত্র বিরাট লাফ দিয়ে 'এসেছে' 'এসেছে' বলে উল্লসিত ঘোষণা করতে করতে ভেতরে দৌড়ে ঢুকে গেল । আর বড়রা মহাসমাদরে 'আয়' 'আয়' বলতে বলতে বেরিয়ে এসে তাকে প্রায় ঠেলে বসবার ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল । বাড়ির একমাত্র বেকার অকর্মণ্য ছেলের আবির্ভাবে এ হেন 'রিঅ্যাকশন' তো হওয়ার কথা নয় ! আশুতোষ বুঝল

কোন একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে, আর তাতে সে পা দিয়েও ফেলেছে । আর দিয়েই যখন ফেলেছে, তখন দেখাই যাক ! স্পোর্টসম্যান-স্পিরিটটা তো আছে আব কিছু থাক আব না-থাক !

"—তারপর ?"

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলল, "ঘরে ঢুকে দেখি ফর্সা জিবজিবে একটা মেয়ে, চোখে গোলগোল বিচ্ছিরি চশমা আর আঙুলে হলুদের দাগ, বসে রয়েছে । (পাঠক, সবাই কিন্তু বলত মমতা দেখতে ভাল ছিল, আর দেখার মতো ছিল তার হাতের আঙুল, এখনো আছে) যাক, আশুতোষ বলল, "মেয়েটাকে ঘিরে আর সবাই বসে আছে । মেয়ে দেখাতে ছেলেকে ডাকা হয়েছে, না ছেলে দেখাতে মেয়েকে আনা হয়েছে, তাই বোধগম্য হচ্ছিল না ।" খানিক পবে 'বড়রা' দু-জনকে কথা বলতে দেবার সুযোগ করে দিয়ে ঘব ছেড়ে চলে গেলে ভবিষ্যতের সাহিত্যিক তার ভবিষ্যৎ জীবন-নায়িকাকে প্রশ্ন করেছিল, 'এখানকার চিড়িয়াখানাটা দেখা হয়েছে ?' ওদিক থেকে স্পষ্ট জবাব এসেছিল, 'হ্যাঁ, আগেই দেখে নিয়েছি ।' আবার প্রশ্ন, 'লক্ষ্ণৌ-এর চিড়িয়াখানাটা বেশি ভাল না এখানকারটা ?' উত্তর, 'আপাতত লক্ষ্ণৌএরটাই ।' প্রশ্ন, 'কেন ?' দ্বিধাহীন জবাব, 'ওই চিড়িয়াখানাটা অনেক বেশি খোলামেলা আর জানাচেনা, এখানকারটার সঙ্গে তো অভ্যস্ত হইনি এখনো !'

সহৃদয় পাঠক, রসিক পাঠক, কী বুঝছেন ? ১৯৫০ এর গোড়ায় বসা পাত্রপাত্রীর প্রথম কথোপকথন এটি ।

একসময়ের টেনিস-প্লেয়ার প্রত্যেকটা সার্ভিস সমান তালে ফেরত পেয়ে খুশি হয়েছিল না চিন্তায় পড়েছিল নিজেই জানে না । তবে ব্যাপারটা এককথায় উড়িয়ে দিতে পারেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই আগস্ট মাসেরই চার তারিখে (৪।৮।৫৩) মমতা মুখোপাধ্যায় হয়ে গেল ।

পাঠক, মনে রাখবেন, জীবিকায় (তখন) ব্যর্থ তরুণ আশুতোষ কিন্তু বাস্তব জীবনে বরাবর দারুণ স্মার্ট, প্রখর বাকচাতুর্যে ভরা, আর শ্যামল-সুন্দর পুরুষ ছিলেন ।

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে একটা কথা বলি । আশুতোষের মমতাকে লেখা সেই চিঠি দুটি তাদের মালিককে ফিরিয়ে দিলাম । কাছে রাখতে পারলাম না । সেই চিঠি থেকেই প্রথম জানলাম সদ্য জনক হওয়া আশুতোষ আদর করে তার মেয়েকে বলত 'তোতো', 'বুবলি' । গা শিরশির করছিল, মনে হচ্ছিল যেন কথা বলছে । এবং এ'দুটি ফেরত পেয়ে মমতা মুখোপাধ্যায়কে যে ভাবে থরথর করে কাঁপতে দেখেছি, কাঁদতে দেখেছি, তাতে মনে হচ্ছিল সত্তরের দোরগোড়ায় আসা প্রবীণা নয়, এক চিরন্তনী প্রেয়সী নারী তার শাশ্বত প্রেমিককে নতুন করে খোয়াচ্ছে, ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে নতুন করে । নতুন করে এই নিবিড় বেদনাকে জাগানো আমার প্রচণ্ড অপরাধ, আমার বিশাল প্রাপ্তি ।

একটি নারীর স্বামীত্ব ও তারপর একটি কন্যার পিতৃত্ব । কিন্তু সন্তান-ভাগ্যে শুধু দুঃখই জুটেছে কপালে । প্রথম সন্তান জন্মাল, মেয়ে, বাঁ-পাটি উলটোনো । সদ্য পিতা আশুতোষ ফ্যালফ্যাল করে দেখল তার ঠ্যাং-ব্যাঁকা মেয়েকে, দেখল স্ত্রীর হাউহাউ কান্না । সেই দিনে বত্রিশটাকা ফী-এর হাড়ের ডাক্তার এনে দীর্ঘ ছ'মাসের চিকিৎসায় কত কষ্টে মেয়ের পা ঠিক করল । সে মেয়েই সর্বাণী মুখোপাধ্যায় । নামটাও তারই দেওয়া । একেবারে প্রথম জীবনের

তার কোন্ এক কাঁচা উপন্যাসের নায়িকার নাম । 'সর্বাণী' আভিধানিক অর্থে মহাদেবের (সর্ব) ঘরনী, কন্যা নয়। কিন্তু লেখক ও জনক 'আশুতোষের' (মহাদেব) তনয়া হল সর্বাণী । ...ছ বছর পরে দ্বিতীয় সন্তান । এবার ছেলে । নাম জয় । আনন্দের বান ডাকল বাড়িতে । কিন্তু সেই ছেলের তিন-চার বছরেই ধরা পড়ল অব্যর্থ মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে করেই সে পৃথিবীতে এসেছে, কালব্যাধি তার শরীরে, নাম 'মাসকিউলার ডিসট্রফি' । সারা পৃথিবীর কোথাও এর কোন চিকিৎসা নেই ।

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল লেখক-মানুষ-জনক আশুতোষ । বেশ কিছুদিনের জন্যে ছেড়ে দিল 'কলম' । প্রথম সন্তান (ঠ্যাং ব্যাঁকা সত্ত্বেও) আসার পরপরই যুগান্তর পত্রিকায় চাকরি, যাতে টিকে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত ; লেখার জগতে খ্যাতি ; পরপর আলোড়ন তোলা ছবি — 'চলাচল', 'পঞ্চতপা', 'দীপ জ্বেলে যাই', 'জীবন-তৃষ্ণা', 'সাত পাকে বাঁধা'—অর্থ-যশ-সাফল্য-স্বীকৃতি-নাম-মান ; যা যা সেই ঠাকুরঘরে মাথা খুঁড়ে চেয়েছিল, বৃষ্টির মতো ঝরতে শুরু করেছিল । কিন্তু একমাত্র ছেলের মৃত্যুর পরোয়ানা শুনে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল এই লেখক, এই মানুষ, এই জনক । তখনই অনুভূত হয়েছিল সেই পরম সত্য—তৃপ্তি আনন্দ আর শান্তিই হল আসল প্রাপ্তি । এর বাইরে কিছু চাওয়ার নেই, কিছুই পাওয়ার নেই ।

ভেতরে ভেতরে গুঁড়িয়ে খানখান হয়ে গেল স্বামী-স্ত্রী । কিন্তু হার মানল না কেউ । একে অপরের কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁতে দাঁত চিপে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে রুখে দাঁড়াল । লেখক-জনক আশুতোষ হাতে কলম তুলে নিল । শেষ অবধি অনিবার্য পরাজয় জেনেই যুদ্ধ করল টানা চোদ্দটা বছর ধরে । স্ত্রী নিল ছেলের সেবার ভার । আর লেখক আশুতোষকে লেখার সময়, সুযোগ, ও মনের-জোর দেওয়ার বড় সাংঘাতিক কঠিন ভাব । আশুতোষ রাতের পর রাত জেগে ছেলের সেবা করেছে স্ত্রীর সঙ্গে । দিনের পর দিন মৃত্যু ঘরে নিয়ে যাকে হাসিমুখে সংসারের (শুধু বাপ-মা-স্ত্রী-সন্তান নিয়ে নিজস্ব সংসার নয়, ভাই-ভাইবৌ ও তাদের ছেলেমেয়েতে ভরা বিরাট যৌথ সংসার) সমস্ত দায়িত্ব বইতে দেখেছি সে আগুনে-মানুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । পাশের ঘরে মুমূর্ষু ছেলে নিয়ে দিনের পর দিন নিজেকে কাঁটা বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে যাকে সাহিত্যের ফুল ফোটাতে দেখেছি সে নমস্য-লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে 'ক্র্যাম্প'-এ আক্রান্ত আঙুলগুলি মুঠি ধরে লাঠির মতো ধরে কলম বাগিয়ে যাকে প্রাণপাত পরিশ্রম করে সন্তানের চিকিৎসার ও বিশাল একান্নবর্তী সংসারের লাগাতার প্রয়োজন মিটিয়ে যেতে দেখেছি, সে যোদ্ধা-পুরুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । আর লুকিয়ে বাথরুমে ঢুকে খানিক চোখের জল বার করে দিয়ে মুখ ধুয়ে যে বাইরে বেরিয়ে আসত সে শুধুই পিতা, বড় দুর্ভাগা, বড়ই দুঃখী জনক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । আর, এতগুলো 'ডাইমেনশনের' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কোন একটিকেও একটিও ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হওয়ার অধর্ম থেকে যে রক্ষা করে এসেছে, নিজেকে নিঃশব্দে ক্ষয় করে করে, সে তার সহধর্মিণী মমতা মুখোপাধ্যায় । এ কথা আজ বুক ফুলিয়ে বলতে পারি (তথাকথিত আত্মীয় পরিজনরা স্বীকার করুক আর নাই করুক কিন্তু সত্যিকারের আত্মজনেরা অকপটে স্বীকার করবেন) মাটির মতো সহিষ্ণু, ধৈর্যময়ী, নরম আর সাহসী এই অতি 'সাধারণ' মহিলার নিঃস্বার্থ সহযোগিতা, প্রেরণা আর শক্তি ছাড়া আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আজকের এই সর্বজন-প্রিয় সফল লেখক হতে পারত না । এ কথা বহু মানুষ

মুখে, লিখে, বলে স্বীকার করেওছেন। (পাঠকের যদি প্রমাণের দরকার হয়, জানাবেন, নাম-ঠিকানা দিয়ে এ কথার যাথার্থ প্রমাণ করব। যাদের নাম-ঠিকানা দেব, তাঁদের অনেককেই আপনারাও চেনেন।) স্বামী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিজে এ কথা বারবার স্বীকার করেছে। করেছে তার নিজের রক্তের বাহকের কাছে, নিজের মেয়ের কাছে। নিজের জামাইয়ের কাছেও। বলত, বারবার বলত, "ও মুখ ফুটে কোনদিন কিছু চাইল না, শুধু দিয়ে গেল। ও বোধহয় এ জন্মে শুধু 'সেবা' দিতেই এসেছিল।" পাঠক, আপনারা লেখকের নিজের প্রিয় উপন্যাস 'সোনার হরিণ নেই'-এর উৎসর্গের পাতাটা দেখেছেন ? যদি না দেখে থাকেন তো দেখবেন উৎসর্গে কেবল লেখা আছে 'তোমাকে'। এই 'তোমাকে' হল মমতা মুখোপাধ্যায়, যে মুখ ফুটে কোনদিন কিছু চাইতে শেখেনি বলেই হয়তো লেখক-প্রেমিক-স্বামী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে উপন্যাসে আসলে নিজেকেই ব্যক্ত করেছিল নায়কের মাধ্যমে, সেই বইটিই তার জীবনের পরমা নারীকে দিয়ে গেছে।

।। ৬ ।। প্রবৃত্তি-জয়ী ; সংযত ; বিচিত্র

লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পাঠিকা-প্রিয় ছিল। তার কাছে প্রচুর মেয়ে ও মহিলারা আসত, ফোন করত, কথা বলতে চাইত। লেখকের ফ্যান। পার্টিতে গেলে সুবেশা রমণীরা ঘিরে ধরত। সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলত লেখক। এ নিয়ে এক সন্ধের এক ঘটনা আপনাদের বলি। তাহলে বুঝতে পারবেন লেখক আশুতোষের মানসিকতা ও রসিকতার সাঙ্ঘাতিক নজির। সন্ধেবেলা একটা সাদা অ্যামবাসাডারে করে একদল মহিলা এসেছিলেন আশুতোষের সঙ্গে দেখা করতে, গল্প করতে, আশুতোষ-সাহিত্য অনুরাগিণী তারা। দুম করে চলে এসেছেন ফোনটোন না করেই। এঁদের কাউকেই লেখক-আশুতোষ চিনত না। গরমের সন্ধে, লেখক লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বসেছিল। অতি আধুনিকা এই মহিলা-দঙ্গলকে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়তে দেখে প্রথমে একটু ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল—খালি গা ! এইরকম সব ভুরভুরে 'গন্ধ-অলা' মহিলাদের সামনে ! কিন্তু তারপরেই কী ভেবে আর উঠে গিয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে এল না ; ওখানেই ওরকমভাবে গ্যাঁট হয়ে বসে থেকে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। কিন্তু লেখকের মেয়ের তার বাবার এই 'গাঁইয়াপনা' অসহ্য লাগছিল। সে মহিলাদের পেছনে দাঁড়িয়ে বারবার তার বাবাকে ইশারায় বলছিল, "জামা ! জামা ! গায়ে একটা জামা দাও !" আশুতোষ ইচ্ছে করেই দেখেও দেখছিল না। শেষে মেয়ে নড়ে না দেখে উত্যক্ত হয়ে বলে উঠল, "কী তখন থেকে জামা জামা করে যাচ্ছিস ? যাদের ঊর্ধ্বাঙ্গে কাপড় দরকার তারাই যদি না দেয় তো আমি এই গরমের মধ্যে জামা পরে মরি কেন ?" মেয়ে পালাতে পারলে বাঁচে তখন। বাঁচে সেই মহিলাকুলও। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘর ফাঁকা। মেয়ে তারপর চোখ পাকিয়ে তেড়ে যেতেই আশুতোষ বলেছিল, "বেশ করেছি। কী সব পোষাকে এসেছিল দেখেছিস ? ব্লাউজ তো নয়, ন্যাকড়ার ফালি ! বুক-পিঠ সব বের করে একটা ব্যাটাছেলের সামনে বসে আছে !"

মেয়ে একদিন জিগেস করেছিল, "আচ্ছা বাবা, লেখকদের তো মদ খেয়ে হল্লোড় করা, মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি, অন্যের সুন্দরী স্ত্রীদের সঙ্গে পরকীয়া প্রেম তাদের প্রায়

ফানডামেনটাল রাইটের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে । তা তোমার জীবনে সেরকম কিছু ঘটেনি ? বা তোমার ইচ্ছে করে না কখনো ? লোভ হয় না ? চান্স তো প্রচুর পাও !" (হ্যাঁ, এরকমই বন্ধু ছিল জনক-আশুতোষ আর তার মেয়ে) । আশুতোষ একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, "ওরা (মহিলারা) বেশি গা-ঘেঁষাঘেঁষি করলে মনটা বিক্ষিপ্ত হয় ঠিকই, কিন্তু জয়ের (ছেলের) এই মারাত্মক ব্যাধিই আমাকে রক্ষা করেছে । যখনই এরকম কোন অবস্থায় পড়ি, আমি যেন স্পষ্ট দেখি জয় বড়বড় চোখ মেলে আমাকে দেখছে । দেখছে যার একমাত্র ছেলে বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে, তার বাবা কী করে !" আশুতোষ জানিয়েছিল ও-ধরনের তথাকথিত স্মার্ট, আপ-টু-ডেট মহিলাদের থেকে সংখ্যায় অনেক অ-নে-ক বেশি ছিল হৃদয়ের মাধুর্যে ভরা, বলিষ্ঠ মনের ও শুদ্ধ-চেতনার নারীরা যাঁরা সত্যিকারের পাঠিকা, খাঁটি অনুরাগিনী আশুতোষ-সাহিত্যের । লেখক ও মানুষ আশুতোষ এঁদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে বারবার । বলেছে, "মেয়েদের জন্যেই তো আমি টিকে আছি, মেয়েরাই তো আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, আমার লেখার সিংহভাগ বিভাব তো মেয়েরাই !"

ছেলে জয়ের অসুখকে কেন্দ্র করেই লেখা হয় মর্মস্পর্শী উপন্যাস 'আনন্দরূপ' । উত্তমকুমার এই বইটি পড়ে অভিভূত হয়ে 'আনন্দরূপ' চরিত্রটি করতে চেয়েছিলেন । হয়ে উঠল না, সময় পেলেন না তিনিও । ছেলের জন্য কখনো সবাইকে নিয়ে, কখনো একা ভারতবর্ষের অন্দরে-কন্দরে ঘুরে বেড়িয়েছে জনক আশুতোষ । যদি কোন সত্যিকারের সাধকের সন্ধান মেলে যাঁর বিভূতিতে ছেলে সুস্থ হয়ে উঠবে ! মেলেনি, এমন কারুর দেখা মেলেনি । কিন্তু চরম নেতির মধ্যেও ইতি খোঁজা লেখক-আশুতোষ ছেলের প্রাণ-ভোমরা খুঁজে আনতে না পারলেও, কুড়িয়ে আনত সাহিত্যের রসদ । যেখানে যেখানে গেছে সমস্ত জায়গা থেকে । প্রতিটি চরিত্রকে বিশেষ মাত্রা দিয়ে, সাজ পরিয়ে লিখে গেছে অক্লান্তভাবে । বহু ঠগ-জোচ্চর জনক আশুতোষের দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে গাদাগাদা টাকা লুটে নিয়ে যেত । আশুতোষ যে যা বলত মুখ বুজে করত, যে যা চাইত এককথায় দিয়ে দিত । মেয়ে বলত, "বাবা, করছ কী ! তুমি বুঝতে পারছ না এরা চীট ?" লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হাসত, "জানি । সত্যিকারের সাধু-মহাত্মারা রোগ সারানোর জন্যে কখনো পয়সা চায় ? আমি জেনেশুনেই ঠকি । তবে ঠিক ঠকিও না, কারণ টাকা দিয়ে এই চরিত্রগুলোকে আমি খুব কাছ থেকে দেখে নিই, এরাও তো আমার লেখার রসদ !" আর মানুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছিল, "সব জেনেবুঝেও আমি ইচ্ছে করেই টাকা দিই যাতে পরে যখন ছেলে থাকবে না, তোর মায়ের যেন কখনো এই আক্ষেপ না হয় যে এদের মধ্যে হয়তো একজনও ছিল যে আমাদের ছেলেকে সুস্থ করতে পারত !"

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তার বাবা-মাকে হারাল ১৯৭৪ সালে, একসঙ্গে । একদিনের তফাতে বিদায় নিল তার বাবা-মা । পঞ্চাশ-এর কোঠায় দাঁড়ানো আশুতোষ শিশুর মতো কেঁদেছিল । আর একমাত্র ছেলে জয় চলে গেলে সাতাত্তর সালে । কারুর সামনে সেদিন এক ফোঁটাও চোখের জল না ফেলে নিষ্প্রাণ ছেলেকে বড় যত্নে 'শেভ' করে দিয়ে, নিজের হাতে সাজিয়ে, মুখে চুমো খেয়ে বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত সঙ্গে করে গিয়ে তাকে রওনা করে দিয়ে এসেছিল এক যোদ্ধা-মানুষ । পরাজিত কিন্তু মাথা-উঁচু পুরুরাজ ।...সেই ভয়ঙ্করী রাত । স্ত্রী ওষুধের ঘোরে অজ্ঞান, মেয়ে শোকে আচ্ছন্ন হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে, টের পেল

মাথায়-গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে মুখের সামনে দুধের গ্লাস ধরে তার বাবা আশুতোষ কী শান্তভাবে বলছে, "ও (জয়) তো গোপাল ! আমাদের কাছ থেকে সেবা নিতে এসেছিল। নেওয়া হয়ে গেছে তাই চলে গেছে । আমি বরাবরই জানি আমার আসলে একটাই মেয়ে। এ দুধটুকু খেয়ে নে, লক্ষ্মী মা তো ! তোকে নিয়েই যে আমরা বাঁচব এরপর !"

মানুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পছন্দের রং ছিল ধপধপে সাদা আর জ্বলজ্বলে হলুদ। খেতে ভালবাসত চর্বিওয়ালা খাসীর মাংস, উচ্ছে-সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি, আর শসা । আর হুইস্কি । দেশী হলে 'পিটার স্কট' নয়তো 'স্কচ্' । রোজ সন্ধেবেলা এক্কেবারে মাপা ডোজ-এ ড্রিঙ্ক করত । আমি 'যে ভাবে' তাকে ড্রিঙ্ক করতে দেখেছি তার ফলেই আমার কাছে এটা কোন অন্যায় বা অসামাজিক কাজ বলে মনে হয়নি । কথাশিল্পী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মদ্যপানকেও নিজের জীবনে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল । তার ড্রিঙ্ক করা দেখে কখনো মনে হত না 'লোকটা মদ খাচ্ছে' । মনে হত এক রাজসিক চরিত্র যেন 'সোমরস পান করছে ।' তার একদম নিজস্ব একটা বিশাল কাচের গ্লাস ছিল । (এখনো আছে, যত্ন করে রেখে দিয়েছি) 'পেগ-মেজার' দিয়ে মেপে ঢেলে নিয়ে অর্ধেক সোডা আর অর্ধেক জল মিশিয়ে ফ্রিজ-এ রাখত । টেবিলে থাকত শসা-বাদাম, কখনো ঝালঝাল শুকনো বটি-কাবাব । ঘুরত-ফিরত, একটু একটু শসা-বাদাম কি কাবাব নুন মাখিয়ে মুখে ফেলত, নিজের হাতে তার মেয়ের মুখে দিত । (শুধু মেয়ে নয়, স্নেহভাজন যারা যারা সামনে থাকত সব্বাইকে, তারপর নাতি তো তার একচেটিয়া সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল সান্ধ্য-আসরের )। আর মধ্যে মধ্যেই ফ্রিজ খুলে কনকনে ঠাণ্ডা গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে ফিরে আসত । সেই সময় দারুণ দারুণ সব গল্প বলত ; বেশীর ভাগই নিজের জীবনের ঘটনা । আর সাহিত্য—নিজের, অন্যের । নানারকম লেখা নিয়ে আলোচনা করত । মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতাম । এরই মাঝে কখনো-সখনো মেয়েকে বলত, "ফ্রিজ থেকে গ্লাসটা একটু নিয়ে আয় তো !" মেয়ে নিয়ে এলে তাতে ঠিক একটা চুমুক দিয়ে আবার ফ্রিজ-এ গ্লাস পাঠিয়ে দিত । আবার চলতো গল্প । এ ব্যাপারে একটা স্বীকারোক্তি আছে ।...এরকম এক সন্ধেয় মেয়েকে ফ্রিজ থেকে গ্লাসটা এনে দিতে বলেছে, (মেয়ে তখন ক্লাস সেভেন-এ পড়ে) পাজী মেয়ে গ্লাস আনতে গিয়ে ফ্রিজের খোলা দরজায় নিজেকে আড়াল করে গ্লাসে বেশ করে একটা চুমুক দিয়ে চোখমুখ কুঁচকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে বাবা ঠিক পেছনে দাঁড়ানো । মনস্তত্ত্বের কারবারি কি করে যেন বুঝতে পেরেছিল, অথচ সেদিনই এ ব্যাপার প্রথম । মেয়ে কেঁপে উঠেছিল । তার বাবা তার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে শান্তভাবে বলল, "লুকিয়ে কোনকিছু করবি না । দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল এটা কেমন খেতে ? নে না ! ভালকরে একচুমুক খেয়ে দ্যাখ !" নিজের হাতে বারো/তেরো বছরের মেয়েকে জোর করে এক ঢোঁক গিলিয়ে দিয়েছিল যাতে এটার প্রতি কোন অনাবশ্যক কৌতূহল আর আগ্রহ না জন্মায় । এরপর থেকে কোনদিন 'লুকিয়ে' তার গ্লাসে মুখ দিতে হয়নি । আরেকটি ঘটনা আছে 'বড়দের বই' পড়া নিয়ে । কোন ছোটবেলা থেকে বড়দের বই পড়া শুরু করেছিলাম নিজেরও মনে নেই । এই নিয়ে একদিন গণ্ডগোল বাধল । আশুতোষের মেয়ে ধরা পড়ে গেল জামার নিচে বড়দের বই 'স্মাগল্' করে নিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে গোগ্রাসে গেলার অপরাধে । জানলার খড়খড়ি ফাঁক করে যে দেখেছিল, সে মমতা মুখোপাধ্যায়কে মুহূর্তের মধ্যে 'সংবাদ—পরিবেশন করছি...' করে এল ।

মমতা মুখোপাধ্যায় রবি ঠাকুরের 'শ্যামা'র কোটালের স্টাইলে এসে মেয়েকে টানতে টানতে 'রাজা'র (অর্থাৎ মেয়ের বাবার) কাছে নিয়ে গেল । বইটা মেয়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার বাবার হাতে দিল । আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বইটা আবার তার মেয়েরই হাতে ফেরত দিয়ে বলেছিল, "বই-পড়া তো সবচেয়ে ভাল কাজ ! লুকিয়ে পড়ছিলি কেন ?" মেয়ে বলেছিল কাঁচুমাচু মুখ করে— "বড়দের বই তো, তাই..."

"--ও, তা বড়দের বই পড়লে কী হয় ?" আশুতোষের প্রশ্ন । এর জবাব মেয়ের তখন জানা ছিল না । কিন্তু মেয়ের মা বলে উঠেছিল, "এখন থেকেই এ'সব বই ও পড়বে ?"

লেখক-মানুষ অথবা মানুষ-লেখক দৃঢ় ভাবে বলেছিল, "পড়বে, ওর ইচ্ছে হলেই পড়বে । তবে লুকিয়ে নয় । আর বই পড়ে কেউ কখনো নষ্ট হয় না । তাহলে ওর বাপ-মা আছে কি জন্যে ?"

উঁচু দরের জীবন-শিল্পী না হলে আজীবন কট্টর মধ্যবিত্ত পরিবেশে রয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে এগুলো সম্ভব হয় না । এই মানসিকতা সম্ভব হয় না ।

কিন্তু তথাকথিত চালিয়াত-স্মার্টনেস, কৃত্রিম সাহেবিয়ানা আর স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খল অসভ্যতার ঘোর বিরোধী ছিল এই মানুষ-লেখকটি । কি ঘরোয়া আসরে কি স্যোশাল পার্টিতে ড্রিঙ্ক করে মেয়ে-পুরুষের ছ্যাবলামি আর হুল্লোড় দু'চোখের বিষ ছিল । বলত, "এরা ড্রিঙ্ক করে কেন ? এরা ড্রিঙ্ক করে' ড্রিঙ্ক-এর বদনাম করে ! আসলে মদের দোহাই দিয়ে এরা যার যার ভেতরের নিষিদ্ধ ইচ্ছার লাগামটা খুলে দেয় । সব ইচ্ছেকৃত বদমাইসি ।" আবার, ঘরোয়া মজলিশে, বিশেষত আশুতোষের বেয়াই বাড়িতে অনেক সন্ধেতেই যখন তার বেয়াই-বেয়ান, মেয়ে-জামাই, ওই পরিবারের ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু-বান্ধবী আর তাদের ছেলে-মেয়ে-বৌ নিয়ে জমাট আসর বসত, যখন হঠাৎ স্মার্ট হয়ে ওঠা কোনো নন্-স্মোকার মহিলা ফুকফুক করে সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ত, মেয়েদের গ্লাস ভরার জন্যে যখন পুরুষেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত, আর যখন পিতৃস্থানীয় কেউ-কেউ কন্যা বা পুত্রবধূ-স্থানীয়া কারুর কানে ঠোঁট লাগিয়ে টেগোর-শেলী-কীট্স-বায়রন-শেক্সপীয়র-হেমিংওয়ে ভুলভাল 'কোট' করত—তখন, চরিত্র-সন্ধানী আশুতোষ মজাদেখা চোখে নিঃশব্দে টিপটিপ্ হাসত । সেই হাসিতে প্রচ্ছন্ন থাকত বিদ্রূপ আর বিতৃষ্ণা । এ প্রসঙ্গে আশুতোষ একদিন তার বেয়াইকে বলেছিল, "বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম'-এর শেষটা মনে আছে তো ?"...অথচ এই মানুষটি বহুসময় নিজের হাতে ড্রিঙ্ক ঢেলে খাইয়েছে অনেককেই । হ্যাঁ, যারা পরিমিতি হারাত না, তাদেরকে । জীবনশিল্পী আশুতোষ বলত, "করো, সবকিছু করো । করে, চুলচেরা বিচার করে যেটা নেবার সেটা নাও আর যেটা ফেলে দেবার সেটা ফেলে দাও । ভোগ না করে ত্যাগ শিখবে কোত্থেকে ?" আরও একটা প্রিয় কথা ছিল তার— "মদ-ভাঙ যা ইচ্ছে খাও । কিন্তু দেখো, ওগুলো যেন তোমাকে না খায় !"

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিল গভীরভাবে । কিন্তু কোনরকম বাঁধা-ধরা পুজো-আচ্চা দীক্ষাটিক্ষার বালাই ছিল না । শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি দেখিয়ে বলত, "এই আমার গুরু, দীক্ষা নেওয়া আমার হয়ে গেছে ।" মজা করে নিজেকে পূর্বজন্মের 'গিরিশ ঘোষ' বলত আশুতোষ । বলত, "একটা 'ডবলু-এর দোষ' (women) ঠাকুর আমার ও জন্মেই
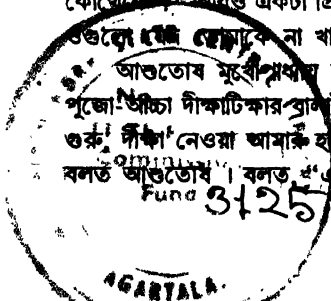
ঘুচিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আরএকটারটা (whisky) এ জন্মেও পারল না ।"

যে ধর্মে অটল ভক্তি ছিল তার, সে ধর্মের নাম স্ব-ধর্ম । মেয়েকে বলত, "ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে হলে ঘব বন্ধ করে আয়নার সামনে নিজেব মুখোমুখি দাঁড়াবি । নিজের চোখে চোখ রেখে বলবি, আমি এই করেছি । যদি নিজেব সেই চোখে চোখ রেখে উঁচু মাথায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিস, যদি সেই রিফলেকশন এতটুকু না নড়ে, তো জানবি তুই ঠিক আছিস । দুনিয়ার লোক যাই বলুক না কেন ।"

অসম্ভব রকমের ভদ্র ব্যবহারের জন্য খ্যাত যে লেখক-মানুষটি তার 'নগব পারে রূপনগর' ধারাবাহিক লেখা-কালীন নায়িকা জ্যোতিরাণীকে ডিভোর্স করিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে দেওয়াতে অপরিচিতা এক টুকটুকে বৃদ্ধার তোড়ে বকুনি নিঃশব্দে মাথা নিচু করে হজম করে হেসে বলেছিল, "মা, আজ আপনি আমাকে বকছেন তো, কিন্তু এর পরের সংখ্যাগুলো পড়ার পর নিজে থেকে এসে আমাকে আশীর্বাদ করে যাবেন", (ভবিষ্যতে তাই হয়েছিল । কিন্তু তখন নামী লেখক-পিতাকে ওরকম বাড়ি-বয়ে-আসা বকুনি অপরাধীর মতো শুনে যাওয়ার জন্য তার মেয়ে রেগে উঠতে যে লেখক-মানুষ বলেছিল, "এঁদের বকুনি শুনব না ! এঁরাই তো আমার ভগবান, আমার পাঠক !")—সেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দু'দুবার তার বাড়ি থেকে দুটি লোককে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিল । একজন এক তান্ত্রিক, যে এসে বলেছিল হোমযজ্ঞ করে কোন ভিখিরির সুস্থ-সবল ছেলের আয়ু দিয়ে আশুতোষের ছেলেকে সারিয়ে তুলবে । অপরজনও এমনই এক ক্ষমতাধর, যে বড়াই করে বলেছিল, কুকুর-বেড়াল কি যে কোনো পশুর বাচ্চার প্রাণ তার ছেলের মধ্যে চালান করে দিতে পারে । পারে কি পারে না সে প্রশ্নও আশুতোষের মাথায় আসেনি । প্রচণ্ড গর্জনে বাড়ি ফাটিয়ে ফেলছিল, "ভিখিরির ছেলে তার বাপ-মায়েব সন্তান নয় ? কুকুর-বেড়ালের বাচ্চা তাদের মায়ের শিশু নয় ? বেরোও ! বেরোও ! নয়তো খুন করে ফেলব !"

এই আমাদের জনক, এই আমাদের লেখক, এই আমাদের বিচিত্র মানুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ।

## ।। ৭ ।। প্রবঞ্চিত ; বেদনাহত ; রক্তাক্ত
## ও
## 'নিদ্রিত'
## এক-কথার মানুষ

**বাড়িতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা ছিল 'বড়ভাই'য়ের যদিও সে ছিল সবার সেজদা, ভাইদের মধ্যে তৃতীয় । বাড়ির যে কারুর যে কোন প্রয়োজনে 'সেজদা আছে' । তখন এই বাড়ি, আসলে আশুতোষের পৈত্রিক বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও, সকলের কাছে 'লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি' । নম্বর বলতে হত না, যে কেউ দেখিয়ে দিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামটা উচ্চারণ করা মাত্র । এই 'বাড়ির' কারণেই আশুতোষ সারা জীবনে নিজের একটা আলাদা 'ব্যবস্থা' করেনি । যদিও সকলের আগেই করতে পারত দেরিতে 'দাঁড়ানো' সত্ত্বেও । কারণ, ভেবেছিল, আর বলেওছিল, "মেয়েটার বিয়ে হয়ে চলে যাবে, ছেলে থাকবে**

না, আমরা দু'বুড়োবুড়ি কি আলাদা বাড়িতে একলা দম আটকে মরব ?...না, এ বাড়িতেই আমরা ভাইদের নিয়ে জড়িয়ে-ভরিয়ে থাকব ।" কিন্তু শেষ অবধি তা হয়নি । আর এ নিয়েই সে দারুণ ব্যথা পেয়ে গেছে জীবনের শেষ বেলায় । পেয়েছে তার সবথেকে নির্ভরতার লোকগুলোর কাছ থেকেই । আমার মনে হয়, আশুতোষের আকস্মিক মৃত্যুর মূলে দুটি প্রধান কারণ । এক, তার একমাত্র মেয়ে, দুই,...। নাঃ, প্রথমে মেয়ের অপরাধের কথাই বলি । একটি মাত্র সন্তানের জন্যে তখন দুশ্চিন্তায় ছটফট করত জনক আশুতোষ । কারণ, মেয়েব শ্বশুরবাড়ি (স্বামী নয় কিন্তু) ; স্নেহময় শ্বশুরের মৃত্যুর পর পাঁচ বছর ধরে সেখানে শান্তি ছিল না । সেই সব অশান্তির কথা যদি তাকে না জানানো হত, তাহলে হয়তো চোট-খাওয়া বুকে আরও চোট পড়ত না । কিন্তু তার ইডিয়েট মেয়ে, স্বার্থপর মেয়ে, নিজের অশান্তির বোঝা হালকা করত তার কাছেই ছুটে ছুটে এসে । আবার কখনো লুকোতে চাইলেও, মেয়ের মুখ দেখেই বুঝতে পেরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত কথা বের করে নিয়ে রাগেদুঃখে গুম হয়ে থাকত । বলত, আমি একটা মনস্তাত্ত্বিক রাইটার ! মানুষের সাইকলজি নিয়ে ব্যবসা করি ! আমার কাছে তুই কী লুকোবি ?" এ জীবনে তার মেয়ে কেবল একটা পুণ্যই করেছিল । নিজের ছেলেকে ন'দিন বয়স থেকেই তার বাবার জিম্মা করে দিয়েছিল । শিশু-সান্নিধ্যের আনন্দ, 'আসলেব চেয়ে সুদের' স্বাদের বেশি ফুর্তিটুকু আশুতোষকে তার মেয়ে দিতে পেরেছিল মাত্র সাড়ে ছ'টা বছরের জন্যে । কারণ, তারপরেই তো... ! তবে ওই কাজটাও মেয়ে করেছিল নিজেরই স্বার্থে, ছেলে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে ঢোকা তখন সম্ভব হয়নি তাই ।

দু'নম্বর কারণ, ভদ্রাসন বিক্রীর তোড়জোড় । এ বাড়ি আশুতোষের প্রাণ ছিল । এর সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে ছিল তার সমস্ত সত্তা ।—এ বাড়িতে তার সেই ঠাকুর-ঘর । বাপ-মায়ের যাওয়া, তারওপর এ বাড়ি থেকেই সে তার একমাত্র ছেলেকে বিদায় দিয়েছিল । এ বাড়ি অন্যের কাছে বিক্রী করে দেবার জন্য উঠে-পড়ে লাগাটা তাকে ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল । নিবিড় ব্যথা ব্যক্ত হয়েছে তার অগ্রজ-প্রতিম বন্ধু (যুগান্তর-এর) শ্রীভূষণচন্দ্র দাসের কাছে লেখা কিছু চিঠিতে । (সেগুলোর জেরক্স-কপি আমি রেখে দিয়েছি ) দারুণ অভিমানী আশুতোষ স্পষ্ট করে কিছু না জানালেও যারা তাকে জানত তারা বুঝত কোন্ কষ্টে ছটফট করছে লোকটা । দুরন্ত অভিমানে এক কথায় বাড়ি বিক্রীর ফতোয়া-জারি মুখ বুজে মেনে নিল । কিন্তু আহত-হৃদয় তা শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারল না । রাতের পর রাত বিছানায় চুপ করে বসে থাকত । কখনো স্ত্রীকে বলত, "হ্যাঁ গো, এই বয়সে আমরা কোথায় যাব বলতো ? কোথায় গিয়ে নতুন করে সংসার পাতব ? কার জন্যে পাতব ? এখানে, এই বাড়িতে সবাই একসঙ্গে থাকব বলেই তো আলাদা বাড়ি করিনি ! যে যে নিজের ক্ষমতায় পেরেছে আলাদা বাড়ি করে চলে গেছে । ওরাও (যারা বাড়ি বিক্রীর হোতা) তাই যাক না ! কিন্তু বাবার বাড়িটাকে ওরা এভাবে শেষ করতে চাইছে কেন ? নিজেদের ছেলেদের জন্যে বাড়ি করতে হবে বাবার করা বাড়ি বিক্রী করে দিয়ে ?"

একদিন দুপুরে ভাত খাচ্ছিল আশুতোষ, বলা নেই কওয়া নেই লোকজন নিয়ে এসে টেপ্ দিয়ে মাপজোক শুরু হয়ে গেল । দুরন্ত রাগে মানুষটির মুখ থেকে বুক পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল, বিষম লেগে গলায় ভাত আটকাল, পড়ল ভাঙা বুকে চোট । কোনমতে খানিকটা জল খেয়ে বিড়বিড় করে বলল, "বাবার বাড়িটাকে ওরা টুকরো টুকরো করে তবে ছাড়বে ।

কিন্তু আমিও বলে রাখছি, কেউ আমাকে এখান থেকে নড়াতে পারবে না, যদি বেরুতে হয় তো এ বাড়ি থেকে আমার ডেড-বডি বেরুবে।"

কী মর্মান্তিক ভবিষ্যৎ-বাণী নিজের সম্পর্কে ! অক্ষরে অক্ষরে প্রতিটি কথা ফললো। ১৯৮৯, ৪মে, দিন যখন সবে শুরু হচ্ছে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল প্রবঞ্চিত আশুতোষ ; বেদনাহত আশুতোষ ; রক্তাক্ত আশুতোষ।

বিকেলবেলা, দিন যখন শেষ হতে চলেছে, এ বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতো চললো আশুতোষও। ঠিক যে ভাবে বলেছিল, সেইভাবে। চিরনিদ্রিত আশুতোষ। প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে গেল আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এক-কথার মানুষ।

( একটি বিশেষ তথ্য ) উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশের জাতক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তার 'শেষ কাজের' ভার দিয়ে গিয়েছিল কুলীন মুখোপাধ্যায় পরিবারের কাউকে নয়—তার কায়স্থ জামাইকে। কবে একটি 'ইচ্ছাপত্র' লিখেছিল জানি না, তাতে আরো অনেক 'ইচ্ছার' সঙ্গে এই নির্দেশ বিশেষভাবে ছিল। মমতা মুখোপাধ্যায় সেই দিনে, সেই অবস্থায়, তার স্বামীর এই নির্দেশ পালিত হওয়ার হুকুম দেয়।

* * *

এখানেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সমাপ্তি। কিন্তু তাই কি ? তাহলে পাঠক, আপনারা তাকে ভালবাসলেন কেন ? এ রচনাবলী হচ্ছে কেন ? এ লেখা আমাকে লিখতে হল কেন ? ...তাহলে আসুন আমার সঙ্গে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও কী মরমীভাবে এ দুনিয়ারই বসবাসকারিদের অন্তরে বাস করছে তার কিছু নমুনা আপনাদের দেখাই।—

।। ৮ ।। হৃদি-হৃদয়াসনে

"......কিছুদিন আগেও বয়োকনিষ্ঠ প্রিয় ব্যক্তিদের শোকবার্তা লিখতে বসে একটা গ্লানি অনুভব করতুম। তাঁদের থেকে বেশিদিন বেঁচে থাকার জন্যে যেন লজ্জাও বোধ হত। এখন আর এসব কিছু মনে হয় না। প্রায় পাথর হয়ে গিয়েছি—এইরকম ভাবতুম।.../কিন্তু সমস্ত বিশ্বাসের মুলেও এক একটা প্রচণ্ড আঘাত আসে—প্রচণ্ড ঝড়ে যেমন বড় বড় বাড়িও ভেঙে পড়ে তেমনই এই সংবাদ—আশুতোষ নেই ! চলে গিয়েছে আমাদের ফেলে।..."

'আশুতোষ মুখোপাধ্যায়' : গজেন্দ্রকুমার মিত্র

"......কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়র চলে যাওয়া মানে শুধুই পৃথিবী থেকে একজন মানুষ চলে যাওয়া মাত্র নয়। অথবা—বাংলা সাহিত্যের হাট থেকে একজন বড় 'ব্যাপারীর' চলে যাওয়া নয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চলে যাওয়া মানে আমাদের চারপাশ থেকে সকালের আলোর মত নির্মল উজ্জ্বল একটি প্রাণখোলা হাসি চলে যাওয়া।......একটি প্রাণখোলা 'প্রাণ' চলে যাওয়া। আজকের যুগে ক্রমশই যে হাসি আর যে 'প্রাণ' বিরল হয়ে আসছে।..."

'নিজের আয়নায়' : আশাপূর্ণা দেবী

"......আশুদা আমার মেরুদণ্ডে নতুন জীবনীশক্তি আর ফুসফুসে টাটকা অক্সিজেন প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন । নইলে কী হতো, কী করতাম, আজ আর ভাবতে পারি না । শুধু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই ঋণ শোধ হয় ?...আশুদার পথ হচ্ছে হৃদয়ের পথ । ......শুধু বলতে পারি হৃদয়বান পাঠক দীর্ঘকাল গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর লেখা পড়বেন এবং মুগ্ধ হবেন । এটুকুই তাঁর কাম্য ছিল ।"

'একজন হৃদয়বান যোদ্ধা' : প্রফুল্ল রায়

"বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পর আবার ওই নাম নিয়ে বিখ্যাত হওয়া বেশ কঠিন । স্বীকার করছি—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামে অনেক ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার আছেন এবং বিখ্যাত হয়েছেন । কিন্তু বাংলায় গল্প উপন্যাস লিখে—এবং শুধুই লিখে—অন্য কোন উপায়ে হইচই না করে কিংবা বড় প্রচারের তোল্লাই না পেয়েও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে একটি গার্হস্থ্য নাম হয়ে ওঠে ।......নিজেকে নিয়ে রিডিকিউল করতেন অবলীলায় । সেখানে দুঃখের ঝিনুক থেকে হাসির মুক্তো তুলে আনতে পারতেন । এসব বড় মানুষ—বড় লেখক বড় একটা হয় না ।

'আশুদা' : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

"......হ্যাঁ, তিনি সুদর্শন তো বটেই, সেখানে খাঁটি একজন হৃদয়বান বাঙালীকে আমি দেখতে পাই । কথায়-বার্তায়, পোশাক-আশাকে, ব্যবহারে বন্ধুত্বে ষোল আনা একজন বাঙালী ।...মানুষ হিসেবে যেমন ছিলেন আবিল-হীন, লেখক হিসেবেও তাই । কিন্তু সাজাত্যবোধ ছিল প্রখর । লেখার প্রতি ছিল গভীর মমতা আর আত্মবিশ্বাস ।......ছিলেন নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল । নারীর মর্যাদা যেভাবে তিনি চিত্রিত করে গেছেন, এ সময়ে তা দুর্লভ । এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের পরে আশুদাই বোধহয় একমাত্র যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে থাকবেন । এ যোগ্যতা অর্জনও কী কম কথা !

'যেমন দেখেছি' : বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

"......আগামী প্রজন্মের কাছে খাঁটি বাঙালী চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য যখন অচেনা রূপকথার জগৎ হয়ে যাবে, সেদিন সত্যসন্ধানী গবেষক ডুব দেবেন আশুতোষ সাহিত্যের বিশাল সমুদ্রে । অনাগত যুগের সেই সব সর্বনাশা দিনের জন্যে আশুতোষ সাহিত্যসম্ভার অত্যন্ত জরুরী ।

'আশুতোষ সাহিত্য : আজ কাল ভাবীকাল' : রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

"...'পারো তো মনের ছবি তুলে নাও,/হে ফটোগ্রাফার !/কি হবে মুখের ছবি তুলে ?/মুখ যে মনের সূচীপত্র/এ প্রবাদে রেখো না বিশ্বাস । প্রশান্ত মুখের অন্তরালে/অনেক অশান্ত ঝড় হয় আন্দোলিত ;/বাহিরের নীরবতা ঢেকে রাখে অন্তরের/বেদনার বহু আর্তনাদ ।'...আশুবাবু, কবিতাটি আপনার কথা ভেবেই লিখেছিলাম । আপনি শুধু অসাধারণ

লেখকই ছিলেন না,...আপনিও ছিলেন অসাধারণ সৃজনীধর্মী সম্পাদক। অনেক নতুন লেখক-লেখিকা আপনি তৈরী করেছেন।...আজ আপনার সম্বন্ধে আমার মনে হচ্ছে : যদি কোনো ম্যাজিক জানা থাকত, যদি আরো কিছুদিন আপনাকে ধরে রাখা যেত!"

'বন্ধুবর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে' : অজিতকৃষ্ণ বসু (অ. কৃ. ব.)

"...প্রায় দেড়শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা আশুতোষের জীবনে একটা বিরল ঘটনার কথা আমরা জানি যা যে কোনো লেখকের পক্ষে পরম কাঙ্ক্ষিত। তাঁর প্রত্যেকটি বই একাধিক সংস্করণের বেড়া ডিঙিয়েছে, তাঁর প্রায় সব বই-ই সর্বদা বাজারে সচল অবস্থায় প্রাপ্তিযোগ্য থাকে এবং 'চলাচল'-'পঞ্চতপা'র যুগ থেকে 'পরকপালে রাজারাণী' পর্যন্ত তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে জনপ্রিয়তায় কখনো ভাঁটা পড়েনি।...শিল্পী-হিসেবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টির সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার করবে মহাকাল। কিন্তু সুভদ্র শোভন মিতবাক ও বিনয়নম্র এই মানুষটির স্মৃতি আমাদের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।"

'আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেন জনপ্রিয়' : ডঃ নিতাই বসু

"...পরিমল গোস্বামী বলতেন 'প্রতারক'।...পরিমলবাবু আশুবাবুর ওপর ভার দিয়েছিলেন একটা ফিচার লেখার। শিরোনাম 'প্রতারককে এড়িয়ে চলুন।'...রসবাজ পরিমল গোস্বামী তাই স্নেহের ছলে আশুবাবুকে 'প্রতারক' বলে সম্বোধন করতেন।...এক এক সময়ে হঠাৎ মনে হয় ওপরে গিয়ে আমাদের দুর্দশা দেখে যেন হাসছেন। সেই সাঙ্ঘাতিক হাসি। ...পরিমলবাবু নামটা ঠিকই দিয়েছিলেন। 'প্রতারক' না হলে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়ে আবার ওপরে বসে কেউ হাসে নাকি?"

'এক 'মহান প্রতারকে'র কাহিনী' : কিষণচাঁদ বর্মন

"...দেশ পত্রিকায় না লিখে সমসাময়িক সাহিত্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করা বেশ কঠিন। একজন দুজন ব্যতিক্রম আছেন। তার মধ্যে আশুবাবু একজন।...আশুদা একবারও বড় পুরস্কার পাননি। আজকাল কে কোন পুরস্কার পেল এবং পুরস্কারের দাম কত টাকা তা দিয়ে লেখক সমাজে কৌলিন্যের বিচার হয়। সে অর্থে আশুদা উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মালেও ছিলেন ভঙ্গ।...সবচেয়ে বড় কথা তিনি তাঁর মত করেই লিখেছেন, তাঁর মত করেই বেঁচেছেন, তাঁর মত করেই ভেবেছেন। তিনি কখনো ধার নিজের সম্পদ বলে লোককে দেখাবার চেষ্টা করেন নি।..."

'রূপনগরের মানুষ' : পার্থ চট্টোপাধ্যায়

"...আশুবাবুর সহৃদয়তার কথা ভোলার নয়।...ভুলিনি মানুষটিকে।...তিনি যে সাহিত্যকীর্তি রেখে গিয়েছেন তা থেকে যাবে। বাংলা সাহিত্যের অগণ্য পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে থেকে যাবেন প্রয়াত সাহিত্যিকও।"

'সহৃদয় আশুবাবু' : অজিতেন্দ্র সিংহ

"......এবং যে ঘরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সাধারণত লিখতেন, সেই ঘরে তিনি শুয়েছিলেন অনেক অশ্রুসজল মানুষের মাঝখানে ।...গায়ে পাটভাঙা সাদা পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি । বোজা চোখের ওপর সোনালী ছোঁয়া লাগানো ফ্রেমের চশমা । আর মুখে বোধহয়, সেই টিপটিপ হাসিটুকু যাঁর বর্ণনা তাঁর অনেক গল্পে, উপন্যাসে ।...বাইরের গরমে একটু একটু করে পুড়ে যাচ্ছিল কলকাতা । বরফ-বিছানায় নিস্তরঙ্গ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—গত চার দশক ধরে সাহিত্য কীর্তির মাপকাঠিতে, বিক্রীর হিসেবে যিনি কলেজস্ট্রিট পাড়ার মুকুটহীন সম্রাট ।......এখন অনেকেই হয়ত তাঁকে চিত্রিত করবেন সাদাসিধে, সদালাপী ; পরোপকারী অসূয়াশূন্য একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে । সত্যি সত্যিই এতসব গুণ ছিল তাঁর ভেতরে । আরও কিছু ছিল তাঁর মধ্যে । হয়ত আগুন ছিল, যে আগুন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শুদ্ধ মানুষদের থাকে । আর তাঁর মেরুদণ্ডটি ছিল বোধহয় ইস্পাতের তৈরি । সেই সোজা শিরদাঁড়ার ওপর মাথাটি টান করে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ।"

'হৃদয়ে মাধুর্য ছিল, মেরুদণ্ডটি কিন্তু ইস্পাতের' : কিন্নর রায়

"আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কত বড় সাহিত্যিক ছিলেন তা বিচার করার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই, কিন্তু কোন দ্বিধা না রেখেই বলতে পারি তাঁর মতো মানুষ আজকের যুগে বিরল ।...'পরিবার' বলতে নিছক নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাই বুঝতেন না । যদি তাঁর ক্ষমতা থাকত একান্নবর্তী পরিবার নামক ব্যাপারটাকে তিনি বাঙালি জীবন থেকে বিদায় নিতে দিতেন না ।"... ..."আশুদার আরও একটা যন্ত্রণা ছিল এবং তাও ছিল অব্যক্ত ।...নিজের পরিবার একান্নবর্তী ব্যাপারটা যাতে টিকে থাকে তার জন্যে চেষ্টার কসুর করেননি ।...আশুদা আসলে গোটা পৃথিবীটাকেই একটা একান্নবর্তী পরিবার বলে ভাবতে চেয়েছিলেন ।...টাকা চুরি করলে অভিযুক্তের শাস্তি, তার নামে ঐ টাকায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া ! এই শাস্তি একমাত্র আশুদাই দিতে পারতেন ।...আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্নেহটাকে যেন স্পর্শ করা যেত ।..."

'চলে গেলেন সুর্বণহৃদয় এক মানুষ' / 'তাঁর স্নেহকে যেন স্পর্শ করা যেত'
: দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

"...'হৃদয় পথের পথিক' লেখক চিরকালই বিরাজ করবেন আমার হৃদয়-আসনে । তাঁর অবিনশ্বর আত্মার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা, আমার প্রণাম । প্রণাম প্রণাম প্রণাম ।"

'হৃদয়-পথের পথিক' : তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

"...যাঁরা, আশুদার খুব কাছাকাছি এসেছেন তাঁরা বিলক্ষণ জানেন ওঁর সঙ্গে পরিচয় শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কে দাঁড়িয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক । আমার ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটেছিল । ফলে প্রখ্যাত লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং স্নেহশীল আশুদা—এই দুইকে আলাদা করে দেখার সুযোগ ঘটেনি কখনো ।"

'আশুদা' : প্রলয় সেন

"........আশুদা ছিলেন গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী । আমি চূড়ান্ত নাস্তিক । তবু, আপামর মানুষের প্রতি তাঁর যে ভালবাসা ছিল, তার তুলনা খুব একটা খুঁজে পাইনি । এই প্রচণ্ড ভালবাসার শক্তিতে তিনি বারবার ঠকে শেষমেশ জিতেই যেতেন । ধর্মপদ-র ভাষায় বলা যায়—তিনি ক্রোধকে সক্রোধ, অসাধুতাকে সততা আর দুর্বিনয়কে নম্রতা দিয়ে পরাস্ত করেছিলেন । বড়সড়ো মাপের এক অপাপ-কিশোরকে আমি দেখতে পেতাম তাঁর মধ্যে ।..."

'আশুদা' : অমিতাভ দাশগুপ্ত

"আশুবাবু চলে গেলেন । প্রসাদের সঙ্গে তাঁর অচ্ছেদ্য বন্ধন কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না ।...তাঁর জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি কোনোরকম সরকারী সম্মানে সম্মানিত হননি । অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না । তাঁর মত শক্তিধর কথাশিল্পীকে যথাযোগ্য সম্মান না জানানোয় আমাদেরই লজ্জাবোধ করা উচিত । রাজার শিরোপা নাই বা জুটল কপালে, প্রজার প্রাণের প্রণাম তো পেয়েছেন অজস্র । সেই পাওয়াই প্রকৃত পাওয়া ।..."

"...মানুষের জন্য ভালবাসা, বিশেষ করিয়া নারী-ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রমহিমার প্রতি শ্রদ্ধা পাঠক-পাঠিকার চিত্ত জয় করিয়াছে ।...একবার এক প্রবীণ লেখক তাঁহাকে টেলিফোনে অনুরোধ করেন, আশুবাবু যেন তাঁহার প্রকাশকদের প্রবীণ লেখকের বই ছাপার জন্য বলেন । ব্যাপারটি আশুবাবুকে বড় ভাবাইয়াছিল । বলিয়াছিলেন, আমার কিন্তু বড় সাধ মরবার সময়েও যেন আমার বই পাঠকরা টানাটানি করে পড়ে ।...এ পারের কথা যদি ওপারে যায়, আশুবাবুর উদ্দেশ্যে বলি, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে । আপনি সকলকে কাঁদাইয়া আমাদের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়াছেন, কিন্তু পাঠকের কাছে আপনার বইয়ের আদর এখনও অপরিসীম । লেখকের পরম ইপ্সিত যা প্রাপ্য তাহা আপনি লাভ করিয়াছেন ।"

সম্পাদকীয় : সবিতেন্দ্রনাথ রায়

কিছু চিঠি

(মমতা মুখোপাধ্যায়কে) "স্নেহের বৌমা, এ কী হল মা ! এ যে কল্পনাও করতে পারছি না আশু আমাদের ছেড়ে চলে গেল ।.../ "হতভাগ্য তোমার ভূষণদা" ৪ ।৫ ।৮৯ (ভূষণচন্দ্র দাস)

(মমতা মুখোপাধ্যায়কে) "পরম পূজনীয়া বৌদি,/এ কি হল বৌদি ? আমি যে দাদার সঙ্গে চার তারিখে দেখা না করেই চলে এলাম আর তাই কি উনি বোনের ওপর রাগ করে চলে গেলেন ?.../ "মমতা" (মমতা খাৱে) ৫ ।৫ ।৮৯

"শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মমতা মুখোপাধ্যায় ও পরিবারবর্গ,/ আপনারা আমাদের আন্তরিক

সহানুভূতি ও সমবেদনা জানবেন। মাত্র কিছুদিন আগেই আমার পিতৃদেব সমরেশ বসু চলে গেছেন আমাদের চূড়ান্ত অপ্রস্তুত রেখে। আমাদের সঙ্গে সমরেশ বসু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েব মত জীবনশিল্পীরা চলে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হন সাহিত্যপ্রেমী মানুষও।..... নমস্কারান্তে নবকুমার বসু-" ১৩।৫।৮৯ (সমরেশ বসু জন্মোৎসব কমিটি)

(সর্বাণী মুখোপাধ্যায়কে) "কল্যাণীয়াসু,/দূরদর্শনে তোমার পিতৃপূজা দেখলাম। তিনি বড় ছিলেন একথা আমার অনুভূতিতে ছিল বলে বারবার তাঁর কাছে মাথা নত করে দাঁড়িয়েছি। Death, be not proud'—তাঁর এই উক্তি তাঁর অন্তরের রাজরূপকে প্রকাশ করেছে। তোমার কথায় একথা জেনে উপকৃত হয়েছি।..."/...মনে পড়ছে তাঁর উচ্চতা, যা এত কাছে থেকে দেখেছি, কিন্তু আর প্রত্যক্ষ করব না, স্মৃতিতে অনুভব করতে হবে। বড় অনেকে আছেন, মহান খুব অল্প। ওঁর হৃদয়ে আকাশের ব্যাপ্তি ছিল।.../শুভার্থী/ তারাপদ ভট্টাচার্য" (৪।৬।৮৯ ও ২৫।৭।৮৯)

(আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে) "প্রিয়বরেষু আপনাকে বোধহয় এই প্রথম চিঠি দিচ্ছি। আপনি বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট কিন্তু আপনি এমনই একজন যাঁকে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করি এবং প্রণাম জানাতেও দ্বিধা নেই।.../ইতি শত" (প্রফুল্ল কান্তি ঘোষ) ১লা বৈশাখ ১৩৯৬

(মমতা মুখোপাধ্যাযকে) "সুচরিতাসু, আপনার স্বামীর আকস্মিক মহাপ্রয়াণে আমি স্তম্ভিত ও মর্মাহত হয়েছি। সেদিন তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে অভিনন্দন জানালুম। সম্পূর্ণ সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখলুম তাঁকে—এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে তা কল্পনাও কবতে পারিনি।.../নমস্কারান্তে ইতি বিনীত/অন্নদাশঙ্কর রায়" (১৩।৫।৮৯)

(মমতা মুখোপাধ্যায়কে) "শ্রদ্ধাভাজনীয়াসু বৌদি,/...তবে কিছু মানুষকে দেখেই আপনার বলে মনে হয় এবং কিছু মানুষের মুখে ভালত্বর স্পষ্ট ছাপ থাকে। আশুদার দুইই ছিলো। দেখা হতোই না বলতে গেলে, মাঝে মাঝে ফোনেই কথা হতো। তবু মনে হতো আশুদা যেন কত কাছের লোক!...ওঁর স্মৃতি চিরদিনই অম্লান থাকবে আমার মনে।'চলাচল' ও 'পঞ্চতপা'র দিনে আমরা স্কুল কলেজের ছাত্র। তবু সেই বিস্ময়াভিভূত আনন্দ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তার পরে অগণিত বইয়ের কথা তো ছেড়েই দিলাম। ওঁর অগণিত পাঠক-পাঠিকা ওঁকে চিরদিনই বাঁচিয়ে রাখবেন। ওঁর মৃত্যু নেই।.../বৌদি, ...এ কথা জানবেন যে আমার মতো অগণ্য নগণ্য মানুষ এই মুহূর্তে আপনারই মতো শোকাহত। আমাদের সমবেদনা আপনাকে সবসময় ঘিরে থাকবে। এবং আছে।.../ ইতি বিনত বুদ্ধদেব গুহ" (৬।৫।৮৯)

"...আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এই দুঃসময়জয়ী জনপ্রিয়তার কারণ কি ? কালজয়ী নয়, বিগত দু'দশকের দুঃসময়জয়ী।...আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বলছি, আপনার এই, "দু'দশক ব্যাপী দুঃসময় জয়" ব্যাপারটা আমাকে আনন্দ দেয়। আপনার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলাম না, কিছু বই পড়েছি। আমার মনে হয়েছে আপনি বাঙালীর প্রাচীন মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের এক আশ্চর্য সফল প্রতিনিধি। যে মূল্যবোধের সবটা ভালো নয়, কিন্তু অনেকটাই ভালো। মানুষে বিশ্বাস, পরিবার বন্ধনে বিশ্বাস, সততায় বিশ্বাস, এগুলো আপনার নিজস্ব বিশ্বাস এবং

লেখাতেও তাই দেখি ।.../একই সঙ্গে মনে করি, যা স্বায়ত্তে নেই তা আপনি করতে যাননি । লেখক হিসেবে আপনি এতটাই সৎ ।.../স্ব-স্বভাবে, স্ব-বিশ্বাসে অটল থেকে লিখে যাবার সাহস আপনার ছিল, অথচ মানুষ আপনি এতই খাঁটি, যে ওটা "সাহস" তা জানতেন না । .../এখন জমিদার-গৌরব লেখা বিপজ্জনক, প্রতিক্রিয়াশীলতার চূড়ান্ত, সমালোচকরাই বলবেন । আপনি স্ব-বিশ্বাসে অন্যরকম জমিদার-কাহিনী 'পরকপালে রাজারাণী' লিখলেন । এটাও সাহস ।.../ ...আপনার ঈশ্বরে, সৎ গুরুতে বিশ্বাস আন্তরিক, আপনার লেখাতেও তা স্পষ্ট । এটাও সাহস । অন্য ঈশ্বর + গুরু বিশ্বাসী লেখকরা তাঁদের বিশ্বাসকে গরম গল্প + সরস যৌনতা + ভাববাদী লেকচারে মুড়ে পরিবেশন করেন । আপনার একটাই মুখ, মুখোশ নেই ।/ আপনি কি বুঝেছিলেন, একটা জীবনে মুখোশ পরা ও খোলার পক্ষে কম সময় মেলে ?/শুনেছি, দুঃখ-আঘাত-শোক আপনাকে রেহাই দিত না, কিন্তু তাতে আপনার সহিষ্ণুতা, প্রসন্নতা, মিষ্টভাষিতা, অপার সরলতা এতটুকু মলিন হয়নি । আপনি নমস্য । /আপনার লেখাতে মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান এক স্থায়ী সত্য । তেজ, সাহস, শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠার ক্ষমতা আপনার সৃষ্ট নারী চরিত্রে । শরৎচন্দ্রের পর আপনাকে নারীদরদী বলতে আমার আটকাবে না ।.../আপনার লেখায় এখন কিছু থাকত না যার অসৎ-প্রভাব পাঠক-মনে পড়ে ।/এইসব কারণেই আপনি অত বড় পুরস্কার পেয়েছেন ।/পাঠক আপনাকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছে । আপনি নিজের সীমার মধ্যে নিজের লেখা গভীর সততায় লিখেছেন ।/ বড় প্রতিষ্ঠানের ব্যাকিং ছিল না, দরকার হয়নি । এ রাজ্যে, যে কারণেই হোক, আপনি পাননি সাহিত্য পুরস্কার । পাননি আকাদেমি ।/বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডেলই কি পেয়েছেন ? কিছুই দরকার হয়নি আপনার ।/ আপনি সমাজ বদলের রাগী লেখক নন । আপনি ছলনার মোড়কে যৌনতার পশারী নন ।/আপনি সৎ বাঙালী লেখক, বাঙালী পাঠকের জন্য লিখতেন ।/কোনো ইঁদুরের দৌড়ে আপনাকে সামিল হতে হয়নি ।'র‍্যাট রেস' শব্দটাও আপনি জানতেন কি না, জানিনা ।/এতগুলো নেতিবাচক ব্যাপার । আপনার কাছে সবই পরাজিত । /আপনার বই লক্ষ লক্ষ পাঠক পড়েছেন, পড়বেন । আপনি প্রমাণ করেছেন, যে গাইতে জানে তার ঢাক বাদ্য লাগে না । জনপ্রিয় বাণিজ্যিক সাহিত্যের সফল লেখক তো কেউ করে দেয়নি আপনাকে । স্বযোগ্যতায় তা হয়েছেন ।/হবার পরেও পাঠককে সেই মূল্যবোধ জানিয়ে গেছেন, যাতে আপনার বিশ্বাস ।.../ আপনার পাঠকদের কাছে আপনার অভাব পূরণ করেন, এমন কোনো ক্ষমতাধর লেখক, বয়সে আপনার অনুজদের মধ্যেও দেখছি না ।/পাঠকের কাছে যেতে হবে, যেতেই হবে । আপনি গিয়েছিলেন ।/আসল কাজটা করতে কোনো ক্রাচের দরকার হয়নি । আপনার মতো পুরস্কারও কেউ পাবে না ।"

'ছিলেন দুঃখজয়ী, সৎ, স্বধর্মে অটল' : মহাশ্বেতা দেবী

* * *

মরমী পাঠক,

আরো আরও অনেকের অনেক কথা আছে । আরো অনেক 'হৃদযাসন' আছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের । সব দিতে গেলে জায়গায় কুলোবে না । লেখক-মানুষ বা মানুষ-লেখক সম্পর্কে যাঁদের কথা তুলে দিলাম ; যাঁদেরটা দিতে পারলাম না ; যাঁরা কিছুই বলেননি কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক বিদায়ে এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলেছেন, এক

মুহূর্তের জন্যেও বেদনা বোধ করেছেন, একবারের জন্যেও মাথা নত করেছেন—তাঁদের সবাইকে, সব্বাইকে আমার সকৃতজ্ঞ প্রণাম ।

।। ৯ ।। বাবাকে :

মহামান্য পাঠক, এবার আপনাদের এমন একটি 'বিষয়' নিবেদন করতে যাচ্ছি, যা না করলে 'কিছু কথা'-র রচয়িতার ওই মানুষ-লেখকের সঙ্গে তার আসল সম্পর্কটাতেই একটা মস্ত ফাঁক ও ফাঁকি থেকে যাবে । সে সম্পর্ক নির্ভেজাল পিতাপুত্রীর । যে সম্পর্কের জোরে আজ 'কিছু কথা' বলতে পারা, যে সম্পর্কের টানে ১৩৯৬ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কথাসাহিত্য'-তে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে সর্বাণী মুখোপাধ্যায়ের প্রথম 'চিঠি লেখা' ।

সে চিঠি এখানে পেশ করছি আরও একটি চিঠির মাধ্যমে—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে —আমার "বাবাকে" ।—

... ... ...

বাবা, আজ সাড়ে চার বছবেরও পর আবার তোমাকে চিঠি লিখছি । সেই প্রথম চিঠি ছিল 'বাবাকে', আর সাড়ে চার বছর পরেব এই চিঠিও সেই বাবাকেই । সে চিঠিও ছিল তোমার 'চলে যাওয়া' নিয়ে, এ চিঠিও সেই তোমার 'চলে যাওয়া' নিয়েই যা এই কটা বছর ধরে আমাকে জীবন চিনিয়েছে, 'মানুষ' চিনিয়েছে, আর সবথেকে বেশি করে চিনিয়েছে তোমাকেই । তাই এ চিঠি থেকেই তুমি জানতে পারবে কোথায় তুমি সবথেকে বড় 'ফেইলাইওর', আর, বিপুল ভোটে জিতেও তুমি গেছ কোন জায়গায় । আগের চিঠিতে লিখেছিলাম—

"বাবা, এই প্রথম তোমায় চিঠি লেখা । কারণ চিঠি লিখতে হলে যেটুকু দূরে যেতে হয় ততটুকু দূরেও যে আমাকে ফেলে কখনো যাওনি কোথাও । তারপর হঠাৎই বড় আচমকা এক বিষম দূরপাল্লার গাড়িতে চলে বসলে ।...কিন্তু এখন আমি কি করি বলো তো ? তোমার এই চলে যাওয়া নিয়ে কত বিদগ্ধজন কত সুন্দর করে কত কিছু বলছেন । কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তোমার এই অতি সাধারণ মেয়েকেও যে এক সারিতে বসিয়ে দেওয়া হল তোমার কথা বলার জন্যে । কিন্তু তোমার সম্বন্ধে যত কথা এই বুকে জমা হয়ে আছে তা যে এক জন্মে বলে ফুরোবার নয় এ আমি কি করে বোঝাই ? তাই কি বলি, কোথা থেকে বলি, কেমনভাবে বলি, কতটাই বা বলি ?

সবাই বলছেন কথাসাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন বাংলাসাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি করে দিয়ে । আমি বরং শুধু একটা অভাগা মেয়ের কথা বলি যার কেবল বাবা চলে গেল তার বুকেব সবটুকু খালি করে দিয়ে । জ্ঞানীগুণীজন বলছেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর অজস্র সৃষ্টিতে অমর হয়ে থাকবেন, চলে গিয়েও তিনি আছেন । কিন্তু তাঁর বোকা মেয়েটা এতসব কথার মানে বুঝতে পারছে না । দু হাত বাড়িয়ে আর্ত হাহাকারে সে শুধু তার ধরা-ছোঁওয়ার বাবাকেই খুঁজে চলেছে—কই ? কই ? বাবা তুমি কই ?...কৃতী কথাশিল্পী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নয়, বিরাট মাপের বিশাল মানুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নয়, বা দেশের-দশের গর্বের অধিকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও নয়—যে তুমি আমার, শুধু

আমার একলার, সেই আমার বাবা, তুমি কই ?

যা আমি হারিয়েছি তাই নিয়েই শুরু করি তাহলে ? সমস্ত কিছুর বিচারে আমি অতীতের, আজকের এবং অনাগতকালের শ্রেষ্ঠ বাবা হারিয়েছি । সন্তানের এর চেয়ে বড় আর কোন যন্ত্রণা আছে কি ? সবথেকে আশ্চর্যের কথা, এই হারানোর ভীতি অবচেতনে যখন প্রথম অনুভূত হয় তখন আমার বয়েস মাত্র তিন বছর । শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে সে দিনটি । তখন ভোর-ভোর । বাবা তুমি আন্দামান যাচ্ছিলে । আমার দু'গালে কপালে ঠোঁটে চুমু খেয়ে তুমি রওনা হলে । ওইটুকু বাচ্চা মেয়ের মনোজগতে যেন এক বিপুল বিপর্যয় ঘটে গেল । ভেতরটা ডুকরে উঠল—বাবা চলে গেল ! সেদিনের সেই 'বাবা চলে গেল' অনুভূতি আজকের 'বাবা চলে যাওয়া'র অনুভূতি থেকে কোন অংশে কম ছিল না, সেদিনের চোখের জল আজকের চেয়ে কম নোনা ছিল না । সেই দিন থেকে প্রতি মুহূর্তে তোমাকে হারানোর কাল্পনিক আতঙ্ক আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত, আর আজ সব খোয়ানোর নিদারুণ নিশ্চিন্তি ।

বাবা, ছোটবেলায় তুমি আমার নাম ধরে ডাকলে আমার ভীষণ রাগ হত । আমি না তোমার মা ? মাকে কেউ নাম ধরে ডাকে ? তাই আমি ছিলাম তোমার নিভৃতের 'ছোট মা' । মাঝেমাঝেই আমরা মায়ে-পোয়ে এমন সব কাণ্ড করতাম যার জের সামলাতে জেরবার হতে হত আমার মা, আর তোমার আসল মাকে । প্রায়ই আবদার করে তোমার হাত ধরে তোমার সঙ্গে অফিসে যেতাম । ২-বি বাসের দোতলার একেবারে সামনের সীটটা দখল করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতাম । প্রায় টানা একঘণ্টার পথ আমার প্রশ্নের ধারাবর্ষণ আর তোমার অক্লান্ত উত্তরবিবরণ । অফিসে পৌঁছেই মেয়ের ফরমাস মত একে একে আসতে থাকত মুড়ি, বাগবাজারের বিখ্যাত তেলেভাজা, সিঙারা, কচুরি, নিমকি । টেবিলের ওপর বড় করে কাগজ বিছিয়ে সব ঢেলে দেওয়া হত । যাঁরা আছেন, যাঁরা আসছেন সবাইকে তোমার দরাজ নেমন্তন্ন । ফেরার পথে রাসবিহারীর মোড়ে লেমনেড আর মিষ্টি পান খাবার পর পেটের আর মুখের ছুটি । বাড়ি ফিরে বাপ-মেয়ের কেন জানি দুজনেরই খিদে নেই । তারপর একটু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ঘড়ি ধরে একই সময়ে শুরু হত যা যা অখাদ্য পেটে ঠাসা হয়েছিল, গলা ঠেলে সেগুলোর উঠে আসার পালা । তোমার মা আর আমার মা রাগ করতে করতে দুজনের মাথায় জল চাপড়াত আর গজগজ করত । আমার মা শাসাত, আর কোনদিন বাবার সঙ্গে অফিস যাবার নাম করে দেখিস ! কিন্তু এরই মধ্যে তোমার আমার নিঃশব্দ চোখাচোখির মধ্য দিয়ে নির্লজ্জভাবে এর পরের প্রোগ্রাম ঠিক করা হয়ে যেত ।

এই ভাবেই ১৯৮৯-র ৩মে পর্যন্ত তোমার আমার প্রোগ্রাম তার একান্ত নিজস্ব গতিপথে নানাভাবে বাঁক নিয়ে চলছিল । এই সময়ের মধ্যে তোমার 'ছোট মা' তার নিজের জীবনে সন্তানের মা হয়েছে, একজনের স্ত্রী হয়েছে, কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে সে শুধু বড় বেশি করে তার 'বাবার মেয়েই' রয়ে গেছিল । তার বদ্ধ ধারণা ছিল চিরটা কাল বাবা নামের বিরাট ছায়াটা তাকে রোদ, জল, ঝড়, ধুলো—সবকিছুর থেকে আড়াল করে রাখবে । কারণ বাবা যে তাকে ফেলে এক মুহূর্তও নিশ্চিন্তে কোথাও থাকতে পারে না ! একটা ঘটনা তো তোমার নিজের মুখেই শোনা । আমি তখন বেশ ছোট । তুমি অফিসে যাবে বলে বেরিয়েছিলে । কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এলে । সবার প্রশ্নের উত্তর বাজে কথা বলে এড়িয়ে গেলে ।

রাতে আমাকে ঘুমন্ত ভেবে মাকে সত্যি কথাটা বলেছিলে । বলেছিলে, বাসে উঠে বসার পর থেকে হঠাৎই মনে হচ্ছিল তোমার ছোট মা পড়ে গেছে, কাঁদছে । তাই পরের স্টপে নেমে ট্যাক্সি করে সোজা বাড়ি ।

একটু বড় হবার পর তোমার লেখার তন্ময়তার সুযোগ নিয়ে তুমি টের পাবে না জেনেই তোমাকে জিগেস করে তোমার পকেট থেকে পয়সা নিতাম । যেসব জায়গায় যাবার পারমিশন সহজে মিলবার নয়, ঠিক তোমার লেখার সময় সেসব জায়গায় যাবার আর্জি পেশ করতাম । তখন তো তুমি কল্পতরু ! কিছু না শুনেই তোমার উত্তর তখন 'হুঁ' । বাপকে যে ভয়ভক্তি করতে হয় তা যেন খুব যত্ন করেই তুমি আমায় শেখাওনি । পা দোলাতে দোলাতে নির্দ্বিধায় হুকুম করেছি—বাবা, একগ্লাস জল দাও তো ! চিরকালেব আনাড়ি তুমি কলসীর পেট ফাটিয়ে ঘর ভাসিয়ে এক গ্লাস জল ধরে মুখের সামনে নিয়ে আসতে । তুমি লিখে টাকা পাও জানতে পেরে ছেলেবেলায় একবার কলম নিয়ে বসে গেলাম, আমিও লিখে টাকা আনব বলে । মেয়ের সেই ছেলেমানুষি তোমার কলমের জাদুতে একটা আস্ত গল্প হয়ে উঠেছিল । আসলে অবচেতনে তুমিও নিশ্চয় সেদিন থেকেই চেয়েছিলে তোমার মেয়েও 'কলম ধরতে' শিখুক, অন্তত চেষ্টা করুক । এরকম করেই আস্তে আস্তে তোমার স্নেহের মধ্যে বেড়ে ওঠা, ক্রমে ক্রমে তোমার লেখার সঙ্গে, কাজের সঙ্গে, খবরদারিতে, আলোচনায়, হাসি-ঠাট্টা, ঝগড়া-তর্কে তোমার সঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকা । তখন নানা ব্যাপারে তোমার তুলতুলে নরম মনের ভেতরে সেই আগুনে মানুষটাকে দেখেছি যে কোনদিন কারুর করুণার পরোয়া করেনি, যে নিজ ক্ষমতায় 'রুদ্রের প্রসন্ন মুখ' দেখার অধিকার অর্জন করেছিল । আরো একটা জিনিস তুমি খুব অনায়াসে করতে বাবা । ভেতরে দুঃখের সমুদ্র নিয়ে বাইরে তুমি গলা ফাটিয়ে হাসতে । তোমার সেই হা-হা হাসি বহুলোক শুনেছে, ভেতরের চোখের জল কজন দেখতে পেয়েছে ?

এভাবেই বেশ কেটে যাচ্ছিল । তারপর ৪ মে বড় আচমকা নিজের অস্তিত্বের বৃন্ত থেকে নিজেকে খসে পড়তে দেখলাম । নিজের থেকে নিজের টুকরো হয়ে যাওয়ার ব্যথায় নীল হয়ে গেলাম । তারপর থেকে আর্ত-হাহাকারে অবিরাম শুধু মাথা কুটে মরছি—নেই, নেই, নেই !

কিন্তু সত্যিই কি নেই ? কি নেই, কতটা নেই, কেমন করে নেই ? এই না-থাকাটাই যদি একমাত্র সত্য হয়, তবে এই দুপুর রাতে কে আমার অস্তিত্বের ভেতর থেকে ডাক দিয়ে উঠল ? কে হাতে সেই কলম তুলে দিল, সামনে ধরে দিল সেই নামলেখা প্যাড ? চুপ করে বসে যখন ভাবছি, কে যোগালো সেই স্পষ্ট আশ্বাস—শুরু কর্ না, আমি তো আছি !

'আমি তো আছি'—এই সেই মন্ত্র যা এতকাল ধরে অবিরাম আমাকে আশ্বাস দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, প্রশ্রয় দিয়েছে, কখনো আমাকে ডাকাবুকো দুঃসাহসী করেছে, আবার কখনো চূড়ান্ত ছেলেমানুষ বানিয়েছে । এই কটি শব্দ আমার পায়ের নিচে শক্ত মাটি যুগিয়েছে, মাথার ওপর বিরাট ছাতা ধরেছে, আর আজ চোখের জলে ভাসাতে ভাসাতে হাতে কলম তুলে দিয়েছে ।

শেষমেশ চুপিচুপি তোমায় একটা মনের কথা বলি বাবা, এত ভালো বাবা হওয়া ভাল নয় । তাতে পরে বড় কষ্ট । তোমার একটাই দোষ, তুমি বড়ো বাড়াবাড়ি রকমের ভালো

বাবা ছিলে । এত ভালো যে সকলের সয় না । সাবাজীবনে একটিমাত্র নিদারুণ কথা তুমি আমায় বলেছিলে । বলেছিলে, আমি যখন থাকব না আমার সম্পর্কে তখন বড় গলা করে লোকের কাছে কতোকিছু বলবি, কতো ভাল ভাল কথা লিখবি, এখন শুধু ঝগড়া আর তর্কই কর্ !

তোমার সেই ভয়ঙ্কর শাস্তি আমি মাথা পেতে নিয়েছি বাবা । শুধু 'তোমার মেয়ে' এই ছাড়পত্রে গুণীজনের পাশে বসে টি.ভি-তে তোমরা কথা বলেছি, এতটুকু ভয় পাইনি । নিজের মরণ দিয়ে জীবনের রাজপথে যে নির্দয় ধাক্কায় আমায় ঠেলে দিলে, সেই শাস্তির জোরেই আজ কাঁচা মুঠোয় শক্ত করে তোমারই কলম চেপে ধরেছি তোমার কথাই লিখব বলে । স্থির জানি, তোমার শাস্তিব প্রসাদ এবার থেকে শুধুই সামনে ঠেলবে আমায় ।

কারণ তুমি তো আছ !"

... ... ...

হ্যাঁ বাবা, 'তুমি আছ' বলেই তোমাকে আজ তোমার কিছু দোষ ত্রুটির কথা জানাচ্ছি যা আগে কখনো 'দোষ' বলে ভাবিনি । কিন্তু গত সাড়ে চার বছরের জীবন-দর্শন আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে ঘাড় ধরে দেখিয়ে দিয়েছে ওগুলো সত্যিই ত্রুটি । যেগুলোর নাম-- অপাত্রে ভালবাসা, অযোগ্যে দান, অযথা সাহায্য, অপ্রয়োজনীয় উপকার । বিশেষত, রক্তের সম্পর্কের পাত্রপাত্রীদের প্রতি তোমার অন্ধতা, নির্বিচার বিশ্বাস, অযৌক্তিক নির্ভরতা— অবিমৃশ্যকারী অক্ষয় অব্যয় আবেগ-মায়া মমতা ।...বাবা, তুমি মনে কোরো না যে আমি নিন্দার ছলে 'ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারে' পাঠকের কাছে তোমার প্রশংসাই করছি । আজ আমি মনে করি এ তোমার অন্যায়, সত্যিই অন্যায় । যার ফল ভুগতে হয় সম্পূর্ণ নিরপরাধ তোমারই সবচেয়ে কাছের কাউকে । এটা কলিযুগ । এই 'অ-সময়ে' তোমার এই এতগুলো ভালো ভালো খারাপ গুণের জন্যে তোমার কী প্রাপ্তি হয়েছে জানো ? যাদের তুমি দিয়েছ, তারা ভেবেছে না-দিয়ে তোমার উপায় নেই বলেই দিয়ে গেছ । আগ বাড়িয়ে যেচে টাকা ঢেলে সকলের প্রয়োজন মেটাতে যাবার ব্যাখ্যা দাঁড়িয়েছে, "বোকার মতো (জয়েন্ট প্রপার্টিতে) টাকা ঢেলেছে কেন ?"...শুনছ বাবা, তুমি বোকা, তোমার ভালত্ব এ যুগে তোমার বোকামি । আমার কথা নয়, তোমারই রক্তের-সম্পর্কের অতি নিকটজনের উক্তি । এ তোমার অবিবেচক উদারতার কর্মফল, তুমি নিজে অর্জন করেছ । তোমারই 'পরিবার' থেকে । আর তোমার আবেগ মায়া মমতাকে তোমার 'দুর্বলতা' ভাবা হয়েছে । পারিবারিক রিলেশনের প্রতি অন্ধতা, নির্বিচার বিশ্বাস, আর অযৌক্তিক নির্ভরতায় ক্ষতি করেছ সবচেয়ে বেশি । নিজের এবং আমার মায়ের । তোমার বিরাট অ্যাটাক-হওয়া হৃদ্‌যন্ত্র তো একেবারে থামার আগে এ চোটটাই বড় বেশি করে পেয়ে গিয়েছিল ! তার প্রমাণ তো ভূষণ জেঠুর (ভূষণচন্দ্র দাস) কাছে লেখা তোমার চিঠিগুলো । তবু তুমি মুখে স্বীকার করতে চাইতে না । আসলে আলোর নিচেই যে সবথেকে ঘন অন্ধকার এই বহু প্রচলিত প্রবাদটা তুমি থিওরি হিসেবে জানলেও নিজের প্র্যাকটিকাল জীবনে বুঝতে পারোনি বহুদিন পর্যন্ত । তাই বড়াই করে বলতে, "আমি একটা সাইকলজিকাল রাইটার ! মানুষের মন নিয়ে আমার কারবার ! আমাকে ভালোমন্দ শেখাবি তুই ?"...কিন্তু বাবা, এতবড় সাইকলজিকাল লেখক হয়েও, এত মানুষের চরিত্র নিয়ে এতো নাড়া-ঘাঁটা ছানাছানি করেও তোমার চারপাশে ঘিরে থাকা অতি-চেনা মানুষগুলোকেই

তুমি চিনতে পারোনি। বুঝতে পারোনি প্রায় শেষ বেলা পর্যন্ত যে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামক সূর্যটির প্রখর আলোয় কতো উপগ্রহ নিজেদের উদ্ভাসিত করে রেখেছে, যেই সেই সূর্যটি অস্ত যাবে অমনি বেরিয়ে পড়বে তাদের অন্ধকারের মুখ, খানাখন্দ ভরা চরিত্র।

কারণ, তোমার সেই বৃহৎ ত্রুটি—নিজের জনের প্রতি অন্ধ-অহেতুক-নির্বিচার বিশ্বাস, ভরসা, ভালবাসা। এতসব 'সদগুণ' যদি তোমার মধ্যে না থাকত তাহলে লাভ এইটাই হত যে জীবনের একেবারে পড়ন্তবেলায় ওই চোটটা তোমার পেতে হত না। তোমারই ভাষায়, "যে মুখফুটে কোনদিন কিছু চাইতে শেখেনি"—সেই তাকেই নিজেরই স্বামী-শ্বশুরের ভিটে থেকে উচ্ছেদ না হবার প্রার্থনা নিয়ে উদভ্রান্ত তাড়নায় জনে-জনের কাছে 'চাইতে' হতো না। তুমি তোমার ভুল বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত ছিলে তুমি না থাকলেও তোমার স্ত্রীর প্রতি সবাই বিশ্বস্ত থাকবে। ভ্রান্তি, ভ্রান্তি, এ তোমার জীবনের সবথেকে বড় ভ্রান্তি। মানুষ হিসেবে ভ্রান্তি, চরিত্র-সন্ধানী লেখক হিসেবে ভ্রান্তি। তোমার নরম-ঠাণ্ডা স্ত্রীকে লড়াই করে আদায় করে নিতে হয়েছে তার জায়গা, যে জায়গা তার নিজের। তবে তার এই লড়াইয়ে নিঃস্বার্থভাবে সত্যিকারের সামিল হয়েছে তোমার দশ ভাইবোনের সবথেকে ঠোঁটকাটা, ট্যাকট্যাক করে অপ্রিয় কথা বলা তোমার আট-নম্বর ভাই। তোমার বড় দুই বোনের কিছু করার ছিল না। তবু তারা দুজনেই তোমার স্ত্রীর এই যুদ্ধে সামিল হয়েছিল। তোমার বড়দি দূর থেকে, মানসিক ভাবে, আর তোমার ছোড়দি নিজের উপস্থিতি দিয়ে আর অনেকই হেনস্থা সয়ে। অথচ আশ্চর্য! মনস্তত্ত্বের কারবারি তুমি এই তিনজনের ওপরেই কখনো তেমন ভরসা রাখোনি মনে মনে। আমি তো জানি! এ-ও তোমার আর এক ত্রুটি। তবে মিথ্যে বলব না, আরো দু'একজন কিছু দিয়েছে। দিয়েছে 'লিপ-সার্ভিস,' মিষ্টিমধুর স্তোকবাক্য। তবু তো কিছু দিয়েছে! শুনিয়েছে কিছু ভালো ভালো কথা! তোমার অতি বিশ্বস্ত প্রাণপ্রিয়দের মতো তো শাসায়নি তোমার স্ত্রীকে— "বাড়ি বিক্রীতে তোমরা (মা, মেয়ে) সই দেবে কিনা আমাকে জানিয়ে দেবে, না দিলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে।" অথবা "ভালোয় ভালোয় বাড়ি বিক্রী করতে না দিলে সেজদার ইনকাম-ট্যাক্স অ্যাটাচ করিয়ে যদি চার লক্ষ টাকা পেনাল্টি করাতে না পারি তো আমার নাম..."। অথচ এই 'নামগুলোর' ওপরেই দারুণ আস্থা ছিল তোমার। ওই 'নামগুলোর' ফ্যামিলির জন্যেই তোমার প্রচণ্ড টান আর 'কনসার্ন' ছিল। ছিল যে তা ওরাও জানত। আমিও জানি। আর এ-ও জানি এ লেখা পড়ার পর গায়ে লাগবে কেবল তাদেরই যারা এইসব 'মহৎ গুণে গুণী'। আমি চাই তারা যেন এ লেখা পড়ার প্রতিবাদ জানিয়ে পাঠক-পরমেশ্বরকে তাদের নামধাম আর 'চেহারাগুলো' নিজেরাই ফাঁস করে দেয়।...

**আচ্ছা বাবা, এককালে অনেক গঞ্জনা আর 'দূর-ছাই' শুনেছিলে বলেই কি তোমার মধ্যে একটা 'কমপ্লেক্স' কাজ করত? সুপ্তভাবে? তাই কি যখন দিন পেলে তখন তোমার ওই সমস্ত অযথা গুণের মাত্রাছাড়া প্রয়োগ নিজেকে সকলের কাছে এতো প্রয়োজনীয় আর অপরিহার্য করে তুললে? এ কথাটা মনে হল কোন এক সময় তোমারই মুখে শোনা তোমার না-উপার্জনের দিনের কিছু ঘটনা শুনে। যেমন, তোমার মেয়ের অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানের ঘটনা। মুখার্জিবাড়ির নিয়ম প্রথম সন্তানের মুখেভাতের অনুষ্ঠান করতেই হয়। তুমি সে অনুষ্ঠানে টাকা দিতে পারোনি। তোমার বাবা ও ভাইদের চাঁদা-তোলা টাকায় সে কাজ সম্পন্ন**

হয়েছিল। কিন্তু তুমি আরও একটা মারাত্মক অপরাধ করে ফেলেছিলে। বাপ হয়েও একটি পয়সা না দিয়ে সারাটা দিন জীবিকার ধান্দায় টো টো করে ঘুরে এসে বড্ড খিদেতে কোনকিছু না ভেবে সোজা নেমন্তন্নের সারিতে বসে পড়েছিলে। তারপর পেট ভরে শুধুই ধমক খেয়ে উঠে গেছিলে পাত ছেড়ে।...এখন একথা সবাই ভুলে গেছে। কিন্তু তুমি কোনও দিনও ভোলনি। তাই কি তোমার মেয়েকে বলতে, "তোর বিয়েটা আমি যেভাবে দেব না! সবাই চেয়ে চেয়ে দেখবে।" মেয়ের মুখেভাতের দিন থেকে যে ঘা তোমার ভেতরে দগদগ করে গেছে, তা বোধহয় শুকিয়েছিল তোমার মেয়ের বিয়ের দিন। যেদিন তুমি তোমার ওই প্রতিজ্ঞাটা কাজে করে সবাইকে 'দেখিয়ে দিয়েছিলে'। যেদিন শুধু তোমার দেওয়া গয়নায় তোমার চাঁদা-তুলে মুখেভাত হওয়া মেয়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে গিয়েছিল; যেদিন তোমার বিখ্যাত সাহিত্যিক-শিল্পী-সম্পাদক বন্ধুদের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারা লোভে সকলের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল; যারা 'আমি আশুতোষ মুখার্জীর' অমুক বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে কৃতার্থ হচ্ছিল—সেইদিন। কিন্তু যে সংকল্পে যাদের তুমি 'দেখিয়ে দিয়েছিলে,' তারা দেখতে পেয়েছিল কি তুমি কী দেখাতে চাইছ ?

আর একটা ব্যাপার। তোমার প্রায় প্রতিটি ইন্টারভিউতে, স্মৃতিচারণে তুমি বলেছ, "আমার লেখা যে বই-ই পড়ার পর বাবার প্রসন্ন মুখ দেখতাম, মনে হত সেটাই বেস্ট। তাঁর চোখের ঘুম আমি শেষ পর্যন্ত নষ্ট করিনি, স্ট্যাম্প পাঠানোর খরচের লক্ষ গুণ ফিরে এসেছে—এটুকুই আমার সামগ্রিক রচনার পুরস্কার।"...বাবা, জানি, তোমার সম্পর্কে তাঁর এককালের ভবিষ্যৎ-বাণী মিথ্যে হয়েছে বলে তোমার বাবা নিঃসন্দেহে সবথেকে খুশি আর নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তুমি ? তুমি তো তোমার মাকে কম ভালবাসতে না ? তোমার দুর্দশা-হতাশার দিনগুলোতে, তোমার বিষাদ-জনিত মানসিক অসুখের সময় যে তোমার মাথার কাছে বসে কাটিয়েছে রাতের পর রাত, যে তোমার ব্যর্থতা নিয়ে কখনো তোমাকে আঘাত করেনি, তোমার অকর্মণ্যতা নিয়ে কখনো কটু কথা বলেনি, যে বিকেল চারটের সময় দুপুরের খাওয়া শেষ করে বিপুল আগ্রহে তোমার প্রতিটি বই পড়ত—তোমার সেই মায়ের 'প্রসন্ন মুখের' উল্লেখ তুমি কোথাও করনি কেন ? এই জন্যেই কি যে ওই পুরনো দিনের গোঁড়া মহিলাটির কাছে তোমার কোনকিছুই প্রমাণ করার দায় ছিল না ? তুমি কৃতী না হতে পারলেও, নামী লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হতে না পারলেও এটাই তার কাছে একমাত্র সত্য ছিল যে তুমি তার ছেলে, সাতচল্লিশ টাকা রোজগার করে যে কোনো হিসেব না কষে পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে মায়ের জন্য চশমা বানিয়ে নিয়ে আসে—সেই ছেলে। এটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় আর শেষ কথা ছিল, তোমার নামী-দামী হাওয়াটা তো তার উপরি পাওনা।...বাবা, তুমিও এটা জানতে। তোমার মন জানত। সেই জন্যেই শুধুই তোমার 'বাবার প্রসন্ন মুখ' তোমার কাছে তোমার 'সামগ্রিক রচনার পুরস্কার'। যা কিনা, আসলে তোমার বিজয়-নিশান। যা দিয়ে অনেক কষ্টে, অনেকই শ্রম-ঘাম-রক্ত-অশ্রু ঝরিয়ে, শেষ পর্যন্ত তোমার প্রতি তোমার সমস্ত প্রতিকূলতাকে, বিরক্তিকে আর অপ্রসন্নতাকে তুমি বিজিত করেছিলে।...

বাবা, এ আমার একান্ত নিজস্ব উপলব্ধি। আমিও তো মনস্তাত্ত্বিক লেখকেরই মেয়ে ! আরো একটা ঘটনা। এটাও তোমার কাছেই শোনা। তখনও পর্যন্ত তুমি নিজেকে

'পদার্থ' প্রমাণ করে উঠতে পারোনি; অপদার্থের পর্যায়েই ছিলে, আর যুদ্ধ করছিলে প্রাণপণ। সে সময় যুদ্ধ-রত সৈনিককে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, তার মেরুদণ্ডটাই নুইয়ে দেবার মতো কয়েকটি কথা— "সারাজীবন ধরে ভাইদের গলগ্রহ হয়ে থাকবে ও"—তোমাকে এত আহত করেছিল, যে তুমি নিজেরই ওপর বিতৃষ্ণায়-ঘেন্নায় (আর বোধহয় প্রখর আত্মমর্যাদায়ও) বলে উঠেছিলে, "তিনতলার ছাদ আছে না ? তার আগে সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব।" পরে, প্রতিষ্ঠিত হবার পর, এরকম মনের মাংস খুবলে নেওয়াদের, না-নেওয়াদের, তোমার জীবনের সক্রিয় নেতিবাচকদের, অক্রিয় উদাসীনদের, বড়দের, ছোটদের, মাঝারিদের—সক্কলের দরকারে লাগার একটা আশ্চর্য 'নেশা' তোমাকে পেয়ে বসেছিল। এটা যে নেশা, তা তুমি জানতে না। যেমন শহীদ হওয়াটাও যে একটা বিরাট নেশা সেটা অনেক শহীদই জানে না। আচ্ছা বাবা, এ ব্যাপারটা কি তোমার সেই 'নোব্‌ল্ রিভেঞ্জ' ? মহৎ প্রতিশোধ ? তোমার অতি প্রিয় এই কথাটার মানে আমি আজও মানতে পারি না। 'নোবিলিটি' আর 'রিভেঞ্জ'—মহত্ত্ব আর প্রতিশোধ আমার কাছে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী শব্দ। যদি নোব্‌ল্ বা মহৎই হব, তাহলে রিভেঞ্জ-এর কথা আর ভাববই না। আর যদি প্রতিশোধই নেব, তবে খাঁড়ার ঘায়েই নেব, সেখানের মহত্ত্বের চিন্তাই আসবে না। কিন্তু তুমি এই উলটো শব্দদুটোকে নিজের জীবনে 'এক' করে ফেলতে পেরেছিলে খুব অনায়াসে। বারবার প্রয়োগ করে গেছ এদের। অথচ তোমার এই নোব্‌ল্ রিভেঞ্জ-এর যথার্থ 'রিসিপিঅ্যান্ট'—গ্রহীতা পেয়েছিলে কি একটাও ? তোমার মহৎ-প্রতিশোধের মহত্ত্ব 'বুঝে' গ্রহণ করেছে, এমন গ্রাহক কি জুটেছিল তোমার ? তাই বলি, এ তোমার অপচয়, বিরাট অপচয়, এতে না হয়েছে মহত্ত্ব, না নিতে পেরেছ প্রতিশোধ।

বাবা, আসলে তুমি মর্মান্তিকভাবে অনুভবশীল আর অতি সূক্ষ্মভাবে প্রতিক্রিয়াশীল (এখানে 'reactionary' নয়। 'sensitive', 'delicate in reaction') বলে কোনো লাঞ্ছনার কথাই ভোলনি, কোনো গঞ্জনাই ভুলতে চাওনি, কোনো বঞ্চনাই ঝেড়ে ফেলতে পারনি। তোমার সৃজনীশীল মন এই না-পারার যন্ত্রণা যে উপায়ে মেটাতে চেয়েছিল তার নাম দিয়েছিল নোব্‌ল্-রিভেঞ্জ। সোনার পাথরবাটি। তবে তোমার এই 'ক্রিয়েটিভ ফ্যাকাল্‌টি'-কে—'নোব্‌ল্ রিভেঞ্জ' নামক 'মলম' বানাতে পারার ক্ষমতাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

জানি বাবা, এখন তুমি মোটা চশমার পেছনে (এখন তোমার আর চশমা লাগে কি ?) তোমার ভাসাভাসা বড়বড় চোখদুটো আরও বড় করে আমাকে বলছ, 'ছিঃ ছোটমা ! ডোণ্ট ওয়াশ ইওর্ ডার্টি লিনেন্ ইন্ পাবলিক ! ঘরের নোংরা কাপড় বাইরের লোকের সামনে মেলতে নেই ! তোকে আমি কী শিক্ষা দিয়েছি এতকাল ?'

কিন্তু বাবা, তুমি তো বরাবরই জানো তোমার এই মেয়ে চিরদিনই অসভ্য, কথা-না-শোনা, জংলী। আর এই অসভ্যতাগুলোকেই তো তুমি অদ্ভুত প্রশ্রয়ে বাড়তে দিয়েছ চিরটা কাল। নিজে রেগে যেতে যখন তোমার সঙ্গে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করত তোমার দুর্বিনীত মেয়ে, কিন্তু অন্য কেউ এ নিয়ে কিছু বলতে এলে তোমার সহ্য হত না। বলতে, "ও ওরকমই, আমাকে সবথেকে ভালবাসে বলেই আমার সঙ্গে এরকম করে। আমি যখন থাকব না, ও সামলাতে পারবে না, পাগল হয়ে যাবে।"...হ্যাঁ বাবা, তোমার এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটা বর্ণে বর্ণে সত্যি। গলা-ফাটিয়ে একতরফা চীৎকার করে মেজাজ দেখানোর মত এখন আমার

আর কেউ নেই ।...যাক, যা বলছিলাম, ঘরের কেচ্ছা বাইরে বের করার ব্যাপারে তোমার আপত্তির কথা । প্রথমেই তোমাকে বলি 'ঘরের' কেচ্ছা আমি 'বাইরে' গাইছিনা । যাদের কথা আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম তারা 'আমার' কেউ নয়, 'তোমারও' কেউ নয়, তাই ঘরের কেউ নয় । যদি তা হত তাহলে 'তুমি নেই' তাদের কাছে স্পর্ধা হয়ে উঠত না । তোমার মেয়ের অপরাধের' (!) ছুতোয় তোমার স্ত্রীকে অবমাননা করার সাহস হত না । এত দরদের তোমার 'বাবার বাড়ি' টুকরো টুকরো হয়ে মাথার ওপর রেশন-দোকানের মাড়োয়ারি মালিক এসে বসতে পারত না । তোমার অত প্রিয় 'নারাণবাবু'-(শালগ্রাম শিলা)কে বারোয়ারি মন্দিরে আজ ছাগলে মুড়োতে যদি না তোমার ওই কটকটে কথা-বলা আট নম্বর ভাইটার আরো ক্যাটকেটে মেয়েটা এসে তাঁকে উদ্ধার করে নিজের শ্বশুরবাড়িতে না ঠাঁই দিত ।

আর 'বাইরের লোক' এখানে কারা ? 'পাবলিক' কারা ? পাঠক ? তারা তো তোমার পরমেশ্বর ! আমারও । তাঁরা তোমার 'শেষের পরের শেষটা' জানবে না ? তবু যদি বা আমার কিছু দ্বিধা ছিল, কাটিয়ে দিলেন বুদ্ধদেব গুহ, যার সম্পর্কে তুমি বলতে 'দরাজ চেহারা দরাজ মন' । সাপ্তাহিক 'বর্তমান'-এ তাঁর দ্বিতীয় পর্বের 'প্রস্তাবনা'-র 'ঋভু' আমার বক্তব্যকে, তোমার অতি ভাল-অতি অযৌক্তিক ত্রুটিগুলোকে, তার নিট রেজাল্টকে, আর তোমার চারপাশকে মেলে ধরতে সাহস জুগিয়েছে । উনি জানেনও না কী দুঃসাহসিক কাজে ঋভু আমাকে ঠেলে দিতে পেরেছে । তুমি 'ঋভু'কে দেখতে পাচ্ছ ? যে নিজেকে নিয়ে বারবার পরিহাস করে, যে পরিহাসের ভেতর একটা ব্যথা-মাখা হাসি উঁকি মারে, খুব সহজভাবে যে তার লাঞ্ছনা, আঘাত আর অবিচারের কথাগুলো পাঠক-পরমেশ্বরের কাছেই তুলে তুলে ধরে ? দেখো, বুদ্ধদেব গুহ-র ঋভু বলছে, "যাঁরা আমাকে এই জীবনে ঠকিয়েছেন, নানাভাবে অপমান-অসম্মান করেছেন, হেয় করেছেন, গভীর সুপরিকল্পিত চক্রান্তের শিকার করেছেন, অকৃতজ্ঞতার চরম করেছেন আমার সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককেই ক্ষমা করে দিলাম । সেই মানুষেদের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে, আমি জেনে-শুনেই ঠকেছি । ঠকব না বলে, শক্ত হয়ে দাঁড়ালে, আমাকে ঠকানো আদৌ সম্ভব হত না । দুদিনের জীবনে সততা, আনন্দ আর শুদ্ধতাই শেষ পর্যন্ত ফুলের মত ফুটে থাকে ।" বাবা, আমি জানি যে তুমিও ( ঋভুর মতোই ) জেনেশুনেই ঠকেছ, তুমিও নানাভাবে অনেকই অপমান-অসম্মান-চক্রান্তের শিকার হয়েছ, অকৃজ্ঞতার চরম রূপ দেখেছ, আর তুমিও তাদের প্রত্যেককেই ক্ষমাও করে দিয়েছ । কিন্তু তফাৎ এইখানে যে, এ-কথাটা ঋভুর মতো তোমারও ছাপা অক্ষরে জানিয়ে তবেই ক্ষমা করা উচিত ছিল । জানিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, ঠকবো না বলে শক্ত হয়ে দাঁড়ালে তোমার সঙ্গেও বঞ্চনা করা আদৌ সম্ভব হত না কারুর । এই উচিত কাজটা করার ভার আমি নিয়েছি । এবং দুদিনের জীবনে সততা, আনন্দ, আর শুদ্ধতার শেষ পর্যন্ত ফুলের মতো ফুটে থাকার জীবন-দর্শনের সঙ্গে তুমিও যে সম্পূর্ণ একমত ছিলে তা কোনো একসময় 'ঋভুকে' আমি জানিয়ে দেব ।...

.....এতক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে সেই আগের মতো শুধু তর্কই করে গেলাম । কেবল তুমিই কোন উত্তর দিলে না আগের মতো । এবার তোমাকে আর একটা কথা জানাই । আমার অভিযোগ ছিল, যৌথ পরিবারের সর্বদা স্নেহান্ধ বড়ভাইয়ের অর্থহীন ভূমিকায় ব্যতিব্যস্ত

যে পাঁচ নম্বর ভাই, সেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে । আর ছোট গণ্ডীর কিছু স্বার্থান্ধের উপকারে লাগা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে । কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি সেটা কতো ছোট পরিসর, সেই ক্ষুদ্রতার বাইরে কোন্ বিশাল জায়গায় তুমি জিতে গেছ, শেষ অবধি কোথায় বিপুলভাবে জিতে গেলে তুমি । তোমার সেই জিত কবে থেকে আমি দেখতে পেয়েছি জানো ? সেই ১৯৮৯, ৪ মে থেকে । যেদিন তুমি ধপধপে জামাকাপড়ে সেজে ঠোঁটে টিপটিপ হাসি নিয়ে চোখ বুজে শুয়েছিল রাজার মতো । যখন আমার মনে হচ্ছিল মৃত্যু তোমার এই রাজকীয়তার সামনে এসে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে । তুমি যেন সেই রাজর্ষি যে মৃত্যুপথের ছেলের মাথার কাছে অটল পাহাড়ের মতো বসে তাকে ছুঁয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে আর বলতে, 'ডেথ্ ! বী নট প্রাউড ।' ওই ৪ তারিখে আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম তোমার সেই রাজসিক শাসন—"ডেথ্ ! বী নট্ প্রাউড । তুমি তো দারোয়ান ! মহাজীবনের এক দ্বার থেকে আরেক দ্বারে পৌঁছে দেবার জন্য আমার প্রয়োজনেই তো তুমি আস । মৃত্যু, তোমার অত দম্ভ কিসের ? এখন চুপ করে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে থাকো যতক্ষণ না সবাই আমার মহাযাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয় ।" বাবা, তোমার এই হুকুম আমি স্পষ্ট শুনেছি । হৃত-গর্ব মৃত্যুর নত মাথা দেখেছি । সে কথা সকলকে জানিয়ে দেবার জন্যে আমি পরে টি-ভি-তে বলেছি । তুমি তো তখন আমার পাশেই ছিলে, নয়তো ভাঙাচোরা শরীর মন নিয়ে অতবড় উপলব্ধিকে আমি প্রকাশ করতে পারলাম কি করে ?

তারপর থেকে তুমি জিতেই চলেছ । আর আশ্চর্য ! জিতছ তোমার ওই এ যুগে অচল কোয়ালিটিগুলোর জন্যেই । যেটা আমি জেনেছি তুমি চলে যাবার পর । যাদের জন্যে তোমার এই জিত, তারা তোমার তথ্যকথিত আত্মীয় না হলেও তারা এই উম্মুক্ত দুনিয়ার উম্মুক্ত হৃদয়ের মানুষ । তোমার, আমার, আমাদের সকলের পরম আত্মজন । এদের নাম গুনে শেষ করা যায় না । এরা অগণ্য, এরা অজস্র । তুমি কি জানো তোমার যে ত্রটিগুলোর জন্যে একটু আগেই তোমায় কাঠগড়ায় তুলেছিলাম, তোমার সেই ভালো ভালো খারাপ গুণগুলোর কথাই আজ সাড়ে চার বছর পরে এদের মুখে মুখে ফেরে ! তুমি থাকতে তোমাকে ভালবেসেই এরা আমাদের কাছে আসত ; এখনো তোমাকে ভালবেসেই আমাদের কাছে আসে । তোমার নামের ফায়দা এরা লোটেনি বলেই তোমার চোখ-বোজা এদের কাছে স্পর্ধার কারণ হয়ে ওঠেনি । নিবিড় ভালবাসার বেদনায় এরা কাছে এসে দাঁড়ায়, পিঠে দরদী হাত রাখে, তোমার স্ত্রীর সামনে সশ্রদ্ধে মাথা নত করে জানায়—আমরা আছি । "আমার মতো অগণ্য নগন্য মানুষ এই মুহূর্তে আপনারই মতো শোকাহত । আমাদের সমবেদনা আপনাকে সবসময় ঘিরে থাকবে । এবং আছে ।"

বাবা, এরা সত্যিই অগণ্য কিন্তু নগণ্য নয় একটুও । এরা মানুষ, এরা তোমার বন্ধু, এরা তোমার পাঠক বা না-পাঠক । কিন্তু এরা শুদ্ধ আত্মার লেখক মানুষ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা করা বিশুদ্ধ আত্মার মানুষ । এদের নিয়েই তো পৃথিবী !.....

নিজের মরণ দিয়ে জীবনের ম্যারাথনে আরও এক জায়গায় তুমি শেষ জিত জিতে গেছ যদিও নিজে দৌড় শুরু করেছিলে সবচেয়ে দেরিতে । তোমার সেই জয়ের অভিজ্ঞান সর্বাণী মুখোপাধ্যায় । যাকে তুমি 'কলম ধরতে' বাধ্য করতে পেরেছ । বিরাট মূল্যে, নিজের মহার্ঘ্য জীবনের মূল্যে । তোমার এই আকাঙ্ক্ষার কথা প্রথম চিঠিতেই আমি সবাইকে

বলেছিলাম, এ চিঠিতেও বলছি । তাব পূর্ণ রূপ দিয়েছি 'কথাসাহিত্য'-তে 'চাঁদের আলো গল্পতে । আসলে ওটা তো আমার তর্পণ, আমার পিতৃপূজা, আমার তোমায় চেনা । 'চাঁদের আলো'-তেও, নিজের জীবনেও, তোমাকে কাছে না পেয়ে যে মেয়ে পাগল হয়ে গিয়ে দু-দুটো বছর ধরে পাবে না জেনেও তোমাকেই খুঁজে মরছিল, সেই মেয়েই আজ তোমাকে খুঁজে পেয়েছে । তার কলম ধরার চেষ্টায়, তার নিজের ভেতরে । তার দুঃসহ শোককে যারা দুর্বলতা ভেবেছিল, আজ তারা ধারেকাছে ঘেঁষতে সাহস পায়না জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে । আর একটা কথা তোমায় স্বীকার করি । তোমার অন্তত একটা 'নোবল্ রিভেঞ্জ'-কে আমি বুঝতে পেরেছি । শব্দদুটোকে মেলাতে পেরেছি । ক্লাস সিক্স-এর যে ছেলেটির বাংলা খাতার প্রথম পাতাতেই লালকালিতে দাগানো গোটা তিরিশেক ভুল বানান উঁচু করে তুলে ধরে সবাইকে দেখাচ্ছিলেন মাস্টারমশাই, সেই ছেলেটিও যখন দূর থেকে কার খাতা বুঝতে না পেরে আর সকলের সঙ্গে গলা ফাটিয়ে হাসছিল, একটু পরেই শিক্ষকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আর সহপাঠীদের আরও হাসিতে সেই ছেলেটির হাসি তখনকার মতো থেমে গেলেও, ওই ছেলেই বড় আজব প্রতিশোধ নিয়ে সারাটা জীবন হেসেছিল হা হা করে । কারণ মাস্টারমশাই বলেছিলেন, আমাদের এই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও বাংলার বাঘ । বাংলা 'ভাষার' বাঘ । রয়েল বেঙ্গল টাইগার । বাংলা ভাষাকেই ও চিবিয়ে খাবে, জন্মে কখনো এক লাইনও ঠিক করে বাংলা লিখতে পারবে না ।—বাবা, তোমার এই 'নোবল রিভেঞ্জ'-কে আমি স্যালুট করি । তোমার সেই প্রণম্য মাস্টারমশাইও নিশ্চয় করে গেছেন ।

আর, তোমার চূড়ান্ত জিত্, কাঁচা মুঠোয় শক্ত করে কলম চেপে তোমারই মেয়ে আজ তোমারই রচনাবলীর কাজ করছে । কাজ করছে তোমারই রক্ত, কথা বলছে শব্দের অক্ষরে তোমারই মাংস, কলম ধরেছে তোমারই শক্তি ।...বলেছিলাম না আগের চিঠিতে, "তোমার শান্তির প্রসাদ এবার থেকে শুধুই সামনে ঠেলবে আমায়"—তাই-ই হয়েছে বাবা, তাই হয়েছে । তারপর থেকেই যাত্রা শুরু । ধীরে হলেও এগিয়ে চলেছি, চলেছি সামনের দিকে । তার সবচেয়ে বড় স্মারক এই রচনাবলী সম্পাদনার পরম কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি ; তোমার সম্পর্কে 'কিছু কথা' বলতে পারার দুর্লভ পুরস্কার । যদি এরপর এখানেই থেমে যাই তো এতটুকু দুঃখ নেই, একফোঁটাও 'রিগ্রেট' নেই । তাই মৃত্যুকে আমিও আঙুল তুলে বলি, ডেথ্, বী নট্ ট্যু ডেয়ারিং ! আমার এ 'নৈবেদ্য' সাজানো শেষ হবার আগে আমায় ছুঁতেও এসো না । তারপর ! ইউ আর মোস্ট্ ওয়েলকাম !

কারণ, বাবা, স্থির জানি, সেখানেও, আমারই জন্যে,

তুমি তো আছ !

* * *

পাঠক-পরমেশ্বর,

এবং

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,

আমাকে ক্ষমা করবেন । 'কিছু কথা' বলতে গিয়ে 'সবকথা' বলে ফেলার অপরাধে ।

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

# জীবন-সন্ধানী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে এক ঝাঁক তরুণ কথাশিল্পীর দেখা পাওয়া গিয়েছিল। এঁদের জন্ম ১৯২০ সালের কাছাকাছি সময়ে। এঁরা যখন যৌবন উপনীত তখনি বঙ্গদেশ তথা ব্রিটিশ-শাসিত ভারত এক গুরুতর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। ববীন্দ্রনাথেব মৃত্যুর পরবর্তী দশটা বছর (১৯৪১-৫০) বাঙালিকে এক রুধিরস্রোতের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছিল। এই এক দশকে অবিভক্ত বাংলাদেশ ও বাঙালিসমাজে খুব দ্রুত পরিবর্তনেব সূচনা হল। জাপানি আক্রমণ (১৯৪১), আগস্ট আন্দোলন ও মেদিনীপুরের বিধ্বংসী বন্যা (১৯৪২), পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩), দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় বণাঙ্গনে সমবাযোজনের মঞ্চরূপে কলকাতা ও বঙ্গদেশকে ব্যবহার (১৯৪১-৪৫), রক্তক্ষযী দাঙ্গা (১৮৪৬), দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা (১৯৪৭) এবং উদ্বাস্তু-আগমন (১৯৪৭-৫০)— এইসব বিপর্যয়কর ঘটনাস্রোতেব মধ্য দিয়ে বাঙালিকে পা ফেলে চলতে হয়েছে। বারুদের গন্ধ, মড়াব গন্ধ, রক্তেরগন্ধ, ফ্যানের গন্ধ আর সেইসঙ্গে জুঁইফুলেব গন্ধ সেদিনকাব বাঙালি লেখকদেব সঙ্গী ছিল।

"এই দশটা বছরেই (১৯৪১-৫০) বাংলা ও বাঙালিব জন্মান্তর হল, শত প্রযাসেও আব আমরা তিবিশের দশকেব শান্তি, স্বস্তি ও মন্থরগতি জীবনে ফিবে যেতে পাবিনি। তাই শবৎচন্দ্রীয় রোমান্টিক যুগের অবসান, কল্লোলীয় বোহেমিয়ান পালাব অবসান, বিভূতিভূষণেব প্রকৃতিমুগ্ধতাব অবসান : এ সবই আমাদেব স্বীকার করে নিতে হয।" (অরুণকুমাব মুখোপাধ্যায, কালেব প্রতিমা, ২য় সংস্করণ, ১৯১৬, পৃ ১৩০)

তারাশংকর-বিভূতিভূষণ-বনফুল-মানিকের পব সমকালীন তরুণ লেখকবাই বাংলা কথাসাহিত্যেব দাযিত্ব গ্রহণ করলেন। এঁদেব মধ্যে ছিলেন নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিবিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমবেশ বসু, এবং আছেন রমাপদ চৌধুবী, বিমল কর প্রমুখ লেখকরা। আব আছেন প্রবীণ ত্রয়ী— আশাপূর্ণা দেবী, অন্নদাশংকব রায, গজেন্দ্রকুমার মিত্র। আবো ছিলেন বিমল মিত্র ও কল্লোলেব লেখকবা ও সুবোধ ঘোষ। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও বিমল মিত্রের জন্ম ১৯১২ সালে। উপরিধৃত তরুণ লেখকদের জন্ম ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে।

সমবকালীন এই লেখকদেব মধ্যে ছিল মেলবন্ধন। "তাঁবা যখন তারুণ্যে উপনীত, তখনি বঙ্গদেশের পালে বিপর্যয় আর অবক্ষয়ের হাওয়া লেগেছে। সেই হাওযা ঝোড়ো হাওয়ায় পবিণত হয়েছে দ্বিতীয বিশ্বসমরকালে। তখন এই লেখকবা ২২/২৩ বছরেব তরুণ। তাঁদের চোখের সামনে শুরু হয়েছে ভাঙন।......ভাবসাম্যের বিচলন, মূল্যবোধের বিনষ্টি, সুস্থ জীবনবোধের অবসান, অবক্ষযের প্রতিষ্ঠা, বিপর্যযের বিজয, স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে বাংলার অর্থনীতিক-রাজনীতির মহিমার অবসান : এই পটভূমিতে আলোচ্যমান উপন্যাসলেখকরা চোখ মেলে তাকিয়েছেন, দেখেছেন ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি, অবাক মেনেছেন ভাগ্যের পদাঘাতে ও নৈরাশ্যেব লগুড়াঘাতে।" (তদেব, পৃ ১৩১)

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (জন্ম : ১৯২০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর, ঢাকা বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রাম, মৃত্যু : ১৯১৬ সালের ৪ মে, কলকাতা) এঁদেবই একজন হয়ে উঠতে

পারতেন। কিন্তু এঁদের সমবয়সী হয়েও ঠিক এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। স্বীকার্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯৪০ সাল নাগাদ গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। প্রথম সাহিত্যপ্রয়াসের পর জীবিকার তাগিদে সাহিত্যচর্চা থেকে কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য তাগিদে— সাহিত্যচর্চার টানে ফিরে এসেছিলেন সাহিত্যের মূলস্রোতে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত 'আর্তমানব' বা 'কালচক্র' উপন্যাস নয়, 'চলাচল' উপন্যাস (১৯৫১) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে এলো বাংলা কথাসাহিত্যের মূলস্রোতে। এই উপন্যাসের পরই প্রকাশিত হয় 'পঞ্চতপা' উপন্যাস। তারপর আর তিনি পিছন ফিরে তাকাননি। উল্লেখ্য : 'চলাচল'-এর পর তিনি লেখেন 'জীবনতৃষ্ণা'। পরবর্তীকালে তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'কালচক্র', 'আর্তমানব' এবং 'জীবনতৃষ্ণা' লেখকের মধ্যে ছিল এক সাহিত্যবিচারক যিনি এই প্রত্যাহারের মূলে।

|| ২ ||

'দেশ' সাপ্তাহিকপত্রের বিশেষ সাহিত্যসংখ্যায় (১৩৮২ বঙ্গাব্দ।১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ) নবীন প্রবীণ পনের জন কথাসাহিত্যিকের আত্মকথা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁদেরই একজন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়— লেখাটির নাম 'সবিনয় নিবেদন'। এটিকে তিনি লেখকের জবানবন্দী বলে বিবেচনা করেছিলেন।

এই জবানবন্দীতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন তাঁর লেখক হয়ে ওঠার কাহিনী। তাঁর পিতা (পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) ছিলেন সরকারি চাকুরে। সেই সূত্রে সারা বাংলা ঘুরেছেন। সেই সুবাদে অখণ্ড বাংলার প্রায় সর্বত্র কিশোর আশুতোষ ঘুরেছেন, ফলে তাঁর পড়াশুনার "ক্ষতি কিছু হয়েছে কিন্তু খেলাধূলার ছোট জগতটা কাছে এসে গেছে। মফঃস্বল শহরে স্কুল থেকে কলেজের পাঠান্তকাল পর্যন্ত কোন খেলায় কত কাপ-মেডেল পেলাম বা পেতে পারি, কোন টীমকে কি-ভাব পর্যুদস্ত করা যেতে পারে— এসব ছাড়া আর কোনো বড় চিন্তা মাথায় ছিল না। ওই সময় পর্যন্ত একটি গল্পের দাগও মাথায় জমাট বাঁধেনি কখনো।"

তবে এই কিশোর-প্রথম যৌবনে অমন অস্থির বহির্মুখিতার পাশাপাশি একটা খাপছাড়া অন্তঃপুরের জগৎ ছিল তাঁর। রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প বানাতে ও ভাইদের শোনাতে ভালবাসতেন।

আশুতোষ এই জবানবন্দীতে কবুল করেছেন, শরৎচন্দ্রের নায়িকারা তাঁকে জ্বালাতন করে মেরেছে। "এত আধা-চেনা আধা-কানা জগতের পর্দা থেকে থেকে তুলে ধরেছে তারা।" নরেশ সেনগুপ্ত, সৌরীন মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসগুলো সেই আধা-চেনা আধা-কানার পর্দাটা ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়েছিল। ফলে বিজ্ঞানের ছাত্র আশুতোষ অন্তরে অন্তরে সাহিত্যের টান অনুভব করতে থাকেন। ১৯৪০ সালে পড়েছিলেন চারখানি উপন্যাস-– যা তাঁকে প্রভাবিত করে— শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী', হল্ কেন্-এর 'ইটারনাল সিটি' এবং ভুলে যাওয়া নাম এক লেখকের 'ওয়ার ওয়াইন অ্যানড় ওম্যান'।

বাড়ি থেকে গঞ্জনা শুনতে হচ্ছিল আশুতোষকে। কারণ পড়াশুনায় অনুরাগ ছিল না।

হুগলীর মহসীন কলেজে আই.এস.সি. উত্তীর্ণ হবার পব কলকাতার কলেজে বি.কম. পড়তে শুরু করেন । এ দুয়েব কোনোটাতেই তাঁর অনুরাগ ছিল না । বি.কম. পড়ার সময তাঁর হল চোখের পীড়া । অনেকদিন অন্ধকাব ঘরে কাটিয়েছিলেন । সুস্থ হবার পর তিনি কলেজেব লেখাপড়া ছেড়ে দেন । পরিবারে তিনিই ছিলেন অকৃতী । আর সব ভাইয়েরা কৃতী হয়ে উঠছিলেন । একারণ তাঁকে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছিল । পরপর নযটি চাকুরি ও ব্যবসা ধবেছেন এবং ছেড়েছেন । শেষ ও দশম চাকুরি যুগান্তব পত্রিকায় । এটাতেই তিনি লেগেছিলেন আঠার বছর (১৯২৪-১৯৫২) । যুগান্তব সাময়িকীতে লেখেন 'প্রাসাদপুরী কলক'তা' আব মাসিক বসুমতীতে 'অচল মানুষ, সবল মানুষ' । তৃতীয় একটি প্রবন্ধের বই এই ধারাবাহিক লেখেন— 'নিষিদ্ধ বই' ।

পূর্বেই লিখেছি 'চলাচল' উপন্যাস '১৯৫১) তাঁকে প্রথম প্রতিষ্ঠা দেয় । পববর্তী চল্লিশ বছব আর ফিরে তাকান নি । মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত 'নার্স মিত্র' গল্পটি ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে । তা পবে 'দীপ জ্বেলে যাই' (১৯৫৬) নামে সিনেমা হয় । এই সময়ে পর পর সিনেমা হয়— চলাচল, পঞ্চতপা, জীবনতৃষ্ণা । এব ফলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে । তাঁর লেখা উপন্যাস ও ছোট উপন্যাসেব সংখ্যা এক শ'ব কাছাকাছি ; ছোটগল্পেব সংখ্যা দেড় শ'র উপরে ; ছোটদের জন্য গল্পের সংখ্যা প্রায পঞ্চাশ ।

'সবিনয় নিবেদন' শীর্ষক জবানবন্দীতে তিনি লিখেছেন— "সৌভগ্যেব অযাচিত বর্ষণ চাইনি— রুদ্রকে ডেকেছি, রুদ্রের প্রসন্ন মুখ দেখতে চেয়েছি । এই চাওযাব জোরেই আজ আমি অকপটে বলতে পারি, উত্তেজনায সেই প্রথম জোযাবেব যত লেখা যে-সব সম্পাদকেবা ফেবত দিয়েছেন তাঁবা প্রত্যেকে আমাকে রুদ্রেব ওই প্রসন্ন মুখ দেখার দিকে এগিয়ে দিয়েছেন ।" পঞ্চতপা উপন্যাসে তিনি রুদ্রেব প্রসন্ন প্রথম দেখেন । তিনি আবো লেখেন, "জীবনে অনেক সুন্দর দেখেছি, কুৎসিত দেখেছি, অনেক ভালো দেখেছি মন্দ দেখেছি । সেই সুন্দর কুৎসিত ভালো-মন্দেব নজির সামনে বেখে মানুষেব বুকের তলার জগৎটাই নানাভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি ।"

এই জবানবন্দীব শেষ কথাটি স্মবণযোগ্য—

"এক-একটা লেখার মধ্য দিয়ে লেখকের এক ধরনেব যন্ত্রণাব মুক্তি, সেই সঙ্গে কিছু আনন্দেরও । এব মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আত্মতুষ্টিগত যতি-চিহ্ন কোনো পাকা স্বাক্ষরের স্পর্ধা ধরে না । কোন্ লেখার মধ্যে এই ব্যথা-ছোঁয়া আনন্দের একটা পূর্ণ রূপ রেখে যেতে পারব ? কোন লেখার মধ্যে গ্লানির গর্ভবাস থেকে শিবসুন্দরের উত্থানের খবরটি সহস্রজনের কাছে রেখে যেতে পারব ? আর কোন লেখার মধ্যেই বা আগামী দিনের লেখকদেব কাছে একটিমাত্র ঘোষণা সম্পূর্ণ করে যেতে পারব— বলে যেতে পারব, এ বিশ্বসংসারে বেঁচে থাকার শক্তিটাও বড় অদ্ভুত ভাই— রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্— দয়া নয়, ক্ষমা নয়, রুদ্র তোমার প্রসন্ন মুখ দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো । পারলে সেটাই হবে শেষ আর সব থেকে সেরা লেখা ।"

॥ ৩ ॥

**চলাচল আর পঞ্চতপা উপন্যাসের পটভূমি সদ্য-স্বাধীন ভারতের বিরাট কর্মযজ্ঞ । চলাচল-**

এ বোম্বাই-এর মেরিন লাইন্‌স-নিবাসী ডাঃ সমাদ্দার গড়ে তুলেছেন ওষুধের কারখানা প্যাবেলে। তাঁব জীবনে লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ নেই । একদিকে অধ্যাপনা, গবেষণা, অন্যদিকে ওষুধের ব্যবসা, দুয়েতেই তাঁর সমান কৃতিত্ব । তাঁর শিষ্য ডা মোহিনী চন্দ্র । তাঁব স্ত্রী অপর্ণা সুবলোকের অধিবাসী । বিজ্ঞানে আব গীতবাদ্যে মিল হল না । অন্যদিকে বিজ্ঞানের ছাত্রী সবমা ব্যানার্জি । তাব সহপাঠী অবিনাশ— কালো, ঢ্যাঙা, হাড়-জবজরে । সরমাব স্বাস্থ্যদৃপ্ত গৌরতনুর পাশে অবিনাশ মূর্তিমান রসভঙ্গ । তবু তাকেই সরমা প্রশ্রয় দেয, হয়ত বা ভালবাসাও । কিন্তু ব্যবসাযী বিপিন চৌধুরীব কাছে গবীব আঁকিযে অবিনাশ হেরে যায় । বিপিন বিবাহ্ কবেন সবমাকে । এইসব চবিত্রেব টানাপোড়েনে জমে ওঠে কাহিনী । স্বাধীন ভাবতে বিজ্ঞানেব কর্মযজ্ঞ এই উপন্যাসে কেবল পটভূমি নয়, চবিত্রব সঙ্গীও বটে । ডা সমাদ্দাব, ডা. চন্দ্র, বিপিন চৌধুবী কেউই শেষ পর্যন্ত সবমাকে পুরো বুঝে উঠতে পারেনা । প্রথম দুজনের মৃত্যুতে কি ল্যাববেটবি বন্ধ হযে যাবে ? অবিনাশেব চিরঅন্তর্ধানে কি সরমা গবেষণা ব্যাহত হবে ? নিশুতি রাতে বিশাল ল্যাববেটবির নিঝুম শূন্যতা কি সবমাকে গ্রাস কবে ফেলবে ? কারুব মৃত্যুই সবমাকে ব্রতভঙ্গ কবাতে পারে না । "সূর্যমন্ত্রেব দীক্ষা শুরু সবমাব জীবনে । আলো দেবে, জ্বলবেও । বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, শুভ্র ভযাবহ একটানা গতি । বিপিন চৌধুবীব আত্মখণ্ডনেব জ্বালা জুড়ায নি, জুডাবে না । অবিনাশের মৃত্যুর স্তব্ধতা মিলায় না, মিলাবেও না । দেবব মণ্টুব দীর্ঘনিশ্বাস কানে বাজছে, বাজবেও । চন্দ্রর বেদনা-[illegible] মর্মদাহ ভোলেনি, ভুলবেও না । কিন্তু সব নিয়ে আবার যখন সে উঠে দাঁড়াল, আর থামবেও না ।" স্বাধীনভাবতেব এই নাবী-বিজ্ঞানী এক নতুন চরিত্র ।

পঞ্চতপা উপন্যাসে প্রাধান্য পেযেছে স্বাধীন ভারতেব আব-এক কর্মকাণ্ড— মড়াই নদীর বাঁধ নির্মাণেব বিশাল কর্মকাণ্ড । চিফ ইঞ্জিনীযাব বাদল গাঙ্গুলি । তাব বন্ধু নবেন চৌধুরী ইঞ্জিনীযাব চিফ ড্রাফটসম্যান । ওভারসিযাব অবনীবাবু । আছে অ্যাডমিনিসট্রেডিভ অফিসাব । আব আছে কনট্রাকটর বণবীব ঘোষ আব দ্বিজেন চাকলাদার । মড়াই নদীব বুক থেকে গেঁথে তুলতে হয় বিশাল দেওয়াল । সেই কাজে নিযুক্ত অসংখ্য সাঁওতাল, তাদেব নেতা পাগল সর্দাব । এই বিশাল কর্মকাণ্ড দেখে চমৎকৃত হয নবাগতা সান্ত্বনা, ওভাবসিযাবেব কন্যা । 'ড্যাম' তৈরি হলে ভেসে যাবে সাঁওতালদেব গ্রাম । তাবা কি ভিটেমাটি ছেড়ে যাবে ? পাগল সর্দার ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে বাজি হযেছে, সেইসঙ্গে মড়াই বাঁধ তৈবিব কাজে লাগাতে বাজি হযেছে । চিফ ইঞ্জিনীযাবেব একটা সমস্যা দূর হযেছে । কিন্তু যেদিন মড়াইযের বুকে গেঁথে-তোলা দেওয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে, সেদিন কনট্রাকটর দুজনের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য তাকে তৈরি হতে হয়েছে । কনট্রাকটব রণবীর ঘোষ মোটা অংকের টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছে । বাদল গাঙ্গুলি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে । হেড আপিস থেকে এলো এনকোয়াবি কমিশন, তার নেতা ইঞ্জিনীয়াব বাড়রি, যার মেয়ে ঝর্ণাকে বাদল গাঙ্গুলি একদিন প্রত্যাখ্যান করেছিল । অপরদিকে সান্ত্বনা নরেনের মনের কাছাকাছি এসেছে । বাদল গাঙ্গুলির চিত্ত বিচলিত হযেছে তাকে দেখে । সান্ত্বনাব সামনে গড়ে উঠছে এক বিশাল ড্যাম । বারবার সেই ড্যাম তাকে টানে । মড়াইয়ের মাঝখানে এসে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে অতল মড়াইয়ের দিকে চেয়ে চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে থাকে । দেখে দূরে দূরে কাজ করছে সাঁওতাল নরনারী । তাবা— নারীপুরুষ এক সঙ্গে কাজ করে । ঘরে বাইরে, পাশাপাশি, কাছাকাছি । ওদের এই

আনন্দ সান্তনাকে বিশেষ স্পর্শ করে । এদের পাশে মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত মানুষেব জীবনেব জটিলতা, ইতবতা, অসূয়া, ঈর্ষা তাকে ব্যথিত কবে । মানবজীবনে সম্পর্কেব টানাপোড়েন স্বাধীন ভারতেব বিপুল কর্মোদ্যমেব পটভূমিতে এক নতুন মাত্রা পেযে যায় । উপন্যাসেব শেষে দেখা দেয় বন্যা, সর্বগ্রাসী, সৃষ্টিধ্বংসী প্রবল বন্যা । দুই পাহাড়ে বাধা পেয়ে পিছনেব দিক ভাসিযে নিযে যায । গোটা মড়াই নদী প্লাবনে ভাসছে । সাময়িক অবরোধ বক্ষা কবাব জন্য ইঞ্জিনীয়াব-মজুববা প্রাণপণে প্রয়াস কবে, শেষ পর্যন্ত তাকে বক্ষা করতে পাবে । কিন্তু সান্ত্বনা ? উপবে নীচে প্রবল বন্যাব সঙ্গে মানুষেব লড়াই । সান্ত্বনা ভেসে যায সেই প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ।

প্রকৃতিব সঙ্গে মানুষেব প্রাণপণ লড়াই আর প্রকৃতিব সম্মোহনী মানুষেব আত্মসমর্পণ, —পঞ্চতপা উপন্যাসে এ দুই বক্তব্য প্রাধান্য পেযে যায । সন্দেহ নেই, চলাচল আব পঞ্চতপা স্বাধীন ভারতের কর্মকাণ্ডেব বিপুল পটভূমিতে নতুন ধবনেব উপন্যাস ।

॥ ৪ ॥

যে বড় (major) উপন্যাস আশুতোষ মুখোপাধ্যাযকে জীবনশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়, তাব নাম 'কাল তুমি আলেযা' । এই উপন্যাসেব নাযক ধীবাপদ চক্রবর্তী । উপন্যাসেব ঘটনাপ্রবাহেব চালিকা-শক্তি সে নয়, ঘটনাস্রোতে সে আবর্তিত হযেছে । অনেক সময়েই সে দর্শক এবং দার্শনিক ।

চারুদির স্নেহে ধীবাপদ সিক্ত হযেছিল । আব-এক নারীব স্নেহও সে পেয়েছিল । সুলতান-কুঠিতে তাব প্রতিবেশী এক ওষুধ কোম্পানি—ফ্যাক্টবি, ল্যাববেটবি আব ওষুধেব দোকানেব এক-চতুর্থাংশেব মালিক চারুদি । সেই জোবেই তিনি ধীবাপদকে কোম্পানিতে ঢুকিযেছিলেন । কোম্পানির হর্তা-কর্তা-বিধাতা হিমাংশু মিত্র । তাঁব পাশাপাশি আছে অনেক চবিত্র । তাঁব পুত্র সিতাংশু, ফ্যাক্টবিব চীফ কেমিষ্ট অমিতাভ ঘোষ, সিনিযব কেমিষ্ট জীবন সোম, ল্যাববেটবিব পবিচালিকা ডাঃ লাবণ্য সরকাব । তিনিই কোম্পানিব মেডিক্যাল অ্যাডভাইসব । ম্যানেজিং ডিবেক্টব হিমাংশু মিত্রব সমর্থনে এই কোম্পানিতে ধীরাপদব চাকুবি । ধীবে ধীরে ধীবাপদ নিজেব যোগ্যতাব প্রমাণ দিযেছে । ফ্যাক্টবি-ল্যাববেটাবি-দোকান —তিন ক্ষেত্রেই ধীবাপদকে কোম্পানিব মালিক বসিযেছেন । যাকে সবাই একদিন অবজ্ঞা করেছিল, সেই ধীবাপদকে— তার ব্যক্তিত্বকে তাবা মানতে বাধ্য হযেছে । ধীবাপদ নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে সবকিছুর সঙ্গে জড়িযে ফেলেনি । একদিন সে সামান্য টিউশন আব কবিবাজী ওষুধেব আর দে-বাবুর বইযেব আশা-জাগানো বিজ্ঞাপন লিখত, জল আব বাতাস গিলে কার্জন পার্কের বেঞ্চিতে ঘণ্টাব পর ঘণ্টা বসে থাকত । আর চোখে যা পড়ত তা দেখত । এভাবেই ধীবাপদর জীবন বহে চলেছিল মন্দ গতিতে । চারুদিব দাক্ষিণ্যে সে এসে পড়ল ওষুধ-কোম্পানিব আবর্তে । ধীবে ধীবে সবাই অনুভব কবে ধীবাপদর প্রবল ব্যক্তিত্বকে । কেবল ব্যবসাগত জটিলতা নয়, মানসিক জটিলতাও ধীরাপদ লক্ষ্য কবেছে, তবু নিজেকি নির্লিপ্ত রাখতে চেয়েছে । ফ্যাক্টবির দশম বার্ষিক অধিবেশনে ম্যানেজিং ডিবেক্টব যে ভাষণ দিলেন তাতে আদর্শ বাণিজ্য-স্বপ্নটি বিস্তাবিত বর্ণিত । এই ভাষণ ধীবাপদব লেখা, অনেক ভাষণ আর বিবৃতি তাকে লিখে দিতে হয়েছে । ধীবাপদর যুক্তিনির্ভব বক্তব্য বিভিন্ন সময়ে হিমাংশু

মিত্র, অমিতাভ ঘোষ, ডা. লাবণ্য সরকার অগ্রাহ্য করতে পাবেন নি । চারুদির পবিচারিকা পার্বতী আর স্ট্রিট-ওয়াকার কাঞ্চন ধীরাপদকে বিচলিত করতে পারে নি । চারুদি আর হিমাংশু মিত্র, পার্টনার আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর পর্যন্ত অনুভব করেছেন ধীরাপদব ব্যক্তিত্ব । সে কোনো অন্যায় ও প্রলোভন, ইতবতা বা বিদ্রূপে বিচলিত হয়নি । কোম্পানির ভিতবকার গোলমালে ধীরাপদ জড়িত থাকতে চায়নি, তবু তারই দিকে অভিযোগের অঙ্গুলি-নির্দেশ কবেছেন অমিতাভ ঘোষ, সিতাংশু মিত্র আর ডা লাবণ্য সরকার। বডসাহেবের পারিবারিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারে ধীরাপদর কাজেব বিরুদ্ধে লাবণ্যের তীব্র তীক্ষ্ণ অভিযোগ বর্ষিত হয়েছে । এইবার ধীবাপদ প্রত্যাঘাত কবেছে । জানিয়েছে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া— কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্তে সে দু'নৌকায় পা দিয়ে চলে নি—এই বক্তব্য উচ্চারণ করতে গিযে ধীরাপদ আত্মবিস্মৃত হযে উঠে লাব্যণ্যের দু কাঁধ দু হাতে জোরে চেপে ধরেছে, স্পষ্ট ভাষায বলেছে —'আমাব জন্য কাউকে জেলে যেতে হয়নি, কারো বউকে আত্মহত্যা কবতে হয়নি ।' ধীরাপদ এখানেই থামেনি, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছে—'তোমার জন্যে তিলে তিলে নিজেকে আমি হত্যা করেছি । করছি । অধঃপতনের তলায এসে ঠেকেছি ।' আরো বলতে যাচ্ছিল—'শুধু নিজেব স্বার্থে তৃষ্ণাব জল দেখিযে ঘুবে বেডায় লাবণ্য ; সে পুরুষের এই ক্ষতি কেমন করে বুঝবে ?' কিন্তু সে কথা বলা হল না, বরং দুহাতে এক রমণী-দেহকে নির্মমভাবে পেষণ করেছে, আরো কাছে এসেছে, আলোব সুইচ বন্ধ করে দিয়েছে । "অন্ধকার । অশান্ত নির্দয় দুই বাহুবেষ্টনে বন্দিনীর সমর্পণঘন বিপুল বিভ্রম ।"

এবপর ধীরাপদর কাছে লাবণ্যেব সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনই ছিল প্রত্যাশিত । কিন্তু তা হয়নি । উল্টে লাবণ্য তাকে নীচ, হীন, ষডযন্ত্রকারী বলেছে । ধীরাপদ সিদ্ধান্ত নেয়—এই প্রতিষ্ঠান থেকে সে স্বেচ্ছাবিদায় নেবে । লাবণ্যের কাছে সে তস্কর নয়, দস্যু । এই পরিচয়ই থাক— ধীবাপদ বিদায়গ্রহণের জন্যে তৈরি । কিন্তু না, তার যাওয়া হল না । যাবার পূর্বে শেষ চিঠিতে ধীরাপদ লিখে যায়—"এই কালটাই তো অন্ধকার গোলকধাঁধারমধ্যে পড়ে আলেযার হাতছানি সম্বল করে পথ খুঁজে মরছে । আমরা এর থেকে বিচ্ছিন্ন হব কেমন করে ? কাল যদি আলেয়া, আশা করতে দোষ কি আমারও এই দিন জাগা রাত জাগা লেখনীর কথাগুলো থেকে যাবে ।...... আমি পালিয়ে এসেছি । কিন্তু পালিয়ে যাব কোথায় ? নিজের কাছ থেকে পালাব কেমন করে । এই নিটোল স্তব্ধ রাতে আমার মনে হচ্ছে, ওই আলেয়ার উৎসবের তলায় তলায় একটা পালানোর কান্নাও থিতিয়ে উঠেছে, পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে ।" বিনিদ্র রজনীতে লেখা এই চিঠিতে ধীরাপদর শেষ কথা—কোন অনন্তকালের এক মহামৌনী সাগ্নিক বসে আছেন । মন বলছে এঁর কাছেই মন্ত্র নিতে হবে । তোমাকে আমাকে সকলকে । সেই মন্ত্রে মুক্তি । তাঁর আলোয় এই আলেয়ার অভিশাপ ঘুচবে । যোগভ্রষ্ট কর্মের শিকল ভাঙবে ।"

মানুষের জীবনে জটিলতার কোনো শেষ নেই, কিন্তু তার মুক্তি-সন্ধানেরও শেষ নেই : এই বক্তব্য 'কাল তুমি আলেয়া' উপন্যাসে শেষপর্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে । বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে এলো লাবণ্য । এই সকালে এক আনন্দ-প্রতিমা হয়ে দেখা ছিলো লাবণ্য । সে ধীরাপদকে সকল কাজে অংশীদার করে নিতে চায়, তার ব্যক্তিজীবনেও ধীরাপদ তাকিয়ে তাকিয়ে লাবণ্যকেই দেখল । আবারও তার মনে হল, এই কাল আলেয়া ।

উপন্যাসের শেষে এই বক্তব্যে লেখক আধুনিক জীবনের সকল জটিলতা থেকে মুক্তি পথনির্দেশ করেছেন। অনেক ঘটনা ও বিশ্লেষণের ভিড় ঠেলে ধৈর্য ধরে যদি পাঠক অগ্রসর হতে পারেন, তবে তিনি ঠকবেন না। কাবণ, আশা ও আনন্দের এক জগতের সব লেখক তার সামনে খুলে ধরেছেন।

॥ ৫ ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রধান উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে বারবার মনে পড়ে যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার পংক্তি—'মত্ততা ছেড়ে মনের গভীরে এসো না/নেশা নয়, থাক পরম পাওয়ার এষণা।/চারা পোঁতাটাই নয়ক' আসল সত্য,/আছে কিনা দেখ হৃদয়ের আনুগত্য।' ('সাগর থেকে ফেরা')

এই পরম পাওয়ার সত্য জীবন-সন্ধানী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ত অস্থির করে রেখেছে। মানবমনের জটিলতা-সন্ধানে তাঁর যেমন আগ্রহ, জীবনের বৈচিত্র্য সন্ধানে তেমনি আকর্ষণ। জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রকে তিনি খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, জীবিকা ও বৃত্তির নানা রূপ তন্ন তন্ন করে দেখেছেন। তারপর তাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছেন মানুষকে। তিনি জানেন, মানুষ ইচ্ছে করলেই রুদ্রের প্রসন্নতা পায় না, তা পেতে গেলে জীবন দিয়ে তার দাম দিতে হয়। তাঁর প্রধান উপন্যাসসমূহ তাব পরিচায়ক।

জীবনে বৈচিত্র্যর সন্ধান আর পরমের সন্ধান—একই সঙ্গে দুটি ধারা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রধান প্রধান উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়।

'নগর পারে রূপনগব' (১৯৬৭) এই দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস। এই উপন্যাস 'ব্যক্তি'র সংকীর্ণতাব দুর্গে আবদ্ধ নয়, আত্মানুসন্ধানের বৃহত্তব শুভবোধের আবেদন; অস্বাভাবিকতা নয়, সুস্থতা; অভিশপ্ত অস্তিত্ব নয়, সার্থক অস্তিত্ব এই উপন্যাসেব আবিষ্ট। পরিচিত সংসার, কর্মক্ষেত্র, লোভ, লালসা, অভিমান, ঈর্ষা, মাৎসর্য ও বিদ্বেষ-জর্জবিত নগর পেরিয়ে এক অ-সাধাবণ রূপনগর-সন্ধানের কাহিনী এই উপন্যাস। এক অমেয় বিশ্বাসে, গভীর সুস্থ জীবনবোধে লেখক আমাদেরকে ফেরাতে চেয়েছেন। লেখক তিন পুরুষের (সুরেশ্বব, শিবেশ্বব, সাত্যকি) কাহিনী লিখেছেন। চাটুজ্জেবংশেব সূচনা থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত (১৮১৭-১৯৬৭) কাহিনীর দীর্ঘ বিস্তার। জ্যোতিরানী-শিবেশ্বরের অসুখী দাম্পত্য জীবনের তীব্র তিক্ত সংঘর্ষ, তাবই মাঝে তাদের পুত্র সাত্যকির জীবনে অস্বাভাবিকতা ও বিপর্যয় এ উপন্যাসেব শেষকথা নয়। শিবেশ্বরেব আর্থিক সাফল্য, দম্ভ, নিষ্ঠুর পীড়ন শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়নি, জ্যোতিরানী আর সাত্যকির আনন্দের সন্ধানই জয়ী হয়েছে। চাটুজ্জেবংশের ধ্রুবতারা প্রভুজী। তিনি কে? এ-বংশের প্রথম পূর্বপুরুষ মানিকরাম তাঁর ঈশ্বরকে ডাকতেন, প্রভুজী। তাঁর সন্ধানে মানিকরামের গৃহত্যাগ ও ফেরার সংকল্প। জ্যোতিরানী বিশ্বাস করে প্রভুজীকে। বাস্তব বিশ্বাস নয়, অলৌকিক বিশ্বাস। জ্যোতিরানী জেনেছেন—আনন্দ থেকেই সব-কিছুর জন্ম। আর তপস্যা দুঃখ থেকে সব কিছুর দৃষ্টি। সুখের সাধনাব থেকে দুঃখের সাধনাও কম নয়। সাত্যকিকে জানতে হয়েছে, ধৈর্যশূন্য তেজ শুধু দম্ভায়, বুদ্ধিশূন্য পৌরুষের নাম অত্যাচার আর বিনয়শূন্য সামর্থ্যের নাম দাম্ভিকতা। এই পরম সত্যের উপলব্ধি যেদিন হয়েছে, সেদিন সাত্যকি (সতু) ফিরেছে তার মায়ের

কাছে, তার প্রণয়িনীর (শমী) কাছে । আমাদের পবিচিত 'নগরেব বিপর্যস্ত' মূল্যবোধেব পটভূমিতে এই আলোব সন্ধান । 'রূপনগরে'ব শুভ মূল্যবোধেব এষণাব বিচিত্রকাহিনী 'নগব পাবে রূপনগর' । উত্তবণের অভীপ্সা এ-উপন্যাসেব মূল ; বিশ্বাসে প্রত্যাবর্তন শেষ কথা ।

অপব প্রধান উপন্যাস 'সোনাব হবিণ নেই' (১৯৭৮-৭৯) 'নগব পারে রূপনগর' উপন্যাসেব উচ্চতাব উপনীত হতে না পাবলেও সন্ধানের কাহিনী এখানেও আছে ।

উপন্যাসের নায়ক বাপী তবফদাব সন্ধান কবেছে মানুষের সার্থকতা, জানতে চেয়েছে 'আগে বাঢো' কথাটাব সত্য অর্থ কী । একালের মানুষেব অর্থলিপ্সা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, সে-সম্পর্কে বাপীব অন্বেষণ-কাহিনী এই উপন্যাসকে জুড়ে আছে । লেখকেব বাল্যজীবনেব পটভূমি উত্তববঙ্গেব চা-বাগান এখানে ব্যাপক জায়গা জুড়েছে । বানাবজুলি চা-বাগানেব কেবানিবাবুব ছেলে বাপী বাগানেব বড সাহেবেব মেয়ে মিষ্টিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, তাকে ধরতে চেয়েছিলো, এবং তাব অনিবার্য ফল—তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হয়েছিলো । প্রহাব সে জর্জবিত হয়েছিল । তাবপব থেকেই বাপীর কামনা—সোনাব হবিণ চাই, চাই প্রচুর অর্থ, প্রতিপত্তি । আট বছবে চেষ্টায় তা সে পেবেছে, কিন্তু মিষ্টিকে কি তাব পাওয়া হয়েছে ? কলকাতায় এসেছে বাপী, শেষ পর্যন্ত মিষ্টি তাব করাযত্ত । আর তখনি তাব মনে হয়েছে, এভাবে জেতা যায় না । সম্পদেব প্রতাপেব লোভ দেখিয়ে মিষ্টিকে আব মদ খাইয়ে তাব হতভাগা স্বামীটিকে কব্জা কবাটা সত্যিকাবের জয় নয় । সেদিনেব চা-বাগানেব দশ বছবের মিষ্টি আব কলকাতাব কলেজে-পড়া আঠারো বছবেব সুন্দবী তরুণী মালবিকা নন্দী যেমন এক নয়, সেদিনেব চোদ্দ বছবেব বাপী আব আজকেব বাইশ বছবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী যুবক বাপী তরফদাবও এক নয় । তবু সেই ফেলে আসা দিনেব বানারজুলিব বাপীকে ভোলা কঠিন, তরুণী মালবিকাব এই স্বীকৃতি বাপীকে নতুন করে ব্যাকুল কবে তোলে । "চৌদ্দ বছব বয়সেব সেই প্রবৃত্তিব আগুন বাইশ বছবেব দেহেব শিবায় শিবায় দাউ দাউ কবে জ্বলছিল । ইতোমধ্যে বাপীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে তিন নাবী —বতন বণিকেব বউ কমলা, মণিদার বউ গৌবী বউদি, বডবাবু মন্মথ সোমেব মেয়ে উষা । তবু মিষ্টিকে তাব চাই । এই চাওয়াব তীব্রতা ফিবে পাওয়াব প্রয়াস শেষপর্যন্ত বাপীকে কোথায় নিয়ে গেল ? মিষ্টির প্রত্যাখ্যান তাকে আরও বেশি জেদী কবেছে । বাপী নিজেকে দিয়ে জেনেছে —"একই আধাবে অবুঝ লুব্ধ জানোয়াব আর মানুষ পাশাপাশি বাস কবে ।" তাই সে কমলাকে নিষ্ঠুরভাবে ভোগ করে এবং ছেড়ে যায় । এ-দুয়েব সহাবস্থান সম্ভব কেমন কবে হয়—এ প্রশ্নেব উত্তর তাব জানা নেই । প্রত্যাখ্যাত বাপী কলকাতা থেকে ফিরে যায় বানাবজুলিতে । দুবছর পবে আবাব ফিরে আসে, শেষ-পর্যন্ত মিষ্টি তার কবায়ত্তা । বিবাহভঙ্গ করে মিষ্টি তাকেই বিবাহ করে । ইতোমধ্যে জঙ্গল পেরিয়ে এসেছে আরও দুটি মেয়েব প্রলোভন । ঊর্মিলা বাই আর রেশমাব আমন্ত্রণ সে প্রত্যাখ্যান কবেছে । পাহাড়ী জঙ্গলে ঘোবাব সময় বাপীব সঙ্গে দেখা হয়েছিল উলঙ্গ জটাজুট-সমন্বিত ত্রিশূলধাবীর । 'আগে বাঢ় । মিল যায়গা ।' সাধুর এই কথায় বাপী চমকে উঠল । বাববাব এই চারটি শব্দ বাপীকে ঠেলা দেয় । এখানেই বাপীব জীবনে পালাবদলেব সূচনা । সামনে এগোও, পেয়ে যাবে । সে কী পাবে ? শেষপর্যন্ত বাপী জেনেছে, সে পাবে আত্মশুদ্ধি আব সত্য । দ্বিতীয় খণ্ডেব শেষে বাপীব জীবনলীলাব আর অন্বেষণেব সমাপ্তি । বাপী শেষপর্যন্ত সত্যের মুখোমুখি—তলিয়ে

যেতে বাপীর মনে উঠল ঢেউ—"তার কি বসে থাকার জোব আছে......খুঁজতে হবে না ? সামনে এগোতে হবে না ? পেতে হবে না ? টাকার পাহাড়ে, সোনার পাহাডেব পর আব কি কোনো ঐশ্বর্য নেই নাকি ? সেই সোনাব হবিণ চাও তো ভিতবে খোঁজো । তা বাইরে কোথাও নেই ।'

।। ৬ ।।

লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ পর্যাযেব উপন্যাসেব মধ্যে উল্লেখ্য দুটি উপন্যাস —'শতরূপে দেখা' (১৯৭১) আর 'পবকপালে রাজাবানী' (১৯৮৯) । দুটিতেই পাই একালের চোখে পুরনো কালের বিশ্বাস-অবিশ্বাসেব কাহিনী ।

প্রথমটি 'শতরূপে দেখা' । একালের চোখে সেকালের মানুষদেব জীবনলীলা-দেখা । একালের মানুষ বসন্ত ঘোষাল ফিরে যাচ্ছেন তাঁব গ্রামে, তাঁর না-দেখা পূর্বপুরুষদেব অতীত কাহিনীতে । তাঁর দাদুর জবানিতে ব্যক্ত সারা কাহিনী । কাহিনীটা বসন্ত ঘোষালেব মা'কে নিযেই । মুখে আর চিঠিতে শতবার তাঁর দাদু তার মাযেব কথা বলেছেন ।

গ্রামের এক টেবে সাধিকা ক্ষমাযোগিনীব আশ্রম । সাবা গাঁয়ে ঘোষালবংশেব দোর্দণ্ড প্রতাপ । মহেশ্বব দত্ত ক্ষমাযোগিনীর প্রিয় পাত্রীক পুত্রবধূ কবে ঘবে নিতে যান । সেই মেযে এই কাহিনীর নায়িকা—চণ্ডী-বউ । ক্ষমাযোগিনী দাপটের মানুষ দত্তকে জানিযেছেন—তোমাদের বউ-ভাগ্য ভালো । মেয়েটা ভালো । তবে মেযেটাব ভাগ্য ভালো কিনা বুঝছি না । যাকে আনছ তাকে ভালো রেখো । চণ্ডীর কোপে পড়লে ক্ষতি হতে পাবে ।

ক্ষমাযোগিনী যখন দত্তকে শুধিয়েছেন, তোমার ওই ছেলেরই একটা বউ মবেছে কিনা ? এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নে দত্ত বিড়ম্বিত, কিছুটা-অনুতপ্ত । তবু তিনি দ্বিতীয় পুত্রবধূ আনতে চান । মেয়েটির নাম চণ্ডী । মহেশ্বব দত্তের পুত্র বাধানাথ গ্রামের যাবতীয কুকর্মেব পাণ্ডা, মদ্যপ ও মনেপ্রাণে ইতব । মহাচণ্ডীব থানে ছাগ-বলি আব বক্ত দেখে দত্তবাড়িব চণ্ডীবউ ভিবমি খেয়েছিল । পড়ে যাবার আগেই ধবে ফেলেছিল ঘোষালবাড়ির ছেলে মদনমোহন ঘোষাল । এই সংবাদে ক্ষিপ্ত রাধানাথ দত্ত । এই প্রথম মদন ঘোষাল চণ্ডীবউকে দেখল, জ্ঞান ফিরে পেয়ে চণ্ডীও তাকে দেখল । এখানেই কাহিনীব সূত্রপাত । তারপর গ্রামে ঘটেছে অনেক ঘটনা, নদীতে জল অনেক গড়িয়েছে । দত্তবাড়ি আর ঘোষাল বাড়ির শত্রুতায় সারা গ্রাম দুভাগে বিভক্ত । শেষে রাধানাথের মৃত্যু, আর ক্ষমাযোগিনীর আদেশের চণ্ডীবউর মদনমোহন ঘোষালকে বিবাহ । এ বিবাহের সংঘটন ও সম্প্রদানের কৃতিত্ব একমাত্র ক্ষমাযোগিনীর প্রাপ্য । এ বিবাহেব ফল বসন্ত ঘোষাল, যেন দাদুর কাছে পুরনোদিনের কাহিনী শুনেছে । অনেক ঘটনা—লৌকিক আর অলৌকিক মিশিয়ে ঠাস-বুনটে তৈরি এই উপন্যাসের পটভূমি । কীভাবে শেষপর্যন্ত চণ্ডীবউ আর মদন ঘোষালের মিলন হল, তারই উদ্দীপক কাহিনী 'শতরূপে দেখা' । সন্দেহ নেই, নারীপ্রতিমার শতরূপ চণ্ডীবউর জীবনেই দেখা গিয়েছে । দাদুর কাছ থেকে বসন্ত ঘোষাল সবিস্তারে তা শুনেছেন । মদ্যপ কুক্রিয়াসক্ত স্বামী রাধানাথের সাথে চণ্ডীবউর কোনো মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি । অথচ গোড়া থেকেই চণ্ডীবউ মদন ঘোষালের প্রতি ঝুঁকেছে—একথা আদৌ সত্য নয় । দাসী মানদার মুখে শুনেছে, ওই লোক মহাচণ্ডীর থানে মাথা খুঁড়ছে, ডুবে মরার মতলবে মরা চূর্ণির ধারে বসে থেকেছে, অনুশোচনায় তিন

দিন তিন রাত জলস্পর্শ করে নি, সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত জলস্পর্শ করবে না—এসবের একটা কথাও বিশ্বাস করেনি চণ্ডীবউ। চন্দনেব ফোঁটা-পবা, মাথায় ওড়না-টানা মানুষটার সেই নিষ্পলক আয়ত চোখের দৃষ্টি মন থেকে তাড়ানো শক্ত। যতবাব মনে পড়েছে এর পব, ততবাব রাগ হয়ছে, আবার সে বাগেব মুখেও চণ্ডীবউ না হেসে পারেনি। চণ্ডী শুনেছে, সাবা বাত তাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে পায়চাবি করে মদন ঘোষাল। অতি ভোরে উঠে চণ্ডী খিড়কিব দবজা খুলে আমবাগান পেরিয়ে পথে এসে দাঁড়িযেছে। দেখল, নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ঘোষালবাড়ির মদনমোহন। তাব দিকে চণ্ডী নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। মদনমোহনও তাকিযে আছে। চণ্ডীবউযেব ঠাণ্ডা চোখে নীবব ভর্ৎসনা। নিষেধ! ফিরে এলো। তবু ত অস্বস্তি যায না, মদন ঘোষালেব উপব ক্রোধ হয় না। চণ্ডীবউ মনে মনে চিন্তা কবল. তাবপব সত্যি সত্যি বিষম ক্রুদ্ধ হল। এই বাগ নিজেব ওপর, কি বাইরে যে দাঁড়িয়ে তাব উপর। সেটা নিজেও জানে না।

এই জানা-না-জানা, বিস্ময-ক্রোধ, কৌতূহল-বিবক্তি পেবিযে চণ্ডীবউ শেষপর্যন্ত আব 'না' বলতে পাবেনি। ক্ষমাযোগিনীব আশ্রমে পরসন্ধ্যায পৌছায়। সেখানেই বোঝাপড়া হবে। তাব আব হল কই? ক্ষমাযোগিনী দুজনকে পাশাপাশি বসিযে বিবাহ দিয়ে দিলেন। মদনমোহনেব প্রতীক্ষা শেষ হল, চণ্ডীবউর শংকা আব কৌতূহল শেষ হল। মদনমোহনের আলিঙ্গনে আবদ্ধা চণ্ডীর মনে হল—"এই প্রথম যেন......এই প্রথমই বটে, পুরুষেব নিবিড় স্পর্শে সমর্পিতা কুমাবীব থবথব শিহবণ।" এই মিলনের ফল বসন্ত ঘোষাল। অনেকবারের বিলেত-জর্মানি-ফেরত এঞ্জিনীযাব বসন্ত ঘোষাল তাব মায়ের গ্রামকে আদর্শগ্রামে পরিণত কবাব সংকল্প নিযে বারবার গ্রামে ফিবে আসছে। তাব কানে বাজছে দাদুব কণ্ঠস্বর—"লক্ষ কথাব বুনটে তোমাব রূপসী মাকে তোমাব চোখেব সামনে হাজির কবতে চেষ্টা করেছি। তুমি দেখতে পাওনি। একদিন দেখতে পাবে। যেদিন আদর্শ গ্রাম তৈবি শেষ হবে সেদিন রূপসী মাকে দেখতে পাবে।" এই আশ্বাসে উপন্যাসের সমাপ্তি।

সংশযীব পক্ষে বলা মুশকিল, একালেব পাঠক এই লৌকিক-অলৌকিকে-মেশানো কাহিনীকে গ্রহণ করবে কিনা। কিন্তু বারো বছরে অষ্টম মুদ্রণ প্রমাণ করে, একালেব পাঠক এই উপন্যাসকে প্রত্যাখ্যান কবেনি।

লেখকের জীবিতকাল প্রকাশিত শেষ উপন্যাস 'পরকপালে রাজারানী' (১৯৮৯)। এতেও লৌকিক-অলৌকিকেব মেশামেশি আছে, সেই সঙ্গে আছে প্রাচুর্যেব শুদ্ধতা অন্বেষণেব কাহিনী, যা আশুতোষ মুখোপাধ্যাযেব সব উপন্যাসে অন্যতম স্থায়ী উপাদান। এই উপন্যাস জুড়ে আছেন বিখ্যাত সাধক বালানন্দ ব্রহ্মচারীজি। তিনি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'মালিকানার বোধটা মন থেকে বদলে দাও, 'সব মেরা'র জায়গায় কেবল ভাবো 'সব তেরা'—এই 'তেরা' হলেন ঈশ্বর, সব তাঁর এটুকু মনেপ্রাণে জেনে, তুমি শুধু তাঁর জিম্মাদার হয়ে বসে থাকো।' রাজেন্দ্রনারায়ণ বসুচৌধুরী সেখানে বসে শুনেছিলেন এই কথোপকথন। পরদিন ফের গিয়েছিলেন বালানন্দ ব্রহ্মচাবীব কাছে। সাধক তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার অনেক ভোগ আছে। উপরে বিশ্বাস রাখো, মনটাকে ছটফট করতে দিও না।' সাধকের এই উক্তি রাজেন্দ্রনারায়ণকে টলিয়ে দিয়েছিল। ভগ্নিপতি ভবানীচরণের হাতে জমিদারি সঁপে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। কোনও ছেলে বাঁচে না। শেষ সন্তান রাজাকে

বাঁচাবেন কী করে ? ব্রহ্মচারীজি বিধান দিলেন, 'ছেলেকে পরকপালে করে দে, বউয়ের ভাগ্যের জোরে বাঁচবে ।' শেষপর্যন্ত তা-ই হল । রাজার বাল্যবিবাহ হল সাত বছরের মেয়ে সুধা ঘোষচৌধুরীর সঙ্গে । সুধারানী, সংক্ষেপে রানী । বালানন্দ ব্রহ্মচারীজি এই কন্যা অনুমোদন করলেন । এখানেই প্রথম খণ্ডের শেষ, শুরু হল একালের আখ্যান ।

এই উপন্যাসের রাজারানী রূপকথার রাজা রানী নয় । এই রানী নতুন কালের নারী, যে তার স্বাধিকার বোঝে, আপন দাবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত, চেতনায় উজ্জীবিত । দ্বিতীয় খণ্ডে তারই কাহিনী । প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডেও বালানন্দ ব্রহ্মচারীর অলক্ষ্য প্রভাব পরিব্যাপ্ত । রানী মনে মনে স্বীকার করে, দেওঘরের গুরুদেব ব্রহ্মচারীজি তাকে মহাপাতক থেকে বাঁচিয়েছেন । আর যেদিন সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হল, ব্রহ্মচাবীজি অপ্রকট হয়েছেন, সেদিন রানী চিত্রার্পিতের মতো বসেছিল । শাশুড়ির সঙ্গে রানীর বিরোধ দিনে দিনে তীব্র হয় । কারণ, সাবিত্রীদেবী পুত্রবধূকে কড়া শাসন করেন । রানী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যায় । কিন্তু ব্রহ্মচারীজিকে ছাড়ে না, তাঁর ছবি তার সঙ্গী । কীভাবে সাবিত্রী বসুচৌধুরানী আর বানীর মিলন হল, স্বামী রাজাকে রানী ফিরে পেল, তারই আবেগমথিত কাহিনীতে উপন্যাসের সমাপ্তি । শাশুডির কঠোরতা বাইরের, ভিতরে আছে মমতাময়ী মা, এই উপলব্ধিতে রানীর বিজয় । মানুষের শুদ্ধতা অন্বেষণের এক আন্তরিক কাহিনী হয়ে উঠেছে এই উপন্যাস । স্বীকার্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কোনো-না-কোনো ভাবে পরমেব অন্বেষণ করা হয়েছে ।

॥ ৭ ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে সন্ধান করেন জীবনের বৈচিত্র্য, অন্বেষণে যান মনের গভীরে । এই বক্তব্য কেবল 'মেজর' উপন্যাস সম্পর্কে বলবৎ নয়, 'মাইনব' উপন্যাস সম্পর্কেও প্রযোজ্য ।

যেমন 'শিলাপটে লেখা' । বিহারের রাজমহল থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের রাজগড় পর্যন্ত আকাশে হেলান দিয়ে আছে পাহাড়ের পর পাহাড় । এই সব পাহাড় বাইবে থেকে ঠিক বোঝা যায় না । যতটা দৃশ্য তার চেয়ে অনেক বেশি অদৃশ্য । বাঙালি অবাঙালি মালিকরা একটি বা দুটি পাহাড়, ইজাবা নিয়ে বিস্ফোবণের সাহায্যে পাথর ফাটিয়ে ও খুঁড়ে খুঁড়ে ক্রমশ নীচের দিকে নামার পথ তৈরি হয় । সেখান থেকে তোলা হয় পাথরের বড় বড় চাঙড় । এর ফলে যে পাতাল-গহ্বর সৃষ্টি হয়, তার নাম খাদান । একশ-দেড়শ ফুট গভীর থেকে তুলে আনা হয় পাথর, তারপর নানা আকারে ভাঙা হয়, চালান যায় শহরে বন্দরে নগরে । ইজাবা নিতে হলে দিতে হয় খাজনা আর সেলামি জমিদার ও সরকারকে । এমনি এক পাহাড়ের মালিক কড়িবাবু । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাতারাতি লাল হয়ে গিয়েছিল এইসব মালিক । তারপর দেশ স্বাধীন হল, পাথরকুচির প্রয়োজন বাড়ল । পাহাড়ের পর পাহাড় ইজারা-বাঁধা পডল । এলো আধুনিক যন্ত্র—ক্রাশার । গাঁয়ে গাঁয়ে ছুটোছুটি শুরু হল—মজুর চাই, মজুরনী চাই । কোয়ারীতে কাজ চলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত । মালিক কড়িবাবুর প্রধান সহায়ক তাঁর ম্যানেজার বিনয়েন্দ্র । তরুণ উৎসাহী যুবক । দায়িত্বশীল । বুদ্ধিমান । কর্মতৎপর । কড়িবাবু তাকে নিয়ে এই বিপুল উদ্যোগ সামলাতেন । তাকে ঠিক ম্যানজার

মনে হয় না, সেই যেন মালিক । কড়িবাবুর কেউ নেই, বিনয়েন্দ্ররও কেউ নেই । এমন সময়, ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব হল একটি দলের । কড়িবাবুর স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা । কতদিন আগে কড়িবাবু তাদের ছেড়ে চলে এসেছিলেন । সে অন্য গল্প । কিন্তু আজ তারা এসে পড়েছে এবং থেকে যাবে বলে মনে হচ্ছে । ধীরে ধীরে কড়িবাবু আর তাঁর ম্যানেজারের সঙ্গে এদের লাগল সংঘাত । বড় ছেলে ব্যবসার সব কর্তৃত্ব নিজের হাতে চায় । তাতে কড়িবাবুর স্ত্রীর সমর্থন আছে । ছোট ছেলে চায় টাকা, বিলেত যাবে ব্যারিস্টার হতে । তরুণী জয়ন্তীদের কলকাতা ফিরে হস্টেলে থেকে বি.এ. পড়তে চায় । কড়িবাবু ও বিনয়েন্দ্রর অস্বস্তি বাড়ে । কর্মধারা সব উলট-পালট হয়ে যেতে লাগায় । বিনয়-এর অস্বস্তি বাড়ে । কড়িবাবু এতদিন বাদে আসা স্ত্রীপুত্রদের ব্যবহার উত্যক্ত হয়ে ওঠেন । শেষ পর্যন্ত দুই ছেলে সরে যায়, জয়ন্তীর কলকাতায় ফিরে গিয়ে ফের পড়ার ছেদ পড়ে । কড়িবাবুর ব্যবসায়ে হাত মেলায় বিনয়েন্দ্র আর জয়ন্তী । এ দুজনের ভালবাসা অব্যক্ত, নিরুচ্চার । সংঘাতের ও সাহায্যের পথে তারা কাছিকাছি এসে যায় । পরস্পরকে গ্রহণ করে, কড়িবাবুর সব দায়িত্ব তুলে নেয় নিজেদের হাতে ।

'শিলাপটে লেখা' উপন্যাস পাহাড় খাদান-ব্লাস্টিং-ওয়াগন-লোডিং-লেবার প্রব্লেমের পটভূমিতে জীবনের এক বিচিত্র রূপ দেখিয়েছেন । এসব বিষয়ে তাঁর প্রস্তুতি একেবারে নিখুঁত প্রেক্ষাপট ও রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে সবকিছু জেনেই লেখক তাঁর নতুন ক্ষেত্রে পৌঁছে যান । কর্তব্য-সততা-নিষ্ঠা-প্রবৃত্তির ঝড়-রক্তের উন্মাদনা : নানা বাধার মধ্য দিয়ে তিনি অন্বেষণ করেন খাঁটি মানুষ । তেমন কাজের নমুনা আর-একটি 'মাইনর' নভেল 'রাগশর' । এটি দাঁড়িয়ে আছে সংগীত শাস্ত্রের ভিত্তির উপরে । তা নিয়ে লেখকের অন্বেষণ, অধ্যয়ন আর আগ্রহ প্রায় সীমাহীন । একটি বিশ্বাস্য পটভূমিতে লেখক গড়ে তোলেন তাঁর উপন্যাস । অঙ্কুর ওরফে অঙ্কু উপন্যাসের নায়ক । তার ভাগ্যান্বেষণের সঙ্গে করিয়ে আছে সংগীতের প্রবল আসক্তি । বস্তুত মার্গসঙ্গীত-ই তাঁর আশ্রয় । অঙ্কু কীভাবে কতো বাধা-অপমান-লাঞ্ছনা পেরিয়ে সংগীত সাধনার সফল হল, তাতেই নিপুণ আলেখ্য 'রাগশর' । তারাবাঈ, কুন্তীবাঈ —প্রথমজন তাকে তাড়িয়ে দেয়, দ্বিতীয়জন সদয় ব্যবহার করে । অঙ্কু তো তবলাবাদক বা তানপুরা হাতে সহায়ক হতে থাকতে চায় না, সে হতে চায় গায়ক ।

অঙ্কুকে জীবনে বারবার পরীক্ষা দিতে হয় । জয়পুরে খাঁ সাহেবের প্রত্যাখ্যানে সে দমে যায় না । কাশীর মিশিরজীর কাছে তবলা শিখেছিল । খাঁ সাহেবের পদসেবা, গাঁজা সেজে দেওয়া—সবকিছু করেছে, তবু মন পায় নি । কুন্তীবাঈ কিন্তু সদয় হল । 'পড়ি মেরি নাইয়া মাঝধার/আর কওন্ করে সাঁই পার ।' বেহাগের সমস্ত আকুতির রুদ্ধ আবেগটা যেন আজ কপাট খুলে দিয়েছে । অঙ্কু গাইছে, কুন্তীবাঈ শুনছে, তার মনে হচ্ছে বেহাগের জীবন্ত একখানি রিক্ত রূপ দেখছে । এক-একটা লহমায় নিষাদ থেকে মিড় দিয়ে যতবার মূল সুর-বিন্যাসে ফিরে আসছে অঙ্কু, ততবার চোখোচোখি হয়েছে কুন্তীবাঈয়ের সঙ্গে । সুর থেকে গান্ধারে আর পঞ্চম থেকে নিষাদে যাওয়ার বৈচিত্র্যও কানে নতুন লেগেছে তার । এক লহমায় নিষাদ থেকে পঞ্চমে । আর পঞ্চম থেকে কড়ি-মাধ্যমের পথে শুদ্ধ-মধ্যম ছুঁয়ে আবার গান্ধারে এসে দাঁড়িয়েছে অঙ্কু ।

এভাবে অঙ্কু মুগ্ধ করেছে কুন্তীবাঈকে, ভরসা পেয়ে তাকে আর মাঝদরিয়ায় পড়ে

থাকতে হবে না। এই শুরু। ফকির-গুরুর অনুগ্রহ পেয়েছে। প্রেমময়ী অনুর ভালবাসা পেয়েছে। গান আর ভালবাসার দুই জগৎ আজ তার সামনে খোলা। তবু ত শেষ রক্ষা হয় না। সমন্বয় ঘটে না। একটাকে ত ছাড়তেই হয়।

যোগানন্দপুরের আশ্রম তথা সেবা-প্রতিষ্ঠানের রজত-জয়ন্তী উৎসবের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছিল কাহিনী। বিভূতিবাবু আর তনুশ্রী আজ আশ্রমের চালিকা-শক্তি। কিন্তু অঙ্কু কোথায়? পণ্ডিত ভাসের কাছ থেকে অঙ্কু সংগীতসাধনায় যা-কিছু প্রাপ্য সব পেয়েছি। তারপর সব ছেড়ে দেওয়া হয়ে গেছে। পঁচিশ বছর পরে বিভূতি আর অঙ্কুর দেখা হয়েছে। তনুশ্রীর সঙ্গে ভালবাসা থেকে শেষ টান থেকে মুক্তি নিতেই বুঝি-বা এসেছে অঙ্কু। যোগানন্দপুরের জঙ্গলে শোনা যায় দূরশ্রুত কণ্ঠস্বর—'ওঁ সত্যং শান্তং সর্বানন্দং চৈতন্যাভরণং। শিব আত্মা পরমাত্মা অন্তরাত্মা ত্বম। আদি অন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব রজঃ সত্ত্ব তম।' তনুশ্রী তার ঘর থেকে শোনে সেই কণ্ঠস্বর, যা জঙ্গল পেরিয়ে দামোদরের দিকে চলে যাচ্ছে। বুঝি-বা অঙ্কু গোসাঁই মুক্তির পথে চলে যাচ্ছে।

'বাজীকর' উপন্যাসে লেখক উপন্যাসের ক্ষেত্র ও চরিত্র বদলেছেন। অল্পবয়সে যে ছিল গুণময়কিশোর দত্ত, প্রথম যৌবনে গ্রামের বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় এসে সে হয়েছিল গুণীডাটা। অবাঙালি মুসলমান চাঁদ সাহেবের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল কলকাতায়। জীবন সম্পর্কে তার স্বপ্ন আর উচ্চাশা জাগিয়েছিল চাঁদ সাহেব। তারপর একদিন উধাও। দুবছর বাদে বোম্বাই থেকে টেলিগ্রাম—চলে এসো। বোম্বাই এসে পৌঁছবার পর চাঁদ সাহেব তাকে বিলেত যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। য়ুরোপগামী এক জাহাজের কোয়ার্টার মাস্টার সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। জাদু দেখিয়ে তাকে খুশি করে সারা সমুদ্র পথে যাত্রীদের মনোরঞ্জন করে গুণীডাটা য়ুরোপ গিয়েছিল। এখান থেকে গুণীডাটার জাদুকর-জীবন শুরু। অনেক লড়াই করে তাকে ধীরে ধীরে উঠে আসতে হয়েছে। অপেরা হাউস থেকে এডওয়ার্ড উডের 'ম্যাজিয়ুড কোম্পানি'তে ভিড়েছে জুলি স্যাণ্ডারসনের দয়ায়, সাহায্যে। তারপর উড-দম্পতির দলে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারপর ঐ দলের সঙ্গে ছ'বছর পরে বোম্বাই ফিরেছে উড-দম্পতির ম্যাজিয়ুড কোম্পানির সঙ্গে। সঙ্গে আছে জুলি স্যাণ্ডারসন। বোম্বাই নগরকে মুগ্ধ করেছে গুণীডাটা জাদু দেখিয়ে। এবং চাঁদ সাহেবকেও। সেখান থেকে কলকাতা। সঙ্গে জুটেছে চাঁদ সাহেবের কন্যাসমা শিরিন। কলকাতায় এসে ফিরতি-সফরে জাহাজের আলাপী শুভেন্দু নন্দীর বাড়ি গেছে। নন্দী পরিবারে সকলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। বিশেষ করে শ্রাবণীর সঙ্গে। তাদের ম্যাজিক-শো-এ শ্রাবণীদের সকলকে ডেকেছে। এবং শেষ পর্যন্ত গুণীডাটা অধ্যাপিকা শ্রাবণীকে জয় করেছে। তাকে বিবাহ করেছে। দূর প্রাচ্যসফরে বেরিয়েছে ম্যাজিয়ুড কোম্পানি। শ্রাবণী যায় নি। শুনেছে, কোম্পনিতে নতুন তারা হয়ে উঠেছে শিরিন, নাম বদলে ভানুমতী। দূর প্রাচ্য জয় করে ফিরেছে গুণীডাটা। তাদের জীবনে এসেছে সন্তান। ছেলে। সন্তান-সম্ভাবনার কথা যেদিন গুণীডাটা জানল, সেদিন ম্যাজিকের মঞ্চ থেকে শ্রাবণী যেন তাকে বাস্তবের মাটিতে নেমে দাঁড়াতে দেখেছিল। প্রথমে বিমূঢ়, তারপর খুশি। ওই বিমূঢ়তার ফাঁকেই আসল মানুষটাকে দেখে নিয়েছিল শ্রাবণী। তার মনে হয়েছিল, গুণীডাটার পায়ে একটা হ্যাঁচকা শিকলের টান পড়েছে। তারপর খুশি হওয়া উচিত বলে খুশি হয়েছে। তাদের

সন্তানকে ভালবাসে শিরিন, আর শ্রাবণী । কিন্তু বাজীকর ? সে কি ভালবাসে ? গুণীডাটা আবার মদ ধরেছে, ম্যাজিক-শো মাঝেমাঝেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । দূরপ্রাচ্য সফর শেষে যখন ফিরেছে তখন আব উড-দম্পতি নেই, জুলি স্যাণ্ডারসন নেই । উঠে এসেছে শিরিন, এখন সে ভানুমতী । তাকে নিয়েই গুণীডাটা খেলা দেখায় । সর্বোত্তম খেলা ড্রিমগার্ল । সে ভানুমতী । শিরিন কি গুণীডাটার জীবনেও ছায়া ফেলছে ? এই সন্দেহ যখন শ্রাবণীকে কুরে কুরে খাচ্ছে তখনি শিরিনের অন্তর্ধান । দুবছর বাদে জুলীর চিঠি এলো বিলেত থেকে । শিরিন জাদুর খেলা দেখাতে গিয়ে ইচ্ছে কবেই মৃত্যুকে বরণ করেছে ।

তেমনই আবো একটি 'মাইনর' নভেল 'তিনপুরুষ' । কাহিনীর ঘনঘটা পেরিয়ে গেলে আমবা লেখকের জীবন-অন্বেষণের ব্যাকুলতা এখনেও অনুধাবন করতে পারি । একদা বি. টি. রোড থেকে বাহারীগ্রামে আসাব পথে হাতে ভারি সুটকেস ঝুলিয়ে আসছিলেন পঞ্চাশ-ছোঁয়া সোমেশ্বব । শ্যালকেব সামনেই স্ত্রীকে বলেছিলেন, আমি নিজেই এটি বহন করতে পাবছি । আব আবৃত্তি কবেছিলেন—কীটস-এর 'ওড অন এ গ্রীসিয়ান আরন' থেকে—'বোল্ড লাভাব, নেভাব নেভার ক্যামস্ট দাও কিস বাহারী....ফরএভার উইলট দাও লাভ, অ্যানড শী বি ফেয়াব' । সেই গ্রীসীয পাত্রাধাবেব গাযে আঁকাছিল একটি নকশা—প্রেমিকা ছুটছে আর তাকে ধরার জন্য প্রেমিক ধাওযা কবেছে । একথা শুনে একচল্লিশ বছরেব পত্নী বাসন্তী লজ্জা পেযেছিলেন । আর সেই সঙ্গে মেনেছিলেন, বাহারীকে এত ভালো এই গ্রামে আর কেউ বাসে না । সে তো পাঁচ বছরে আগেব কথা । কলেজে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে গ্রামে এসে সোমেশ্বর, বিনা পয়সায গবীবদের চিকিৎসা কবতেন । কেন তা করেন ছেলে ধ্রুবর প্রশ্নেব উত্তরে বলেন—'কামাত্মতা ন প্রশস্তা, ন চৈবেহাস্ত্যকামতা । যদ বুদ্ধি কুরুতে কর্ম, তৎতৎ কামস্য বেষ্টিতম' । কাম অর্থে লোভ । লোভ ভালো নয ঠিকই, কিন্তু জগতে অবিমিশ্র লোভহীনতারই বা অস্তিত্ব কোথায় ? মানুষ স্ববুদ্ধিতে যা কিছু কর্ম করে তার সবই তো কোনো না কোনো লোভের বশে ।

বাপ আর ছেলে, সোমেশ্বর আর ধ্রুব । ছেলে বাপকে বুঝতে চায়, পেরে ওঠে না । তাব বড়দি ছোড়দিব বিয়ে বাবা দেন । কাবও মতামত নেননি । ববাবর নিজ মতে অনড় । আজ ধ্রুবর বিয়েতে তিনি ছেলেব পছন্দকেই মেনে নিলেন । বস্তুত মেনে নিয়েছিলেন দুবছর পূর্বে । তাঁর সম্মতি-পত্র মুখবন্ধকরা খামে ছিল । আজ সেটি ছেলের হাতে তুলে দিলেন —বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে বিধবা হয়েছে, সেই মাধুরীকে ধ্রুবর পত্নী রূপে মেনে নিতে বাপ রাজি । এই চিঠি পড়ে অবাক হযেছে ধ্রুব, ধ্রুবর মা । বাবাকে সত্যি সত্যি ঠিক-ঠিক চিনেছে কিনা এমন সন্দেহ মাঝে মাঝে ধ্রুবর মনে আসে । বিয়ে হয়ে গেছে । বাহারী গ্রাম কোলিয়ারি-এলাকায় । সেখানকার সব লোকের মন জয় করে বসে আছেন সোমেশ্বর । তাঁর সেবা ও আন্তরিকতা ও সদাসাহায্যে তারা মুগ্ধ । সোমেশ্বর গ্রামের লোকেদের বলেন—গাঁয়ের মানুষ খুঁজে বার কর, খনির মানুষ খুঁজে বার কর,—কত লোকের মধ্যে দেবতা বসে আছেন, না জাগালে তিনি জাগেন কি করে ?

এও তো সেই পরমের অন্বেষণ । বস্তুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বারবার এসেছে এই অন্বেষণ—তাকে বলা যায়, পরম সত্য । ধ্রুব তার পিতার কাছে কৃতজ্ঞ । তবু শেষ পর্যন্ত এই সত্যনিষ্ঠ কর্তব্যনিষ্ঠ পিতার সঙ্গেই তার সংঘর্ষ ঘটেছে । গ্রামের নির্যাতিতা

বধ্ শিউলি সোমেশ্বরের আশ্রয় চেয়েছে, আর তা পেয়েছে। কিন্তু এস. ডি. ও. ধ্রুবর তাতে আপত্তি। নষ্টচরিত্র শিউলিকে বাড়ি থেকে বার করে দাও। মার কাছে ধ্রুবর ক্ষুব্ধ নালিশ, বাবা গ্রামের সব লোককে ভালবাসে, আমাকে ছাড়া। সে বাড়ি থেকে স্ত্রীপুত্র নিয়ে চলে আবার সংকল্প ঘোষণা করে। কিন্তু শিউলি নিজেই বলেছে, সে চলে যাবে। এবং পবদিন ভোরে সে উধাও। তিন সপ্তাহ পরে একটা খবর রটল—দূরে অজয়ের ধারে রাতে এক পাগলিনীর হাসি শোনা যায়। এ আর কেউ নয়। শিউলি। সারাজীবন সোমেশ্বর সত্যের জন্যে লড়েছেন। এবার নিজেই কাত। 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহ পরাণি।' এলো মৃত্যু। ধ্রুব পিতার মৃতদেহের পাশে দাঁড়িযে শুনল—'আই ওয়াণ্ট টু বি এ সিম্পল অনারেবল ম্যান।' তার বাবা বারবার এই কথাটাই বলতেন।

।। ৮ ।।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেবল উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের নিয়েই উপন্যাস লেখেননি। ভারতের গ্রামবাসী পশ্চাপদ্ শ্রেণীর মানুষদের কাহিনীও লিখেছেন। যার সূচনা সতীনাথ ভাদুড়ির উপন্যাসে—'ঢোঁড়াই চরিত মানস'এ, তাদের নিয়ে বেশকিছু উপন্যাস বাংলাভাষায় লেখা হযেছে। এখানে একথা স্বীকার্য, জাতপাতের লড়াই ও গরীবদের শোষণ বিহার-উত্তরপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশে, বা দক্ষিণ ভারতে-ওড়িশায় আজও যেভাবে চলে আসছে, তা পশ্চিমবঙ্গে বসে কল্পনাও করা যায় না। মহাশ্বেতা দেবী এদের মধ্যে অনেকদিন কাজ করে আসছেন, তাঁর লেখায় আমরা তার পরিচয় পাই। আশুতোষ মুখোপাধ্যায বিহারের পশ্চাৎপদ দুটি গ্রামের সেই নিপীড়িত লাঞ্ছিত শোষিত এবং ধর্ষিত নরনারীদের নিয়ে সে-রকম একটি উপন্যাস লিখেছেন—'মানুষের দরবারে' (১৯৮৭)। এই উপন্যাস পডলে অনুধাবন করা যায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'দলিত' আর 'বন্ধুয়া' (সারাজীবনের জন্য মালিকের কাছে বিক্রীত) মানুষের জীবনকে স্পর্শ কবতে পেরেছেন। এদের কথা পাই সতীনাথ ভাদুড়ি, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমবেশ বস, প্রফুল্ল রায়, দেবেশ রায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে, এবং অবশ্যই তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যাযেব উপন্যাসে।

গ্রামের প্রবল-প্রতাপ স্বনিযুক্ত মালিক-শাসক ঠাকুর ব্রিজমোহনকে নিয়েই উপন্যাসের সূচনা। এই নিষ্ঠুর লম্পট রইসের মনের চেহারা কী রকম ? লেখকের কথায়—"যারা ভুক্তভোগী তারা জানে কারো সর্বনাশ করবার বা ঘাড় মটকাবার মতলব আঁটলে ঠাকুর ব্রিজমোহনের ঠোঁটের ফাঁকে, গোঁফ জোড়ায় আর চোখের তারায় মোলায়েম্ হাসির ঝলক দেখা যায়, সুখী অমায়িক বচন শোনা যায়। তখন মনে হয় মানুষটার ভিতরে একখানা ছুরির ফলা ঝিকমিক করছে। যার দিকে অমন নজর তার তখন-হৃৎকম্প। জানে মরবে কি ঘর পুড়বে ; কি সুডৌল মেয়ে বা বউয়ের ইজ্জতে টান ধরবে এই আশংকায় কণ্টকিত। ওদের মতো লোকের ঘরে সুঠাম সুশ্রী মেয়ে বউ থাকাটাও অভিশাপ। রাশভারী ভূস্বামী ব্রিজমোহনের কার ওপর নজর লাগল সেটা এক ভুক্তভোগী ছাড়া আর কাক-পক্ষীরও জানার উপায় নেই। তার ভোগের সুড়ঙ্গ-পথ নিশ্ছিদ্র। কিন্তু বশম্বদ ইয়ার-বকশী এমনকি নিজের দামাল ভাইপো বাবুয়ার ভোগের ব্যাপারেও এই ঠাকুর-সাহেব উদাসীন একটুও নয়। তাদের

নজরে পড়লেও জানাজানি কানাকানি না হলে জানোয়ারদের ভোগের আগুনে ইজ্জত আহুতি দিয়ে কেউ নিঃশব্দে ফিরে আসে, মুখ গুঁজে ঘর করে বা ঘরে থাকে । তাদেব মরদরাও বুদ্ধিমানের মতোই মুখে কুলুপ এঁটে থাকে । এটা তারা ওপরওয়ালার মার ভাবে । আরো বড়ো মাব এ-বকম ঘটনায কাউকে নিয়ে নিজেদের মধ্যেই বেশি চেঁচামেচি হৈ-চৈ পড়ে গেলে সেই মেযে বা বউযের আর ঘরে ফেবা হয় না । ভোগেব দরজা দিয়ে বেবিযে সোজা তাকে কোঠে বাড়ি অর্থাৎ পতিতালয়ে চলে যেতে হয ।"

উপন্যাসেব সূচনায এই পটভূমি কাহিনীর মূল সূত্রটা ধরিয়ে দেয । আমবা জানি এই ব্যাপাব আজো ভারতের গ্রামে ঘটছে—বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশায এভাবেই নিপীড়িত হচ্ছে গবীর পুরুষরা আর ধর্ষিত হচ্ছে মেয়েরা ।

বিহারেব অগণ্য গ্রামেব একটি—ছুপা গাঁও । ভোজপুব অঞ্চলের অধীন । লেখক আগাগোড়া প্রযোজনমত নৈপুণ্যেব সঙ্গে ভোজপুরিয়া ভাষা ব্যবহাব করেছেন । তাতে 'স্থানিক বঙ' ফুটে উঠতে সাহায্য হযেছে । ঠাকুর ব্রিজমোহনেব পবিচিত শত্রু তারই ভাগ্নে পবনকুমার, যে ব্রিজমোহনকে নির্বাচনে হারিযে দিয়েছে । ঠাকুব সাহেবেব দ্বিতীয শত্রুর হয়ে গ্রামে নবাগত ড্রিলিং-ইঞ্জিনীযার শাওন ভার্মা । সৎ ও কঠিন, হৃদযবান ও সাহসী শাওন ভার্মাকে ঠাকুব সাহেব কব্জা কবতে পাবে নি । আর পারেনি গ্রামেব এক গরীব যুবতী—নাম তিতলি (প্রজাপতি) । বাসন্তীযা আব বলদেও মল্লা তাব মা আর বাবা । আল্পবয়স থেকে তিতলি মাতৃস্নেহবঞ্চিত । আব দুর্বল বাপকে সে ঘৃণা করে তার ভীরুতাব জন্যে । আকস্মিক পরিচয থেকে পাবস্পবিক মুগ্ধতা থেকে শাওন ভার্মার সঙ্গে তিতলির বিবাহ ঘটেছে অনেক বাধা বিপত্তিব শেষে, ঠাকুব সাহেবের সব চক্রান্ত এরা ব্যর্থ করে দিয়েছে । গ্রামের অন্যতম মাতব্বর কুন্দন সিং-এব শায়িত মৃতদেহের সামনে এসে দাঁড়াল শাওন, তিতলি আব তার বাপ । শেষ দেখা দেখতে এসেছে, গ্রামেব সব মানুষ । উঁচু জাতের নেক নজবের সে সব লোকের হাতে 'ছৌঁড়ী' আব 'বহু'বা নির্যাতিত হয়েছে তারা মতে প্রাণে জেনেছে শাওন ভার্মা তাদের বক্ষা করতে পাবে । তাকে সাহস জুগিয়েছিল তিতলি । একদিন কুন্দন সিং তিতলিকে তিবিশ হাজারে কিনেছিল, কিন্তু তিতলিকে ঘরে আটকে রাখতে পারেনি । তিতলি রাতের আঁধারে শাওন ভার্মাব কাছে থেকে পালিয়ে এসেছিল, শেষপর্যন্ত ভার্মা তাকে বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে । আজ সেই কুন্দন সিং চিবনিদ্রায় শায়িত । তিতলি এসেছে তাকে শেষ প্রণাম জানাতে । তার কারণ বহুযা কুন্দন সিং তার পালক-পিতা । তিতলিকে রক্ষার জন্যই সে তিরিশ হাজাব টাকা দিয়ে কিনেছিল । তিতলি তাঁর চিরশায়িত পালকপিতাব পায়ে শেষবারের মতো প্রণাম জানাল ।

সমবেত জনতাব কাছে কান্না-ভেজা গলায় তিতলি যে-কথা বলেছে সেটাই উপন্যাসের মূলকথা—

**"হমারী অচ্ছুত আওর গরীব মা-বাপুলোগঁন, হমারী অছুত ভাই আওর বহিন,—ম্যায় তিতলি হুঁ । ছুপা গাঁওকি এক অচ্ছুৎ লেড়কি তিতলি ।...ও হমারী পালন-পিতা লোহার গাঁওকি এ হি ঠাকুর কুন্দর সিং সাহাব ! কোই না জানে সমাজক গিধর আওর মগরকা (কুমারী) লোভী কালা হাতোঁসে রখ্সা করকে মহাত্মা ঠাকুর সাহেব এ ব্রাভণ কুমার শাওন ভার্মাকে সাথ হমার সাদী দিহল, নয়ী জিন্দেগী বসাইলঅ—এক অদ্ভুত লেড়কিকা খাতির**

জাত-পাত ছোঁয়া-ছুঁতকা লড়াইমে, সারে অছুত লোগঁনকে জিতাইকে নয়ী জিন্দেগীকা ডাগরোঁয়ামে (পথে) চড়ালি...হমার মা-বাপু-ভাই-বহিন, তো আপন জনমকা কসম খাইকে শপথ লিহ—অছুত লোগঁনকা গরীব লোগঁনকা এ বিজয়-ঝাণ্ডা খাড়া রহে, উঁচা রহে—চাঁদ শূবযোযাকা সাথী হইকে । উঁচা জাতকা গিধর আওব মগরোয়াকা ডরসে লালচোয়ালে এ ঝাণ্ডা কভু না নিচে ঝুঁকে । তোঁহারা শপথ লিহ—ঠাকুর কুন্দর সিং হামলোগঁনকা আন্ধেরি জিন্দেগীমে যো নয়ি দিয়া জ্বলা দিহলঅ, উস বোশনী দিকে দিকে ছোটে । শপথ লিহ, এ রোশনী কভু না বুতে—কোই না বুতায়—কভু না, কভু না ।”

সমবেত উৎপীড়িত নির্যাতিত গবীব ও নিচু জাতেব মানুষদের বুকের তলায় হাজার বছরের অন্ধকাব জীবনে এক বিচিত্র আলোকপাত হয়ে গেল বুঝি । এই আলোর ঘায়ে পালাচ্ছে আঁধারের হিংস্র মানুষরা । পালাচ্ছে ব্রিজমোহন, জনার্দিন পূজাবী, মহাদেও প্রসাদ, জগদেও মিশির, বাবুয়া, আবো অনেকে । নীচু তলার মানুষের জীবনে আজ আলো পড়েছে । যিনি আলো ফেলেছেন, তিনি জীবন-সন্ধানী আশুতোষ মুখোপাধ্যায ।

এই সঙ্গেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আব-একটি উপন্যাস অবশ্যস্মর্তব্য : ‘আনন্দরূপ’ (১৯৭৪) । বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায যেমন নিজের মাকে নিযে লিখেছেন—‘স্বর্গাদপি গবীয়সী’, আশুতোষ তেমনি নিজেব ছেলেকে নিয়ে লিখেছেন ‘আনন্দরূপ’ । আশুতোষের এক কন্যা (সর্বাণী), এক পুত্র (জয়) । এই পুত্রকে নিযেই তাঁর জীবনে ঘনিযে এল এক ট্রাজেডি । জয়েব জন্ম ১৯৬০ সালেব ১৯ ফেব্রুআরি । তার যখন বয়স পাঁচ তখন ধবা পড়ল সে এক দুবাবোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত—ধীব অথচ নিশ্চি গতিতে তাব শবীরেব সব পেশী-তন্তু শুকিযে যাচ্ছে । দীর্ঘ বারো বছব (১৯৬৪-৭৭) পুত্রেব চিকিৎসা করিয়েছেন লেখক, তাকে নিযে সপরিবাবে ঘুবেছেন ভাবতের তীর্থে তীর্থে, কতো সাধুসন্ন্যাসীব কাছে. ধরনা দিযেছেন কতো মন্দিবে যদি কোনো অলৌকিক প্রভাবে ছেলেকে সুস্থ ফিবে পান । কিন্তু কিছুই হল না, সতেবো বছব বয়সে মারা যায় জয় (১৯৭৭) । জয়ের মৃত্যুর তিন বছব পূর্বে আশুতোষ লেখেন ‘আনন্দরূপ’ (১৯৭৪) উপন্যাসটি । এই কাহিনীব পিতা পুত্র আশুতোষ ও তাঁর পুত্র জয় । আর আনন্দরূপ নামে যে সন্ন্যাসী আছেন তাঁকে তিনি দেখেন হরিদ্বারে, কিন্তু উপন্যাসে তাঁকে পেয়েছেন ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে । পিতৃহৃদয়ের মর্মবেদনাতে তিনি সার্থক শিল্পে উন্নীত করেছেন এই উপন্যাসে । (আশুতোষ মুখোপাধ্যাযেব উপন্যাসেব এই আলোচনায় সাহায্য নিয়েছি মৎপ্রণীত ‘কালের প্রতিমা : বাংলায় উপন্যাসের ষাট বছব : ১৯২৩-১৯৮২) (২য় সংকলন ১৯৭৪)

॥ ৯ ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চল্লিশ বছরের সাহিত্যসাধনায় উপন্যাসের সংখ্যা এক শ’র কাছাকাছি ; ছোটগল্পের সংখ্যা দেড় শ’র উপরে । এই গল্পসম্ভার থেকে একটি মাত্র গল্পের আলোচনা করতে চাই । কারণ এটি তাঁর সাহিত্যসাধনার সঙ্গে জড়িত । তাঁর লেখক-জীবনের সূত্রপাতে যে-বাধা উপস্থিত হয়েছিল, তা নিয়েই লিখেছিলেন একটি গল্প—‘প্রথমা’ (‘নবনায়িকা’ গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত) । গোড়ার দিকে লেখা (১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে রচিত) এই গল্পে লেখক নিজের কথাই লিখেছেন । গল্পকথকের স্ত্রী হাসি এই গল্পেব

নায়িকা। যৌথ সংসাব লেখকের দেয় মাসে ৭৫ টাকা। তিনি তা-ই দিয়ে উঠতে পাবেন নি। কারণ গল্প-উপন্যাস লিখে তাঁর আয় যৎসামান্য। সংসারে প্রাপ্য নিত্য গঞ্জনা, শেষপর্যন্ত স্ত্রীও অনুযোগ দিলেন। বহু চেষ্টায় জুটল বিলেতি ল্যাম্প-ফ্যাক্টরিব সেলসম্যানেব চাকরি —মাদ্রাজ ওরফে তামিলনাড়ু রাজ্যে সেলস অর্গানাইজার হয়ে তাঁকে চলে যেতে হবে। বেতন তিন শ টাকা। ঘবের কোণে যে আলমাবিতে তাঁর কাগজপত্র বই পাণ্ডুলিপি থাকে সম্প্রতি তা অবহেলিত, মাদ্রাজ চলে যাবার ক'দিন পূর্বে তাঁর দৃষ্টি পডল আলমারির প্রতি। ওটা ভাগ্নের বাড়িতে চালান কবে দিতে চাইলেন '। তারপব—

"প্রবাসযাত্রার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে ভিতরে একটা শুকনো টান ধরে যাচ্ছে কোথায় অনুভব কবতে পারি। অন্তস্তলে দিনরাত এক নীবব হাহাকার শুনতে পাই। আলোর দাম মুখস্থ করতে গিয়ে অন্ধকার দেখি চোখে। কি যে ঘটে গেল কোথা দিয়ে হুঁশ নেই। সম্বিৎ ফিরতে দেখলাম কাজে ইস্তফা দিয়ে কোম্পানি থেকে বেরিয়ে আসি।"

বাড়ি ফিরে আসতে সকলে মর্মাহত, মা আশ্রয় নিয়েছেন পুজোর ঘরে, বাবার মুখে নেমে এসেছে সংবাদপত্র, দাদারা স্তব্ধ। রাতে শোবার ঘরে স্ত্রী মুখোমুখি। চূড়ান্ত বোঝাপড়ার অপেক্ষায় লেখক। কিন্তু এ কি ? গঞ্জনা বদলে সমর্থন।—"আমি খুশি হয়েছি, বুঝলে মশাই। লেখাটেখা ছেড়ে এ চাকরিটা নিযে বাইরে যাওয়া তোমার কেমন লাগত ?" ঘুমন্ত ছেলেব গায়ে হাত বেখে পুনবপি উবাচ—"অভাবের তাড়নায় ওকে ফেলে পালিয়ে যাবার কথা মনে হলে আমরা যেমন লাগে।"

হাসির মুখে হাসি দেখে আর কণ্ঠে সমর্থন পেয়ে এবার লেখকের চোখ দিয়ে ধাবা নামে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছোটদের জন্য গল্প লিখেছেন প্রায় পঞ্চাশ। অনাখ্যান গদ্যরচনার বই চাবটি—'প্রাসাদপুবী কলকাতা', 'অচল মানুষ সবল মানুষ', 'নিষিদ্ধ বই' এবং যুগান্তরের পৃষ্ঠায় একটি কলাম—'কথামালা'—বিচিত্র জীবনের ও মানুষের চলচ্ছবি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন সম্পর্কে প্রিয় বক্তব্য—"এ বিশ্বসংসারে বেঁচে থাকার শক্তিটাও বড় অদ্ভুত তাই—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—দয়া নয়, ক্ষমা নয়, রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো।"

৩০।১১।১৯৯৩

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

# ভূমিকা

আমাব উপন্যাসপাঠে হাতে খড়ি হয মাযেব আনুকূল্যে । আমবা যখন কাশীতে, মাযেব কাছে ডাকে বাংলা পত্রপত্রিকা আসত । তখনই বাংলা ছোটগল্প ও ধাবাবাহিক প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসের পাঠক হযে যাই । আমাদের বাড়িতে বই পড়া নিযে কোন বাধা-নিষেধ ছিল না । এর মধ্যে অকালপক্কতা কেউ দেখেন নি । ফলে অতি অল্প বযসেই আমি অনুরূপা দেবীর মহানিশা, শবৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ, দেবদাস পড়ে ফেলি । পড়তুম আব ভাবতুম কি করে এঁবা গল্প লেখেন এমন বানিয়ে বানিযে । তাবপর অনেককাল কেটে গেছে । যাঁদেব লেখা পডে মুগ্ধ হতুম, তাঁদেব অনেকেব সঙ্গে সাক্ষাৎ পবিচয হোল । কারও কারও সঙ্গে সে পরিচয ঘনিষ্ঠ আত্মীযবৎ হযে গেল । আব কখন পাঠক থেকে নিজেও সেই লেখকদেব দলে ভিড়ে গেলাম তাব দিন সময় সন তাবিখ আজ আব মনে নেই ।

তবে সেই পাঠকজীবনেব গোড়া থেকে এবং আজ পর্যন্তও সেই সব উপন্যাসই আমাকে টানে, যেখানে গল্প তথা মানুষেব জীবনই বড় কথা । উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে সমাজ রাজনীতি দেশ-কালের প্রতিচ্ছবি তো আসেই এবং আসবে । কিন্তু তা যদি কাহিনীকে ছাপিযে যায় বা কাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে সে সবেব চাপে, তখন আব তা সার্থক উপন্যাস থাকে না, অন্তত সে গ্রন্থ উপন্যাসেব মর্যাদা হাবায । এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রেব সে অমূল্য উক্তিটি স্মরণীয় —পাঠকেব সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা হইল কোন বই না পড়িবাব । আজও যে সব উপন্যাস আমাদের সামনে অটুট খ্যাতি নিযে দাঁড়িযে আছে সে সবগুলোই কাহিনী-প্রধান এবং কাহিনী-প্রধান বলেই মানুষ ও মানুষের জীবন সেখানে প্রথম ও প্রধান কথা ।

আশুতোষ মুখোপাধ্যাযের সাহিত্যেব কথা আলোচনা করতে গিয়ে এগুলি বলতে হোল, কারণ লেখক আশুতোষ এবং তাঁর উপন্যাস-সাহিত্য উপরোক্ত গোত্রেরই অন্তর্ভূক্ত । এবং এইখানে তঁবা মানসিকতার সঙ্গে আমার মানসিকতার মিল । আমরা সমধর্মী মানুষ এবং লেখকও । আশুতোষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা যেমন আনন্দের এবং সৌভাগ্যের, তেমনই তা বিষাদবহ এবং দুর্ভাগ্যজনক । বয়োকনিষ্ঠ আশুতোষ আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন, আমার অগ্রাধিকারকে বঞ্চিত করে । আরও দুঃখজনক হল ওঁর অবর্তমানে আমাকে লিখতে হচ্ছে ওঁর রচনাবলীর ভূমিকা, বেঁচে থাকলে যা হত কত আনন্দের !

আশুতোষ মুখোপাধ্যাযের রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে তিনটি উপন্যাস আছে—চলাচল, সাত পাকে বাঁধা ও বলাকার মন । তিনটিই কালানুক্রমিক ভাবে বিন্যস্ত । 'চলাচল' প্রথম দিককার রচনা । 'সাত পাকে বাঁধা' ও 'বলাকার মন' পরিণতকালের লেখা । কিন্তু প্রথমদিককার রচনা হলেও চলাচলের কাহিনী, গঠনবিন্যাস ও কাহিনীর জাল গোটানোর মধ্যে যে বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় পাই তা একজন পরিণত লেখকের পক্ষেই সম্ভব ।

'চলাচলে'র কাহিনীর পটভূমি সমুদ্রতীরের অভিজাত শহরে । অধ্যাপক ডঃ চন্দ্র, অধ্যাপকের রূপসী স্ত্রী, ছাত্রী সরমা, সরমার সহপাঠী অবিনাশ, সরমার দাদা মণিময়, অধ্যাপকের স্নেহভাজন ও পরে সরমার স্বামী বিপিন, সরমার ছাত্র ও বিপিনের ভাই মণ্টু প্রধানত এই কুশীলবদের নিয়েই গড়ে উঠেছে 'চলাচলে'র কাহিনী । এখানে ডঃ চন্দ্র-অপর্ণা-সরমা, ডঃ চন্দ্র-মণিময়-অপর্ণা, বিপিন-সরমা-অবিনাশ প্রভৃতি বিভিন্ন রকম ত্রিভুজী প্রেম-

সংঘাতের সমস্যা আছে । এই সব সমস্যার আবর্তকে কেন্দ্র করে ও তার ঘাত-প্রতিঘাতকে অবলম্বন করে উপন্যাসের কাহিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে এক নিশ্চিত পরিণতির দিকে, অনেকটা গ্রীক ট্র্যাজেডির মতো । এই ট্র্যাজেডিতে জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে সবমার আর সবমাকে যারা ভালবেসেছিল তাদেরও । তবু আশ্চর্য লাগে যে কাহিনী শেষ করে পাঠকের মন বিমর্ষ হয়ে মাটিতে মুখ গুঁজড়ে পড়ে না, ববং এক অনির্বচনীয় উদাস উচ্চতায় পৌঁছে যায় । কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা আছে সন্দেহ নেই কিন্তু কোথাও অতিনাটকীয়তা মনকে পীড়িত করে না । লেখকের প্রথম জীবনের স্পর্শ আছে উপন্যাসটিতে কিন্তু কোথাও অপরিণতির ছাপ মাত্র নেই ।

রচনাবলীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সাত পাকে বাঁধা' বহুপঠিত উপন্যাস । চলচ্চিত্রে জনপ্রিয়তার ফলে এই উপন্যাসের কাহিনীও অনেকের জানা । 'সেলিম চিশতীর কবর' নামে যে ছোট গল্পটি লেখক আগে লিখেছিলেন সেটিই 'সাত পাকে বাঁধা' উপন্যাসের বীজ বলা যায় । যেমন তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' গল্প থেকে 'কালিন্দী' উপন্যাস । 'সাত পাকে বাঁধা' উপন্যাসকে ট্র্যাজেডি বলা যায় যদিও এই উপন্যাসে মৃত্যু কোথাও তার স্পর্শচিহ্ন ফেলে নি । কন্যা-সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহের আতিশয্যে বা এক ধরনের আধিপত্যের বাসনাতে কন্যার দাম্পত্য জীবন যে কিভাবে বিষময় হয়ে ওঠে, 'সাত পাকে বাঁধা' উপন্যাসের কাহিনী তারই দৃষ্টান্ত । কাহিনীর নায়িকা অর্চনার জীবনে বিচ্ছেদের খড়্গ নেমে এসেছে । সেখানে আর দ্বিতীয় পুরুষের পদার্পণ ঘটে নি, পদার্পণের সম্ভাবনাও নেই । তবু অর্চনা সেলিম চিশতীর কবরে তার অনাগত সন্তানের জন্য ফকিরের দোয়া মাগে, শাড়ির টুকরো জালির দেওয়ালে বেঁধে আসে সবার অলক্ষ্যে । সন্তানলাভের অন্যতম শর্ত—পবিত্র শুচি সহকারে জীবন যাপন করে চলে অর্চনা একাকী, তার একক জীবনে । তার প্রাক্তন স্বামীর জায়গায় আসতে দেয় নি কোন পুরুষকে । প্রথম সাত পাকের বন্ধনের পবিত্রতা সে আজও সে অটুট অক্ষয় রেখেছে এবং সেই সঙ্গে বহন করে চলেছে নারীজীবনের চরম ট্র্যাজেডি । ভাগ্যের নিদারুণ এই ব্যঙ্গের মধ্যেই গ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা ফুটে উঠেছে । 'সাত পাকে বাঁধা' নিঃসন্দেহে লেখকের সেরা উপন্যাসগুলির অন্যতম ।

তৃতীয় গ্রন্থ 'বলাকার মন' পূর্ব-আলোচিত উপন্যাস দুটি থেকে চরিত্রে ও বিষয়বস্তুতে পৃথক । এমন কী কাহিনীর পটভূমি ও বয়ন-বিন্যাসেও পার্থক্য পাঠকের চোখে পড়বে । যদিও এই উপন্যাসের নায়কের কর্মজীবন এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত হয়ে গেছে তবু পরিণতি মিলনান্তক এবং মনুষ্যত্বের ওপর বিশ্বাস ও ভরসা নিয়ে পাঠক বই শেষ করেন । তবে আমাকে যদি কেউ আলোচিত তিনটি উপন্যাসের স্থান নির্দেশ করতে বলেন তবে আমি এই ভাবে সাজাব—সাত পাকে বাঁধা, চলাচল এবং তারপর বলাকার মন । তবে এই স্থাননির্দেশ আমার নিজের মতে, পাঠক এবং সমগোত্রীয় লেখক হিসাবে আমার যা মত । আমি সমালোচক বা অধ্যাপক নই । তাঁরা তাঁদের মতো ভাবুন । এতৎসত্ত্বেও 'বলাকার মন' উপন্যাসের বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান আছে । অনিশ্চয়তা ও ব্যস্ততা বৈমানিক এবং এয়ারহোস্টেসদের জীবনের এক বড় অংশ অধিকার করে নেয় । ফলে তাঁদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সাধারণ নাগরিক গৃহস্থের জীবনযাত্রার কোন সাদৃশ্য থাকে না, অথচ শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষদের মতো তাঁদের জীবনেও প্রেম, বঞ্চনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সাফল্য-

অসাফল্যের দ্বন্দ্ব আসে, আনন্দের উচ্ছ্বাসের পিছনে হয়তো লুকিয়ে থাকে বেদনার আভাস। এঁদের কথা বাংলা সাহিত্যে তেমন করে বলা হয় নি। 'বলাকার মন' সে অভাব অনেকখানি পূরণ করেছে। উপন্যাসের উপসংহার পাঠকের মনে দাগ কাটার মতো। এক অনাথ শিশু দুর্ঘটনায়-পঙ্গু বৈমানিক এবং এক অতি-আত্মসচেতন এয়ারহোস্টেসকে এক জায়গায় এনে কিভাবে তাদের দাম্পত্যজীবনের গ্রন্থিস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে, আশুতোষ তা নিপুণভাবে প্রতিপন্ন করেছেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমার অনুজ সহোদরতুল্য ও সমধর্মী লেখক আগেই বলেছি। প্রত্যেক লেখকের একটি নিজস্ব সৃষ্টিমানস থাকে, সেখানে অবশ্য আশুতোষ একক, স্বকীয় স্বরাজ্যে স্বরাট। যে মহৎ গুণ ও ঐশ্বর্য থাকলে সৃষ্ট সাহিত্য মহনীয় হয়ে ওঠে সে লক্ষণ তাঁর গল্পে উপন্যাসে—যা আমি পড়েছি সর্বত্র প্রকাশিত দেখেছি। আর দেখেছি মানুষের ওপর অগাধ বিশ্বাস ও অপরিসীম মমতা অথচ কী নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত। তাঁর বিভিন্ন সৃষ্ট চরিত্র, এমন কি দুর্বৃত্ত, চলচ্চিত্রে যাকে 'ভিলেন' বলে, তারাও তাঁর স্নেহদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় নি। যে লেখনীর গুণে দুর্বৃত্ত চরিত্রকেও পাঠক ভালবেসে ফেলে, তার সৃষ্টি সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

# চলাচল

শ্রীরতননাথ দত্ত

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

মেরিন্-লাইনস্ ।

সমুদ্রের ধারটা আগাগোড়া বাঁধানো । হঠাৎ মনে হবে ঐশ্বর্যের দম্ভ নীরব অবহেলায় সমুদ্রকে তফাত করে দিয়েছে । একধারে সারি সারি বাড়ি । আশ্চর্য সাদৃশ্য বাড়িগুলির আকার এবং গঠনে । বণিক-বহুল বোম্বাই শহরের সর্বত্র ধনীর সংখ্যা অগণিত । মেরিন্-লাইনস্এ যাঁদের নিবাস তাঁরা ধন-কুবের ।

কমলা এবং বাগ্‌দেবীর চিরন্তন বিবাদ বহুশ্রুত । কিন্তু অভ্রান্ত নয় । মেরিন্-লাইনস্-নিবাসী সাততলা বাড়ির ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধটির প্রতি কৌতূহল ছিল পারিপার্শ্বিকের ।

ডাঃ সমাদ্দার, এম. বি, ডি. এস্‌সি ।

ডাক্তারি ভুলেছেন । ল্যাবরেটারির গবেষণায় চোখদুটো জ্বলে ওঠে চকচকে ছুরির মতো । প্যারেলে ওষুধের মস্ত কারখানা । দেশবিদেশের বিজ্ঞপ্তি আছে রসায়নশাস্ত্রে ।

মনীষী-মহল আড়ালে বলেন পাগল । মস্তিষ্ক-বিকৃতির অপবাদ নয় কিছু । স্বল্পমাত্র খুশির ছোঁয়ায় আত্মবিস্মৃত অট্টহাসিটা যেমন সহজ, বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটলে তেমনি সগোত্র মনে হবে নন্দী-ভৃঙ্গীর । সায়েন্স কলেজ থেকে সংস্রব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি আজও । ছাত্রদের আকর্ষণ দুরতিক্রমণীয় । ক্লাস নিচ্ছেন ।

কোণের দিক থেকে একটা অস্ফুট গুঞ্জন ভেসে আসছে মাঝে মাঝে । সমাদ্দার পড়ানো বন্ধ করে ফেললেন হঠাৎ । মুহূর্তের নীরবতা । গর্জে উঠলেন, হোয়াট্‌স্ দি ট্রাবল উইথ্ ইউ জেন্ট্‌ল্‌মেন দেয়ার—?

সাড়াশব্দ নেই ।

আই ওয়ান্ট নো সাইলেন্স নাও, স্পীক্ ! হোয়াট্‌স্ দি ট্রাবল ? ছাত্ররা ভয়ে তটস্থ । মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল তারা । সমাদ্দারের মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেছে । রেজিস্টার চক্ ডাস্টার সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে ।—তোমরা কেমেস্ট্রি শিখবে, কেমন ? বেশ ভালো করে হাটবাজার বসাও এবার, আমি আর নেব না তোমাদের ক্লাস, নেভার । সরোষে প্রস্থান করলেন ।

অতঃপর একটা কলহ বেধে ওঠার উপক্রম ছাত্রদের মধ্যে । কিন্তু তাতে মীমাংসা কিছু হবার নয় । অগতির গতি চন্দ্র সাহেব । ছাত্ররা দল বেঁধে উপস্থিত তাঁর কাছে ।

ডাঃ মোহিনী চন্দ্র ।

বাঙালী ছাত্ররা ডাকত দৈত্যচন্দ্র । লম্বায় সাত ফুটের কাছাকাছি । প্রস্থেও তদনুরূপ । সমাদ্দারের অনুবর্তী । একঘর ছেলের মাঝে বিশালকায় মানুষটি হাস্য গোপন করে আছেন মোটা বর্মা চুরুটের আড়ালে ।

এ নিয়ে তিনবার হল, আমার দ্বারা হবে না কিছু, যাও—

আমাদের অন্যায় হয়েছে স্যার ।

তাঁকেই গিয়ে বলো একথা ।

সে আমরা পারব না স্যার ।

আমিও পারব না ।

মুখে যাই বলুন, তাঁর দুর্বলতার সন্ধান ছেলেরা ভালোই রাখে । উঠতে হল ।
—এই শেষবার, ক্লাসে গিয়ে বসে থাকো চুপ করে ।

চুরুট অ্যাশ-পটে গুঁজে শিষ্য চললেন গুরু দুর্বাসার ক্রোধ প্রশমনে। দু-তিনটে ঘর ছাড়িয়ে সমাদ্দারের চেম্বার। দরজার গায়ে টোকা পড়ল। একটা, দুটো—

ডোণ্ট্ কাম্! আমি নেব না ক্লাস!

দরজা ঠেলে চন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করলেন। সমাদ্দার লিখছেন কি। তিনি পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ও, তুমি...।

কমবয়সী ছেলে ওরা, এমনি রাগ করলে লোকে হাসবে যে স্যার।

হাসবে মানে? কে হাসবে? কাগজ কলম থাকল পড়ে। উত্তেজনায় মোটা লাঠিটা টেবিল থেকে হাতে উঠে এলো।

নীরবে হাত বাড়িয়ে দিলেন ডাঃ চন্দ্র। সমাদ্দার অপ্রস্তুত। অ্যাঁ! ও, তুমি হাসবে বুঝি? দেব যখন এক-ঘা বসিয়ে, বুঝবে মজা। ঘর-ফাটানো শব্দে নিজেই হেসে উঠলেন হা-হা করে।—দেখো তো, এমন রাগিয়ে দাও যে মাথার ঠিক থাকে না।

বসব?

বোসো, ক্লাস নেই?

না, লিখছেন কী?

শশব্যস্তে কলম তুলে নিলেন আবার। দেখেছ, দেবে ওদিকে পাবলিশার তাগিদের চোটে নাম ভুলিয়ে। মরবার ফুরসৎ নেই এমনিতে, আবার এক জ্বালা তার ওপর। দু-তিন লাইন লিখে গেলেন।

সময়ের প্রতীক্ষায় নীরবে বসে থাকেন চন্দ্র। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না এও সুনিশ্চিত। ও মানুষটি নিজেই দেবেন না কাউকে মুখ বুজে বসে থাকতে। কোন দুরূহ মীমাংসার মুখে থেমে গিয়ে হয়তো বিপদাপন্নের মতো প্রশ্ন করবেন, তিন-সাতে কত, অথবা চোদ্দ আর পনেরয়। কেউ যদি জবাব দেয় বাইশ অথবা সাতাশ, চিন্তা না করে বসিয়ে যাবেন তাই। পরে হয়তো তোলপাড় করে খুঁজবেন ভুল কোথায় হল।

রেডনের অ্যাটমিক্ ওয়েট্ কত হে?

দু-শ বাইশ।

অ্যাটমিক্ নাম্বার?

ছিয়াশি।

ছিয়াশি...। লিখছেন, ওয়েট্ অ্যাণ্ড্ নাম্বার বোথ্ অ্যান্টিসিপেটেড...নট কনফার্মড। বিরক্ত হয়ে কলম রেখে দিলেন—এই এক কথাই তো লিখতে হবে সকলের মতো, তবে আমাকে দিয়ে আর বই লেখানো কেন বাপু!

হেসে উঠলেন। নিজের অসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে নিজেই একটু সচেতন হলেন যেন। ছেলেগুলোকে এভাবে বকেঝকে চলে এসেছেন বলে ভিতরটা খচখচ করছিল কেমন। কলম হাতে তুলে নিয়ে বললেন আবার, দেখো ... ক্লাসট্রাস আর নেব না আমি...পড়াশুনায় মন নেই কারো, খালি গোলমাল করবে বসে বসে...এ বয়সে আর ওসব পোষায় না বাপু।

যে কোন একটা প্রসঙ্গের প্রতীক্ষায় ছিলেন চন্দ্র। নির্লিপ্ত মুখে সায় দিলেন, একদিন দুদিন হলে কথা ছিল, প্রায়ই তো এই কাণ্ড করছে।

দেখো তো ! সমর্থন পেয়ে খুশি ।—নিজের কারবার ফেলে কাজ ফেলে তোদের জন্য ছুটে আসি, আর দুটো ঘন্টা তোরা চুপ করে বসে থাকতে পারিস না ! দুদিন না এলেও তো দেখি চলে না । কর এবার কত গোলমাল করবি, আমি সাফ বলে দিয়েছি, আর নেবই না ক্লাস ।

বেশ করেছেন । নিরাসক্ত মুখে ঘরের ছাদ দেখছেন চন্দ্র ।—আমিও দেখে শুনে আর কোথাও চলে যাব ভাবছি, ভালো লাগে না আর ।

আবার লেখায় মন দিয়েছিলেন সমাদ্দার । কলম থেমে গেল । বিষম অবাক । —কেন ?

কি হবে এদের পড়িয়ে, পণ্ডশ্রম শুধু শুধু—পড়তে কি আর আসে, আসে আড্ডা দিতে ।

হাত থেকে কলম খসল । কথাগুলো মনঃপূত হল না খুব । আঙুলে করে টেবিলে দ্রুত তালে তবলা বাজালেন গোটাকতক । চন্দ্র জানেন, এও অসহিষ্ণুতারই অভিব্যক্তি ।

এ তুমি বলতে পারো না, সকলেই কি আর আড্ডা দিতে আসে ! তা ছাড়া তুমি পণ্ডশ্রম ভাববে কেন, এই এদের মধ্যেই কার ভিতরে কি আছে এ কি বলা যায় ।

এই জন্যই এত ভণিতা । চন্দ্রের নিস্পৃহতা রূঢ় শোনাল প্রায় । তাঁর এই শিক্ষাগুরুটিকে তাঁর থেকে ভালো আর কে চেনে । বললেন, ওই আনন্দেই থাকুন আপনি । কোন রকমে চাকরি করে যেতে পারলেই আমি খুশি, ওসব বড় বড় ভাবনায় কাজ নেই আর ।

বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে ফেলেন সমাদ্দার, হল কী ?

কি আবার । অন্য দেশ থেকে নট-কনফার্মড্‌গুলো কনফার্মড্‌ হয়ে আসবে, আনফাউণ্ডগুলো ফাউণ্ড হবে—বই থেকে সেগুলি তখন মুখস্থ করবে'খন আমাদের ছেলেরা ।

সমাদ্দারের মতো মানুষের জগৎ আলাদা । মুখের কথা আর মনের কথায় তফাত খোঁজেন না ।

চন্দ্র নির্বিকার ।—চলুন, আবার বাইরের কোন য়ুনিভার্সিটিতেই না হয় চলে যাই । জলাঞ্জলি যাক এসব ছেলেরা, গোলমাল করবে কেমিস্ট্রি শিখতে বসে, এদের দিয়ে কোনদিন কিছু হবে ?

থামো থামো ! লাঠিটা সজোরে টেবিলে আছড়ে হুঙ্কার দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি । —দূর হও আমার সমুখ থেকে । একশোবার করবে ছেলেরা গোলমাল—কেমিস্ট্রির এখনি কি বোঝে তারা যে তোমার মতো মুখ বুজে বসে থাকবে সারাক্ষণ ?

তাই বলে গোলমাল করবে ক্লাসে ? যেন এমন অসম্ভব কথা চন্দ্র শোনেন কি আর ।

নিশ্চয় করবে, এক হাজার বার করবে । তুমি একটা আস্ত ক্রিমিনাল—যদি শুনি কিছুমাত্র ফাঁকি দিয়েছ ওদের শেখাতে তোমাকে দেখব আমি । বাইরের য়ুনিভার্সিটিতে যাব !...ক্লাস নেব না !...ইউ ফুল...।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন । এলেন আবার ক্লাসে ! আঁট-সাঁট হয়ে বসে আছে ছাত্ররা ।

শোনো ছেলেরা, তোমাদের ক্লাস নেব আমি, এক্ষুনি নেব । কী পড়াচ্ছিলাম ? ইরিডিয়াম—

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চন্দ্র হাসছেন মৃদু মৃদু । দুই হাত ট্রাউজারের পকেটে সন্নিবিষ্ট । ...এমনি সামান্যতম ঘটনা থেকে কত বিপর্যয়েই না তাঁকে হাসিমুখে দাঁড়াতে হয়েছে

মিটমাটের জাদুকাঠি হাতে নিয়ে।

কিন্তু নিজের ঘর ?

প্রবল উৎসাহ ছিল তাঁরও অপর্ণার গান-বাজনা শিল্প-কলায়। যখন তখন হাঁক দিতে শোনা গেছে, অপর্ণা—!

নিঃশব্দ প্রবেশ অপর্ণার। চন্দ্রর একটা চোখ বোজা এবং অন্যটি মাইক্রোস্‌কোপে সংবদ্ধ। সেই অবস্থাতেই আবার ডাকেন, অপর্ণা—!

আঃ, চেঁচাও কেন, চোখদুটো তুলে দেখার সময় নেই ?

ওঃ, তিনি হেসে ওঠেন, তোমার তানপুরা নিয়ে বোসো। গান শুনব।

গান ! এখানে—?

দূর, এখানে কেন, চলো আমি যাচ্ছি।

মাইক্রোস্‌কোপ কাঁদবে না ?

কাঁদুক, তুমি নিয়ে বোসো, আমি আসছি।

ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। বাদ্য-যন্ত্রটা তুলে রাখে অপর্ণা। এসে দেখে, এক চোখ তেমনি বোজা, অপরটা মাইক্রোসকোপের ওপর। নিঃশব্দে ফিরে আসে। মানুষটির চোখ আছে জানে, সূক্ষ্ম অণুপরমাণুও এড়ায় না। অথচ...

ইন্দ্রাণীর বেশে পথ চলে যখন অতিবড় মুখচোরা পথচারীরও গোপন দৃষ্টি অনুভব করতে পারে অপর্ণা।

কিন্তু এ যে ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা নয় মানুষটার, জানত। অন্যমনস্কতা বরদাস্তও করত হাসি মুখে। কিন্তু দুর্জ্ঞেয় নারীচরিত্রে কোথায় বুঝি ব্যতিক্রম ঘটে গেছে হঠাৎ। মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর বছর ঘুরেছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাড়ম্বর শুশ্রূষায় স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণতাও সমুচ্ছল। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে মনের যে দিকটাই ভাঙন ধরল তার হেতু হয়তো বা অপর্ণার নিজেরও অজ্ঞাত। সময় অসময়ে তার অকারণ রুক্ষতায় চন্দ্র কখনো বিস্মিত কখনোবা বিমূঢ়।

কিন্তু এও অভ্যস্ত হয়ে আসছে ক্রমশ।

ডাঃ সমাদ্দার ইরিডিয়াম পড়াচ্ছেন। তাঁর উত্তেজনায় ছাত্ররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সরমা পিছনের বেঞ্চে হেলান দিয়ে ফিরে তাকায় দরজার দিকে। পাগল প্রফেসারকে ক্ষেপিয়ে দিলেন যিনি, দরজার ওধারে তাঁকে দেখা যায় কি না।

সরমা ব্যানার্জী।

দাদারে মোটর মেরামতের দোকান ছিল ওর বাবার। তাঁর হাতুড়ি-পেটা সবল মূর্তি আজও চোখে ভাসে। মাকে মনেও পড়ে না। তিনি অনেক আগেই গেছেন। বড় ভাই মণিময়ের গানের সুনাম আছে বন্ধুমহলে। সেটুকু বজায় রাখতে গিয়ে দোকান রাখা আর হয়ে ওঠে নি। মেয়েদের সায়েন্স পড়া আর ছেলেদের মেয়েলী সুরে গান গাওয়া নিয়ে ভাই-বোনের অকৃত্রিম বচসা শ্রবণাভিরাম।

কিন্তু সরমার প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে অপরিহার্য যার নাম, সে অবিনাশ। কালো, ঢ্যাঙা, হাড়-জর্জরে। সৃষ্টির নির্মম পরিহাস যেন। অনেক ওপরে পড়ত, দ্বিতীয় বিজ্ঞান বার্ষিক ক্লাসে

উঠে সরমা সহপাঠিনী হল তার । ছ বছর আগে ওদের প্রথম পরিচয়টুকু হাস্যরসাত্মক ।

কমবয়সী ছেলেদের অদ্বিতীয় রহস্য-সখা অবিনাশ । এক পার্শী ধনীর দুলাল চ্যালেঞ্জ করল, ক্লাসে সরমা ব্যানার্জীর পাশে বসতে পারো ? কুড়ি টাকা বাজি ।

সমস্বরে হেসে উঠেছিল অন্য ছেলেরা । সরমার স্বাস্থ্যদৃপ্ত গৌর তনুর পাশে অমাবস্যা-নিন্দিত মূর্তিটি কল্পনা করা যেতে পারে । বিধাতা অট্টহাসি হেসে গেছেন ওর চেহারার মধ্যে ।

রাজী, টাকা ফেলো ।

ডাঃ চন্দ্রর ক্লাসে কিন্তু ।

বহুত আচ্ছা ।

ডাঃ চন্দ্র এই বেসরকারী কলেজে সদ্যনিযুক্ত অধ্যাপক তখন । গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি ।

মেয়েদের আসন আলাদা । চন্দ্র ক্লাসে আসেন নি তখনো । অবিনাশ এসে দাঁড়াল সরমার সামনে । বিনয়-বিনম্র ।

অন্য ছেলেরা রুমাল চাপা দিয়েছে মুখে । সরমা সবিস্ময়ে তাকালো তার দিকে ।

আমি আপনার এপাশটিতে বসব । বিশ টাকা বাজি ফেলেছে ওই বাঁদরগুলো, গরিব মানুষ, ভালো খেতে পাইনে দুবেলা, লোভ সামলাতে পারলুম না । সরে বসুন না একটু—

প্রস্তাব শুনে সরমার দু-চোখ বিস্ফারিত ।

অবিনাশের কণ্ঠস্বর মোলায়েম শোনায় আরো ।—দেখুন, প্রায় মানুষের মতোই চেহারা নয় আমার, রোগে সারা তার ওপর । তবু ওদের এ ঠাট্টা আমার লাগে । দেবেন একটু জায়গা ?

মুখে হাসির মতোই লেগে ছিল সরমার । কিন্তু বিপন্ন অবস্থাটা অগোচর নয় কারো । বই-খাতা নিয়ে অবিনাশ পাশে বসে পড়ল ।

চন্দ্র এলেন । খুকখুক কাশির শব্দে হাসি চাপার চেষ্টায় ক্লাসঘর মুখরিত । রহস্য নয়নগোচর হতে চন্দ্রও হেসে ফেলেছিলেন । সামলে নিলেন ।

তুমি ওখানে কেন অবিনাশ ?

ওরা বড় জ্বালায় স্যার । বিনীত জবাব ।

জায়গায় যাও ।

আমি এঁকে বলেই এখানে বসেছি স্যার, আপনি জিজ্ঞাসা করে দেখুন । হাত বাড়িয়ে সরমার কেমেস্ট্রি বইটা টেনে নিল সে ।—আজও অ্যালুমিনিয়ামই পড়ান স্যার, সেদিন ভালো বুঝতে পারিনি ।

বেগতিক দেখে চন্দ্র পড়াতে শুরু করে দিলেন ।

বাজির টাকা আদায় হতে সময় লাগল না । স্থির হল, পরদিন চায়ের সমারোহ হবে ক্লাসসুদ্ধু । কিন্তু অবিনাশের হাত থেকে রেহাই পেতে সরমা পালিয়ে বেড়াল পর পর সাতদিন ।

এরপরে সরমা ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে । অবিনাশের অধ্যবসায় রবার্ট ব্রুসের প্রতিস্পর্ধী । পরীক্ষার ফল বেরুলে প্রতিবারই সরমা জিজ্ঞাসা করত, কী হল ?

কী আবার হবে ।

পাস করেছ ?

আমার আর খেয়ে দেয় কাজ নেই ।

সরমার দাদা মণিময়ের কৌতুক আর একটু নির্মম । শেষবারে টিপ্পনী কাটল, এক কাজ কর অবিনাশ, বিয়ে-থাওয়া করে ফেল, ছেলে হোক, একসঙ্গে পরীক্ষা দিস ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবিনাশ, সরমা কি রাজী হবে তাতে ।

মনিময়ের বিব্রত চোখ দুটো দেয়ালের গায়ে সন্নিবিষ্ট । সরমা উঠে সশব্দে এক চাঁটি বসিয়ে দেয় অবিনাশের মাথায় ।

কিন্তু একটা গুণ আছে মানুষটার । আঁকতে পারে ভালো । পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে শেষে একেই সম্বল করে নিল একদিন । সরমার সঙ্গে মতান্তর ঘটল সেদিন, যেদিন দেখল এ বিদ্যাটির পরিণতি দাঁড়াচ্ছে কমার্শিয়াল আর্ট-এ । চুরুটের বিজ্ঞাপন আর সুগন্ধ-তৈল-বিহারিণীর সুষমা প্রকাশের জন্য তুলিচালনা চক্ষুঃশূল ।

এসব কি হচ্ছে শুনি ?

মন্দ কি । টোবাকো কোম্পানিতে বিজ্ঞাপন আঁকার কাজ নেব ভাবছি ।

উদ্ধার করবে । এ বুদ্ধি ছাড়বে তো ছাড়ো, নইলে সব ফেলে ছড়িয়ে একাকার করে দেব আমি ।

তার আগে ফ্রক পরে নিও একটা ।

সরমা হেসে ফেলে, আঁকবার আর জিনিস পেলে না, সিগারেট আর নারকোল তেলের বিজ্ঞাপন ?

টাকা আসছে ।

টাকার জন্যে এই ?

এই । টাকা পেলে দেহটা অন্তত বাঁচে কিছুকাল ।

আর যেটা মরে ?

সেটা অনেক আগেই মরেছে ।...সেই যেদিন চন্দ্রর ক্লাসে বসেছিলাম তোমার পাশে ।

হুঁ ? হাসতে গিয়েও হাসি আসে না সরমার । চেয়ে থাকে মুখের দিকে ।

ধ্যেৎ ছাই ! অবিনাশ তুলি ফেলে দেয় হাত থেকে, সাবু বার্লিতে লিকুইড হয়ে গেল সব কিছু, আমার আবার মরা বাঁচা । পালাও এখন, এ লেটারিংগুলো সেরে দিতে পারলে টাকা পাব দশটা—ছেলে ঠ্যাঙানো নেই আজ ?

শশব্যস্তে উঠে আসে সরমা । আছে বইকি । সাধারণ ঘরের দৈনন্দিন সংগ্রাম পায়ে পায়ে। তার আছে ছেলে পড়ানো আর আছে সেখানে একজনের একাগ্রতা থেকে রোজ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসার দায়িত্ব ।

সেই একজন বিপিন চৌধুরী ।

অল্প বয়সে বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে সুপ্রতিষ্ঠিত । তার দুর্দম কর্মপদ্ধতি অনেক অবাঙালী সহব্যবসায়ীর ঈর্ষার কারণ । তাঁরা সামনে করেন প্রশংসা, আড়ালে বলেন ওয়াইলড্ । বর্তমানের বাসস্থল সান্তাক্রুজএ । মেরিন্-লাইনস্এ সাততলা বাড়ির ছক্কাটা আছে মগজে । অবকাশ কম । আর, অবসর সময়েও ওর ছোট গাড়িটা তূর্যগতিতে শহরের এমাথা ওমাথা করে বেড়ায় দিনে কতবার হিসেব নেই । বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অপরাধে

জরিমানা গুনেছে অনেক। স্বভাব বদলায় নি। তারই খুড়তুতো ভাই মণ্টুকে পড়ায় সরমা।

তবু খারাপ লাগত না। নানা ছলে পড়ার ঘরে বিপিনের আবির্ভাব এবং মণ্টুকে বাইরে পাঠিয়ে তার সঙ্গে আলাপের প্রয়াস, এও না। মণ্টু ছেলেমানুষ নয়, বোঝে সবই।

এর মধ্যে তোমার মাথা ধরে গেল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, গেল—তুই যা দেখি আগে, অ্যাস্‌প্রো কিনে নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। ওকে একটু ছুটি দিন সরমা দেবী।

ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু লেগে থাকে শুধু, সরমা মুখে বলে না কিছু। মণ্টুর নিষ্ক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিপিন বসে পড়ে চেয়ার টেনে।—যা ব্যাপার শেয়ার মার্কেটের এ যদি দেখতেন একবার, পাকা লোকেরও মাথা ধরিয়ে ছেড়ে দেয়।

সাড়াশব্দ নেই অন্য তরফ থেকে।

মণ্টু পড়ছে কেমন ?

ভালো।

এবার পাস করতে পারবে তাহলে ?

দেখা যাক।...আপনার যেরকম মাথা ধরা শুরু হয়েছে।

বিপিন হেসে ওঠে, সশব্দে, লোকটা পাকা নই তেমন বুঝতেই পারছেন।

কিন্তু মানুষটির আর একটা দিকের আভাসও সরমা পায় এখানে পড়াতে এসে। দোতলা থেকে খাবারসুদ্ধু থালা-বাসন অথবা আসবাবপত্র যখন আছড়ে পড়ে একতলার মাটিতে, সরমার ভারী ইচ্ছে করে তার তখনকার সে মূর্তি দেখতে।

মণ্টু বহুদিন লজ্জা পেয়েছে সরমাকে অবাক হতে দেখে। বলে, দাদার রাগ, কোন মানে হয় না...।

রগচটা বিপিন চৌধুরীকে সরমা চিনত। কিন্তু তারই মধ্যে আছে আর একজন যে পারে তুচ্ছ থালা-বাসনের মতো অপরের জীবন-যাত্রা ভেঙে তছনছ করে দিতে, পারে প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে নিজেকে সুদ্ধু সে আগুনে ভস্মীভূত করে ফেলতে, এ কি কোনদিন ভেবেছে।

এ বাড়িতে তার পড়াতে আসার বৈচিত্র্যটুকু হৃদয়গ্রাহী।

মণ্টু পাকা ছাত্র। আই. এসসি উত্তরণের দুরতিক্রমণীয় বাধা উপলব্ধি করে পর পর দু-বার পরীক্ষা না দিয়েই ফিরে এসেছে। আরো আসতে পারত বারকতক। সরস্বতী বাদ সাধলেন।

যোগাযোগটা ঘটেছিল চন্দ্রর প্ররোচনায়। বিপিন চৌধুরী দাদা ডাকত তাঁকে। দেখা-সাক্ষাতের স্বল্পতায় বাল্যবন্ধুত্ব চেনাশুনায় পর্যবসিত। একজনের ল্যাবরেটোরির গবেষণা আর একজনের শেয়ার বাজারের। কাছাকাছি নয় কোনটা তবু তাঁকে দেখামাত্র কাকীমার মেঘ-মূর্তির স্মরণ হল বিপিনের।

একজন ভলো প্রফেসার-টফেসার দেখে দাও না মোহিনীদা, মণ্টুকে পড়াবে। কাকীমার ধারণা এ অভাবটুকুর জন্যেই ছেলে পাস করতে পারছে না তাঁর।

পাস করেও কাজ নেই তাহলে, শেয়ার মার্কেটের দড়ি পরিয়ে দাও নাকে। চকিতে মনে পড়ল কি।—মণ্টু আই. এস্‌সি পড়ে না ?

হ্যাঁ ।

প্রফেসার রাখতে চাও, মাইনে তো অনেক দেবে ?

দেড়-শ দু-শ দিতে পারি ।

চন্দ্র ভাবলেন একটু । মেয়ে টিচার রাখবে ? বেটার দ্যান এনি অর্ডিনারি প্রফেসার ?

বিপিন চৌধুরী ভেবে দেখার অবকাশ পেল না । চন্দ্রর উৎসাহ চতুর্গুণ ।—ব্রিলিয়েন্ট স্কলার, সিক্সথ ইয়ারে পড়ছে এখন...সি ইজ্ নিডি, তবু রাজী হবে কি না বলতে পারিনে । হলে পাঠিয়ে দেব ।

কাকীমাকে বলে দেখি একবার—

কিছু বলতে হবে না, আমার কথা বোলো তাঁকে । এখন শ-খানেক দিলেই হবে ।

সরমার কাছে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছিলেন ঘুরিয়ে ।—পড়াশুনার ক্ষতি না হলে একটা ভালো কাজ যদি পাও নেবে ? আমাকে ধরেছে তারা । অবিনাশের সঙ্গেও পরামর্শ করতে পারো ।

সরমা বিস্মিত । অবিনাশের নাম উল্লেখের পিছনে হেতু কি, সেটা সরমা জানে না তখনো ।—কার কথা বলছেন ?

তোমার । ছেলে পড়াতে হবে, একশ টাকা মাইনে দেবে এখন ।

চকিতে কানের কাছটা লাল হয়ে ওঠে সরমার । ক্ষুদ্র জবাব দেয়, পরামর্শ করতে হবে না, আপনি বলে দেবেন যাব ।

শুনে অবিনাশ হাসল । সরমা জ্বলে ওঠে আরো ।—ভেবেছে কি সবাই শুনি ? আমি ছেলে পড়াব কি না সে পরামর্শও তোমার সঙ্গে করতে হবে ?

ভারী অন্যায় । আমার পরামর্শ ছাড়া এক পা-ও নড় না তুমি বাইরের মানুষ এ জানল কি করে !

তেলে জলে মেলে না । সরমার স্বভাবেও রাগ মেশে না । হাসি সামলালো তবু, আমি বলে দিয়েছি যাব ।

ততোধিক গম্ভীর অবিনাশ ।—আমারও তাই পরামর্শ ।

নির্দেশমত সরমা চৌধুরীগৃহে উপস্থিত । পরিচারিকা গঙ্গাবাঈ তাকে পড়ার ঘরে বসতে দিয়ে অন্দরমহলে ছুটল খবর দিতে । টেবিল থেকে একটা বিজ্ঞানের বই তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল সরমা । তার তখনো ধারণা, ছেলে পড়াতে হবে মানে ফোর্থ ক্লাস, থার্ড ক্লাস, বড় জোর সেকেণ্ড ক্লাস ।

ষড়যন্ত্রটা মণ্টুর অজ্ঞাত তখনো ।

শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়তে হবে শুনে আঁতকে উঠল প্রথম । এ ভয় তার মারও ছিল । তার ওপর ব্যবস্থাটিও মনঃপূত নয়, বিপিনের মেজাজ বুঝে অমতটা জানাবেন স্থির করেছিলেন । কিন্তু অবসরমত তাকে পাওয়া দুরূহ ।

শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের কল্পনা বিপিনেরও ছিল না কোন কালে । চন্দ্রর মুখের ওপর অসম্মতি জানাতে পারে নি শুধু । কিন্তু আধুনিকতায় অরুচির নজির নেই নব্য কর্মীর । নতুনত্বটা লোভনীয় ঠেকল অচিরে । লেখাপড়া-জানা মেয়ের সন্ত্রস্ত চাউনি অবলোকন করল মনে মনে । দ্বিধা অতলে নিমজ্জিত । ব্যবস্থাটা অন্দরমহলে পেশ করে দিয়েই খালাস ।

মা !

ঘর-ফাটানো আর্তনাদে মন্টু উপস্থিত মাতৃ-সকাশে । চারুদেবী প্রমাদ গুনলেন । এ মা ডাক তেমন মধুর নয় ।

আমি কি করব, তোর দাদা ঠিক করেছে ।

দাদা ঠিক করেছে । রাগে ক্ষোভে মন্টু স্তব্ধ খানিকক্ষণ ।—যেতে বলে দাও, শিগগীর, কেন আমাকে আগে বলো নি কিছু ?

আঃ, শুনতে পাবে যে ! বাড়ি বয়ে এসেছে, সামনে গিয়ে বোস দুদিন । পরে দাদাকে বলিস পড়াতে পারে না কিছু—শুনলে নিজেই বারণ করে দেবে সে ।

ও, আচ্ছা আমিই বলে দিচ্ছি—।

দুড়দাড় নীচে নেমে এলো । পড়াশুনা করলে পাস করতে পারত না এমন নিরেট নয় । কিন্তু এ বিপদ কে জানত !

ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক উত্তাপ তিরোহিত । পা দুটোও আড়ষ্ট লাগছে কেমন । চেয়ার টেনে বসল আস্তে আস্তে ।

বসে থেকে বিরক্তি ধরে গেছে সরমার । হাতের বই টেবিলে রাখল । সাড়া না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনার ভাই পড়বে ?

মন্টুর মেজাজ বিগড়াল আবার ।—না আমি । দু বছর আই. এস্‌সি পরীক্ষা দিই নি ইচ্ছে করে, কলেজের পরীক্ষাতেও দশ-পনেরোর বেশি পাইনে কখনো—এবারেও ফেল করব জানা কথা । কিন্তু পাস না করতে পারলে আপনার দোষ হবে...পড়াবেন কিনা ভেবে দেখুন ।

সরমা হতভম্ব । একে এ পরিবেশের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তায় এমন শর্ত । হাসি পেল একটু বাদেই । ছেলেটি পড়তে অনিচ্ছুক তার কাছে সুস্পষ্ট । উঠে চলে আসত হয়তো, কিন্তু কথা শুনে একবার বাজিয়ে দেখার লোভ সামলাতে পারল না । সকৌতুকে খানিক দেখল তাকে । পরে জবাব দিল, ভাবতে সময় লাগবে একটু ।...বয়সে বড় আমি, নাম ধরে ডাকলে আপত্তি হবে না তো ?

সন্ধ্যের দেরি ছিল তখনো । জবাবে খটাস করে সুইচটা টিপে দিল তবু ।—আমার নাম মন্টু ।

সরমাও চেষ্টা করল গম্ভীর হতে—আমাকে যদি ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে বলো এক্ষুনি বসে, সব বিষয়ে শূন্য পাব । তুমি দশ-পনেরো পাও যখন কিছু জানো নিশ্চয় ।

মন্টু মুখ তুলে বুঝতে চেষ্টা করল পরিহাস কি না । গম্ভীর মুখে জবাব দিল, কিছু না । ফিজিক্স কেমিস্ট্রি মোটে বুঝিনে আমি ।

সরমা হাসল ।—তুমি সুইচ টিপলে আলো জ্বলবে এ তো জানাই ছিল । কি করে জ্বলল, কারেন্ট এলো কি করে, আলো জ্বললে দেখতেই বা পাবে কেন, আমার কথা তোমার কানে যাচ্ছে কি করে—এ যদি বোঝ ভাল করে, দেখবে ইন্টারমিডিয়েট ফিজিক্স-কেমিস্ট্রির সব উত্তর ওতেই আছে ।

শঙ্কটাপন্ন অবস্থা মন্টুর । নির্বাক চোখ দুটো বলতে চায়, ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি ।

একটু থেমে সরমা বলল, মেয়েছেলের কাছে পড়তে হবে এ দুর্ভাবনা কাটিয়ে উঠতে পারো যদি তোমার পরীক্ষা পাসের ভার আমি নিতে পারি ।

সাপের মাথায় ধুলোপড়া বলে একটা কথা আছে । পাশের ঘরের আড়াল থেকে চারুদেবী লক্ষ্য করেছিলেন তাই । ছেলের ধ্যানবুদ্ধ মূর্তি নয়নাভিরাম ঠেকল না । সহসা বীতরাগ জন্মাল সবগুলি চেনা মানুষের ওপর । বিপিনের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন, ছেলের উপরে রেগে গেলেন, ক্রুদ্ধ হলেন নবাগতার প্রতি এবং বাড়ির ঝি গঙ্গাবাঈ বিনা কারণেই ধমক খেল গোটাকতক ।

দুই একদিন না যেতেই দুর্ভাবনা বাড়ল আরো । বিনা তাগিদে ছেলে নিজেই যথাসময়ে বসে যায় বইপত্র খুলে এ বেশ ভালো কথা । কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর মুখের কথা না শুনে তার টকাটক আঁক-কষা-হাতে লাবণ্যশ্রী দেখবে তন্ময় হয়ে এবং একটানে আঁকা ফিজিক্সের ডায়গ্রামের দিকে না তাকিয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকবে অবাক বিস্ময়ে, এ তেমন ভালো কথা নয় ।

মেয়েটা পড়ায় ভালো নিশ্চয় । মাথা বোঝাই বিদ্যে থাকুক আপত্তি নেই, ছেলেরই ফল ভালো হবে পরীক্ষায় । কিন্তু ছেলে পড়িয়ে দিন চলে যার তার আবাব কথায় কথায এই মুখ টিপে হাসাব রোগ কেন ।

শিক্ষয়ত্রীর অভাব নেই বোম্বাই শহরে, কিন্তু বিপিনের সঙ্গে যোগাযোগেব রহস্যটুকু না জানার অস্বস্তি প্রবল ।

সাতদিন অবিশ্রান্ত খাটুনির পর বিপিন চৌধুরীর অবকাশ মিলেছে একটু । আগেই বাড়ি ফিরল সেদিন । বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজের হেডলাইনের আড়ালে বিশ্রাম নিচ্ছে । মুখে পাইপ । দ্বারপ্রান্তে অচেনা নারীমূর্তি দেখে সবিস্ময়ে মুখ তুলল ।

ভেতরে আসুন, কাকে চান ?

মণ্টু...।

মণ্টু ! ও মণ্টু । চিৎকার করে ডাকল, মণ্টু, মণ্টু, মণ্টু ! চকিতে মনে পড়ল কি । মণ্টু—মানে, মণ্টুকে আপনি পড়ান নাকি ?

হ্যাঁ ।

ও । আসুন, আসুন । ত্রস্তে ব্যস্তে সরমাকে নিয়ে এলো পড়ার ঘরে । চেযার এগিয়ে দিল, বসুন । আমি মণ্টুর দাদা, বিপিন চৌধুরী । চন্দ্র সাহেব বন্ধু আমার, আপনার সম্বন্ধে তিনিই আমাকে বলেছিলেন ।

সরমা নমস্কার জানাল ।

নমস্কার, বসুন আপনি, মণ্টু ।

হাঁকডাক শুনে মণ্টু পড়িমরি করে ছুটে এসেছিল । জায়গামত বসল সে । বিপিন দমে গেল । সে নিষ্ক্রান্ত হলেই পাঠ শুরু হতে পারে ।

দেড় ঘণ্টা ।

পাশেব ঘরে চেয়ার সরানোর শব্দ কানে আসতে খবরের কাগজ ফেলে দিল বিপিন । হেডলাইন পড়া, পায়চারি করা, ডাঃ চন্দ্রকে মনে মনে ধন্যবাদ জানানো, নারী-কণ্ঠের টুকরো টুকরো কথাবার্তা অনুধাবনের প্রয়াস, ইত্যাদির পর আর বাকি থাকে কি ? ভাবরাজ্যে বিচরণ । শেয়ার বাজারের ব্যবসায়ীর পক্ষে পণ্ডশ্রম তাও ।

পড়ালেন ?

জবাবে সরমার গতি ঈষৎ মন্থর হল শুধু ।

চন্দ্র সাহেবের মুখে শুনেছি ভালো স্কলার আপনি, দেখুন মণ্টু যদি পাস করতে পারে এবার । তা বলে খুব বেশি খাটতে হবে না আপনাকে, যা পারেন একটু-আধটু দেখিয়ে নেবেন । এবারে না হয় আসছে বারে পাস করবে'খন, কি বলো মণ্টুবাবু ?

অদূরে অবস্থান করছিল মণ্টু । বলা বাহুল্য, শ্রুতিমধুর ঠেকল না কানে । সরমা মৃদু হেসে মণ্টুর বিক্ষুব্ধ মূর্তির দিকে তাকাল একবার ।

একতরফা আর কিছু বলাটা শেয়ার বাজারের দালালির মত শোনাবে এ জ্ঞান অবশ্য আছে বিপিনের । অগত্যা কাগজের দিকেই দৃষ্টি সংবদ্ধ হল আবার । সরমা চলে গেছে তৎক্ষণে ।

কেমন পড়ায় রে ?

যে কোন একটা প্রশ্নের অপেক্ষায় ছিল মণ্টু ।—ভালো । কিন্তু ওঁকে দেখে তুমি করলে এমন—ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি—যেন আজই উনি নতুন এলেন এখানে ।

ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ! আমি ? কখন ?

কখন ! আমার পাস ফেলের জন্য এত দরদ যদি তোমার, একশ টাকা মাইনে দিয়ে ওঁকে রাখার দরকার ছিল কি শুনি ?

দুবার বেপরোয়া আক্রান্ত হয়ে ধমকে ওঠা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না বিপিনের ।

দিন যায় । সরমার ছাত্র আর একজন বেড়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না । কখনো শেয়ার-ডিস্‌কাউণ্টের সামান্য প্রশ্ন নিয়ে চিন্তিত মুখে সরমার সাহায্য প্রার্থনা, কখনও বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের তুলনামূলক গবেষণা—কখনো বা মাথা ধরায় অপরিমিত অ্যাসপ্রো সেবনের ফলাফল সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা । কিন্তু কথা একাই বলে যেতে হয় । অন্য তরফ নির্বাক শ্রোতা । বিরক্ত হয়ে বলেও ফেলে বিপিন, আচ্ছা আপনি এত কম কথা বলেন কেন, মণ্টুকে তো বেশ পড়ান ? ওই তো, ওই হাসিটুকুই কি জবাব হল !

মণ্টুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়, আর ডিস্‌টার্ব করব না ।....একটা কথা, কস্টিক সোডা লার্জ-স্কেল ম্যানুফ্যাকচারের একটা স্কীম আছে আমাদের । ওর চীপ প্রিপারেশান্‌ তো আপনাদের ভালো জানার কথা ?

সরমা বোঝে. আবার আধ ঘণ্টার সূত্রপাত । জবাব দেয়, আমার বইপড়া জানা ব্যবসায়ে কোন কাজে লাগবে না । চন্দ্র সাহেবকে জিজ্ঞাসা করব, তিনি ভালো পরামর্শ দেবেন ।

না না—চন্দ্র সাহেবকে কিছু বলে কাজ নেই, আমি এমনি বলছিলাম ।

ক্রমশ কতকগুলি অনুভূতির প্রকোপ দেখা দেয় বিপিন চৌধুরীর মনে । শেয়ার বাজারের উত্তেজনায় রোমাঞ্চ নেই । মোটর নিয়ে ছোটাছুটির আভিজাত্যে মাদকতা নেই । আর, শুধুই অর্থ রোজাগারের মোহগ্রস্ততায় আবেগ নেই ।

সরমার অসচ্ছলতার খবর রাখতেন চন্দ্র । একবার তাঁর সাময়িক অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব ও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যানও করেছিল । মণ্টুকে পড়াবার ব্যবস্থা করে দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন তিনি ।

এতদিন অবিনাশই সরমার ভালোমন্দের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে চাপিয়েছিল ।

প্রায় দু-বছর আগের ঘটনা ।

ওর লেখা ছোট একটা চিঠি উপলক্ষ করে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক আজ বন্ধুত্বে পর্যবসিত । কালো ঢ্যাঙা মূর্তিটির আড়ালে কি যেন চোখে পড়েছে সেদিন । চিঠি ভোলেন নি—

সরমা ব্যানার্জীকে মনে আছে মাস্টারমশাই ? যখন আই. এস্‌সি পড়াতেন কলেজে, ছাত্রী ছিল আপনার ? সেবারে প্রথম হয়েছিল কেমিস্ট্রিতে, এবারে বি. এস্‌সি পরীক্ষা দিয়েছে । ভারী ইচ্ছে এম. এস্‌সি পড়ে ।

কিন্তু এদিকে 'যাবার সময় হল বিহঙ্গের' । ডাক্তার মুখভার করেন তাঁদের শাস্ত্র-বহির্ভূত হয়েও দেহটাকে এমনি আঁকড়ে আছি কি করে । আমার অবর্তমানে সরমার ভার নিতে হবে । নিঃসংশয়ে জানি, রত্নের মতো নিজের মূল্যেই দাম ওর । অবহেলায় অযোগ্য লোকের ভিড় বাড়াবার সম্ভাবনাও তাই বেশি । চেনাশুনা সকলের মুখ স্মরণ করলাম, আপনাকেই বার বার মনে পড়ছে । আপনার স্বীকৃতি পেলে এবারের মতো বিশ্বরূপ পরিদর্শন শেষ করতে পারি । আসুন না একবার ওপরের ঠিকানায় ?—অবিনাশ ।

অবিনাশের বাচালতা জানতেন । তবু খটকা লাগে কেমন । ওর বাড়ি এসে স্তম্ভিত । অবিনাশের জ্ঞান ছিল না তখন ।

কিন্তু অবিনাশ বেঁচে গেল সেযাত্রা । বিকলপ্রায় রুক্ষ শীর্ণদেহে প্রাণশক্তির পরাক্রম দেখে বিস্মিত হয়েছিল সবাই ।

তার পরে একদিন সকালে তদারক করতে এসে চন্দ্র থমকে দাঁড়িয়েছিলেন বাইরে । সরমা বকছে অবিনাশকে, চোখ বড় বড় করে দেখছ কি, খেয়ে নাও এটুকু ।

জবাবে অবিনাশের কবিত্ব কানে এলো, 'আজু রজনী হম ভাগে পোহায়নু, পেখনু পিয়া মুখ ছন্দ—'

দুদিন আগেও যাকে নিয়ে অক্লান্ত টানা-হেঁচড়া গেছে যমে-মানুষে, কে বলবে এ তারই কণ্ঠস্বর । চন্দ্র বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁসছিলেন মৃদু মৃদু ।

হাঁ করো, এই সাতসকালে আর রঙ্গ করতে হবে না । সমস্ত শরীরের মধ্যে আছে তো দুটো চোখ ।

অবিনাশের হাস্যধ্বনি ।—কালো, তা সে যতই কালো হোক না কেন, আছে আমার কালো হরিণ-চোখ ।

সরমাও হেসে ফেলেছে হয়তো ।—তোমার হল কি বলো তো, এই না চোখ উলটে বসেছিলে সেদিন ?

আ-হা, মরণ রে ! তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান, তুঁহুঁ মম—

থাক, চললাম আমি । ঠক করে পথ্যের বাটি নামিয়ে রাখার শব্দ । দরজার সামনে এসে অকস্মাৎ রাঙা হয়ে উঠল চন্দ্রকে দেখে । তিনিও বিব্রত ।

আসুন স্যার—

উৎফুল্ল মুখে অবিনাশ উঠে বসতে চেষ্টা করল প্রায় । আসুন মাস্টারমশাই, আসুন । সরমা বলছিল, আপনাকে নাকি দিনে দশ ঘণ্টা করে এখানে আটকে রেখেছি এ ক'দিন । শুনে ওকেই বকলাম ফিরে, অন্যায় করেছ—বৌদি হয়তো ওদিকে দিনে ঠিক দশটিবার করেই

মুণ্ডুপাত করেছেন আমার ।

সরমা সন্ত্রস্ত । চন্দ্রও অবাক । ভূতপূর্ব ছাত্রের মুখে এ কৌতুক বিসদৃশ । কিন্তু রাগতে গিয়েও পারলেন না । মিথ্যে বলে নি সরমা । সমস্ত অবয়বের মধ্যে ওর আছে দুটি চোখ । সহজ, স্বচ্ছ ।

খেয়ে নাও ।

খাচ্ছি । সরমার দিকে চেয়ে হেসে উঠল অবিনাশ, হাঁ করে ফেললে যে একেবারে ! তুমি নাম ধরে ডাকলেও লোকটা যে আমি এক যুগের ওপরে প্রাচীন তোমার থেকে সে খেয়াল আছে ? স্কুল-কলেজ মিলিয়ে বার দশ-এগারো ফেল মেরেছি, নইলে মাস্টারমশাই দুই এক বছরের বেশি বড় হবেন না বয়সে, বৌদি সম্পর্কটা চলতে পারে, পারে না মাস্টারমশাই ?

সরমাকেই বলল, কি চন্দ্রর অস্বস্তি লক্ষ্য করে তাঁকেই শোনাল সঠিক বোঝা গেল না । কিন্তু সঙ্কোচ কাটল চন্দ্রর । তার দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে হল বন্ধুত্ব কাম্য বটে । হেসে জবাব দিলেন, খুব পারে । বৌদি কি করেছেন ভালো হয়ে নিজেই একবার জিজ্ঞাসা করে এসো । ওকে দুধটা দাও সরমা—

এক চুমুকে বাটি খালি করে দিল অবিনাশ । এক ঢোঁক জল খেয়ে হঠাৎ হেসে ফেলল চন্দ্রর দিকে চেয়ে ।—কিন্তু মাস্টারমশাই, যাবার সময় তো হল না বিহঙ্গের ?

তিনি স্মিত হাস্যে জবাব দিলেন, না ।

সরমা কিছু না বুঝে দুজনকেই নিরীক্ষণ করল শুধু । অবিনাশের চিঠির প্রহসন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তার ।

অপর্ণা অভিশাপ না দিক, খুব খুশিও হয় নি । আহার নিদ্রা এমন কি পড়াশুনা ভুলে ঘরের লোকটির বাইরের কারো প্রতি এ টান কোথায় যেন লাগে । অর্থও ব্যয় হয়েছে কম না । অবিনাশের চিকিৎসার ত্রুটি রাখেন নি চন্দ্র ।

কিন্তু চাবি অপর্ণার কাছে ।

প্রথম প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই টাকা বার করে দিয়েছে । ঠাট্টা করে বলেছে, ছাত্রের জন্য মাস্টারের এমন দরদ আর দেখি নি । পড়ানো ছেড়ে দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে বোসো একটা ।

জবাবে অবিনাশের চিঠিটা তার দিকে এগিয়ে দেন চন্দ্র ।—দেখো, মরতে বসেও আরও একজনের জন্য ভাবতে পারে কেমন ।

অ্যাসিড পাউডার গ্যাস নিয়ে কারবার তাঁর, মনস্তত্ত্বের ধার ধারেন না । নইলে করতেন না এমন ভুল ।

সরমা কে ?

ছাত্রী ছিল, এম. এস্‌সিতে ভর্তি হবে এবার—চিঠিতেই তো লেখা আছে সব ।

এ ছেলেটির কে হয় ?

কে আবার হবে, কেউ না ।

তবে !

কি তবে ?

কিছু না । একটা গানের বই খুলে বসল ।

আবহাওয়া প্রতিকূল ঠেকছে । দ্বিধা কাটিয়ে চন্দ্র বলেন, সিন্দুকটা খোলো তো একবার ।

কি দরকার ?

টাকা লাগবে কিছু ।

টাকা নেই সিন্দুকে ।

হ্যাঁঃ, খুব জানো তুমি, আমি দেখলাম সেদিন হাজার টাকা ।

অপর্ণার মেজাজ চড়া, নতুন পিয়ানোটা এল কোথা থেকে ? আমি রোজগার করে এনেছি সে টাকা ?

পিয়ানোর সংবাদ চন্দ্র যদি শুনেও থাকেন, ভুলে গেছেন । প্রয়োজনের সময় বিঘ্ন দেখে বিরক্তি বাড়ল ।—কতদিন তোমাকে বলেছি ঘরে কাঁচা টাকা থাকা দরকার কিছু, এখন তাড়াতাড়িতে কোথায় যাই বলো তো !

গানের বই অপর্ণার হাতে থেকে পড়ে গেল । স্থির নেত্রে রোষ-বহ্নি । কিছুটা বা অভিমান । উঠে সরাসরি ফোন তুলে নিল হাতে ।

চন্দ্র হকচকিয়ে গেলেন কেমন ।—ও কি ?

নিরুত্তরে অপর্ণা ডায়েল ঘুরিয়ে নম্বর মেলাতে লাগল ।

কাছে এসে চন্দ্র রিসিভার কেড়ে নিলেন হাত থেকে ।—কি ব্যাপার ?

পিয়ানো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলব ।

সময় লাগে তাকে শান্ত করতে । কিন্তু টাকা দরকার । সময়ও কম । চন্দ্র কটাক্ষে দেখেন স্ত্রীটিকে ।

চেক বইটা—

অপর্ণা নীরব ।

চেক বইটা দেখে দেবে কোথায় আছে ?

এর অনেক দিন বাদে জবাব দেবার সুযোগ অবশ্য পেয়েছেন চন্দ্র । না বলার মধ্য দিয়ে হয়তো বলেও ছিলেন কিছু ।

বিনা আমন্ত্রণে সেদিন অবিনাশকে দেখে চন্দ্র বিস্মিত । খুশিও ।

এসো, এসো—হঠাৎ তুমি ! কই শরীর তো সারেনি তেমন ?

সহাস্যে আসন গ্রহণ করল অবিনাশ ।—ওইটেই বিশেষত্ব আমার, কেমন আছি দেখে বোঝবার জো-টি নেই ।

খুব ভালো ।

না তো কি । যমকে ফাঁকি দিয়েছি পাঁচ মাস আগে আর পাঁচ মাস বাদে হয়তো যমরাজা নিজে আসবেন স্বয়ং । পরোয়া করিনে, আপনি আছেন ।...এক্ষুনি উঠব কিন্তু, কাজে এসেছি একটু ।

পকেট থেকে তিনখানা একশ টাকার নোট টেবিলের ওপর রাখল সে ।—সরমাকে লেখাপড়া শেখানো মিথ্যে মাস্টারমশাই । আমার অসুখে কত খসল আপনার সে হিসেবটুকুও

রাখে নি ঠিকমতো । ভালোই হয়েছে, আমি অবশ্য রাগ করেছি মুখে, যে দেনা শুধতে পারা যাবে না তার হিসেব নাই রাখলে, তা বলে—

চন্দ্র বিব্রত মুখভাব দেখে হেসে উঠল, আপনি একেবারে সোজামানুষ মাস্টারমশাই । আমার টাকা এমনি আটকে থাকলে পাঁচ মাসে সতেরো বার তাগিদ দিতুম । উঠল, আচ্ছা আসি, আর একদিন বৌদির সঙ্গে বোঝাপড়া করে যাব ।

কিছুক্ষণ । চন্দ্র অন্যমনস্ক । অপর্ণার কণ্ঠস্বরে মুখ তুললেন ।

মূর্তিটি কে ?

অবিনাশ, পছন্দ হল ?

খুব । মাস্টারমশাই বলে ডাকলেও কথাবার্তা পূজনীয় ব্যক্তির মতো, পছন্দটা তাইতে বাড়ল আরো ।

চন্দ্র নোট ক'টা তার দিকে ঠেলে দিলেন ।—তুলে রাখো, ওর অসুখে যে টাকা খরচ হয়েছিল ফেরত দিয়ে গেল ।

মোটা কেমিস্ট্রি বইয়ের আড়ালে তাঁর মুখ দেখা গেল না ।

॥ ২ ॥

সায়েন্স কলেজ । ল্যাবরেটারির কোণের দিকে সরমার ডেস্ক । আজানু অ্যাপ্রনের দু হাত কনুই পর্যন্ত গোটানো । অবিন্যস্ত রুক্ষ কেশ । অ্যাসিড গ্যাস এবং ধোঁয়ায় মুখ আচ্ছন্ন । মাঝে মাঝে গবেষণার প্রতিক্রিয়া লিখে রাখছে খাতায় ।

সব ক'টা ডেস্কএ বার্নার জ্বলছে সারি সারি । ছাত্ররাও কর্মনিবিষ্ট । সরমার সামনের ছেলেটি বিমনা হয়ে পড়ছে বার বার । নিজের কাজ দেখতে গিয়ে প্রতিবারই চোখ পড়ছে স্বাস্থ্যদৃপ্ত নারীপ্রাচুর্যের দিকে ।

ওপাশ থেকে স্বজাতীয় আর একজন টিপ্পনী কাটে দিশি ভাষায়, ফুটন্ত অ্যাসিডে মুখটা যেন পোড়ালে হে মাথুর, কিন্তু কৈফিয়ৎ দেবে কি ?

যারা বুঝল তারা হেসে উঠল । রহস্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করল অন্য সকলে ।

অভিযুক্ত আসামী প্রতিবাদ জানায়, দেখেছ মিস্ ব্যানার্জী, যা তা বলছে ।

সরমা শিশি থেকে আরো খানিকটা অ্যাসিড ঢেলে দিল ফুটন্ত সলিউশনে । ওদের হাসি-ঠাট্টায় একবার কান দিলে রক্ষা নেই ।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ঝাঁজ খানিকটা এদিক ওদিক ভেসে আসতে সাড়ম্বর কাশির সঙ্গে নাকে রুমাল চাপা দিল ছেলেরা । ঝাঁজের উগ্রতা একেবারে ছিল না এমন নয় । কাছে ছিল বলে সরমার নিজের চোখেই জল এসে গেছে । কিন্তু ঘটা করে কাশবার মতো এমন কিছু করে ফেলে নি সে । তবে অপ্রস্তুত হল, আরও একটু বেশিই ঢেলে ফেলেছে ।

ছেলেরা রেহাই দেবে না তাকে ।—ওটা কিসের গবেষণা হচ্ছে মিস্ ব্যানার্জী, প্রাণ গেল যে !

সরমা সামনের এলোমেলো দুই-একগাছা চুল একদিকে সরিয়ে জবাব দিল, পরিশ্রম করে কাশতে হলে প্রাণ যাবেই, কাশি বন্ধ করো—এর নাম অ্যাসিটিল্-ক্লোরাইড ।

দু দিন বাদে এ মেয়েই প্রথম হবে পরীক্ষায় সকলে জানে। ওরা বিব্রত করতে ছাড়বে না তবু। সর্বনাশ! আমাদের তাড়াতে চাও এখান থেকে মুখে বলো না কেন।

মুখে বললে কি আর তোমরা যাবে!

ওটা কি কাজে লাগবে মিস্ ব্যানার্জী? দূর থেকে রাশ টেনে ধরে এক ভাটিয়া ছাত্র।

সব‑' হাসিমুখে নিজের কাজ নিরীক্ষণ করতে লাগল। এমনি চলতে পারত আরো কিছুক্ষণ। দোরের কাছ থেকে হঠাৎ একজন বাঙালী ছাত্র নাটকীয় অভ্যর্থনা করে উঠল, স্বা-গতম্!

দ্বার-প্রান্তে দৃষ্টি পড়ল সকলের। আগন্তুক অবিনাশ। সুপরিচিত এবং সুপ্রতীক্ষিত। সপ্তাহে দু-তিন দিন তার এখানে আগমন অনিবার্য। অস্ফুট আনন্দ গুঞ্জরণে হল ভরপুর। সরমা ছদ্ম-গাম্ভীর্যে নিবিষ্ট-চিত্ত।

মাথুর ছেলেটি দোষস্খালনে সচেষ্ট হল এইবার। দরাজ গলায় আহ্বান জানাল, এসো অবিনাশবাবু, বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে সময় নষ্ট কোরো না। মিস্ ব্যানার্জী অ্যাসিটিল্ ক্লোরাইডের গন্ধ-ধূপ রচনা করে প্রতীক্ষায় আছেন, তোমার বিলম্ব দেখে চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে দেখো—সঙ্গে আমাদেরও।

সরমা ডেস্কে ঝুঁকে পড়ল আরো। হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়াল অবিনাশ। নাকে কাপড়ের খুঁট এবং চোখে জামার আস্তিন চেপে ধরল নাটকীয় ভঙ্গিতে।—এই যে এসে গেছি।

বসে থাকো ওই টুলটায়। মুখ না তুলেই সরমা ঝাঁঝিয়ে ওঠে প্রায়।

ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তোমার এক্সপেরিমেন্টের চোটে ভূত পালাবে এক মাইল দূর থেকে, আমি তো ছার মানুষ।

তবে পালাও, আমার দেরি হবে।

হুঁ। বারোমাসে তেরো রোগে ভুগি বটে সত্যি কথা, পুরুষমানুষ নই তা বলে! গম্ভীর মুখে সরমার টুলটা দূরে সরিয়ে বসে পড়ল। পরে কাশতে লাগল বিপুল বেগে।

দৃশ্য উপভোগ্য। সকলেই হাসছে। সরমাও।

অবিনাশ বলল, কালে কালে দেখব কত, আগে ছিল উনুনের ধোঁয়ায় জল গড়াত মেয়েদের চোখে, এখন ল্যাবরেটরির গ্যাসে। এর পরে বলবে, যুদ্ধ করব এরোপ্লেন চড়ে আর বক্সিং শিখব জো-লুইর কাছে।—আজই মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করব আমি।

বিপুল হাস্য ধ্বনি।

ছদ্ম কোপের অভিব্যক্তি সরমার মুখে।—থামবে?

অবিনাশ নির্বিকার।—ধমকে থামালে থামব বইকি।

কিন্তু ছেলেরা ছাড়বে না ওকে। নিরীহ প্রশ্ন করে একজন, মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করবে কেন অবিনাশবাবু?

কেন করব না তাই বলো। এমনিতে বছরে পাঁচ মাস থাকি হাসপাতালে, তার ওপর হামেশা এই ল্যাবরেটারির ঝাঁজ—বাঁচব ক'দিন! মিনিস্টারকে বলব, সায়েন্স পড়া চলবে না মেয়েদের, কেমিস্ট্রি তো নয়ই। অন্তত ফ্যাসিটি-ক্লোরাইড—

অ্যাসিটিল্-ক্লোরাইড। সংশোধন করল একজন।

তর্ক জুড়ে দেয় অবিনাশ, পুরোমাত্রায় ফ্যাসিজম্ পদার্থটির বিক্রমে, ফ্যাসিটি-ক্লোরাইডই ঠিক নাম।

ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং শব্দে। ছুটির ঘণ্টা। ছেদ পড়ল রসালাপে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যাবরেটারি প্রায় ছাত্রশূন্য। সরমা এবং আর জনাকতক তাদের অসমাপ্ত কাজটুকু তাড়াতাড়ি শেষ করে নিচ্ছে। অবিনাশ ধ্যানমগ্ন। অর্থাৎ, নিঃশব্দে বসে।

ডাঃ চন্দ্র উপস্থিত ল্যাবরেটারিতে। অবকাশ সময়ে মাঝে মাঝে টহল দেন। সরমা লিখছিল মাথা নিচু করে, লক্ষ্য করল না। চন্দ্র একে একে সকলের কাজ নিরীক্ষণ করলেন চুপচাপ। কাছে আসতে সরমা সচকিত হয়ে অবিনাশকে আড়াল করে দাঁড়াল।

অ্যাসিটিল্-ক্লোরাইড ?

হ্যাঁ। পিছনে হাত দুটো তার ইশারায় অবিনাশকে নির্দেশ দিচ্ছে কিছু।

চন্দ্র বললেন, অবিনাশের জন্য ব্যস্ত হতে হবে না তোমাকে, ওর অধ্যবসায় তোমার থেকে কম নয়।

এঁর সামনে অপ্রস্তুত হওয়া এই প্রথম নয়। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে সরমা বার্নারের শিখা বাড়িয়ে দিল খানিকটা।

ধ্যান বুদ্ধের মতোই বসে আছে অবিনাশ।

চন্দ্র বার্নার নিবিয়ে দিলেন।—তারপর অবিনাশ, তুমি এখানে যে ?

অবিনাশ সবিনয়ে জবাব দিল, এখানে এসময়ে আপনি আসবেন জানতুম না স্যার। কোনদিন তো এমন ফ্যাসাদে পড়ি নি।

সরমা বিব্রত মুখে ফিরে তাকাল একবার ; আর যারা ঘরে আছে, কথা কানে গেলেও বাংলা বোঝে না এই রক্ষা। মৃদু হেসে চন্দ্র অবিনাশের সামনে এসে দাঁড়ালেন।—তার মানে প্রায়ই এখানে এসে থাক তুমি।

প্রায়ই। আসাটা প্রায় রাইট-এ দাঁড়িয়ে গেছে এখন।

কিন্তু দারোয়ান তো জানে বাইরের লোকের এখানে আসা বারণ।

অমায়িক হাসিটুকু সহজেই দেখা দেয় অবিনাশের মুখে। উঠে দাঁড়াল।—দারোয়ান এও জানে স্যার আপনি সায়েন্স কলেজে চলে এলেন বলেই আমার আই. এস্‌সি পড়া খতম হয়ে গেল। তাই বলে না কিছু।

সরমা প্রমাদ গুনছে মনে মনে। বেশি ঘাঁটাতে গেলে কি যে বলে বসবে ও ঠিক নেই। কিন্তু এখানে পদমর্যাদা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ডাঃ চন্দ্রও। অল্প হেসে ঘুরে দাঁড়ালেন। —তোমার সঙ্গে কথা আছে সরমা, কাজ শেষ হলে আমার ঘরে এসো একবার। অবিনাশকে আহ্বান জানালেন, তুমি আসবে নাকি ?

না মাস্টারমশাই, সরমা রেগে যাচ্ছে। আমি বরং বাইরে ফাঁকা হাওয়ায় দাঁড়াই একটু। কেমন পাকা স্বাস্থ্য আমার জানেন তো, ফ্যাসিটি-ক্লোরাইডের দপটে ঘায়েল হয়ে গেছি।

দ্বিতীয় অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে সে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। নীরব হাস্যে চন্দ্রও। ডেস্কের সরঞ্জাম যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে সরমা অ্যাপ্রন খুলে ফেলল। সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে চন্দ্রর ঘরে এলো।

বোসো। ডাক্তার সমাদ্দার রিটায়ার করে যাচ্ছেন শিগগীরই, শুনেছ ?

না তো ! সরমা বিস্মিত ।

তোমাদের এই সেশানই শেষ, আর ধরে রাখা যাবে না । নিজে কতকগুলো এক্সপেরিমেন্ট করবেন বলে অবসর নিচ্ছেন, প্রকাণ্ড ল্যাবরেটারিও ফেঁদে বসছেন বাড়িতে । জনকতক অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবেন, আমাকেও চাকরি ছাড়তে হতে পারে ।

সরমা নীরবে শুনছে ।

তুমি পরীক্ষার পর রিসার্চ করতে চেয়েছিলে না ?

সরমা ঘাড় নাড়ল ।

একটু ভাবলেন তিনি ।—তাঁর সঙ্গে কাজ করতে চাও তো চেষ্টা করে দেখতে পারি । ভালো রিসার্চ-স্কলারের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে অবশ্য...তবু আমি বললে হবে । কি বলো ?

খুশির ছোঁয়া লাগে । তবু শান্ত মুখেই জবাব দিল, আমি আর কি বলব স্যার...এ কাজ আমি কতটা পারব আপনিই ভালো জানেন ।

চন্দ্র নীরবে চেয়ে থাকেন স্বল্পক্ষণ ।—আচ্ছা যাও, পরে খবর দেব ।

কি নিয়ে কাজ করবেন তিনি ?

চন্দ্র হেসে উঠলেন হঠাৎ, সেটা তিনি নিজেও জানেন কি না সন্দেহ আছে । তবে... সে জন্যে ভাবিনে, যাই করুন ভবিষ্যতে তার দাম হবে । তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবে এইটেই বড় কথা । আচ্ছা, ভালো করে পড়াশুনা করো তো এখন, রেজাল্ট ভালো হওয়া চাই ।

পথের ধারে অবিনাশ প্রতীক্ষারত । সরমা কাছে আসতে ধমকে উঠল, ছুটির ঘণ্টা বেজেছে তো ঘণ্টাখানেক আগে, এতক্ষণে ছাড়লেন চন্দ্র সাহেব ?

হ্যাঁ । সরমা চেষ্টা করল গম্ভীর হতে । তোমার স্বভাব বদলাবে কবে ?

মরলে, দিন-তারিখ সঠিক বলতে পারছি না এখন ।

সমুদ্রের ধারে একটা নির্জন জায়গায় অবকাশ পেলেই এসে বসে দুজনে । সেদিকে পাশাপাশি অগ্রসর হল । সরমা বলল, ঠাট্টা নয়, ভদ্রলোক নেহাত ভালো মানুষ তাই, কোনদিন সত্যিই দারোয়ান ডাকলে বুঝবে মজা ।

ছদ্ম-রাগে ভুরু কোঁচকাল অবিনাশ ।—দেখো, রাগিও না । বছরে পাঁচ মাস হাসপাতালে কাটালেও গোটা তিরিশেক বসন্ত পার হয়েছে এই কাঠামোয় । চন্দ্রর ওই পর্বতকান্তির পায়ে আছড়ে পড়ে গর্জন করব, অপমান সহ্য হবে না স্যার, যুদ্ধং দেহি !

শাসন মাথায় থাকল । সকৌতুকে ফিরে তাকাচ্ছে পথচারীও । শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে সরমা হাস্য দমন করল কোন প্রকারে ।

নির্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে বালুর ওপর বসল তারা । সামনে অতলান্ত জলরাশির দিকে চেয়ে অবিনাশ সুগম্ভীর প্রশ্ন করে, আর কি বক্তব্য তোমার ?

সায়েন্স কলেজে আসতে পাবে না আর ।

আসবই । ছেলেরা আমাকে ভালোবাসে, মেয়েরাও বাসত, চেহারার জন্যে পারে না ।

মেয়েরা বলতে আমি ছাড়া আর কে থাকে ল্যাবরেটারিতে ?

মেয়েদের বেলায় বহুবচন প্রয়োগ করতেই ভালো লাগে আমার—তোমার কথাই

বলছি ।

হুঁ । নিরীহ মুখে সরমা একমুঠো বালু ওর শার্টের কাঁধের ফাঁক দিয়ে পিঠময় ছড়িয়ে দিল ।—আর এটা কেমন লাগে ?

এ হেন দুষ্কর্ম এই প্রথম নয় । গম্ভীর মুখে অবিনাশ দু হাত ভরে বালু তুলতে লাগল । অর্থাৎ, আজ সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না ।

সরমা সশঙ্কে সরে গেল খানিকটা ।—ভালো হবে না বলছি ।

কি ভালো হবে না ?

আমি চ্যাচাব—

আচ্ছা অন্ধকার হোক । বালু ফেলে দিল অবিনাশ ।

আপসের চেষ্টা দেখে সরমা, ঝেড়ে দিচ্ছি— । জামা তুলে রুমাল দিয়ে পিঠ মুছে দিতে লাগল ।

ওতেও রাগ পড়বে না, এ নিয়ে তিন-চারদিন হল ।

বেশ হল । ছেলেদের সামনে অমন করবে আর ?

আমার কি দোষ, ওরা খুশি হয় ।

তা বলে তুমি উসকে দেবে ওদের ?

নিশ্চয়ই দেব । কোথায় কাব্য করব উদাস কণ্ঠে—অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের পল্লবে, অধরা ছিল তোমার কাঁকন-পরা নিটোল হাতের মধুরিমায়—না ফ্যাসিটি-ক্লোরাইড নিয়ে হাবুডুবু ।

সমস্বরে হেসে ওঠে দুজনেই । শুভ্র দুই হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সরমা বলল, কাঁকন কই ?

মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সরমার দাদা মণিময় । নাটক লেখা শুরুর পর থেকে ব্যানার্জী ছেড়ে বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছে । কোট প্যাণ্ট, নেকটাই এবং ডার্বি-শু দুটোও সিকি দরে বিক্রি করে দিয়েছে এক বন্ধুর কাছে । বকমারি খদ্দরের চাদর এবং তালপাতার চটির জন্য মাঝে মাঝে সরমার কাছে ধার চাইতে হয় । না পেলে রুক্ষমূর্তিতে শরণাপন্ন হয় অবিনাশের । টাকা পায় এবং সঙ্গে আরো কিছু, যার জন্যে মনে মনে ওকে জ্যান্ত কবর দিতে ছাড়ে না প্রায়ই ।

বিপত্নীক । ছেলে আছে বছর পাঁচেকের । স্ত্রী বেঁচে থাকতে সঙ্কল্প ছিল ছেলেকে সাহেব ইস্কুলে পড়তে পাঠাবে । অধুনা বাংলা দেশের শান্তিনিকেতনই পছন্দ বেশি । এ সম্বন্ধে সরমার পরামর্শও নিতে গিয়েছিল । জবাব পায় নি । জানে সরমা অবহেলা করে তাকে । ফলে ছেলের মাথায়ই সশব্দে চাঁটি পড়েছে একটা ।

দাদার ছোট এক অপরিসর গলির মধ্যে একতলায় পাশাপাশি দুখানি ঘর । প্রথমটি মণিময়ের আবাস, তার পুঁথিপত্র হারমনিয়াম সমেত । পরেরটা সরমা এবং বিনুর ।

মণিময়ের গানের টিউশন আছে গোটা দুই । রেডিও থেকেও যৎকিঞ্চিৎ রোজগার হয় । আবার কোথায় কোন রেকর্ড কোম্পানির অস্থায়ী সুর-শিল্পীও বটে । কিন্তু মাসের শেষে ঘরে বাইরে ধার চাওয়াটা আছেই । সকলকেই আশ্বাস দেয়, নতুন নাটকটা সিনেমায় কণ্ট্রাক্ট

হলে ঋণ পরিশোধ করবে । স্টুডিওতে প্রাত্যহিক হাজিরা এবং বিনীত আবেদনেরও বিরাম নেই । কিন্তু কন্ট্রাক্টটুকু হয়ে উঠছে না আর ।

প্রথম প্রথম লিখে সরমাকে দেখাতে চেষ্টা করেছে।—পড়ে দেখ ।

পড়ে নীরবে পাণ্ডুলিপি প্রত্যর্পণ করেছে সরমা । নিষ্ফল প্রতীক্ষা । সরমা আর বলে না কিছু ।

কেমন লাগল ?

তোমাকে এ রোগে পেল কেন আবার, বেশ তো গান নিয়ে ছিলে ।

অবজ্ঞা মর্মান্তিক ।—তুই আর্টের বুঝিস কি শুনি ? অ্যাসিড আর গ্যাস নয়, এর নাম সাহিত্য ।

ভুলবশতই পাণ্ডুলিপি খোলা পড়ে থাকে অবিনাশের চোখের সামনে । তার পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্যমনস্ক না থেকেও উপায় নেই । পরে ব্যস্ত হয়ে উঠে আসে।—আমার খাতাপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কেন আবার, সবই তো কাজে লাগে তোমার ! কোনটা ওটা, শেষের নাটকটা নাকি ?

হ্যাঁ, এই নাও । প্রথমটা লিখতে শুরু করো এবার ।

মণিময় নিজের দুর্ভাবনায় তন্ময় । খেয়াল করল না । বলল, ক'টা বইয়ের দোকান তো ছাপাতে রাজী এক্ষুনি, বলে কপি-পাইট বিক্রি করে দাও—আমাকে কলা দেখাবার মতলব আর কি । ভাবছি দেখে শুনে দিয়ে দেব একজনকে । আমার আবার পড়ে দেখা হয় নি লেখার পর থেকে, ভুলচুল নেই তো কিছু ?

কিছু না ।

মণিময় আসন নিল তার পাশে । উৎসাহ ঘনীভূত ।—আচ্ছা হিরণ্ময়ীর ডায়লগগুলি একটু বেশি স্ট্রেইট হয়ে গেছে, না ? মুখের ওপর সত্যি কথা ঝপাং করে বলে দেওয়া... মিল নেই সাধারণ পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে...

আমিও ভাবছিলাম সে কথা । অবিনাশ চিন্তিত ।

কিন্তু ওই জন্যেই তো এমন অ্যাট্রাকটিভ হয়েছে মেয়েটির চরিত্র ।

তা তো হয়েইছে । পড়ে বিয়ে করতে ইচ্ছে যাচ্ছিল হিরণ্ময়ীকে, সরমার ভয়ে চুপ করে আছি ।

অতঃপর একজনের মারমুখী বাক্যবাণ এবং আর একজনের বোবা অভিব্যক্তি । সরমা মুখে আঁচল গুঁজে পাশের ঘরে চলে আসে ।

কিন্তু সম্প্রতি তার লেখা নিয়ে পরিহাসের দুঃসাহস সরমা এমন কি অবিনাশেরও নেই । বছর দুই ঘোরাঘুরির পর সত্যিই একটা নাটক ছাপা হয়ে গেছে । বাংলা সাহিত্যে বিবর্তনের ছাড়পত্র । ওর ভয়ে কথায় কথায় অবিনাশের কাব্য আওড়ানোও বন্ধ ।

সম্প্রতি এর চেয়েও বড় সমস্যা উপস্থিত । তার লেখা আর একটা সদ্য-সমাপ্ত নাটক কপি করে দিতে হবে । নিরুপায় হয়ে সরমা অবসর মতো কপি করছেও । কিন্তু বিলম্ব দেখে মণিময়ের ধৈর্য বিড়ম্বিত ।

সরমা এবং অবিনাশ সেদিন সবে ফিরেছে সায়েন্স কলেজ থেকে । মণিময় চৌকিতে আধ-শোয়া । লেখায় মগ্ন । মেঝেতে বিনু বসে আছে গম্ভীর মুখে । কান্নার সদিচ্ছাটুকু প্রবল ।

বার দুই ধমক খেয়ে সে চেষ্টা আর করে নি। একজন ছোকরা চাকর ওকে রাখত, সম্প্রতি তার অসুখের দরুন শিশুটি একেবারে নিঃসঙ্গ। সসপ্যানে দুধ রেখে গেছে গয়লা। অমনি পড়ে আছে, কেউ ঢেকে রাখে নি।

ঘরে প্রবেশ করেই অবিনাশ ঘুরে দাঁড়াল। ঠোঁটের ওপর তর্জনী ঠেকিয়ে ইশারা করল, চুপ, লিখছে!

ঘরের চারিদিক দেখে নিয়ে সরমা বিনুর দিকে তাকাল।

শিশুটির ধৈর্য রক্ষা সম্ভব নয় আর। ফুঁপিয়ে উঠল, পিসী, খিদে পেয়েছে।

নাট্যকার তন্ময় তখনো।

সরমা নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ না তুলেই মণিময় আপ্যায়ন করল, শুনবি খানিকটা?

ছেলেটাকে খাওয়াও নি কেন এখনো?

অ্যাঁ—? ধ্যেৎ ছাই, দিলি মুডটা নষ্ট করে। ওই তো দুধ, খাইয়ে দে—ওর ক্ষিদে পেয়েছে।

আমার দায় পড়েচে, থাক শুকিয়ে, হাতের কাচে স্টোভ, গরম করে ওকে খাইয়ে তারপর রাজ্যোদ্ধারে বসতে পার নি?

মণিময় সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। দুধ খাওয়ানোর মতো তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে তার লেখার প্রতি এ অশ্রদ্ধা বৃশ্চিকদাহের মতো লাগে। চিন্তিত। মানুষের সূক্ষ্ম বোধ-শক্তি, শিল্পী-মন, এসবের বোধ করি আর দাম থাকবে না অদূর ভবিষ্যতে। বিনুকে নিয়ে সরমা চলে গেছে তার ঘরে। দুধের প্যান এবং স্টোভ হাতে অবিনাশও।

পাশের ঘর। সরমা চৌকিতে বসে। অবিনাশ স্টোভে দুধ জ্বাল দিতে ব্যস্ত। বিনু দ্রষ্টা।

অবিনাশ! মণিময়ের আহ্বান।

আজ্ঞা করুন।

একটা ভালো কনভেণ্ট-এর খোঁজ করিস তো, বেশ ট্রেনিং-টেনিং দেয়—

তুমি থাকবে সেখানে?

না, বিনুকে পাঠাবো...কি বললি? ফাজলামো হচ্ছে?

অবিনাশ সামলে নেয় তাড়াতাড়ি, দেখছ দুধ জ্বাল দিচ্ছি, কি বলছ সে কি আর শুনতে পাচ্ছি ছাই! প্যান্ নামাল, বলো এবার—বিনুকে কনভেণ্ট-এ রাখবে?

ওঘর থেকে মণিময়ের পরীক্ষাসূচক ভ্রূকুটি।

আরো নিস্পৃহ শোনায় অবিনাশের কণ্ঠস্বর, অমন দুই-একটা জায়গা তো আমার জানাই আছে।

কি নাম?

পিকাডিলি চাইলড্‌স হোম।

চাইলড্‌স হোম...এই বম্বেতে?

না লণ্ডনে। কই সরমা, দুধটা খাইয়ে দাও না ওকে, এখনো বসে কেন? যত দোষ মণিময়দার, না? নিজের এদিকে উঠতে বসতে সময় লাগে তিন দিন।

হাসি চেপে সরমা বাটিতে দুধ ঢেলে বিনুর মুখের কাছে ধরল । চোখ পাকিয়ে মণিময় উঠে এলো । অবশ্যম্ভাবী অগ্ন্যুৎপাদন ।

ক'দিন তোকে বারণ করেছি এ বাড়িতে ঢুকবিনে ?

আমাকে বলছ ? সকরুণ জিজ্ঞাসা ।

তোমার ইয়ারকির পাত্র আমি, না ? আমি সাবধান করে দিচ্ছি সরমা, ও যেন এ বাড়ি না আসে আর । খাতির জমাতে হয় তার জায়গা বাইরে আছে ।

তারা যে যার অন্য দিকে চেয়ে থাকে । দুধের বাটি নিঃশেষ করে বিনু সুস্থির হয়ে বসল ।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে মণিময় জামা-কাপড় বদলে প্রস্তুত হল । বেরুবে । চায়ের জল চড়াতে গিয়ে সরমার দৃষ্টি পড়ে সেদিকে ।—বাইরে যাচ্ছ মানে ?

নিরুত্তরে সে মাথা আঁচড়াতে লাগল । কাছে এসে সরমা ঝাঁজিয়ে উঠল আবার, যাচ্ছ কোথায় ?

চুলোয়, সর !

সরবার জন্য আসে নি সরমা । সরোষে বলে উঠল, পনেরো দিন ধরে চাকরটার অসুখ, একটা লোক খোঁজ করতে পার নি ? ছেলে দেখবে কে, আমায় পড়াতে যেতে হবে না ?

ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে যা ।

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল । রুদ্ধ আক্রোশে সরমা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ । অবিনাশ চা ঢালছে পেয়ালায় ।

দেখলে কাণ্ডটা ?

দেখলাম ।

প্রতিবন্ধক নতুন নয় । গতকালও ঠিক একই কারণে পড়ানো কামাই গেছে । সেটাও বড় কথা নয়, কিন্তু আর একজন সমস্ত দায় ওর কাঁধে ফেলে হাওয়ার ওপর ঘুরে বেড়াবে সেটা অসহ্য ।

যা হোক কিছু ব্যবস্থা করো, একটু শিক্ষা হওয়া দরকার । কালও পড়াতে যাইনি, আজও হল না । ওদিকে দু দিন বাদে ক্লাসের পরীক্ষা ছেলেটার ।

তা ছাড়া দু দিনের অদর্শনে ছটফটিয়ে মরছে ছেলেটার দাদাও । অকৃত্রিম সহানুভূতি অবিনাশের ।

ফাজলামো রাখো । সরমা চটে ওঠে ।

রাখলুম । চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল সে ।—ভাবনা নেই, থাকব'খন ছেলে আগলে । ঠাকুর চাকর থেকে পাহারাদার পর্যন্ত কিছু আর বাকি রইল না ।

সরমা হেসে ফেলল, কিছুই না ?

তা আর না ! ডবল তালা লাগানো ও দরজায় সে আমার খুব জানা আছে ।

বিনুর ওপর চোখ পড়তে সরমা হাসি চেপে গেল । নিরীহ মুখে বলল, কেন বিনু তো ডাকছেই পিসেমশাই বলে...ওতে হবে না ?

একদা হাস্যপরিহাসের ফলে বিনুর মুখে এ ডাকই স্থায়ী হয়ে গেছে । অবিনাশ সরমার পড়ার টেবিলের সামনে বসে বলল, ও একটু বড় হলেই বুঝবে লোকটা চিনির বলদ মাত্র ।

আবহাওয়া বুঝে ক্ষুদ্রকায় বিনোদচন্দ্র দু হাত তুলে বায়না ধবল, পিসী কোলে—

থাম। ওই ওখানে যা, আমি চললাম ছেলে ঠ্যাঙাতে।

পথে নেমে অনুতপ্ত হল একটু। এমন ঠাট্টা না করাই ভালো ছিল।

মনে মুখে আজ আগল নেই সরমাব। কিন্তু কেন নেই? কারণ, অবিনাশের সংসারী রূপটা কল্পনার বাহিরে। প্রধান অন্তরায় তার রোগজীর্ণ ভাঙা স্বাস্থ্য। এ অবিনাশ যেমন জানে, সবমাও জানে তেমনি। এবং জানে বলেই নিশ্চিন্ত।

স্বার্থপরতা?

তাই।

আপন অন্তস্তল তলিয়ে দেখতে চেষ্টা কবল সবমা। নিজেব সুস্থ সবল পরিপূর্ণতায় আহ্বান না থাকুক আমন্ত্রণ তো আছে। ডাক না দিক সাড়া দেবে। অবিনাশ সেখানে বাইরের মানুষ মাত্র।

অবিনাশকে বাদ দিলে আর যে কোন পরিবেশে নিজেব প্রাচুর্যেব উৎসটাতে শুকনো টান ধবে যেতে পাবে এ ভেবে দেখেছিল কখনো?

না।

পবস্পরকে নিযে এ হাস্যকৌতুকে অনেক আগেই ছেদ পড়ে যেত তাহলে।

বিনু গম্ভীর মুখে একখণ্ড কাগজ শতধা কবছে। অবিনাশ চেযাবে বসে। টেবিলে মণিমযেব নাটকেব পাণ্ডুলিপিটা পড়ে আছে। পাশে সরমার পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষবে কপিকবা কতকগুলি পৃষ্ঠা গ্রন্থিবদ্ধ।

পাতা ওলটাতে লাগল।

মণিময ফিরে এলো একটু বাদেই। অবিনাশকে নাটকপাঠে নিবিষ্ট দেখে বিবক্তি দমন কবল।

তুই আছিস এখনো দেখছি।

অবিনাশ নিরুত্তর। তন্ময়তাব অভিব্যক্তি।

নিজেব লেখা পড়তে দেখলে সাত-খুনও মাপ করে থাকে লেখককুল। আক্ষেপ করল, সবমাকে দিযে আব কপি করানো হয়ে উঠল না। রোজ একপাতা আধপাতার বেশি এগুবে না অথচ তাড়াতাড়ি দরকার আমার।

আমিও ধরব'খন। এখন ডিসটার্ব কোরো না, খুব ইণ্টারেস্টিং লাগছে।

মণিময় বিগলিত।—আচ্ছা, আচ্ছা। সরমা সত্যিই আটকে গেল ভেবে ফিবে এলাম। বিনুকে ডেকে নিযে পাশের ঘরে গিয়ে বসল সে।

সহসা মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপল অবিনাশের। সরমার লেখা পাতাগুলির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল কি। মুখে কৌতুকের আভাস। উঠে গম্ভীর মুখে মণিময়ের ঘর থেকে কতকগুলি সাদা কাগজ এবং তারই কলম নিয়ে এলো। মণিময় হর্ষোৎফুল্ল আবারও।

অবিনাশেব সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত সরমার কপি করা হস্তাক্ষরগুলিতে। সেগুলি দেখে দেখে কি লেখে আর ছিঁড়ে দুমড়ে ফেলে দেয় টেবিলের নিচে। কলেজে পড়তে যে বিদ্যায় বহু ছেলেকে জব্দ করেছে, বিব্রত করেছে—অনেকদিন বাদে আজ সেইটুকুরই

চপল-সাধনায় নিবিষ্টচিত্ত। ঘণ্টা দুই চলল এমনি লেখা নকলের মুসাবিদা। সমস্ত কাটাছেঁড়ার পর গোটা গোটা মেয়েলী অক্ষরে যে লেখাটুকু সুসমাপ্ত, নিজেই নিঃশব্দে হাসছে সেটা পড়ে।

অবিনাশ, তুমি জানো কত ভালোবাসি তোমাকে, অথচ মুখ ফুটে আজো তুমি বললে না কিছু। এই নরককুণ্ডে পড়ে আছি, এখান থেকে তাড়াতাড়ি আমাকে উদ্ধার করবে তো করো, নইলে চিরদিন দুঃখ করতে হবে। এই শেষবার শেষ কথা বলে দিলাম তোমাকে। —সরমা।

ভাঁজ করে পকেটে রাখল। পরে চৌকিতে শুয়ে পড়ল সটান। মণিময় উঠে এলো শশব্যস্তে।—কতদূর এগুলি ?

একটুও না। গম্ভীর।

যাঃ।

অমায়িক হাস্যে টেবিল খুঁজল। এক পাতাও কপি করা হয় নি বটে।—হাসি নিবল। কি করলি এতক্ষণ ?

ভাবলুম।

লেখা সম্বন্ধে ?

না, তোমার মতো মানুষকে কি করে শায়েস্তা করা যায়, সেই সম্বন্ধে।

মুহূর্তের আত্ম-বিভ্রম। পরে দুই চোখের নিঃশব্দ অগ্নিবিকিরণ। বেরোও বাড়ি থেকে—

সরমা আসুক, তাকে নিয়ে বেরুবো।

তুমি যাবে কি না এক্ষুনি আমি শুনতে চাই ?

তোমার কথায় নয়। পড়ো এটা। সক্রোধে পকেটের চিঠিটা তার গায়ে ছুঁড়ে মারল অবিনাশ।—কপি করতেই বসেছিলাম, কিন্তু কপির ভাঁজে এটা পেয়েও তোমার জন্যে কিছু করব ভাবো ? গায়ে জোর থাকলে আজ—

কি করত সেটুকু অসমাপ্তই থাকল। মণিময়ের মুখে বর্ণান্তর সুপরিস্ফুট। আবার পড়ল চিঠি। সন্দেহের হেতু নেই। তবু টেবিলের কাছে এসে সরমার লেখা কপির পাতা ওলটালো দুই একটা। এ ঘরে এসে গুম হয়ে বসল চৌকির ওপর।

ক্রুদ্ধ প্রতীক্ষা।

সরমা বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে রোষ-কশায়িত নেত্র-সম্পাতন। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সরমা নিজের ঘরে এলো। অবিনাশকে দেখে বলল, আবার হয়ে গেছে বুঝি এক হাত, মারমুখো মূর্তি কেন দাদার ?

অবিনাশ নিরুত্তর। জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখছে।

মণিময় ফেটে পড়ল চৌচির হয়ে, বলি পড় তো সায়েন্স, এসব নাটক কিসের ?

সরমা ঘুরে দাঁড়াল।

এটা নরককুণ্ড, এখান থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে হবে, কেমন ?

কি বকছ যা তা ?

যা, তা ? বলিহারি তোমার নজর। ওই রোগা-পটকা হাড়গিলে চেহারা—

দু ঘণ্টা টিউশনএর পর মেজাজ এমনিতেই চড়া। বলল, রাগিও না বলছি এখন, কি

হয়েছে ?

কি হয়েছে ! এটা কি ?

চিঠি এলো সরমার হাতে । পড়ে বিস্ফারিত । নিজে লেখে নি জানে । কিন্তু...

মণিময় হুঙ্কার ছাড়ল আবার, আমি জানতে চাই এসবের মানে কি ? যেখানে খুশি যাও, নরককুণ্ডে পড়ে থাকতে কে তোমাকে মাথার দিব্বি দিয়েছে ?

সরমা হতভম্বের মতো তাকাল অবিনাশের দিকে । কি ব্যাপার ?

ঠাট্টা বিদ্রূপের মতো শোনায় অবিনাশের কণ্ঠস্বর । কেন, তুমি লেখো নি ?

চিঠির দিকে চেয়ে সরমার বিভ্রম বাড়ে আরো ।

এটা...আমি...মানে... ! দেখো, চালাকি কোরো না, আমি কখন লিখলুম ?

চৌকি থেকে নেমে দাঁড়াল অবিনাশ । জানাজানি হয়েছে বলে যখন এত ভয় তোমার, থাকো এই নরককুণ্ডেই, আমি চললাম । ছদ্ম-গাম্ভীর্যে দ্রুত প্রস্থান ।

সরমা আবারও পড়ল লেখাটুকু । ঘুরে দাঁড়াতে চোখ পড়ল টেবিলের নিচে রাশীকৃত কাগজ-কুণ্ডলীর ওপর । টেনে এনে খুলে খুলে দেখল, একটার পর একটা কি রকম মক্স করা হয়েছে তার লেখা । মণিময়ের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল ।

মণিময় বিমূঢ় । এমন করে নকল করেছে তোর লেখা ?

তাই তো দেখছি, আমি সুদ্ধু ভড়কে গিয়েছিলাম ।

হুঃ । ভালো চাস তো ওকে আর ঢুকতে দিবিনে বাড়িতে । এই লেখা জাল করেই ও দাগী হবে একদিন বলে রাখলুম ।

সরমা আর কথা না বাড়িয়ে ট্রাঙ্ক খুলে চিঠিটা রেখে দিল ডালার খুপরিতে । বলল, দাগী যদি হয়ই কখনো, নমুনাটা থাক...।

।। ৩ ।।

সঙ্কট সবচেয়ে বেশি চারুদেবীর । সংসারক্ষেত্রে গোয়েন্দাগিরি সুখকর নয় তেমন । একদিকে ছেলের জন্য দুর্ভাবনা অন্যদিকে বিপিন । সন্ধ্যা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত সকলের অগোচরে পাহারা দিয়েই কাটে । ফলাফল প্রতিকূল । সমাধানও দুরূহ ।

সরমার পর পর দুদিন কামাই হয়ে গেল আবার । বিনুর তত্ত্বাবধানের ভার সেদিনও অবিনাশের কাঁধে চাপিয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে বেরিয়ে পড়েছিল মণ্টুকে পড়াতে ।

বিধি অপ্রসন্ন সেদিন ।

বইখাতা খুলে মণ্টু পড়তে বসে গেছে আগেই । শিক্ষয়িত্রীর সান্নিধ্যে অন্যমনস্কতার জেরটুকু এমনি বাড়তি খেটে পুরিয়ে রাখতে হয় । পরীক্ষা দেওয়া এবং পাস করা দুই-ই অনিবার্য প্রয়োজন এবার ।

চারুদেবী ঘরে প্রবেশ করলেন । পাঠে বেশি মনোযোগ দেখলে মেজাজ আরো দ্রুত বিগড়ে যাচ্ছে আজকাল ।

তোর মাস্টারনী দুদিন আসে নি কেন রে ?

জানিনে ।

আজও আসবে না ?

কি করে বলব ।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বুক্‌সেল্‌ফ-এ সাজানো বইগুলি নিরীক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ । —এই মোটা মোটা সব বই পড়াতে পারে মেয়েটা ?

বহুদিন একই প্রশ্নের তাৎপর্য অজ্ঞাত নয় মণ্টুর । মায়ের মেজাজ চড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করল আর একটু ।—এসব তো জল-ভাত তাঁর কাছে ।

জল-ভাত তো তুই দু-দুবার ফেল করলি কেন রে হতভাগা ? একটা মেয়ে তোকে পড়াচ্ছে—লজ্জা করে না ? বিপিনকে বল্‌ কোন পুরুষ মাস্টার রেখে দেবে ।

যে জন্যেই হোক মায়ের সুনজর নেই তার শিক্ষয়িত্রীর ওপর মণ্টু বোঝে । বলল, তুমি যাও তো এখান থেকে, উনি এসে পড়বেন এক্ষুনি ।

এসে মাথা কেটে নেবে আমার ! যা-পছন্দ করিনে কোন কালে—

লঘু পদধ্বনি শোনা গেল বাইরে । চারুদেবী পাশের ঘরে আশ্রয় নিলেন ।

কাল বিলম্ব না করে কর্তব্য শুরু করে দিল সরমা ।—ফিজিক্স কি কি পরীক্ষা হবে ?

হিট, লাইট, ভালটাইক্‌ ইলেকট্রিসিটি ।

কেমিস্ট্রি ?

মেটালস্‌ ।

আচ্ছা, তুমি লাইট থেকে রিফ্র্যাক্‌টিভ্‌ ইন্‌ডেক্সের অঙ্কগুলো কষো, আমি মেটালস্‌-এর প্রপার্টিগুলির একটা কমপ্যারেটিভ্‌ চার্ট তৈরি করে দিচ্ছি ।

দুজনেই তারা খাতার দিকে মনোনিবেশ করল । মণ্টুর মা আড়ালে দাঁড়িয়ে ।

একটু বাদেই পাঠ বিস্মৃত হল মণ্টু । ভালো লাগে পার্শ্ববর্তিনীর এ নিবিষ্টতা ।

দুর্যোগ আসন্ন সরমা জানত না । একই ব্যাপার চার মাস ধরে লক্ষ্য করে আসছে, আজই বা এমন ধৈর্য-বিচ্যুতি ঘটল কেন ? সহসা বিরক্তিতে কান গরম হয়ে গেল—খাতা ফেলে মণ্টু তার মুখের দিকে চেয়েই আছে ।

হচ্ছে না ?

মণ্টু সচকিত ।...হচ্ছে ।

কিছুক্ষণ...। আবারও পেন্সিল থেমে যায় মণ্টুর হাতে । পুনরায় দৃষ্টি বিনিময় । কিন্তু মণ্টুর খেয়াল নেই এবার । সরমা লিখতে লিখতে আড়চোখে বারকতক লক্ষ্য করল তাকে । হঠাৎ তার কানে হাত দিয়ে মাথাটা ফিরিয়ে দিল খাতার দিকে ।—চোখ দুটো ওদিকে দাও, পরীক্ষায় পাস করতে পারবে তাহলে ।

মণ্টু চেয়ে থাকে হতভম্বের মতো ।

অঙ্ক পারচ না ?

মণ্টু নির্বাক ।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে একটা হাত গালের ওপর উঠে আসে চারুদেবীর । দৃশ্য কল্পনাতীত । অতঃপর নীরব থাকা সম্ভব নয় কোনমতে । সাত পাঁচ না ভেবেই সুব্যবস্থায় এগিয়ে এলেন । ছেলেকে আদেশ দিলেন রুক্ষকণ্ঠে, ভেতরে যা—!

হুকুমের ভয়ে না হোক ক্ষণকালের জন্যও ও মর্মান্তিক লজ্জা থেকে ছাড়া পেয়ে বাঁচে

মণ্টু । দ্রুত প্রস্থান করল ।

চারুদেবী ঘুরে দাঁড়ালেন ।—অতবড় ছেলে, কলেজে পড়ে, তার কানে হাত দাও তুমি কি বলে ?

এমন নাটকীয় যোগাযোগের জন্য কে আর প্রস্তুত ছিল । সরমার বাক্‌স্ফুরণ হল না সহসা ।

বাপ-দাদার আমল থেকে এতটুকু আঁচড় লাগেনি ওর গায়ে, আর তুমি বাইরের মেয়ে, তোমার হাত উঠল ?

আর কেউ হলে হয়তো বলত, আঁচড়টা লাগা উচিত ছিল অনেক আগেই, বাইরের মেয়ের হাত ওঠার কোন প্রয়োজন হত না তাহলে । সরমা বলতে পারল না কিছু । রাগে, লজ্জায় আরক্ত দেখাল শুধু ।

আর পড়াতে হবে না ওকে, মাইনে যা পাওনা হয়েছে মাসকাবারে পাঠিয়ে দেব ।

সরমা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ।—মণ্টুকে ডাকুন একবার ।

কেন, আমি বলছি তাতে হবে না ?

হবে । আপনি একবার ডেকে দিন ।

চারুদেবী তার দিকে চেয়ে কেমন যেন ঘাঁটাতে সাহস করলেন না আর ।

একদিকের ঘরে মণ্টু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে । অবনত, আড়ষ্ট, পাংশু ।

তোকে ডাকছে, শুনে আয় ।

তুমি একথা বলতে গেলে কেন ?

নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না চারুদেবী ।—আমি বলতে গেলাম কেন ! আসুক বিপিন, দেখছি তার পর, ভালো চাস তো শুনে আয় আগে কি বলতে চায় ।

মণ্টুর পুনঃপ্রবেশ । সরমা একখানা হাত রাখল তার কাঁধে ।—কিছু মনে করো না, আমার অন্যায় হয়েছে । কিন্তু একটা কথা মনে রেখো ভাই, বাঁচার তাগিদে এমনিতেই যেতে বসেছে মেয়েরা, তোমরা ভরসা না দিতে পারো গ্লানি বাড়িও না ।

মণ্টু নীরব ।

মেটাল্‌স্‌এর চার্ট নিয়ে গেলাম, শেষ হলে ডাকে পাঠিয়ে দেব, পরীক্ষায় কাজে লাগবে ওটা ।

অন্যমনস্কের মতো হাঁটতে লাগল সরমা । বিপিন চৌধুরীর মোটর ঠিক পাশে এসে থামতে দাঁড়াতে হল । সহাস্যে বিপিন নেমে পড়ল গাড়ি থেকে ।—এরই মধ্যে ফিরে চললেন আজ ?

সরমার দুচোখ দূরের দিকে ।

আজ যান নি পড়াতে ?

সরমা হাসল একটু । চোখে চোখ রাখল ।—মণ্টুর পড়াশুনার জন্য আপনার দুশ্চিন্তার শেষ নেই বিপিনবাবু, না ?

তা নয়...দুদিন আসেন নি, আজও চলে যাচ্ছেন এরই মধ্যে, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম । মণ্টুর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছি, এবারে চেষ্টা করলেও ফেল করতে পারবে না ।...আপনার পড়ানো

হয়ে গেছে তা হলে ?

হ্যাঁ—

তাড়াতাড়ি এসেছিলেন বুঝি আজ ?

না ।

তবে ? থাকগে, রাস্তায় আটকে রাখব না, বাড়ি যাচ্ছেন তো ? চলুন পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে ।

আবারও খানিক নীরব থেকে সরমা জবাব দিল, আপত্তি ছিল না, কিন্তু আপনার ছোট ভাইয়ের সামান্য শিক্ষয়িত্রী আমি, মোটর করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার এ আতিশয্যটুকু কেন বিপিনবাবু ?

কথাবার্তা সহজ লাগছে না বিপিনের । তবু অন্তরঙ্গ আহ্বান জানালো, আপনি আসুন তো—

সরমা শান্ত মুখে তাকালো তার দিকে । বলতে পারে কিছু এখন । দু'কথা শোনাতে পারে । কিন্তু কি লাভ । সামলে নিল, দোষই বা কি ভদ্রলোকের...।

ধন্যবাদ, আমি নিজেই যেতে পারব, নমস্কার ।

বিস্ময়াহত মুখে বিপিন দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ দেখা যায় তাকে । বাড়ি ফিরে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করল মণ্টুর পড়ার ঘরে ।—আজো তোর টিচার আসে নি মণ্টু ?

কৈফিয়তের হাত থেকে অব্যাহতি নেই জানে । মণ্টু জবাব দিল, এসেছিলেন ।

পড়া হয়ে গেল এরই মধ্যে ? মাথা ধরেছে বললি বুঝি ?

মণ্টু নিরুত্তর ।

বিপিন তেতে উঠল, পড়ার সময় খালি ফাঁকি, এবারেও পাস করতে হবে না তোমাকে বলে দিলাম ।

মণ্টু ঠাস করে বলে বসল, মা তাঁকে আর আসতে বারণ করে দিয়েছে ।

বিপিনের বাক্‌শক্তি যেন লোপ পেয়ে গেল হঠাৎ । বিমূঢ়ের মতো চেয়ে রইল খানিক । সরমার শান্ত মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে ।

কেন ?

জবাব নেই ।

ওপরে এসে হাঁক দিল, কাকীমা ।

চারুদেবী ঝিকে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এলেন, ওরে গঙ্গা দাদাবাবুর খাবার ঠিক করতে বল্—

ও মেয়েটিকে আর পড়াতে আসতে বারণ করেছ ?

হ্যাঁ বাবা, ও ছেলেকে পাস করানো মেয়েমানুষের কর্ম্ম নয় । একজন পুরুষ মাস্টার রেখে দিস তুই ।

মণ্টু বলেছে এ কথা ?

মণ্টু বলবে কেন, আমার চোখ নেই ? মেয়েলি বুদ্ধিতে সচেষ্ট হলেন তাকে শান্ত করতে ।—এতবড় শেয়ার বাজারটা চালাচ্ছিস তুই, তোকে বিজ্ঞান পড়ানো গেল না কত চেষ্টা করেও । আর একটা মেয়ে এত সব শক্ত শক্ত বই পড়িয়ে দেবে !

ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে বিপিনের । কিন্তু ব্যাপারটা আগে জানা দবকার । কাকীমাব মুখের দিকে চেয়ে অপেক্ষা কবল একটু ।...হুঁ । কি হয়েছে খুলে বলো, নয় তো এক্ষুনি তাকে আবার ডেকে নিয়ে আসব আমি ।

তা আর আনবে না । স্বরূপ প্রকাশ করলেন চারুদেবী, আগে তোমাব রাত দুপুব হত বাড়ি ফিরতে, এখন সাত-তাড়াতাড়ি কাজ ফেলে পালিয়ে আসা চাই বিকেল না হতে । আর ভাই ওদিকে পড়া ফেলে হাঁ করে সারাক্ষণ রূপ গিলবে মাস্টাবনীর, এখানে এসব চলবে না আমার বাপু পষ্ট কথা । কইরে গঙ্গা, খাবারটা দিয়ে গেলি দাদাবাবুব—

জল-খাবার নিযে গঙ্গাবাঈর আবির্ভাব । ভযে ভয়ে টেবিলটা এগিযে দিল বিপিনের দিকে । চারুদেবী জল গড়িয়ে ধবলেন সামনে ।—মুখ হাত ধুয়ে খেযে জিরিয়ে নে আগে ।

খাবারসুদ্ধু থালা বাসন ঝন্ ঝন শব্দে আছড়ে পডল মাটির ওপর । কাচের গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জানলা দিয়ে ।

দুড়দাড় পাযে নিচে নেমে বিপিন মোটব নিযে বেরিয়ে গেল আবাব ।

অনিশ্চয়তাব অস্বস্তি আছেই । আবাব পারম্পর্যহীন একটানা দিন যাপনের চিন্তা মনোবম নয় । এম. এসসি পরীক্ষা পর্যন্ত নিরুদ্বিগ্ন ছকটা একবকম ধরাবাঁধাই ছিল । হঠাৎ ওলটপালট হয়ে গেল সব ।

বাড়ি ফিরে দেখল অগ্রজ নাটক লিখছে, পাশে বিনু ঘুমিয়ে ।

অবিনাশ চলে গেছে । মুখ না তুলেই মণিময় সংবাদটা জানাল । অর্থাৎ বিনুব জন্যে খুব বেশি সময আটকে থাকতে হয নি তাকে ।

সরমা নিজের ঘবে এসে বসল । চেষ্টা করল ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে । বড জোর কপালে নেই পবীক্ষা দেওয়া, চাকরি দেখে নিতে হবে আগেই । হোক । মণিময় গত চার মাস সংসার নির্বাহের দায থেকে প্রায় অব্যাহতি পেয়েছে । এখন কতটা নির্ভব কবা চলে তার ওপর জানা দরকার । উঠে এলো । লেখা থামাও দাদা, কথা আছে ।

মণিময় মুখ তুলল ।

আমার এম. এস্‌সি পরীক্ষা পর্যন্ত খবচাপত্র সব একা চালাতে পারবে ?

এই । অম্লানবদনে ঘাড় নাড়ল সে, খুব পারব, শিগগীবই দেশের মেয়ে নাটকটা সিনেমা হবে, মন্দ টাকা পাব না ।

বাজে কথা রাখো, কাল থেকেই খরচাপত্রের ভার নিতে হবে সব, পারবে ?

মণিময় ভয় পেল এবার, তোর ওই—ইয়ে—কি হল ?

গেছে ।

ক'দিন কামাই হল তাই ?

হাসি পেল সরমার । না, যা বললাম জবাব দাও । না যদি পারো পরীক্ষা দেওয়া হবে না আমার ।

নাটক মাথায় থাকল । উঠে বসল মণিময় ।—পরীক্ষা দেওয়া হবে না মানে ?এতকাল কোন রোজগারটা ছিল তোর শুনি ? তখন চালাই নি ?

এখন পারবে কি না বলো ?

খুব পারব । গম্ভীর ।—বাজে খরচ করি তাই, নইলে রোজগার আমার কম নাকি !
ভরসা দিল বটে, কিন্তু সরমা ভরসা পেল না তেমন ।

দাদারেই ছোট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে অবিনাশ থাকে । আসবাবপত্রের মধ্যে পুরানো একটা আরাম-কেদারা এবং হাতল-বিহীন ভাঙা একটা চেয়ার । পাশে নড়বড়ে চৌকিটাতে অনন্তশয্যা পাতাই আছে । সরমা মাঝে মাঝে বালিশের ওয়াড় এবং চাদর বদলে দিলে তবে এর সংস্কার ঘটে । অদূরের সেল্‌ফ-এ গোটাকতক কাব্যগ্রন্থ । চৌকির নিচে ভাঙা তোরঙ্গ এবং কমার্সিয়াল আর্টের সরঞ্জাম ।

সরমা ইজিচেয়ারে বসে আছে । অবিনাশ চৌকিতে । টিউশনপর্ব সবিস্তারে শুনল এই মাত্র । নির্বিকার চিত্তে একটা কাগজের ওপর পেন্‌সিলে আঁচড় কাটছে সে । সরমা চেয়ে আছে ওর দিকে ।

অবিনাশ বলল, কাজকর্ম মন্দ জুটছিল না, ভেবেছিলাম টাকাকড়ি কিছু জমাব, তোমার পাল্লায় পড়ে সে আর হবার জো-টি আছে ! এখন আর ছাত্র খুঁজে কাজ নেই, পরীক্ষাটা হয়ে যাক ।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে সরমা বলে উঠল, চুলোয় যাক পরীক্ষা, তার এখনো দেরি ছ-সাত মাস । তোমায় যা বললাম তাই করো—পরীক্ষার ফী যোগাতেও কত টাকা লাগবে জানো ?

যা লাগে দেবে এই গৌরী সেন, তোমার ভাবনা কি ? ক'টা মাস শ'খানেক করে দিতে খুব অসুবিধে হবে না আমার ।

তা হয় না । বিরক্তি বাড়ছে সরমার ।

অবিনাশ ভ্রূ-কুঁচকে তাকাল তার দিকে, কেন হয় না শুনি ? আমার অসুখের সময় হাসপাতালে কেবিনের খরচ পর্যন্ত চালাও যখন, তখন হয় কি করে ?

সরমা অবাক ।—কে বললে তোমাকে ?

তোমার ড্রয়ারের পাস-বই । স্কলারসিপের জমানো পাঁচশ টাকা পুঁজি শূন্যয় এসে ঠেকেছে—বলেছিলাম তখন, এ হয় না সরমা ?

বেশ...! সরমা হেসে ফেলল ।

খানিক অন্যমনস্কের মতো থেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, একটা কথার সত্যি জবাব দেবে ?

মিথ্যে বলে পার পাই তো দেব না, শুনি কথাটা— ।

সরমার অনুসন্ধিৎসু দুই চোখ তার মুখের ওপর সন্নিবদ্ধ । আজ এ আবহাওয়ায় যে প্রশ্নটা চকিতে উদয় হল মনে, তা নিয়ে চিন্তার কারণ আগে ঘটে নি কখনো । কিন্তু আজ হোক কাল হোক বোঝাপড়া তো একটা হওয়াই চাই তাদের ।

আজ সত্যি করে বলতে হবে কি চাও তুমি ।

হাতের পেন্সিল থেমে গেল এবার । মুখ তুলল অবিনাশ ।—কি চাই মানে ?

মানে ঠিকই বুঝেছ ।

অবিনাশ হেসে উঠল ।—বেশ, না হয় বুঝেইছি । কিন্তু চাইলেই তো আর সব ঐশ্বর্য উজাড় করে দেবে না । বলে হবেটা কি ?

সরমা শুকনো কণ্ঠে জবাব দেয়, ঐশ্বর্যের আছে কি । হাসি বাদ দিয়ে যা বলবার সত্যি করেই বলো ।

ও...। ছদ্ম গাম্ভীর্য-মণ্ডিত । তা রক্ত-মাংসের মানুষ যা চায় সবই তো আশা করি আমি ।...মুখ শুকিয়ে গেল যে ?

একটু ভাবল সরমা । তারপর অনেকটা প্রস্তুত হয়েই যেন বলল, দেখো, আমার ভবিষ্যৎ আমারই, আর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে মিলবে বলে মনে হয় না ।·ও নিয়ে ভাবিনে, বলো তুমি ।

অবিনাশ হাসছে মৃদু মৃদু ।—জলজ্যান্ত মিছে কথাটা বললে ?

অস্বস্তির মতো লাগছে সরমার । মিছে কেন ?

উৎফুল্ল মুখে তাকালো অবিনাশ, নয় ? ভালো । বরাত এমন প্রসন্ন জানতুম না । উচ্ছল আনন্দে কাব্য করে উঠল, 'উড়ে যাক, দূরে যাক্, জীবনের জীর্ণ বিবর্ণ বিশীর্ণ পাতা' । হঠাৎ থামল সে, আমার ছেলেবেলার কথা কিছু জানো না সরমা, না ?

সরমা চেয়ে আছে অনুসন্ধিৎসু চোখে ।

সোৎসাহে শুরু করল অবিনাশ, যেন মজার গল্প বলছে একটা । পাঁচ ভাই ছিলুম আমরা, আমি বড় । পরের দুটো মরেছে অ্যানিমিয়ায় । পেটের রোগ আর খাওয়ার রোগে যমে টেনেছে তার পরেরটাকে । আর সকলের ছোট যে, সেও বেশিদিন জ্বালায় নি । জন্মাবধি রিকেটে ভুগছিল, একদিন চোখ উলটে দিলে ।...পয়সা থাকতেও কি জানি কেন ডাক্তার ডাকতে সাহস করতেন না বাবা । রোগী দেখতে এসে ডাক্তার গালাগাল করতেন তাঁকেই । আমার সাত-আট বছর বয়সের কথাও মনে আছে, রীতিমতো ভালো স্বাস্থ্য ছিল মায়ের । ...আর, আমার পনেরো বছর বয়সের সময় মা যখন মারা গেলেন, হাড় ক'টা গুনে নেওয়া যেত শরীর থেকে ।

সরমার বিবর্ণ মূর্তির দিকে চেয়ে আনন্দের খোরাক পেল যেন আরো । বলে গেল, আমার ওপরও যমের নজর আসন্ন জেনে হেসে খেলে সময় দিলুম কাটিয়ে। বুদ্ধি ছিল না এমন নয়, পাস-টাসগুলো করতে পারতুম হয়তো, মিয়াদের কথাটা ভেবেই সেদিকে মাথা গেল না আর । কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন সৌভাগ্য কপালে লেখা আমারই ! উচ্ছল চপলতায় খল্ খল্ করে হেসে উঠল সে, ঐশ্বর্য তোমার দেহে, ঐশ্বর্য তোমার মনে—কুছ্ পরোয়া নাই—কামনা-কালীয়-দহে আকণ্ঠ ডুব দেব আমি—'বুকের ভিতরে ছুরির মতো, মনের মাঝারে বিষের মতো, রোগের মতো, শোকের মতো, রব আমি অনিবার !'

শুষ্ক, পাংশু সরমার সমস্ত মুখ । চুপচাপ কিছুক্ষণ ।...ভয় দেখাচ্চো ?

ভয় যে পেয়েছ সে তো আর মিথ্যে নয় ।

সরমা নীরব ।

হাতের কাগজ পেন্সিল একদিকে সরিয়ে রাখল অবিনাশ । পেন্সিলের আঁচড়ে সাদা কাগজটায় সরমার মুখের আদল ফুটে উঠেছে । অনেকক্ষণ অন্যমনস্কের মতো চোখ বুঝে বসে রইল সে । চপলতার চিহ্ন মুছে গেছে । মুখে হাসির মতো ।

অবিচ্ছিন্ন নীরবতা । সরমার মুখ কোলের কাছে নুয়ে এসেছে প্রায় । অবিনাশ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল আবার—। একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে ফেললাম দেখছি ।

সরমা তেমনি বসে ।

আশ্চর্য, সায়েন্স-পড়া মেয়ে কেঁদে ফেলবে না কি এর পরে । মুখ তোলো—
সরমা তাকালো এবার ।

তারপর ? অবিনাশের চোখদুটো হাসছে ।

বলো ।

মাটি করেছে । সত্যিই কিন্তু বিয়ে করে ফেলতে চাইব এবার । জেনে-শুনে যেমন ঘাঁটাতে গেলে ।

আমার অন্যায় হয়েছে অবিনাশ ।

লক্ষ্মী মেয়ে । মন দিয়ে পড়াশুনা শুরু করে দাও, আর কিছু ভাবতে হবে না ।

দেখা যাক—

দেখা যাবে কি, যা বললাম তাই হবে ।

আচ্ছা । সরমা হাসল অল্প একটু, আপাতত দাদাই চালিয়ে নিতে পারবে বলছে । অন্য প্রসঙ্গ উঠতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা সন্তর্পণে ।—কিন্তু সবাই তোমরা সরাসরি টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চাও কেন বল তো, সামর্থ্য আমার কম নাকি কিছু ?

তোমরা মানে ! একজন তো আমি, আর সব কারা ?

সরমা বলল, ডাঃ চন্দ্রও ঘুরিয়ে সাহায্যের প্রস্তাবটা তুলেছিলেন এক দিন ।

সর্বনাশ ! ত্রস্ত বিস্ময় অবিনাশের, তিনি তো বিবাহিত, আর স্ত্রৈণ বলে সুনামও শুনেছি কলেজে পড়তে !

সরমা হেসে ফেলল ।

বাড়ির পথ । সরমা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে বার বার ।...অবিনাশ ব্যঙ্গ করেছে । করুক । এতটুকু লাগে নি । কিন্তু অবিনাশ প্রকাশও করেছে নিজেকে । ব্যর্থতার ভয়াবহ মূর্তি । মনের সব কটা তার একসঙ্গে নাড়িয়ে দিল যেন ।

বিবাহ সংসার সংসার-পালন—এ একটা সহজ নিয়ম । বৈচিত্র্য না থাকুক সুখে দুঃখে এর সহজ পরিণাম ।

কর্ম সাধনা জ্ঞান বৈরাগ্য...নিয়মটা বিঘ্নসঙ্কুল । তবু দৃষ্টান্ত আছে অনেক জীবনে । আত্ম-সান্ত্বনায় শান্ত পরিণাম এরও ।

কিন্তু তৃষ্ণার্তের সম্মুখে পূর্ণ পানীয় পাত্র । পান নিষিদ্ধ । তার পরিণাম ?

যৌবনের পরদায় দখিন-বাতাসের ছোঁয়ার মতো ক্ষণে-ক্ষণে অনুভব করল বাঞ্ছিতের সান্নিধ্য । আমৃত্যু উপবাস বিধিলিপি । তার পরিণাম ?

কর্মী নয়, মুমুক্ষু নয় । যেতে হবে কর্ম-পথে, ত্যাগের পথে ! তার—?

সাধ আছে, সাধ্য নেই তার—?

সময় নির্বাচনে ভুল হল বিপিন চৌধুরীর । দু'চারদিন পরে একেবারে খুশি হত না সরমা, এ কথা জোর করে বলা চলে না । কিন্তু ধৈর্য বলে কিছু কুষ্ঠিতে নেই বিপিনের । গলির বাইরে অপেক্ষা করছিল । দেখা হল ।

নমস্কার ।...আপনি বিশ্বাস করুন সরমাদেবী, আমার কোনো অপরাধ নেই ।

তার বলার আগ্রহে কৃত্রিমতা নেই। সরমা মুখের দিকে চেয়ে থাকে স্বল্পক্ষণ। —না।

কি বলছেন ?

আপনার কোন অপরাধ নেই।

বিব্রত মুখে বিপিন অপেক্ষা করে একটু। তা হলে—

সরমা শান্ত মুখে জবাব দেয়, তা হলেও মণ্টুকে পড়ানোর অজুহাত নিয়ে আর তো আপনাদের বাড়ি যেতে পারিনে।

অজুহাত বলছেন কেন ? আহত প্রত্যাশায় তাকালো বিপিন চৌধুরী।

বিরক্তি বাড়ছে সরমার। একটু থেমে জবাব দিল, তা যদি না হয়, মণ্টুকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন, পড়া বুঝে নিয়ে যাবে।

বিপিন দ্বিধান্বিত। কিন্তু আমারও কিছু কথা ছিল...

সরমা আবারও সোজাসুজি তাকালো তার দিকে। অর্থাৎ, কথা যে আছে সেটা সে জানে। কিন্তু যে মেয়ে পড়াতে যেত মণ্টুকে, তার সঙ্গে আজ অন্তত ওর অনেক তফাত। বলল, আপনার বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, টাকা আছে—কথাও কিছু থাকবে আশ্চর্য কি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কথার বদলে আমিও কিছু বলতে পারি, সেটা শুনতে ভলো লাগবে না আপনার। বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আর আপনাকে কষ্ট দেব না, নমস্কার।

বিপিনের চেষ্টার ত্রুটি নেই তবু। সানুনয়ে বলল, একটু দাঁড়ান...

অন্যসময় আসবেন তাহলে, আমার এগারোটায় ক্লাস।

বিপিন দাঁড়িয়ে। ব্যর্থ, বিমূঢ়। সরমা বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

শেয়ার-মার্কেট বিল্‌ডিংস্‌।

তিন-তলায় ঘরের বাইরে সাইন-বোর্ড ঝুলছে, চৌধুরী অ্যাণ্ড্‌ কোম্পানি, স্টক্‌ অ্যাণ্ড্‌ শেয়ার ডিলার্স।

সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সামনে বড় গদি-আঁটা চেয়ারে বিপিন চৌধুরী বসে। পাশে ঘনশ্যামবাবু। এক চতুর্থাংশের মালিক। কাগজপত্র ঘাঁটছেন আর ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা তুলছেন মাঝে-মাঝে।

আয়রনের ট্র্যানজাকশান্‌টা ক্লোজ করে ফেলি, কি বলেন ? বাজার কিন্তু সুবিধের নয়।

আদিম মানুষের সমস্ত মনোবৃত্তি জাগ্রত বিপিন চৌধুরীর মধ্যে। ভালোবাসা নয়, মোহ নয়। বন্যশক্তি দিয়ে শুধু জয় করে নেবার ইচ্ছা।

গানির দর সাত-আটে নেমেছে, দেখছেন ? ঘনশ্যামবাবু ব্যবসা ভাবছেন।

কিন্তু সরমা হয়তো বা রাজী হবে না, তখন ? অসহিষ্ণু রোমন্থন। হবে নাই বা কেন ! শক্তি দিয়ে সামর্থ্য দিয়ে নিজে হাতে গড়েছে এ বর্তমান। এর দাম দিতে হলে...

গোডাউনটা একবার ইনস্‌পেক্ট করে আসা উচিত কিন্তু। ঘনশ্যামবাবু নাছোড়বান্দা।

জবাবে বিপিন বিরক্ত মুখে একবার মুখ তুলে তাকালো শুধু। ভাবছে।...আর বলবে, দারিদ্র্যটা আভরণ নয়, অভিশাপ। আদর্শের অভিমান নিয়ে দিন চলে না, ধনীর দ্বারস্থ হতে হয় টিউশনএর জন্যে। কথারই যদি দাম, কথাই সে বলবে এবারে।

এ ক'টা সই করে দিন তো। ঘনশ্যামবাবু কাগজ বাড়ালেন।

ভাবছে বিপিন, প্রথম প্রথম অন্য রকম মনে হয়েছিল, সামান্য হাসি ছাড়া কথা নেই মুখে। ভালো লাগত। কিন্তু আজও যে ভালোই লাগলো।...

হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, কোন দিকে না তাকিয়ে হনহন করে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

প্রৌঢ় ঘনশ্যামবাবু নির্বোধের মতো খানিক বসে থেকে অস্ফুট মন্তব্য করলেন, ছোকরার মাথা বিগড়েছে।

ভাসুরপোর জেদ বিলক্ষণ জানতেন চারুদেবী। ভয়ও করতেন। কিন্তু সেটা এমন আকারে দেখা দেবে ভাবেন নি। দু-চারখানা থালা-বাসন ভাঙবে, চেঁচামেচিতে বাড়ি সরগরম থাকবে দিন দুই—এ জন্যে প্রস্তুতই ছিলেন। এই থমথমে নীরবতায় ভয় পেলেন। ঝোঁকের মাথায় ওই গোঁয়ার ছেলে না করে বসতে পারে এমন কাজ নেই। ছেলেকে বললেন, মেয়েটাকে আবার ডাকলে আসবে না?

না। মন্টুও তেতে আছে মায়ের ওপর।

তুই জানলি কি করে, একবার গিয়ে বলে আয় না।

মন্টু সাফ জবাব দিল, পারব না।

চারুদেবী বলতে যাচ্ছিলেন কি, বিপিনকে আসতে দেখে থেমে গেলেন। কয়েক নিমেষ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বিপিন মন্টুর দিকে তাকালো—তোর কলেজ নেই?

রবিবার আবার কলেজ কি।

তা বলে পড়াশুনাও বন্ধ নাকি রবিবারে? কারণ থাক না থাক, শাসনের সদিচ্ছা দুর্বার। বলল, এবারে পাস করতে পার ভালো, নইলে টাকাপয়সা আমার শস্তা হয় নি বলে রাখলুম—মায়ের আঁচলের নিচে বসে দিন কাটবে না।

মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল আবার।

অনেকক্ষণ নিরুদ্দিষ্ট ঘোরাঘুরির পরে ডাঃ চন্দ্রকে মনে পড়ল হঠাৎ। সংবাদটা সর্বাগ্রে তাঁকেই জানানো উচিত ছিল। ইতিমধ্যে যদি শুনে থাকেন, কি ভেবেছেন ঠিক নেই। আর একটা সম্ভাবনাও চকিতে উদয় হল মনে। দেখা যাক্।

মোটর ছুটল শিবাজী পার্কের রাস্তা ধরে।

বাইরের ঘরে মোটা বইয়ের আড়ালে মুখ ঢাকা চন্দ্রর। নিবিষ্ট চিত্ত। পায়ের শব্দে মুখ তুললেন। হাস্যোৎফুল্ল বিস্ময় তারপর। শেয়ার মার্কেট যে! কি খবর?

ছুটির দিন, এলাম...

বেশ, বোসো বোসো। দেখলেন একটু, ছুটির দিন তো প্রতি সপ্তাহে একটি করে আছে হে, কখনো মনে পড়ে না তো? খবর সব ভালো? ব্যবসায় তো লাল হয়ে উঠেছ শুনতে পাই, আমরা বই ঘেঁটেই গেলাম।

বিপিন হালকা জবাব দিল, তোমরা কি আর চাও কিছু, মহাদেবের মতো সোনার বদলে ছাই-ই অলঙ্কার তোমাদের।

থাক, তুমি কবিত্ব শুরু করলে আর বাকি থাকবে না কেউ। হাঁক দিলেন, অপর্ণা!

শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে অপর্ণা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ডাঃ সমাদ্দার ভিন্ন

আর কারো সামনে ডাক পড়ে না বড় একটা ।

চন্দ্র ডাকলেন, এসো, ভেতরে এসো । আমার ব্রোকার বন্ধুর গল্প করতাম, ইনি—। এখন একাই একটা আস্ত শেয়ার মার্কেট । ছুটির দিনে পথ ভুলে এসে পড়েছে—পড়েছেই যখন একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে হয় ।

অন্তরঙ্গ-সুরে বিপিন বলল, মোহিনীদার কথা শুনবেন না বৌদি, লোকের নামে বাড়িয়ে বলাই ওঁর অভ্যাস ।

অপর্ণা তেমনি জবাব দিল, কি করে জানবো, পড়ার বই ছাড়া কারো সঙ্গে যে আলাপ আছে তাই তো জানতুম না ।

আজ জানলে তো ? হাসিমুখে চন্দ্র তাকালেন বিপিনের দিকে ।—বিপিন, এঁর গান সম্বন্ধে তোমাদের কি বলেছিলাম বলে দাও তো ।

অপর্ণার গানের সুখ্যাতি বিপিন যথার্থই শুনেছে আগে । এবং রূপেরও । জবাব দিল, বলেছিলে...চমৎকার গলা, কিন্তু ওঁর গান থেকেও ওঁকেই বেশি পছন্দ তোমার ।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে তাকালেন চন্দ্র ।—ইউ লায়ার ! এই বলেছিলাম ?

অপর্ণা স্মিতহাস্যে টিপ্পনী কাটল, উনি ভুলে গেছেন, তুমি বলেছিলে মাইক্রোস্‌কোপ বেশি পছন্দ ।

সম্মিলিত হাসি ।

বসুন, চা দিতে বলি । অপর্ণা ফিরে গেল ।

সংসারের আনন্দ-রূপটা বিপিনের বুভুক্ষু মনে তৃষ্ণা আনলে । একটা জ্বালার মতো অনুভূতি বিমনা করে দিল তাকে । অভাব তো তারও কিছু নেই, অথচ জীবনের কতগুলো দিন বৃথাই ব্যয় করে ফেলেছে ।

তারপর আর কি খবর বলো । চন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন ।

খবর ভালোই !

ও মেয়েটি পড়াচ্ছে কেমন তোমার ভাইকে ?

বিপিন সহসা জবাব দিয়ে উঠতে পারে না কিছু ।

চন্দ্র বলে গেলেন, অমন ভালো মেয়ে সচারাচর দেখা যায় না হে, মণ্টু এবার ভালো রেজাল্ট করে যাবে দেখো'খন ।

দ্বিধা কাটিয়ে ওঠা ছাড়া গত্যন্তর নেই । এসেছেও এই জন্যেই ; কিছু বলতে । কিছু প্রকাশ করতে । তাই খবরটাই প্রথম দিল সরাসরি । বলল, এঁর সম্বন্ধেই তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল মোহিনীদা । মণ্টুকে আর পড়াচ্ছেন না উনি ।

সে কি ! চন্দ্র অবাক ।

কাকীমার ঠিক পছন্দ নয় মেয়ে টিচার তাঁর ছেলেকে পড়ায় । নিষেধ করে দিলেন হঠাৎ ।

শুনে চন্দ্র স্তব্ধ হয়ে থাকেন কিছুক্ষণ । পরে আস্তে আস্তে বললেন, এমন হতে পারে জানলে তাকে পাঠাতুম না তোমাদের বাড়ি । সী ইজ্‌ নিডি...বাট্‌ সি ইজ্‌ ওয়ান্‌ ইন্‌ এ থাউজেণ্ড ।

অপর্ণা ঘরে প্রবেশ করল । পিছনে বেয়ারার হাতে চায়ের সরঞ্জাম । চন্দ্রর প্রশংসা-

বাণী কানে গেছে। বেয়ারাকে বিদায় দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কার কথা বলছ ? ছদ্ম-ভীতি, আমি নয় তো ?

আমার ছাত্রী।

সরমা ব্যানার্জী ?

হ্যাঁ।

অপর্ণা মুচকি হাসল একটু, তাই এত উচ্ছ্বাস !

এ সংবাদ শোনার পর বিদ্রূপ তেতো লাগল। বিপিনকে শোনাবার জন্যই চন্দ্র বলে বসলেন, হবে না কেন, তোমাদের মতো শাড়ি গাড়ি গান বাজনা নিয়ে তো তার দিন কাটে না—

বিব্রত হলেন পরক্ষণে। এর জের সামলাতে হবে। অপর্ণা বিস্মিত নেত্রে একবার তাকালো তাঁর দিকে। পরে পেয়ালায় চা ঢেলে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল ঘর থেকে।

বিপিন বলল, রাগিয়ে দিলে তো বৌদিকে ?

চন্দ্র হাসলেন একটু, যাকগে...কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাকে আর কি করতে বলো তুমি ?

আমি বাড়ি থাকলে এমনটা হত না ঠিক।

ঈষৎ ক্ষোভে চন্দ্র বললেন, কিন্তু আর তো তাকে বলতে পারিনে ও বাড়ি গিয়ে আবার পড়াও তুমি।

একটু থেমে বিপিন সোজসুজি অভিপ্রায় ব্যক্ত করে ফেলল।—আমি তোমার কাছে অন্য সুপারিশ নিয়ে এসেছি মোহিনীদা।...তাকে বরাবরকার মতোই আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতে চাই।

চন্দ্র অবাক খানিকক্ষণ। পরে হেসে উঠলেন সশব্দে। এই ব্যাপার ! তা, আমি তো করি মাস্টারি, ঘটকালি তো করিনে।

তোমাকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

চন্দ্র ভাবলেন একটু। সদিচ্ছাটা সরমাকে জানিয়েছ ?

না।

তাকে বলো। ছেলে হিসেবে তো এ বাজারে রত্ন তুমি, আমার মতামত কিছু চায় তো...। হঠাৎ থেমে গেলেন, কি যেন মনে পড়তে অন্যমনস্ক হলেন একটু। জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, অবিনাশের সঙ্গে আলাপ নেই তোমার, না ?

না, কে তিনি ? বিপিন সচকিত।

চন্দ্রর চিন্তাস্রোত ঘুরে গেল। কি ভেবে জিজ্ঞাসা করেছেন নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় খুব। অল্প হেসে বললেন, চিনলে ভালো করতে...যাক, সরমার দাদা আছেন শুনেছি, তাঁর কাছেও কথাটা তুলে দেখতে পারো।

বিপিন চলে গেল।

পড়ায় মন বসছে না আর। চন্দ্র বই রেখে দিলেন। এ সম্ভাবনার কথাটা ভাবা উচিত ছিল। বিপিন বাল্যবন্ধু। শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে। সানন্দে এ ব্যবস্থায় অগ্রণী হতেও বাধা ছিল না...যদি না, মাঝখানে আর একজনকে এমন করে জানতেন তিনি বা চিনতেন এমন করে। বিপিনের তুলনায় সেই মানুষটার নেই কিছুই—রূপ, স্বাস্থ্য, অর্থ। কিন্তু সমস্ত

রিক্ততা সত্ত্বেও যে মানুষ পরিপূর্ণ, অবিনাশ তাদেরই একজন। চন্দ বিমনা হয়ে পড়লেন।

দেয়াল-ঘড়িতে চোখ পড়তে সম্বিৎ ফিরল। ছুটির দিনে সময়ে স্নানাহারের জন্য অপর্ণার তাগিদ আসার কথা। কিন্তু তার সাড়াশব্দ নেই। মুষড়ে গেলেন, গোলযোগ নিজেই সৃষ্টি করে রেখেছেন।

অপর্ণা শুয়ে আছে ইজিচেয়ারে। অভিমান দুরপনেয়।

সায়েন্স-পড়া মানুষটির কণ্ঠস্বরে নিঃসৃত হল গদ্যাকারের দুটি কথা, রাগ করেছ ?

অপর্ণা সোজা হয়ে বসল, না।

কিঞ্চিৎ রসিকতার স্পৃহা দমন করতে পারলেন না চন্দ্র। বললেন, রাগলে যদি এমনটি দেখায়, রোজ একবার করে রাগিয়ে দেওয়াই উচিত তোমাকে।

ব্যর্থ চেষ্টা। রুক্ষ দৃষ্টি অপর্ণার।—পাঁচ বছরের খুকিটি পেয়েছ আমাকে ?

না, সাতাশ বছরের। হল কি বলো তো, তোমার সঙ্গেও ওজন করে কথা বলতে হবে সব সময় ?

অপর্ণা উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। তিনি বাধা দিলেন, আমার সত্যিই অন্যায় হয়েছে অপর্ণা।

এরই অপেক্ষায় ছিল। ঘুরে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল, সত্যিকারের দুঃখটা প্রকাশ করে ফেলেছ রাগের মাথায়, এই অন্যায় ? শাড়ি গাড়ি গান বাজনা নিয়ে দিন কাটবে আমার, তোমার মাইক্রোসকোপের তথ্য আমি বুঝতে চাইব না কোন কালে—এ তুমি আগে জানতে না ?

জানিতুম। সহাস্যে জবাব দিলেন চন্দ্র, গান বাজনার বদলে তুমি মাইক্রোসকোপের তথ্য বুঝতে চাইলে পাঁচ ডিগ্রী জ্বরের মতো লাগত।

ছোটখাটো গোলযোগে আপসের এ প্রয়াস নতুন নয়। তা ছাড়া একেবারে মিথ্যেও বলেন নি। সরমার প্রসঙ্গে অপর্ণার প্রতি ব্যঙ্গোক্তিটা সাত-পাঁচ না ভেবেই করে ফেলেছেন। নইলে তার গান বাজনা রাগ অভিমানে অভ্যস্ত তো বটেই, ভালোও লাগে।

## ॥ ৪ ॥

বিপিন চৌধুরীর সঙ্কল্প অটুট। শেষ না দেখে থামবে না। সেদিনের সাক্ষাতে সরমার দিক থেকে সহজ আহ্বান মাত্র থাকত যদি, মেজাজ চড়ত না এতটা। চন্দ্রের কথা মনেও পড়ত না হয়তো। কিন্তু ফল বিপরীত দাঁড়াল। অজ্ঞাত অবিনাশের নামটা কৌতূহলোদ্দীপক। অস্বস্তিকরও। শান্ত প্রতীক্ষা সম্ভব নয়, লাগাম-ছাড়া দুরন্ত বাসনায় অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত দুঃসহ। মোটর ছুটল দাদারের দিকে। যান-বাহন-পরিকীর্ণ রাজপথে স্পীডোমিটারের কাঁটা চল্লিশের দাগ ছুঁয়েছে।

কাকে চান ? মণিময় লেখা থামাল।

সরমাদেবী বাড়ি আছেন ?

না।

ফিরতে দেরি হবে ?

জানিনে, কি দরকার বলে যেতে পারেন ।

তিনি আসতে বলেছিলেন আমায়—

বসুন তাহলে । মণিময় কলম তুলে নিল । মানুষটা বসবে কোথায়, মেঝেয় না তার ছড়ানো কাগজপত্রের ওপর, সে ভাবনাও নেই ।

আচ্ছা, বাইরে গাড়িতেই অপেক্ষা করছি আমি—

গাড়ির কথা কানে যেতে মণিময় আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিল একবার । গাড়ি থাকা সম্ভব বটে । তক্তপোশের ধার থেকে কাগজ পত্র সরিয়ে নিল ।—এখানেই বসুন, মিছিমিছি বাইরে আবার কেন । সরমা বলে গিয়ে থাকলে এক্ষুনি আসবে ।

আহ্বান অবহেলার নয় । আসন গ্রহণ করল বিপিন চৌধুরী ।—আমি আজই আসব উনি জানেন না অবশ্য...আপনি তাঁর দাদা ?

হ্যাঁ, আপনি ?

আমার নাম বিপিন চৌধুরী ।

দ্রুততালের আলাপ । শেয়ার বাজারের দালালির দক্ষতা এ ক্ষেত্রেও কাজে লাগে ।

আপনি লেখেন ?

একটু আধটু ।

সশ্রদ্ধ অভিব্যক্তি বিপিনের ।—দেখুন তো কি অন্যায়, সরমাদেবী কোন দিন বলেন নি । ভালো লেখকের যে কত অভাব আজকাল, অথচ হাতের কাছে আপনি এমন...নামটি কি আপনার ?

নাম বলল ।

চিন্তাপ্রচ্ছন্ন ।—শুনেছি হয়তো, ঠিক মনে পড়ছে না । কি লেখেন, উপন্যাস ?

নাটক । উপন্যাসের দলে আর ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি ।

আগ্রহাতিশয্যে পকেট থেকে নোট বই হাতে উঠে আসে বিপিনের ।—বইয়ের নাম বলুন, আজই কিনে নেব—না না কমপ্লিমেন্টারি চাইনে, ওই এক রোগ আমাদের, সবার আগে বই কিনে কোথায় লেখকের সম্মান বাড়াবো তা নয়, কমপ্লিমেন্টারি চেয়ে নিয়ে বাহাদুরি করা চাই অন্যের কাছে । সামাজিক নাটকের আইডিয়া তো এদেশে প্রায় নতুন বললেই চলে—

স্তুতিকথায় পাথর ভেজে । মণিময় সামান্য মানুষ । অতঃপর 'দেশের মেয়ে' চিত্র-রূপায়ণের সদিচ্ছায় বিপিনের দ্বিগুণতর উচ্ছাস জ্ঞাপন । কল্পিত চিত্র-প্রযোজক-বন্ধুর অকৃত্রিম সহযোগিতার আশ্বাস দানে মুক্ত-কণ্ঠ ।

আবহাওয়া অনুকূল । প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হল ।—এমনিতেই আজ আপনার সঙ্গে আলাপের ইচ্ছে ছিল, এখন তো দেখছি উঁচু দরের সাহিত্যিক আপনি । আমার ইয়ে... সমস্যাটা বুঝবেন বোধহয়...।

মণিময় জিজ্ঞাসু ।

এই, বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলাম আর কি—

মণিময় অবাক ।—বিয়ে ! কিন্তু বিয়ে তো আমি করব না আর ।

বিপিন মনে মনে তাকে জাহান্নমেই পাঠাল একবার ।—আমি আমারই কথা বলছি ।

সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবতে চেষ্টা করল মণিময় । নিজের ঝোঁকে থাকে, আসলে নির্বোধ নয় মানুষটা । অনুমানে ঠিকই বুঝে নিল তার সমস্যা ।

এই ব্যাপার... । সামান্য কথাটা তোলবার জন্যে এতক্ষণ কষ্ট করলেন বসে ? সরমাকে বলেছেন ?

না ।

বলুন তাকে ।

পারি, কিন্তু আপনি আছেন মাথার ওপর—

না মশাই, ওর মাথার ওপর কেউ...হঠাৎ স্মরণ হল কি,—অবিনাশকে চেনেন আপনি ?

আবার ধাক্কা খেল বিপিন । নাম শুনেছি, কে বলুন তো তিনি ?

থার্ড-ক্লাস্ লোক । সরমার বন্ধু । কাউকে দিয়ে যদি তুলতে চান কথাটা, একমাত্র মানুষ সে । তার কাছে যান । আমি বলেছি বলবেন না যেন ।

কি করেন ?

ঘাস কাটেন । কমার্সিয়াল আর্টিস্ট, বছরে সতেরো বার অসুখে ভোগে বলে চাকরি গেছে । এখন বাড়ি বসেই কাজ করে শুনেছি ।

অবিনাশর প্রসঙ্গে চন্দ্রর শেষের হাসিটুকু মনে আছে বিপিনের । মণিময়ও যথার্থই পথ দেখালো কি পথের সন্ধান দিল বোঝা দুরূহ । লেখক জাতটার ওপরেই সে চটে উঠল, হেঁয়ালি ছাড়া সবেতে শূন্য-কুম্ভ ।

নিজেই তিনি বিবাহ-প্রার্থী নন্ তো ? সশঙ্ক জিজ্ঞাসা ।

মণিময় ভেবে জবাব দিল, বোধহয় না ।... একবার সে মুখ ফুটে বললে এতদিনে তিনবার বিয়ে হয়ে যেত ।

অথৈ জল । থার্ড-ক্লাস লোক, ঘাস কাটে—সরমার বন্ধু । মুখ ফুটে বললে এতদিনে তিনবার পর্যন্ত বিয়ে হতে পারত । হয় নি, অর্থাৎ মুখ ফুটে সে বলেনি কখনো । সব মিলিয়ে সব কিছুই তেমনি গোলমেলে ।

গোঁয়ার মন্টুর শান্তি নেই ।

বিগত ক'টা দিনে তারও মানসিক জগতে বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটে গেছে । তার ভয় নেই মায়ের মতো । দুশ্চিন্তা নেই বিপিনের মতো । কিন্তু বিক্ষোভের মাত্রা কম নয় লেশমাত্র । মায়ের তরফ থেকে সরমাকে ফিরিয়ে আনার অনুরোধে আগুন হয়েছে । জ্যেষ্ঠের তিরস্কারে মেজাজ বিগড়েছে । আর আত্মতাড়নায় অহর্নিশি মন জ্বলেছে । জ্বলছেও ।

কর্তব্য স্থির অবশেষে । ছুটির সময় সায়েন্স কলেজের গেটে হাজিরা দিল । এক দিন দু দিন তিন দিন কিন্তু সঙ্কল্প দোদুল্যমান । দূর থেকে সরমাকে দেখামাত্র কণ্ঠতালু শুকিয়ে তৃষ্ণার উদ্রেক হয়েছে কেমন । বাড়ি ফিরে জলের বদলে বিবেকের চড় খেয়েছে গোটাকতক ।

মরার বাড়া যাতনা কাপুরুষতার গ্লানি । মন্টু মরীয়া শীতকালের সকালে জল-ভীরু স্নানার্থীর সহসা ঝপাঝপ জল ঢেলে ফেলার মতো সেও একদিন সপাসপ হাজির সরমার বাড়ি ।

বিনুকে বিছানায় বসিয়ে সরমা হাসিমুখে এলো তাড়াতাড়ি ।—কি আশ্চর্য, তুমি ? এসো এসো । হাত ধরে তাকে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে, বোসো ।

মণ্টু বসল গম্ভীর মুখে । সরমা তার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করল একটু । পরে হাসি গোপন করে স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চড়ালো ।

আমি চা খেতে আসি নি ।

সরমা সকৌতুকে তাকে নিরীক্ষণ করল আবার ।—কেন এসেছ ?

মণ্টু অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে ।

সরমা আবার বলল, এলে একটা কিছু অনুরোধ করবে বলে অথচ ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন আমিই আসামী । এদিকে ফিরে বসতে পার, এখন আমার দিকে চাইলে রাগ করব না ।

কানের কাছটা লাল হয়ে ওঠে মণ্টুর ।

পড়াশুনা হচ্ছে ভালো ?

না ।

কেন ?

আপনি যদি না পড়ান, পড়া ছেড়ে দেব আমি ।

ও বাবা ! কিন্তু আমি তো ইচ্ছে করে পড়ানো বন্ধ করি নি তোমাকে ?

মণ্টু নীরব ক্ষণকাল, আমাদের বাড়ি আর কক্ষনো কোন অসম্মান হবে না আপনার ।

সরমা মুখ টিপে হাসল তার দিকে চেয়ে ।—কথাটা কি তোমার না আর কারো ?

আর কেউ জানে না আমি এখানে এসেছি । মা অনেকবার তাগিদ দিয়েছেন আপনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য । তা ছাড়া দাদা সেই থেকে রেগে আগুন ।

ওই জন্যেই বুঝি এসেছ ?

না, আমার অন্যায় হয়েছে । আপনি না এলে আমি সত্যিই পড়া ছেড়ে দেব ।

সরমা ভাবল একটু । এক পেয়ালা চা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আমার কোন রাগ নেই তোমাদের ওপর । বোঝবার যদি কিছু থাকে, এসে বুঝে নিও, খুব খুশি হব ।

কিন্তু মণ্টু খুশি হল না ।

সরমার মায়া হল কেমন । বলল, তুমি পড়াশুনায় অবহেলা করেছ শুনলে ভয়ানক রেগে যাব কিন্তু । এম. এস্‌সি পর্যন্ত একেবারে পাস করে নাও ভালো করে । তারপর একসঙ্গে আমরা রিসার্চ করব কোন ভালো ল্যাবরেটারিতে । কেমন হবে বলো তো ?

মণ্টু হাসিমুখেই বিদায় নিল শেষপর্যন্ত ।

অবিনাশের দোর-গড়ায় মোটর থামল । আগন্তুক বিপিন চৌধুরী । অবিনাশ-সন্দর্শনে বিস্ময়ের উদ্রেক হল সত্যিই ।

আপনি অবিনাশবাবু ?

হ্যাঁ, বসুন—আপনি ?

বিপিন বসল কাঠের আধময়লা চেয়ারে । অনুসন্ধিৎসু । মণিময়ের বর্ণনা মিলছে, থার্ড-ক্লাস...ঘাস কাটে...। কিন্তু সরমার বন্ধু এবং তার পরেরটুকু মেলানো শক্ত ।

আমি একজন শেয়ার ডিলার—একটা বিজ্ঞাপনের ডিজাইন্ এঁকে দিতে হবে। পকেট থেকে নমুনা বার করল।

অবিনাশের মুখে ভাবান্তর নেই কোনো। কাগজটা হাতে নিয়ে দেখল একবার।

হবে।

লেটারিং ঠিক এমনি হওয়া চাই।

অবিনাশ হাসতে লাগল মৃদু মৃদু। জবাব দিল, হাতের লেখা দেখলে আপনার নাম সই করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে আসতে পারি। লেটারিং-এর গলদ থাকবে না।

—বেশ! অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায় বিপিনের হাসি-খুশিতে। আপনি এ লাইনে কাজ করছেন কতদিন?

অনেক দিন। আসল কথাটা বলুন এবার।

বিপিন তাকালো। নিরীক্ষণ করল। টাকা? সে আপনি যা চান তাই পাবেন।

প্রচ্ছন্ন কৌতুকে অবিনাশ চেয়ে থাকে স্বল্পক্ষণ। আর তাহলে কোন কথা নেই আপনার?

বিপিন জিজ্ঞাসু। মানে—?

মাপ করবেন। আপনার আপিস বড়ি-বন্দরে, ছ'মাইল পেট্রোল খরচা করে এসেছেন বিজ্ঞাপনের লেটারিং আঁকাতে আমার হাত-যশ শুনে, বুঝতে পারি নি।

বিপিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে তাকে।—কাস্টমারের সঙ্গে এ কোন্ দিশি তামাশা আপনার?

খাঁটি দিশি। অবিনাশ গম্ভীর।—বাজে বকাটা মুদ্রা-দোষ আমার, অপরাধ নেবেন না। আচ্ছা নমস্কার, আপনার অর্ডার কালই পাবেন।

থার্ড-ক্লাস লোকই বটে। মুখ ফুটে বললে সরমা যাকে তিন-বার পর্যন্ত বিয়ে করত, মণিময়ের মতো চল্তি ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসের কেউ সে হবে না, জানা কথা। ছলাকলা পরিহার করে সোজাসুজি সম্মুখীন হওয়াই সমীচীন। ঈষৎ হেসে বিপিন বলল, আমি কেন এসেছি বুঝতে পেরেছেন?

অবিনাশ জবাব দিল ভেবেছিলাম পেরেছি কিন্তু সেটা তো দিশি তামাশার মতো জলো লাগল। মন্টু, অর্থাৎ সরমা যাকে পড়াতো তার দাদা তো আপনি?

জবাবে উচ্চহাস্যে ঘর সরগরম করে তুলল বিপিন। পরে বলল, শেয়ার বাজারের দালালি জানা আছে, বিয়েব বাজারের সুপারিশও একই বিদ্যেয় চালাতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনলুম। হ্যাঁ, আমি মন্টুর দাদা, আমার নাম বিপিন চৌধুরী।

কিন্তু আমার কাছে সুপারিশ কিসের?

আমাকে দেখেই আপনি এতটা জেনে বসে আছেন আর এইটুকু জানতে বাকি?

অবিনাশ সহাস্যে বলল, তা নয়—কিন্তু আমি তো আপনার পাত্রী নই মশাই!

বিপিন মনে মনে বলল, গলায় দড়ি দিতে হত তাহলে। পাত্রী নয় জানে, কিন্তু আর কিছু কি না সেটাই জানা দরকার। বলল, ডাঃ চন্দ্র অপনার নাম করলেন, সরমার দাদাও আপনার কথাই বললেন...আপনার সুনজর থাকলে নাকি আর আটকাবে না।

অবিনাশ হাসছে।—নিজের এমন অদ্ভুত প্রতিপত্তি জানতুম না। সাদা কথায় আপনি

সরমাকে বিয়ে করতে চান আর আমাকে সেজন্যে তদবির করতে হবে, এই না ?

গরজ বিষম বালাই । ক্ষুদ্র জবাব দিল, আপনার অনুগ্রহ ।

কয়েকটা চিন্তার রেখা মিলিয়ে গেল তড়িতে । একটু নীরব থেকে অবিনাশ শান্ত মুখে বলল, আমি বলে দেখতে পারি এই পর্যন্ত...কিন্তু গোটাকতক কথা তাহলে জিজ্ঞাসা করা দরকার ।

বলুন ।

মাসে রোজগার কত আপনার ?

চার পাঁচ হাজার । ঘরের ভিতরটা বিপিন ভালো করে দেখল আবার । মূর্তিমান দারিদ্র্য । সীমাতীত মনে হয় স্পর্ধা ।

সান্তাক্রুজে নিজেদের বাড়ি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ ।...মেরিন-লাইনসএও জমি দেখছি, আর ব্যাঙ্কের পাস্ বইও গোটাকতক, বলেন তো পাঠিয়ে দিতে পারি ।

অবিনাশ ততোধিক শান্ত ।—ছবি আঁকা পেশা, মনের কথা এমনিতেই একটু-আধুট বুঝতে পারি, বিদ্রূপের চেষ্টা পণ্ডশ্রম আপনার ।...সরমার বরাবরকার ইচ্ছে বিজ্ঞানে সত্যিকারের কিছুতে কাজে লাগবে ও । এতে আপনার দিক থেকে বাধা আসবে না কখনো ?

না ।

বেশ । তেমনি নিস্পৃহ ঠাণ্ডা গলায় অবিনাশ বলল আবার, আপনার পাস্ বইয়ের জোর থাকে তো বাড়িতে একটা ল্যাবরেটারির মতো করে দেবেন ওকে । আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না...তবে, যে যাই বলুক, তার নিজের মতামতই সকলের বড়, এ আপনিও জানেন বোধহয় । শিগগীরই ছুটি হয়ে যাবে ওদের, তখন তুলব কথাটা ।

বিপিন গাত্রোত্থান করল, আজ আসি তাহলে, নমস্কার ।

নমস্কার । অবিনাশ বিজ্ঞাপনের নমুনাটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে ।—এটা নিয়ে যান ।

মোটরে বসে বিপিন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল বিজ্ঞাপনের নক্সা ।

॥ ৫ ॥

সাঙ্গ হল মণিময়ের শবরীর প্রতীক্ষা । চলচ্চিত্র প্রযোজকের পাষাণ-প্রাণও ভিজল শেষ পর্যন্ত । স্টুডিও থেকে ডাক এসেছে । ওদিকে রেকর্ড কোম্পানিতে হাজিরা দেওযাও আশু প্রয়োজন । কিন্তু বেরুবে কি, সরমার দেখা নেই—ছেলে একা থাকে বাড়িতে । ঠিক করল, কাজটা হলে ওকে কন্‌ভেণ্টএ পাঠিয়ে দেবেই ।

সরমা ফিরল, সঙ্গে অবিনাশ । আল্‌না থেকে তাড়াতাড়ি একটা জামা টেনে নিয়ে রাগে গজগজ করে উঠল মণিময় ।—এতক্ষণে সময় হল তোর, একপা' নড়তে পারছিনে আমি—

এবার যাও ।

এবার যাও, একবার বেরুলে আর—

ঘাট হয়েছে, থামো । গান গাইতে পারবে এক জায়গায় ?

এবার মণিময়ের বিস্ময়ের পালা । গান সে ভালোই গায় এবং বাইরে সুনামও আছে । কিন্তু সরমার কাছে উৎসাহ পায় নি কোনদিন । অবিনাশের বাহ্বা বরং জুটত আগে ।

কোথায় ? কি অকেশান ?

সায়েন্স কলেজে । ডাঃ সমাদ্দারকে রিসেপশান দেবে সব কলেজ আর য়ুনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা । যাবে নাকি ? বিনুকে অবিনাশের কাছে রেখে যাব'খন ?

আচ্ছা ।—মেজাজ একমুহূর্তে ভালো হয়ে গেল । অবিনাশের দিকে তাকালে সে, আসবি নাকি, স্টুডিও তো দেখিস নি কখনো, চল্ ।

অবিনাশ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল, থাক দাদা, শুভ কাজে যাচ্ছ, আমাকে ডাকাও যা বেরুবার মুখে অযাত্রা স্মরণ করাও তাই । প্রার্থনা করি তোমার প্রডিউসারের যেন সত্যিই ভীমরতি ধরে এবার ।

সময়াভাবে গতানুগতিক বোঝাপড়া স্থগিত থাকল । দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হল সে ।

পিতার সান্নিধ্যে বিনু নির্বাক শ্রোতা এবং দ্রষ্টা । সতেজে ঘোষণা করল এবার, আমি পিসেমশাইর কাছে থাকব না । তাকে অবিনাশের কাছে রেখে যাবার কথাটা মনে করে বসে আছে ।

সরমা বসল তার পাশে, কেন পিসেমশাই কি করেছে ?

সে একই কথার পুনরুক্তি করল, থাকব না ।

অবিনাশও বলল চেয়ার টেনে । বলল, দেখ সরমা, ও ডাকটা ওকে ছাড়াও । শুনতে আমার ভালোই লাগে কিন্তু ওর সত্যিকারের পিসেমশাই যিনি আসছেন, শুনলে হার্ট ফেল করবেন ।

বাজে কথা রাখো, বেলা হল, কি করবে এখন ?

উঠছি । অবিনাশ হাসছে মুখ টিপে ।—কিন্তু কথাটা বাজে কেন হল, ও বেচারীর আশা ভরসা সত্যিই নেই নাকি ?

সরমা অন্যমনস্কের মতো বিনুর মাথার চুলগুলি নাড়া-চাড়া করে কিছুক্ষণ । জবাব এড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় ।—অবেলায় আর বাড়ি গিয়ে রান্না চাপাতে হবে না, যা আছে দুজনের হয়ে যাবে একরকম করে । এসো ।

পাশের ঘরে চলে গেল । অবিনাশ আপত্তি করল না । করলেও ফল হবে না জানে ।

দুটো থালায় ভাত বেড়ে নিয়েছে সরমা । অবিনাশ দঁড়িয়ে দেখল একটু ।

বোসো ।

বসছি । ওর দিকে চেয়েছিল অবিনাশ । একটু যেন গম্ভীর দেখাচ্ছে । বিপিন চৌধুরীর আবেদন যথা সময়েই পেশ করেছিল । শোনা মাত্র সরমা যদি বাতিল করে দিত, কথা থাকত না । কিন্তু সরমা তা করেনি । চুপচাপ শুনেছিল । আর শুনেও চুপ করেই ছিল । থালায় ভাতের পরিমাণ দেখে নিয়ে অবিনাশ স্বভাব-সুলভ হাল্কা গলায় বলল, ভাগ জিনিসটা ঠিকমত ভাগ না হলে অবশিষ্ট থাকে কিছু । হিসেবে থাকে থাকুক, ভাতের বেলায় নৈব নৈব চ । দেবার বেলায় দেবে বেশি অথচ খিদের জ্বালায় মনে মনে নেবে বেশি, আমার শরীরে এত সইবে না । ভাত কমাও ।

বক্বক্ না করে বোসো এখন ।

এবারে অবিনাশ বেশ ঘটা করে ওকে দেখল যেন এক দফা । তাতেও কাজ হল না দেখে ছদ্ম-গাম্ভীর্যে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে তৎপর হল সে । দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বক্তৃতার সুরে বলল, দেখো, এই যে মেজাজটা তোমার ভালোই ছিল এতক্ষণ, অথচ বিগড়ে গেল ঝট্ করে, আর তার দায় গিয়ে পড়ল বিনুর পিসেমশাই নির্বাচনের ওপর, সেটা মিথ্যে না হলেও ঠিক সত্যি নয় । পাকযন্ত্রের প্রতিক্রিয়া মনোযন্ত্রের বিকৃতি সর্বজনবিদিত । অতএব, হে অন্নদা —খানিকটা অন্নব্যঞ্জন তোলো তোমার থালায়, নতুবা মরীয়া হয়ে আমি তাণ্ডব নৃত্য শুরু করব ।

সরমা হেসে ফেলল । বলল, আঁকা ছেড়ে থিয়েটারে ঢুকে পড়ো সং সেজে । দিচ্ছি কমিয়ে বাক্যবাগীশ, বোসো ।

অবিনাশের মুখে অবিচ্ছেদ্য গাম্ভীর্য । আসন-পিঁড়ি হয়ে ভারী গলায় বলল, অপ্রিয়ভাষিণী, তোমার রসনা সহ্য হয়, কিন্তু সঙ্গের ওই হাস্যচ্ছটাটুকু নয় । রাগ ভুলে-ও মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতে পারি ।

সরমা ভাতের বদলে আঁচল তুলে দিল মুখে । দুই চোখ ওর মুখের ওপর ।—থাকো না, কে বারণ করেছে ।

সহাস্যে আহারে মনোনিবেশ করল তারা । কিছুক্ষণ বাদে অবিনাশ বলল আবার, বাজে কথাটার আলোচনা শেষ করে নেওয়া যাক এবার তাহলে, মাথা ঠাণ্ডা রেখো।

তোমাকে কি ভদ্রলোক দালাল রেখেছেন নাকি ?

দালালি একটা পাব নিঃসন্দেহ, তবে সেটা কোন তরফ থেকে জানা নেই ।—তোমার বক্তব্য কি ?

সরমা নিরুত্তর ।

মাস্টারী ঢংএ অবিনাশ বলল, দেখো, সবারই জীবনে প্রোগ্রাম থাকে একটা । তোমারও আছে—

যেমন ? সরমাও চেষ্টা করছে সহজ হতে ।

এবার আর ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি জবাব দিল অবিনাশ, যেমন ধরো, এম. এস্‌সি পাস করবে, তারপর সমাদ্দারের ল্যাবরেটারিতে জায়গা পাও যাবে, নয়তো চাকরি করবে কোন কলেজে, সুযোগ পেলে বাড়ি বসেও কিছু গবেষণা করতে পারো । অন্যদিকে কর্তৃত্ব করবে একজনের ওপর আর ক্রমশ একটা সংসারের ওপর । সব মিলে একটা বড় সার্থকতার আশা আছে মনে, অথচ বলতে পারছ না মুখ ফুটে । কেমন কি না ?

সরমা থালা থেকে মুখ না তুলে হাসল একটু ।—বলতে বাধা কোথায় শুনি ?

বাধা এই পামর ।

আহা-গো ।...তারপর তোমার প্রোগ্রাম ?

অবিনাশ ঈষদহাস্যে তাকে নিরীক্ষণ করল একটু । পরে কয়েক গরাস ভাত মুখে পুরে বলল, সে কি তোমার জানা নেই নাকি ?

তা হলেও বলো, মিলিয়ে দেখি ।

আহার সম্পন্ন করে অবিনাশ এক ঢোঁক জল খেয়ে নিল । পরে ধ্যান-মগ্নের মতো চোখ বুজে বসল পা গুটিয়ে ।—তোমারটা পুরোপুরি বললেই আমারটা বলা হবে, দেখো

মেলে কিনা ।...এখন একত্রিশ আমার, আরো বছর তিনেক কাটছে এমনি হৈ চৈ করে এবং কিছু না করে । এরপরে ভালো থাকলে চুপ করে নক্সা আঁকছি ঘরে বসে । অন্যথায় হাসপাতাল । ইতিমধ্যে বিপিনবাবু তোমার কাঁধে ভর করেছেন । তুমি প্রথম প্রথম দেখাশুনা করতে আসছ প্রায়ই, পরে সময় অভাবে মাঝে মাঝে । সঙ্গে স্বাস্থ্যোপদেশ আর হিতোপদেশের ঝুড়ি । তোমার সময় কমছে, কাজেই আমার বাড়ছে । পয়সা কিছু পাচ্ছি কিন্তু থাকছে না । দেহের খাঁচা ঠিক রাখতে মাশুল যাচ্ছে ক্রমাগত । কিন্তু নাছোড়বান্দা আমি, যুদ্ধ করছি অক্লান্ত । বিপিনবাবুকে বাহন করে তোমার ঘন ঘন ষড়যন্ত্র—তদারক এবং সুচিকিৎসার অজুহাতে এসে থাকতে হবে তোমাদের বাড়ি । আমার কাঁধে শনি, সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করব ।

খাওয়া ফেলে সরমা চেয়ে আছে তার মুখের দিকে । অবিনাশ হাসল একটু । চোখ বুজে তেমনি বলে গেল, এরপরে হঠাৎ একদিন ক্লান্ত হয়ে যমরাজার বশ্যতা স্বীকার । বিপিনবাবু এক সপ্তাহ শেয়ার বাজারে লোকসান খাবেন দিবারাত্র তোমাকে সান্ত্বনা দেবার অছিলায়...তোমার দিন কাটছে বছর কাটছে । একটা দুটো করে অনেকগুলো । কখনো মনে পড়ে আমাকে কখনো বা পড়ে না । তোমার মাধুর্য নিয়ে কল্যাণ নিয়ে বড় হয়ে উঠছে তোমার ছেলেমেয়েরা, সুন্দর সংসার । আমি অপরিচিত তাদের । শেষে তুমিও ভুলবে । বয়সের মাঝ ধাপে পা দেবে একদিন, ছেলেমেয়ের শাসনে পড়ে বিশ্রাম নিতে শুরু করবে মাঝে মাঝে । তেমনি এক অলস সন্ধ্যায় বারান্দার রেলিংএ দাঁড়িয়ে নয়ত ছাতের আলসেতে বসে নিজের পরিপূর্ণতাই অনুভব করছ হয়তো । একটু আনন্দ, একটু গর্ব, একটু ব্যথা— । অতীত প্রদক্ষিণ শুরু হবে অন্যমনস্কের মতো । স্তব্ধ হয়ে দেখবে অবিনাশ হারিয়ে যায় নি একেবারে । মুখ চাওয়াচাওয়ি করবে তোমার ছেলেমেয়েরা, তাদের মায়ের হল কি আজ ! ভাববে, ডাকবে কি ডাকবে না ।

অবিনাশ চোখ মেলে তাকালো । খাওয়া পড়ে আছে সরমার, চুপ করে চেয়েই আছে তেমনি । উদ্‌গত অশ্রুর বাঁধ ভেঙে পড়ে বুঝি ।

হাসতে চেষ্টা করল অবিনাশ । মুখ বিকৃত হল শুধু । স্তব্ধ হয়ে বসে রইল খানিক । এ কোন্ বুভুক্ষু কাঙাল স্বরূপ প্রকাশ করল নিজের । বেদনায় সঙ্কুচিত সমস্ত মুখ ।

উঠল । মুখ হাত ধুয়ে এ ঘরে এলো দুজনেই । সরমা নীরবে বসল চৌকিতে । বিনু ঘুমাচ্ছে ।

সরমা—

বলো—

ভাবছ কি—

ভাবছি তোমার ও দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার সইবে কি না ।

সরমা !

চোখ রাঙিও না, ভয় পাবার বয়স নেই আর । আর কারো ঘরে আমি গেলে হাড়পাঁজর সুদ্ধু গুমরে উঠবে তোমার এ তুমি গোপন করতে চাও কেন ? অহঙ্কার ভালো নয় কিন্তু শোকের অহঙ্কার যে আরো খারাপ ।

অবিনাশ ঘরের মধ্যে পায়চারি করল বার দুই । মধ্যাহ্নের গুমটে ঘর ভরে গেছে ।

আবার এসে দাঁড়াল সামনে । কণ্ঠস্বর রুক্ষতর ।

তর্ক আমিও ভালোবাসিনে, তুমিও না—বিপিনবাবুকে কি বলব ?

আমার সম্বন্ধে কিছু বলা না বলার মালিক তুমি নও । তাঁর কিছু শোনবার থাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও ।

বিবর্ণ দেখালো অবিনাশকে । অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলল, একটু আগে যে ছবিটা তুলে ধরেছিলাম, রিক্ততা আছে কিন্তু তার থেকেও বেশি আছে যা, সেটা শিল্পীর চোখের একটা সুন্দর স্বপ্ন । তোমাকে আমি জানি, আমার ভাঙা স্বাস্থ্য তোমাকে অব্যাহতি দিয়েছে এও তো সত্যি । কিন্তু কোনদিন এ নিয়ে কটাক্ষ করেছি বলে মনে তো পড়ে না ।

সরমা রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে, তার মানে ?

মানে বুঝে নিও । মৃদু স্পষ্ট কণ্ঠে বলল সে, আর একটা কথা, তোমার করুণার বোঝা হয়ে অবিনাশ থাকবে না কোনদিন, বরং নিজেকে সে সরিয়ে নেবে অনেক দূরে, সেটাই স্বাভাবিক জেনো ।

সরমা বসে আছে মূর্তির মতো । অবিনাশ চলে গেছে । বিনু ঘুমুচ্ছে অঘোরে । মধ্যাহ্নের ক্লান্ত স্তব্ধতা ।

ভাবছে...

দাহ আছে, আছে ব্যর্থ জীবনের বোবা নিঃশ্বাস, কিন্তু তা বলে 'করুণার বোঝা হয়ে অবিনাশ থাকবে না কোনদিন, বরং—'

ধড়মড় করে উঠে সরমা অগ্রসর হল দরজার দিকে । ভয় পেয়েছে । ভয়ই করে অবিনাশকে । থামতে হল । বিনু একা থাকবে । আবার চৌকিতে গিয়ে বসল ।

এ কোন অদ্ভুত সমস্যা বোঝে না । স্বামী হিসেবে বিপিন চৌধুরীকে তবু কল্পনা করা যেতে পারে । অথচ এই অস্থিচর্মসার মানুষটার প্রতিও লোভের অন্ত নেই তার । উদ্বেগেরও শেষ নেই । ব্যবধান হয়তো চায়, বিচ্ছেদ সইবে না ।

নিজের ঘরে ফিরে বিজ্ঞাপনের নক্সা আঁকায় মন দিল অবিনাশ । মুখভাব নির্লিপ্ত । কাজটা জরুরী । শেষ হল । কাগজে মুড়ে সেটা মালিকের জিম্মায় পৌঁছে দিতে গেল । বিজ্ঞাপন-দাতা মোড়কটা এক পাশে সরিয়ে রেখে বললেন, আর একটা অর্ডার আছে খুব আর্জেন্ট, আজই ধরে ফেলুন ।

অবিনাশ শান্ত মুখে অপেক্ষা করল একটু, এটার টাকা আজ দেবেন ?

দু'চার দিন পরে পাবেন ।

অর্ডারও দু'চারদিন পরে পাঠাবেন ।

ফিরে চলল অবিনাশ । ভদ্রলোক প্রথমে বিস্মিত, পরে ক্রুদ্ধ । কিন্তু স্বল্প পারিশ্রমিকে কাজ ভালো করে যে, পাবলিসিটি এজেন্টের তার উপর রাগলে চলে না । তাছাড়া পারিশ্রমিক প্রদানেও এই প্রথম বিলম্ব নয় ।

শুনুন, নিয়ে যান টাকা—

অবিনাশ ফিরল ।

এই নিন, টাকার দরকার খুব, মুখে বললেই হত । এইটে নতুন অর্ডার ।

কিছু না বলে কাগজপত্র গুটিয়ে নিরুদ্দিষ্টের মতো পথ চলতে লাগল অবিনাশ। মধ্যাহ্নের নির্জনতা কমে আসছে। যান-বাহন লোক-চলাচল সব কিছুই চেয়ে চেয়ে দেখছে সে। চোখে অনর্থক আগ্রহ। কিন্তু বিস্মৃতির খোরাক যোগাতে পারল না কোন বাহ্য বস্তু।

বেলা গড়িয়ে গেল।

বাড়ির কাছে এসে অবিনাশ অবাক। বন্ধ-দরজার সামনে বিজ্ঞাপনের সেই ভদ্রলোকটি অপেক্ষা করছেন। অনতিদূরে সরমা দাঁড়িয়ে।

ঘরের তালা খুলে অবিনাশ ভদ্রলোককে ডাকল, আসুন। পরে তাকালো সরমার দিকে, এসো।

দ্বিতীয় আহ্বান শুনে ভদ্রলোক থমকালেন একটু। পথের ধারে একজন সুদর্শনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হচ্ছিলেন। আর, এভাবে এতক্ষণ অপেক্ষা করাটাও বিরক্তিকর মনে হয়নি তেমন।

ঘরে প্রবেশ করে সরমা দূরেই দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। ভদ্রলোকটির উদ্দেশে অবিনাশ প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার বলুন তো?

আর কি ব্যাপার। ভদ্রলোকের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল এবারে।--আপনার মতো দু'চার জনের পাল্লায় পড়লে ব্যবসা ছেড়ে একেবারে পালাতে হবে মশাই। আমার ওখান থেকে বেরিয়েছেন তো তিন ঘণ্টা আগে?

অবিনাশ হাসল, দালালির কাজ করেও এমন মাথা মোটা আপনার। তিন ঘণ্টার কৈফিয়ৎ চাই, না অন্য কোন কাজ আছে?

জবাবে গম্ভীর মুখে তিনি কাগজের মোড়ক খুলে দুপুরে আঁকা নক্সাটা বার করলেন। --কি হয়েছে এটা?

অবিনাশ বিস্মিত।

লেটারিংএ পাকা হাত জেনে, না দেখেই টাকা দিয়েছি, নতুন অর্ডার দিয়েছি, এতটা বিশ্বাসের পরে এই! আসলটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন তো একবার?

অবিনাশ মিলিয়ে দেখল। চকিতে সরমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একটা। নিজের আঁকা নক্সাটা তিন চার টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে পকেটে হাত দিল।

টাকা ফেরত নিন, আর এই আপনার নতুন অর্ডার।

ভদ্রলোক থমকে গেলেন, ভুল হয়নি বলতে চান?

হাসল সে।--হয়েছে। কিন্তু কি আর করব বলুন, লেটারিংএ আমাকে অভ্রান্ত জানা অথবা কাজ না দেখে টাকা দেওয়া এর কোন পরামর্শই আমি দিই নি। ভুলের জন্য দুঃখিত, দ্বিতীয়বার বিশ্বাসের দাবি আর করব না। আচ্ছা আসুন—

বিজ্ঞাপনদাতা আড়চোখে একবার সরমার দিকে তাকালেন। মনে মনে যাই বলুন, মুখে হৃদ্যতা প্রকাশ পেল।—মেজাজ আপনার সেই থেকে বিগড়ে আছে দেখেছি। টাকা ফেরত নিতে আসি নি আর বিশ্বাসও ঠিকই করব। এখন অনুগ্রহ করে কালকের মধ্যে আবার এটি করে দিয়ে আমাকে বাঁচান। নতুন অর্ডারটার দিকেও একটু নজর দেবেন। চলি, কেমন?

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। শয্যায় দেহ এলিয়ে দিল অবিনাশ। সরমা কাছে এসে বসল.

হাতল-বিহীন চেয়ারে ।

বলবে কিছু—?

না, এমনি এলাম । সরমা ঝুঁকে মেঝে থেকে ছেঁড়া নক্সার টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিজের মনেই মিলিয়ে দেখতে লাগল আসলটার সঙ্গে ।

অবিনাশ ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে তাকে । নক্সা মেলানো শেষ করে সরমা মুখ তুলতে বলল, খুশি হয়েছো বেশ, না ?

অনেকটা নির্বিকার মুখেই সরমা জবাব দিল, চেষ্টা করছিলাম খুশি হতে, পারলুম না । চেয়ার ছেড়ে কাছে এসে দাঁড়াল, ওঠো—

দৃষ্টি জিজ্ঞাসু অবিনাশের ।

আমার সামনেই ধরো এটা আবার, নইলে কালও এই জন্য কথা শুনতে হবে ।

অবিনাশ চুপচাপ কিছুক্ষণ । দেখছে ।—ঠাট্টা করছ ?

সরমা জোর দিয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ করছি তো ঠাট্টা, ওঠো । তার পরেই হেসে ফেলল মুখের দিকে চেয়ে ।—আচ্ছা, তুমি এমন কেন ?

অবিনাশের নিস্পৃহতায় ফাটল ধরল না তবু । কেমন ?

তার মাথার কাছে বসল সরমা । অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে দু হাতের আঙুলগুলো চালিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে এমন প্রশ্রয় তুমি কেন দাও । ওই জন্যেই তো এতটুকু ভয়ডর নেই, যা মুখে আসে বলে বসি । বাঃ, চোখ বুজলে কি, উঠবে না ?

চোখ বুজেই শুয়ে থাকে অবিনাশ । নীরব স্বল্পক্ষণ ।—আজ সত্যিই ক্লান্ত আমি, কাল ঠিকই আঁকব, তুমি বাড়ি যাও ।

চুলের ফাঁকে আঙুল ক'টা থেমে গেল সরমার । দু'চার মুহূর্ত । অসহিষ্ণু ক্ষোভে বলে উঠল, বাড়ি যাও । মতলব আঁটচ মনে মনে আমি বুঝিনে ? ও কথা বলে এলে কেন তখন ?

চোখ মেলে তাকালো অবিনাশ । মুখে হাসির আভাস । নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময় ।—যা বলে এলাম, যদি না চাও তাহলে যে জন্যে তখন এমন বিকার ঘটে গেল দুজনেরই তার বোঝাপড়া আগে হওয়া চাই । নইলে মনের কালি যাবে না, আমারও না তোমারও না ।

খানিক বাদে সরমা প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, তোমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারি এমন বড়াই করব না আর । মাপ চাইছি ।

অবিনাশ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তাকে । গ্লানি মুছে যাচ্ছে একটু একটু করে ।

গুড্ । তারপর ?

বিশ্বাস করো, বিপিনবাবুর সম্বন্ধে সঠিক কোন জবাব নিজেই পাইনি আমি, পেলে জানাবো ।

মোস্ট ওবিডিয়েন্ট গার্ল । চুলগুলো জোরে টানো ।

সরমাও হেসে ফেলল ।—ওবিডিয়েন্ট না হয়ে উপায় আছে ! একটু আগে মিছেই বলছিলাম ভয়ডর নেই, তোমাকে যেমন ভয় করি তেমন আর কাউকে নয় ।

সহাস্যে উঠে বসল অবিনাশ ।—উত্তম, নক্সাটা শেষ করে ফেলি, তুমি বসে দেখো । ব্যাটাচ্ছেলে খুব বড় বড় কথা শুনিয়ে গেল— ।

রেকর্ড কোম্পানিতে ভাটিয়া ম্যানেজারের বক্তব্য শুনে মণিময়ের সমস্ত সুরলোক রোমাঞ্চিত। আগামী সপ্তাহে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা আসছেন গান রেকর্ড করতে। সে গানের সুর অবশ্য মহিলাটির ওস্তাদেব দেওয়া। কোম্পানির উদ্দেশ্যে তাঁকে দিয়ে আরো কিছু বাংলা গান বেকর্ড করানো। কথাবার্তা পাকা। অতএব মণিময় যেন অবিলম্বে গোটাকতক বাংলা গান এবং তার সুর ব্যঞ্জনা ঠিক করে রাখে।

গলা কেমন ? মণিময় জিজ্ঞাসা করল।

এক্সকুইজিট।...অ্যাণ্ড সি ইজ এ বিউটি ট্যু। ম্যানেজার সকৌতুকে হাসলেন, ইউ হ্যাভ টু গিভ ইওর বেস্ট দিস টাইম মিস্টার—।

মণিময় সবিনয়ে জানালো, গান এবং সুর নিয়ে প্রস্তুত। আগামী বেকর্ডিং-এর দিন সে এসে মহিলাটির গলা শুনে যাবে।

এক ঘণ্টাব মধ্যেই দ্বিতীয় ধাক্কা। স্টুডিওতে এসেছে প্রযোজকেব সঙ্গে দেখা কবতে। নাম দেশাই, চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ। এঁরই পদমূলে অবিশ্রান্ত তৈল সিঞ্চন করে এসেছে এতদিন। মণিময়ের নাটক মুদ্রণের ফলে ছাপা অক্ষরে নাম দেখে প্রযোজকেব আস্থা জন্মেছে। সহাস্যে আপ্যায়ন করলেন, সুখবব আছে বাবুজি, বোসো—।

সুখবর কিছু থাকা সম্ভব মণিময় আগেই আঁচ কবেছিল। বসল। কম্প্রবক্ষ, নম্র-নেত্র।

কিন্তু সুখবব একটা নয়, একাধিক।

প্রযোজক প্রথম জানালেন, মিটিং-এ সাব্যস্ত হয়েছে এবাবে ওব নাটকখানা ধবা হবে।

নববধূব প্রিয় সম্ভাষণের মতো লাগে। মণিময় দ্বিধান্বিত তবু।—অনেক মেহেরবাণী...কিন্তু ডিসিশান ফাইন্যাল তো ?

ফাইন্যাল, আজই কণ্ট্রাক্ট হবে। প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞাসা করলেন, তাব সুরেব বেকর্ড বাজাবে আজকাল কাটছে কেমন।

ধীরে রজনী, ধীরে। দ্বিতীয় সম্ভাবনায় মণিময় ঘেমে উঠল প্রায। সবিনয়ে জানালো, ওটাই তার আসল লাইন, এবং আজও কতকগুলি অর্ডার পেয়েছে।

প্রযোজক মনোভাব ব্যক্ত করলেন। নিজেব বইএর মিউজিকের ভাব নিতে মণিময় সাহস করে কি না, একটা চান্স ওকে দিতে তাঁদের আপত্তি নেই, তবে প্রথমবার টাকা অবশ্যই কম হবে, ইত্যাদি।

আহা! এসো এসো বঁধু এসো, আধেক আঁচোরে বোসো, অবাক অধবে হাসো। মণিময় স্বপ্ন-বিহ্বল ক্ষণকাল। সাহস! আত্মস্থ হল।—এ ভার যদি আমাকে দাও মিঃ দেশাই, বই উতরে দেবার দায়িত্ব আমি নেব।

কণ্ট্রাক্ট সই হল। দু'হাজার টাকার অগ্রিম চেক্ নিয়ে বায়ু সাঁতবে ঘরমুখে ছুটল সে। চেক্‌টার স্পর্শ বুকে গরম ঠেকছে। প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকাবে সাদা পরদায় নামের আলো। সুরশিল্পী মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায। অলিতে-গলিতে মোড়ে মোড়ে দেয়ালের গায়ে গায়ে বিজ্ঞাপন।

সুরশিল্পী...!

নাট্যকার...!

সায়েন্স কলেজ। ছাত্রছাত্রী এবং অভ্যাগতদের সমাবেশ। মালা গলায় ডাঃ সমাদ্দার মাঝখানে সমাসীন। সামনের সারিগুলির একদিকে ডাঃ চন্দ্র এবং অপর্ণা বসে। দূরে এক কোণে সরমা দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে।

মণিময় হারমনিয়ামে গানের প্রথমটা বাজিয়ে নিয়ে শুরু করল, 'সব সাঁচ মিলৈ যো সাঁচ হৈ, না মিলৈ সে ঝুঁট—'।

সঘন করতালি। অপর্ণা অস্ফুট মন্তব্য করল, বেশ মিষ্টি গলা তো, ভদ্রলোক কে?

চিনিনে। গান চন্দ্রর কানে গেছে এই পর্যন্ত। অন্যমনস্ক হয়ে ডাঃ সমাদ্দারের কথাই ভাবছিলেন তিনি।

সমাদ্দার উঠে দাঁড়ালেন। মালা খুলে টেবিলে রাখলেন। নড়াচড়া এমন কি দাঁড়াবার ভঙ্গিও উদ্বাস্ততায় চঞ্চল। সভা উৎকর্ণ। কম্পিত কণ্ঠস্বর আসতে লাগল মাইকের মধ্য দিয়ে!

ছেলেমেয়েরা, সবাই তোমরা ভাবছ কাজ থেকে আমি অবসর নিলাম। কথাটা ঠিক নয়। বরং কাজ করবার জন্যেই এখান থেকে ছুটি নিচ্ছি।...প্রাণটুকু বাদ দিলে দেহের নাম যদি হয় মাটির জড় পদার্থ, তবে ওই জড় পদার্থকে ইচ্ছা মতো শক্ত সবল সুস্থ রাখা যাবে না কেন? যাবে। আজ আমার ডাক পড়েছে সেই সাধনায় যাতে প্রাণ-পুরুষের আবাস এই মানবদেহ সুস্থ সবল থাকবে দীর্ঘকাল। তোমরাও কলেজের পড়া শেষ করে তাড়াতাড়ি এসো আমার ল্যাবরেটারিতে। সত্যিকারের বিজ্ঞানীর ওটাই আসল জায়গা।

সভা ভাঙল। সমাদ্দার চলে গেলেন। সময় নেই। বিপুল উদ্যমের এক পাগলা ঘোড়া যেন অবিশ্রান্ত তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। এখনি গিয়ে হয়তো ডুব দেবেন অ্যানাটমি অথবা বায়লজির দুরূহ সমুদ্রে।

গেটের সামনে চন্দ্র এবং অপর্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল সরমার। নমস্কার জানালো হাত তুলে। চন্দ্র বললেন, তোমাকে আমি দু'দিন ধরে খুঁজছি সরমা। ডাঃ সমাদ্দার তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন। তাঁর বাড়ি চেনো?

সরমা ঘাড় নাড়ল। পরে কৌতূহল দমন না করতে পেরে জিজ্ঞাসা করল, কেন স্যার?

তাঁর কাছেই শুনো, দু'চার দিনের মধ্যেই যেও। অপর্ণা, এঁর নাম সরমা ব্যানার্জী, আমার ছাত্রী।

অপর্ণা সাগ্রহে দেখছিল তাকে। ওর প্রসঙ্গে বিপিনের সামনে চন্দ্রর সেদিনের বক্রোক্তিও ভোলেনি। হাসি মুখে বলল, আপনার কথা অনেক শুনেছি। বলতে ভয় করে...একদিন আসুন না আমাদের বাড়ি?

সরমা সানন্দে মাথা নাড়ল যাবে। বলল, ভয় কেন?

ছদ্ম-গাম্ভীর্যে অপর্ণা জবাব দিল, আমি শাড়ির গল্প করতে পারি গাড়ির গল্প করতে পারি গান শোনাতে পারি বাজনা বাজাতে পারি—কিন্তু কেমিস্ট্রি? ও বাবা! আপনার জায়গা অনেক উঁচুতে।

ঈষৎ বিস্ময়ে সরমা চন্দ্রর দিকে তাকালো একবার। পরে বিব্রত মুখে বলল, ভয়

তো আমাকেই পাইয়ে দিলেন দেখছি ।

কিছু না শিগগীরই আসা চাই একদিন । চন্দ্রকে বলল, চলো—

খানিকটা এগিয়ে এসে মন্তব্য করল, মেয়েটি বেশ ।

চন্দ্র বললেন, তুমিও বেশ, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে ওর সে ধারণা হল না বোধহয় ।

মাথা খারাপ ভাবলে ?

বিচিত্র কি । আমারই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ।

অপর্ণা গম্ভীর মুখে সায় দিল, ভাবনার কথা, মাস্টারমশাইকে সান্ত্বনা দিতে এসে ছাত্রী না প্রিয় পাত্রী হয়ে দাঁড়ায় ।

ছিঃ অপর্ণা !

সেদিনের বক্রোক্তির জের টানতে অপর্ণা মুখে যাই বলুক, ঈর্ষা করে না কাউকে । তাই ক্ষুদ্র তিরস্কারটুকুও বিঁধল । তাদেরই একজন সে, যারা অপরকে সচেতন রাখবেই নিজের সম্বন্ধে । তার সারাদেহে রূপের ফাগুন, যে কোন পরিবেশে নিজেকে অনুভব করতে পারে প্রতি মুহূর্তে । কিন্তু এই মানুষটির জীবনে সে একজন মাত্র, একমাত্র একজন নয় । রূপের মূল্য এখানেও মেলে অজস্র, কিন্তু সেইসঙ্গে মেলে আত্মভোলা উপেক্ষা ; রূপের মূল্য মেলে--নিষ্ঠুর মূল্য, আর মেলে এমনি শান্ত অনুশাসন । অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া মনের । মানুষটাকে ভালোবেসে মুগ্ধ করেছে, ভালোবেসেই দগ্ধ করবে ।

চন্দ্র ভাবেন শুধু, অপর্ণা এমন ছিল না আগে ।

রেকর্ড কোম্পানি । মণিময় যথাসময়ে উপস্থিত । ম্যানেজার তার অপরিসীম ভাগ্যোদয়ের বারতা শুনেছেন । সহাস্যে করমর্দন করলেন :—কংগ্র্যাচ্যুলেশানস্ !

মণিময় মাথা নোয়ালো, ধন্যবাদ ।

অতঃপর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি, দিন আসবে একদিন আগেই জানতেন, ধান দেখলে চালের বহরটা বলে দিতে পারেন, ইত্যাদি ।

সুখ বদলেছে । আগে ছিল মুরুব্বিয়ানা, খানিকটা অনুকম্পাও । মণিময় বিস্মিত হয়নি । পরিচিত মহল বিগত ক'টা দিন ধরে তাকে রাতারাতি বিখ্যাত করে তোলার নেশায় মেতে উঠেছে যেন ।

ম্যানেজারের মনোভাব স্পষ্ট । সিনেমার গান এখান থেকে রেকর্ড হওয়া চাই, নইলে বোঝাপড়া আছে । নাট্যকার এবং সুরশিল্পীর ডবল ফাংশন যখন, তার কথা কেউ সহজে ফেলতে পারবে না ।

মণিময় হাসল । অমায়িক হাসি । অনেক কিছু করতে পারি'র সঙ্গে কি আর করতে পারি গোছের বিনয় ।

ম্যানেজার জানালেন, উক্ত মহিলাটি এসে গেছেন, এক্ষুনি গান 'টেকিং' হবে । মণিময়কে সঙ্গে করে নির্দিষ্ট ঘরে এলেন তিনি ।

অপর্ণা চন্দ্র বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল বসে । আরো একজনের দৃষ্টির উষ্ণতা উপলব্ধি করে মুখ তুলল একবার । মণিময় চেয়েই আছে । আত্মবিস্মৃত আনন্দ এবং রোমাঞ্চ । ম্যানেজার অত্যুক্তি করেন নি সেদিন । অপর্ণা চোখের সামনে কাগজ তুলে

ধরল। বিরক্তির আভাস। কিন্তু কি মনে পড়তেই আবার তাকালো সোজাসুজি। কোথায় যেন দেখেছে...। মনে পড়ল।

অনতিদূরে রেকর্ডিং-এর ব্যবস্থা। বাদ্যযন্ত্র পরিবৃত অর্কেস্ট্রা পার্টি প্রস্তুত। অপর্ণার ডাক পড়তে উঠে এলো। দু'চারবার ট্রায়ালের পর জড়তা সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

মণিময়ও খবরের কাগজ টেনে নিল একটা। একটু বাদেই বিশেষ একজন বলে পরিচিত হবে। সুগাম্ভীর্যটুকু দরকার।

হল রেকর্ডিং। বাজনার সরঞ্জাম রেখে অন্য সকলে চলে গেলেন। অপর্ণা পূর্বের আসনে ফিরে এলো। গানের রেশ মণিময়ের কানে লেগে আছে তখনো অন্তত মুখ দেখলে সেরকমই মনে হবে। ম্যানেজারের উৎফুল্ল প্রশ্নে চমক ভাঙল।

হাউ ডু ইউ লাইক ইট্ বাবুজি ?

হিট্ করবে। ক্ষুদ্র মন্তব্য করল মণিময়।

ভালো হয়েছে অপর্ণাও উপলব্ধি করতে পারে, তা খারাপ লাগে না শুনতে।

অতঃপর পরিচয়-পর্ব শেষ করলেন ম্যানেজার।...মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রেইনার, চিত্রনাট্যকার, মিউজিক্ ডাইরেক্টার—।

স্মিতহাস্যে যুক্ত-কর কপালে ঠেকালো অপর্ণা। বলল, সেদিন সায়েন্স কলেজে আপনার গান শুনেছি, খুব ভালো লেগেছে। এত-সব পরিচয় অবশ্য তখন জানতুম না।

তার সলজ্জ গর্বটুকু অপর্ণা উপভোগ করল বেশ। ম্যানেজার কাজের কথা পাড়লেন। এই মাসেই আর একটা সিটিং অপর্ণার, গান এবং সুর মণিময়ের। পাশের ঘরটাই ট্রেইনিং রুম, আজই একটু-আধটু দেখেশুনে নিলে মন্দ হয় না। সৌজন্য প্রকাশ করলেন তৎক্ষণাৎ, বাট্ ফার্স্ট রেস্ট্ অ্যাণ্ড্ টী—।

চায়ের ব্যবস্থায় গেলেন তিনি। অপর্ণা বিব্রত মুখে বলল, এখানে বসে গানের সুর শিখতে হবে নাকি ?

মণিময় বলল, নোটেশান একটু-আধটু দেখে নেওয়া শুধু, আপনার গলায় ও জলভাত।

এ কাজটা বাড়িতে হয় না ? এখানে ভারি অসুবিধে হবে আমার। অসুবিধের পরিমাণ অপর্ণার কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট।

বাড়িতে ! মণিময় ভাবল একটু, তা হবে না কেন, কিন্তু এখানেই বা অসুবিধে কি ? তা'ছাড়া ব্যাকগ্রাউণ্ড-মিউজিকের সঙ্গে সেট করতে হবে তো।

সে তো দু'ঘণ্টার কাজ। অপর্ণা হেসে বলল, বুঝেছি, আসল কথা বাড়িতে আপনাকে পাব কোথায় ?

চা আসতে রুদ্ধ নিঃশ্বাসটা মুক্তি পেয়ে বাঁচে মণিময়ের।

বিদুৎ-স্পর্শের মতো অকস্মাৎ একটা পরিকল্পনা মনে জাগে অপর্ণার। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখল লোকটিকে।

মণিময় বিপর্যস্ত।

ভাবছে অপর্ণা। কেমিস্ট্রি বই থেকে একজনের চোখ দু'টো ফিরিয়ে আনার এ সঙ্কল্পটা কেমন...। খুব অবহেলার নয়। সুবর্ণ যোগাযোগ। চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে মুখ তুলল আবার। চোখে কৌতুক-মাধুর্য।

মণিময় বিধ্বস্ত আবারও

দু'চারদিন দেখলেই আমার গলায় আপনার গান ঠিক হয়ে যাবে বলে যদি সত্যিই মনে করেন, তবে আসুন না এক আধ দিন আমার বাড়ি ? আপনার কষ্ট হবে জানি, কিন্তু এখানে বসে শেখা আমার দ্বারা হবে না। পাঁচজনের অনবরত যাওয়া আসা, নাঃ, সে বড় বিচ্ছিরি...। আসবেন ?

পকেট থেকে রুমাল বার করে মণিময় কপালের ঘাম মুছে ফেলল। অপর্ণাকে দেখেই বুঝেছে, গান তার শখের খোরাক মাত্র, রোজগারের নয়। অনুমোদন ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা'ছাড়া আমন্ত্রণও সুবাঞ্ছিত। হেসে জবাব দিল, যেতে বলেন একবার কেন দশবার গিয়ে বিরক্ত করতে রাজী আছি।

মনে মনে ভাবে অপর্ণা, সে ভয় নেই এমন নয়। মুখে বলল, খুশি হলাম।...এই ধরুন সামনের রবিবার সকালে ? অসুবিধে হবে ?

চন্দ্র নিঃসন্দেহে বাড়ি থাকবেন সেদিন।

মণিময় জবাব দিল, কিছুমাত্র না, আরো আগে হলেও আপত্তি নেই।

ছদ্ম-খুশিতে রাঙিয়ে ওঠে অপর্ণা।—সাহিত্যিকদের বিনয়ের ধাঁচই আলাদা। আমার তো ডবল লাভ, গান শেখাও হবে আপনার মতো মানুষকে জানাও হবে। কাব্যচর্চায় আনাড়ি বাধ্য হয়ে স্বীকার করব, নয়তো ধরা পড়ার ভয় আছে। কিন্তু রসাস্বাদনে একেবারে অপটু একথা মানতে রাজী নই, মোটা তর্ক জুড়ে দিয়ে আপনাকে রাগিয়ে দিতে পারি পর্যন্ত। হাসির ঝলকে নিজেই উছলে উঠল অপর্ণা। ছোট দম ফেলে বলল, যাক, রবিবার থেকেই শুরু করুন, নিষ্ফলা বার সবদিকে সুদিন।—আচ্ছা, কি বই প্লে হচ্ছে আপনার ?

দেশের মেয়ে। মণিময়ের চোখ মেলে তাকানো দায়।—সবে স্টার্ট পেয়েছি একটা, এরই মধ্যে এমন করে বললে লজ্জায় মরে যাব।

মনে মনে সায় দিল অপর্ণা, আধমরা তো করেই এনেছি, বাকিটা দেখা যাবে ধীরে সুস্থে। হেসে বলল, চলুন, সঙ্গে গাড়ি আছে, আমার বাড়ি চিনে নেবেন, তারপর ড্রাইভার পৌঁছে দেবে'খন আপনাকে।

কতগুলো দিন গেছে এর পরে। অপর্ণা উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করেছে কিসের ব্যতিক্রমটুকু চন্দ্রর চোখে পড়ার কথা। কিন্তু পড়েনি। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল, খুশিতে যেন উপচে উঠেছে অপর্ণা। ঘরের মানুষের তাও চোখে পড়ার কথা। কিন্তু পড়েনি।

এই নির্লিপ্ততা অপর্ণা চেনে। এর পর হঠাৎ একদিন সচকিত হয়ে উঠবেন। সচেতন হবেন। দিন কতক ওর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগের পালা। তারপর বই ফেলে কাজ ফেলে কাছে আসবেন। কাছে টানবেন। এতটুকু ব্যতিক্রমও চোখ এড়াবে না তখন। অপর্ণা অনেককাল এরই জন্য অপেক্ষা করেছে, দিন গুনেছে। তারপর একটা প্রতিবাদ শুরু হয়েছে ওর ভিতরে ভিতরে। ঘড়ায় তোলা জলের সঙ্গে দুর্দম পিপাসিতের যেটুকু সম্পর্ক, দিনে দিনে সেটাই যেন বড় হয়ে উঠেছে অপর্ণার চোখে।

কিন্তু এই প্রথম বোধ করি মানুষটার বিগত ক'টা দিনের এই নির্লিপ্ততা বিনা ক্ষোভে বরদাস্ত করে গেল অপর্ণা। প্রায় নিশ্চিন্তে কাটালো। অন্যথায় ওর এই ক'টা দিনের প্রতীক্ষার তাড়না এবং আজকের এই খুশির বিড়ম্বনা দুই ই অসময়ে ধরা পড়ে যেত।

অপর্ণা প্রস্তুত হল ।

ইজিচেয়ারে শুয়ে চন্দ্র বই পড়ছিলেন। পাশের ঘরে অপর্ণার গলায় পরিচিত গানখানা শুনে কান পাতলেন । কিন্তু অবাক পরমুহূর্তে । অপর্ণা এ ঘরেই দাঁড়িয়ে । বইএর আলমারি ঘাঁটছে ।

কি ব্যাপার ?

কি ? অপর্ণা বই হাতে ফিরে দাঁড়াল । নিস্পৃহ !

গাইছে কে ও ঘরে ?

গ্রামোফোন ।

আশ্চর্য তো, অবিকল তোমার মতো, তোমারই ওই গানটা ।

হুঁ । হাসি চেপে অপর্ণা চলে এলো । বক্র কটাক্ষে এ ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রেকর্ডখানা উল্টে দিল । পরে পড়তে বসল গম্ভীর মুখে । এ গানখানাও চন্দ্র বহুদিন শুনেছেন অপর্ণার মুখে । দু'টোই বিশেষ প্রিয় গান তাঁর । বিস্ময়ের ধাক্কায় বিজ্ঞানের বই বন্ধ করতে হল । এ ঘরে এসে দাঁড়ালেন । গ্রামোফোনের পাশে বসে গম্ভীর মনোযোগে মাসিকপত্রের পাতা ওলটাচ্ছে অপর্ণা । গ্রামোফোন থামিয়ে রেকর্ডটা তুলে নিলেন তিনি । দু' দিকেই নাম লেখা, অপর্ণা চন্দ্র ।

নির্বাক বিস্ময় ।

অপর্ণা হেসে ফেলল । চন্দ্র বসলেন তাঁর চেয়ারের হাতলে ।—হোয়াট্ এ সুইট্ সারপ্রাইজ ! অ্যাঁ ? কবে হল ? কখন হল ? কি করে হল ?

অপর্ণা জবাব দেয়, রেকর্ড কোম্পানির লোকও তোমার মতোই অবাক, এতদিন হয়নি কেন, কি করছিলাম, কার পাল্লায় পড়েছি ?

এক হাতে গ্রামোফোন রেকর্ড, আনন্দাতিশয্যে অন্য হাতে প্রবল আকর্ষণে অপর্ণাকে একেবারে কাছে টেনে আনলেন চন্দ্র । চড়া হাসিতে ঘর সরগরম । বলে উঠলেন, আমি সত্যিই যাচ্ছেতাই একটা, আমার স্ত্রীর এই কাণ্ড অথচ আমিই জানিনে !

অপর্ণার খুশি ধরে না । তাঁর হাত ছাড়িয়ে উঠে ড্রয়ার খুলে চেক্ বার করল একটা । —দেখো, এ টাকাটা অ্যাডভান্স করেছে আপাতত । চার টাকা দাম করেছে রেকর্ডটার, বাজারে ভালো কাটবে শুনছি ।

খুশি হয়ে মাথা নাড়তে গিয়েও চন্দ্র থেমে গেলেন হঠাৎ । হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল । আনন্দের চিহ্ন বিলীন ।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অপর্ণা । কি হল ?

কিছু না ।

ফিরে এসে চন্দ্র বই নিয়ে বসলেন আবার । অপর্ণাও উঠে এসেছে । নিরীক্ষণ করে দেখল একটু । ঈষদুষ্ণ প্রশ্ন করল, ব্যাপারটা খুলে বলোই না ?

চন্দ্র জবাব দিলেন, যত আনন্দ হয়েছিল রেকর্ডে তোমার গান শুনে, ততোটা খুশি হবার তেমন কোন কারণ নেই ।

কেন ? অপর্ণা বিস্মিত । বিরক্ত ।

একটু থেমে চন্দ্র জবাব দিলেন, ওই গালার চাকতিটা বারোয়ারি সম্পত্তি এখন, চারটে

করে টাকা ফেলে দিলেই পাওয়া যাবে । রাস্তায় পানের দোকান থেকে রাতে নাচের আসর পর্যন্ত যার খুশি, যতবার খুশি, খেয়াল মেটাতে বাধ্য ওটা ।

শুনে গা জ্বলে যায় অপর্ণার । ধৈর্য সংবরণ করল তবু, আর নিজেরা যখন অন্যের রেকর্ড কিনে আনি ?

খানিক চুপ করে থেকে চন্দ্র তেমনি শান্তমুখে বললেন আবার, নিজের স্ত্রী বলেই সত্যটা চোখে পড়ল । দেখো না, দুটো গানই এত ভালো লাগত আমার অথচ এখন আর তেমন লাগবে না । তোমারও হয়তো আর ও দুটো গাইতে ইচ্ছে করবে না ! ওর স্যাংটিটি গেছে ।

পড়ায় মন দিলেন । নির্বাক রোষে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে অপর্ণা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে ।

একটু বাদে ওপর থেকে নিচের কঠিন মাটিতে একটা কিছু ভাঙার শব্দ শুনে চন্দ্র আড়ষ্ট হয়ে গেলেন । ভিতরের গম্ভীর মাস্টারটি অন্তর্হিত । ওর এতবড় আনন্দটা এমন করে ভেঙে না দিলেই হত...। উঠে বাইরের রেলিং-এ দাঁড়িয়ে দেখলেন, রেকর্ডটা ভেঙে ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে । এ ঘরে এসে দাঁড়ালেন । অপর্ণা সেলাই নিয়ে শুয়ে পড়েছে ।

চন্দ্রর হঠাৎ গোঁ চাপল কেমন । বললেন, দেখো অপর্ণা, একটা কথা তোমাকে অনেকদিন বলব ভেবেছি, এত রাগ থাকা ভালো নয় মেয়েদের, আর সেটা আমার পছন্দও নয় ।

ছিটকে উঠে বসল অপর্ণা, তোমার পছন্দ নিয়ে আমাকে চলতে হবে ?

তাই তো জানতুম । আমার বদলে ওই যে দুধ দেয় গয়লা তার পছন্দ মতো চললে ভালো বলবে না কেউ ।

জবাবে অপর্ণা চোখ দিয়ে আগুন ছড়ালো । তারপর সেলাই হাতে শুয়ে পড়ল আবার ।

ওটা রাখো এখন, মাথা ঠাণ্ডা হোক, নইলে সেলাইয়ের বদলে হাতে ছুঁচ ফোটানো সার হবে । রেকর্ডটা ভাঙলে কেন ?

আমার খুশি ।

তোমার খুশি দেখে মনে হচ্ছে পারলে আমাকে সুদ্ধু ভাঙো অমনি করে । আচ্ছা...এ তো আর গলার গান নয় তোমার, কলের গান—দেখি ক'টা ভাঙতে পারো । চন্দ্র বেরিয়ে এলেন ।

অধরপ্রান্তে সারি সারি দাঁতের দাগ পড়ে গেল অপর্ণার ।

রবিবার । যথাসময় মনিময় বাইরের ঘরে উঁকি দিল । সেটি'তে আধশোয়া মানুষটির মুখ বইএ ঢাকা । বারকতক পা ঘষা এবং কাশির শব্দেও চেতনা নেই ।

শুনছেন ?

দেখুন—

রবিবার নিষ্ফলেই যায় বুঝি ।—শুনছেন ?

চন্দ্র সোজা হয়ে বসলেন । ভেতরে আসুন, কাকে চান ?

মিসেস্ অপর্ণা চন্দ্র এ বাড়ি থাকেন ?

চন্দ্র নীরব এক মুহূর্ত । থাকেন, আপনি ?

আমি মানে...আমার আসার কথা ছিল । অনুগ্রহ করে খবর দেবেন একবার...আমার নাম মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় ।

চন্দ্র সকৌতুকে নিরীক্ষণ করলেন একটু । চাকরকে ডেকে আদেশ দিলেন অপর্ণাকে সংবাদ দিতে।—আপনাকে কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে । কোথায় বলুন তো ?

মণিময়ের অস্বস্তি কাটেনি তখনো । জবাব দিল, কোনো গানের আসরে যদি দেখে থাকেন—

গান ! হ্যাঁ হ্যাঁ—ডাঃ সমাদ্দারের ফেয়ারওয়েলে আপনিই তো সায়েন্স কলেজে গেয়েছিলেন ?

মণিময় ঘাড় নাড়ল ।

আপনাদের আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে জানতুম না তো ! অপর্ণার ভারী ঝোঁক এদিকে, ভালো কাউকে গাইতে শুনলে কথা নেই । বসুন দাঁড়িয়ে কেন ।

বাইরে থেকে কথাগুলো কানে গেল অপর্ণার । মণিময়ের জবাবও । —আমারই সুরে ওঁর নেক্স্ট গান রেকর্ড হবার কথা, কোম্পানির স্টুডিওতে সুর ঠিক করে নিতে উনি লজ্জা পেলেন, তাই...। আপনি মিঃ চন্দ্র ?

অপর্ণা ঘরে প্রবেশ করল । ছোট্ট নমস্কার করে বলল, এসেছেন তা হলে, আমি ভাবলাম ভুলেই গেলেন ।

চন্দ্র সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, তুমি ভাবলে কি বলো তো—একের পর এক আমাকে অবাক করে দিয়ে হার্টের রোগ ধরাবে নাকি ? সেদিনের এতবড় খবরটা হঠাৎ পেলাম, আর এ সুখবরও দিব্বি চেপে গেছ !—এবার এমন রেকর্ড করিয়ে দিন মণিময়বাবু যেন আমি সুদ্ধু ফেমাস হয়ে উঠি ।

মানুষটার নিরুদ্বিগ্ন হাসি দেখে অপর্ণা ভ্রূ-কুঁচকে তাকালো । পরে তেমনি হাল্কা জবাব দিল, তা হতেও পারো । এঁর কাছে আমি গান শিখব ঠিক করেছি, অবশ্য ইনি যদি শেখান ।

চন্দ্র সায় দেন তৎক্ষণাৎ, যদি আবার কি, রাজী না হলে তুমি ছাড়বে না মোটে ।

অপর্ণার আহ্বানে মণিময়ের চেতনা ফেরে ।—ওপরে চলুন !

মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ায় সে । নিজের অজ্ঞাতে একবার শুধু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, বিশালকায় মানুষটি আবার আগের মতোই পাঠমগ্ন ।

কিন্তু ওপরে এসে অপর্ণার ব্যবহারে ভড়কে গেল কেমন । একটু আগের হাসিখুশির আতিশয্য স্তিমিত । তাকে বসতে দিয়ে সেও বসল অনতিদূরে । ঘরের এক কোণে গানের সরঞ্জাম । কিন্তু সেগুলো নিয়ে আসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ।

বেয়ারা চা নিয়ে এলো । কর্তব্য সম্পাদনের মতো গম্ভীর মুখে পেয়ালায় দু'চারটে চুমুক দিয়ে মণিময় বলল, তাহলে বসা যাক—। নোটেশান পরে দিচ্ছি, গানের বাণীটা দেখে নিন আগে ।

পকেট থেকে গানলেখা কাগজ তার হাতে দিল ।

অপর্ণা নিঃশব্দে পড়ল সেটা ।—বেশ । একঝলক হেসে পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এলো যেন ।—চা শেষ করুন আগে, পরে আপনার দুই-একখানা গান শুনব । ওই জন্যেই আপনাকে বাড়ি নিয়ে আসা, নইলে রেকর্ডে গান-টান আর দেব না আমি ।

সে কি !

নাঃ, ভালো লাগে না ।

মণিময় হতভম্ব । মনে হল অনেক উঁচু থেকে হঠাৎ বুঝি নিচে পড়ে যাচ্ছে । মস্তিষ্কে গোলযোগ আছে কি না এ সন্দেহও জাগল একবার ।

কণ্ট্রাক্ট সই করেছেন, গান না দিলে রেকর্ড কোম্পানি ছাড়বে কেন ?

অপর্ণার রেগে উঠতে এটুকুই যথেষ্ট ।—না ছেড়ে তারা করবে কি ? কণ্ট্রাক্ট সই করা হয়েছে বলে চুরি করা হয়নি । উঠে বাক্স থেকে হারমনিয়াম এনে রাখল তার সামনে । নিন, আপনার বেলা হয়ে যাচ্ছে ।

মণিময় স্তব্ধ । একটা তিক্ত অনুভূতি ধীরে ধীরে সচেতন করল তাকে । নাট্যকার, মিউজিক ডাইরেক্টার—এক ডাকে ছুটে এসেছে । কিন্তু এই মহিলাটির কাছে কোন দাম নেই তার । তবু এও বুঝল, হঠাৎ এ সিদ্ধান্তের মূলে নিগূঢ় কোন হেতু আছেই ।

হেসে বলল, সেদিন আপনার আগ্রহ দেখে হাতের কাজ ফেলেই ছুটে এলাম, কিন্তু কে জানত এমন ছেলেমানুষি কাণ্ড ! অপর্ণার সবিদ্রূপ দৃষ্টিবাণে আত্মবোধ চাড়িয়ে ওঠে আরো ।—কিন্তু আপনার অনুরোধ এখন রাখতে পারলুম না । গান শোনাবার জন্য গান গাইবার সময় আমি কমই পাই । তবু, আবার কোথাও গাইতে গেলে আপনাকে আগে খবর দেব, এখন উঠি ।

ব্যর্থ গেল না । অপর্ণাকে যথার্থই স্মরণ করতে হল মানুষটি সুগায়ক, সুরশিল্পী এবং নাট্যকার । বিশেষ করে, তার আমন্ত্রিত । অপ্রস্তুত হয়ে বলল, গান না শোনালে ছাড়ছি না, নিশ্চয় আপনি রাগ করেছেন, নইলে ও সময়টার অপব্যবহার হবে জেনেই এসেছেন ।

না । মণিময়ের নতুন মর্যাদাবোধের ওজন কম নয় । জবাব দিল, নিজের স্বার্থেই এসেছিলাম । আপনার রেকর্ড হিট করবে সেদিনই জানি । আশা ছিল, তেমন সুর তুলে দিতে পারলে আপনার গলায় আমার গান বাজার গরম করে দেবে । ভাবল একটু । চেষ্টা-চরিত্র করে আরো লোভনীয় একটা প্রস্তাব নিয়ে উড়তে উড়তে এসেছিল । সেই টোপটাও ফেলল প্রায় নিস্পৃহ মুখেই । বলল, তা'ছাড়া ওই এক রেকর্ড শুনেই 'দেশের মেয়ে'র প্রডিউসার এক কথায় রাজী আপনার সঙ্গে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের কণ্ট্রাক্ট করতে । এতটা আশা এবং ব্যবস্থা একেবারে পণ্ড করে দেবেন কে জানত ।...কিন্তু হঠাৎ মত বদলালেন কেন বলুন তো ?

কানের কাছটা উষ্ণ ঠেকছে অপর্ণার । গ্রামোফোন রেকর্ডে তার গানের ছড়াছড়ি । তারই কণ্ঠগীতে মুগ্ধ নির্বাক প্রেক্ষাগৃহের শত সহস্র দর্শক । নামের পূজা, যশের অর্ঘ্য । বর্তমানের এই পারম্পর্যহীন একটানা জীবন-যাত্রার সঙ্গে চকিতে তুলনা করে নিল একবার । আতপ্ত অনুভূতি । সোজাসুজি তাকালো মণিময়ের দিকে । হাত বাড়িয়ে বলল, দিন নোটেশান—

হ্যাঁ ।

সিনেমার ব্যাকগ্রাউণ্ডএ ?

আপত্তি নেই ।

বিনুকে যথার্থই কনভেন্ট-এ পাঠিয়ে দিয়েছে মণিময় । সরমা বাধা দেয় নি । পাবে যদি চালাতে ভালোই । ছেলেটা মানুষ হবার সুযোগ পাবে । তবু, সে চলে যাওয়ায় মন ভালো ছিল না । মণিময়ও বাড়ি নেই ।

ডাঃ সমাদ্দারেব সঙ্গে দেখা করা হয় নি আজও । সেখানেই যাবে স্থির করল । গলির বাইবে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল । অবিনাশ আসছে ।

কোথায় ? ছদ্ম হতাশা অবিনাশেব চোখে মুখে ।

সরমা বলল, মেরিন-লাইনসএর দিকে । সমাদ্দারেব সঙ্গে দেখা করাব কথা ছিল, ভুলে গেছি । তোমার তাডা নেই তো কিছু ?

না । হালকা হেসে অবিনাশ তাকালো তার দিকে, মুখ শুকনো কেন ?

ঈষৎ হেসে সবমাও তেমনি জবাব দিল, যেমন তোমাব চোখ—ঘরে গিযে বোসো. এই চাবি নাও, আমি শিগগীবই ঘুবে আসছি ।

নির্দিষ্ট জায়গায় বিরাট বাড়িটির ভিতরে এসে সবমা জনপ্রাণী দেখতে পেল না । বাইবের দিকে প্রকাণ্ড হল । সায়েন্স কলেজেব মতোই ল্যাববেটাবিব বিপুল সরঞ্জাম । মাঝে মাঝে এক একটা বড বড ডেস্ক সাজানো । সবমা সাগ্রহে দেখতে লাগল । কোণেব দিকে খাটিয়া পেতে একজন লোক ঘুমুচ্ছে । সম্ভবত দারোয়ান । ডেকে তুলল । সবমাকে দোতলায় উঠে যেতে বলে সে পাশ ফিবে নাক ডাকাতে লাগল আবাব ।

ডাঃ সমাদ্দাব নিবিষ্ট চিত্তে কিসেব চার্ট তৈবি কবছেন একটা ।

ভিতবে আসব স্যাব ?

চশমা কপালের ওপব তুলে ভ্রূ কোঁচকালেন তিনি । স্বগত বিস্ময় । অ্যান এঞ্জেল ফ্রম হেভেন । এসো—

সবমা ঘবে প্রবেশ কবল ।

বোসো । দেখলেন একটু । এই...কে যেন তুমি ?

সবমা হেসে ফেলল, চিনলেন না ?

চোখ মুখ কুঁচকে ওকে নিবীক্ষণ কবে দেখলেন আবাব । হেসে উঠলেন হো-হো শব্দে । —আই উইশ সামবডি কুড ব্লো মাই ব্রেইনস আউট, এরই মধ্যে এমন ভুল । তুমি তো সরমা ব্যানার্জী, আমাদের চন্দ্রর চন্দ্র—বোসো, বোসো ।

সবমা আরক্ত । চুপ কবে বসল তাঁর সামনে ।

হাতেব কাজ বেখে তার মুখোমুখি বসলেন তিনি ।—আমাব নতুন রিসার্চএ আসতে চাও ?

নিলে তো খুশি হয়ে আসি স্যাব ।

নো মাই ডিয়ার, নো ফেভাবিটিজম, কাজ জানো ?

কাজ না জানুক, এই মানুষটির সঙ্গে কথা কি করে বলতে হয় জানে । জবাব দিল, কাজ কবলাম কোথায়, পডছি তো ! বি. এসসিতে ফার্স্ট-ক্লাস পেয়েছিলাম, এম. এসসিতেও পাব আশা করি ।

দ্যাটস নো কোয়ালিফিকেশান । তডবড়িয়ে উঠলেন তিনি, বিনে মাইনেয় খাটতে পাববে ? ভেবি ভেবি হার্ড লেবার—?

সরমা নিরীহ মুখে পাল্টা প্রশ্ন করে, ঘরের বৌ-ঝি'দের মতো ?

হোয়াট্ ! রাগতে গিয়ে হেসেই ফেললেন পরক্ষণে ।

ইউ সিলি গার্ল ! সমনোযোগে দেখলেন তাকে ।—সত্তর বছরের কুমার আমি, এবার নিজের গিন্নিই করব তোমাকে । এসো আমার সঙ্গে—

হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন সিঁড়ির দিকে । আমার সাব্জেক্ট শুনেছ ?

সরমা ঈষৎ বিব্রত ।—ঠিক জানিনে ।

প্রায় ধমকেই উঠলেন যেন সমাদ্দার। ওঃ তুমি তো খুব রিসার্চ করবে দেখছি। নিচে নামতে লাগলেন, গড়পড়তা ছাব্বিশ বছর পরমায়ু এ দেশের মানুষের, বড় কাজ তারা করবে কখন গো ? সময় কোথায় ! অথচ কেন বাঁচবে না তারা সত্তর বছর আশী বছর একশ বছর । ভেবে দেখেছ কখনো ?

সরমা ভয়ে ভয়ে চুপ করে থাকে । কিছু বলতে যাওয়া নিরাপদ নয় জানে । সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আড়চোখে দেখে । বৃদ্ধের মুখে উত্তেজনায় মেশা আকুতিটুকু ভারী সুন্দর মনে হয় তার ।

ল্যাবরেটারি । দারোয়ান হয়তো ঘুমের মধ্যেও প্রভুর পায়ের আওয়াজ শুনতে পায় । নিদ্রার আশা জলাঞ্জলি দিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বসে আছেন । সমাদ্দার রেহাই দেবেন না তবু ।—কি বাবা, ঘুমুচ্ছিলে ?

সকলের বড় ডেস্কটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, এখানে আমি কাজ করব ! পাশেরটা দেখালেন, এটা চন্দ্রর । যতদিন সে না আসে খালি থাক, ক'দিন আর অবাধ্য হবে আমার । সেদিন আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছি—আরে বাবা, কারখানার টনিক বিক্রির টাকা দিয়েও তোর মতো দশটা লোক পুষতে পারি সারা জীবন, চাকরির মায়া কিসেব ! কি বলো ?

হাসলে বিপদ, সায় দেওয়াও মুশকিল ; ল্যাবরেটারি দেখার আগ্রহে সরমা জবাব এড়িয়ে বাঁচে ।

এই ডেস্কগুলি আর সব অ্যাসিস্ট্যান্টদের । চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে কি ভাবলেন তিনি, আর ওই সকলের শেষে সবচেয়ে ছোট ডেস্কটা হবে তোমার । এখান থেকে গিন্নির মতো সব কাজ এগিয়ে দেবে । তোমার খাওয়া-পরা থাকার ভার আমার, এর বাইরে এখন আর পাবে না কিছু । রাজী ?

সরমা হাসিমুখে ঘাড় নাড়ল । রাজী ।

গুড্ । এখন ভালো করে পরীক্ষার জন্যে তৈরি হওগে যাও । দু'তিন মাস লাগবে এখানে কাজ শুরু হতে, তখন ডেকে পাঠাব । সাদা-সাপটা বিদায় দিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন আবার ।

বিরক্তিতে মণিময়ের গোটা মুখ বিকৃত । হাতে কাগজ কলম । কিন্তু বিছানায় অবিনাশ শয়ান । চক্ষু নিমীলিত । ঠেলতে শুরু করল, এই এখানে ঘুমুচ্ছিস কেন, ওঠ্ !

প্রত্যুত্তরে নাসিকাগর্জন । অগত্যা মেঝেতে বসেই লেখায় মন দিল সে ।

সরমা ফিরে আসতে অবিনাশ ধীরে সুস্থে উঠে বসল । এসো, অনেকক্ষণ অপেক্ষা

করছি ।

মনোযোগ অপঃসৃত মণিময়ের ।—তুই ঘুমুস নি ?

না !

তোকে যে ডাকলুম এতবার ?

শুনেছি।

মণিময় মারমুখী । অবিনাশ নিরীহ মুখে বলল, কি জানি বাবা, না ঘুমুলে এমন রেগে যাবে জানলে ঘুমিয়েই থাকতাম ।

মণিময়ের যত রাগ গিয়ে পড়ে সরমার ওপর । গর্জন করে ওঠে, আলাদা বাড়ি দেখছি আমি, ও যদি সেখানে যায় তো খুন হয়ে যাবে বলে দিলাম তোকে ।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে তাড়াতাড়ি জামা পরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল । সম্ভব হলে আজই অপর্ণাকে স্টুডিওতে নিয়ে যাবে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিকের ব্যবস্থা পাকা করতে ।

সরমা বলল, এখন আর ঠাট্টা নয়, নাটক ছবি হচ্ছে, তার ওপর মিউজিক ডাইরেক্টার —কোন কথা সহ্য হবে না । ছেলেটাকে তো সত্যিই দিলে পাঠিয়ে ।...চা খাবে নাকি ?

থাক । সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা হল ?

পাশে বসল সরমা ।—শুধু দেখা, তাঁর নতুন ল্যাবরেটারিতে গিন্নির পদে পাকা হয়ে এলাম পর্যন্ত ।

অবিনাশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সেদিনের মাপ চাওয়া ভুলে গিয়ে মাথা খারাপ করো না আবার । আর এক জায়গায় ও পদটা যে খালিই থেকে গেল সে সম্বন্ধে ভাবলে কিছু ?

কি জানি বাপু, জানিনে আমি—। এই মুহূর্তে এই কথাটাই তুলবে অবিনাশ, সরমা ভাবেনি । বিরক্ত হল । অন্তত চেষ্টা করল বিরক্ত হতে । কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা মীমাংসার তাড়নায় সেই থেকে ভুগছে নিজেও । ভেবেছে । ভাবছে । তার এ ভাবনায় এক অবিনাশ ছাড়া আর দোসর নেই কেউ । কিন্তু ওর সঙ্গেই এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার মতো এমন অস্বস্তিও আর নেই বুঝি ।

নিমেষের স্তব্ধতা । অবিনাশ যথাপূর্ব শান্ত আবার ।—খবর দিই বিপিনবাবুকে ?

সরমা নীরব অনেকক্ষণ । আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বলো ?

অবিনাশ হাসল ।—ইচ্ছে ষোল আনা, অথচ বলাটা চাপাবে আমার ঘাড়ে !

না, তুমি ভেবে বলো । ঈষৎ জোর দিয়ে বলল সরমা ।

ভেবেছি । শান্ত মুখে নিজের মতামত ব্যক্ত করল অবিনাশ, মানুষটি একটু আত্মম্ভরী বটে, তবে খারাপ মনে হয় না ।

সরমা চকিতে তাকালো একবার তার দিকে । পায়ের একটা আঙুল মেঝেতে ঘষতে লাগল চুপচাপ । পরে আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু আমার যেন কেমন ভয় করছে অবিনাশ...।

ভয় ! অবিনাশ অবাকই হল যেন । একটু থেমে হাল্‌কা করে বলল, তোমার সকলের বড় পুঁজি নিজের ওপর আস্থা, এ যদি হারাও একটা বড় জিনিসই হারাবে ।

কথা মাস্টারির মতো শোনাবে এর পরে । অবিনাশ উঠে পড়ল । নিজের ছেঁড়া ঝুলির শূন্যতা ভরাতে কোনদিন চেষ্টা করেনি । প্রত্যাশাও ছিল না কিছুরই । তবু উন্মনা হয়ে পড়ে

কেমন । নিরবচ্ছিন্ন ছুটির আস্বাদন একটা । বোঝার মতো লাগছে ।

দাবির শিকলটা ছিঁড়েছে ।

কিন্তু ওর একটা টুকরো যেন আটকে আছে কোথায় । নড়তে চড়তে লাগে

॥ ৭ ॥

চন্দ্র সোৎসাহে আপ্যায়ন করলেন, অবিনাশ যে ! এসো, এসো—

ঘরের অন্য দু'জন — মণিময় এবং অপর্ণা । সাড়া না দিয়ে ঢুকে পড়ে অবিনাশ বিব্রত বোধ করল । কিন্তু তার চেয়েও বেশি অবাক মণিময়কে দেখে । নাট্যকারের মুখেও বিস্ময় এবং সঙ্কটের সুস্পষ্ট ছায়া । গান শেষে গল্পগুজব চলছিল । অপ্রত্যাশিত এই মূর্তিমান বিঘ্ন ।

বিস্ময় কাটিয়ে সপ্রতিভ মুখে অবিনাশ বলল, অন্যায় করলাম বোধহয়, তবু এসে যখন পড়েছি বসবই । কিন্তু মণিময়দা তুমি এখানে ?

মণিময় সামলে নিয়েছে সকলের অগোচরে ।—আমিও তো তোকে এ কথাই জিজ্ঞাসা করতে পারি ।

পারো । তড়বড় করে একটা ফিরিস্তি দিয়ে গেল অবিনাশ । ইনি মাস্টারমশাই, আমার রোগশয্যায় এঁর দিবারাত্র তদবিরে ভয় পেয়ে বলেছিলাম, বৌদি হয়তো রাগ করে মুণ্ডুপাত করছেন আমার—প্রতিবাদে মাস্টারমশাই চোখ রাঙিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, স্বয়ং এসে বৌদির হাতে এক পেয়ালা গরম চায়ের দণ্ড নিতে । হেসে ফেলল, কিছু মনে করবেন না মাস্টারমশাই, মণিময়দা সাহিত্যিক মানুষ, কাব্য করে বললে ভারী খুশি হন ।

অপর্ণা আর একদিন একে দেখেছিল আড়াল থেকে । হাসতে লাগল মৃদু মৃদু । চন্দ্র বললেন, এবারে আপনার জবাবদিহির পালা মণিময়বাবু ।

রসালো জবাবদিহি করল মণিময়ও । অবিনাশকে উদ্দেশ করে বলল, মিসেস্ চন্দ্র যদি তোর মুণ্ডুপাত করে থাকেন, আমার করছেন ডাঃ চন্দ্র । তুই অসুখে তাঁকে আটকে রেখেছিলি, আমি এঁকে আটকে রাখছি গানে । দণ্ডও তোর আমার এক, আমারটা হয়ে গেছে, তোমারটা বাকি, অতএব তুমি বোসো আমি চললাম ।

অদম্য উচ্ছ্বাসে অবিনাশ তার পিঠ চাপড়ে বলে উঠল, পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলব এর পরে, আর বোলো না ।

চিরাচরিত উষ্ণ ঝাঁজটুকু দমন করতে হল । সম্মানটা বেঁচেছে এখনো, আর মুহূর্তমাত্র অবস্থানও সুবিবেচনার কাজ হবে না । মণিময় বিদায় নিল ।

কলকণ্ঠে এই হাস্য-পরিহাসের পর হঠাৎ যেন লজ্জা পেয়ে গেল অবিনাশ । অপর্ণাকে বলল, নমস্কার বৌদি, এ উৎপাত দেখে হয়তো বা ভড়কে গেছেন, গাছ থেকেই নেমে এলো নাকি । চেহারাটিও আবার তেমনি কিনা । গম্ভীর ।—আমার নাম অবিনাশ, অর্থাৎ বিনাশ নেই—একই ক্লাসে সাত বছর জবাই হয়েছি মাস্টারমশায়ের হাতে, তবু না ।

চন্দ্র সহাস্যে প্রতিবাদ করলেন, বাড়িয়ে বোলো না, আমার হাতে মোটে দু'বছর ছিলে তুমি ।—ওকে ছেড়ো না অপর্ণা, সত্যিই ও তোমার নামে অপবাদ দিয়েছিল ।

বিগত দিনের সেই অপ্রিয় প্রসঙ্গ একটু যেন অস্বস্তির কারণ । অপর্ণা অনুভব করছে, হাসিমুখে যে ছাত্রকে বন্ধু বলে কাছে টেনে নিয়েছেন চন্দ্রর মতো রাশভারী শিক্ষক, সে লোকটি অবহেলার নয় । ভালোও লাগল । বলল, অপবাদের জন্যে না হোক, তোমাকে কাজ আর পড়া থেকে কিছুটা বিশ্রাম দেবার জন্যেও এঁকে মাঝে মাঝে নেমন্তন্ন করতে আমার আপত্তি নেই ।

অবিনাশ সায় দেয় তৎক্ষণাৎ, অপরকে বিশ্রাম দিতে সারা বোম্বাই শহরে এমন আর দু'টি পাবেন না । পরীক্ষার খাতায় গোল্লা বসালেও এই বিদ্যেটির জন্য মাস্টারমশায়ের একটা বড়সড় টাইটেল দেওয়া উচিত আমাকে । থেমে অপর্ণার দিকে তাকালো সে, কিন্তু মণিময়দা ও কি বলে গেলেন, আপনাকে গান শেখাচ্ছেন তিনি ?

চন্দ্র জবাব দিলেন, এবার ওঁরই, সুরে গান রেকর্ড করবার কথা । তুমি মণিময়বাবুকে চেনো কি করে ?

জবাব এড়িয়ে অবিনাশ চোখ কপালে তুলে ফেলল প্রায় ।—তাহলে তো বেশ বড় ব্যাপার ! চেহারার মতো রুচিটাও আমার নীরস নয় বৌদি, একেবারে বাদ যাবো ?

অপর্ণা হেসে ফেলল ।—দাঁড়ান, সবে তো একদিনের আলাপ, দু'চারদিন যাক আরো তারপর বিবেচনা করব । আসছি--

একটু বাদেই বেয়ারা চা এবং খাবার এনে রাখল টেবিলে । চন্দ্র খাবারের ডিস এগিয়ে দিলেন অবিনাশের দিকে !

মাস্টারমশাই— । কিছু একটা বলবে অবিনাশ, কিন্তু কি ভাবে বলবে সেটাই যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না ।

বলো ।

একেবারে এমনি আসিনি, কথা ছিল ।

চন্দ্র নীরব, জিজ্ঞাসু ।

অনেকদিন আগে বিপিনবাবু আমার কাছে গিয়ে হাজির, আপনি নাকি বলে দিয়েছেন, আমার মধ্যস্থতায় সরমার সঙ্গে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা হতে পারে । সরমার অমত নেই দেখলুম, তবু ফিরে ও আমার কাছেই পরামর্শ চাইলে । এখন পরামর্শ দেবার দায় সত্যিই যদি কারো থাকে, সে আপনি ।

চন্দ্র চেয়ে থাকেন তার মুখের দিকে । জবাব দিতে হবে ভুলে গেলেন । বিজ্ঞানীর চোখে হয়তো ধরা পড়েছে এমন কিছু যা অবিনাশকে দেখলে বুঝবে না কেউ । অন্যমনস্ক— । ওর জন্য চা ঢালতে গিয়ে শুধু পেয়ালা ছাড়া ট্রের আর সর্বত্রই ঢাললেন চা । বিব্রত মুখে বললেন, এ আবার কি করলাম ।

অবিনাশ দেখছিল । অল্প হেসে পেয়ালা পটএর মুখে এগিয়ে দিল ।—আপনার কাছে আসার আগে একটা ভয় ছিল মাস্টারমশাই, সহজ হবার তাগিদে পাছে সহজের সীমা ছাড়িয়ে যাই । মিথ্যে সে চেষ্টা করব না আর, চা ঢালার বিভ্রাট দেখেই বুঝেছি আপনার চোখকে ফাঁকি দেব এত বিদ্যে নেই ।...তবু, আমার কথা না ভেবে সরমার ভালোমন্দ চিন্তা করেই জবাবটা দিন ।

মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে অপর্ণা ঘরে প্রবেশ করল আবার ! ট্রের ওপর চায়ের ধারা চোখে

পড়তে অবাক।

ও কি ?

বিড়ম্বিত মুখে চন্দ্র বললেন, পড়ে গেল কেমন—

অবিনাশ বলল, মাস্টারমশায়ের দোষ নেই বৌদি, সাত বছর পড়াবার পরেও চতুষ্পদ-বিশিষ্ট কেউ নই আমি, হাতও আছে দু'টো, এ সব সময় মনে থাকে না। বাধা না দিলে সবটুকু চা-ই উনি ট্রেতে ঢালতেন।

চন্দ্র হাসলেন একটু।

এ আত্ম-বিস্মৃতি অপর্ণা চেনে। একটা রুক্ষ ছায়া নামে মুখে। এ অন্যমনস্কতায় আর একটা নাম জড়িত। বাইরে থেকে এইমাত্র শুনেছে সেই নামটা। অবিনাশকে লক্ষ্য করে টিপ্পনী কাটল, দিনদুপুরে সব অন্ধকার দেখছেন, কি ব্যাপার ?

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তাই তো দেখবেন, বিক্রম কি এ মূর্তির কম নাকি—জেনেশুনে আপনি গেলেন কেন ঘর ছেড়ে !

অপর্ণা চেয়েই আছে। সপ্রতিভ রস-সৃজন-পটুতার প্রশংসাই করল মনে মনে।

বুঝলাম !...তারপর কি নিয়ে কথা হচ্ছিল আপনাদের ?

ওঁর এক বিশেষ ছাত্রীর বিয়ের সম্বন্ধে পরামর্শ করছিলাম।

বিশেষ ছাত্রী কি রকম ?

অবিনাশ বিব্রত মুখে হেসে ফেলল।

ব্যাপার মন্দ নয় তো ! হেসে ওঠে অপর্ণাও, ওঁর বিশেষ ছাত্রীর বিয়ের সম্বন্ধে আপনি এসেছেন পরামর্শ নিতে—বিশেষ ছাত্রীটি আপনারও বিশেষ কেউ হন নিশ্চয় ?

অবিনাশ নিরুপায়।—বৌদিকে ওকালতি পাস করিয়েছেন নাকি মাস্টারমশাই ?

তাই তো, এমন প্রাণান্ত অবস্থা আপনাদের। একটা ধারালো উচ্ছলতা দেখা দেয় অপর্ণার মুখে।—আচ্ছা চলুক তাহলে পরামর্শ, বাধা দেওয়া উচিত নয়। আমার আবার কাজ আছে একটু—তার আগে কাউকে পাঠিয়ে দিই ট্রে-টা সরাবে, নয়তো পরামর্শের গরমে ওটা এবার টেবিলে ওলটানো আশ্চর্য নয়।

হাসতে হাসতে চলে গেল। কিন্তু হাসিটা তেমন প্রাঞ্জল ঠেকল না অবিনাশের চোখে।

অবিনাশ—। ডাঃ চন্দ্র আত্মস্থ হলেন যেন।

বলুন।

বিপিনকে তোমার কাছে যেতে বলেছিলাম যখন, কিছু না ভেবেই বলেছিলাম। তুমি রাগ করো নি ?

না।

এ ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয় ?

অবিনাশ সকৌতুকে খানিক চেয়ে রইল তাঁর দিকে। পরে জবাব দিল একটু আগেই তো বললাম, আমায় বাদ দিয়ে ভাবুন। আর কোন ব্যবস্থার দরকার আছে কি না আপনিই ভালো বুঝবেন, বিপিনবাবুকে তেমন করে জানিনে আমরা।

একটু ভেবে চন্দ্র শান্ত মুখে বলেন, সরমার মতো মেয়ে ও বাড়িতে খাপ খাবে কি না বলা শক্ত অবিনাশ !...তবে, বিপিনকে যতটুকু জানি, লোক খারাপ নয়।

অবিনাশ চলে গেল ।

চন্দ্র একা বসে চুপচাপ । একটু আগের হাসিখুশির আবহাওয়ায় কেমন যেন বিরস ছেদ পড়ে গেছে একটা । ভালো লাগছে না । উঠে পায়ে পায়ে ভিতরে এলেন তিনি ।

অপর্ণা স্টুডিওতে ফোনে কথা বলছে মণিময়ের সঙ্গে ।—আসুন একবার, আপনার প্রডিউসারের সঙ্গে ব্যাক্-গ্রাউণ্ড গান নিয়ে আজই আলাপ করতে আপত্তি নেই ।...অ্যাঁ ? না ভুল বলেছি, হবে সময়—কোন কাজ নেই, আসুন ।

চন্দ্রের উপস্থিতি অনুভব করে একটু জোরেই বলল কথাগুলি । রিসিভার রেখে ফিরে দাঁড়াল । দেখল একটু ।—শেষ হল পরামর্শ ?

হুঁ । আরাম কেদারায় শুয়ে খবরের কাগজ হাতে নিলেন চন্দ্র ।

অপর্ণা কটাক্ষে তাকালো আবারও !—কূলকিনারা পেলে কিছু ?

চন্দ্র নিরুত্তরে কাগজ পড়তে লাগলেন ।

।। ৮ ।।

বিপিন চৌধুরী আর যায়নি অবিনাশের কাছে । প্রথম সাক্ষাতে খুশি নয় । নিজে থেকে আবার দেখা করতে সম্মানে লাগে । দিন কতক গুম হয়ে কাটিয়ে কাজে মন দিল আবার । শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গোলমেলে কানা-ঘুষা শুনছে কিছু ।

ঘনশ্যামবাবু সংবাদ দিলেন, কে একজন অবিনাশ মুখুজ্জে টেলিফোনে খোঁজ করছিলেন একটু আগে ।

বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো ফাইল থেকে মুখ তুলল বিপিন ।

আপনি নেই শুনে জিজ্ঞাসা করলেন কখন পাওয়া যেতে পারে । বললাম, ঠিক নেই । ...একবার দেখা করতে বললেন আপনাকে ।

কাজ মাথায় থাকল । কোট গায়ে ফেলে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করল বিপিন । সহকর্মী প্রথমে হতভম্ব, পরে বীতশ্রদ্ধ । বর্তমানে তার কার্য-পদ্ধতি মনঃপূত নয় মোটেই ।

সাত মাইল পথের ব্যবধানটুকু বিরক্তিকর রকমের দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে বিপিন চৌধুরীর । যে বেগে মোটর ছুটেছে প্রায় ভয়ের কারণ । কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই । প্রত্যাশার তাড়নায় স্থৈর্য বিড়ম্বিত ।

কোনরকম ভূমিকা না করে অবিনাশ শান্ত মুখে বলল, সরমার সঙ্গে দেখা করুন ।

কবে ? বিপিন দম নেবার অবকাশ পায়নি তখনো ।

আজ কাল, যেদিন খুশি । অবিনাশ নির্লিপ্ত । ছবি আঁকছে ।

বিপিন নড়েচড়ে বসল একটু । দ্বিধা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বলেছিলেন...?

হ্যাঁ, আপনি যান তার কাছে ।

বিপিন তবু অপেক্ষা করে একটু । নিস্পৃহতা চক্ষুশূল । অবিনাশ নক্সা আঁকছে একমনে ।

অর্থাৎ, আর কথা নেই কিছু । ওর যা বলার বলেছে। এবং এইটুকুই সব । উঠতে হল বিপিন চৌধুরীকে । এর পরে আর বসে থাকাও বিসদৃশ ।

নক্সা আঁকছে অবিনাশ । নিবিষ্ট-চিত্তে । স্বেচ্ছায় সে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল সেদিকে

আর পিছু ফিরে চাওয়া নয় ।

নক্সা আঁকছে । মনে মনেও। নারী মানুষের জীবনে কী ? কেন ? কতটুকু ?

পুরু অয়েল-পেপারটা চার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে । ভুল হয়েছে। রিয়েলিস্ট অবিনাশ মুখুজ্জে হেসে উঠল । ভালোবাসা বড় করে মানুষকে ? হয়তো করে।

ফ্রেমে নতুন ক্যানভাস্ চাপাল আর একটা ।

ছোট একটা পার্কের ধারে গাড়ি থামিয়ে বিপিন কিছুক্ষণ বসে থাকে চুপচাপ । ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবা দরকার । বড় বেশি তাড়াহুড়ো করছে—নিজেই বোঝে । কিন্তু ভাবতে গিয়েই মনে মনে যার সামনে এসে দাঁড়ায়, ধৈর্যের বাঁধ বালির বাঁধ সেখানে ।...মন্টুকে পড়ানোর মাঝখানে ওর প্রত্যাশিত আবির্ভাবে সেই হাল-ছাড়া নারী-মাধুর্য ।...আর পথের ধারে সেদিনের সেই প্রত্যাখ্যানের সবল কমনীয়তা । ভিতরটা চনমনিয়ে উঠল বিপিন চৌধুরীর । তৃষ্ণার্ত অনুভূতি । দিন-কতক চেষ্টা করেছিল ভুলে থাকতে ।...দিন কতক ? পলে পলে অনেকদিন । গাড়ি ছুটল আবার ।

কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলে দিল সরমা ।

বৃথাই বাক্যচ্ছটার জাল বুনছিল বিপিন এতক্ষণ । সরমার চোখের শান্ত জিজ্ঞাসাটুকু হঠাৎ শান্ত করে দিল তাকেও ।

আসুন ।

বিপিন অনুসরণ করল ।

বসুন—। নিজে বসল চৌকিতে, বিপিন চেয়ারে ।

কিছু একটা বলা দরকার এবার । বিপিন চেষ্টা করল ।—মণিময়বাবু বাড়ি নেই বুঝি ? ক্ষুব্ধ হল পরক্ষণে । এই কি একটা জিজ্ঞাসা করার মতো কিছু !

বেরিয়েছেন ।

অস্বস্তিকর মুহূর্ত দু'চারটে ।...অবিনাশবাবু আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে ।

বলে ফেলে নিজের ওপরই জ্বলে উঠল আবার । এ কথাটাই বলবে না ভেবেছিল । প্রার্থীর নগ্ন প্রকাশ যেন । উত্তেজিত হল এবং নিজেকে ফিরে পেল তখুনি ।—উনি পাঠান নি, আপনার কাছে আসতে বলেছেন আজ হোক কাল হোক যেদিন খুশি । আমি আজই এলাম, উনি না বললেও একদিন আসতুম ঠিকই ।

তার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল সরমার । এ উত্তেজিত মূর্তিটি আগেও খারাপ লাগত না । সামলে নিয়ে চুপ করেই বসে রইল ।

জড়তা সম্পূর্ণ অপসৃত । ঈষৎ হেসে বিপিন পরিপূর্ণ দৃষ্টি রাখল তার মুখের ওপর । কি করে যেন বুঝছে লগ্ন শুভ । বলল, আপনার একটা কথার অপেক্ষায় দিন গুনছি অনেকদিন । কাজকর্মও ভুলেছি । আর ক'দিন এমন করে থাকব ?

অদ্ভুত শোনায় । সরমা চকিতে তাকাল তার দিকে । সহজ আবেদনের স্পর্শ আছে একটা । শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, আপনার আর ভেবে দেখাব নেই কিছু ?

বিপিন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, আপনার চিন্তা ছাড়া আর কিছু ভাববার সময় আমি পাইনি । বলুন কি ভেবে দেখতে হবে ?

মনের কোথায় ছোঁয়া লাগে আবারও। পরস্পরের দৃষ্টি সংবদ্ধ ক্ষণকাল। সরমা ভাবল একটু। পরে আস্তে আস্তে বলল, নিতান্ত সাধারণ ঘরের মেয়ে আমি...তবু পড়াশুনা নিয়ে আছি, এর পরে ঘরের বাইরে হয়তো আমার কাজ থাকবে কিছু।

বিপিন অম্লান বদনে সায় দিল, থাকাই উচিত, আমি সহায় হব তাতে।

সরমা চেয়েই আছে। দু'চার মুহূর্ত...। মৃদু হাসিতে ওর মুখের রং গেল বদলে। লালিমাসিক্ত। বেশ, আর দিন শুনতে হবে না, কাজ করুনগে নিশ্চিন্ত মনে।

লগ্ন শুভ। জায়গাটা অনুকূল নয়। একটা প্রবল ইচ্ছাকে বিপিন সবলে নিষ্পেষিত করল মনের মধ্যে।—তোমার...আপনার পরীক্ষা কবে ?

বেশি দেরি নেই।

তবু ?

মাস তিনেক।

মনে মনে বিপিন একবার স্বর্গগত পিতাকেই স্মরণ করল বোধহয়।—তিন মাস! এ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ?

বিব্রত হল সরমা। হ্যাঁ বলতে বাধে, না বলাও সহজ নয়। একটু ভেবে ফিরে তাকেই জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি বলেন ?

লগ্ন নিছক শুভ। আপাদ-মস্তকে খুশির ঢেউ লাগে আবার। ছোট কথা, সামান্য কথা, সাধারণ কথা। কিন্তু কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে পৌঁছায়। চোখ বুঝে শ্রবণ-রসিকের মতো দুই কান দিয়ে আস্বাদন করার মতো। কি যে বলবে ভেবে পাচ্ছে না বিপিন। —আমি, মানে আমি আর কি বলব। তা দেখুন, ধেৎ, ছাই দেখুন—মোট কথা তিন মাস প্রকাণ্ড সময়—ভাবতে গেলেও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ার মতো। বিয়ের পর তোমার নিজের বাড়ি বসে পরীক্ষার শুভ কাজটা ভালো হবে না এ কোন কাজের কথা নয়—আমি এই বলি।

চোখে চোখ রেখে হেসে ফেলল সরমাও। নিজেকে দেওয়ার মধ্যে পাওয়ারও বিচিত্র একটা স্বাদ আছে যেন।

আবার শেয়ার বাজার !

ভিড় ঠেলে লিফটএর সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সবুর সইল না। বিপিন প্রায় এক দৌড়ে তিনতলার আপিস ঘরে উঠে গেল।

ঘনশ্যামবাবু আড়চোখে দেখলেন বারকতক।—এসেছেন ভালোই হয়েছে, গোটাকতক কথা ছিল। বাজার খারাপ—

বাজার খুব ভালো। সংক্ষিপ্ত জবাব। টেবিলের উপর কনুই ঠেসা দিয়ে হাতের ওপর মাথা রাখল সে।...সরমা বলছে, আর দিন শুনতে হবে না, কাজ করুনগে নিশ্চিন্ত মনে।

ঘনশ্যামবাবু বললেন, কিন্তু মনে হয় ডিপ্রেশান্ আসছে একটা।

আসুক।...সরমা জিজ্ঞাসা করল কি না ফিরে তাকেই, আপনি কি বলেন। বিপিন চৌধুরী হাসছে মৃদু মৃদু।

তবু দেখে শুনে চলা উচিত একটু। ধৈর্যের শেষ নেই ঘনশ্যামবাবুর।

চলুন দেখে শুনে।...ওর কথা শুনে হেসেই ফেলেছিল সরমা।

আমি বলছি নতুন করে আর টাকা রিস্ক করা ঠিক হবে না। ঘনশ্যামবাবুও মরীয়া।

রিস্ক আরো বেশি করতে হবে।...বিয়ের দিনটা কবে ঠিক করা যায়? ছুটিও নিতে হবে, একঘেয়ে ভালো লাগে না আর। মুখ তুলল।—ঘনশ্যামবাবু!

বিরক্তি সত্ত্বেও ওর চঞ্চল বর্ণচ্ছটা ঠিকই লক্ষ্য করছিলেন তিনি। ডাক শুনে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন।

আমি ছুটি নেব দিন-কতক আমার বিয়ে।

মনে মনে কটূক্তি করে উঠলেন ঘনশ্যামবাবু, শ্রাদ্ধ আমার—। হাসলেন একগাল, অ্যাঁ! কবে?

শিগগীরই। দিন-কতক একাই সব দেখতে হবে আপনাকে।

সহকর্মী প্রমাদ গুনলেন, নইলে পিণ্ডি চটকাবে কি করে আমার—আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়া গেছে। মুখে বললেন, এ আর বেশি কথা কি, দু'চার দিন বইতো নয়।

না, আরো বেশি।

আপিস ভালো লাগছে না আর। উঠে পড়ল।

রাগের মাথায় হাতের ফাইল রাখতে গিয়ে ঘনশ্যামবাবু কালির দোয়াত ওলটালেন।

শুভ সংবাদটা শুনে বিপিনের মুখের ওপর মতামত প্রকাশ করতে ভরসা পেলেন না চারুদেবী। কিন্তু ক্রুদ্ধ হলেন মর্মান্তিক। জেনেশুনে তাঁকে এমন অপদস্থ করা কেন।

মণ্টু খুশি হবে কি হবে না নিজেই বুঝে উঠছে না। সরমার সঙ্গে সম্পর্কটা ভাবতে খারাপ লাগে না। অথচ কেমন অদ্ভুত লাগছে।

বিপিন গাড়ি নিয়ে বেরুল আবার। দুনিয়াটাকে টেনে-হিঁচড়ে একজনের পায়ের কাছে এনে ফেলতে পারলে ভালো লাগত। সম্ভব নয়। অগত্যা ছোটাছুটি করে ছটফটানি নিরসনের প্রয়াস। চন্দ্রকে মনে পড়ল, সংবাদটা তাঁকে জানানো দরকার।

চন্দ্রর ড্রইংরুমে আলোচনার বিষয়বস্তু 'দেশের মেয়ে' ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ড গান। গৃহস্বামী বাড়ি নেই। বক্তা মণিময়। অপর্ণা শুনছে।

গানের সুনিশ্চিত সাফল্য-বিশ্লেষণে সুরকার আবেগসিক্ত। একে ক্লাসিকাল কাজ আছে অপর্ণার গলায়, তাতে সংযোজন হবে ইংলিশ টিউন, আধুনিক গান কাকে বলে অডিয়েন্স শুনবে এবার, ইত্যাদি।

দেখুন আগে কি দাঁড়ায়—। অপর্ণা রাশ টানে।

দেখা আছে। আপনার ট্রায়েল শুনে প্রডিউসার পর্যন্ত সতেরো বার তাগিদ দিচ্ছে, ব্যানার্জী কণ্ট্রাক্ট সই করিয়ে নাও। গান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু ছবি যে কি দাঁড়াবে সেটাই ভাবনা। যথার্থই একটা ভাবনার ছায়া পড়ল মণিময়ের মুখে।

কেন, ভালো হবে না?

ভালো হওয়া তো উচিত, বই তো আপনিও পড়েছেন...। প্রায় নিরাসক্ত মন্তব্য করল মণিময়। কিন্তু ভালো করবে কে? এক হিরম্ময়ীর রোলএ তেমন কাউকে পেলেই ছবি উতরে যেতে পারে, কিন্তু নামবে তো সেই একঘেয়ে ইনি না হয় উনি—না আছে কালচার না কিছু। সত্যি কিনা বলুন?

অপর্ণা ছদ্ম-গাম্ভীর্যে সায় দিল, সত্যি। নিজের কণ্ঠসংগীত সংস্রবজনিত দুর্বলতাও আছে। বলল, লেখাপড়াজানা মেয়েরা তো অনেকে ঝুঁকছে আজকাল এদিকে, আপনারা চেষ্টা করেন না কেন ?

মণিময়ের দু'চোখ অস্বাভাবিক চক্‌চকে দেখায় মুহূর্তের জন্য। পরে নিস্পৃহ জবাব দেয়, তেমন কই, দু'জন একজনে কি আর আর্ট বাঁচে ! সোৎসাহে ঝুঁকে বসল আবার, অথচ দেখুন—

বাধা পড়ল। মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো বিপিন চৌধুরীর আবির্ভাব। মণিময় চিনল এবং তৎক্ষণাৎ গাম্ভীর্যের আবরণে গুটিয়ে ফেলল নিজেকে।

বিপিনও তেমনি বিস্মিত।—নমস্কার, আপনাকে এখানে দেখব মণিময়বাবু, ভাবিনি। বৌদি চিনতে পারছেন তো ? মোহিনীদা কোথায় ?

অপর্ণা সহাস্যে অভ্যর্থনা করল, বসুন, তিনি বেরিয়েছেন। চিনতে পারব না ! সরমা ব্যানার্জী লাভের আশায় লজ্জাসরম বিসর্জন দিয়ে যে করে ছুটে এসেছিলেন এত সহজে ভুলতে পারি। হল কিছু ব্যবস্থা ?

মণিময় অধিকতর গম্ভীর। কর্ণমূল আরক্ত বিপিন চৌধুরীর। মণিময়ের সামনে এ পরিহাস মর্যাদায় লাগে। নিরুপায়। বলল, সে খবরটাই দিতে এসেছিলাম মোহিনীদাকে। হাসল। যেমন হাসে শেয়ার বাজারের অবিশ্বাসী মক্কেল বশীভূত করতে।—তবে, ছোটাছুটি সত্যি করতে হয় নি তেমন। মণিময়বাবু এখনো শোনেন নি তো ? আপনি বাড়ি ছিলেন না, আজই ব্যবস্থাটা পাকা হল। অপর্ণাকে লক্ষ্য করে বলল, এঁর সঙ্গে এখন আমার সম্পর্কটা জানেন তো বৌদি ?

অপর্ণা সবিস্ময়ে ঘাড় নাড়ল, বুঝলাম না তো !

দেয়ালে চোখ রেখে মণিময় বলল, সরমা আমার ছোট বোন।

অপর্ণা অবাক। মণিময়ের দাম হঠাৎ যেন বেড়ে গেল তার কাছে। সাগ্রহে বিস্ময় প্রকাশ করল, কই বলেন নি তো কোনদিন ?

এ যে একটা বলবার মতো কথা কি করে জানব বলুন। জ্যেষ্ঠোচিত হাসি।

অপ্রস্তুত হয়েও সামলে নিল অপর্ণা। বলল, সেদিন সায়েন্স কলেজে সরমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। এখানে একদিন আসবে কথা দিয়েছিল।... আপনার নিজের বোন ?

হুঁ।

এক মুহূর্ত নীরব থেকে অপর্ণা উৎফুল্ল মুখেই বিপিনকে বলল, এঁর সামনে অমন ঠাট্টাটা করে ফেলে আপনাকে তাহলে বেশ লজ্জা দিয়েছি বলুন।...তা আপনার থেকে ঢের ঢের বড় লোকও পত্নী-লাভের তপস্যা করেছে, লজ্জা কিসের।

বিপিনও তেমনি জবাব দিল, ঠিক কথা, মোহিনীদার তপস্যার ফল যখন সামনেই দেখছি।

হাস্য-পরিহাসের মাঝখানে মণিময় বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল।

নিজের চিন্তায় তন্ময়।

মানুষটা খারাপ ছিল না আসলে। কিন্তু উপর্যুপরি সাফল্যে চিত্ত বিভ্রান্ত। আশার তাড়নায় অর্থের ঘোরালো পথটা সোজাসুজি পাড়ি দিতে চায় এখন। লোভ-দানবের হাতে চলার

লাগাম। কপাল ঠুকে আজ কপালটাকে যাচাই করে নেবার দিকেই ঝোঁক বেশি। ভাবছে তবু। সঙ্কোচের একটা সূক্ষ্ম কাঁটা বিবেকের নরম পর্দায় আঁচড় কাটে থেকে থেকে।

ভাবছে। প্রযোজকের অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আর অল্প দুই-একটা কথা, যার অর্থ, শুধু ব্যাকগ্রাউণ্ড গান নয়, পারো যদি একে নায়িকার ভূমিকাতে নামাতে, সার্থকতার সোনার তিলক কপালে বাঁধা।

নায়িকার প্রাদুর্ভাবজনিত শোকের মর্মার্থ এই। বিপিন চৌধুরীর সমাগম না হলে আরো খানিকটা এগোনো যেত।

ছবির প্রডিউসার জানে। জানে, শিল্প ছেড়ে শিল্পীর প্রতি নজরটা এরই পরের অধ্যায়। কিন্তু সব জানা ধামাচাপা পড়ে স্বার্থের মোটা যুক্তির নিচে।—যে পারে সে পারেই ঠিক থাকতে। আর্টের খাতিরে চেষ্টাটা দোষের নয়।

তোর বিয়ে শুনলাম?

সরমা তার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করল একটু। পরে তেমনি হালকা জবাব দিল, খুব অবাক হবার মতো কিছু নাকি?

তাই তো! অবিনাশ ঘাড় থেকে নামবে ভরসা ছিল না। সুবুদ্ধি হয়েছে দেখছি।

শুনলে কোথায়? সরমা নিরীক্ষণ করছে ওকে।

বিপিনবাবুর মুখেই...ডাঃ চন্দ্রর বাড়িতে। চন্দ্রকে চিনিস? সায়েন্স কলেজেই তো আছেন—

চিনি। সামান্য হাসির উন্মেষ, অপর্ণা চন্দ্রকেও চিনি!

মণিময় চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একটা।—ভালো। কিন্তু তোর খবরটা চেপে আছিস কেন?

বাড়ি এলেই শুনতে পেতে. আজই কথা হয়েছে। কিন্তু অপর্ণা চন্দ্রকে তুমি গান শেখাও একথা গল্পচ্ছলেও কখনো বলো নি তো দাদা?

অমন কত মেয়ে শেখে গান। মণিময় নিস্পৃহ।

শেখে?

না তো কি!

আর একজনের নাম করো তো?

এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চায় নি মণিময়। কটাক্ষ অমার্জনীয়।—কি বকছিস?

কি আবার, অপর্ণা চন্দ্রর মতো নাম করো না আর একজনের?

ফাজলামো রাখ, তিনি বলেছেন তোকে কিছু?

না। তবে আমি তোমাকে কিছু বলতে পারি! অল্প হেসে সরমা তার চোখে চোখ রাখল।—তোমার রাতারাতি বিখ্যাত হওয়া থেকে কোন কথাটা না শতখানা করে ঢাক পিটিয়েছ আজ পর্যন্ত? বলো নি শুধু এ খবরটা। কেন—?

আলোতে কুঁকড়ে যায় এক প্রকারের কীট। মণিময় মিইয়ে আসছে তেমনি। তথাপি হেসে জোর গলায় বলল, আমার খুশি। কি বলতে পারিস তুই শুনি?

বলতে পারি, মহিলাটিকে যতটুকু চিনেছি, সজ্ঞানে তোমাকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন বোধহয়। মতলব কিছু থাকে তো ছাড়ো দাদা।

ভীম-গর্জনে ফেটে পড়াই নিরাপদ এস্থলে। তাছাড়া সহ্যও অনেকক্ষণ করেছে।— তোর মতো পেয়েছিস সকলকে, না ? ছেলে পড়ানোয় একদিন কামাই হলে অস্থির ! এর নাম তোমার ছেলে পড়ানো ? মুখ বুজে থাকি, কিছু বলি না বলে, কেমন ?

আর কি বলবে ? সরমা হাসি চাপছে।

তোমার চরটি কে জানা নেই আমার ? অবিনাশের রোগাপটকা শরীর ছাতু করে দিয়ে জেলে যাব তাও আচ্ছা, সাতখানা করে লাগানো বার করছি, দাঁড়া—।

উত্তেজনা দুরপনেয়। হাতের কাছে অবিনাশের অভাবে একটা কিছু ভাঙতে পারলে দাহ কমত। সবেগে পায়চারি শুরু করে দিল।

সরমা অনেক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে নিরীহ মুখে বলল, অবিনাশকে ডেকে আনব ?

শুধু খেয়ালের বশেই ওকে রাগিয়ে দিল অথবা অগ্রজের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর আস্থা কম বলে যথার্থই সতর্ক করে রাখল সরমাই জানে। কিন্তু আজকের দিনে অন্তত অপ্রীতিকর বচসা কাম্য নয়। হেসে বলল, তোমার হল কি দিনকে দিন, ঠাট্টা করে বললাম, আগুন হয়ে উঠলে ওমনি ?

মন ভিজল একটু।

সরমা জল ঢাললো আরো, তোমার মনে গলদ, নইলে কি না বললে আমাকে, রাগ করেছি ?

আপসও বাঞ্ছনীয়।

অবিনাশের প্রসঙ্গে চিন্তিত আর একটি মানুষও। বিপিন চৌধুরী। মন্টুর মুখে নামটা শোনামাত্র কৌতূহল আগের মতোই দুর্নিবার। অস্বস্তিও।

সাত-সকালে মন্টুকে দূত পাঠিয়েছিল সরমার বাড়িতে। তারই জের।

গত রাত্রিতে চন্দ্রর বাড়ি থেকে বিপিন ফিরেছিল প্রায় দিগ্‌বিজয়ীর মতোই। অকারণে মুখ ভার চারুদেবীর, তাও নজরে পড়ে নি। রাত্রিতে ভালো ঘুম হয় নি। সকালে উঠে আগামী শুভ দিনের তারিখ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে সরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ সেদিনই অত্যন্ত জরুরী বলে মনে হল। কাগজ কলম নিয়ে বসল তক্ষুনি। লিখল, সন্ধ্যে নাগাদ সে দেখা করবে, যেন বাড়ি থাকে।

তারপর ভরসা মন্টু। প্রাগ্‌-অনুরোধের ভূমিকাটুকু মন্দ নয়।

তোর তো বেশ সুবিধেই হল রে মন্টু—

যেন তোর সুবিধার্থেই কোন ব্যবস্থার সূচনা।

বৌদির কাছ থেকে ধরেবেঁধে শিখে নিবি সব, ভালো পাস করতে পারলে এবার একটা মোটর সাইকেল ঠিক কিনে দেব তোকে।

উক্ত দ্বি-চক্রযানের বিনীত সুপারিশ মায়ের মারফত মন্টু একদা পেশ করেছিল বটে। দুর্ঘটনার অজুহাতে বিপিন চারুদেবীকে নিরস্ত করেছে তখন।

মন্টু শঙ্কিত। ঔদার্যের এমন বহর উদ্দেশ্যবিহীন নয়। গুরুর অস্ত্রে গুরুকে পরাস্ত করার নজির আছে কুরুক্ষেত্র পর্ব থেকে। জবাব দিল, মোটর-সাইকেল দরকার নেই, খুব অ্যাক্‌সিডেন্ট হচ্ছে আজকাল।

মুণ্ডু হচ্ছে তোর, ভীতু কোথাকার। যাক্‌গে, তুই সরমাদের বাড়ি চিনিস? মূল কথাটা কতক্ষণ আর মূলতবী রাখা যায়!

না। প্রশ্ন শেষ হবার আগেই সাফ জবাব।

আচ্ছা, কাগজ পেনসিল দে, চিনিয়ে দিচ্ছি, নম্বরও বলে দেব'খন। একটা চিঠি দিয়ে আসবি ওর হাতে, দরকারি চিঠি। দরকারোচিত গম্ভীর বিপিন চৌধুরী।

আমার পড়াশুনা আছে অনেক, আমি পারব না। মন্টু আর্তনাদ করে উঠল প্রায়।

কিন্তু না পেরে রেহাই নেই। বিপিনের চোখে আসন্ন ধৈর্য-চ্যুতির ইঙ্গিত। মন্টু সভয়ে পাঠ করে নিল মুখভাব।

দাও—

কাগজ পেনসিল নিয়ে আয়।

বাড়ি চিনি, দাও।

ঘুরে এলো। বাইরের ঘরে বিপিন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। চিঠি বয়ে নিয়ে যেতে না হলে মন্টুর মায়া হতো হয়তো। নীরস খবরটা একেবারে গদ্যাকারে জ্ঞাপন করল সে। বলল, দেখা হল না, এই নাও চিঠি! তাঁর দাদা বললেন, অবিনাশবাবু না কার বাড়ি খোঁজ করতে। সে বাড়ি আমি চিনি না।

আনন্দ রোমন্থনে হঠাৎ যেন বেখাপ্পা ছেদ পড়ে গেল একটা। লোকটাকে সাময়িক বিস্মৃত হয়েছিল বিপিন, কিন্তু ভোলেনি। একটা নামের অস্বস্তি এড়ানো সম্ভব হল না আজও। গুম হয়ে বিপিন বসে থাকে একা ঘরে।...মানুষটা সরমার জীবনে কে? কি? কেন?

উত্তর মেলে না। দুই-একটা ইঙ্গিত মনে পড়ে। চন্দ্র আর মণিময়ের। কিন্তু তাই যদি হবে, সরমা ফিরিয়ে দিল না কেন তাকে?

ভাবছে, ডাঃ চন্দ্রকেই খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়।

কিন্তু সমস্যার দোটানায় চন্দ্র বিপর্যস্ত নিজেই। সমাদ্দারের তাঁকে চাই। রোজগার কমবে না সত্যি কিন্তু য়ুনিভার্সিটির কাজটা ভালোবাসেন তিনি। দ্বিধা লক্ষ্য সমাদ্দার করে রেগে ওঠেন।

টেল্ মি ইয়েস্ অর নো?

ভেবে দেখি।

ভাববে আবার কি! এতবড় একটা জিনিস ফেঁদে বসলাম তোমার এই শেষ সময়ে ভেবে দেখি বলার জন্য? সমাদ্দার উত্তেজিত।—কি হবে ছেলেদের দু'পাতা কেমিস্ট্রি মুখস্থ করিয়ে! ম্যালেরিয়ায় মরছে, যক্ষ্মায় মরছে, কলেরায় মরছে, পেটের অসুখে ভুগে মরে যাচ্ছে—অস্থিচর্মসার বিকলাঙ্গ সব, মনের জোর নেই, শরীরের জোর নেই—কেমিস্ট্রি শিখে করতে বসবে তো কেরানিগিরি। কাকে পড়াবে?

চন্দ্র হেসে ফেলেন। বলেন, তার চেয়েও ভালো বাজারে একের পর এক পেটেন্ট-মেডিসিন আর টনিক ছাড়া। সে কথা যাক, আপনি ডাকলে শেষপর্যন্ত না এসে পারব না। বলুন কি করতে হবে?

সমাদ্দার বিগলিত।—পেটেন্ট আর টনিক তো আমার ফ্যাক্টরিতে হামেশাই বেরুচ্ছে

হে, সেজন্যে কে ডাকছে তোমাকে ? ল্যাবরেটারিতে শুধু রিসার্চ ওয়ার্ক চলবে। তুমি আমি বাদে আরও জনা তিন-চার কেমিস্ট নেবো আপাতত। তোমার ওই ছাত্রীটির নাম কি ? দ্যাট লাভলি এঞ্জেল—সরমা ব্যানার্জী, তাকেও কথা দিয়েছি নেবো। মেয়েটি কাজের হবে, না ?

হ্যাঁ। চন্দ্র নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন।

আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা তোমার সঙ্গে কথা পাকা তাহলে ?

চন্দ্রর হাসলেন, পাকা।

কিন্তু এই অনুমোদনের ফলে ব্যাপার গড়ালো অনেক দূর। ডাঃ সমাদ্দারের পীড়াপীড়িতে অপর্ণা নিজেই আগে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, নামজাদা মানুষ দেশের, ডাকছেন এমন করে, গেলে নিশ্চয়ই ভালো হবে, রাজী হচ্ছ না কেন ?

চন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন, গেলে তোমার রাগ বাড়বে আরো, বই থেকে মুখ তুলতে সময় পাব না।

অপর্ণা ছদ্ম-রোষে প্রতিবাদ করেছিল, আমি শুধু রাগই করি, না ?

সুযোগ পেলেই, আর না পেলেও। চন্দ্র বলতে ছাড়েন নি।

বেশ যাও ! অপর্ণা হেসেছিল।

কিন্তু সেদিন সমাদ্দার বিদায় নিতে দেখা গেল, নতুন কাজে যোগদান সম্বন্ধে অপর্ণার আগ্রহ শূন্যে পর্যবসিত। ভিতরে এসে চন্দ্র নিজে থেকেই জানালেন বুড়োকে কথা দিয়ে দিলাম।

সাড়াশব্দ নেই !

গম্ভীর যে ? চন্দ্র ঈষৎ বিস্মিত।

য়ুনিভার্সিটির চাকরি কি হবে ? প্রায় তীক্ষ্ণ শোনায়।

চন্দ্র দেখলেন একটু।—সে তো ছাড়তেই হবে।

হাজার টাকা মাইনে সমাদ্দার দেবেন ?

তা না দিলে কি হাওয়া খেয়ে কাজ করব। লেগে থাকলে ভবিষ্যতে অনেক বেশিই পাব। কিন্তু কি ব্যাপার, তোমার মত নেই নাকি ?

উষ্ণ ঝাঁজে অপর্ণা বলে উঠল, এ বাজারে এক কথায় হাজার টাকার চাকরি ছেড়ে দেবে সুদিনের স্বপ্ন দেখে, আর আনন্দে আটখান হব আমি তাই ভেবেছিলে ?

চন্দ্র বিমূঢ়। বুঝে উঠলেন না ঠাট্টা কি না। নারী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয় বিবেচনায় পাস কাটাতে গেলেন।

শোনো—। কঠিন কণ্ঠে বাধা দিল অপর্ণা।

ফিরে দাঁড়ালেন।

চাকরি ছাড়া হবে না তোমার।

শান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে চন্দ্র অপেক্ষা করলেন একটু। একটা সন্দেহ যেন সচকিত করল তাঁকে। অপর্ণার ও অসম্মতি অনটন সম্ভাবনার দরুন নয়। তার সেদিনের আগ্রহ আজ বিপরীত বাধায় মুখর কেন বুঝলেন। সময় লাগল সামলে নিতে। কাছে এলেন।

দেখ অপর্ণা, আগেও বলেছিলাম আজও বলছি, বাইরে থেকে যে মেয়েটির নাম শুনেই

এত ঈর্ষা তোমার, সে সত্যিই এ সবের অনেক উঁচুতে । তাকে নিয়ে তোমার এ দুর্ভাবনার আভাস যদি পায় কখনো লজ্জায় মরে যাবে ।

কাগজ কলম নিয়ে বসলেন । সমাদ্দারকে চিঠি লিখলেন অল্প দু'চার কথায়। চাকরি ছেড়ে গবেষণায় যোগ দেওয়া সম্ভব নয়, এ নিয়ে আর অনুরোধ যেন না করেন । চাকরকে ডেকে আদেশ দিলেন, সমাদ্দারের হাতে দিয়ে আসতে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অপর্ণা দেখল সব । ডেকে থামাল চাকরকে । চিঠিটা নিল তার হাত থেকে । পড়ল । পরে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ফেলে দিল সেটা ।

লজ্জায় ধিক্কারে বিবর্ণ সমস্ত মুখ । মনের যে দ্বন্দ্বে আজ এ বাধার সৃষ্টি, আপাতদৃষ্টিতে তার নাম ঈর্ষা বইকি ।

চন্দ্রের ভুল হল আবারও । যতবারই আঘাত দিয়ে আলো জ্বালতে চাইলেন, আগুন জ্বলল ।

চলচ্চিত্র প্রযোজকের সামনে সমাসীন মণিময়, অপর্ণা এবং আরো কয়েকজন । অপর্ণার একটা সম্মতির অপেক্ষায় উদগ্রীব সকলে ।

এ যোগাযোগের শুভাশুভ ভেবে দেখার অবকাশ নেই অপর্ণার । সুস্থ চিন্তার অন্তরায় একান্ত ঘরের মানুষের নির্লিপ্ত উদাসীনতা । জ্বালাটা নিবিড় করে অনুভব করে তখনি, যখন ভাবে পথ আছে ডাইনে বাঁয়ে । পাথেয়র নগ্নরূপ সম্প্রতি উত্তেজনাবৃত ।

তবু অস্বস্তি কেমন । সামনে বসে আছেন যাঁরা, চোখের দৃষ্টিতে আবরণ নেই মার্জিত সম্ভ্রমের । ওর সর্বদেহে সংবদ্ধ তাঁদের নির্মম পরীক্ষা । অশোভন স্পর্শের মতো । বস্ত্র-স্বল্পতার অনুভূতি একটা । আগে জানত না এদের পরিকল্পনা । পরে শুনেছে । সাদাসিধে প্রস্তাব নয়, ফলে ফুলে পুষ্পিত মধুবর্ষী প্রস্তাবনা ।

এবার জবাব দিতে হবে ।

ঘরের কথা ভাবল আবার । যেমন ভেবেছে বহুদিন । মনোমালিন্য আর তিক্ততা । মানুষটা থাকুক তার সাধনা নিয়ে । এর নামও শিল্প । পরোয়া করে না সংস্কারের কোন চোখ-রাঙানির । উচ্ছল পরিপূর্ণতার সূক্ষ্ম বেদনাবোধ আছে একটা । বাঁচার মতো করে বাঁচতে চায় সে । আর চায় যশ খ্যাতি নাম । প্রস্তুত হল, দেবে জবাব ।

কিন্তু আমি তো প্লে করিনি কখনো ।

প্রযোজক দেশাই ব্যাখ্যা শুরু করলেন, আজ যা নতুন কাল তা পুরানো । মণিময়বাবুর মুখে শুনেছেন আর্টএর জন্য অপর্ণার দরদ কতখানি । ওটুকুই আসল, জড়তা কাটানো দু'দিনের অভ্যাস শুধু, ইত্যাদি— ।

অপর্ণা শান্ত মুখে একবার তাকালো মণিময়ের দিকে । তার সেদিনের আক্ষেপের তাৎপর্য অস্পষ্ট নয় আর । জবাব দিল, নামি যদি, জড়তা কাটিয়েই নামব, বলুন কি ব্যবস্থা হবে ।

ব্যবস্থা...মানে কন্ট্রাক্ট ?

হ্যাঁ ।

সাফল্যজনিত আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশটুকু ব্যবসায়ীর গাম্ভীর্য-ব্যূহের অন্তরালেই

সংগোপন থাকে । কটাক্ষে দেশাই সহকর্মীদের মুখভাব অবলোকন করলেন একবার। জানালেন, কণ্ট্রাক্ট-ফর্ম ছাপানোই থাকে তাঁদের, ব্যবস্থা আজই পাকা হতে পারে । নতুন আর্টিস্টকে এ বাজারেও তাঁরা যা দেবেন ততটা রেমুনারেশান্ কম প্রডিউসারই দিয়ে থাকেন : মন্দা-বাজারের মুনাফার অনিশ্চয়তায় কণ্ঠস্বর চিন্তাক্লিষ্ট ।

অপর্ণার শান্ত চোখে বিদ্রূপের ছায়া পড়ে । আসল জবাবের প্রতীক্ষায় চুপচাপ বসে রইল ।

ফুল-পিকচার কণ্ট্রাক্ট হবে...পনেরো হাজার টাকা—এর বেশি পারিনে । কর্মচারির উদ্দেশে হাঁক দিলেন প্রযোজক, একঠো ফরম লাও জী—

ফর্ম এলো । অপর্ণা মণিময়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আবার । অতিরিক্ত মনোযোগে ধরে রাখা গাম্ভীর্যের মুখোশ । হাসি পেয়ে গেল । মাথা নিচু করে ভাবল একটু । তারপর প্রযোজকের দৃষ্টির সম্মুখীন হল সোজাসুজি ।

ভূমিকাটি নায়িকার ?

হ্যাঁ—গ্র্যাণ্ড্ রোল্, যদি উতরে দিতে পারেন নাম ফেটে যাবে । প্রযোজকের সিক্ত কণ্ঠস্বরে সেই নিশ্চিত সম্ভাবনার আভাস ।

নায়িকার ভূমিকায় সচরাচর ওই রকমই দিয়ে থাকেন আপনারা ? অপর্ণার প্রশ্নে জড়তার লেশমাত্র নেই ।

শুনে গদ্য-রাজ্যে নেমে এলেন শুধু প্রযোজক নয়, মণিময় এবং আর যাঁরা উপস্থিত তাঁরা । একটু ইতস্তত করে দেশাই জবাব দিলেন, আর্টিস্ট বুঝে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজারও দিতে হয়, কিন্তু নতুন আর্টিস্টের বেলায় সে কথা ওঠে না । একজনকে ইশারা করলেন ফর্ম এগিয়ে দিতে ।

অপর্ণা ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, শুধু ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের কণ্ট্রাক্ট হবে ।

প্রযোজক নড়েচড়ে বসলেন, কেন ?

অন্য সকলের মুখে আশাভঙ্গের ছায়া ।

অপর্ণা জবাব দিল, এর সঙ্গে অভিনয়ের কোন সম্পর্ক নেই ।

তা নেই । প্রযোজক মিষ্টি করে বললেন, কিন্তু আপনি নতুন আর্টিস্ট সম্বন্ধে খবর নিয়ে দেখুন, বেশিই অফার করেছি আমরা ।

হতে পারে । আমার নতুন আসাটা কোন ডিসকোয়ালিফিকেশান কি না সেটা আপনাদের বিচার । ওই সব চেয়ে বেশি যাঁদের দাবি আমার অফার তাঁদের সমান রইল । মিউজিকের কণ্ট্রাক্ট-ফর্ম ফিল্-আপ করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন, সই করে দেব । আচ্ছা, নমস্কার ।

খানিকটা আসতে মণিময়ের আহ্বান শুনে ঘুরে দাঁড়াল অপর্ণা । হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে সে । যথার্থ ক্রুদ্ধ হয়েছে ।

এ কি ছেলেমানুষি করলেন বলুন তো ? আঘাতটা যেন তারই সব থেকে বেশি লেগেছে ।

কী ? অপর্ণা অস্ফুটকণ্ঠে ধমকে উঠল প্রায় ।

মণিময় থতমত খেয়ে গেল । বলছিলাম, আপনি প্লে করবেন না বলে দিলেই হত, মিছিমিছি এতক্ষণ—

অপর্ণা নিঃশব্দে দু'চার মুহূর্ত চেয়ে থাকে তার দিকে ।—আমি প্লে করব এমন আভাস কখনো দিয়েছি আপনাকে ?

মণিময় নিরুত্তর । হঠাৎ এই লোকটার প্রতিই কেমন যেন মায়া হল অপর্ণার । নরম করে বলল, তবে ওঁরা রাজী হলে আপত্তি নেই । চলতে শুরু করল নীরব ।

সেই কথাই তো বলছি, এবারে কথা বলতে ভরসা পেল মণিময় এমন ইম্‌পসিবল টার্মস্ আপনার, ওঁরা রাজী হবেন কি করে ? যা চাইলেন আপনি, শুনে আমি সুদ্ধু অবাক ।

অপর্ণা হাসল একটু । ওঁদের চাওয়াটাও কম নয় ।

কিন্তু ওঁরা তো নামাতে চান আপনাকে ?

নামাতেই তো চান । যাকগে, আপনি ফিরে যান, আমার তাড়া আছে একটু । সোজা গিয়ে গাড়িতে বসল অপর্ণা । মণিময় দাঁড়িয়ে ।

ব্যক্তিত্বের সুকঠিন আব্রু এবং রূপ-মর্যাদার প্রহেলিকার যে মায়াজালের সূচনা সেদিন, তার মোহ-পাশ থেকে সহজে মুক্ত হবেন এমন সবল নন চলচ্চিত্র প্রযোজক দেশাই । অভিনেত্রীর সঙ্গে দর কষাকষি অনেক করেছেন, অনেক দিয়েছেন দাবির সীমা ছাড়িয়ে । কিন্তু যেখানে তিনি মহাজন এবং দাতা । ব্যতিক্রম ঘটল এবার এবং ঘটল বলেই খুশি । এ ধরনের ব্যতিক্রম যাচাইয়ের কষ্টিপাথর । অপর্ণা পুরো নম্বর পেয়ে গেছে সেদিক থেকে । তাকে মূল্য দেওয়া ব্যর্থ হবে না কোন রকমে ।

এদিকে অপর্ণার দিন যাপনে পারম্পর্য নেই । ডাঃ চন্দ্র সমাদ্দারের ফ্যাক্টরি এবং ল্যাবরেটারির সুব্যবস্থায় অহর্নিশি ব্যতিব্যস্ত । কিছুদিনের মধ্যে দু'চারটে কথারও বিনিময় হয়নি অপর্ণার সঙ্গে । যদি কিছু বলেছেন তিনি, অপর্ণা শুনেছে চুপ করে । যদি কিছু চেয়েছেন, অপর্ণা হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছে নিঃশব্দে । কর্ম-ব্যস্ততায় তার থমথমে গাম্ভীর্যও চোখ এড়িয়ে গেছে চন্দ্রর ।

অপর্ণা নিজের থেকেই তফাতে থাকে যথাসম্ভব । কিন্তু মনটাকে তফাতে করে দেওয়া সম্ভব নয় । বিজ্ঞানের যে সিঁড়ি প্রস্তুত করতে সঙ্কল্প-বদ্ধ এঁরা, উত্তরকালে তারই কোন সুউচ্চ সোপানে যশোজ্জ্বল থাকবে আর এক নারীর নাম, সে অপর্ণা নয় । এঁদের সাধনার সঙ্গে লিপিবদ্ধ থাকবে যে নারীর একাগ্র সাধনা, সেও অপর্ণার এই জীবন-ব্যাপী বিক্ষোভ নয় ।

অথচ, দুর্বলতার সন্ধান রাখে মানুষটার ।

সময় অসময়ে দানব-পিপাসার সেই উচ্ছৃঙ্খল তাড়না । সেই মুহূর্তে দুই সবল বাহুর ক্ষিপ্ত নিষ্পেষণে নিঃশ্বাস রোধের ভীতিটা অহেতুক নয় অপর্ণার ।

তার প্রথম সন্তান...

ভাবতে পারে না ।

অথচ, এই মানুষটিরই মুখ উদ্ভাসিত হতে দেখেছে একটি মাত্র নারীর নামোল্লেখে । সেও অপর্ণা নয় । ঈর্ষা করে না । কিন্তু একটা দিনের জন্যও তার ডাক পড়ল না পাশে ।

সুসময়ে আবির্ভাব মণিময়ের । হাস্যোদ্ভাসিত । শুভ সংবাদ । প্রযোজক সম্মত আছেন, যেতে হবে কন্ট্রাক্ট সই করতে।

অপর্ণা শান্ত মুখে শুনল তার উচ্ছ্বাসের ইতিবৃত্ত ।—আমার টার্মস না সেদিন ইম্‌পসিবল্ বলে মনে হয়েছিল আপনার ?

মণিময়ের বিপর্যস্ত মুখমণ্ডল সুদৃশ্য ।—তাই তো মনে হয়েছিল, ব্যাটারা একদিনে এতটা ইম্‌প্রেসড্‌ হয়ে যাবে কি করে জানব ।

আবারও ঠাণ্ডা প্রশ্ন অপর্ণার ।—কি দেখে একদিনে এতটা ইমপ্রেসড্‌ হলেন তাঁরা ?

মণিময় সচেতন হল এবারে । ভালো করে কিছু বলা দরকার । উচ্ছ্বাস গেল । প্রায় নিস্পৃহ । বলল, সে জবাব তাদের কাছ থেকেই নেবেন, আমি খবরটা দিলাম শুধু । থামল একটু । ভাবল যেন একটু ।—কিন্তু দেখুন, সত্যিই যদি ভয় থাকে মনে, তাহলে থাক, লাইনটা ভালো নয় সত্যি কথাই । কিন্তু যাই করুন, এ নিয়ে আপনি আমাকে অপদস্থ করতে চান কেন--আমি ছোটাছুটি করি বলে ?

অপর্ণা হাসল, কেন করেন ছোটাছুটি ?

করি নিজের স্বার্থে, বেশ এবার থেকে সাবধান হব ।

অপর্ণা জোরেই হেসে ফেলল তার দিকে চেয়ে । হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল তাকে । বলল, বরং আর একটু বেশি অসাবধান হবেন, কিছু বলব না তাহলে । সিনেমা নিয়ে এমন মেতে গেছেন যে আমার গান শেখাও বন্ধ । রাগ হবে না ?

অব্যর্থ অস্ত্র । দুর্জ্ঞেয় নারী-চরিত্র বিশ্লেষণের আয়াস মণিময়ের চোখে ।

অপর্ণা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার বোনের বিয়ে কবে ?

মণিময়ের ভাবতে হল একটু । বোনের বিয়ে...তা, শীগগীরই হবে বোধহয় ।

অর্থাৎ, খোঁজও রাখেন না, বেশ মানুষ । আপনি গান করেন, বই লেখেন—এসবে সরমার উৎসাহ কেমন ? হাল্‌কা আলাপের আগ্রহ অপর্ণার ।

এতবড় একটা দায়িত্ব হাতে মণিময়ের, এ সময়ে ঘরোয়া কৌতূহল বিরক্তিকর । জবাব দিল, কেমিস্ট্রি বই পড়া আর অবিনাশের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর কিছুতে উৎসাহ নেই তার ।

অবিনাশবাবু আপনাদের আত্মীয় বুঝি ? নিরীহ বিস্ময় ।

আমার নয়, সরমার—কেমন আত্মীয় সেই জানে । নিজের রসিকতায় মণিময় হেসে উঠল নিজেই ।

বুঝলাম । অপর্ণা যোগ দিল তার হাসিতে—কিন্তু বিয়ের ব্যবস্থাটি আর একজনের সঙ্গে কেন ? অপরের ব্যাপারে এ ধরনের আগ্রহ খুব সুশোভন নয় উপলব্ধি করেই তাড়াতাড়ি বলল আবার, এমন একজন ভালো মেয়ে য়ুনিভার্সিটির, তাই জানতে ইচ্ছে করে ওঁর সম্বন্ধে ।

জ্যেষ্ঠোচিত গাম্ভীর্যে মণিময় ভাবল একটু । পরে জবাব দিল, হ্যাঁ—পরীক্ষাগুলোতে বরাবরই প্রথম হয়, বুদ্ধি কিছু আছে ।...অবিনাশের একে তো ওই চেহারা, তায় না আছে চালচুলো না আর কিছু । বিপিন চৌধুরী সুপাত্র সেদিক থেকে ।

অপর্ণা চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ । খুশি হবার কথা । সরমার সঙ্গে ভালো করে আলাপ হয় নি, তবু চোখে যতটুকু দেখেছে তার সম্বন্ধে আর পাঁচজনের মতো এ কথাই সত্যি বলে মনে হয় না ।

মণিময় তাড়া দিল, আমাকে আবার যেতে হবে...আপনি কি করবেন ঠিক করে ফেলুন ।

অপর্ণা আত্মস্থ হল যেন ।—কি আবার করব, যাব । বসুন, আসছি ।

উঠে ওপরে এলো । আলমারি খুলে শাড়িগুলির ওপর অন্যমনস্কের মতো চোখ বুলিয়ে

গেল একবার। প্রিয়জন ছেড়ে বহুদূরে কোথাও যাবার আগের একটা অনুভূতির মতো নিরুৎসাহ ঔদাসীন্যে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

সচেতন হল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে। চন্দ্র ফিরলেন। গভীর মনোনিবেশে শাড়ি বাছাই চলল অপর্ণার।

মণিময়বাবু নিচে বসে আছেন...ও, বেরুচ্ছ নাকি ?

অপর্ণা একবার ফিরে তাকালো শুধু, জবাব দিল না। শাড়ি নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। প্রসাধন শেষ করে দাঁড়াল আয়নার সামনে। রোষদৃপ্তা ইন্দ্রাণীর রূপসজ্জা। টক্‌টকে লাল শাড়ির আভায় রক্তিম দেখাচ্ছে মুখ।

চন্দ্রর সামনে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, চাবিটা রাখো।

চন্দ্র চাবি নিলেন। দেখলেন তাকে।—শোনো।

অপর্ণা ফিরে দাঁড়াল।

চন্দ্র ডেকে ফেলেছেন এই পর্যন্ত। মুগ্ধ চোখ দু'টো নিজের অজ্ঞাতে তার সর্বদেহে বিচরণ করল একবার। বললেন, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে, কোথায় যাচ্ছ ?

ক্ষণিকের দুর্বলতা সামলে নিল অপর্ণা।—এসে বলব।

মণিময়ের বিরক্তি বাড়ছে ক্রমশ। বসিয়ে রাখারও সীমা আছে একটা। কথার ছলে আজই জানিয়ে দেবে, সময়ের দাম তারও কম নয়।

চলুন--

রূঢ় পরিকল্পনা অতলে নিমজ্জিত। বদলে, আত্মবিস্মৃত চোখের বিমূঢ় অর্ঘ্য নিবেদন। স্থান কাল ভুল হয়ে গেল মণিময়ের।

অপর্ণা হেসে ফেলল, দেখছেন কি, আসুন—?

হ্যাঁ, চলুন। মনে মনে ভাবল মণিময়, চল্লিশ হাজার ছেড়ে এর চারগুণে রাজী হওয়াও আশ্চর্য নয় প্রযোজকের।

চন্দ্র বই পড়ছিলেন। ঠিক পড়ছিলেন না, বসে ছিলেন বই নিয়ে। বিকেল গেল, সন্ধ্যা পেরুলো, রাত হল। ভালো লাগছে না। মন বসছে না বইএ। একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি যেন থিতিয়ে আছে সেই থেকে। অপর্ণা যাওয়ার পর থেকেই। ঘুরে ফিরে বার বার তার কথাই ভাবছেন। ভাবছেন না ঠিক, মনে পড়ছে তাকে। তার ওই চোখ-ধাঁধানো লাল পোশাক যেন লাল নিশানার মতো কিছু। আশঙ্কার আভাসের মতো। খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু সে চলে যাবার পরে মনে হয়েছে, প্রায় নির্দয় রকমের সুন্দর দেখাচ্ছিল যেন।

বই হাতে বিগত ক'টা দিনের কথা ভাবতে চেষ্টা করছেন। মনে পড়ার মতো কিছু মনে পড়ছে না।...লক্ষ্য করেননি বলেই বোধহয়। লক্ষ্য করলে চোখে হয়তো পড়ত কিছু। এই লক্ষ্য না করাটাও অপর্ণা আগে বরদাস্ত করত না...। দ্বিগুণ রাগত। কিন্তু সম্প্রতি কোন প্রতিবাদ নেই ওর দিক থেকে। কোনো রাগ না, অভিমান না।

আজ সে বেরিয়ে যাবার পর থেকে ওর এই কঠিন বিচ্ছিন্নতাটুকুই যেন ঘুরে ফিরে বার বার উপলব্ধি করছেন চন্দ্র।

চাকরটা মাঝে-মধ্যে এসে ঘুরে যাচ্ছে। কর্ত্রী বাড়ি নেই। যদি কিছুর প্রয়োজন হয়।

এবারেও অস্পষ্ট পায়ের শব্দে চন্দ্র ভাবলেন, সে-ই। মুখ না তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, মাইজি আয়া?

সাড়া না পেয়ে মুখ তুললেন, ও তুমি—এত রাত হল?

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল অপর্ণা। আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকল। কাছে এলো। গাঢ় রক্তিম সাজের লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। নিরাসক্ত মুখে পাল্টা প্রশ্ন করল, কেন, ভাবছিলে নাকি?

ভাবব না? মুচকি হেসে চন্দ্র বই সরিয়ে রাখলেন।

অপর্ণা স্থির গম্ভীর। বলল, একটা কথা আছে।

চন্দ্র নীরবে তাকালেন। ক্ষণকালের বিভ্রম। ওর লাল সজ্জায় এখন মনে হচ্ছে, সারা গায়ে যেন আগুন লেগেছে।

আমি সিনেমায় নামছি। তোমার আপত্তি হবে।

ঘোরের ঘোর কেটে গেল। বিমূঢ়ের মতো চেয়ে থাকেন চন্দ্র। বাহ্যজ্ঞান-রহিত।

একটু অপেক্ষা করে অপর্ণা স্পষ্ট, মৃদু-কঠিন কণ্ঠে বলল আবার, অবাক হচ্ছ কেন, তোমার সাধনায় আমি তো আনন্দ কিছু পাইনে—যাতে পাই সে চেষ্টাও করোনি কখনো। অথচ কিছু একটা চাই আমার, তুমি বাধা দেবে?

পায়ের নিচে মাটি দুলছে। নিশ্চেতন মূর্তির মতো চন্দ্র চেয়ে আছেন তেমনি।

জবাব দাও।

বিমূঢ় চোখে চেয়ে দেখছেন চন্দ্র। সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। নির্মল সুন্দর। সচেতন হলেন একটু একটু করে। অস্ফুট স্বরে বললেন, বাধা দিলে আটকানো যাবে তোমাকে?

না। একটি মাত্র শব্দে আপসের ক্ষীণ আশাটুকুও যেন নির্মূল করে ফেলল অপর্ণা।

স্তব্ধ, নীরব, কতকগুলি মুহূর্ত। বেদনার রেখাগুলি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল চন্দ্রর মুখ থেকে। বললেন, কারো ইচ্ছেয় বাধা দেওয়া আমার স্বভাব নয় অপর্ণা। সত্যিই এই চাও তুমি।

হ্যাঁ।

বেশ। আমাকেও তুমি হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলে, ভুলো না।

অপর্ণা চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়াল।—মানে?

নিরুত্তরে বই তুলে নিলেন চন্দ্র।

কিন্তু হবে কেন বই পড়া। থাকল পড়ে বই। থাকল পড়ে বিজ্ঞানের দুরূহ সমস্যা। মনের বিজ্ঞান বিপর্যস্ত। চন্দ্র আরাম-কেদারায় শুয়ে পড়লেন। আবার উঠলেন, আবার বসলেন। অশান্ত পায়ে ঘরময় ঘুরে বেড়ালেন বারকতক।

খাটের ওপর চুপ করে বসে আছে অপর্ণা। ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চন্দ্র কাছে এলেন। বসলেন পাশে। মাঝখানে দুস্তর বাধার মতো।

অপর্ণা তাকালো তাঁর দিকে। স্থির, তীক্ষ্ণ। কিন্তু অচিরে দু'চোখ সজল হল নিজের অজ্ঞাতে। যে মানুষটির এতটুকু অনুরাগে সিক্ত হতে পাবে ওর সমস্ত জীবন, তাঁর তাপদগ্ধ হৃদয়ের স্পর্শ লাগল বুকের মধ্যে নির্ভুল পাঠ করে নিল সব না-বলা কথা! কন্ট্রাক্ট সই করে আসার পর থেকে একটা অতিবড় আশ্রয়চ্যুতির অনুভূতি উতলা করে তুলেছিল

এতক্ষণ। কি করে যেন বুঝল, ওই প্রশস্ত বুকে আশ্রয় তার বাঁধাই আছে। খুব কাছে এসে একখানি হাত রাখল তাঁর হাতে। ধরা গলায় বলল, আমার জন্যে ভেব না কিছু।

সহসা যেন সচেতন হয়ে চন্দ্র দুই বাহুর নিবিড় বন্ধনে বেষ্টন করে রাখলেন তাকে। সার্থক হয়েছে অপর্ণার কন্ট্রাক্ট সই করে আসা।

॥ ৯ ॥

বিয়ে হয়ে গেল সরমার। ছোটখাটো কয়েকটা মতামত লঙ্ঘন করতে হয়েছে। যেমন, চারুদেবী রাজী নন রেজিস্ট্রি ম্যারেজএ। কাগজে কলমে আবার বিয়ে কি বাপু? ধূপধূনো নেই, যাগযজ্ঞ নেই, অনাসৃষ্টির দেশে আছি বলে যা খুশি তাই হবে।

কিন্তু কাগজে কলমেই হল বিয়ে। শোরগোল তুলে কোন উৎসবের উপলক্ষ হতে রাজী নয় সরমা। বাধা কোথায় এ যদি নিজের মনে উপলব্ধি করেও থাকে, প্রকাশ করা গেল না বিপিনের কাছেও। তার জিদ দেখে সে বিস্মিত, মুখ গম্ভীর চারুদেবীর—তবু এ নিয়ে আর জোর করল না কেউ।

কিন্তু শেয়ার বাজারের পদস্থ মানুষ বিপিন চৌধুরী জীবনের এতবড় শুভকর্ম চুপচাপ ঘরে বসে সারবে, এটা সম্ভব নয়। ইচ্ছেও নয়। শীঘ্রই আত্মীয়-পরিজন এবং বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করে পরিপূর্ণ এক উৎসবের আয়োজনে মেতে গেল সে। গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে নিমন্ত্রণ-পর্বটা নিজেই সমাধা করল। তারপর মনে পড়ল একজনের কথা।

সরমা, অবিনাশবাবুকে তো বলা হল না?

এই ভয়টাই ছিল মনে মনে। নিস্পৃহ জবাব দিল, থাকগে—।

থাকগে কি! তাঁর সুপারিশ না হলে, যাক—তুমি বলে আসবে না আমি যাব?

সরমা হেসে বলল, কাউকে যেতে হবে না এমনিতেই রোগা শরীর, বারোমাস অসুখে ভোগে, দাদাকে বলেছ?

হ্যাঁ। ওর মুখের দিকে চেয়ে কিছু যেন বুঝতে চেষ্টা করছে বিপিন।

মাস্টারমশাই আর তাঁর স্ত্রী?

বলেছি।

বিপিন চলে গেল সেখান থেকে। সরমা দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। অবিনাশকে বাদ দেওয়ার এ যুক্তিটা সে সহজ মনে গ্রহণ করল না বুঝেও। নতুন জীবনের সূচনায় কোন অসন্তোষের ছায়া ফেলতে চায় না! কিন্তু এই উপলক্ষে অবিনাশকেও ভদ্রতাপাশে আবদ্ধ করে টেনে আনতে মন সায় দিল না কিছুতে।

মন্টু এদিকে এসেছিল, চুপি চুপি তার দরজা অতিক্রম করে সরে পড়ছে। সরমা তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ডাকল, এই দাঁড়াও!

কাছে গিয়ে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে। জোর করে বিছানায় বসিয়ে দিল।

বড় যে পালিয়ে বেড়াচ্ছো দু'দিন ধরে?

মন্টুর লজ্জা কাটেনি তখনো।—পালাব কেন, কাজ ছিল।

কাজ ছিল ? আচ্ছা, মুখ তোলো ।

মণ্টু তাকালো জিজ্ঞাসু নেত্রে ।

চেয়ে থাকো যতক্ষণ খুশি, কিছু বলব না ।

হেসে ফেলে মণ্টু । এবার সহজ মুখে ফিরে ঠাট্টা করল, দাদা লাঠি নিয়ে আসবে ।

সরমা হেসে উঠল, এই ভয়ে পাচ্ছো না ?—আচ্ছা, দাদাকে বলে দেব'খন এটি দু'নম্বর আমার ।

যান্—

একেবারে দোতলায় এসে উঠেছি, যান বললেই আর যাই । হাসছে সরমা, ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেল ?

মণ্টু ঘাড় নাড়ল ।

দিলে কেমন ?

জবাব না পেয়ে বলল, আচ্ছা থাক, এসব অপ্রিয় কথা এখন তুলব না, পরে মাস্টারি তো আছেই—।

আমি আর পড়বই না আপনার কাছে ।

দেখা যাবে । আপনি ছেড়ে তুমি বলতে শুরু করো, অভ্যাস হোক—তা'বলে বৌদি বলা বাদ দিও না আবার ।

ধেৎ ! এবার যথার্থ লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়াল মণ্টু । চারুদেবী এলেন । সরমা মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে দিয়ে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল ।—এবার কিন্তু ছাত্রের কানমলে দিলেও চলে যাবার কথা বলতে পাবেন না কাকীমা ।

কি এক অশুভক্ষণে চারুদেবী ওকে প্রথম দেখেছেন এখানে । তার ওপরে দলিলপত্রে বিয়ে । বললেন, তা কি পারি, তোমাদের অনুগ্রহের ওপর ভরসা করেই তো চলা এখন ।

সরমা একেবারে চুপ । হাসি মিলিয়ে গেল মণ্টুর মুখ থেকেও । রাজ্যের বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকালো মায়ের দিকে । চারুদেবী বক্র কটাক্ষে একবার দু'জনকেই নিরীক্ষণ করে যেন ঘরের দেয়ালের উদ্দেশেই বললেন, বিপিন কোথায়, সন্ধ্যেই এই কাজ আর সে হুট-হুট করে বেড়াচ্ছে সকাল থেকে ।

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন ।

নিজের মা বলেই বোধ করি মণ্টুর লজ্জা আরো বেশি । বলল, মা ওই রকমই বৌদি, কথার মাথামুণ্ডু নেই—

সরমা সামলে নিয়েছে । মণ্টুর বিপন্ন মুখভাব লক্ষ্য করে বলল, দু'দিনেই খাতির করে নেব'খন, ভেবো না ।

অবিনাশের ঘরের দরজায় তালা আটকানো । তবু কি ভেবে বিপিন জানলার শার্সি টেনে উঁকি দিল ঘরের মধ্যে । পকেট থেকে নিমন্ত্রণ-পত্র বের করে নাম লিখল । পরে তার এক ধারে লিখে দিল, নিজে এসেছিল কিন্তু দেখা হল না—সন্ধ্যায় অবশ্য যেন আসে, বিশেষ অনুরোধ ।

শার্সির ফাঁক দিয়ে কার্ড ফেলে দিল । বাড়ি ফিরে এ সম্বন্ধে সরমাকে বলল না কিছু ।

অবিনাশ কাজে বেরিয়েছিল । ফিরে আসতে দুপুর গড়িয়ে গেল । ঘরের জানলা খুলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল । এটা অভ্যাস ।

একটা দুর্ভাবনা ছিল । আজকের পার্টির খবর মণিময়ের মুখে শুনেছে ! তারও টানাহেঁচড়া পড়বে হয়তো । যেতে হবে, হাসতে হবে, আনন্দ করতে হবে ।...তা'ছাড়া বড়লোকের বাড়ির অভিজাত সমাবেশে বেমানান লাগবে নিজেকে । কিন্তু অন্য তরফের সাড়াশব্দ না পেয়ে খুশি । মনে মনে কৃতজ্ঞ রইল সরমার কাছে ।

বিপিনের কার্ড শিয়রের কাছে মাটিতেই পড়ে ।

ভারী ইচ্ছে হল অবিনাশের, আজকের দিনে একটা উপহার পাঠায় সরমাকে । বাজারে কেনা লোক-দেখানো উপহার নয় । অন্য কিছু । কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দিল ইচ্ছেটা । আজ অন্তত নয়, পরে ভেবে দেখা যাবে ।

দরজায় কড়া নাড়র শব্দে সচকিত হল ।

ডাঃ চন্দ্র । ধুতি পাঞ্জাবি চাদর, এ বেশে কখনো দেখেনি তাঁকে । সোল্লাসে উঠে বসল ।

মাস্টারমশাই ! আসুন আসুন, এই—কোথায়ই বা বসাই আপনাকে—আচ্ছা এইখানে বসুন । বিছানার চাদরের একটা দিক ঝেড়ে টান করে দিল ।

মৃদু হেসে বসলেন তিনি । ঘড়ি দেখে বললেন, পাঁচটায় পার্টি বিপিনের, সময়মতো পৌঁছুতে হবে । কি করছিলে ?

খুশি ধরে না অবিনাশের । তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, বিজ্ঞাপনের নতুন অর্ডার এনেছি, দামী অর্ডার—ভাবছিলাম নক্সাটা হবে কেমন । আর, আপনি কি না আজই এলেন আমার মধ্যে আর কোন নক্সার আঁকি-বুঁকি চলছে কিনা দেখতে ! থামল একটু । উৎফুল্ল দুই চোখ তাঁর মুখের ওপর সন্নিবদ্ধ ।—আপনাদের নতুন স্কীম কতদূর, কেমিকাল-কাম রিসার্চ ল্যাবরেটারি ?

চন্দ্র ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, কাজ শুরু হবে শিগগীরই ।

পাবলিসিটির দরকার নেই ? আমাকে দেবেন এঁকে দেব, চার্জ অবশ্য বেশিই হ...

অল্প একটু হাসলেন তিনি ।

অবিনাশ এতক্ষণে লক্ষ্য করল, কোথায় যেন ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে । চকিতে একটা সন্দেহ জাগে মনে । কিন্তু কিছু না বলে চুপ করেই রইল । তখনো জানে না কি জন্যে এঁর এই অপ্রত্যাশিত আগমন ।

ক্ষণকাল নীরব থেকে চন্দ্র বললেন, আচ্ছা অবিনাশ, একটা কথা তোমার মনে আছে —গত বারের বড় অসুখটা সবে সেরেছে তোমার, আমাকে শুনিয়ে তুমি সরমাকে বললে, বন্ধুত্ব সম্পর্কটা চলতে পারে তোমার সঙ্গে ?

অবিনাশ জিজ্ঞাসু নেত্রে ঘাড় নাড়ল ।

শান্ত মুখে চন্দ্র বললেন, ছাত্রর মুখে সেদিন কথাটা শুনতে খুব ভালো লাগেনি প্রথম, কিন্তু মনের কোথাও লেগেছিল নিশ্চয় । তারপর থেকে নিজেও বুঝেছ সেটা । কিন্তু গোড়াতেই যা তুমি শুনিয়ে দিলে, লজ্জা পেয়ে গেছি । মনে মনে আজ কিছু আঁকছ কি না, আর পাঁচজনের মতো সাধারণ কৌতূহল নিয়ে সেটাই আমি দেখতে আসতে পারি ?

স্বল্প-ভাষী মানুষটির মুখে গভীর কথাগুলি শুনে যথার্থ লজ্জা পেল অবিনাশ ।—আমার

অন্যায় হয়েছে মাস্টারমশাই ।

অপরের বেলায় অন্যায় হয়েছে বলতুম না । চন্দ্র হাসলেন একটু, আজ সকাল থেকে বার বার মনে পড়ছিল তোমাকে, এসে পড়েছি ।

দু'জনেই চুপচাপ কিছুক্ষণ । তাঁর দিকে চেয়ে একটা দ্বন্দ্ব আবারো স্পষ্ট ধরা পড়ে অবিনাশের চোখে । দ্বিধা কাটিয়ে বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মাস্টারমশাই ?

তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন ।

বৌদিরও নিমন্ত্রণ ছিল তো আজ ?

ছিল, কাজে আটকে গেছেন । কেন ?

একটু হেসে অবিনাশ বলল, থাকগে, এটাই জিজ্ঞাস্য নয় ঠিক ।...কিছুদিন আগে খবরের কাগজে তাঁর ছবি দেখলাম এক সিনেমা কোম্পানির বিজ্ঞাপনে । ব্যাপারটা আপনার সম্পূর্ণ অমতেই হয়েছে নিশ্চয় ?

হঠাৎ যেন বিব্রত বোধ করতে লাগলেন চন্দ্র । সহজ ভাবটুকু মিলিয়ে গেল । ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, এসব কথা আজ থাক্ অবিনাশ ।

থাক্ । বলল বটে, কিন্তু জবাবের হাত থেকে অত সহজে রেহাই দিল না ভদ্রলোকটিকে । দ্বিধান্বিত কৈফিয়তের সুরে বলল, একটু আগে বলছিলেন, অবিনাশ আর শুধু ছাত্রই নয় আপনার, তাই ভাবলুম তুলতে পারি কথাটা, মন হাল্‌কা হবে আপনার ।

চন্দ্র সোজাসুজি খানিক চেয়ে রইলেন তার দিকে । পরে হেসে ফেললেন ।—আমি শুধু ভাবি অবিনাশ, তুমি কি করে ফেল করলে বছরের পর বছর ।—না, আমি তাঁকে বাধা দিই নি ।

কেন দিলেন না ?

লাভ হত না ।

আরো কিছু বলার মুখেও থেমে গেলেন যেন । সকাল থেকেই আজ অবিনাশের প্রতি মন টানছিল কেমন । সেটা নিজের কারণে নয় ওরই জন্য । তাই আসা । কিন্তু উল্টে নিজেরই প্রসঙ্গ নিয়ে এভাবে টান পড়তে বিব্রত বোধ করতে লাগলেন ।

অবিনাশ অনুভব করে, মানুষটি বাইরে যত শক্ত-সমর্থ হোন ভিতরে ততোখানিই দুর্বল । বলল, ভদ্রঘরের মেয়েরা তো হামেশাই নামছে আজকাল ছবিতে, এ নিয়ে দুর্ভাবনা কেন মাস্টারমশাই ।

মৃদু হেসে তিনি জবাব দিলেন, এই জন্যেই তো আজকের দিনটিতে এলাম তোমাকে দেখতে, যদি কিছু শিখতে পারি ।

অবিনাশ লজ্জা পেয়ে গেল ! একটু বাদে বলল, আমার ওপর আপনার স্নেহ যত বাড়ছে সরমার ওপর রাগও হচ্ছে ততটাই, না মাস্টারমশাই ?

চট করে জবাব দিয়ে উঠতে পারলেন না চন্দ্র । পরে আস্তে আস্তে বললেন, রাগ কি না জানি নে ।...তোমার রূপ নেই, স্বাস্থ্য নেই, কিন্তু যা আছে তার দাম কেন দিতে পারল না সরমাও, ভেবে পাইনে ।

আর কি আছে, টাকাও তো নেই ।

না তাও নেই ।

অবিনাশ হেসে ফেলল, আমিও ভাবি মাস্টারমশাই, এতবড় বিজ্ঞানী আপনি কি করে হলেন । এমন অবিচারই যদি নিজের ওপর করত সরমা, শুধুই যে আদর্শের বোঝা হয়ে উঠত আমার কাছে, রক্ত-মাংসের মানুষ বলে কোনদিন কি ভালোবাসতে পারতুম । নীরব স্বল্পক্ষণ ।—আমাকে নিয়ে নিজের সঙ্গে ওর সেই দ্বন্দ্বের কথা মনে হলে যেমন হাসি পায়, ভালোও লাগে তেমনি ।...কোনদিন ও এতটুকু ছলনা যে করেনি এইটেই বড় কথা মাস্টারমশাই ।

চন্দ্র নিঃশব্দে দেখছেন শুধু । মনে পড়ল, ওর রোগশয্যায় সরমা একদিন দুধ খাওয়া নিয়ে রাগ করে বলেছিল, সমস্ত শরীরের মধ্যে আছে তো দুটো চোখ । তার দিকে চেয়ে কথাটা হঠাৎ নতুন করে অনুভব করলেন যেন ।

উঠে দাঁড়ালেন ।—এবার যেতে হবে। তুমি...?

অবিনাশ মুচকি হেসে ক্ষুদ্র জবাব দিল, না—! চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি খানিকটা ।

আধুনিক রুচি মাফিক পার্টি । ইঙ্গ-বঙ্গ এমন কি পশ্চিমি গোঁজামিলও চোখে পড়ে । অভ্যাগতদের বেশিরভাগ শেয়ার বাজারের অন্তরঙ্গ সুহৃদবৃন্দ । সহকারী ঘনশ্যামবাবুও উপস্থিত । মন্টুর বন্ধু-বান্ধবদের সংখ্যাও নগণ্য নয় । আতিথ্যের ত্রুটি নেই । স্বয়ং বিপিন চৌধুরী শশব্যস্তে তদারক করে বেড়াচ্ছে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত ।

মিসেসকে নিয়ে এলেন না মিঃ পারেখ, ভারী অন্যায় কিন্তু—

রাম রাম শেঠজি, বহুৎ মেহেরবানি—

বুলু কখন এলে, কাকীমার সঙ্গে দেখা করেছ তো ? বউ—? ওই তো, যাও না—

নমস্কার মিসেস্ আইচ, মিঃ আইচকে সাবধান করে দিয়েছি, স্পেকুলেশানে মার যদি খাই তল্পিতল্পা গুটিয়ে সন্ন্যাসী হব—

এই যে ভাই, মন্টু ওদিকে—

হিসেবী মানুষ ঘনশ্যামবাবু নির্বাক । যা উড়নচণ্ডে স্বভাব, কোনদিন না তাঁকে সুদ্ধ...

মন্টু একে একে তার বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিল সরমার সঙ্গে । হাসিখুশি দেখে মনে হবে তারই বিশেষ দিন । সরমা এক ফাঁকে ওকে কাছে ডেকে ঠাট্টাও করল এ নিয়ে । কিন্তু ভিতরটা হাঁপিয়ে উঠছে কেমন । অবিনাশের জন্য দুশ্চিন্তা ছিল, এ পরিবেশে এখন নিজেরই অস্বস্তি লাগছে যেন । নিজের কেউ বলতে মণিময় পর্যন্ত আসেনি তখনো ।

হঠাৎ দরজার দিকে চোখ পড়তে স্মিতহাস্যে উঠে দাঁড়াল । আগন্তুক ডাঃ চন্দ্র । কাছে এসে সরমা পা ছুঁয়ে প্রণাম করল । জিজ্ঞাসা করল, বৌদি এলেন না ?

জবাব দেবার আগেই ওধার থেকে বিপিন ছুটে এলো হন্তদন্ত হয়ে ।—এতক্ষণে সময় হল মোহিনীদার । আমার ভয় হচ্ছিল গবেষণায় ডুব দিয়ে হয়তো ভুলেই গেলে সব । বৌদি কই ?

চন্দ্র বললেন, তিনি আসতে পারলেন না...বেশি দেরি হয়ে গেল আমার ?

না, কিন্তু বৌদি আসতে পারলেন না মানে ? আরো কি বলতে যাচ্ছিল বিপিন, থেমে গেল । অপর্ণার ছায়াচিত্রে যোগদানের খবর তাদেরও অবিদিত নয় । চন্দ্রর দিকে চেয়ে

সঙ্কোচ অনুভব করল কেমন । বলল, আচ্ছা পরে বোঝাপড়া হবে বৌদির সঙ্গে—সরমা, মোহিনীদাকে তোমার কাছে নিয়ে বসাও, ইনিও আর কাউকে চেনেন না এখানে, তুমিও না ।

হেসে বিপিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চ-কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করলেন চন্দ্র, সে কি হে, চেনাশুনাটাও করে নিতে পারনি এখনো !

বিপিন সহাস্যে আর একদিকে চলে গেল । ঠাট্টাটুকু কানে গেছে সরমার । মুখে রং লাগল একপ্রস্থ । চন্দ্র আসন নিলেন ।

অদূরে উপহার সাজানো টেবিলটা চোখে পড়তে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে ছোট গহনার কেস্ বার করলেন একটা । সরমার দিকে এগিয়ে দিলেন ।—অপর্ণার বদলে আমাকেই নিয়ে আসতে হল এটা ।

অনেকটা সহজ মুখে হাল্কা আপত্তি জানাল সরমা, ও আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান, তাঁর হাত থেকে নেব ।

হাসলেন তিনি, দেখা হলে লজ্জা দিও, ধরো—।

সরমা হাসিমুখে বাক্সটা নিয়ে ভিতরের বস্তুটি দেখল একবার । পরে সেটা হাতে রেখেই জিজ্ঞাসা করল, সায়েন্স কলেজ ছেড়ে দিচ্ছেন তো আপনি ?

হ্যাঁ—

ডাঃ সমাদ্দারের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম ।

চন্দ্র বললেন, সব জানি, কিন্তু আজ কোন কাজের কথা নয় । এমনিতেই যথেষ্ট দুর্নাম আছে, তার ওপর আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিপিন খোঁচা দিয়ে রেখেছে ।

মনের গুমোট ভাবটুকু কেটে গেছে তাঁর । কথার ফাঁকে ফাঁকে সরমাকে দেখছেন । অনুসন্ধিৎসু কৌতূহল চোখে । কিন্তু না । অবিনাশ বলে কাউকে সে চেনে এমনও মনে হল না ।

উৎফুল্লমুখে বিপিন মণিময়ের বাহু বেষ্টন করে একপ্রকার টনতে টানতেই নিয়ে এলো এদিকে ।—বসুন বোনের কাছে, আপনি বিশেষ লোক আজ, আর আপনারই দেরি !

তাকে ছেড়ে দিয়ে আবার ছুটল সে । সরমা ঈষৎ হেসে তাকালো অগ্রজের দিকে । সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, সম্মুখের মানুষটিকে দেখামাত্র মণিময় আড়ষ্ট, নিষ্প্রভ । ডাঃ চন্দ্রও ইচ্ছে করেই চেয়ে আছেন আর এক দিকে, যেন কোন আগন্তুককে লক্ষ্যই করেন নি ।

শুকনো হেসে মণিময় কুশল প্রশ্ন করল, কি রে কেমন আছিস ?

হঠাৎ একটা সন্দেহ জাগে সরমার মনে । অপর্ণার চলচ্চিত্র অভিযান রহস্য দুর্বোধ্য নয় আর । তাকে গান শেখানোর প্রসঙ্গে সেদিনের ঠাট্টার ফলে মণিময়ের উগ্র মূর্তিও চকিতে মনে পড়ে যায় । তিক্ত একটা অনুভূতি যেন সম্পূর্ণ আড়ষ্ট করে ফেলল তাকেও । মৃদু গলায় শুধু বলল, বোসো—।

কতকগুলি ছোট ছোট সংঘাত, ছোট ছোট যোগাযোগ । হয়তো তাদের ভিত্তি নেই কিছু, তাৎপর্য নেই কোন সুস্থ বুদ্ধির বিবেচনায় । তবু অতি সহজে এগুলো পারে মানুষের জীবন-ধারা বিপর্যস্ত করে ফেলতে । বিচিত্র সংমিশ্রণে গড়া এই মন আত্মিক শক্তিকে তাড়িয়ে

নিয়ে বেড়ায় শেকল-ছেঁড়া খ্যাপার মতো, যার না আছে অর্থ, না কিছু।

বিপিনকে নিমন্ত্রণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অপর্ণা। কিন্তু স্টুডিওতে এসে দেখে, যে সেটিংএর ব্যবস্থা সেদিন, সন্ধ্যার আগে ছাড়া পাবে না। সাত পাঁচ ভেবে চন্দ্রকে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিল ড্রাইভারের হাতে।—ফিরতে দেরি হবার সম্ভাবনা, অপেক্ষা করার দরকার নেই।

কিন্তু ওপরওলার অভিপ্রায় অন্যরকম। দেখা গেল কিছু 'শট্' স্থগিত থাকায় অন্যদিন অপেক্ষা সেদিনের কাজ আগেই শেষ।

চিঠি রেখে চন্দ্র গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। অপর্ণা ঊর্ধ্বশ্বাসে রওনা হল বাড়ির দিকে। নির্দিষ্ট সময়ের আগে পৌঁছেও সাক্ষাৎ হল না। চন্দ্র বেরিয়ে গেছেন। বিরক্তিতে ভরে গেল মনটা। চুপ করে বসে ভাবল খানিকক্ষণ।

টেবিলের ওপর বিপিনের নিমন্ত্রণের কার্ড পড়ে আছে। বাড়ির ঠিকানা নোট করে আবার বেরিয়ে পড়ল গাড়ি নিয়ে।

সেদিনের সেই রাতে যার যার গুরুভার নিয়ে অতি কাছাকাছি এসে পড়েছিল যে দু'জন, প্রাণের বিনিময় হয়তো ছিল তাতে। চন্দ্রর আশা ছিল, সঙ্কল্প ত্যাগ করবে অপর্ণা। কিন্তু যে প্ররোচনায় অপর্ণার তরফ থেকে মণিময়ের প্রথম আমন্ত্রণ এ বাড়িতে, চিত্রাভিনয়ের পরিকল্পনা তারই পরের ধাপ। সেই রাতের প্রাণের স্পর্শে তারা যদি উপলব্ধি করেও থাকে কিছু, মনের গতি চিরকালই জটিল পথে।

কিন্তু সুরা পান নিয়ে ছলনা চলে, পানের পরে নয়। অমোঘ প্রতিক্রিয়া আছে ও বস্তুর। অপর্ণা প্রথম কিছুদিন অভিনয় সম্পন্ন করেছে সকৌতুক আগ্রহে। কিন্তু অচিরে কখন অন্তর স্পর্শ করে এ প্রহসন। ভাঙন ধরে খেলার আবরণে। অনাস্বাদিত শিহরণ লাগে প্রতি অঙ্গে। মদিরোচ্ছল পূর্ণতায় ভরে যায় দেহ মন।

অভিনয়ের ফাঁকি গেল।

ড্রাইভার, রোখো রোখো—। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে গাড়ি থামতে নির্দেশ দিল অপর্ণা।

পাশ দেবার জন্য যে লোকটা সরে দাঁড়িয়েছে একধারে সে অবিনাশ। অপর্ণা ডাকল।

অবিনাশ একটা কিছু ভাবছিল হয়তো, শুনতে পেল না। চন্দ্রকে বিদায় দিয়েছে একটু আগে, এরই মধ্যে আর এক বিস্ময়কর যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত ছিল না। চলতে শুরু করল।

গাড়িটা আবারও এসে থামল পাশে। অবিনাশ থমকে দাঁড়াল।—কি আশ্চর্য, আপনি!

দেখুন ঠিক কি না, যেভাবে পথ চলেন গাড়ি চাপা পড়বেন যে!

কাছে এসে দরজা ধরে দাঁড়াল অবিনাশ। হেসে বলল, এ রকম গাড়ি চাপা পড়লে দুঃখ হবে না খুব, চাই কি কাগজে ছবি উঠে যেতে পারে।...কিন্তু আপনি কি কাজে আটকে গেছেন শুনলাম?

আমি! ও, হ্যাঁ...কোথায় শুনলেন? জিজ্ঞাসু দুই চোখ তার মুখের ওপর রাখল অপর্ণা।

উৎফুল্ল মুখে অবিনাশ জবাব দিল, তাই তো ভাবছিলাম কার মুখ দেখে ঘুম ভাঙলো আজ, বলা নেই কওয়া নেই মাস্টারমশাই সশরীরে উপস্থিত আমার ভাঙা কুঁড়েয়, আধ-ঘন্টা না যেতে আবার আপনার সঙ্গে দেখা এতবড় পথে! দিনটা ভালো যাবে মনে হচ্ছে।

একটা জিজ্ঞাসা রেখাপাত করে অপর্ণার মনে ।...মানুষটা অবহেলার নয় আগেও জানতো ।

গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে ডাকল, আসুন তাহলে—

কোথায় ? অবিনাশ ভড়কে গেল প্রায় ।

শুধু দেখায় কি আর দিন ভালো যায় । ও কি ! আপনারও আবার লজ্জা আছে নাকি ? আসুন—

মনে মনে বিব্রত হলেও বেশ যেন আহত হয়েছে এমনি মুখ করে অবিনাশ বলল, এমন কি আচরণ করলাম বৌদি যে ধরে নিলেন মানুষটা একেবারে নির্লজ্জ আমি । থামল একটু, কিন্তু সত্যিই যাচ্ছেন কোথায় ?

অপর্ণা এবারেও সোজাসুজি নিরীক্ষণ করল তাকে । দু'চার মুহূর্ত । তারপর জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার কোথাও যাবার কথা নেই এখন ?

অবিনাশ হাসল । যেমন হেসেছিল চন্দ্রর সামনে । কিন্তু অপর্ণার জিজ্ঞাসা আরো স্পষ্ট । এবং আর একটু নির্দয়ও যেন । অন্তত সেই রকমই মনে হল অবিনাশের । তাই হাসিটা একরকম হলেও জবাবটা একরকম হল না । সবিনয়ে বলল, আপনার কৌতূহলের উপযুক্ত নই বৌদি ।

তার মুখের ওপর অপর্ণার পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে আরো কয়েক মুহূর্ত । পরে হেসে বলে উঠল, দেমাক তো কম নয়, ডাকছি এতক্ষণ ধরে শুধু কথার ওপর কথা ! ঈষৎ নিচু গলায় বলল, আসুন খারাপ লাগবে না খুব ।

মনে মনে বিস্মিত অবিনাশ । আর আপত্তি না করে উঠে বসল তার পাশে । ড্রাইভার স্টার্ট দিল আবার ।

অবিনাশ বলল, আমার খারাপ লাগবে না জানি, আপনার কেমন লাগবে সেটাই ভাবনা । মূর্তিটি আমার এমন মাজা-ঘষা যে এদিকে তাকালে নিজের চেহারাটি পর্যন্ত দেখতে পাবেন বোধ হয় ।

অপর্ণা চকিতে ঘাড় ফেরাল তার দিকে । পরে হেসে বলল, কথাগুলোর অর্থ কি সাদা বাংলা না আর কিছু ?

আর কি ! নিরীহ বিস্ময়ের অভিব্যক্তি অবিনাশের মুখে ।

বাঁচলুম...।

উৎফুল্ল মুখেই বিনয় প্রকাশ করে অবিনাশ, কথার যদি অর্থই থাকবে এত, সাতবার করে পরীক্ষায় ফেল করি ।

অপর্ণা সায় দেয় তেমনি, ঠিক । ঘুরে বসল একটু তার দিকে ।—যাচ্ছিলেন কোথায় ?

বাড়ির দিকে ।

আপনার মাস্টারমশাই নিমন্ত্রণ রাখতে গেছেন ?

হ্যাঁ । আপনি গেলেন না ?

একটু থেমে অপর্ণা জবাব দিল, কি জানি...শুনলেন তো কাজে আটকে গেছি । হঠাৎ তার দিকে চোখ রেখে হাসল একটু, কাজটা কি বলেন নি ?

অবিনাশ বিব্রত মুখে সামনের দিকে তাকালো ।

হেসে উঠল অপর্ণা, ড্রাইভার বাংলা বোঝে না, নির্ভয়ে জবাব দিতে পারেন। আর আপনার বাড়ির পথটাও বলে দিন ওকে, নামিয়ে দিয়ে যাই—।

এ উচ্ছ্বলতার হেতু অবিনাশের হৃদয়ঙ্গম হল না সঠিক। সে জানতে চায় কি সেটুকু অবশ্য সুস্পষ্ট। বলল, ড্রাইভার বাঙ্গালী নয় যখন বাংলা না বোঝাই স্বাভাবিক, কিন্তু বুঝলাম না যে কিছু আমিও।

হুঁউঁ? সকৌতুক কটাক্ষে ব্যাঙ্গোচ্ছল একটা শব্দ নির্গত হল অপর্ণার কণ্ঠ থেকে।

পরিহাসের লোভ সংবরণ করতে পারল না অবিনাশ। বলল, আমার মোটা মাথায় কৌতূহল জিনিসটাই একটু কম বৌদি, সবই পণ্ডশ্রম আপনার—অচল টাকা জোর করে বাজাতে গেলেই বাজবে কেন।

মুখের হাসি স্তিমিত হয়ে আসে অপর্ণার। হঠাৎ যেন উপলব্ধি করে, লোকটি মণিময় নয়। এর জাত আলাদা। সাতবার ফেল করা সত্বেও চন্দ্র শ্রদ্ধা করেন একেই, আর মণিময়ের মতে য়ুনিভার্সিটির নামকরা ভালো ছাত্রী সরমার মতো মেয়েরও একমাত্র রহস্যজনক অন্তরঙ্গ মানুষ এই লোকটিই। অপর্ণার সহ্যগুণ কম, বসে থাকে গুম হয়ে।

অবিনাশ জানালো, সামনের বাঁয়ের পথে তার বাড়ি।

নামতে হবে না।

অবিনাশের নির্বাক বিস্ময়ের জবাবে কণ্ঠস্বরে আরও জোর দিয়ে অপর্ণা বলে ওঠে, আমি সিনেমায় প্লে করতে নেমেছি আপনি জানেন সে কথা?

অবিনাশের জিজ্ঞাসু দু'চোখ তার মুখের ওপর সন্নিবদ্ধ। সোজা চলল গাড়ি।

জানেন?

জানি।

আপনার মাস্টারমশাইয়ের কাছে শুনলেন?

হাসতে লাগল অবিনাশ।—ঠিক যে কি আপনি শুনতে চান বৌদি সেটুকুই সোজাসুজি বলুন না! আমি নিরীহ মানুষ আমার ওপর এ রাগারাগি কেন?

থতমত খেয়ে অপর্ণা হেসে ফেলল।

অবিনাশও বাঁচল যেন। বলল, খবরের কাগজে আপনার ছবিটা চোখে পড়বার জন্যেই দিয়েছিলেন বিজ্ঞাপন-দাতারা। পড়েছেও। তেমনি হাল্কা কণ্ঠেই বলে গেল সে, আজ আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই ভাবছি, আর দু'দিন বাদে যাঁকে দেখবার জন্য এতবড় বোম্বাই শহর হত্যা দেবে সিনেমার দরজায়, আমি অবিনাশ শর্মা কি না তাঁরই পাশে বসে মোটরে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছি, এ আনন্দ রাখি কোথায়! কিন্তু আপনার রকম-সকম দেখে প্রায় হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে আমার—।

নীরবে তার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিতে চেষ্টা করল অপর্ণা। পরে হেসেই বলল, ছাই হয়েছে আপনার।

আরও খানিকটা অগ্রসর হবার পর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে।

আজ পথের ধারে অবিনাশকে দেখে হঠাৎ আটকে রাখল কোন্ খেয়ালে, অপর্ণা জানে না নিজেও। আত্ম-সমর্থনের অভাব ঘটে যখন, হয়তো এমনি করেই বাইরের সমর্থন খুঁজে বেড়ায় মানুষ। পেলে খুব যে খুশি হয় এমন নয়, কিন্তু প্রাণঘাতী জ্বালার মতো লাগে সেটুকুও

না পাওয়া। এ ধরনেরই একটা আঘাত উৎক্ষিপ্ত করে তুলল অপর্ণাকে।

কিন্তু এবারে অবিনাশই প্রস্তুত মনে মনে। ধীর, শান্ত মুখে বলল, এতক্ষণ এ আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছিলাম বৌদি, কিন্তু আপনিই ছাড়লেন না! তা ছাড়া, বাইরের মানুষ হলেও বরাতজোরে আপনাদের এত কাছে এসে গেছি যখন, সাহস বেড়েছে।... অনেকদিন বাদে আজ মাস্টারমশাইকে দেখে মনে হল, মনটা খুব সুস্থ নয় তাঁর। তাই, আপনার ওই ছবিতে নামার কথাটা আমিই তুলেছিলাম জোর করে।

সশ্লেষে অপর্ণা বাধা দিয়ে ওঠে, বিশেষ করে আজকের দিনেই তাঁর মনের অসুস্থতা অন্য কারণেও তো হতে পারে।

বলে ফেলেই সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হয়ে গেল যেন। অজস্র ধিক্কার দিল নিজেকে। সামলে নিতে চেষ্টা করল তাড়াতাড়ি, আমি পার্টিতে যেতে পারলুম না বলেও হতে পারে মন খারাপ! যাক, কি বললেন তিনি ?

গভীর দৃষ্টিতে অবিনাশ চেষ্টা করল তার মুখভাব নিরীক্ষণ করতে। অন্ধকারে বোঝা গেল না ঠিক। ভারী ইচ্ছে হল, তাকে কাছে টেনে এনে পরীক্ষা করে দেখে কি গোপন করে গেল। একটু থেমে গম্ভীর মুখে জবাব দিল, তিনি বললেন না কিছু, বরং জানালেন, ভুল তাঁরই।

এই সম্বন্ধেই যাহোক কিছু শোনবার জন্য অপর্ণা উদ্‌গ্রীব ছিল সারাক্ষণ। শোনার পর মন বিরূপ হল অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই। স্বল্প-পরিচিত মানুষটির সঙ্গে আজ সর্বক্ষণ তার নিজের আচরণের অস্বাভাবিকতা ভেবে দেখার নেই অবকাশ, নেই ধৈর্য। উল্‌টে চন্দ্রর ওপরেই গুমরে উঠল মনে মনে, বাইরের মানুষের সঙ্গে ঘরের কথা নিয়ে এসব আলোচনা কেন।

ব্যঙ্গোক্তি করল, গুরুশিষ্যের আলাপের বিষয়বস্তুটি চমৎকার। তারপর আপনি আমারই ভুলটা প্রমাণ করতে লেগে গেলেন বোধহয় ?

না, বরং সান্ত্বনা দিলাম এরকম হামেশাই হচ্ছে আজকাল, অন্যায় কিছু নয়।

সান্ত্বনা! দপ্ করে এক ঝলক আগুন জ্বলে উঠল যেন অপর্ণার চোখে। চাপা হাসির ছটায় প্রায় ফেটে পড়তে চাইল পরক্ষণে। বলে উঠল, নীতির দাগটা তাহলে অন্যায়ের ঘর ছুঁয়েছে একশ পাঁচ ডিগ্রি জ্বরের মতো, কি বলেন ? অন্ধকারে ছাই মুখও দেখতে পাইনে ভালো করে।...ঘন হয়ে সরে এলো পাশে।—তারপর ?

অবিনাশ বাক্‌শক্তি-রহিত ক্ষণকাল। রহস্যের মতো লাগে। সঠিক যেন বোঝেনি একে। বলল, আপনি হাসছেন সত্যি, কিন্তু রাগটুকু বুঝতে পারি। এ আলোচনা থাক।

ও মা, আমি রাগব কি! জোরেই হেসে উঠল আরো। ভেতরে কোন পদার্থ থাকলে তো, উল্‌টে ভালোই লাগছে শুনতে।...তা পেলেন তিনি সান্ত্বনা ?

জানিনে ঠিক—। অবিনাশের অস্বস্তি বাড়ে। সপ্রগল্‌ভ সান্নিধ্যে ওর শাড়ির আঁচল এবং সামনের দু'এক গোছা অবাধ্য চুল ক্ষণে এসে লাগছে চোখে মুখে।

বেশ—। অপর্ণা সম্পূর্ণ ঝুঁকে বসেছে তার দিকে। কাঁধে কাঁধ লাগল। মাঝের সামান্য ফাঁকটুকু গেছে প্রায়।—বলল, এখন সব জড়িয়ে আপনার বক্তব্য কি ?

চেষ্টা করেও অবিনাশ হাসতে পারল না আর। জবাব দিল, মাস্টারমশাইয়ের ভুল যদি

কিছু থাকেও, আপনার দিক থেকে আর একটা ভুল দিয়ে তার জের মিটবে না।

চমৎকার ! আর কিছু ?

না ।

অপর্ণা হেসে উঠল উচ্ছল কণ্ঠে । অবিনাশের হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উৎফুল্ল মুখে বলল, এতক্ষণে বুঝলাম সরমাকে কেন খুইয়ে বসেছেন আপনি । উপদেশ আর বক্তৃতা দু'টোই যে দু'চোখের বিষ মেয়েদের, গতি হবে কি আপনার ?

অবিনাশ সরে বসতে চেষ্টা করল একটু । পরে ফিরে তাকালো একবার । আঘাত দেবার জন্য ওর এই সঙ্গোপন ব্যথার জায়গাটুকুই বেছে নিতে পারে কেউ, ভাবেনি । কিন্তু আশ্চর্য, যতটা লাগা উচিত অবিনাশের, ততটা যেন লাগল না । চোখ ফিরিয়ে নিতে হল ।...পার্শ্ববর্তিনী বিচিত্ররূপিনী ।

অপর্ণা ড্রাইভারকে আদেশ দিল গাড়ি বাঁয়ে ঘোরাতে । পরে আবার বলল, কিছু ভয় নেই, নীতির বালাই নেই যখন, আমি আছি রোগ সারিয়ে দেব'খন আপনার ।

নিজের অজ্ঞাতেই আবারও তাকালো অবিনাশ । সারা দেহে অননুভূত যাতনা একটা । প্রকাশের তাড়না । বুভুক্ষু বেদনা । অন্ধকার সত্ত্বেও কঠিন এক ঝলক হাসির আভায় অপরূপ দেখাচ্ছে অপর্ণাকে । তার তপ্ত নিঃশ্বাস, উষ্ণ স্পর্শ এবং দাহ্য সান্নিধ্য ক্রমশ যেন নিষ্ক্রিয় করে ফেলছে অবিনাশকে । বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত । মুগ্ধ, বিহ্বল ।

কিছুক্ষণ । অবিনাশ সামলে নিল ।

অন্তস্থলের একটা শুভ চেতনা এই ক্ষণিকের মোহজাল থেকে যেন টেনে তুলল ওকে । আরো খানিক চুপ করে থেকে খুব ধীরে, খুব শান্ত মুখে বলল, নিজেকে ভালো ক'রে জানি বলেই এও জানি বৌদি, মেয়েদের কাছে কোনদিনই কিছু প্রাপ্য নেই আমার । এ ব্যর্থতার ব্যথা আছেই, মানুষটা আমি সবল এমন অহঙ্কার তো কোনদিন রাখিনে । কতটুকুই বা দাম আমার মতো মানুষের মুখের দুটো মন-রাখা কথার ।...সেটুকু পেলেন না বলে এতবড় নির্মম পরীক্ষা আপনার !

সহসা কে যেন একপ্রস্থ কালি লেপে দিল অপর্ণার সমস্ত মুখে । স্তব্ধ, নিস্পন্দ ।

নীরবে সরে এলো এক কোণে ।

বসে রইল নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো ।

ড্রাইভার গাড়ি থামাও । অবিনাশ বলল, একতলার ওই ঘরটায় আমি থাকি...আপনি নামবেন ?

জবাব পেল না । একটু অপেক্ষা করে নেমে চলে গেল সে । অপর্ণার অগ্নিদৃষ্টি অন্ধকারে অনুসরণ করল তাকে । তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে ড্রাইভারকে অস্ফুট নির্দেশ দিল গাড়ি চালাতে ।

চন্দ্রকে সান্ত্বনা দেওয়ার কথাটা ওর মুখে শোনামাত্র দুর্বার আক্রোশে জ্ঞান হারিয়েছিল । ভেবেছিল, চূর্ণ করে দেবে শুকনো নীতির মুখোশ, কামনার নগ্নমূর্তি দেখিয়ে দেবে নিজেদেরই —অস্ত্র আছে তারই হাতে । অবিনাশের দুর্বলতার আঁচ পাওয়া মাত্র প্রতিঘাতের আনন্দে ঝক্‌মকিয়ে উঠেছিল সমস্ত মুখ । আর একটু...। তীব্র শ্লেষে ঐ সান্ত্বনার কথাটাই ফিরে স্মরণ করিয়ে দিত ।

কিন্তু কি হয়ে গেল কোথা দিয়ে। নিজেকে প্রকাশ করেও শান্ত মুখে সে যা ফিরিয়ে দিয়ে গেল তার বৃশ্চিক দাহনে জ্বলে যাচ্ছে সমস্ত ভিতরটা। অভিসারিকার ছলনায় উপবাসক্লিষ্ট অন্তরে দাগ ফেলার প্রয়াস শুধু হীনতা নয়, নিষ্ঠুরতাও। ফলে, যে হিংস্র মূর্তি চোখে পড়ে নিজের, এমন যেন আর কোনদিন দেখেনি। অবিনাশের শেষের কথাগুলি বার বার অব্যক্ত ক্ষোভে অস্থির করে তুলল অপর্ণাকে।

হাত-ঘড়িতে সময় দেখে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল বিপিন চৌধুরীর ঠিকানায় যেতে।

ঘরের তালা খুলে অবিনাশ আলো জ্বেলে বিছানায় বসল চুপ করে। কিসের একটা অবসাদে আচ্ছন্ন সমস্ত দেহ। একজনের তপ্ত নিঃশ্বাস এবং উষ্ণ স্পর্শ এখনো যেন লেগে আছে। কানে মাথায় জল দিয়ে এলো বেশ করে। তারপর জানলা খুলতে গিয়ে চোখে পড়ল মাটিতে বিপিন চৌধুরীর নিমন্ত্রণ-পত্র।

চকিতে সময় দেখল ঘড়িতে। না যাওয়াটা সুশোভন হল না। কিন্তু সময় নেই আর ত্রুটি সংশোধনের।

অন্যমনস্কে কাটল কতক্ষণ খেয়াল নেই। নিজের অজ্ঞাতে একটা বড় নিঃশ্বাস মিশল বাতাসে। চিঠিটা রেখে আলো নিবিয়ে দিল। জানলা দিয়ে একফালি জ্যোৎস্না যেন খলখলিয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। জানলার গরাদ ধরে অবিনাশ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। আকাশে অগণিত নক্ষত্রের নীরব সমারোহ।

আর নির্মম কৌতূহল দূরান্ত সপ্তর্ষির অনন্ত জিজ্ঞাসায়।

উৎসববাড়িতে অভ্যাগতদের বিদায় নেবার পালা। মণিময় ওঠবার উপক্রম করছেন। বিপিন আটকে রেখেছে। চন্দ্রর তাড়া ছিল না খুব, তবু এবার যাবেন ভাবছেন।

বাড়ির গেট পর্যন্ত একজন নিমন্ত্রিতকে এগিয়ে দিতে বিপিন অপর্ণাকে সঙ্গে করে ফিরল।

উৎসব-শেষে এমন একজন সুদর্শনার আগমনে যাবার কথা বিস্মৃত হলেন অনেক আগন্তুক।

বিপিন সোল্লাসে বলে উঠল, মোহিনীদা পর্যন্ত যে হাঁ করে ফেললে। সরমা বোঝাপড়া করে নাও বৌদির সঙ্গে, দুটি ঘণ্টার আগে ছাড়া পাবেন না।

অপর্ণা জবাব দিল, সবে বিয়ে করেছেন, বাইরের লোককে বেশিক্ষণ ধরে রাখলে বউ রাগ করবে।

কাছে এসে সরমা স্মিতহাস্যে দু'হাত তুলে নমস্কার জানাল, আপনি আর আসবেন সত্যিই ভাবিনি।

অপর্ণা একবার তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হাত দু'টি টেনে নিল নিজের দুই হাতে। সকৌতুকে বলল, ভাব নি তো? ওই দেখুন বিপিনবাবু, আপনি খুশি হলে কি হবে, বউ ভাবনায় পড়েছে। আপনি-টাপনি বাদ দিলম ভাই, কিছু মনে কোরো না। ফিরে তাকালো একবার চন্দ্রর দিকে।—না এসে উপায় আছে, তোমার মাস্টারমশাই কি আর তাহলে মুখ দেখতেন আমার!

বিপিন টিপ্পনী কাটল, খুব ভয় তো আপনার।

অপর্ণা ছদ্ম-গাম্ভীর্যে জবাব দিল, খুব—। পরে এক ঝলক হেসে বলল, কিন্তু আমার যে ক্ষিদে পেয়ে গেছে, খেতে টেতে দেবেন না ? সব শেষ নাকি !

বিপিন হাঁকডাক করে বেয়ারাকে আদেশ দিল খাবার নিয়ে আসতে। হাসছিল সবাই। ডাঃ চন্দ্রও ।

অপর্ণার হঠাৎ চোখ পড়ে মণিময়ের ওপর । ঈষৎ থমকে গিয়ে বলল, কি আশ্চর্য, আপনি এখানে চুপটি করে বসে ! আমি তো দেখতেই পাইনি, এই জন্যেই বুঝি আজ স্টুডিও কামাই ?

বিব্রত মুখে মণিময় হাসল একটু । না, অন্য জায়গায় কাজ ছিল, আপনার এত দেরি ?

হবে না ! শুটিং কি আর শেষ হয় ছাই, আসতে পেরেছি এই ঢের ।

একমাত্র চন্দ্র বুঝলেন, সম্পূর্ণ ইচ্ছে করেই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করল অপর্ণা। নিজের অজ্ঞাতে সরমা কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল একটু । কাছাকাছি দুই-একজন যাঁরা ছিলেন সাগ্রহে সম্পূর্ণই ঘুরে বসলেন এবার । বিপিন শোনেনি কিছু, নিজেই একটা ছোট টেবিলে এনে পেতে দিল অপর্ণার সামনে ।

অপর্ণার মুখে ব্যতিক্রম নেই এতটুকু । পৃথক জগতের আনন্দ-স্বরূপিনী যেন । খাওয়ার তাগিদটা নামমাত্র ।

বিপিন অনুযোগ করল, এই আপনার ক্ষিদে ?

ও মা, কম খেলাম নাকি ।

এর নাম খাওয়া ! মিথ্যে খাটালেন, সরমা ধরো না ভালো করে ।

অপর্ণা বলল, ধরলে হবে কি, মাস্টারের বউ, এর বেশি অভ্যেস নেই ।

চোখ কপালে তুলে ফেলে বিপিন, অ্যাঁ ! মোহিনীদা সামনে বসে আর এত বড় দুর্নাম । যাচাই করব কিন্তু—

তেমনি জবাব দিল অপর্ণা, করুন যাচাই, দেয় নাকি ভালো করে খেতে, এই জন্যেই তো এমন ছিরি চেহারার ।

বিপিন সরমা এমন কি মণিময়ও হেসে উঠল সশব্দে । বিপিন বলল, আপনার চালাকি বুঝি, যে অপবাদটা চাপিয়েছিলেন মোহিনীদার ঘাড়ে, চেহারার ছিরি দেখিয়ে সেটা নিজেই কাটিয়ে নিলেন আবার ।

অপর্ণার হাসি-খুশি উপচে উঠছে যেন । সরমার দিকে একবার কটাক্ষপাত করে বলে উঠল, থাক, আপনি আর বলবেন না কিছু, যে জিনিস সংগ্রহ করেছেন ভয়ে ভয়ে দিন কাটবে । তার ওপর আবার মুখখু-সুখখু নয় আমার মতো, খাঁটি রত্ন ।

লোকের সামনে সরমা স্বভাবতই কম কথা বলে । মৃদু হেসে তাকালো তার দিকে । —এবারে বুঝি আমার পালা ?

কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল খেয়াল নেই কারো । তারা ক'জন বাদে অন্য নিমন্ত্রিতরা সকলেই চলে গেছেন । চন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন, চলো রাত হল—

চলো । অপর্ণা উঠল তৎক্ষণাৎ । কি মনে হতে মুহূর্তের জন্য ভাবল একটু । ক্ষিপ্র হাতে গলা থেকে বড় লকেটসুদ্ধ হারটা খুলে নিয়ে সরমাকে বলল, এসো—

সবিস্ময়ে সরমা দাঁড়াল একটু ।—সে কি ! মাস্টারমশাই হাতে করে নিয়ে এলেন একটা,

আবার কেন ।

চকিতে একবার উপহারের টেবিলের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অপর্ণা সহাস্যে বলল, তোমার বরাত ভালো, আমি তো নিশ্চিন্ত ছিলুম হয়তো বা একটা মাইক্রোসকোপই নিয়ে হাজির হবেন উনি । যাই আনুন, খুলেছি যখন পরতে হবে, এসো ।

না এ ভারি লজ্জার কথা । সরমা প্রতিবাদ করল তবু ।

দেখো, আমার রাগ তো জান না, জিজ্ঞেস করে দেখো তোমার মাস্টারমশাইকে, এসো বলছি !

বিব্রত হয়েও হেসে ফেলে সরমা ।—কিন্তু এসেই না বললেন, আপনিই খুব ভয় করেন মাস্টারমশাইকে ।

হেসে ফেলল অপর্ণাও । ঠিকই বলেছি ।

হার সরমার গলায় পরিয়ে দিয়ে চন্দ্রর দিকে ঘুরে দাঁড়াল, চলো— ।

এই হার একদা চন্দ্রই নিজে পছন্দ করে অপর্ণাকে কিনে দিয়েছিলেন ।

মোটর চলল । দু'জনে দু'ধারে বসে । কিছুক্ষণের নীরবতা । চন্দ্র বললেন, তোমার এই শেষের ব্যবহারে আমি অপমানিত বোধ করেছি অপর্ণা ।

অপর্ণা জবাব দিল, অসম্ভব নয় ।...বুদ্ধি আছে সরমার, কিছু একটা গলদ হয়তো বা ধরাই পড়েছে ।

প্রত্যুত্তরের এই বাঁকা সুর সুপরিচিত । বাইরের দিকে চোখ ফেরালেন চন্দ্র ।

অপর্ণা বলল, কিন্তু কেমন ভালো অভিনয় করি আমি খেয়াল করে দেখলে তো ?

চন্দ্রর মুখের বেদনার্ত ছায়াটুকু চোখে পড়ল না অপর্ণার । উৎসব-গৃহে ওর অপ্রত্যাশিত আগমনে খুশি হয়েছিলেন মানুষটি । মণিময়ের সঙ্গে কথাবার্তা এবং শেষের এই হার পরানো ছাড়া ওর সারাক্ষণের হাসি-কৌতুকে খুঁজে পেয়েছিলেন আগের সহজ সুস্থ অপর্ণাকে । ভালো লেগেছিল ।

নিরুত্তরে সম্পূর্ণই ঘুরে বসলেন এবার ।

একটু বাদে অপর্ণা শান্ত মুখে বলল, আমাকে নিয়ে মন তোমার এত খারাপ যে বাইরের কে না কে অবিনাশ, সেও দু'টো সান্ত্বনার কথা শোনায় তোমাকে । শুনে আমিও বোধ করেছি খানিকটা অপমান, এটা কি তার চেয়েও বেশি ?

বিস্মিত নেত্রে ফিরে তাকালেন চন্দ্র । বুঝলেন, তিনি চলে আসার পর যেখানেই হোক আজই অবিনাশের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছে । কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অবিনাশ বলেছে কিছু বিশ্বাস্য নয় । তাকে চেনেন এবং আরো বেশি চেনেন অপর্ণাকে ।

বললেন, লোকের মুখ আর চাপা দেবে কি করে । কিন্তু বাইরের কে না কে লোকটা গায়ে পড়েই তোমাকে সান্ত্বনার খবরটা দিয়ে গেল বোধহয় ?

অন্ধকারে নিজের অধর দংশন করল অপর্ণা ।

জবাব না পেয়ে হাসলেন তিনি ।—অবিনাশকে ঘাঁটাতে গেলে তেমন কিছু বলবে সে এ বোধহয় আগে জানতে না ।

সাড়াশব্দ নেই অপর্ণার ।

মিথ্যে যে বলেন নি এ আর অপর্ণার চেয়ে বেশি কে জানে আজ । অন্তর্জ্বালা সত্ত্বেও

নিখুঁত অভিনয় করে এলো বিপিন চৌধুরীর বাড়িতে । কিন্তু অবিনাশকে ভুলতে পারে নি এক মুহূর্ত । অপমানের যে কালি মানুষটার সমস্ত মুখে মাখাতে গিয়েছিল রূপের অহঙ্কার বুদ্ধির গর্ব নিয়ে, তার সবটুকু ফিরে এসেছে নিজের কাছে ।

রাগে দুঃখে বেদনায় অপর্ণা নিঃশব্দে থাকে বসে স্থাণুর মতো ।

শুধু মণিময় ছাড়া বাইরের আর নেই কেউ । বিপিন শেয়ার মার্কেটের গল্প করছিল তার সঙ্গে । সে থামতে মণিময় উঠে দাঁড়াল ।

এবার চলি, বেশ রাত হয়ে গেল ।

সরমাও চুপচাপ অপেক্ষা করছিল সেই থেকে । ডাকল, দাদা, শোনো—

তাদের কথা বলার অবকাশ দিয়ে বিপিন বেয়ারাদের খোঁজে অন্য দিকে গেল। মণিময় জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলবি ?

শাড়ীর আঁচল আঙুলে জড়াতে জড়াতে সরমা তাকালো তার দিকে ।—শুনলাম ডাঃ চন্দ্রের স্ত্রী সিনেমায় নেমেছেন, সে কি তোমার বইএ ?

হ্যাঁ, তুই জানতিস না ? শুকনো হাসি ।

না, হঠাৎ এ খেয়াল তাঁর ?

কি জানি । নির্লিপ্ত মুখে জবাব দিল মণিময়, চল্লিশ হাজার টাকা পাচ্ছেন, তার ওপর গানের দাম, নেমে গেলেন । প্রস্থানের উদ্যোগ করল সে ।

দাঁড়াও, সরমা বাধা দিল আবার, আমি থাকব না তাই মনে করিয়ে দেওয়া—সময়মতো টাকা পাঠাতে ভুলো না বিনুর হস্টেলে...আর, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে এসো তাকে ।

কি ভেবে কর্তব্য দু'টো স্মরণ করিয়ে দিল সেই জানে । সাদা কথার তাৎপর্য সাদা মনে গ্রহণ করল না মণিময় মুখ দেখেই বোঝা গেল । কিছু না বলে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সে ।

ওপারে এসে চারুদেবীর নির্দেশমতো হাত মুখ ধুয়ে ফুল ছড়ানো বিছানায় এসে বসল সরমা ।

ভালো লাগার কথা । কিন্তু তেমন ভালো লাগছে না । এত মানুষ এলো গেল, কিন্তু এলো না যে, শ্রান্ত অবকাশের প্রথম মুহূর্তে মনে সেই মানুষেরই ছায়া পড়ে আবার । তাকে ডাকেও নি আশাও করেনি । কিন্তু ডাকে নি যে, আর আশাও করা চলে না যে, উৎসব আসরেও ঘুরে ফিরে বার বার মনে হয়েছে সে কথা ।

খুঁটিনাটি তদারক সেরে বিপিন এলো খানিক বাদেই । একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তার সামনে বসল । ঘর্মাক্ত ।

সরমা তার দিকে চেয়ে হাসল একটু । উঠে পাখার স্পীড় বাড়িয়ে দিল ।—খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তো ?

অনুরাগ-রঞ্জিত প্রেম-গুঞ্জন নয় নব-বধূর । ওতে সরমাকে মানায় না । যা মানায় তা এই । পাখার বেগ বাড়ানো বা অনাড়ম্বর জিজ্ঞাসার ওটুকুতেই শেষ নয় । অনাস্বাদিত স্পর্শের মতো লাগে বিপিনের । হেসে বলল, এরকম ছোটাছুটি আমার অভ্যেস আছে । সিগারেট ধরালো একটা ।—তোমার খারাপ লাগছে না তো কিছু ?

খারাপ লাগবে কেন ? আমি তো দিব্বি বসেই কাটিয়ে দিলাম ।

নীরবে ধূমপান চলল মিনিট খানেক । পার্টির সাফল্যে সারাক্ষণই প্রসন্ন ছিল মন । এখনো তাই । কিন্তু সরমাকে একা পাওয়ার এই লোভনীয় মুহূর্তেই বিপিনেরও যেন মনে পড়ে কিছু । একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, অবিনাশবাবু কিন্তু সত্যিই এলেন না শেষ পর্যন্ত । সরমার সপ্রশ্ন চোখে চোখ রেখে থামল একটু । বলল, আমি নিজে গিয়ে কার্ড রেখে এসেছি, বিশেষ অনুরোধও করেছিলাম ।

সরমা অবাক প্রথমে । পরে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, আসবে বলেছিল ?

না, ঘর তালা-বন্ধ দেখে চিঠির নিচে আলাদা করে লিখে রেখে এসেছিলাম, যেন আসেন ।

সরমা চেয়ে থাকে খানিক—ঘর তালা বন্ধ তো কার্ড দিলে কাকে ?

বিপিন বলল, জানলার শার্সি খুলে বিছানায় ফেলে রেখে এসেছিলাম ।

সরমা ভাবল কয়েক মুহূর্ত । ও কার্ড তাহলে মাটিতেই পড়ে আছে, ওর তক্তাপোশ থেকে জানালা দু'তিন হাত দূরে । চোখে চোখ রাখল আবার, কিন্তু আমাকে বলনি তো কিছু ?

চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেনি অবিনাশ, এ সিদ্ধান্ত সরমা মেনে নিলেই বিপিন খুশি হত । হয়তো বা আত্মপ্রসাদজনিত সহানুভূতিও থাকতে পারত অবিনাশের প্রতি । বদলে, জানলা থেকে তার শয্যার দূরত্বের হিসাব ভালো লাগল না তেমন । তবু হেসেই জবাব দিল, তিনি এলে তোমাকে অবাক করে দেব ভেবেছিলাম ।

অবিনাশের সম্বন্ধে তার আগ্রহ এই দ্বিতীয়বার লক্ষ্য করল সরমা । হাসল মনে মনে । অবিনাশকে চেনার সুযোগ ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রেখে বলল, রাত হয়েছে, মুখ হাতে জল দিয়ে এসো, ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে ।

অনুভূতির সূক্ষ্ম বোধটুকু সজাগ হল আবার । সিগারেট ফেলে এবারে ভিন্ন আগ্রহ নিয়ে তাকালো বিপিন । পুরুষের আকাঙ্ক্ষার দুর্লভ মাধুর্য এত কাছে, ছাইয়ের ভাবনা তার ।

কি দেখছ ? তার দেখার এই পরিবর্তনটুকু উপলব্ধি করেই সহজ হতে চেষ্টা করল সরমাও ।

না । গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল বিপিন । জামাটা খুলে আলনার দিকে ছুঁড়ে দিল দূর থেকে । আলনা টপকে কোথায় গিয়ে পড়ল ওটা দেখার অবকাশ নেই । বিছানায় উঠে তার কোলে মাথা রেখে সটান শুয়ে পড়ল ।

সরমা হেসে ফেলল—কী ?

জবাবে বিপিনের দুই বাহুর, হাতের আঙুলের, নিবিড় স্পর্শে তপ্ত বাসনার আঁচ লাগল সর্বাঙ্গে । সরমা থমকে গেল একটু । শ্বাস রুদ্ধ করে তাকালো তার দিকে । ওই দুই চোখের উষ্ণপিপাসা প্রথম রাত্রিতেও অনুভব করেছে । কিন্তু এক শ্রান্তির ঘোরে কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো কেটেছে সরমার সে রাতটা । বিপিন লক্ষ্য করেছিল সেটুকু । লক্ষ্য করেই অন্তর্তুষ্টির উদারতায় ওর বিশ্রামে আর ব্যাঘাত ঘটায়নি । সাড়া জাগাতে চেষ্টা করেনি ।

পরের রাত্রিটা চারুদেবীর মতে কাল-রাত্রি । হলই বা কাগজে কলমে বিয়ে । শুভকর্মের বিধি-বিধান সবই উল্টে দিতে হবে নাকি ! অতএব সরমার বিগত রাত্রিটা কেটেছে চারুদেবীর হেপাজতে । এই সংস্কার বিধানের দরুন কেন যে এত স্বস্তি বোধ করেছে সরমা মনে মনে,

নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় খুব । আর সমস্ত রাত ধরে বিপিনের যেন মনে হয়েছে, এমন কাল-রাত্রি আর বুঝি হয় না ।

তারপর আজকের রাত...।

সরমার রুদ্ধ নিঃশ্বাস মুক্তির অবকাশ পেল না ।

যাতনার মতো লাগছে এই নিবিড় স্পর্শ, অধর-নিপীড়ন । যাতনা আর অস্বস্তি। কোথায় যেন বাধা একটা । কোন্ অগোচরে । স্মৃতি-পথে । স্পর্শ-যাতনার মধ্যেও সরমা চমকে উঠল প্রায় । কোথায় বাধা কিসের বাধা চিনেছে যেন । উপলব্ধি করেছে যেন । নতুন জীবনে যাকে ছাড়িয়ে এলো, মনের নিভৃত থেকে তাকে একেবারে বিদায় দেওয়া হয়নি বুঝি জীবন-বাস্তবে, যৌন-বাস্তবে তাকে চায়নি, চায়ও না । কিন্তু অন্তস্তলে তারই ছায়া পড়ে আছে একটা । সেটাই বাধা । সেইখানেই বাধা ।

সহসা শিউরে উঠে দেহতটের বাঁধ ভেঙে দিয়ে সকল বাধা নিঃশেষ করে দিতে চাইল সরমা । নতুনের অভ্যর্থনায় নিঃশেষ করে দিতে চাইল নিজেকে । সাড়া জাগল । সাড়া জাগালো । আগল-ভাঙা সমর্পণে বিস্মৃত-ঘন অবসানের আকৃতি ।

## ।। ১০ ।।

সরমার পড়াশুনায় কামাই হয়ে গেল বেশ কিছু দিন ।

আপাত দৃষ্টিতে সেজন্য বিপিনই দায়ী বটে । হালকা ভ্রূকুটি করে সরমা মাঝে মধ্যে তাকে অনুযোগ করতেও ছাড়েনি । কিন্তু নিজেরও যেন একটা মোহাবেশের মধ্যেই কেটেছে এই ক'টা দিন । সেদিনের সেই সমর্পণের বিহ্বলতা নিজেও ছাড়িয়ে উ .ত পারেনি বড় । দু'জনার এই বিনিময়ের নিভৃতেও বিপিন চৌধুরীর স্বভাবের পরিবর্তন দেখেনি । তেমনি দুর্দম, তেমনি অশান্ত । প্রায় বন্য । প্রায় হিংস্র । তবু প্রশ্রয় এবং আগ্রহ নিয়েই প্রতীক্ষা করেছে সরমা । না করে পারেনি । এই স্থূল মত্ততা প্রশমনের মধ্যে নিজের বিবশ পরিতৃপ্তিটুকু গোপন লজ্জার মতো ।

কিন্তু পরীক্ষা সন্নিকট ।

পাশের ঘরে বইপত্র, গুছিয়ে মণ্টুকে তলব করল সরমা ।—তোমার তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে এসো এ ঘরে, অনুরাগ চর্চা শুরু হবে কাল থেকে ।

এ ক'দিনে মণ্টুর সঙ্কোচ অনেকটা কেটে গেছে । জবাব দেয়, রেজাল্ট বার হোক, নইলে চর্চাটা হবে কি নিয়ে ?

খালি চেয়ার টেবিলেই হবে, নইলে বউ মানুষ সারাক্ষণ বই মুখে নিয়ে বসে থাকলে কাকীমার মেজাজ বিগড়ে যাবে ।

ও, মাকে দেখলেই পড়াতে শুরু করে দেবে আমাকে ?

ঠিক । হেসে তাকালো সরমা । বরাবরই জানি তোমার বুদ্ধি আছে ।

চারুদেবীর সুনজর নেই তার ওপর সরমা জানে । কিন্তু এর থেকেও বড় বিপদ মণ্টুকে নিয়ে । মায়ের বিন্দুমাত্র কটাক্ষও বরদাস্ত করার পাত্র নয় সে । ওর প্রকাশ্য সংগ্রামে সরমা কোথায় পালাবে ভেবে পায় না এক এক সময় । এবারে পথটা মন্দ উদ্ভাবন করেনি ।

চারুদেবীর মেজাজ নিয়ে লঘু হাসি-ঠাট্টায় বিষয়ের গুরুত্ব চাপা পড়ে।

বিপিন চৌধুরী ঠাণ্ডা মাথায় চেষ্টা করছে কাজে মন দিতে। শেয়ার বাজারের সচ্ছলতায় টান ধরেছে কিঞ্চিৎ। উঠে পড়ে লাগল আবার। কতগুলি ছোটখাটো ব্যাঙ্কের শেয়ার কেনা ছিল। ডিরেক্টার হিসেবে সেগুলিরও তদারক শুরু করল। যোগ্যতার প্রশ্ন কোনদিন যেন না ওঠে সরমার মনে। টাকা করতে হবে। অজস্র টাকা। এটাই সে পারে, যা কোন পারার থেকে কম নয়।

কিন্তু বিকেল ছ'টা না বাজতে ছটফটানি শুরু। গৃহাভিমুখী চিত্তকে কাজের হাজার বলগায়ও আটকে রাখা যায় না তখন। অথচ সন্ধ্যে না হতে সরমা বসে যাবে বই নিয়ে। বিরক্ত করা উচিত নয় বলেই নিজের ওপর বিরক্তি বাড়ে।

কখনো বা মন্টুকে পড়ার ঘরে গল্প করতে দেখে খুশি হয়ে নিজেও চেয়ার টেনে বসে সামনে।—কি রে পরীক্ষার সময় আড্ডা জমিয়েছিস তো।

কিন্তু আলোচনার বিষয়বস্তু প্রায়ই রসায়ন-চর্চাগত। বিরক্তি চেপে কাজের অছিলায় উঠে যেতে হয়। দু'বার ফেল-করা ছেলের পরীক্ষার পরেও কেমিস্ট্রিপ্রীতি দেখে পিত্তি জ্বলে যায়।

সেদিন বিপিন একটু আগেই ফিরল আপিস থেকে। প্রস্তাব করল চলো সিনেমায় যাই।

সরমা একটু অবাকই হল যেন। সিনেমায় যাবে...এখন ?

বিপিনের উৎসাহ স্তিমিত ওটুকুতেই। তার মন রাখতে সরমা হেসেই বলল, পরীক্ষাটা হয়ে যাক না, ক'টা দিনই বা বাকি আর। কি বলো ?

আচ্ছা।

কিন্তু শিগগীরই এই না যাওয়া অর্থটা বিকৃত রূপ নিল সম্পূর্ণ। হয়তো সরমাই দায়ী এজন্য

বিয়ের পর তিন সপ্তাহ বিগত। অথচ অবিনাশের সাক্ষাৎ নেই। সরমা ভেবেছিল, বিপিনের নিমন্ত্রণ-লিপি চোখে পড়লে মূর্তিমানের আগমন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বৃথা দিন গুনলো বসে। বিবাহিত জীবনের আনন্দটুকুর সঙ্গে সন্তর্পণে মিশে আছে কেমন একটু বেদনা-বোধ। তবু স্থির জানে, অবিনাশের সামনে একবার গিয়ে দাঁড়াতে পারলে সঙ্কোচ কাটবে। নিজেই যাবে যাবে করে যত দিন যায়, সহজে গিয়ে হাজির হওয়ার বাধাও ততো বাড়ে।

পড়াশুনার ফাঁকেও সরমা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে একটু-আধটু। অসুখ-বিসুখ করল কিনা তাই বা কে জানে। যে চাপা লোক, একটা খবরও দেবে না হয়তো। বই রেখে দিল তৎক্ষণাৎ। তার যাওয়াই চাই এবং আজই। অবিনাশ পারে তাকে না দেখে থাকতে। অনেক কিছুই পারে সে। কিন্তু ও পারবে না।

আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরবে আপিস থেকে ?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধছিল বিপিন, সোৎসাহে মুখ ফেরাল। কেন বলো তো ?

এক জায়গায় যাব—

তার উৎসুখ চোখের দিকে চেয়ে দু'দিন আগে সিনেমায় না যাওয়ার কথাটা কেমন মনে পড়ে গেল সরমার। তবু দ্বিধা কাটিয়ে বলল, অবিনাশের ওখানে।—তোমার সঙ্গেও

আলাপ হবে ভালো করে আর নিমন্ত্রণ না রাখার কৈফিয়ত নেব, চলো না ?

স্নো-পাউডার-ঘষা মুখে উপর্যুপরি ক'টা রেখার কুঞ্চন মিলিয়ে যায় । আলনা থেকে কোট পেড়ে নেবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল বিপিন । কোটের ভাঁজ পরীক্ষা করে কনুইয়ের ওপর ফেলল সেটা ।

তুমি যাবে তো যাও না, আমার ফিরতে দেরিই হবে হয়তো, অনেক কাজ হাতে । দরজার দিকে পা বাড়িয়ে হাসল একটু ।—দালাল মানুষ, কোন্ নিমন্ত্রণে কে এলো না এলো অত কি আর মনে করে বসে আছি, কৈফিয়ৎ নেব কি !

সে চলে গেলে বিশেষ কিছু ভাবার অবকাশ পেল না সরমা । সঙ্গে সঙ্গে মণ্টুর আবির্ভাব । জাঁকিয়ে বসল বিছানায় ।

দাদা আপিসে যাবে তাও তোমার মন খারাপ !

সরমা হেসে যোগ দিল সত্যিই তো, তুমি আছ কি করতে । আজ বিকেলে বেরুতে হবে আমার সঙ্গে ।

কোথায় ? মণ্টু উদ্‌গ্রীব !

অত খোঁজে দরকার কি, যেখানে বলব নিয়ে যাবে ।

এক পায়ে রাজী, কিন্তু সাড়ে পাঁচটায় যে খেলা আমার ?

আগেই বেরুব, খেলার শেষে আবার নিয়ে আসবে আমাকে ।

আচ্ছা । ঠাট্টা করতেও ছাড়ল না, একা আর পথে-ঘাটে বেরুবে না ঠিক করলে নাকি ?

সরমা গম্ভীর মুখে জবাব দিল, হ্যাঁ ।

মণ্টুও চেষ্টা করল গম্ভীর হতে, বলল, ভালোই করেছ, নইলে মা বলবে, নতুন বউ বলা নেই কওয়া নেই হুট হুট করে বাড়ির বার হলেই হল !

হাস্যধ্বনি ।

মণ্টু একেবারে মিথ্যে আঁচ করেনি হয়তো । কিন্তু ওটাই কারণ নয় । জীবনের নতুন অধ্যায় থেকে পুরানো দিনে ফিরে যাওয়া । ক্ষণিকের বিড়ম্বনাটুকু সইয়ে নেবার জন্যও একজনের আড়াল দরকার ।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রসন্নতা বাড়তে লাগল বিপিন চৌধুরীর । সেদিন উৎসব-রাত্রির সেই ছোট জিজ্ঞাসাটুকু নিশ্চিহ্ন হয় নি মন থেকে । নিজের অজ্ঞাতে বরং ব্যাপ্তিলাভ করেছে সেটা । অদূরে ঘনশ্যামবাবু মুখ গোমড়া করে বসে । ভাবছেন, ঝকমারি এমন মানুষের অংশীদার হওয়া ।

বিপিন চিন্তিত । ট্রাম বাস অথবা ট্রেনে যেতে হবে সরমাকে । গাড়িটা রেখে না আসার দরুন নিজের উদ্দেশেই কটূক্তি করল মনে মনে । আপিস হয়ে গেল । উঠে পড়ল ।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজে । চারুদেবী দিবানিদ্রার আলস্যজড়ানো মুখে সবে উঠে বসেছেন । সরমা অথবা মণ্টু কাউকে না দেখে বিপিন তাঁকেই জিজ্ঞাসা করল, এরা সব গেল কোথায় ?

সশব্দে হাই তুলে তিনি জবাব দিলেন, এই তো একটু আগে আমাকে বলে বেরুলো দু'জনে । তুই এত সকাল সকাল ফিরলি ?

বিপিন নিজের ঘরে এসে বসল গুম্ হয়ে । দিবানিদ্রার উষ্ণতায় চারুদেবী বিরক্তি প্রকাশ করলেন, বুঝিনে বাপু ভাবসাব ।

পুরানো আঁকা ছবির পাতা ওলটাচ্ছিল অবিনাশ। বিজ্ঞাপনের নক্সা নয়। ওর যুগাতীত বিলাসী মনের সঞ্চয় কিছু। এর থেকেই এনলার্জ করবে একটা। সামনের ফ্রেমে ড্রইংয়ের ক্যান্‌ভাস আঁটা।

সরমাকে দেখে আনন্দে স্তব্ধ কয়েক নিমেষ। চেঁচামেচি করে উঠল তারপর।—এসো এসো, আমি ভাবছিলাম চৌধুরীমশাই বুঝি ফরাক্কাবাদেই উধাও হলেন তোমাকে নিয়ে।

সরমা অল্প হেসে ঘুরে মন্টুকে আহ্বান করল, তোমার খেলার তো দেরি আছে এখনো, মানুষটাকে দেখেই যাও একবার—

সে ঘরে প্রবেশ করতে অবিনাশ জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো সরমার দিকে। পরে উঠে চেয়ারটা টেনে দিল শশব্যস্তে। চৌকিতে পাশের জায়গাটা চাপড়ে দিয়ে সরমাকে বলল, বোসো। এটি ?

সরমা হালকা জবাব দিল, এটি আমার ভূতপূর্ব ছাত্র, বর্তমানের বডি-গার্ড এবং ভবিষ্যতের হয়তো বা দু'নম্বর মালিক।

অবিনাশ সোচ্ছ্বাসে বলল, বুঝলাম—বোসো ভাই, দাঁড়িয়ে কেন, একটু দেখে বোসো জামা না ছেঁড়ে—নতুন যখন কিনে আনি থার্ড-হ্যাণ্ড চেয়ারটা তখন থেকেই একটা হাতল নেই ওর।

মন্টু তাড়াতাড়ি বসে বাঁচল।

ঠিক আছে, এইবার দেখো আমাকে। তোমার লেডি মিছে বলেন নি, জ্যু-লজিকাল গার্ডেনের মতো ম্যান-লজিকাল গার্ডেনের পত্তন হলে এ দেশ থেকে আমার ক্লেইম্‌ আনরাইভালড্‌। ছদ্ম-গাম্ভীর্যে আবার নিরীক্ষণ করল মন্টুকে। তারপর বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—কিন্তু ভাই মিছে আশ্বাসে ভুলছ তুমি, ছাত্র ছিলে ভালোই ছিলে, বডি-গার্ড হয়েছ সেটা আরো ভালো—কিন্তু ওই দু'নম্বর মালিকানা এক-এ নামবে না কোনদিন। অথচ, তোমার ওই পুঁটলির ইউনিফর্ম পরে খেলার মাঠের হোয়াইট্‌ গ্যালারির পাশে এই চেহারা নিয়ে যদি ঘোরাঘুরিও করো দিন কতক—অনেক সুদর্শনা এক নম্বর ছেড়ে একমেব অদ্বিতীয়ম্‌ বলবেন। কিন্তু লেডি তোমার এমনই স্বার্থপর, এই সৎ পরামর্শটুকুও দেবেন না কোনদিন।

মন্টু বিস্ফারিত নেত্রে তাকালো সরমার দিকে। অর্থাৎ এ কোথায় এনে ফেললে আমাকে।

সরমাও হাসছে ! বলল, বকুনি থামাও, ওকে এভাবে লজ্জা দিলে ও আর আসবে না এখানে।

অবিনাশ জবাব দিল, নিশ্চয় আসবে, কারণ ও যাঁর বডি-গার্ড তিনি আসবেন এবং তিনি গার্ড না নিয়ে চলাফেরা করেন না আজকাল। ওর জন্যে আমার দুর্ভাবনা নেই, তোমার খবর কি ?

সরমা কটাক্ষে একবার মন্টুর দিকে চেয়ে হেসেই জবাব দিল, ভালো। ছবির খাতা খুলে বসেছ যে, কমার্সিয়াল আর্ট কি হল ?

অবিনাশ গম্ভীর মুখে বলল, মহা-অতীতের সাথে আজ আমি করেছি মিতালি—আজ নির্বাসন ওদের। রসসৃষ্টি কারিগরিটা একেবারে ভুলে মেরে দিইনি এর প্রমাণ থাকবে বিপিন

চৌধুরীর অন্তঃপুরিকার শয়নঘরের দেয়ালে—এই জন্যেই কোমর বেঁধে বসেছিলাম ।...তা উইল্-ফোর্সের জোর দেখো, তিন সপ্তাহের সেতু ডিঙিয়ে কুলবতীর স্বয়ং আবির্ভাব ভক্ত-শিল্পীর ঘরে । অতএব প্রশ্ন করে আর বেশি ঘাঁটিও না দেবী, বসে থাকো চুপ করে, ভালো করে দেখি তোমাকে ।

মণ্টুর বিস্ময়াপ্লুত মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠল অবিনাশ—কিছু মনে কোরো না ভায়া, ওকে দেখার নিরীহ অভ্যাসটা তোমার মতোই ছিল আমারো । নেহাৎ বয়সে আট-দশ বছরের বড় বলে কান-মলা পুরস্কার থেকে সগৌরবে বঞ্চিত হতে পেরেছি । ও কি ! লজ্জা পেও না, বরং সদর্পে বলবে, মহৎ সাধনায় দুঃখ আছে, নির্যাতন, আছে...এই কি বলে, আরো অনেক কিছু আছে—।

সরমা শাড়ির আঁচল মুখে পুরল । মণ্টু আরক্ত ।

কিন্তু ভায়া, তোমার খেলা ক'টায়, সময় উৎরে যাচ্ছে না তো ?

মণ্টু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল । দেরিই হয়ে গেছে, কিন্তু যেতে মন সরে না । হেসে বলল, বৌদির মারফত আমার নেমন্তন্নটাও পাকা করে দেবেন, তিন সপ্তাহ ছেড়ে সপ্তাহে তিনবারও আসতে পারি ।

অবিনাশ সানন্দে বলল, দেখলে সরমা, জহুরী জহর চেনে । বেশ, আসবে । সাতবার পর্যন্ত ফেল করাতে পারি আমি, তার বেশি বিদ্যে নেই ।

বৌদিকে ক'বার ফেল করালেন ? মণ্টু একেবারে ছাড়ার পাত্র নয় ।

অবিনাশ গম্ভীর । বোলো না, গুরুর নাম ডুবিয়েছে ।

সরমা হাসি চেপে মণ্টুকে বলল, তোমাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না, এঁকেই ধরে নিয়ে যাব'খন ।

সে চলে গেলে ঘুরে বসল অবিনাশের মুখোমুখি । এত বাক্চাতুরি কিসের ?

স্বভাব । কিন্তু ওকে সত্যিই বারণ করে দিলে আসতে ?

কেন তোমার ও বাড়ি যেতে আপত্তি হবে খুব ?

না ।

সরমা চকিতে দেখে নিল একটু । সেদিন গেলে না কেন ?

অদৃষ্ট । নিমন্ত্রণ-লিপি চোখে পড়ল যখন, গেলে তাড়া খেতে হত ।

তার পরেও তো এলে না ?

অবিনাশ সকৌতুকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ —নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে এতদিন বাদে নিজেই চলে এলে শেষপর্যন্ত এই তো ভালো হল ।

বিব্রত হয়ে সরমা হেসে ফেলল । জেনেশুনেই বিপদ ডেকে আনা । জোর দিয়ে বলল, আমার দায় পড়েছে বোঝাপড়া করতে, যখন খুশি আসব আগের মতোই, কে কি বলবে ?

মুচকি হেসে অবিনাশ থামল একটু ।—বাজে কথা যেতে দাও, চৌধুরীমশাইকে লাগছে কেমন ?

মন্দ কি

তবু, বনিবনাটা হল কেমন শুনতে পাইনে ?

তোমার মতো ঝগড়াটে নই, বনিবনা সকলের সঙ্গেই হয় আমার ।

লক্ষ্মী মেয়ে ।

ভালো হবে না বলছি—। বিগত দিনের সুর ।

তারপর, পড়াশুনা ?

হচ্ছে—। সরমা উঠে আলো জ্বেলে দিল ঘরের ।

সময় দেন তো চৌধুরীমশাই ?

ফের ?

ঘরের চারিদিকে পরীক্ষাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সরমা ভুরু কোঁচকালো । পরে হেসে ফেলে বলল, তুমি কি ভেবেছ আগের মতোই এসে তোমার ঘর গুছিয়ে দিয়ে যাব আমি ?

জামাকাপড় বইপত্র সবকিছু তছনছ হয়ে পড়ে আছে যেটার যেখানে খুশি । সশঙ্ক দৃষ্টিতে অবিনাশও একবার দেখে নিল চারদিক । ওর চোখে পড়েছে যখন সংস্কার অনিবার্য । খুশি করার জন্যই জবাব দিল, নিশ্চয় দেবে, নইলে এসে করবে কি আগের মতো ? কিন্তু তা বলে আজ ও-সব কিছুতে হাত দেওয়া চলবে না ।

আজ কি ?

গুরুবার ।

তোমার মুণ্ডুবার ।

উঠে শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে নিল সরমা ।—চাদরটারও তো দেখছি তেমনি ছিরি ।

অবিনাশ অসহায় কণ্ঠে বলে ওঠে, আমার ছিরিটাই বা এগুলোর থেকে এমন কি ভালো —আজ থাক না ?

থাকবে বইকি, নইলে ভালো হাতে অসুখ বাধাবে কি করে ।

যাবতীয় সামগ্রী সুবিন্যস্ত হল আবার । ঘরটাও ঝাঁট দিয়ে ফেলল সরমা । অবিনাশ শুয়ে শুয়ে দেখছে আর হাসছে মনে মনে । যে স্নেহ এবং আগ্রহ আজ পরিস্ফুট ওর মুখে, তার হেতু অন্য কিছু ।

সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে শাড়ির আঁচলেই হাত মুছে নিল । ঘরের কোণে টিনের তোরঙ্গটা খোলাই থাকে বারোমাস । একটা চাদর বার করে পাট ভেঙে সামনে এসে দাঁড়াল । ওঠো—

ওঠবার লক্ষণ নেই, অবিনাশ চেয়েই আছে তেমনি ।

সরমা হেসে ফেলেও সামলে নিল চট করে । ওঠো না ?

অবিনাশ অস্ফুট হাস্যে গা ছেড়ে দেয় আরো । নাটকীয় সমর্পণের ঢং এ টেনে টেনে বলে 'চক্ষে তোমার কিছু বা করুণা ভাসে, ওষ্ঠ তোমার কিছু কৌতুকে হাসে, মৌনে তোমার কিছু লাগে মৃদু সুর—।'

বেশ, কাব্য করবে না উঠবে ? রাত হয়ে গেল, আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে না ?

এ কাজটুকু অন্তত আমি পারব, তুমি চাদরটা রেখে এই চেয়ারে বসো বলছি ।

কিন্তু ওর বিরক্তি লক্ষ্য করে উঠতে হল তৎক্ষণাৎ । চেয়ারে আশ্রয় নিয়ে নিরুপায় কণ্ঠে বলল আচ্ছা, যতটা লক্ষ্মীছাড়া ছন্নছাড়া ভাবছ ততটা যে নই আবার এলেই দেখবে । তোমার করুণা বরদাস্ত করার পাত্র নই আমি ।

সরমা পরিষ্কার চাদরটা বিছানায় ফেলল । পরে মুখ না ফিরিয়েই নিরীহ মুখে বলল, অন্য কোনো করুণাময়ীর সন্ধানে লেগে যাবে ?

জবাব দেবার সময় পেল না অবিনাশ । দোরগোড়ায় মোটর থামার শব্দ । বিছানায় উঠে চাদরের ধারগুলি টান করে গুঁজে দিচ্ছিল সরমা, বিস্মিত নেত্রে ফিরে তাকালো সেও । পরক্ষণে ঘরে প্রবেশ করল যে তাকে ওরা আশা করেনি কেউ ।

বিপিন চৌধুরীর দিক থেকেও এ শয্যা-বিন্যাসের পরিস্থিতি কল্পনার বাইরে ।

সরমা নিজের অজ্ঞাতেই হঠাৎ আরক্ত হয়ে উঠল । কোমরে জড়ানো শাড়ির আঁচলটা খুলে মাথায় ফেলল সে ।

বিপিনের মুখের মুহূর্তের স্তব্ধতাটুকু এড়ায়নি অবিনাশের । সহাস্যে উঠে দাঁড়াল । —এতগুলি হাতির পা আজ গরীবের কুঁড়েয়, কি ব্যাপার ! বসুন, শর্ষেফুল দেখছিলেন তো চোখে ?

নিস্পৃহ মুখে বিপিন বলল, রাত হচ্ছে দেখে এলাম একবার—

মস্ত এক ফাঁড়া কেটেছে যেন এমনি মুখ করে তড়বড়িয়ে উঠল অবিনাশ, খুব ভালো করেছেন, নইলে আমাকে নাকে দড়ি পরিয়ে নিয়ে যেত এক্ষুনি ।

সরমা ধীরেসুস্থে বিছানার চাদর টান করতে লেগে গেছে আবার । অবিনাশ বাধা দিল, ও এখন থাক, মানুষটাকে দেখো একবার—ক'জনকে চাপা দিয়ে এলেন খবর নাও ! উৎফুল্ল মুখে বিপিনের দিকে চেয়ে বলল, আপনার স্ত্রীর মহিষমর্দিনী রূপটা পুরোপুরি দেখতে পেতেন আর একটু আগে এলে, এখন ঘোমটা টেনে কলাবউ সেজেছে । ওই দেখুন ঝাঁটা, ঘর সংস্কার করে আমাকেও একদফা...থাকগে কি আর বলব— ।

বিপিনের মুখে গাম্ভীর্যের ব্যতিক্রম নেই এবারেও । বাড়ির আটপৌরে মেয়ের মতো সরমার এ অন্তরঙ্গ সহজতর আকর্ষণ আছে বলেই মেজাজ আরো বিগড়ে যায় । ঠাট্টার ছলেই ফিরে ব্যঙ্গ করল, শুধু ঝাঁটায় কুলোবে তো ?

অবিনাশ হেসে উঠল হা হা করে ।—আমাকে এমন করে জব্দ করলে নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই কিন্তু ঝগড়া হয়ে যাবে আপনার !

মনে মনে ভাবল বিপিন, সে ভয় আছে দেখতেই পাচ্ছি । পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখের সামনে ঘোরালো বার কতক । অর্থাৎ, গরমে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ।

অবিনাশ তাড়াতাড়ি একটা হাতপাখা এগিয়ে দিল ।

থাক—

পাখা হাতে রেখে অবিনাশ হাসল একটু । দারিদ্রের পরোয়া করে না, তবু বিব্রত দেখাচ্ছে আজ ।

বিপিন বলল, আছেন কেমন, সেদিন তো এলেন না ?

নিতান্তই ভদ্রতা রক্ষার্থে । অবিনাশ সবিনয়ে জবাব দেয়, কথায় আছে অভাগা চাইলে সমুদ্র শুকোয় । আপনাদের নিমন্ত্রণ অবহেলা করতে পারি এমন কদর অবিনাশ শর্মার নয় —জবাবদিহি করেছি একবার । কই সরমা, বল না ?

সরমা তক্তাপোশের ধারে সরে এসে পা নামিয়ে বসল । বিপিনের হাবভাবে প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞাটুকু লক্ষ্য করেছে । অবিনাশের বিনম্র কথাগুলি বিরক্তিকর আরো । জবাব দিল,

যাওনি তো যাওনি, তার জন্যে এত বিনয় কেন ? এবার না হয় চিঠি চোখে পড়েনি সময়মতো, লোকের ভিড় আর কবে না এড়িয়ে গেছ তুমি ?

অবিনাশের বিপন্ন মুখভাব যেন গ্রাহ্যই করল না, বিপিনের দিকে চোখ ফেরাল সে। —তোমার না ফিরতে রাত হবে বলেছিলে ?

আগের বক্রোক্তি যথাযথ অনুধাবনে ভুল হল না বিপিনের। সম্ভ্রমের পালিশে আঁচড় পড়ল ঠিকই। গত্যন্তর নেই মনোভাব গোপন করা ছাড়া। হাসল।—রাত মানে যদি বারোটা একটা ধরো তাহলে ঠিক বলিনি। আমি কিন্তু উঠব এক্ষুনি, তোমার দেরি হবে ?

বাঁকা শোনায়। ঈষৎ বিস্মিত নেত্রে তাকালো সরমা। কোথা দিয়ে যেন একটা নিষেধের বেড়াজাল সৃষ্টি হয়ে গেছে চারদিকে। জীবনের এই নতুন অধ্যায়ের প্রতিটি পদক্ষেপ আর একজনের অনুমোদন-সাপেক্ষ।

হয়তো বা এটা সরমারই মনের গলদ। বিপিনের অপ্রত্যাশিত আগমনে নিজের মুহূর্তকালের বিভ্রমটুকু অজ্ঞাত নয় নিজেরও। কৈফিয়ৎ নেই বলেই দাহ আছে।

আর মনে মনে ভাবছে অবিনাশ, ওর জন্য সরমার এই শয্যা-রচনা যেন অন্তিম শয্যাই হয়। তবু কলকণ্ঠে সে-ই সাড়া দিল আগে, দেরি হবে কি মশাই ! ঝাড়া তিন ঘণ্টা বকিয়েছে, আর নয়—আড্ডায় একবার জমলে সময় জ্ঞান থাকে নাকি ওর !...একটা কথা, এর পরে আপনি নিয়ে আসবেন সঙ্গে করে, নইলে উঠতে বসতে শাসন অসহ্য।

পাছে সরমার চোখে চোখ পড়ে যায় এই ভয়ে আর একদিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাসতে লাগল সে। অন্য লোকের সহস্র কটাক্ষেও যে মেয়ের শান্ত মুখে এতটুকু রেখা পড়বে না, ওর সামান্য কথায় তারই চণ্ডী-মূর্তি বহুবার দেখেছে। এখনো ওর জ্বলন্ত চোখ দু'টো ঠিকই অনুভব করল।

বিপিন চেষ্টা করে হাসল আবার একটু। বলল, মেয়েদের শাসন আর্টিস্টদেরই মনোপলি, সকলের কপালে জোটে না—বাধা দিতে গিয়ে ঘরের সঙ্গে লড়াই বাঁধাব ! তার চেয়ে অনেক সহজ পাটের দর চড়িয়ে দেওয়া। উঠে দাঁড়াল। সৌজন্য প্রকাশে ত্রুটি নেই।—আমি দালাল মানুষ, সময় কম বুঝতেই পারেন, আপনিই আসুন মাঝেমধ্যে আমাদের বাড়ি। পরীক্ষা কাছে এখন, সে গ্যারান্টিও দিচ্ছি। আসবেন তো ?

দু'দিন আগেও সরমার সপ্রশংস মনোভাবই ছিল ! লোকটার রাখা ঢাকা নেই কিছু, মুখের দিকে চাইলে মনের কথা বোঝা যায়। কিন্তু সেটাই আজ এতবড় লজ্জার কারণ হবে ভাবেনি। পরীক্ষার তাগিদে সিনেমায় না যাওয়ার কথাটা মনে পড়ে আবার। আর লোকের ভিড়ের প্রসঙ্গও ও নিজেই উত্থাপন করেছে। দেখল, হাসিমুখেও মাথা নেড়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে অবিনাশ, যাবে—। কিন্তু তার ভিতরের বিপর্যস্ত মূর্তিটা গোপন থাকার কথা নয় সরমার চোখেও।

মোটর ছুটেছে।

গাড়ির বেগে বিপিনের অসন্তোষের মাত্রা নির্ণয় করা যেতে পারে। পাশে সরমা। সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে।

অস্বস্তি কাটিয়ে বিপিনই সহজ হতে চেষ্টা করল প্রথম !—মণ্টু রাস্কেল্‌টার নিতে আসার কথা ছিল তোমাকে, না ?

সরমা শান্তমুখে তার দিকে চেয়ে রইল খানিক। পরে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, পথে চলাফেরা করতে চলনদার লাগে আমার তাই জানতে নাকি তুমি ?

ঠাণ্ডা স্পর্শের মতো লাগে কণ্ঠস্বর। বিপিন আড়চোখে তাকালো একবার। গাড়ির স্পীড় কমিয়ে দিল খানিকটা। মণ্টুর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ওজরে অপ্রীতিকর জিজ্ঞাসাটা থামিয়ে দেওয়াই বিধেয়। বলল, সে কথা নয়, ভাবলুম ওর জন্য অপেক্ষা করে বসে আছ।

তাতেই বা দোষের কি ?

বিপিন জবাব দিল না। তার দোষ নেই, আজকের ব্যবহারে অশোভন যদি থাকেই কিছু তার জন্যে দায়ী ডাঃ চন্দ্র, মণিময় এবং সব থেকে বেশি সরমা নিজে। একটু নীরব থেকে বিপিন আসল সমস্যার সম্মুখীন হল সরাসরি। বলল, এই নিয়ে তিন দিন আলাপ অবিনাশবাবুর সঙ্গে, কিন্তু এখনো ঠিক চিনলুম না ভদ্রলোকটিকে।

সরমা সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, সময় লাগবে চিনতে।

অন্ধকারে বিপিনের মুখের বর্ণান্তর দেখা গেল না।

সরমা বসে আছে তেমনি, দু'চোখ সামনের দিকে। জিজ্ঞাসা করল, অবিনাশকে চেনার থেকেও তার সঙ্গে আমার এ ঘনিষ্ঠতা কেন এই হয়তো বিশেষ করে জানতে চাও তুমি না ?

নিরুত্তর।

সেদিন উৎসব-রাত্রিতে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েও মনে মনে হেসেছে সরমা আজ আর তা সম্ভব হল না। আজ হোক কাল হোক এ নগ্ন জিজ্ঞাসার বোঝাপড়া আছেই। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হবে সেটা ভাবেনি। হল যখন, শেষ হওয়াই ভালো। একটু অপেক্ষা করে নরম করেই বলল, তার আগে একটা কথা তোমাকে ভেবে দেখতে বলি। বিয়ের আগে স্বাধীনই ছিলুম আমি, কেউ বাধা দেবার ছিল না কোথাও—সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেতেই তোমাদের বাড়ি এসেছি। অবিনাশকে চিনতে চাও ভালো কথা, কিন্তু তাকে নিয়ে এ দুর্ভাবনা কেন ?

অখণ্ড নীরবতা। গাড়ির একটানা শাঁ শাঁ শব্দ। রগ-চটা বিপিন চৌধুরীর নিরুপায় বিক্ষোভ দাহ্য পদার্থের মতোই ওঠা-নামা করছে দেহে। নিষ্ক্রমণের পথ নেই। কারণ ইঙ্গিতটা মিথ্যে নয়।

রাগ করলে ? সরমা কাছে এলো একটু।

অন্ধকারে মাথা নাড়ল বিপিন। অস্ফুট একটা শব্দ নির্গত হল শুধু।

কিন্তু অবিনাশ উপলক্ষ মাত্র। সত্যিই কেন এ দুর্ভাবনা হয়তো বিপিন নিজেও জানে না সঠিক। একটা অস্বস্তিকর বোঝা বিজড়িত এর সঙ্গে। যোগ্যতার মানদণ্ডে নিজেই নিপীড়িত। ঐশ্বর্যের আড়ম্বর যত বড় করে তুলতে যায়, মনের দিক থেকে দেউলে হয়ে পড়ে ততো বেশি। সরমার একান্ত সান্নিধ্যে এসে ওর শিক্ষা এবং স্বতন্ত্র সত্তার পরিবেষ্টনীতে বেমানান লাগে নিজেকে। আকর্ষণ বাড়ে। ভয়ও। ঐশ্বর্যের বাইরে শিগগীরই হয়তো আরো কিছু অনুসন্ধান করবে সরমা যা তার নেই। তাই পাওয়ার আনন্দটা যত বড়, তাকে ছাপিয়ে ওঠে হারাবার ভয়ে।

বিগত সন্ধ্যাটা বেশ কিছুদিন মনে ছিল বিপিনের।

ফিরে সেই গোড়ার দিকের পথ অবলম্বন করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিল। ওর

আত্মসমর্পণের সহজতাও অনেক সময় বিপন্ন করে তোলে সরমাকে । পরীক্ষা এগিয়ে আসছে । খাটুনি বাড়ছে । কিন্তু রাত্রে দশটা না বাজতে বিপিন পড়ার ঘরের বাইরে পায়চারি শুরু করে দেবে ঘন ঘন । ডেকে বাধা দেবে না একবারও ! কিন্তু এ প্রতীক্ষার আহ্বান কোনো ডাকাডাকির থেকে কম না ।

পড়ার সাথী মণ্টু এক-একদিন বই আড়াল করে হাসতে থাকে । তবু কিছু না দেখার ভান করে সরমা নিজেকে আটকে রাখে বেশ কিছুক্ষণ । কোনদিন বা হেসেই ফেলে । উঠে হাতের বই দিয়েই মণ্টুর পিঠে বসিয়ে দেয় এক ঘা— । খুব যে ! পালাও আর পড়ব না ।

নিজের ঘরে এসে ছদ্মরাগে বিপিনের সম্মুখীন হয় কোনদিন, পরীক্ষা আছে না আমার ?

আমিও তো আছি । বিপিন নির্বিকার ।

বেশ ! খানিক মুখ গোঁজ করে বসে থেকে সরমা আবারও হেসেই ফেলে শেষপর্যন্ত ।

এরপর আর এক খেয়াল চাপল বিপিনের । বিয়ের আগে অবিনাশ বিদ্রূপ করেছিল ব্যাঙ্কের পাস বইয়ের জোর থাকে তো বাড়িতে যেন একটা ল্যাবরেটারি করে দেয় সরমাকে । মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্গুণ ব্যস্ততা । শুনে সরমা অবাক ।

ল্যাবরেটারি ! এ কি ঘরের চাল ডাল নাকি যে এনে মজুত করলেই হল ? যেমন অবিনাশের বুদ্ধি—কোন হাঙ্গামা করে কাজ নেই এখন ।

হাঙ্গামা আছে বলেই বিপিনের উৎসাহ । আর দশজনের দ্বারা সম্ভবপর হলে গা করত না । সরমার কাছে আমল না পেয়ে মণ্টুর সঙ্গেই গোপন মন্ত্রণা চলল । সরমা পরীক্ষার পড়ায় ব্যস্ত । ষড়যন্ত্র টের পেল না ।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল, যন্ত্রপাতি ব্যালান্স গ্যাস-জার ফানেল টেস্ট-টিউব বার্নার প্রভৃতির আমদানি শুরু হয়েছে ।

মণ্টু মাথা চুলকে পড়ার ঘরে এসে উপস্থিত ।—বৌদি, তোমার ঘরে গিয়ে বোসো একটু, এই ঘরে লোক আসবে ।

সরমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুলল ।

গ্যাস অ্যারেঞ্জমেণ্ট্ ফিট্ করতে হবে, আর মিস্ত্রি এসেছে লম্বা ডেস্ক বসাবে একটা ।

নিচে এসে ব্যাপার দেখে সরমার চক্ষু স্থির ।—তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে ?

মাথা খারাপ হবে কেন । বিপিনের মেজাজ প্রসন্ন ।

এখানে এসব দিয়ে হবে কি ?

বিপিন দমে যায় একটু । কিন্তু মণ্টু উল্টে বকুনি ঝাড়ে, যা হবার হবে, তোমার কাজে না লাগুক আমার লাগবে—এখন সরো এখান থেকে, কাজ করতে দাও ।

পড়ার ঘরে ল্যাবরেটারির মতো পত্তন হল একটা কিছুর । আলমারিতে থাকে থাকে অ্যাসিড এনে সাজাল মণ্টু । অপরিমিত অর্থব্যয় হল এইগুলি সংগ্রহ করতেও । কারণ, দাম দিলেই বাজারে পাওয়া যায় না সব জিনিস ।

টাকার শ্রাদ্ধ দেখে চারুদেবীর অসন্তোষ প্রকাশ্যে মুখর । সব কিছুর উপলক্ষ হয়ে সরমা লজ্জায় সঙ্কোচে নিজের ঘরে আবদ্ধ থাকে দিন কতক ।

কিন্তু ব্যর্থ বিপিন চৌধুরীর সগর্ব প্রতীক্ষা ।

অবিনাশ এলো না ।

ক্ষুদ্র রসায়নগারটিও অভ্যস্ত হয়ে গেল সকলের চোখে । মণ্টুর উৎসাহ অপরিমিত । আর ক্রমশ এ ঘরটার প্রতি সরমার প্রচ্ছন্ন আকর্ষণও বিপিন অনুভব করতে পারে ।

আই. এস্-সি পরীক্ষার ফল মন্দ হয় নি মণ্টুর । বি. এস্-সি. ক্লাসের ছাত্র এখন । রাসায়নিক গবেষণার ঝোঁকও তাই প্রবল । যতক্ষণ পড়ে সরমা, কলেজপাঠ্য একটা কিছু এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে সে তন্ময় । কখনো বা চিৎকার করে ওঠে আনন্দে, ম্যাগনফিসেণ্ট ফেলিওর ! ম্যাডাম কুরি ! এদিকে আসবে তো এসো, নইলে সব ওলটালুম ।

সেদিন রীতিমতো উত্তেজনা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল সে, চাপা গলায় ডাকল, বৌদি !

হুঁ— ।

দেখই না চেয়ে !

পকেট থেকে শিশি বার করল একটা । সমস্ত মুখ সাফল্যস্ফীত । সাড়া পেয়ে পাশের ঘর থেকে বিপিনও উপস্থিত ।

সরমা জিজ্ঞাসা করল, কি এটা ?

মণ্টু শিশির লেবেলটা ধরল তাদের দিকে । সাইনাইড্ ।

বিপিনের মুখ সাদা হয়ে গেল এক নিমেষে। সরমা অবাক । কি হবে এতে ?

সোনার উপর অ্যাকশান দেখব ।

সরমা রাগতে গিয়েও পারে না ।—সোনা-দানার খুব ছড়াছড়ি পড়েছে বাড়িতে, কেমন ?

কতটুকু আর লাগবে, এইটুকু তো— । সকরুণ আবেদন মণ্টুর ।

বিপিন আত্মস্থ হয়েছে খানিকটা । শাসনের সুরে বলল, এসব বাড়িতে আনা উচিত হয়নি তোর । সরমার দিকে তাকালো সে, দেখতে চায় দেখুক না, তুমি জানো নাকি কি করতে হবে ?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মণ্টু বলল, আমরাই ঘাঁটাঘাটি করি সাইনাইড নিয়ে তার আবার—

জিনিসটার এতটা মর্যাদা দিয়ে ফেলে বিপিন মনে মনে অপ্রস্তুত । গলার কাছের বোতমটা ছিঁড়ে নিয়ে সরমার সামনে রাখল ।—আচ্ছা, দেখা যাক কি হয় ।

বই রেখে সরমা গম্ভীর মুখে উঠল এবার । আঁচলের চাবি দিয়ে অ্যাসিডের আলমারি খুলল । মণ্টুর হাত থেকে শিশি নিয়ে এক কোণে আড়াল করে রেখে দিল সেটা । আলমারির তালা বন্ধ করে বোতামটা আঁচলের খুঁটে বেঁধে পড়তে বসল আবার ।

বারকতক মাথা চুলকে মণ্টু প্রস্থান করল ঘর থেকে । বেগতিক দেখে বিপিনও চলে এলো । মারাত্মক জিনিসটা থাকল আলমারির মধ্যে, এ অস্বস্তি সম্পূর্ণ যাবার নয় । মণ্টুকে আচ্ছা করে ধমকে দেওয়া দরকার ।

দিন যায় । এত করেও অবিনাশকে মন থেকে একেবারে সরানো সম্ভব হল না যেন । আমন্ত্রণ সত্ত্বেও একদিনও আসেনি এখানে । এলে বিপিন সন্তুষ্ট হত এমন নয় । কিন্তু সরমাই আরো বারকতক গেছে তার ওখানে । কখনো মণ্টুর সঙ্গে, কখনো একা । পুরানো ক্ষতের ওপর নতুন করে লাগে । কিন্তু মনোভাব গোপন করে বাইরের সহজতা বজায় রাখতে শিখছে

বিপিন ।

ভাগ্যচক্রের পরিহাসের কেবলমাত্র শুরু এটা । হঠাৎ আসল সংঘাত উপস্থিত কর্মক্ষেত্রের দিক থেকে । সহকর্মী ঘনশ্যামবাবু বিপদের লাল নিশানা দেখে আগেই সাবধান করেছিলেন ।

কিন্তু বিপিনের আত্ম-বিস্মৃত দু'চোখের একান্ত দৃষ্টি তখনো ঘরের দিকে ।

সংশ্লিষ্ট কতগুলি ছোট ব্যাঙ্কের পতন ঘটল একে একে ।

বোম্বাই শহরের অনেক ঘরেই ত্রস্ত আলোড়ন পড়ে গেল একটা । ভাঙনের ত্রাস দেখা দিল ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ী মহলে । আর সহসা প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে প্রকৃতিস্থ হল বিপিন চৌধুরী ।

দিবারাত্র পরিশ্রমের ফলে বাঁচল কিছু । কিন্তু গেল যা তাও অনেক দিনের সঞ্চয় ।

বাড়িতে কিছু প্রকাশ করা সম্ভব নয় । অর্থের নিশ্চিন্ত আচ্ছাদনে নিজের যে অভাব পরিপূর্ণ করে ঢেকে দেবে সরমার চোখে, ভাঙন ধরেছে সেই সঞ্চয়ে । বাইরে সহ-ব্যবসায়ীর উপদেশ, ঘনশ্যামবাবুর তাড়না । ঘরে চারুদেবীর নিশ্চিন্তে মহাভারত পাঠ, মণ্টুর গবেষণা, সরমার পরীক্ষার পড়া এবং সময় পেলে এরই মধ্যে অবিনাশের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । রুক্ষ তিক্ত ক্ষিপ্ত হয়ে গেল মেজাজ ।

তার এই পরিবর্তনটুকুই শুধু চোখে পড়ে সকলের । সরমা পরিষ্কারই জিজ্ঞাসা করল একদিন, কি হয়েছে তোমার আজকাল বলো তো ?

কি হবে—

কিছু না ?

হঠাৎ নড়েচড়ে বসল বিপিন । চোখে চোখ রেখে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।—আমার যদি হয়ও কিছু তোমার পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটবে একটুও ? আর—

অবিনাশের নামটা মুখে এনেও সামলে নিল ।

কি আর ?

বিপিন অন্যদিকে মুখ ফেরাল ।

সরমা খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, দেখো, নিজের মন থেকে যারা দুঃখ সৃষ্টি করে দুঃখ পায়, তাদের অদৃষ্টে শান্তি লেখা নেই কোন কালে ।

আবার গিয়ে পড়তে বসল সে ।

বিপিন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সেদিকে । যন্ত্রপাতি সমেত ওই ঘরটাকে ভস্ম করতে পারলে শান্ত হত ।

আগের উদ্যম নিয়ে কাজে লাগলে যা গেছে তার চারগুণ ফিরিয়ে আনতে পারে, নিজের এমন একটা বিশ্বাস আজও আছে । কর্মক্ষেত্রে নিজেকে এবার নির্বাসিত করলও সম্পূর্ণ । কিন্তু মনের আষ্টেপৃষ্টে শিকল বাঁধা ।

॥ ১১ ॥

মেরিন্-লাইনস্-এর ল্যাবরেটারির দু'জন সহকারী এসেছে । ভুটা এবং হরিআনন্দ । নির্বাচনে

বাহাদুরি আছে সমাদ্দারের । গুণী দু'জনেই । কিন্তু এমন বিপরীতমুখী যোগাযোগ সুদুর্লভ । ভুটার দিকে তাকালে মনে হবে লোকটা বুঝি রাতের মুখ দেখেনি কখনও । হাসি-খুশিতে ভরপুর । হরিআনন্দ্ অবলীলাক্রমে দেশ-বিদেশের ডিগ্রী আহরণ করে গেছে একের পর এক । কিন্তু মুখ থেকে ফেল করা ছাত্রের সঙ্কোচ গেল না । একসঙ্গে দু'টোর বেশি কথা বলতে গেলে কান লাল হবেই । কোনো দুরূহ মীমাংসার মুখে সকলে যখন ব্যস্ত-সমস্ত, সে হয়তো সসঙ্কোচে ভুটার কানে কানে সন্ধান দেবে, অমুক জার্নালের অমুক পাতায় হদিস মিলতে পারে, একবার দেখলে হয়...। এদিকে তার সদা-বিব্রত মুখভাব দর্শনে ল্যাবরেটারির সুদক্ষ বেয়ারাও সংশয়াপন্ন । দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে অনেক সময়, অ্যাপারেটাস ফিটিংএ গলদ আছে কি না ।

সমাদ্দারের কাজ শুরু হয়েছে পুরো উদ্যমে । একদিকে ওষুধের ফ্যাক্টরী, অন্য দিকে ল্যাবরেটারির রিসার্চ । প্রবল প্রাণ-শক্তি মানুষকে সুন্দর করে তোলে কত, ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধটির দিকে চেয়ে চেয়ে অনেকেই উপলব্ধি করে সেটা । পূর্ব-ব্যবস্থা মতো রিসার্চের প্রধান দায়িত্ব ডাঃ চন্দ্রর । সারা পৃথিবীর কেমিকাল লিটারেচারে মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন দিবারাত্র ।

সেদিন বিকালের দিকে সমাদ্দার ফ্যাক্টরী থেকে ল্যাবরেটারিতে এসে দেখেন শুধু চন্দ্র ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে । সমাদ্দার খালি ডেস্ক দু'টোর দিকে চেয়ে ফেটে পড়লেন প্রায় ।

এঁরা সব গেলেন কোথায় ?

চন্দ্র বিজ্ঞান-তথ্য থেকে মুখ না তুলেই হাসলেন একটু । জবাব দিলেন না ।

এই করে সব রিসার্চ করবে, অ্যাঁ ! ছ'টা না বাজতে হাওয়া !

চন্দ্র বললেন, তবে কি এক ন'টায় এসে আর এক ন'টায় যাবে ?

আর এক ন'টায় মানে ? দরকার হলে তার পরের দিন ন'টায় যাবে, দরকার হলে একদম যাবে না !

দরকার হোক আগে । বিকেলে ওদের খেতে দেবে কে, সে ব্যবস্থা করেছেন ? বুড়োকে একটু জব্দ করতে চেষ্টা করলেন চন্দ্র ।

থতমত খেয়ে গেলেন সমাদ্দার । পরক্ষণে উল্টে তেতে উঠলেন তাঁরই ওপর—কেন করোনি ব্যবস্থা ? তোমার ওপর ভার দিলে এমনি হবে জানি । সকাল ন'টা থেকে আটকে রাখো ওদের, খাওয়া নেই দাওয়া নেই—এই সন্ধ্যে পর্যন্ত ! কাজ করতে এসে শেষে অসুখে পড়ুক, কেমন ?

চন্দ্রর বিপদ কম নয় । হরিআনন্দ্ এবং ভুটার সামনেও এমনি ধমক খেতে হয় । অথচ, তিনি নিজে যেদিন থাকেন ল্যাবরেটারিতে কোনদিন ছুটি দেন পাঁচটায় কোন দিন বা তারও আগে । চন্দ্রকে বলেন, রিসার্চের থার্স্ট যখন ভিতর থেকে আসবে ওদের, দিন রাত এখানে পড়ে থাকবে দেখো—।

মাঝখান থেকে জলযোগের খরচাটা বাড়ল ।

সায়েন্স কলেজ । ঘণ্টা বাজল । পরীক্ষার্থীরা বেরিয়ে আসছে । সিঁড়ির একপ্রান্তে অবিনাশ দাঁড়িয়ে । সরমা মহা খুশি তাকে দেখে ।

তুমি যে।

আজ্ঞে। শেষ হয়ে গেল তো পরীক্ষা?

হ্যাঁ।

বালাই গেল।

গাড়ি নিয়ে বিপিনও অপেক্ষা করছে পথের ধারে। আপ্যায়নে বাধা পড়ল অবিনাশকে দেখে।

কেমন দিলে পরীক্ষা?

ভালো উৎফুল্ল মুখে সরমা বলল, আজ যে দেখি গ্রাণ্ড রিসেপশান্! তিনটের মধ্যেই কাজ শেষ তোমার?

দিনটা শনিবার সরমার খেয়াল নেই। পরীক্ষা-পর্ব শেষ জেনে বিপিন খুশিমনেই এসেছিল। কিন্তু যে মানুষ বাড়ি এলো না একবারও তার এখানে যাতায়াত ভালো লাগার কথা নয়।

জবাব দিল, আবার যেতে হবে, এমনি খোঁজ নিতে এসেছিলাম। আপনা থেকেই অবিনাশের দিকে চোখ পড়ে এবার!

দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো অবিনাশ।—তবু ভালো দেখতে পেয়েছেন। আপনার স্ত্রী য়ুনিভার্সিটির কবল থেকে ছাড়া পেল এতদিনে, দিনটা সেলিব্রেট করা উচিত।

বিপিন হেসেই বলল, করুন সেলিব্রেট...কিন্তু আমি নিরুপায়। বিজনেসম্যানেব কপালে আর্টিস্টের সাহচর্য কদাচিৎ জোটে। চলি, কেমন?

একমুখ হেসে সে প্রস্থান করল।

একটা বড় নিঃশ্বাস টেনে ঠাট্টার ছলেই মনোভাব ব্যক্ত করল অবিনাশ।—ভদ্রলোককে রোগেই ধরল নাকি শেষপর্যন্ত বুঝছিনে।

হয়তোবা অস্বস্তিব মতো লাগছিল সরমারও। জোব দিয়ে প্রতিবাদ করল, ভদ্রলোক নিষ্কর্মা নয় তোমার মতো, সত্যিই আজকাল নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই, দিনরাত কাজে ডুবে আছে।

অবিনাশ নিশ্চিন্ত হল যেন।—বাঁচালে। কিন্তু এখন যাওয়া হবে কোথায়?

তোমাব প্ল্যান ছিল কিছু?

প্ল্যান আবার কি। হাসতে লাগল, পথে-ঘাটে আর লাইটপোস্টের গায়ে যে রকম পোস্টাবের ছড়াছড়ি অপর্ণা চন্দ্রর, দেখার ইচ্ছে ছিল কি এমন অসাধ্য সাধন করলেন। মণিময়দা'ব গল্প তো জানই—

পরীক্ষাব চাপে এ প্রসঙ্গ একেবারে মনে ছিল না সরমার। সোৎসাহে বলে উঠল, চলো দেখে আসি।

পর-মুহূর্তে মনে পড়ল কি। ভাবল একটু। কাল তো ববিবার? কাল চলো, আজ ক্লান্ত লাগছে।

বেশ তো! অবিনাশ হাসছে আবারও।

সরমা বলল, কাল দুপুরে তোমাকে ডাকব, কোথাও বেরিও না। তাছাড়া ডাঃ চন্দ্রর বাড়িও যেতে হবে একবাব, দরকারি কথা আছে।

অবিনাশ ঘাড় নাড়ল, তথাস্তু । যুগলে আসছ তো ?

সরমা হেসে ফেলল । আসছিই তো, তোমার খুশির মাত্রা কমবে তাতে ?

না ।

হাসছ যে ?

তোমার ক্লান্তির বহর দেখে । আমাকে বেশ খানিকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছে এও কম আনন্দের কথা নয় । নইলে বলতে, না বাপু আজ যাবার উপায় নেই, ঘরের লোকটিকে সঙ্গে নিতে হবে—আগের সরমার সঙ্গে মিল থাকত তাহলে । আর হেঁটে কাজ নেই, এই ট্রাম তোমার, উঠে পড়—কাল বাড়ি থাকব'খন ।

ট্রামে বসে সরমা পরীক্ষা-পত্রটা খুলল আবার । মনে মনে একবার হিসেব করে নিল কত নম্বর পেতে পারে । ভাঁজ করে রেখে দিল ওটা ।

জবাব দেওয়া যেতে পারত অবিনাশকে । বলতে পারত, আগের সরমা বদলেছে সত্যি, কিন্তু বদলেছে আগের অবিনাশও । অপরকে আপন করে নেবার যাদু-কাঠি যার জিভের ডগায় সে কেন এমন দূরে ঠেলে রাখল ওরই ঘরের লোকটিকে । বলবে । আবার উঠুক কথাটা ।

কিন্তু যাকে নিয়ে মনে মনে এ সুপারিশ, তার বিকলতার পরিধি কল্পনাতীত । বাড়ি ফিরে সরমা অবাক ।

বিপিন খাটে শয়ান । মাথার ওপর পাখা ঘুরছে পুরোদমে ।

পরদিন । যথাসময়ে সরমা ঘরে প্রবেশ করবার পরেও ঈষৎ ঝুঁকে অবিনাশ সরমার দিকে চেয়ে থাকে । দ্বিতীয় কারো সাড়া না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, বিপিনবাবু এলেন না ?

ডাকিনি । চলো, তিনটেয় তো শো ?

অবিনাশ জিজ্ঞাসু ।...ডাকোনি কেন ?

এমনি ।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে অবিনাশ সটান শুয়ে পড়ল আবার ।—বোসো । আজ থাক তাহলে, একসঙ্গে যাওয়া যাবে'খন আর একদিন ।

সরমা জোর দিয়ে বলল, না, আজই যাব ।

না ।

সরমা রেগে গেল । উঠবে তো ওঠো নইলে আর কোনদিন কোথাও যাব না তোমার সঙ্গে ।

না গেলে । অবিনাশ নির্লিপ্ত ।

খানিক তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সরমা দরজার দিকে অগ্রসর হল । তাড়াতাড়ি উঠে অবিনাশ হাত ধরে ফেলল ।

ছাড়ো, কাজ আছে । ঝাঁজিয়ে উঠল সরমা ।

অবিনাশের দু'চোখ তার মুখের ওপর নিবদ্ধ ।—পরীক্ষার গরম কাটেনি এখনো, না আর কিছু ?

অসহিষ্ণু ক্ষোভে সরমা বলে উঠল, তুমি যাবে কি না ?

যাব, বোসো—। দেয়ালের হুক থেকে জামা পেড়ে নিল । বলল, কোনদিন কোথাও যাবে না আমার সঙ্গে এর মানে এই নয় যে এখানে এসেও বসবে না পর্যন্ত । জামা গায়ে পরে হঠাৎ হাসল একটু, আচ্ছা তোমার যত তম্বি কি আমারই ওপর ?

সরমা চুপ । এখানে জোর খাটে বলেই নির্বিচারে খাটায়ও সে জোর । কিন্তু সকলের বড় জোর সেখানে খাটবার কথা মেয়েদের, সেখান থেকে একটা শূন্যতার আঘাত যেন বিদ্রূপ করে ওঠে তাকে ।

ভবিষ্যতের যাত্রাপথ নিরঙ্কুশ হবে না এ আভাস স্পষ্ট যেন...।

সহজকে সহজ করে দেখার মন নিয়েই ছেলেবেলা থেকে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ উত্তীর্ণ হতে চলল । এর মাঝে গৃহস্থ মেয়ের হাজার বিধিনিষেধের দণ্ড হাতে পাহারা দেয়নি কোন অভিভাবক । সহপাঠীর সসংকোচ উসখুসানি ভালো লাগত । ভালো লাগত বেপরোয়া বিপিন চৌধুরীর সাগ্রহ আকর্ষণ । এতে না ছিল কোন গ্লানি, না কোন লজ্জা ভয় । অবিনাশকে ঘিরে আজ সহসা একটা সমস্যা বিমূঢ় করে ফেলে তাকে । বিয়ের পর বিপিন যদি হাসিমুখে ঠাট্টা করত অবিনাশকে নিয়ে, হাসিমুখে বরদাস্ত করত সরমাও । কিন্তু এর ধার দিয়েও গেল না মানুষটা ।

ভাবল অবিনাশকে বলে দেয়, গতকাল সে যা অনুমান করেছিল মিথ্যে নয় । যথার্থই অবিশ্বাসের বীজাণুতে রোগাক্রান্ত তার ঘরের মানুষ । চুপ করে থাকে ।...বিপিনকে আজও বোঝেনি সঠিক এমন একটা আশ্বাস এখনো আছে । আর যদি সত্যিই বুঝে থাকে, নির্বাচনে এত বড় ভুলের লজ্জা অবিনাশের কাছে অন্তত পেতে চায় না ।

নির্দিষ্ট প্রেক্ষাগৃহের কাছে এসে মনের ভার কাটল অনেকটা । অবিনাশ গেছে টিকিট কাটতে । জনতার ঠেলাঠেলি বাঁচিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল সরমা ।

দেয়ালের গায়ে অপর্ণা চন্দ্রর একাধিক চিত্রিত মূর্তি । কৌতূহল সত্ত্বেও সরমা ভালো করে তাকাতে পারল না সেদিকে । নারী-মূর্তি রেখাঙ্কনে রুচির পরিচয় থাকার কথা নয় প্রচার-চিত্রকরের । আছে দেহের অংশ-বিশেষে বেপরোয়া তুলি চালনার স্থূল দক্ষতা । মূল্যবান বেশ-ভূষার ত্রস্ত আবরণ নগ্নতাকে লজ্জা দেয় । চলচ্চিত্র রস-পিপাসু জনতা এবং পথচারীর সাগ্রহ দৃষ্টি অনুসরণ করে বার বার তবু সেদিকে চোখ পড়ে যাচ্ছে সরমার । একা দাঁড়িয়েও লজ্জা পেতে লাগল কেমন ।

অবিনাশ টিকিট কেটে কাছে এলো, চলো । দু'পা এগিয়েই সে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার । সামনের দেয়ালে অপর্ণার সপ্রগল্‌ভ মূর্তিটি নিঃসঙ্কোচে দেখল চেয়ে চেয়ে । দুর্বোধ্য একটা শব্দ নির্গত করল মুখ দিয়ে । সরমার সঙ্গে দৃষ্টি মিলল পরক্ষণে ।

হঠাৎ কান পর্যন্ত রাঙিয়ে ওঠে সরমার । নিজেরই কোনো অসম্বৃত লজ্জার স্খলিত প্রকাশ যেন । অন্য দিকে চেয়ে তাড়া দিল, চলো না, দাঁড়ালে কেন ?

অবিনাশ হেসে ফেলল, যাচ্ছিই তো !

পরদায় তখন প্রচার-সংবাদ শুরু হয়েছে । পিছনের এক কোণের আসন থেকে প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকার বিদীর্ণ করে সেই দিকটার প্রতিটি আগন্তুককে লক্ষ্য করছেন একজন । ...ডাঃ চন্দ্র । পর পর দু'টো রবিবার চেষ্টা করছেন চেনা চোখ এড়িয়ে স্ত্রীর ছবি দেখতে । গতবারে সামনে ছিল জনাকতক ছাত্র । তাদের রসালাপে বিঘ্ন ঘটবার আগেই সংগোপনে

উঠে গেছেন। এবারেও হল না। অদূরে অবিনাশ এবং সরমা পাশাপাশি আসন নিয়ে বসেছে। একটু বাদে ইন্টারভ্যালের আলো জ্বলবে, হয়তো বা ফিরে তাকাবে ওরা—। শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন চন্দ্র, নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন পূর্ব দিনের মতোই।

বিজ্ঞানীর এই গোপন ব্যর্থতা সংসার-ক্ষেত্রেও। রঙ্গ-মঞ্চের মতো অপর্ণার অন্তঃস্থ পরদার প্রতিটি বর্ণচ্ছটা পর্যবেক্ষণের মর্মান্তিক আগ্রহে কতবার তার কাছে গিয়েও এমনি সংগোপনে ফিরে এসেছেন ঠিক নেই।

ছুটির দিনে সমাদ্দারের ওখানে যাবার কথা সন্ধ্যার পর। এতক্ষণ সময় বাইরে কাটানো সম্ভব নয়। অগত্যা বাড়ির পথ ধরলেন চন্দ্র।

দূর থেকে বৈঠকখানায় নারী-পুরুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর কানে এলো। অন্দরমহলে প্রবেশের দ্বিতীয় পথ নেই আর।

অপর্ণা এবং মণিময় ছাড়া আরো জনাকতক অপরিচিত এবং অপরিচিতার হাস্যোজ্জ্বল সমাবেশ। মানুষটিকে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সকলেই দৃষ্টি ফেরালেন।

স্টুডিওর গণ্ডি ছাড়িয়ে এই দলটির এখানে আসাটা তেতো ওষুধ গেলার মতো লাগছিল অপর্ণার। এখনো তার মুখের চকিত বিপন্ন ছায়াটা দৃষ্টি-গোচর হল না কারো। অতিথিবৃন্দের সপ্রশ্ন চাউনির জবাবে একটু হেসেই উঠে দাঁড়াল।—এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।...ইনি মিঃ দেশাই, প্রডিউসার।...ইনি ডিরেক্টর ত্রিবেদী।...মিস্ লয়লা খান, আমার সঙ্গেই নতুন নেমেছেন... মিসেস্ বেদী, কত হাসতে পারেন একবার এঁর ছবি দেখলে বুঝতে। মণিময়বাবুকে তো চেনই—ইনি মিঃ কাপুর, ক্যামেরাম্যান। অতিথিদের দিকে চোখ ফেরাল অপর্ণা, ডাঃ চন্দ্র—

অভিবাদন বিনিময়ের পর প্রযোজক দেশাই ইংরেজী এবং উর্দূ সংমিশ্রণে উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করলেন।—বসুন, আপনার স্ত্রীর ছবি দেখেছেন নিশ্চয় ? দেখেন নি ! হাউ-স্ট্রেইঞ্জ ! কালই পাস পাঠিয়ে দেব। সি হ্যাজ্ ওয়ার্কড মিরাক্‌ল—আপনাদের মতো সম্ভ্রান্তদের এ সহানুভূতি চিত্র-জগতে বিপ্লব আনবে আশা করতে পারি।

হাঁপিয়ে উঠলেন প্রায়। সঙ্গীসাথীরাও ঘাড় নেড়ে চিত্রজগতের স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আস্থা জানালেন।

গিরিরাজের অভ্যন্তরে তরল অগ্নি-স্রোত। বাইরে প্রশান্ত হিম-শীতল। চন্দ্রর শান্ত মুখেও নেই কোন দাহের ইঙ্গিত। বললেন, ভারী খুশি হলাম পরিচিত হয়ে।...কিন্তু আমার আবার কাজ আছে একটু। আচ্ছা নমস্কার...।

বিজ্ঞানীর ছদ্ম-ব্যস্ততায় ভিতরে চলে এলেন। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে শুনলেন অপর্ণার প্রশংসাবাণী, ওঁর মাইক্রোসকোপ ঠিক থাকে যদি, ইত্যাদি—। আর শুনলেন অপর সকলের পালিশ করা হাস্যগুঞ্জন।

ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন রেলিংএ ঠেস দিয়ে। কতক্ষণ ঠিক নেই। হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখেন, অবিনাশ এবং সরমা প্রবেশ করছে গেট দিয়ে।

তাড়াতাড়ি নিচে নামলেন। ড্রইংরুমের কারো দিক দৃকপাত না করে বাইরে এলেন।

কি ব্যাপার, তোমরা...।

অবিনাশ বলল, বৌদি সেই কবে নাকি সরমাকে নিমন্ত্রণ করে রেখেছিলেন, আজ তাঁর

ছবির প্রশংসা করতে গিয়ে মনে পড়ে গেল সে কথা ।

সারাপথ সরমা অবিনাশকে সাবধান করে এসেছে, সিনেমার প্রসঙ্গ যেন উল্লেখ পর্যন্ত না করে এখানে এসে । ফলে এই । কুণ্ঠিত মুখে বলল, আমি আজ নিজের কাজেই আসতুম আপনার কাছে ।

বেশ, অপর্ণার ছবি দেখে এলে বুঝি ?

হ্যাঁ...সত্যিই নিখুঁত অভিনয় করেছেন । সরমা না বলে পারল না ।

চন্দ্র হাসলেন, অভিনয় জিনিসটা নিখুঁতই হওয়া চাই, এসো—। তাঁর কাছে কারা সব এসেছেন, একজন অবশ্য তোমার দাদা...আচ্ছা এসই তো, এসো অবিনাশ ।

তারা দু'জন অনুসরণ করল অনেকটা যন্ত্র-চালিতের মতো । ঘরে ঢুকে চন্দ্র অপর্ণাকে লক্ষ্য করে বললেন, আজ সুদিন বলতে হবে, আরো সব অতিথি এসেছেন তোমার । প্রযোজকের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতে বললেন, না না—তাড়া নেই, ইউ টেক্ ইওর টাইম্ —আমরা ভিতরে গিয়ে বসছি ।

অপর্ণা ততক্ষণে উঠে এসেছে সরমার কাছে। পিছনে অবিনাশকে দেখে থমকে গেল মুহূর্তের জন্য । সরমা দু'হাত কপালে ঠেকাবার আগেই হাত দু'টি ধরে ফেলে সানন্দে বলল, নমস্কারে কাজ নেই, এসেছ এই ঢের—ওপরে গিয়ে বোসো আমি এক্ষুনি আসছি মূর্তিমানদের বিদায় করে ।

মণিময়ের দিকে চোখ পড়ল সরমার । ভোরবেলার পাণ্ডু চাঁদের মতো নিষ্প্রভ সমস্ত মুখ ।

চন্দ্র আগে আগে উঠলেন সিঁড়ি দিয়ে । পেছনে সরমা, তারপর অবিনাশ । গুমটের মতো লাগছে সরমার । মনের একান্ত নিভৃতে যে মন অন্তর্যামী, এ কোন্ ভবিষ্যতের দিকে তার নীরব ইঙ্গিত কে জানে । চলচ্চিত্রের এ হেন অভ্যাগতদের সামনেও অবশ্য অপর্ণার সাদাসিধে গৃহস্থ-বউয়ের আটপৌরে বেশবাসে আতিশয্য দেখল না । সিনেমার দেয়ালে বিস্রস্ত-বসনা নারী-মূর্তি যেন আর কেউ । ছবিও ভালো লেগেছে । দেয়ালের ও বিজ্ঞাপন পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণের উপলক্ষ শুধু, নইলে নায়িকার ভূমিকায় তার সংযত অভিনয়ে নারীর মর্যাদা-বোধ এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি কোথাও । কিন্তু এখানে এ পরিবেশ এবং সেখানে মণিময়ের উপস্থিতি—সহসা সব কিছুর যেন তাল কেটে গেল ।

ভাবছে অবিনাশও । সেদিনের সেই বিহ্বল সন্ধ্যায় দ্রুতগতি মোটরের অন্ধকারে পার্শ্বলগ্না লীলাসঙ্গিনীর এতটুকু মিল নেই আজকের অপর্ণার সঙ্গে ।

তাদের বসতে দিয়ে চন্দ্র নিজে খাটের ওপর বসলেন ।—এ ঘরেই আমি থাকি । সরমার দিকে তাকালেন, তোমার পরীক্ষার খবর বলো, কেমন দিলে ?

ভালোই...।

কতটা ভালো ?

সরমা স্মিতমুখে জবাব দেয়, ফার্স্ট ক্লাস পাব ।

বেশ ।...নিজের কি কাজের কথা বলছিলে তখন ?

সরমা বলল, পরীক্ষা তো হয়ে গেল, ডক্টর সমাদ্দারের ওখানে কবে থেকে যাব ঠিক করে দিন...।

প্রসন্ন মুখে খানিক হেসে নিলেন তিনি ।—ভয়ানক তাড়া যে । একবার ও ভদ্রলোকের সুনজরে পড়লে পালাতে চাইবে । অবিনাশের দিকে মুখ ফেরালেন, ফ্যাক্টরী তো আছেই, বাড়ির ল্যাবরেটারিতেও দিনরাতে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ হলে বোধ করি খুশি থাকেন ভদ্রলোক ।

সরমার কৌতূহল বাড়ল । দিবারাত্র এক কর্মমুখর সৃষ্টি-কাজে সেও একজন ভাবতে ভালো লাগে ।—আমি কোথায় কাজ করব ?

ল্যাবরেটারিতে । কারখানার কমার্সিয়াল মেডিসিনের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই ।

ওদিকে নিচে ড্রইংরুমের অতিথিরা গাত্রোত্থান করলেন । মজলিশ জমবে না আর বুঝেছেন । অপর্ণার নির্লিপ্ত অন্যমনস্কতার অর্থ সুস্পষ্ট । প্রযোজক দেশাই জানিয়ে গেলেন, নতুন ছবি রূপায়ণের আলোচনা মুলতবী থাকল আপাতত, কিন্তু শিগগীরই একদিন স্টুডিওতে আসা চাই অপর্ণার ।

অপর্ণা মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল শুধু । লক্ষ্য অন্য দিকে । ডাকল, মণিময়বাবু !

দরজার কাছ থেকে মণিময়ের প্রত্যাবর্তন ।

আপনি চললেন যে বড়, সরমার সঙ্গে দেখা করবেন না ?

দেখা তো হলই । আজ নতুন গান নিয়ে বসব দুই একটা...ওকে বলে দেবেন একদিন যাব'খন ।

অপর্ণার নীরব দৃষ্টি তার মুখের পরে বিচরণ করল স্বল্পক্ষণ । হাসল একটু । আচ্ছা, আসুন তাহলে ।

দোতলার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল অপর্ণা । যে কবেই হোক বুঝেছে, সেদিন প্রদোষ-কালের নাটকীয় ব্যাপারটা অবিনাশ আজও বলেনি সরমাকে । অন্যমনস্কের মতো তাকালো ওপরের ঘরের দিকে । চাকরকে চায়ের আদেশ দিতে ফিরে এলো আবার ।

এদিকের ঘরে আলোচনার বিষয়-বস্তুর পরিবর্তন হয়নি তখনো । চন্দ্র বললেন, কথা তো ঠিকই আছে, কবে থেকে কাজে লাগতে চাও বলো ।

অপর্ণা ঘরে প্রবেশ করল । সরমাকে লক্ষ্য করে ঈষদহাস্যে বলল, দেবি হয়ে গেল, বোসো বোসো—উঠতে হবে না, আমি এখানে বসছি । চন্দ্রর পাশে খাটের ওপর আসন নিল সে । —থামলে কেন, একেবারে খোদ কেমিস্ট্রির আড়ালে আছি, আমাকেও একজন বিজ্ঞজন বলে ধরে নিতে পারো ।

সরমা হেসে ফেলে চন্দ্রর কথারই জবাব দিল আগে, বসেই তো আছি এখন, যেদিন বলবেন সেদিন থেকেই যেতে পারি ।

চন্দ্র বললেন, আচ্ছা, সবে পরীক্ষা দিয়ে উঠলে, বিশ্রাম তো করো এ সপ্তাহটা, একেবারে সেই পরের সোমবার থেকে এসো । আজ সমাদ্দারকে তোমার কথা মনে করিয়ে দেব'খন আবার । ভাবলেন একটু ।—তুমি আমাদের ল্যাবরেটারিতে কাজ করবে বিপিন জানে তো ?

অপ্রতিভ দেখাল সরমাকে । চিন্তা করেও স্মরণ হল না বিপিনকে এ সম্বন্ধে কখনো কিছু জানিয়েছে কি না । ক্ষুদ্র জবাব দিল, আজ বলব ।

খাটুনি বেশি তাই বলছিলাম ।...যাক্, আর কাজের কথা নয় এখন । অপর্ণা, এদের একটু চা দেবে না ?

অপর্ণার দৃষ্টি এতক্ষণ সরমার প্রতি নিবদ্ধ ছিল চন্দ্রর চোখে চোখ রাখল। পরামর্শের সুরে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বল, দেবো ?

সকলেই হেসে ফেলল। চাকর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আসতে অপর্ণা উঠে চা করল। এতক্ষণ পর্যন্ত একবার চেয়েও দেখেনি অবিনাশকে। এবারও অপরিচিতার মতোই চা এবং খাবার এগিয়ে দিল। পরে নিজের জন্য এক পেয়ালা চা নিয়ে স্বস্থানে বসল আবার।

প্লেট থেকে আধখানা বিস্কুট ভেঙ্গে চন্দ্র বললেন, তোমার ছবির এঁরা খুব প্রশংসা করছিলেন অপর্ণা।

অর্পণা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, ভালো। মনে মনে যে শ্রাদ্ধ করছিলেন সে আর জানবে কি করে বলো।

বিব্রত মুখে বিস্কুট গলাধঃকরণ করলেন চন্দ্র। এসে পর্যন্ত অবিনাশ নিঃশব্দে বসে আছে লক্ষ্য করেছেন। সেদিন রাতে বিপিনের বাড়ি থেকে ফেরার মুখে ওর ওপর অপর্ণার সেই তিক্ত আক্রোশের প্রসঙ্গটা মনে পড়ল চন্দ্রর। নিঃসঙ্কোচে ওদের কথাবার্তা বলার সুযোগ দেবার জন্য একটু আগেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আচ্ছা, তোমরা গল্প করো, আমি চলি এখন।

ডুবন্ত লোকের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো একটা ক্ষীণ আশাও মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল হয়তো। আজও অবিনাশ বলে যদি কিছু, সুফলই হবে।

কিন্তু এবারে বিপদ ডেকে আনল অবিনাশই। সরমাকে লক্ষ্য করে বলল, আমরাও তো এখন উঠলে পারি ?

সরমা কিছু বলার আগেই অপর্ণা জটিল করে তুলল পরিস্থিতি। সরমাকেই জিজ্ঞাসা করল হঠাৎ, তোমার তাড়া আছে কিছু ?

না।

তবে বোসো, আমি পৌঁছে দিয়ে আসব'খন তোমাকে। চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি গাড়ি নিয়ে বেরুচ্ছ ?

না।

মুহূর্তের নীরবতা। অপর্ণার ইঙ্গিত স্পষ্ট। অবিনাশ চন্দ্রর সঙ্গেই যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াবে কিনা ভাবছে। সরমা তাড়াতাড়ি বলল, পৌঁছে দিতে হবে না, আমরা পরে যাব'খন আপনি যান মাস্টারমশাই।

তিনি চলে গেলে অবিনাশকে প্রায় ধমকেই উঠল সরমা, তোমারই বা এমন কি তাড়া, বোসো না—।

মানুষটার স্বভাব-বিরুদ্ধ নীরবতা এবং তার প্রতি অপর্ণার এ স্পষ্ট অবজ্ঞা দুই-ই সরমার বিস্ময়ের কারণ। তবু কিছু খেয়াল না করার মতো হালকা সুরেই অপর্ণাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার সঙ্গে এঁর তেমন আলাপ নেই বোধহয় ?

সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে অবিনাশ। মুখে নিরুপায় হাসির আভাস।

অপর্ণা শান্ত মুখে অপেক্ষা করল একটু।—তেমন আলাপটা কি রকম বুঝিয়ে বলো।

বিব্রত হয়ে শেষ পর্যন্ত অবিনাশকেই ঠেলে দিল সরমা। হেসে বলল, এমন চুপ করে থাকলে আমি সামলাই কি করে ?

অপর্ণা লক্ষ্য করল, চন্দ্রর সামনে মেয়ে যতটা শান্তশিষ্ট এমনিতে ঠিক ততটা নয় ।

অবিনাশ হেসেই জবাব দিল, বিপদ ডেকে আনবে তুমি আর সামলাবার দায় আমার । মনের ত্রিশঙ্কু অবস্থা কাটিয়ে ফেলল জোর করে । যথেষ্ট সহ্য করেছে আর নয় । সোজাসুজি তাকালো অপর্ণার দিকে । বলল, আপনার মিথ্যে চেষ্টা বৌদি, বইয়ের রসায়ন তথ্য সরমা হয়তো বোঝে, কথার রসায়ন ওর মাথায় এক বর্ণও ঢোকে না—সে বেলায় এই সাদা দেয়ালটার মতোই, নিরেট ও । নইলে আমাকে আটকে রেখে দিত না এমন করে, আপনার গাড়িতে ওকে পৌঁছে দেবার সাদা অর্থটা বুঝত ।

সরমা চকিতে দু'জনকেই নিরীক্ষণ করল একবার । কৌতূহল দমন করে বলল, আশ্চর্য, আলাপ আছে কি না জিজ্ঞাসায় এমন বিভ্রাট !

অপর্ণা পূর্বের মতোই নিস্পৃহ মুখে জবাব দিল, ওই তেমন কথাটা যদি তুলে নাও তাহলে অবশ্য বিভ্রাট কিছু হবে না ।...নীতি-বিশারদরা তো আমাদের ভয়ে দিশেহারা একেবারে । মুহূর্তের একটা তীব্র কটাক্ষে এক ঝলক ব্যঙ্গচ্ছটা যেন ছড়িয়ে দিল অবিনাশের মুখের ওপর । যথাপূর্ব শান্ত আবার ।—জানোই তো ছবিতে নেমেছি, তোমার মতো সাইনটিস্ট তো নই ।

নির্বাক শ্রোতার মতোই বসে থাকে অবিনাশ । দুর্বোধ্য একটা বিস্ময়ের ধাক্কা আবারও সামলে নিয়ে সরমা জোরেই হেসে উঠল ।—আমার মতো সাইনটিস্ট ফি-বছর গণ্ডায় গণ্ডায় বেরোয় য়ুনিভার্সিটি থেকে । কিন্তু আপনার দাম তো একটু আগে নিজের চোখেই দেখে এলাম, সাইনটিস্টদের শিল-নোড়ায় বাটলেও এ জিনিসটি তাদের দ্বারা হবে না ।

অপর্ণা চেয়ে থাকে কয়েক নিমেষ ।—সত্যি ভালো লাগল ?

খুব, আপনি তখন মিছেই অমন করে বললেন মাস্টারমশাইকে ।

অল্প একটু হাসল অপর্ণা ।

সরমা বলল, তাছাড়া এমন গাইতে পারেন কানে না শুনলে ভাবতে পারতুম না ।

তুমি বাড়িয়ে তুললে আমাকে । একটু থেমে অপর্ণা অনেকটা আপন মনেই বলল যেন, পাঁচ-মিশালি গান ভেঙ্গে সুরগুলি মন্দ করেননি তোমার দাদা—

সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের কোন্ পথ ধরে এই মন্তব্য সঠিক বোঝা গেল না । ফলে দেখা গেল গান অথবা ছবির প্রশংসায় সরমার উৎসাহ নেই আর ।

লঘু-হাস্যে অপর্ণা এ প্রসঙ্গ ধামা-চাপা দিল এবারে ।—এসব তথ্য থাক্ এখন, তোমার খবর বলো শুনি ।

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সরমা ।—খবর ভালোই ।

বিপিনবাবুর একেবারে দেখা নেই কেন ?

দিনরাত ব্যবসার চিন্তায় ডুবে আছেন, বাড়ির লোকেরই দেখা পাওয়া শক্ত ।

ও, বিয়ের পর বুঝি এই ! আর আগে— । হাল্কা একটা কিছু বলার মুখে অপর্ণা থেমে গেল ।—আচ্ছা আমার কাছে পাঠিয়ে দিও একদিন, বেশ করে সমঝে দেব ।

হেসে ঘাড় নাড়ল সরমা, দেবেন ।

পথে নেমে চুপচাপ অগ্রসর হল দু'জনে । সরমা আড়চোখে মাঝে মাঝে দেখছে

অবিনাশকে । তার দিক থেকে বাক-স্ফুরণের সম্ভাবনা না দেখে যথাসম্ভব নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, তারপর ?

ট্রামে ওঠো বাসে ওঠো ট্রেনে ওঠো—যা খুশি ।

সে পরামর্শ চাইনি । এখানে দেরি হল বলে রাগ করোনি তো ?

না । অবিনাশ গম্ভীর ।

করবে না জানি ।...তোমাকে দেখে মনে হল অপর্ণা চন্দ্রর এ ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলে । দেখছে সরমা । অপেক্ষা করল একটু ।...জেনে শুনে কেন এলে বলো তো ?

ক্ষুদ্র জবাব দিল অবিনাশ, ঠিক এতটা জানতুম না ।

চন্দ্র সাহেবের বাড়িতে অপর্ণার অভ্যর্থনা কি রকম হবে এ নিয়ে অবিনাশ যথার্থই মাথা ঘামায়নি কখনো । কিন্তু সকল জিজ্ঞাসা বাদ দিয়ে সরমার হঠাৎ এ প্রশ্নটা আর একদিকে সচেতন করল যেন । আজ ও বাড়িতে তার পদার্পণের উপলক্ষ সরমাই বটে, কিন্তু তার নিজের দিক থেকে কোন আকর্ষণই ছিল না কি ?

ভাবছে...। যদি থাকেও সেটা কোন্ জাতের ? যে আকর্ষণ নিয়ে মণিময় আসে এখানে আর আসেন চলচ্চিত্র পরিপোষকরা ?

আর একটিও কথা না বলে সরমা মুখ বুজে হেঁটে চলল । শিবাজী পার্কের ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে । অবিনাশের বাহুতে মৃদু আকর্ষণ করে ডাকল, এসো বসা যাক—

গ্যাস-পোস্টের আলো ছাড়িয়ে বেশ একটু অন্ধকারে জায়গা বেছে নিয়ে ঘাসের ওপর বসল সরমা । একটু তফাতে অবিনাশও । অবতরণিকা কিসের মর্মে মর্মে বুঝছে । তবু একটু অপেক্ষা করে মনের আড় কাটাবার জন্যই হাল্কা হেসে বলল, বেশ নিরিবিলি জায়গাটি, ভাগ্যগুণে তেমন কেউ, ধরো বিপিনবাবুই...হঠাৎ যদি এসে উদয় হতে পারেন, কিছুতে বোঝানো যাবে না, এক্ষুনি একটা গুরুগম্ভীর আলোচনায় মেতে যাব আমরা । ঠিক কি না বলো ?

সরমা সুবোধ মেয়ের মতোই সায় দিল, ঠিক । অন্য কিছু ভাববেন হয়তো ।

আহা, যদি আসতেন একবার ।

সরমা বলল, আর একটু কাছে সরে এসো তাহলে, নইলে যদিই এসে পড়েন, ঠিক যা ভাবাতে চাও একেবারে তা নাও ভাবতে পারেন ।

দূরে তারাভরা আকাশেব কোন এক দিকে চোখ দুটোকে আটকে রাখে অবিনাশ । সরমার অস্ফুট হাসি যেন কানের মধ্য দিয়ে শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে থাকে নিমেষ কতক । অতি সন্তর্পণে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সহজ দৃষ্টিতেই তার দিকে ফিরে তাকালো আবার ।

কিন্তু ততক্ষণে গলার সুর বদলে গেছে সরমার ।—একটু আগে অপর্ণা চন্দ্রকে জব্দ করার জন্য তার ঘরের দেয়ালের সঙ্গে তুলনা করে এলে আমার । কিন্তু নিজেও কি সত্যিই তাই ভাবো ?

না ।

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করব না, নিজেই খুলে বলবে সব ?

একটু সময় নিয়ে অবিনাশ বলল, শুনতে চাও বলতে পারি, কিন্তু তাতে ভুল বোঝার

সম্ভাবনাই বাড়বে শুধু ।

কাকে ভুল বুঝব, তোমাকে না অপর্ণাকে ?

আমার জন্য চিন্তিত নই ।

সরমা উষ্ণ হয়ে উঠল একটু, অপর্ণার জন্যও তোমার দরদের কোন কারণ দেখিনে ।

স্বল্প নীরবতায় অবিনাশ কি চিন্তা করল নিজের মনে । তারপর সেদিনই সরমাদের ওখানে পার্টিতে যাবার আগে ওর কাছে চন্দ্র সাহেবের আসা এবং অপর্ণার সম্বন্ধে মানুষটির অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাসটুকু ব্যক্ত করল প্রথম । পরে সেদিন পথের ধারে অপর্ণার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ থেকে একে একে প্রায় সকল কথাই বলে গেল । নিজের সেই ক্ষণ-বিহ্বল দুর্বলতার কথাও গোপন করল না ।

সরমা স্তব্ধ । সাড়া নেই অনেকক্ষণ । একজনের ব্যথাতুর শূন্যতা যত বেশি বুকে বাজে, রূপ-যৌবন-বিলাসিনী আর এক নারীর এই নির্মম কৌতুকে মন ততো বিরূপ হয়ে ওঠে । আস্তে আস্তে বলল, এর পরেও আজ এখানে এসে এক ঘণ্টা ধরে অপমান সইলে বসে বসে ?

অবিনাশ জবাব দিল, সারাক্ষণ আমাকে তাঁর এই অবহেলা দেখাবার চেষ্টাকে শুধু যদি অপমান বলেই মনে করো ভুল হবে । নিজেকেই তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি হয়তো...

খানিক চুপ করে থেকে সরমা বিক্ষোভ সংযত করে নিল অনেকটা ।—দাদাকে একবার পাঠিয়ে দিও তো আমার কাছে ।

অবিনাশ হেসে ফেলল, গর্দান নেবে ?

ঠাট্টা নয়, মাস্টারমশাইয়ের কাছে মুখ দেখানো মুশকিল হবে এর পরে ।

অবিনাশ ফস করে বলে বসল মাস্টারমশাইয়ের কাছে মুখ যাতে কমই দেখাও তুমি এ জন্যেই হয়তো অপর্ণা চন্দ্র তোমার দাদার নাকে দড়িটা পরিয়েছেন ।

সরমা বিমূঢ় ।—কি বললে ?

অবিনাশ চুপচাপ বসে থাকে খানিকক্ষণ । যা বলে ফেলেছে, বলবে ভাবেনি কখনো । কিন্তু তা বলে ঢাকতেও চেষ্টা করল না আর । জবাব দিল, বললাম তোমার দাদাকে নিয়ে তোমার যেমন দুর্ভাবনা, তোমাকে নিয়ে অপর্ণারও তেমনি একটা দুর্ভাবনা থাকা অসম্ভব নয় ।...আছে বলেই জানি ।

সরমা হতভম্ব আবারও । আমাকে আগে বলো নি কেন এ কথা ?

কি হত ?

কি হত । সরমা জ্বলে উঠল প্রায়, আমি আসতুম না এখানে, এলেও অন্যভাবে চলতাম ।

সে জন্যেই বলিনি ।

যথার্থই রেগে গেল সরমা ।—থাক আর তত্ত্বকথায় কাজ নেই । ছি, ছি, মাস্টারমশাইয়ের মতো মানুষ—

অবিনাশ নির্বিকার প্রায় । বলল, অমানুষ নন বলেই অপর্ণার অস্বস্তি আরো বেশি । রাগ কোরো না, কারণ ছাড়া গণ্ডগোলগুলো যে ঘটে সেগুলি এমনি অদ্ভুতই হয়!

কি রকম ? নির্লিপ্ত মন্তব্য শুনে সরমার বিরক্তি বাড়ে আরো ।

পার্কে অন্ধকার ঘন হয়ে এলো আরো। অবিনাশ ওপরের দিকে চেয়ে দেখল একটা খণ্ড-মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চাঁদটা। তারপর সরমার অসহিষ্ণু প্রতীক্ষাটুকু উপলব্ধি করেই বলল যেন।—কি রকম আর ওই মানুষটি দূরে সরে যাচ্ছে এ সন্দেহ যদি অপর্ণার মনে জাগে, আর কেউ কাছে সরে আসছে তাঁর, এ সন্দেহই বা জাগবে না কেন। তাঁর ওপর রাগ করে আমাকেই যখন বাজিয়ে দেখতে গেল অমন করে, তোমার বেলায় এমনি একটা কিছু ভেবে নেওয়া অনেক সহজ। দুই-ই মনের অসুখ।

সবমা তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, অপর্ণা শুনলে এবারে চোখের জলে পা ধুয়ে দেবে তোমার! কিন্তু এ অসুখ হলে গারদে থাকার কথা এটা ভেবেছ?

অবিনাশ ঈষৎ হেসে জবাব দিল, থাকার তো কথা, কিন্তু পাঠায় কে।...বিপিন চৌধুরীও গারদের বাইরেই আছেন।

সমস্ত উষ্ণতায় হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা জল পড়ল একপ্রস্থ। সরমা একেবারে চুপ। নিরপেক্ষ আঘাত নয় শুধু। আর একটা সত্য চোখে পড়ে। অবিনাশ যত আপন হোক, পর-স্ত্রী হিসেবে সরমার ব্যবধানও আজ অপর্ণার থেকে কিছুমাত্র কম নয়। একে ডিঙিয়ে কাছে এসে চোখ রাঙাতে গেলে ও এমনি করেই সচেতন করে দেবে।

কিন্তু বোবা অভিমান নিয়ে সরমা বসে থাকল না বেশিক্ষণ। কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল, আচ্ছা—বিপিন চৌধুরীর অসুখ যাতে গারদের বাইরেই সারে সে চেষ্টা করব। এজন্যে যদি তোমার মায়া ছাড়তে হয় তাই না হয় ছাড়বো। তা বলে অপর্ণার অসুখও যদি তুমি সারাতে যাও সেটা ভয়ানক বিসদৃশ হবে কিন্তু। ওঠো, রাত হল।

সাড়াশব্দ নেই।

নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো বসে আছে অবিনাশ। অন্ধকারে ভালো মুখ দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু ও মুখের বিবর্ণতা না দেখেও উপলব্ধি করতে পারে সরমা। আঘাত জায়গা মতোই লেগেছে। মৌন অস্বস্তি। পার্কের বাতাসও ভারী লাগছে কেমন।

আর, অনুতাপে সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে সরমা নিজেই। জীবনব্যাপী ব্যর্থতার দাহ বুকে নিয়েও যে মানুষ ওর পথ আগলে দাঁড়ায় নি একদিনের জন্যও, মায়া ছাড়বার এ ইঙ্গিতে তার শেষ সম্বল এই দুর্বলতাটুকুর এত বড় অসম্মান সেই কি না করে বসল!

আত্মস্থ হয়ে সরমা চেষ্টা করল সামলে নিতে।—বাবুর রাগ হল বুঝি?

সাড়া পেল না।

পাবে না জানে। গলার সুর একেবারে কোমলে নেমে এলো এবার।—বাড়ি যাবে না?

দূরের দিকে চোখ রেখেই অবিনাশ জবাব দিল, আমি একটু পর যাব'খন, তুমি আর রাত কোরো না।

সরমা প্রমাদ গুনল মনে মনে। কাছে সরে এসে লঘু ঝঙ্কারে হাল্কা করে দিতে চাইল সব কিছু। বলল, কোথাকার কে অপর্ণা চন্দ্র তার জন্য নিজেরাই ঝগড়া করে সারা। একটা হাত রাখল তার কাঁধে, পরে গিয়ে কাজ নেই, চলো—

অবিনাশ বসে থাকে তবু।

কাঁধের ওপর সরমার হাতটা জোরেই নড়ে ওঠে এবার।—বলছি তো বাপু ঘাট হয়েছে,

আর  কক্ষনো বলব না এমন কথা । রাত হয়ে গেল, এরপর বাড়ি থেকে খুঁজতে বেরুবে আমাকে, লক্ষ্মীটি ওঠো—

উঠতে হল । আজ পর্যন্ত বহুবার আঘাত দিয়ে ফেলে সরমা অম্লান বদনে এমনি প্রতিজ্ঞা করেছে আর রাগের সময় অম্লান বদনেই ভুলেছে তা । তবু এমনি ছোট দু'টি কথায় অবিনাশ আগেও ভূলেছে, আজও ভুলল ।

।। ১২ ।।

সমাদ্দারের ল্যাবরেটারিতে সরমা যোগ দিয়েছে । বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক কিছুদিন যাবৎ ফ্যাক্টরির কাজে ব্যতিব্যস্ত । দৈবক্রমে প্রথম দিনই তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে সরমা কাছে আসতে তিনি চমকে দেখিয়ে দেন,—ওখানে । আমাব মরবাব ফুরসৎ নেই এখন ।

ভুটার সঙ্গে আলাপ হযেছে । সরমা তাদেবই একজন জেনে ভাবী খুশি । ওর প্রকাশ্য আনন্দে সবমাও বিব্রত বোধ কবে প্রায়ই । হরিআনন্দ-এব সঙ্গেও পবিচয় হয়েছে বলা যায । মুখ তুলে আলাপ কববার মানুষ সে নয । ভূটা এক এক সময় কাছে এসে তার কানে কানে ঠাট্টা কবে, মনে মনে দেখলে কি তাব মন ভরে, মুখ তুলে দেখই না !

ফলে বেচাবা অবনত-মুখী আরো ।

কিন্তু সরমাব উৎসাহ স্তিমিত প্রায় । কোন অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীব সার্থক-তিলক কপালে জুটবে অনুমান করা শক্ত । ববং সেদিন প্যাবেলএ ফ্যাক্টরি দেখে খুব উৎসাহ নিযে ফিবে এলো । ওই কর্ম-মুখরতাব কিছু একটা স্থিব লক্ষ্য আছে । সেখানে কাজেব বেগেব সঙ্গে মনেব আবেগ আপনি মেশে ।

চন্দ্রর কাছে প্রস্তাব কবল, আমাকে ফ্যাক্টরিতে ব্যবস্থা করে দিন ।

চন্দ্র অবাক, সেখানে কাজ করবে ?

হ্যাঁ ।

এই জায়গাটা কি দোষ কবল ?

জবাব দিতে পারে না । চন্দ্র হেসে সাবধান কবলেন, আমাকে বললে তাই রক্ষা, সমাদ্দাবের কাছে যেন মুখব্যাদানও করো না ।

প্রায় জেনেশুনেই সরমা লজ্জা পেল । কিন্তু ওব যথার্থ সমস্যা ঠিক এই নয । চন্দ্রর সঙ্গে আলাপ আলোচনায এখানকাব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খানিকটা ধাবণা কবে নিতে পাবত । কিন্তু পারে নি । সেদিন অবিনাশেব ইঙ্গিতে ছাত্রী-শিক্ষকের যোগসূত্রটা ছিঁড়ে গেছে । এখন সামনে গিযে দাঁড়ালে নাবীত্বেব উপলব্ধি আগে মনে আসে ।

গেল কিছুদিন । এবাব সমাদ্দাবের নিযমিত উপস্থিতিতে ল্যাবরেটারিব আবহাওয়াব খানিকটা উন্নতি দেখা গেল । হাঁক-ডাক্ চিৎকাব চেঁচামেচিতে হলঘব সবগরম ।

কি ভুট্টা সাহেব, একটা সলফা-ড্রাগ অ্যানালাইজ কবতেই যে বছব কাটালে । তোমার তড়বড়ানি কমাও বাপু একটু, নইলে হবে না কিছু ।

তারপর আনন্দ । মুখখানা অমন গোমড়া কেন ? এ কি তোমাব বিলিতি ডিগ্রী যে একটার পর একটা পকেটে পুরবে ? কাজ করো কাজ করো, সাম ডে দি ডেভিল  পিপ্‌স ইন—অ্যাণ্ড ইউ আর ফেমাস ওভারনাইট । দাঁড়াও আমিও লাগছি তোমার সঙ্গে ।

সরমা কি একটা সলিউশান চাপিয়েছে বার্নারে ।

তাই তো, গিন্নি অ্যাফেয়ার বেমালুম ভুলে গেছি । ওকে কি কাজ দিলে হে চন্দ্র ?

হাসি চেপে চন্দ্র মেডিক্যাল জার্নালের পাতা ওলটাতে লাগলেন । জবাব দিলেন না ।

সমাদ্দার উঠে সরমার কাছে এসে দাঁড়ালেন । হাত দু'টো ট্রাউজারের দুই পকেটে সন্নিবিষ্ট । সহসা ওর মুখের ওপর আটকে গেল যেন তাঁর দুই চোখ । ভ্রূদ্বয় বিস্ময়-কুঞ্চিত ।

এ কি কাণ্ড !

সরমা থতমত খেয়ে বার্নার থেকে টেস্টটিউব সরিয়ে নিল । কোথায় ত্রুটি ঘটল না বুঝে তাকালো তাঁর দিকে । বাকি তিনজনের দৃষ্টিও এদিকেই আকৃষ্ট হয়েছে ।

সমাদ্দার কণ্ঠস্বর চড়িয়ে দিলেন আরো ।—কপালে সিঁদুর মাথায় ঘোমটা—বলি, কার সীমন্তিনী গো ?

হঠাৎ এ ভাবে আক্রান্ত হয়ে সমস্ত মুখ টক্-টকে লাল হয়ে গেল সরমার । চন্দ্র তাড়াতাড়ি জার্নালে মনোনিবেশ করেন আবার । আর রং লাগে তরুণ-বিজ্ঞানী দুটির নির্বাক কৌতূহলে ।

সমাদ্দার হেসে উঠলেন হা-হা শব্দে ।—আমি লক্ষ্যই করিনি এতদিন । ভদ্রলোকটি কে গো ? সায়েন্স পড়ে থাকে তো এনে লাগিয়ে দাও এই ঘানিতে—অ্যাণ্ড লেট্ মি ফাইট্ এ ডুয়েল ।

শিশুর প্রগল্ভ উচ্ছলতা । টক্-টক্ করে স্বস্থানে ফিরে এসে বসেন আবার । সরমার হঠাৎ ভারী ইচ্ছে হয়, বিপিনকে এনে এ মূর্তিটা দেখায় একবার ।

কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক দুনিয়ায় সমাদ্দার সাহেব আকস্মিক ব্যতিক্রম মাত্র । ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর আদর্শ প্রতিপদে হোঁচট খাবে । সেখানে নিজের থেকেও দীর্ঘতর ছায়া ফেলে চলে মানুষ ।

দু'টো বছর ঘুরে গেল ।

রাসায়নিক সাধনার ফলাফল কিছুমাত্র উল্লেখযোগ্য নয় । বেশির ভাগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত । কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা আমূল পরিবর্তন আসছে সকলেরই । সমাদ্দার চন্দ্র ভুটা হরিআনন্দ্ সরমা—ক্ষুদ্র রসায়নাগারটির অভ্যন্তরে এরা পৃথক নয় কেউ । একই সম্মিলিত ইচ্ছার বেগ থেকে যে রসের সৃষ্টি তাকে উপলব্ধি করা চলে শুধু । সারা জীবনের ব্যর্থতা অনেক সময় তুচ্ছ মনে হবে এর কাছে ।

কাজ নিয়ে অভিযোগের অবকাশ আজ আর নেই সরমার । বরং প্রথম প্রথম ক্ষুণ্ণ হত । অপর সকলের গবেষণার ফলাফল ধারাবাহিক ভাবে লেখা, জার্নাল থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করে নোট্ রাখা, স্লীপ্ আঁটা এবং সময়কালে হাতের কাছে সেগুলি যোগান দেওয়া—এই করে তার কাজ শুরু । ভাবত, আর যাঁরা আছেন, ফার্স্ট ক্লাস এম. এস্-সির ছাড়পত্র তাঁদের সর্বনিম্ন ছাপ—সমপর্যায়ে উঠতে সময় লাগবে । ভুটা হরিআনন্দ্ এমন কি চন্দ্রও দিনের কাজ সম্পন্ন করে বাড়ি চলে যেতেন, আর সে রাত পর্যন্ত বসে পাতার পর পাতা তাঁদের গবেষণার তথ্য লিখে রাখত । এমন হয়েছে বহুদিন । তখনো জানে না, ডাঃ চন্দ্রর পরেই বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি তার ওপর ।

পরে বুঝেছে । এই কাজ আগে চন্দ্র করতেন নিজের হাতে । তারও আগে সমাদ্দার । আজ এঁদেরই মতো সরমারও কোন প্রকাশিত মতামত অথবা প্রবন্ধ রাসায়নিক-বিশ্লেষণে

যখন আলোচনার বিষয়বস্তু রূপে দেখা দেয়, সমাদ্দার হেসে টিপ্পনী কাটেন, কি গো গিন্নি —খুব যে রাগ ছিল মনে মনে—বলি, এসব এলো কোথা থেকে ?

কিন্তু ল্যাবরেটারির মতো বাড়িতে সুদীর্ঘ দু'টো বছর বিগত । তার ইতিবৃত্ত তেমন আনন্দের নয় । বাড়ির বাইরেও কিছু কাজ থাকবে সরমার, এমন একটা বোঝাপড়া অবশ্য বিয়ের আগে হয়েছিল বিপিনের সঙ্গে । কিন্তু মেরিন্-লাইন্স্এ সাত-তলা বাড়ির ছক্-আঁকা মনে তখন এ শর্তটা কোন সমস্যাই নয় । উল্টে বলেছিল, সেও সহায় হবে ।

সহায় না হোক বিপিন প্রকাশ্যে বাধাও অবশ্য দেয়নি কিছুতে । তবু একটা অদৃশ্য বাধা মনে লেগে থাকে সরমার ।

কিন্তু বিপিন চৌধুরীই বা করবে কি ?

জীবনের পণ্য-তরী শত-ছিদ্র । একে জোড়াতাড়া দিয়ে সচল রাখার অক্লান্ত চেষ্টায় শ্রান্ত, বিপর্যস্ত । ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাতে মাঝ-দরিয়ার নিরাশ্রয় পাখির মতো যেদিকে তাকায় অথৈ জল । পাখার আকুলি-বিকুলি যত বাড়ে, অন্তিম রাহুর মুখব্যাদান ততো কাছে মনে হয় ।

আত্মবিশ্বাস বিচলিত, চিত্ত বিভ্রান্ত । নিরিবিলি সন্ধ্যায় নিতান্ত আপন কারো সান্ত্বনা পেতে মন হাহাকার করে ওঠে । তবু একবার ভেবে দেখে না, সম্পদ গেছে যাক, রিক্ততা দিয়েও যাকে বাঁধা চলে সরমা তাদেরই কেউ কিনা । সে ভাবনার ধৈর্য নেই, মন নেই, চেষ্টাও নেই ।

বাড়ি ফিরতে সরমার রাত হয় প্রায়ই । কোনদিন বা অসমাপ্ত কাজ হাতে করে নিয়ে আসে, নিজের ক্ষুদ্র রসায়ন ঘরটিতে বসে শেষ করবে । এছাড়া মণ্টুর আমন্ত্রণ আছেই । ভালো অনার্স পেয়েছে বি. এস্-সি পরীক্ষায়, এম. এস্-সিতে আরো ভালোর আশা রাখে । রোজ সরমার সাহচর্য না পেলে সে রেগে আগুন ।

সন্ধ্যার পর মণ্টু প্রায়ই সমাদ্দারের ল্যাবরেটারিতে গিয়ে হাজির হয়, সরমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরে । প্রথম প্রথম এ নিয়ে সরমা ঠাট্টাও করত । মণ্টু গায়ে মাখেনি । বাড়িতে একমাত্র সে-ই সহায় ওর, নইলে চারুদেবীর ক্ষুরধার রসনা এড়াতে অনেক আগেই বাড়ি ছেড়ে পালাতে হত । বিপিনও কাকীমার চোখের জলকে ভয় করে, কিন্তু ছেলের কাছে সবই ব্যর্থ । দু'বছর আগে সমাদ্দারের ল্যাবরেটারিতে যোগ দেওয়া মণ্টুর জন্যই অনেকটা সহজ হয়েছিল । বিপিনের মৌন মনোভাবটুকু বুঝে চারুদেবী হাল ধরতে এসেছিলেন । ছেলের দাপটে নাজেহাল হয়ে গেছেন ।

এই করে বছর দু'টো কাটল ।

বিপিন স্থির হয়ে আসছে প্রতিদিন ।...বাড়ির মধ্যে সরমা জানে এই মণ্টুকে !...আর বাইরে অবিনাশ । অব্যক্ত আক্রোশে ভেঙে তছনছ করে ফেলতে চায় সব কিছু । সয়ের সীমা অতিক্রম করে যায় কখনো । হিংস্র ক্রূর প্রতীক্ষায় ঘরের আলো নিবিয়ে জেগে থাকে যত রাত হোক ।

ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে চেয়ে থাকে সরমা । নির্মম জড়-পেষণের মতো লাগে কঠিন দুই বাহুর নিষ্পেষণ । কিছু যেন নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলতে চায় ওকে । হাঁড়-পাঁজরে টনটনে বেদনাটুকু বাজে বহুক্ষণ পর্যন্ত ।

মেরিন্-লাইনস্এ বিপিন চৌধুরীর সাতমহল স্বপ্ন-সৌধ আগেই ধূলিসাৎ হয়েছে । কিন্তু কিছুদিন যাবৎ সান্তাক্রুজএর ছোট বাড়িটা নিয়েও চারুদেবীর সঙ্গে একটা গোপন মন্ত্রণার আভাস সরমা পাচ্ছে । তবু এ নিয়ে তেমন কিছু কৌতূহল ছিল না তার ।

পড়ার ঘরে সেদিন গম্ভীর মুখে বসে আছে মণ্টু । সামনে বই-পত্র ছড়ানো । সরমার মনে পড়ল, গতকাল কি একটা পাঠ্য বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যে তার ডাক পড়েছিল । কিন্তু নিজের কাজ থাকায় সময় করে উঠতে পারেনি সরমা । ভাবল, রাগটা ওই জন্যে । হেসে বলল, মুখখানা অমন হাঁড়ি করে বসে থাকলে কি হবে, কালকের কাজ শেষ হয়নি, আজও ঘণ্টাখানেক লাগবে । ওদিকে বুড়ো রেগে আগুন—রাত দু'টো পর্যন্ত জেগে ক্যালকুলেশান শেষ করে নিয়ে যাইনি কেন ।

মণ্টু শান্ত মুখে বলল, তুমি কাজ করো না, আমার তাড়া নেই কিছু ।

বিনয়ের বিংশ সংস্করণ দেখি যে ।

কথা না বাড়িয়ে সরমা খাতাপত্র খুলে বসল । নিবিষ্ট মনে কাজটুকু শেষ করে সেগুলি গুছিয়ে রাখল একপাশে । স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এবার এসো, তোমাকে নিয়ে পড়া যাক—।

হেসে ফেলেও সামলে নিলে চট্ করে, সমস্যাটা কি ?

আজ থাক, মাথাটা ধরেছে কেমন—

মাথা ধরেছে তো তীর্থের কাকটির মতো বসে আছ কোন আশায়, শুশ্রূষা-টুশ্রূষা যদি করি ? সকৌতুকে অপেক্ষা করল একটু, আচ্ছা চলে এসো এদিকে, দেখি কে কোথায় ধরল মাথা।

মণ্টু উঠে দরজার কাছে গিয়ে দেখল পাশের ঘরে বিপিন আছে কি না । পরে তার পাশে এসে বসল । রকম-সকম দেখে সরমা বুঝল মাথা ধরা বা রাগটাগ কিছু না । কিছু একটা ঘটেছে । এতক্ষণে ভালো করে লক্ষ্য করল ওকে, শুকনো দেখাচ্ছে কেমন ।

কি ব্যাপার ?

তুমি এই সায়েন্সএর গবেষণা নিয়ে আর কতকাল ডুবে থাকবে ? যেন বাড়ির কেউ নও, যে যা খুশি করছে—

সরমা আরও নিরীক্ষণ করে দেখে তাকে ।—বাজে বোকো না, কি হয়েছে ?

আজ এই বাড়ির মালিকানা বদল হয়ে গেল জানো ?

সরমা বিস্ময় দমন করে ঘাড় নাড়ল ।—না ।

মণ্টু একটু থেমে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, দাদার কি বাইরে দেনা টেনা হয়ে গেছে ?

ব্যবসায়ের বাজার ভালো না এটুকুই আঁচ করেছিল সরমা । ক্ষুদ্র জবাব দিল, জানিনে ।

কিছুই তো জানো না ।...মা আর দাদার নামে ছিল এই বাড়ি, আজ দাদার অংশ মায়ের নামে বিক্রি হয়ে গেল । দলিলপত্রে বিক্রি—মায়ের হাতে টাকা নেই আমি জানি ।

সরমা বিপন্ন মুখে বসে থাকে কিছুক্ষণ । কিছু বলাও মুশকিল, নীরব থাকাও সহজ নয় । হাসল একটু, অবস্থা যদি তেমন খারাপই হয়ে থাকে এ ছাড়া আর উপায় কি, তোমার মায়ের অংশ নিয়ে টানাটানির আশঙ্কা ছিল হয়তো ।

কিন্তু তোমার কাছে এমন ঢাকাঢাকি কেন ?

হয়তো ভয় ছিল...

ছাই ভয় ছিল। উত্তেজনায় কথাটা শেষ করতে দিল না মন্টু।—লজ্জা ভয় দাদার কিছুতে নেই শুনে রাখো। ল্যাবরেটারিতে দু'বছর ধরে গোয়েন্দাগিরি করে আসছি তোমার পিছনে, সপ্তাহে ক'দিন তুমি অবিনাশদার বাড়ি যাও আর কখন যাও এই দেখতে—এখন আর আমাকেও বিশ্বাস করে না। বুঝেছে আমি তোমাদের ল্যাবরেটারিতে যাই তাকে কোন খবর এনে দিতে নয়, ভালো লাগে বলে। এই রকম ভয় তার তোমাকে—জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারো, পরোয়া করিনে। আমাকে কিছু বলতে আসে তো সাফ জবাব দিয়ে চলে যাব এখান থেকে, বাড়ি নিয়ে মায়ের সঙ্গে থাকুক।

আরক্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মন্টু। সরমা স্তব্ধ।

বিপিনের মনোভাব অবিদিত ছিল না। তা বলে...

উঠল এক সময়। বিপিন ফেরে নি। আলো জ্বেলে বিছানায় বসল। ভালো লাগলো না বেশিক্ষণ। আলো নিবিয়ে অন্ধকারে ছাতের কার্নিশে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।...ভাবছে। এই অসহিষ্ণু প্রতিক্ষা নিরর্থকই নয় শুধু, নির্বুদ্ধিতাও। মুখোমুখি বোঝাপড়ার গ্লানিময় ফলাফল অনুমান করতে পারে সরমা। মনুষ্যত্বের খোলসটা একবার গেলে কিছু আর বাকি থাকবে না। বাড়ির আবহাওয়াসুদ্ধ কলুষিত করে দেবে হয়তো। আত্মসম্মানের এই রূঢ় মৃত্যুকেই সকলের বড় ভয় সরমার।

মন্টুর কথা চিন্তা করে আরো দমে গেল। বিপিন ওকে ক্ষমা করবে না কোন কালে। কিন্তু স্নেহের আকুলতা মনের অনেকটা জায়গাই জুড়ে বসেছে সরমার। ভাবে অন্যমনস্কের মতো। ক'টা বছর আগের মন্টুর সঙ্গে কত তফাৎ আজকের এই মন্টুর।

নিঃশব্দে কাটল সে রাত।

পরদিন সরমা খুব সকালেই গত সন্ধ্যায় আনা কাগজপত্র হাতে করে মেরিন্-লাইন্স্-এর উদ্দেশে বেরিয়ে গেল। ল্যাবরেটারিতে এ সময় কারো থাকার কথা নয়। সমাদ্দারেরও ওপর থেকে নেমে আসার সম্ভাবনা কম।

চন্দ্রর টেবিলে কাগজপত্র রেখে সরমা চিঠি লিখল একটা। খামে পুরে সেটা ভালো করে আটকে নাম লিখে বেয়ারার হাতে দিয়ে বলল, চন্দ্র সাহেবের হাতে দিতে হবে। দু'ঘন্টার মধ্যেই বাড়ি ফিরে এলো আবার।

পড়ার ঘরে চুপচাপ বসে সময় কাটল অনেকক্ষণ। সকাল থেকে মন্টু আজ আর ওপরে ওঠেনি। সরমাও খোঁজ করল না। নিজের হাতে একান্ত আপনার কিছু বিসর্জন দিয়ে আসার মতো অনুভূতি শূন্য স্তব্ধতায় মন আচ্ছন্ন।

সিঁড়িতে বিপিনের নেমে যাওয়ার শব্দ এলো কানে। সরমা উঠে এ ঘরে এসে চেয়ারে বসল। বিপিনের বড় ব্যাগটা চোখে পড়তে বুঝল, সে আপিসে যায়নি, এক্ষুনি ফিরে আসবে। ভাবল উঠে যাবে কি না। টেবিল থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিল চোখের সামনে।

খানিক বাদে বিপিন যথার্থই ফিরে এলো আবার। গত রাত্রি থেকে সরমার পরিবর্তনটুকু ভালো করেই লক্ষ্য করছে। আজ সকালে উঠেই কোথা থেকে ঘুরে এলো জানে না। এত বেলা পর্যন্ত বসে আছে চুপচাপ এও কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। ব্যাগে কাগজপত্র রাখার ফাঁকে তাকালো দুই একবার। খবরের কাগজে মুখ দেখা যাচ্ছে না। কারণ অনুসন্ধান করতে

গিয়ে হঠাৎ কঠিন একটা হাসির রেখায় দুই ঠোঁট কুঞ্চিত হল বিপিনের। বেরুবার মুখে থামল একটু।—কাজে গেলে না?

খবরের কাগজের পাতা উল্টে ভাঁজ করে নিয়ে আবার পড়তে চেষ্টা করল সরমা।—না।

ছুটি আজ?

না।

পরে যাবে?

না।

স্বভাব অনুযায়ী বিপিনের রেগে ওঠার কথা। উল্টে খুশির আমেজ লাগল চোখের পাতায়। উৎফুল্ল পদক্ষেপে টক্-টক্ করে নিচে নেমে গেল।

বাড়ির ব্যাপারটা শুনেছে নিশ্চয়। ঠিক এই জন্যে এতটা বীতরাগ আশাতীত। বিক্ষোভের আড়ালে স্বার্থ-জড়িত সাধারণ মেয়ে সরমার নাগাল পেল যেন। ওর নিস্পৃহ অবহেলাটুকুই প্রত্যাশিত ছিল। আজ অনেকদিন বাদে বিপিন হাসল মনে মনে। এই তো স্বাভাবিক। ছেলে পড়িয়ে দিন চলত, অর্থ-সম্পদের সুনিশ্চিত আচ্ছাদনে চিড় খেলেও সেই মেয়ে বিচলিত হবে না এমন অসম্ভব ধারণাই বা ছিল কেন।

কিন্তু সবই গোলমেলে ঠেকল পরদিন সকালে। টেলিফোনের রিসিভার টেবিলে রেখে চাকরকে বলল, বৌদিকে বল্ ফোন্ আছে।

সরমা নিচে নেমে টেলিফোন ধরল। চন্দ্র সাহেব। ল্যাবরেটারি থেকে ডাকছেন। আগামী কাল দুপুরের দিকে একবার আসা চাই সরমার, বিশেষ কথা আছে। জবাবের অপেক্ষা না রেখে লাইন কেটে দিলেন তিনি।

শোনো—

বিপিনের ডাকে সরমা ঘুরে দাঁড়াল।

আজও কাজে বেরুচ্ছ না?

না।

কারণটা জানতে পাই না?

সরমা জবাব দিল না।

বিপিন একটু থেমে বলল, চন্দ্র সাহেব আমাকে একবার সন্ধ্যের দিকে তাঁর বাড়িতে বিশেষ করে যেতে বললেন।...তুমিও আসবে?

তাঁর সঙ্গে কাল আমার দেখা হবে।

মুখের দিকে চেয়ে থেকেও কিছু আঁচ করা সম্ভব হল না বিপিনের পক্ষে। হল না বলেই কৌতূহল। আর একটু যেন অস্বস্তিও। হাসতে চেষ্টা করল।—তবু আসতে বলছি এই জন্যে যে তোমাদের ওই রিসার্চের মতো এমন একটা ব্যাপারে তোমার দু'দিন না যাওয়ার জন্য ভদ্রলোক পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করবেন হয়তো। এসব নিয়ে এখন আমার মাথা ঘামাবার সময় একটু কম।

সরমা স্পষ্ট জবাব দিল, যেও না, তিনি মাইনে দেওয়া মনিব নন্ তোমার।

ওপরে এসে সরমা চুপচাপ বসে থাকে বহুক্ষণ। এতদিনের সব আশা নিজে হাতেই

শেষ করে এসেছে । এ দুঃখের শেষ নেই । দু'দিন ধরে একটু একটু করে অনুশোচনায় ভরে যাচ্ছে মন । বিকৃত-বুদ্ধি একজনের দ্বেষ আর হীনতায় দিশেহারা হয়ে এ কি করে বসল ! শুধুই মন যুগিয়ে কাটবে সারা জীবন ! বেলা দশটা না বাজতে ল্যাবরেটারির দিকে পা টানে । নিজের অজ্ঞাতে প্রতীক্ষা করে কিসের । আজ চন্দ্রর ফোন পেয়ে আশান্বিত হল, হয়তো বা সমাদ্দারকে এখনো কিছুই জানান নি তিনি ।

নিচের ঘরে একা বসে জ্বলছে বিপিন চৌধুরীও । ঘরে-বাইরে সর্বত্র বুঝি কি এক ষড়যন্ত্র চলেছে তার বিরুদ্ধে । সব কিছু ধূলিসাৎ করে তবে ছাড়বে ।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই চন্দ্রর বাড়ি পৌঁছল । যথাসম্ভব নিরুদ্বেগ সহজতায় প্রফুল্ল । চন্দ্র ফেরেন নি তখনো । অপর্ণা আছে । খবর পাঠালো ।

ইতিমধ্যে দিন বদলেছে অপর্ণারও । আরো দু'তিনখানা ছবিতে তাকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা গেছে । অধুনা সাধারণের অজস্র অভিনন্দন এবং প্রযোজকের সাগ্রহ সমাদর দুই-ই প্রায় উপেক্ষার বস্তু । চা স্নো পাউডারের বিজ্ঞাপনে তার একটা স্বাক্ষরের আশায় ব্যবসায়ী উদ্‌গ্রীব ।

কিন্তু সাফল্যের বান-ডাকা জোয়ারের তলায় তলায় একটা শুকনো ধারা বইছে কোথায় । একজনের চোখে ধরা পড়তে সহস্রের চোখে ধরা দিল, কিন্তু এর থেকে আগের সে বেদনাও যেন ছিল ভালো । আজ তার সাজের মধ্যে নেই কোন আকুতি, রূপ নিয়ে যশ নিয়ে মাধুর্য নিয়ে নিজেই ক্লান্ত । একটা অর্থহীন দুর্বার আক্রোশ জাগে কখনো বা । চূড়ান্ত পিচ্ছিলতা থেকেও শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে আনে নিজেকে । ভাবে, ছেড়ে দেবে এ পঙ্কিল পথ । যে পথে একটা মাত্র বিলোল কটাক্ষ উজাড় করে দেয় মানুষের সকল সঞ্চয় ।

পারে না । এও এক নেশার মতো পেয়ে বসেছে । কারণ অভিনয়ের আনন্দটুকুতে খাদ নেই । তার শেষের ছবিটা চন্দ্রকে নিয়ে পরদায় দেখে এসেছে । তিনিও প্রশংসাই করেছেন । আজকাল স্ত্রীর এ জীবন-ধারা মেনে নিয়েছেন বলেই মনে হয় । চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট লোকজনের সমাগমেও তাঁর বিজ্ঞানচর্চায় ব্যাঘাত ঘটে না আর ।

কি আশ্চর্য, পথ ভুলে নাকি ! বসুন, বসুন...

বিপিন হেসে বলল, আসবার ইচ্ছে তো সব সময় ষোল আনা, কিন্তু ভয় করে, এখন আর তেমন খাতির পাব কি না । কেমন আছেন ?

ভালো। অপর্ণা সকৌতুকে চেয়ে থাকে তার দিকে, ভয়টা কিসের অভিনেত্রী হয়ে যদি সব কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে থাকি ?

স্তুতিকলা বিপিন আজও ভোলেনি । জবাব দিল, কি যে বলেন, নেহাৎ আসতে সময় পাইনে, নইলে আপনাকে নিয়ে গর্ব করি কত !

অপর্ণা বাধা দিল, থাক্ থাক্, ফুলে ফেঁপে অস্থির হয়ে যাব । আজ হঠাৎ কি মনে করে বলুন—

আজ পর্যন্ত বিপিন অপর্ণার একটা ছবিও দেখে উঠতে পারেনি । প্রসঙ্গান্তরে খুশি হল । —মোহিনীদার জোর তলব, কখন ফেরেন তিনি ?

রাত ন'টার আগে নয় ।

কি সর্বনাশ ! আমাকে যে সন্ধ্যের পর আসতে বললেন ফোনে ।

তাহলে এসে পড়বেন । চা দিতে বলি ?

ধন্যবাদ, একটু আগে ও পর্বটি বেশ ভালো করে সেরে এসেছি ।

অপর্ণা খোঁচা দিল, এখানে এসে চা পাবেন কি না ভয়টাও ছিল বুঝি ?

বিপিন হাসি মুখেই জবাব দেয়, আপিস ফেরত ওটা নৈমিত্তিক ব্যাপার ।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ আপনাকে জোর তলব কেন ?

কি করে বলি, আসামী হাজির, তারপর দেখা যাক ।

সরমার খবর কি ? সেই কবে একবার এসেছিল অবিনাশবাবুর সঙ্গে...ভালো আছে ?

হ্যাঁ। বিপিন থামল একটু, কবে এসেছিল বলুন তো ?

তার প্রচ্ছন্ন কৌতূহলটুকু অপর্ণার চোখ এড়াল না ।—সে অনেকদিনের কথা, দু'বছর হবে—একেবারে দেখা নেই কেন ?

বিপিন গম্ভীর মুখে জবাব দিল, দেখা পাবেন কি করে, এ আমার শেয়ার মার্কেটও নয় বা আপনার ছবির অভিনয়ও নয়—একেবারে খাঁটি রিসার্চ ! এক ফোঁটা ফাঁকি থাকবার জো নেই—মানুষের রোগ শোক জরা মৃত্যু সব এঁরা একেবারে জয় করে তবে ছাড়বেন। আমি একটু আধটু দেখা পাই এই ঢের ।

দু'জনেই হেসে ফেলল । মনে মনে অতিরিক্ত খুশি অপর্ণা । পরিহাসের আড়ালে ঝাঁজটুকু অনুমান করতে পারে । ছদ্মরাগ দেখাল মুখে ।—বলবেন বই কি, নিজে শেয়ার মার্কেট নিয়ে দিনরাত ডুবে থাকেন, এখন ওর ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে—ভারী অন্যায় ।

বিপিন জবাব দিতে যাচ্ছিল কি, বাইরে পায়ের শব্দ শুনে থেমে গেল । ডাঃ চন্দ্র ।

তুমি এসে গেছ...আমার একটু দেরি হয়ে গেল ।

অপর্ণা উঠে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটি ছেড়ে দিল । তিনি বসলেন ।

কতক্ষণ এসেছ ?

এই তো খানিকক্ষণ, বৌদির সঙ্গে গল্প করছিলাম ।

বেশ...ভালো আছ ?

হ্যাঁ ।

অপর্ণা বলল, তোমার অনুপস্থিতিতে শুধু গল্প করেই সমাদর করলাম অতিথির, চা খেলেন না । আজ রিসার্চের পর্ব যখন আগেই মিটল, একেবারে হাত মুখ ধুয়ে এসেই বোসো না ?

চন্দ্র বললেন, থাক, আমারও খাবার তাগিদ নেই ।

ব্যস নো ঝামেলা—হাসি মুখে একটা নিশ্চিন্ত ভাব দেখালো অপর্ণা—। আমি তাহলে চলি বিপিনবাবু, বেরুব ।

এই মানুষটির ঘরে পদার্পণ মাত্রেই একটা অসাচ্ছন্দ্য অনুভূতির প্রতিক্রিয়া চলছে বিপিনের ভিতরে ভিতরে । কি ভেবে অপর্ণাকে বাধা দিল, খুব তাড়া না থাকে তো বসুন না একটু, কতকাল বাদে দেখা—আমি না হয় লিফ্‌ট দেব'খন আপনাকে ।

অপর্ণা মোটর কিনেছে এবং সে গাড়ির দামে বিপিনের মতো তিনখানা গাড়ি কেনা চলে । তবু যে জন্যেই হোক আপত্তি করল না ।

আচ্ছা । মৃদু হেসে পাশের আরাম কেদারায় আসন নিল সে ।

চন্দ্র অপেক্ষা করলেন একটু । পরে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি বলো তো ?

কিসের ?

সরমা এ কাজ ছেড়ে দিল কেন ?

বিপিন অবাক । অপর্ণাও । নিজের অজ্ঞাতে উল্টো প্রশ্নটা আপনি নির্গত হল বিপিনের মুখ থেকে ।—একেবারে ছেড়ে দিয়েছে ?

তুমি জানো না ? চন্দ্র ঠিক যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না ।

না ।...দুদিন ধরে যাচ্ছে না দেখছি বটে । বিপিনের তীক্ষ্ণ দু'চোখ চন্দ্রর মুখের ওপর আবদ্ধ থাকে স্বল্পক্ষণ—কারণ জানায় নি ?

যেটুকু লিখেছে কিছুই নয় । নানা অসুবিধের জন্যে তার আর আসা হবে না, এই । থামলেন একটু, অসুবিধেটা কি ?

স্বাভাবিক কণ্ঠেই বিপিন জবাব দিল, কি করে বলি, হয়তো এ কাজ আর ভালো লাগছে না তার ।

চন্দ্র হাসলেন ।—সরমা জানে যে কাজে হাত দিয়েছে সেটা ছেলেখেলা নয় ।

আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে অপর্ণা নিঃশব্দে বসে আছে । বিতর্কের জের বিবাদে দাঁড়াবার ভয়ে শঙ্কিত । কৌতূহল আরো বেশি ।

বিপিন শান্ত ।—তা হলে তুমি বলতে চাও ছেলেখেলা গোছের একটা কিছু আমিই করছি ?...কিন্তু আমি যদি বলি সংসারটাও ছেলেখেলা নয়, পাঁচজনের প্রতি দায়িত্ব আছে কর্তব্য আছে, শুধু আদর্শের স্বপ্নে ডুবে থাকা চলে না—এও ছেলেখেলা হবে বোধ করি ?

চন্দ্র ক্ষণকাল নীরব থেকে আস্তে আস্তে বললেন, এই দায়িত্বজ্ঞানটুকু তুমিই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছ কি না জানতে চাইছিলাম ।...কিন্তু অবিনাশ যদি সত্যি কথা বলে থাকে, সরমার এ কাজ বরাবর মেনে নেবে বলেই তো তুমি তার কাছে স্বীকার করেছিলে ?

আজই ল্যাবরেটারি ফেরত চন্দ্র অবিনাশের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন । এই প্রসঙ্গ উল্লেখ না করাই সমীচীন ছিল । বলে ফেলে অপ্রস্তুত হলেন ।

নিজেকে সংবরণ করতে এবারে বেশ সময় লাগল বিপিনের ।—এসব কথায় আমি অপমান বোধ করছি মোহিনীদা । কে অবিনাশ, কি করেই বা সে সরমার সম্বন্ধে এমন নাটকীয় বোঝাপড়ার অধিকার পায় ভেবে দেখার সময় বা রুচি আমার কম ।...নিজের ব্যবসায়ে তলিয়ে যাচ্ছি কোথায় ঠিক নেই, এর মধ্যে সরমার কাজ নিয়ে আনন্দে লাফালাফি হয়তো করিনি, কিন্তু তা বলে কথা রাখিনি বা কাজে বাধা দিয়েছি কখনো, এ কথাই কি সরমা বলেছে তোমাকে ? কেন আজ আমাকে ডেকে এনে এসব শোনাচ্ছ ?

চন্দ্র অধোমুখে বসে থাকেন খানিকক্ষণ । নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে ওঠেন মনে মনে । নরম সুরে বললেন, ছি ছি, আমার বলার দোষেই এমন রেগে গেলে তুমি—তোমাকে শোনাব কিছু এত বড় স্পর্ধার কথা আমি ভাবব কেন ? তাছাড়া, সরমা কিছু বলা দূরে থাক, তোমার সম্বন্ধে কোনদিন তার এতটুকু অভিযোগ কখনো দেখিনি । তুমি তাকে বাড়িতে ল্যাবরেটারি করে দিয়েছ এ নিয়ে সমাদ্দারের হাসি-ঠাট্টায় লজ্জা পেলেও তাকে খুশি হতে দেখেছি ।

বিপিন শান্ত মুখে বলল, তাকেই কেন ডেকে জিজ্ঞাসা করলে না কাজ ছাড়ার কারণটা

কি ?

চেষ্টা করে বেশ জোরেই হাসলেন চন্দ্র ।—একসঙ্গে কাজই করি বা যত স্নেহই করি, ও সেদিনের ছাত্রী আমার । বন্ধু হিসেবে তোমাকে যা খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করা চলে তাকেও কি চলে !

অপর্ণা নির্বাক দ্রষ্টা এবং শ্রোতা । বিপিনের ক্রোধ কিছুমাত্র প্রশমিত না হলেও চাঞ্চল্য দেখা গেল না ।

আমাকে কি করতে বলো এখন ?

সাদা মনে বোঝাপড়া করতে গিয়ে একজন ভুল রাস্তায় পা দিয়েছেন চন্দ্র । বোঝাপড়ার ধার দিয়েও গেলেন না আর । জবাবে এবারেও বিব্রতভাবটুকুই আগে প্রকাশ পেল মুখে ।

কি বলি না বলি তোমার রাগ দেখে সবই ঘুলিয়ে যাচ্ছে । অথচ, কি করে তোমাকে বোঝাই এ সময়ে ওর এই না আসার অর্থ কি । দু'টো বছরই শুধু পণ্ডশ্রম নয়, অনেক ব্যবস্থাও ওলটপালট হয়ে যাবে । সমাদ্দার নিজে ওকে পড়াচ্ছেন, কাজ শেখাচ্ছেন...আশাও রাখেন অনেক । ওর এদিকে ঝোঁক দেখে আনন্দে আটখানা তিনি—হঠাৎ এ ব্যাপার শুনলে আকাশ থেকে পড়বেন বোধ করি । আর তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত যে ধাওয়া করবেন এতেও কোন ভুল নেই ।

অখণ্ড নীরবতা । দেরি হচ্ছে দেখেও বিপিনকে যাবার তাড়া দিতে ভুলে গেছে অপর্ণা । তাছাড়া চন্দ্রর এমন বিনীত সুপারিশে এক ধরনের আনন্দও পাচ্ছে হয়তো ।

একটু পরে চন্দ্রই জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ব্যবসার সম্বন্ধে কি বলছিলে, ভালো যাচ্ছে না ?

ঝোঁকের মাথায় বিপিন দুরবস্থার কথাটা প্রকাশ করে ফেলেছে । জবাব দিল, বাজার সর্বত্রই খারাপ এখন, আমার ব্যবসা বলে কিছু নয় । উঠে দাঁড়াল, আচ্ছা আজ চলি রাত হয়ে গেল ।...সরমাকে জিজ্ঞাসা করে দেখব তার অভিযোগ কি ।

শোনো, দ্বিধা কাটিয়ে চন্দ্র বললেন, তাকে কাল আমি ল্যাবরেটারিতে আসতে বলেছি, তোমার অমত না থাকে তো কোন কথা না শুনে কাজে লাগিয়ে দেব ।

দিও । বৌদি চলুন—

অপর্ণা উঠল । তার দেরিই হয়ে গেছে । একঝলকে যতটা দেখে নেওয়া যায় ঘরের মানুষটিকে, দেখল । চোখে মুখে ঠোঁটের কোণে কৌতুকাভাস । বসে বসে ভারি মজা দেখে উঠল যেন একটা ।

কলেজ রোড ধরে গাড়ি ছুটেছে । পাশে অপর্ণা । স্টুডিও যাবে । এক সময় বলল, আপনি বেশ জোরে ড্রাইভ করেন তো ।

বিপিন হাসল একটু ।

কথা শুরু করে কথা বলাটা সহজ হল আরো । অপর্ণা হাল্‌কা হেসেই বলল আবার, আজকের এই অনধিকার চর্চার জন্য আর বোধহয় মুখ দেখবেন না আমাদের, না ?

বিপিন চিন্তামগ্ন । ক্ষুদ্র জবাব দিল, তা কেন ।

তবু আর একটা অনধিকার চর্চা করব আমি । অপর্ণা ভাবল একটু, আচ্ছা...সরমাকে যতটুকু চিনেছি, ঘর-সংসার বা আপনাকে অবহেলা করবে তেমন মেয়ে তো সে নয় ?

অকারণেই হঠাৎ অবিনাশের ঘরে সরমার সেই শয্যা-বিন্যাসের দৃশ্যটা চোখে ভাসল বিপিনের। জবাব দিল না।

অপর্ণা ফিরে তাকালো তার দিকে, আপনার অসুবিধের কথা তাকে বলেছিলেন কখনো ?

না। বিপিনের দুচোখ সামনের রাস্তার ওপর।—মোহিনীদার সুবিধে-অসুবিধের কথা সব সময় আপনাকে বলার দরকার হয় ?

অপর্ণা একেবার চুপ। বিপিন কি ভেবে আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বৌদি, অবিনাশের সঙ্গে আপনাদেরও বেশ চেনাশুনা আছে, না ?

অপর্ণা ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখতে চেষ্টা করল একবার। জানি তাঁকে।...কেন ?

এমনি। সকলেই বিশেষ লোকটিকে জানে দেখছি, আমারই সুযোগ হল না।

চকিত কটাক্ষ অপর্ণার। চকিত বিশ্লেষণ। চেষ্টা করেছিলেন ?

না তাও করিনি। বিপিন হাসল একটু, আচ্ছা, জানার হাতেখড়ি আপনার কাছ থেকেই শুরু হোক, বলুন শুনি—।

সহসা একটা ক্রূর অভিলাষ অপর্ণার ভিতর থেকে চাড়িয়ে ওঠে যেন। ক্ষণকাল আগে চন্দ্রর আবেদনের সুরটা লাগল কানে। ভালো ভালো, ওরা খুব ভালো—এত ভালোর তুলনা নেই। কিন্তু অপর্ণা নিজে তো ভালো নয় কিছুমাত্র। দেবে নাকি এমন অসম্ভব ভালোর গায়ে একটু কালি ছিটিয়ে ! বিপিনের দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করে আমোদ পেলো আরো। তার দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে বসল এবার।

অন্ধকার সত্ত্বেও অপর্ণার মোলায়েম হাসিটুকু সুদৃশ্য। মজার অনেক কিছুই যেন মনে পড়ে গেল হঠাৎ। বলল, অনেকদিন আগে কি একটা কথায় মণিময়বাবু বলছিলেন, সরমা জানে শুধু কেমিস্ট্রি পড়তে আর অবিনাশের সঙ্গে আড্ডা দিতে। ভালো করে আমি তখন জানিইনে ভদ্রলোক কে বা কি, নাম শুনতাম প্রায়ই। আপনাদের বিয়ে সবে ঠিক তখন --মণিময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়ের পাত্রটি অবিনাশবাবু নন কেন। শব্দ করেই হাসল আবার, রেগে যাচ্ছেন না তো ?

বিপিন উৎকর্ণ। না না রাগব কেন, তারপর ?

মণিময়বাবু জবাব দিলে, অবিনাশের না আছে চালচুলো না আর কিছু। তিনি তাচ্ছিল্য করেই কথাটা বলেছিলেন, কিন্তু পরে জেনেছি লোকটার সত্যিই এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কিছু নেই। চালচুলো না থাকার সঙ্গে আর কিছু না থাকাটা বড় বিষম জিনিস।

হেঁয়ালির ধার দিয়েও গেল না বিপিন। ওদের বিয়ে না হওয়ার আড়ালে এই স্থূল দারিদ্র্যের ইঙ্গিতটুকু শুনেই খুশি।

বাক-চাতুর্য এখন নিজের বিবেকেই বিঁধছে অপর্ণার। চিনলেন ?

কতকটা।

আচ্ছা, ভালো করে চিনিয়ে দিচ্ছি আরো।—লোকটার ওই ভাঙ্গা কপালের দাম দিতে পারে এমন সম্পদ কারো নেই—আর এ সত্যটা সবচেয়ে ভালো জানে সরমা। তাই তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে আপনি ঘরে গিয়ে ঘুমোন নাকে তেল দিয়ে। গাড়ি থামান, আমি নামব এখানে।

হঠাৎ রূঢ় কণ্ঠস্বরে হক্‌চকিয়ে গিয়ে পথের মাঝখানে ব্রেক কষল বিপিন। নেমে সশব্দে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে অপর্ণা হেঁটে চলল হন হন করে। রাগটা বিপিনের ওপরেও হতে পারে, চালচুলো-বিহীন অবিনাশের সম্বন্ধে এই স্বীকৃতির দরুন নিজের ওপরে হওয়াও বিচিত্র নয়।

খাওয়াদাওয়া সেরে বেশ একটু রাত করেই ওপরে উঠল বিপিন। অন্ধকার ঘরে সরমা খাটে ঠেস দিয়ে বসে আছে চুপচাপ। আলো জ্বলতে ফিরে দেখল একবার।

বিপিন চেয়ারটা তার কাছে টেনে নিয়ে বসল।—চন্দ্র সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এলাম, তাঁর স্ত্রীও ছিলেন।

নীরবে তাকালো সরমা।

তুমি কাজে একেবারে ইস্তফা দিয়ে এসেছ শুনলাম।

সরমা ঠাণ্ডা প্রশ্ন করল, তোমাকে ডেকেছিলেন কেন ?

কৈফিয়ৎ নিতে। এতবড় একটা অসম্ভব ব্যাপারে দিশেহারা হয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই রীতিমতো অপমান করে ছেড়ে দিলেন। তা যাক, আমার আর দামটা কি। কিন্তু ল্যাবরেটারির সব ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে যাবে জেনেও তুমি এমন কাজ করে বসলে ?

সরমা প্রথমে বিস্মিত। কাউকে অপমান করবার মানুষ চন্দ্র সাহেব নন, আর ল্যাবরেটারি-প্রসঙ্গে শেষের শ্লেষটুকু মর্মান্তিক।

বিপিন লক্ষ্য করছে ভাবান্তর। অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল আবার, হঠাৎ অপরাধটা কি করলাম জানতে পাই না ?

জেনে কি হবে। সরমা স্থির শান্ত।

আর কিছু না হোক শুধরে নিতে চেষ্টা করতে পারি।

পারো ? সরমা সম্পূর্ণ ঘুরে বসল তার মুখোমুখি। চোখের দৃষ্টি বুঝি অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিল তার।

কাকীমার নামে বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা আমাকে লুকিয়ে চুরিয়ে কেন ? আমি বাধা দিতাম ?

সশব্দে হেসে ওঠে বিপিন। আনন্দে উছ্‌লে উঠল যেন ! এই ! আমার ভয় ছিল কি না কি।...তা আমি তো ভেবেছিলাম টাকা পয়সা ঘর বাড়ি এসব অতি তুচ্ছ তোমার কাছে।

ঠিকই ভেবেছিলে, অতি তুচ্ছ। তেমনি চেয়ে থাকে সরমা।—আর দু'বছর ধরে মন্টুকে আমার পিছনে লাগিয়ে রেখেছ কি করি, কোথায় যাই দেখতে—সে সম্বন্ধে কি ভেবেছিলে ?

অকস্মাৎ বজ্রপাত হলেও বিপিন সম্ভবত এমন চমকে উঠত না। বিবর্ণ পাংশু দু'চার মুহূর্ত। তীরের মতো উঠে দাঁড়াল সে।—মন্টু বলেছে এ কথা ?

মৃদু কঠিন কণ্ঠে সরমা বলল, চেঁচিও না, আমি কাছেই বসে আছি। কি ভেবেছিলে তখন ?

অন্ধ আক্রোশে বিপিন দরজার দিকে অগ্রসর হতে সরমা ঈষদুচ্চ কণ্ঠে বাধা দিল দাঁড়াও—।

পা দুটো হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই থেমে গেল বিপিনের।

সরমা বলল, মণ্টু আজ আর এতটুকু ভয় করে না তোমাকে, কিন্তু আমি ভয় করি তাকে । তার আত্মসম্মান বোধ আছে । এই নিয়ে ওর ওপর তোমার একটু কটূ কথায় আমাকে তুমি বরাবরকার মতো তাড়াবে এ বাড়ি থেকে । খুব ভালো করে বুঝে নিয়ে তবে যাও ।

বাহ্যজ্ঞান রহিতের মতো বিপিন ঘুরে দাঁড়াল । নির্বোধ, বিমূঢ় । নড়াচড়ার সামর্থ্যও হারিয়েছে যেন । এক পা দু'পা করে বাইরের অন্ধকারে এসে আশ্রয় নিল সে । সরমা উঠে দেখল কোথায় যায় । পরে খাটে এসে বসল আবার ।

পরদিন ।

বিপিন কাগজ পড়ছে । অথবা চেষ্টা করছে পড়তে । সরমা মণ্টুকে ঘরে ডেকে পাঠালো । সে এলে বিপিনকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার গাড়িটা রাত্রিতে ছেড়ে দিতে পারবে আমাকে ?

খবরের কাগজ প্রায় মুখে ঠেকেছে বিপিনের । ঘাড় নাড়ল, পারবে ।

সরমা মণ্টুকে বলল, ল্যাবরেটারি থেকে সন্ধ্যের পর আমি অবিনাশের ওখানে যাব । ফিরতে দেরি হতে পারে, উনি আপিস থেকে এলে তুমি এই...সাড়ে আটটা নাগাদ আমাকে আনতে যাবে । হাঁ করে দেখছ কি, কাজ নেই তো কিছু ?

কোন প্রকারে মাথা নেড়ে মণ্টু ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান করল । সরমা সেখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করল একটু । বিপিনের সমস্ত মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে । গামছা কাপড় নিয়ে সরমা ধীরেসুস্থে স্নানের উদ্দেশে চলে গেল ।

ল্যাবরেটারি ।

ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করে সরমা দেখে সমাদ্দার পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে টেলিফোনে কথা বলছেন তারস্বরে । মেডিকাল রিসার্চ ইনস্‌টিটিউট্ ? সমাদ্দার— । কি বাবা, স্যাম্পল্‌টা যে পাঠালাম ইম্‌প্রুভমেন্ট্ দেখলে কিছু ? না ? রাবিশ ! তোমাদের রিপোর্ট পাঠাচ্ছ না কেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলে ?

সরমাকে দেখে চন্দ্র উঠে এলেন । নিচু গলায় বললেন, তুমি এমন ছেলেমানুষ জানতুম না । সমাদ্দারকে যা হোক কিছু বলে দিও, তাঁকে চিঠি দেখাই নি ।

সরমা নিজের ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়াল । ভুটা সহাস্যে কুশল প্রশ্ন করে গেল । হরিআনন্দ্ নিজের জায়গা থেকেই মুখ তুলে দেখল একবার । বিগত ক'টা দিনের সকল কাজ নীরস লাগছিল দু'জনেরই ।

ফোন রেখে সমাদ্দার ফিরে দাঁড়ালেন, ওহে ভুটা-আনন্দ-চন্দ্র কোম্পানি—

সরমাকে দেখা মাত্র থেমে গিয়ে অস্ফুট শব্দ নির্গত করলেন একটা । মাই ডিয়ার, ডিয়ার !

ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কাছে এসে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন তার ।—অসুখ করেছিল ?

মৃদু হেসে সরমা বলল, না ।

না মানে ! বিষম অবাক তিনি, বলা নেই কওয়া নেই ডুব মেরে দিলে দু'দুটো দিন । আমি ভেবে সারা, চন্দ্রকে তাগিদ দিচ্ছি সাতবার করে, দেখে এসো অসুখ করল কি না,

আর এদিকে দিব্বি আনন্দ করে বেড়াচ্ছ ! আজ থেকে রোজ দু'ঘণ্টা করে জরিমানা করলাম তোমার !

সরমা নিরীহ মুখে প্রশ্ন করল, দু'ঘণ্টা কম খাটব ?

ইউ ন'টি গার্ল দু'ঘণ্টা বেশি খাটবে ।

সরমা হাসি মুখেই তর্ক করতে ছাড়ে না ।—এমনিতেই তো কাজের পর ঘণ্টা দুই বেশি থাকি রোজ ।

দরাজ গলায় হাসতে হাসতে তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে সমাদ্দার নিজের জায়গায় এসে বসলেন ।

অদ্ভুত ভালো লাগছে সরমার । যেন বৈচিত্র্য-হীন একটানা প্রবাস-নির্বাসনের মেয়াদ কাটিয়ে আজ নিতান্ত নিজের জায়গাটিতে ফিরে এসেছে ।

ল্যাবরেটারি থেকে বেরিয়ে সরমা অবিনাশের উদ্দেশ্যে ট্রেনে চাপল । সব ভুলে ছিল এতক্ষণ ; রাতে আবার বাড়ি ফিরে দেখতে হবে সেই গম্ভীর মুখ । আনন্দ নেই, হাসি নেই, অসন্তোষের প্রতিমূর্তি । অনেকদিন বাদে অবিনাশের জন্য মনটা বেশিরকম ছটফট করে উঠল । তাকে বলবে সব । সুরাহা কিছু না হোক, বলার জন্যেও বলবে । এই দুর্বিষহ গুমট সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে ।

সম্প্রতি ওদের দেখা-সাক্ষাৎ দুই একটা ছুটি-ছাটার স্বল্পতায় সীমাবদ্ধ । সরমা সময় করে উঠতে পারে না । সেদিন মণ্টুর মুখে শুনেছে অবিনাশের শরীর ভালো যাচ্ছে না । কিন্তু মাঝখানের এই গোলযোগে কিছুই মনে ছিল না ।

বিগত দিনের স্মৃতি বার বার মনে পড়ে ।

সায়েন্স কলেজে যখন তখন উপস্থিত হয়ে তাকে অপ্রস্তুত করা, মণিময়কে রাগানো, লোকচক্ষুর কৌতূহল এড়িয়ে দূর নিরালায় বালুর ওপর পা ছড়িয়ে বসা, মানুষটার ব্যাঙ্গোচ্ছ্বাস...সমুদ্রের কলধ্বনি ।

সরমা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে কেমন । ভাব-প্রবণতার জায়গা নেই মনে, প্রতিষ্ঠার সার্থক-মাল্য একমাত্র লক্ষ্য । তবু আগের দিনগুলি ভাবতে গেলে আত্মবিস্মৃত নিঃশ্বাস পড়ে দুই-একটা । অতীতে নির্বাসিত ওরা । কোনদিন কোন ছলেই ফিরে আসবে না আর ।

ভারী ইচ্ছে করছে অবিনাশকে নিয়ে আজ সমুদ্রের ধারে সেই পুরানো জায়গাটিতে গিয়ে বসে । হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল, ওর শরীর সুস্থ থাকলে তাই যাবে আজ । অসুস্থতার প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল ক'টা বছর আগে সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময়েও ওষুধ আর পথ্য খাওয়া নিযে তার সেই চপলতা ।

সচেতন হল সরমা । অপ্রস্তুতও । নিজের মনেই হাসছে সে । সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে অপরিচিত যাত্রীদের নীরব কৌতূহল ।

সেই সঙ্গে অলক্ষ্য দেবতাটিও নিঃশব্দে হাসছিলেন বোধ করি ।

সামনে বই খুলে অবিনাশ বিছানায় সমাসীন । নারী সমাগম উপলব্ধি করে খোলা বইয়ের দিকে চেয়েই জোরে জোরে পড়তে শুরু করল, রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা, বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শুনি কাহারো কথা, বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে—

সরমা বই টেনে নিয়ে দেখে, কমার্সিয়াল বিজ্ঞানের গাইড একটা । রাগ করে চৌকির

এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটা । হেসেও ফেলল । ওর ঠাট্টার নমুনা শুনে মনে মনে বিস্মিত, বিগত কটা দিনের ঘটনা জানে কি না বোঝা গেল না ।

বলল, মেজাজপত্র ভালো না আমার, রাগিও না বলচি । ভাঙ্গা চেয়ারটা মুখোমুখি টেনে নিয়ে বসল, কেমন আছ ?

ভালো ।

সরমা আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করল, ভালো তো দেখছি না ?

দেখবে না তো । তড়বড় করে বলে গেল অবিনাশ, লোকে বলে দেহের সঙ্গে মন আর মনের সঙ্গে দেহের যোগ—একেবারে বাজে কথা । নাছোড়বান্দা ঐহিক দেহটার সঙ্গে পেরে উঠছি না বটে কিন্তু মনটা একদম পারত্রিক জগতের সিংহদ্বার ঠেলে আধ্যাত্মিকতার সিঁড়ি ছুঁয়েছে ।—আমি বিদ্রোহী !

এইটুকুই সরাপথ ভাবতে ভাবতে আসছিল সরমা । খুশির ছোঁয়া লাগে । ধমকের সুরে বলল, বিদ্রোহী কি এখন বেরুবেন, না এই ভর-সন্ধ্যেয় চাদর গায়ে বিছানায় বসে থাকবেন ?

অবিনাশ ততোধিক গম্ভীর । জবাব দিল, বিদ্রোহী মন জীবনের সাতস্তরে টপাটপ্ লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, মুহূর্তের বিশ্রাম নেই । কিন্তু নশ্বর দেহ সম্প্রতি নচ্ছার ডাক্তারী বিধি-নিষেধের নাগপাশে আবদ্ধ । নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু—।

ঠাট্টায় কান না দিয়ে সরমা চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করল, হয়েছে কি ?

মেন্টাল্ থ্রমবসিস্ । হেসে উঠল অবিনাশ, ছাই হয়েছে । এই মাত্র সাতরাজ্য ঘুরে এলাম, একসঙ্গে বেশি চলাফেরা বারণ...একটু বাদে বেরুব'খন । যাবে কোথায় ?

সরমা ব্যস্ত হয়ে পড়ে । না আর বেরিয়ে কাজ নেই, বেশি চলাফেরা বারণ কেন —ওই হার্টেরই ট্রাবল্ তো ?

যেতে দাও । স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ একেবারে বাতিল করে দিতে চায় অবিনাশ, সতেরো বছর বাদে এসে উনি এখন স্বাস্থ্য-চর্চা শুরু করলেন, আমি এদিকে হাঁসফাঁস করছি মান-ভঞ্জনের পালাটা শুনব বলে ।

সরমা নীরবে অপেক্ষা করল একটু । পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, শুনলে কার কাছে ?

ভবিষ্যৎ রিসার্চের ভরাডুবি ভেবে দুশ্চিন্তায় যিনি সর্ষেফুল দেখছিলেন চোখে—অর্থাৎ, চন্দ্র সাহেব । আজ ল্যাবরেটারি থেকে আসছ ?

হ্যাঁ ।

কাজ করলে ? অবিনাশ হাসছে মিটিমিটি ।

করলাম ।

গুড্ । মাস্টারমশাইকে তখনি বলেছিলাম, নির্ভাবনায় অপেক্ষা করুন, না ভদ্রলোক ভেবেই অস্থির !

তোমার ভাবনা হয়নি ? সরমা তেতে উঠছে ভিতরে ভিতরে ।

পাগল ! বরং এতদিনে বুদ্ধির তারিফ করেছি তোমার । অনুরাগ-চর্চার একঘেয়েমি কাটাতে মাঝে মাঝে এই রাগ-বিরাগের দাম বোধহয় নিজেই বুঝছ এখন । এর অভাবে

কেমিস্ট্রি পর্যন্ত নীরস লাগে । লাগবেই ।—'শুধু নির্মাণ নেশায় যদি মাত, সৃষ্টি হবে গুরুভার, তার মাঝে লীলা রবে না তো'—আহা, হাইক্লাস্ !

প্রতি কথায় তার অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসটুকু লক্ষ্য করছে সরমা । গম্ভীর মুখে বলল, ফাজলামো করতে হবে না, ।—ওদিকে নিজের ব্যবসা নিয়ে ডুবেছেন হয়তো, আর যত ঝাল বাড়ির ওপর । তোমার কাছে লজ্জা করে লাভ নেই, দু'বছর ধরে এই চলছে । আর সহ্য হবে না, একটা পরামর্শ দাও ।

অবিনাশ বিস্ফারিত প্রথম । বুঝতেও সময় লাগে যেন । পরে সোল্লাসে বলে উঠল, বা বা বা বা ! পরমার্শের কি আছে, দলিলপত্রে বিয়ে, ছিঁড়ে ফেলতে কতক্ষণ লাগে !

সরমা নির্বাক খানিকক্ষণ । ঠাট্টা করছ ?

কি মুশকিল ! বিব্রত ভাব দেখাবার মধ্যেও বিদ্রূপটুকুই স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরো ।—বাংলা দেশের রক্ষণশীলতারও গোড়া নড়েছে, এ তো কেতাদুরস্ত বোম্বাই শহর, পরামর্শটা খারাপ হল ?

সরমা আবারও নীরব ক্ষণকাল । সান্ত্বনা পেতে আসা যার কাছে, উল্টে তারই মুখে এ শ্লেষ বৃশ্চিক দংশনের মতো লাগে । এখানে আসা এবং এসে ভালো লাগার অনুভূতিটুকু নির্মমভাবে মুছে যেতে লাগল যেন । দেখছে ওকে । ক্ষোভ আর অপমানের ছায়া ঘন হয়ে আসছে, মুখে । বলল, দুরবস্থার কথাটা শুনে আনন্দ চেপে রাখতে পারছ না আর, কেমন ?

ওই মুখ আর ওই ঠাণ্ডা সুর অবিনাশ চেনে । তবু আপসের চেষ্টা করল না একটুও । মাথা নেড়ে জবাব দিল, তাই তো ! কিন্তু সরমা যা বলেছে, তার পক্ষেও বরদাস্ত করা সহজ নয় খুব । ভিতরে গিয়ে বিঁধছে । ধাক্কা খেয়েছে । তার চোখে চোখ রেখে সরাসরি বলল আবার, তা কি পরামর্শ চাইছ তুমি ? আমি যদি বলি, বিপিন চৌধুরীর এই দুঃসময়ে সারাক্ষণ তোমার এই ল্যাবরেটোরির গবেষণায় তার খুব উৎসাহ পাবার কথা নয়, বরং অনেক জোর পায় বল পায় শুধু তুমি কাছে বসে থাকলে, খুশি হবে ?

এবার নিজেকে সামলে নিল সরমা । খুব শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, যেন পরামর্শই করছে কিছু, সব ছেড়ে ছুড়ে বসে থাকি তাহলে, কি বলো ?

ছাড়তে গেলেই ছাড়া যায় না এ তো চেষ্টা করে দেখলে । অবিনাশ নির্লিপ্ত ।—তোমাদের কাজে আমার কোন অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু তা বলে বিপিনবাবুকেই বা অমানুষ ভাবব কেন ?

না বিল্ব-পত্র দিয়ে পূজা করোগে যাও । সরমার সব সহিষ্ণুতা ভেঙে পড়ল যেন । তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, আর যদি শোনো ছোট ভাইকে দিয়ে দিনের পর দিন তিনি গোয়েন্দাগিরি করিয়ে বেড়াচ্ছেন, কবে, কখন তোমার কাছে আসি না আসি খবর নিতে, শ্রদ্ধার মাত্রাটা তোমার উথলে উঠবে বোধ করি ?

নিস্পন্দের মতো বসে থাকে অবিনাশ । হার্টের গোলযোগবশতই হয়তো বাতাসের অভাববোধটা বেশি লাগছে । গায়ের চাদর সরিয়ে রাখল ।

সরমা ঝাঁজিয়ে উঠল আবার, জবাব দিলে না ?

তবু সময় লাগে একটু—আমার জবাব শুনলে তোমার রাগ আরো বাড়বে সরমা । তোমার ভেতরের সন্ধান তেমন করে পেতে দাওনি বলেই হয়তো আজ তোমার বাইরের

সন্ধানটা এমন করে হাতড়ে বেড়াচ্ছে ভদ্রলোক ।

স্থির নেত্রে সরমা তাকে দেখছে চেয়ে চেয়ে । অব্যক্ত রোষে পলক পড়ে না চোখে । দু'বছর আগে অপর্ণা চন্দ্রর প্রতি সহানুভূতি আর আজ বিপিন চৌধুরীর জন্য এই দরদ দুইয়েরই একটি মাত্র নিগূঢ় হেতু যেন সুস্পষ্ট দেখতে পেল । রাগের মাথায় বহুদিন যে ইঙ্গিতটা করে ফেলে অবিনাশকে আঘাত দিয়েছে এবং পরে অনুতপ্ত হয়েছে নিজে—আজ তারই শেষ প্রহসন । কঠিন হাসির আভায় মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আরো । অস্ফুট স্বরে বলল, মনে মনে এত জ্বালা তোমার ! আজ যদি আমার সব সাধ একসঙ্গে ডোবে তুমিই বোধ করি আনন্দে হাততালি দেবে সকলের আগে, না ?

থামল একটু । অপেক্ষা করল । দেখল—তোমার ওই রোগেভোগা মন নিয়ে মিছেই তুমি আমার শেষ দেখার আশায় বসে আছ অবিনাশ । আজ বলে যাই, বেঁচে থাকলে দেখবে, একজন ছেড়ে দশজন বিপিন চৌধুরীরও সাধ্য নেই সরমাকে নিঃশেষ করে তোমাকে আনন্দ দিতে পারে ।

অবিনাশের মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে একটু একটু করে । সমস্ত হৃৎপিণ্ড কে বুঝি মুচড়ে নিঙড়ে একাকার করে দিল । একটা নিবিড় ব্যথা গোপন করার তাড়নায় কপাল ঘেমে উঠেছে । সময় লাগল সামলে নিতে । খুব আস্তে আস্তে বলল, আমার রোগেভোগা মন কখনো আশা যদি করেও থাকে কিছু কোনদিন যে একে প্রশ্রয় দিইনি নিজেই তো জানো সরমা ।...তোমার মতো একজন এমন করে বড় একটা আসে না কারো জীবনে । তাই নিজের অদৃষ্টের কথা ভেবে নিঃশ্বাস হয়তো দুই-একটা পড়েছে কখনো । কিন্তু এ নিয়ে কোনদিন তোমার ওপর এতটুকু নালিশ নেই আমার, আমার চিন্তা দিনরাত তোমার মঙ্গলই চেয়েছে ।

কিছুক্ষণ ।

অনেকক্ষণ ।

মণ্টু গাড়ি নিয়ে এসে দেখে সরমা বসে আছে মূর্তির মতো আর অবিনাশ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ।

কি ব্যাপার অবিনাশদা, এমন চুপচাপ যে ! শরীর ভালো তো ?

অবিনাশ কাছে এলো, হ্যাঁ ভালো ।

মণ্টু বসার উদ্যোগ করতে সরমা উঠে দাঁড়াল, আর বসতে হবে না, এসো, কাজ আছে বাড়িতে ।

কোনদিকে না তাকিয়ে সরমা গাড়িতে গিয়ে উঠল । মণ্টু বিলক্ষণ ঘাবড়ে গেছে মনে মনে । অবিনাশের দিকে চেয়েও সুবিধেজনক ঠেকল না পরিস্থিতি ।

গাড়ি চলে গেল ।

অবিনাশ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে । কতক্ষণ ঠিক নেই । একসময় বিছানাটা কম্বলসুদ্ধ গুটিয়ে নিল বেশ করে । সুটকেসে জামা কাপড় বই ইত্যাদি ভরে নিল । ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে বিছানা বাক্স সমেত দাদারের ট্রেনে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে এসে নামল । দূরের ট্রেন ধরবে ।

শান্ত, নিরুদ্বেগ । সরমা সুখী হোক । শান্তি পাক বিপিন চৌধুরী । বিগত দিনের স্মৃতি

নিয়ে আগাছার মতো আর ওদের সামনে পড়ে থাকা নয় । সে লজ্জা আর গ্লানির অবসান একেবারেই হয়ে যাক আজ ।

পর পর দু'দিন ঘর তালাবন্ধ দেখে মন্টু ফিরে গেছে । সেদিন খটকা লাগল কেমন । সার্শি টেনে ঘরের ভিতরটা দেখতে চেষ্টা করল সে । পরিত্যক্ত দশা ।

সরমা শুনে বিমূঢ় চোখে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ । পরে সামলে নিয়ে বলে, হয়তো চেঞ্জে-টেঞ্জে গেছে কোথাও । ওর কৌতূহল এড়াবার জন্যেই একটা বই খুলে বসল ।

পরদিন সকালে সরমা নিজেই কথাটা তুলল আবার ।—আচ্ছা মন্টু, সেদিন অবিনাশের শরীর খারাপ দেখে এসেছিলাম...তার বাড়ির কাছেই হাসপাতাল, একবার খবর নেবে ?

নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও সরমার উদ্বেগটুকু গোপন থাকে না মন্টুর কাছে । বলল, শরীর ভালো নয় আমিও জানি, কিন্তু বাক্স-বিছানা বই-পত্র নিয়ে কে আর হাসপাতালে যায় ।

তা তো বটে, চেঞ্জেই গেছে বোধহয়...।

কঠিন একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চায় সরমা । গেছে যাক্ । বার বার ক্ষমা চাওয়া নয় আর । কিন্তু নিজেকে ক্ষমা করতে না পারার যাতনা আরো বেশি । যথার্থই মানুষটাকে তাড়াতে সমর্থ হয়েছে এতদিনে ।...একদিন সে বলেছিল, কারো করুণার বোঝা হয়ে থাকবে না কোনদিন । থাকলও না । সেদিন ভয় পেয়েছিল সরমা । আজ ? সাফল্যের গরিমা সকল ভয়কে ছাপিয়ে উঠেছে বইকি । অবসন্ন স্তব্ধতায় দিন কাটে । ল্যাবরেটারিতেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে । কাজ ভুল করে সমাদ্দারের কাছে বকুনি খায় ।

চন্দ্র সেদিন একটা চিঠি হাতে কাছে এসে দাঁড়ালেন । বললেন, অবিনাশ বাইরে গেছে জানতুম না তো !

সরমা উদগ্রীব নেত্রে অপেক্ষা করে । চন্দ্র আবার বললেন, কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে, পাছে আমরা ওর জন্যে ভাবি তাই লিখেছে ।

সরমা মৃদু-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছে—

ভালোই তো লিখেছে, পড়ে দেখ না—ঠিকানাটা নোট করে আমাকে ফেরত দিও ।

চিঠি রেখে চলে এলেন চন্দ্র । নিশ্চিন্ত বুঝলেন, অবিনাশ এখানে নেই সরমা জানে । এবং তার হেতুও । হঠাৎ এই স্থান পরিবর্তনের উদ্দেশ্য আর যাই হোক স্বাস্থ্যোদ্ধার যে নয় জায়গার নামেই তার প্রমাণ । কবে পর্যন্ত ফিরবে কোন উল্লেখ নেই ।

সরমা চিঠি পড়ল । ওর এই উধাও হয়ে যাওয়াটা কারো ভাবনার কারণ হয় এ ও চায় না । যা হোক একটা হদিস পেয়ে সরমার দুশ্চিন্তা গেল । রাগ বাড়ল । একটু মুখের কথাই যদি এত বড়, থাক যেখানে গিয়ে খুশি । চিঠি সে লিখবে না । বিজ্ঞাপন আঁকা বন্ধ রেখে ক'টা দিন আর বাইরে থাকা চলবে ?

কাজের উৎসাহ ফিরে আসে আবার । তবু অবিনাশের একটা ইঙ্গিত বাড়িতে সকল সময় সচেতন রাখে তাকে । বিপিন চৌধুরীর তিক্ত গাম্ভীর্য হাসি মুখেই বরদাস্ত করে আসছে তারপর থেকে । পাঁচটা কথার একটা জবাব না পেলেও কাছে আসে এবং চেষ্টাও করে তাকে কাছে টানতে ।

ছ'মাস গেল । অবিনাশের আসার কোন লক্ষণ নেই । চন্দ্র দু'তিনটে চিঠি লিখেও জবাব পান নি । সরমা ভাবছে, আর চুপ করে থাকা উচিত কি না । অবকাশ কম, ল্যাবরেটারির

সুনামের সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাপ বেড়েছে ।

অকল্পিত একটা দুর্যোগে ভাবনা চিন্তা একেবারে স্থগিত থাকল বেশ কিছুকাল ।

দেহের নিম্ন অংশ প্যারালিসিস্ হয়ে সমাদ্দার শয্যা নিলেন । আর উঠবেন না এও সুনিশ্চিত । কিছুকাল কাটল দুশ্চিন্তায় এবং বিশৃঙ্খলায় । ল্যাবরেটারির সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরীরও সকল দায়িত্ব পড়ল চন্দ্রর ওপর । নিচেই কোণের একটা ঘরে সমাদ্দার নিজের ব্যবস্থা করে নিলেন । এ আবহাওয়া ছেড়ে নিরালায় থাকতে রাজী নন্ । সেখান থেকে ডাকাডাকি চিৎকার চেঁচামিচির বিরাম নেই । কেউ সংবাদ নিতে এলে ঝাঁজিয়ে ওঠেন, গো টু ইওর ওয়ার্ক, ডোন্ট্ ওয়েস্ট টাইম্ প্লীজ !

দৈনন্দিন কাজ সেরে রাত্রিতে চন্দ্রর সঙ্গে সরমাও তাঁর কাছে গিয়ে বসে খানিকক্ষণ । তিনি খুশি হন ।—দেখ গিন্নি, আশী বছর বাঁচলুম আবার কি ! যতদিন পেরেছি থামিনি —নিজেদের বেলায় এ যেন মনে থাকে তোমাদের ।

## ।। ১৩ ।।

কিন্তু এদিকে বিপিন চৌধুরী তার শেষ প্রহরের ঘন্টা শুনেছে ।

গলা পর্যন্ত বাজারের দেনা । যে কোন একটা শেয়ারের দাম চড়লে আরো কিছুকাল টিকে থাকতে পারে । কিন্তু তা যেন আর হবার নয় । একটানা পড়তি দশা শেয়ার বাজারের । ঘনশ্যামবাবু পৃথক হয়ে অনেকটা সামলে নিয়েছেন । তবু স্বার্থের যোগ এখনো আছে কিছু । তাঁর পরামর্শে কতগুলি দরকারি কাগজপত্র বিপিন সেদিন বাড়িতে সরিয়ে আনল । দলবল সমেত গোপনীয় আপিসটা এবার থেকে বাড়িতেই বসবে । সেদিনের মতো কাগজপত্র সব চারুদেবীকে দিল রাখতে ।

সরমা বাড়ি ছিল না । সে বাড়ি ফিরতে চারুদেবী সেগুলো আবার তার হেপাজতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন ।

পরদিন যথসময়ে ঘনশ্যামবাবুর সমাগম । সঙ্গে দিনকে রাত করতে পারেন এমন একজন ব্যবহারজীবী পরামর্শদাতা । ব্যস্ত হয়ে বিপিন সেই কাগজপত্র সব চাইতেই প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন চারুদেবী ।—সে সব তো আমি বৌমা আসতেই তার হাতে দিয়ে দিয়েছি সাবধান করে রাখার জন্য !

বিপিন তেতে উঠল । কিন্তু বাক্যব্যয়ের সময় নেই আপাতত । নিজের ঘরে এলো । সরমা তার কাজে বেরিয়ে গেছে ! চাবি বিছানার নিচে থাকে তাই রক্ষা । হয় দেরাজে নয় তো ট্রাঙ্কে রেখেছে । দেরাজেই পেল । কাগজপত্র সব বার করে নিয়ে বিপিন নিচে নেমে গেল ।

মোটামুটি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে মূল্যবান তথ্যগুলি একে একে উক্ত পরামর্শদাতার দিকে এগিয়ে দিতে লাগল ।

সকলের শেষে একটা খাম ।

উল্টে-পাল্টে দেখল বিপিন, কিছু লেখা নেই । ভাবল, আপিসের কাগজপত্রের সঙ্গে এসে গেছে । তবু দরকারী কি না দেখার জন্য ভেতরের লেখা কাগজটা বার করল ।

সহসা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে তাড়াতাড়ি ওটা হাতের মুঠোয় আড়াল করে ফেলল সে। ঘর টেবিল চেয়ার সব কিছু দুলছে চোখের সামনে।

'অবিনাশ, তুমি জান তোমাকে কত ভালোবাসি আমি, অথচ মুখ ফুটে কিছুই তুমি বললে না আজও। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না বাঁচব না বাঁচবই না—এই শেষ কথা বলে দিলাম। নরক-কুণ্ডে পড়ে আছি, এখানে থেকে তাড়াতাড়ি আমাকে উদ্ধার করবে তো করো, নইলে চিরদিন দুঃখ করতে হবে।—সরমা।

মণিময়কে রাগাবার উদ্দেশ্যে সরমার লেখা নকল-করা অবিনাশের সেই চিঠি।

সরমা যত্ন করে রেখে দিয়েছিল, কতটা পারে অবিনাশ, তার নমুনা। সেদিনের ক্ষুদ্র পরিহাসটুকু নিয়ে নির্মম পরিহাসের জাল ফেলে বসে আছে অদৃষ্ট। মণিময়ের ক্রোধের শতগুণ ফলাফল নিয়ে ওটা আজ বিপিন চৌধুরীর চিন্তাধারার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে অমিলে যাবেই।

বিস্ময়-বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে আছেন অপর দু'জন ভদ্রলোক।

বিপিন বলল, আজ আর কিছু হবে না, আপনারা যান।

কিন্তু ব্যাপার কি? ঘনশ্যামবাবু প্রশ্ন করেন তবু।

কিছু না। কাগজপত্র ফেলে রেখেই চিঠি নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিসের একটা ঝনঝনানি অবিরাম বাজছে কানে। শেষ কিছুর ইঙ্গিত যেন। চিঠি বুকপকেটে। পড়ে পড়ে কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। ভাবছে, কিছু একটা করা চাই—কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

বেশি রাত্রিতে বাড়ি ফিরল। সকালের কাগজপত্র তেমনি ছড়ানো পড়ে আছে টেবিলে। স্ফীতকায় দেনার অঙ্কটা ভাসছে চোখের সামনে। সুমসৃণ রজ্জু-খণ্ডের মতো অমোঘ ক্রূঢ়তায় ওটা এগিয়ে আসছে কণ্ঠ বেষ্টন করতে।

পরদিন সকালে বেরুল আবার। আজও ঘর তালাবন্ধ অবিনাশের। কালও এসে ফিরে গেছে বিপিন। বাড়ি ফিরে কি ভেবে সরমার সামনে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল, কাজে বেরুচ্ছ?

হ্যাঁ, বলবে কিছু?

না, কি আর বলব...।

ইদানীং ব্যবসায়ের দুশ্চিন্তায় দিবারাত্র তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখছে সরমা। নতুন কিছু চোখে ঠেকল না। তবু বলল, দিনরাত খেটে খেটে হয়রান হয়ে গেলে, দু'দিন বিশ্রাম নাও না।

বিপিন হাসল। চমৎকার অভিনয়ের মতো লাগছে।

নেব।

আমি যাই?

এক মিনিট। বেশ সাদাসিধে মুখে বলল বিপিন, অবিনাশবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, ঘর তালাবন্ধ দেখলাম। তিনি নেই এখানে?

সরমা অত্যন্ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। মনের ভিতরটা খল-খলিয়ে হেসে ওঠে বিপিনের।

সে এক বছর ধরেই নেই এখানে ।...কেন বলো তো ?

কাজ ছিল । ঠিকানা জান না তুমি ?

জানি । চাই তোমার ?

এখন থাক । বিপিন বিছানায় শুয়ে পড়ল ওপাশ ফিরে । তবু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সরমা । এক বছর বাদে এ কিসের সূত্রপাত আবার বুঝছে না । ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে বেরিয়ে গেল ।

কি ভেবে বিপিন উঠে বসল । লেটার-প্যাড আর কলম টেনে নিল । বুকপকেট থেকে চিঠি বার করে বয়ানগুলো তুলল যথাযথ । নিচের সংক্ষিপ্ত পত্র লিখল চন্দ্রের নামে ।— আসল চিঠিখানা এখানে এসে দেখে যেতে পারো । ভাবছি, সরমা কেন সোজাসুজি এ নরক-কুণ্ড থেকে বিদায় চাইল না ? সে শুধু প্রিয় ছাত্রীই নয়, আদর্শ ছাত্রী বলে গর্বও আছে তোমার । তাই আদর্শের একটা নমুনা পাঠিয়ে বিলক্ষণ আনন্দ পাচ্ছি ।—বিপিন চৌধুরী ।

ল্যাবরেটারি । চন্দ্র সারাক্ষণ তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন সরমার ওপর । কিন্তু এতটুকু ব্যাতিক্রম চোখে পড়ল না । একাগ্র আনন্দে হরিআনন্দ্ এবং ভুটার সঙ্গে রাসায়নিক তথ্যে ডুবে আছে ।

পরদিনও তাই ।

চন্দ্র বিভ্রান্ত । অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও অবিনাশেরই শরণাপন্ন হলেন শেষপর্যন্ত । লিখলেন, শিগগীরই আসা চাই, অত্যন্ত জরুরী ।

সন্ধ্যার পর সরমা বাড়ি ফিরে দেখে বিপিন শুয়ে আছে ।

সকাল থেকেই হাবভাব অন্যরকম দেখছে । জিজ্ঞাসা করল, শরীর খারাপ নাকি ?

না । বিপিন নির্লিপ্ত ।

এ সময় শুয়ে যে ?

এমনি ।

তবু ভালো...মাস্টারমশাইও হঠাৎ আজই আবার জিজ্ঞাসা করছিলেন তুমি কেমন আছ না আছ—

বাইরে যত নিস্পৃহ দেখাক, ভিতরে ভিতরে বিস্ময়ের অবধি নেই বিপিন চৌধুরীর । মনে মনে প্রশংসা না করে পারছে না, অন্তর্দ্বন্দ্বের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাচ্ছে না সরমার মুখে ।

প্রায় এক ঘন্টা আগে অপর্ণা দোতলা থেকে অবিনাশকে তাদের বাড়ির গেটে ঢুকতে দেখেছে এতক্ষণে নিচে নেমে বসবার ঘর প্রায় অতিক্রম করেও ফিরে দাঁড়াল । চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কাজে যাবে না আজ ?

হ্যাঁ, এইবার উঠব ।

অবিনাশের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অপর্ণা কাছে না এসে পারল না । অবিনাশ নমস্কার জানালো দু'হাত তুলে ।

অপর্ণা আবার স্বল্পক্ষণ নিরীক্ষণ করল তাকে ।—আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন, অসুখ নাকি ?

না, ভালোই আছি ।

চন্দ্র অনুযোগ করলেন, আমার কথা বিশ্বাস হল না, এখন দেখো—।

অবিনাশ বলল, সারা রাত ট্রেনের ধকলেই এমন দেখাচ্ছে বোধহয় ।

কোথায় গিয়েছিলেন ? প্রশ্ন অপর্ণার ।

অবিনাশ হাসল অল্প একটু । চন্দ্র বলেন, ও তো এই এক বছর ধরেই বাইরে কাটালো, আজই সকালে এসেছে ।

অপর্ণা একটু অপেক্ষা করে চলে গেল । খবরটা জানা ছিল না ।

অবিনাশও উঠে দাঁড়াল ।—চলি, আজ-কালের মধ্যেই বিপিনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করব ।

ল্যাবরেটারিতে চন্দ্র সরমাকে অবিনাশের আসার খবরটা জানালেন । শোনামাত্র ওর প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্যটুকু দৃষ্টি এড়ালো না । হাতের টেস্ট-টিউবে চোখ রেখে নিস্পৃহ কুশল প্রশ্ন করল ।—ভালো আছে ?

চন্দ্র বললেন, ভালো নেই বলেই তোমাকে দুই একটা কথা বলা দরকার । ওটা রাখো হাত থেকে...

টেস্ট-টিউব তাড়াতাড়ি ফাইলে রেখে সরমা পাংশু মুখে ঘুরে দাঁড়াল ।

চন্দ্র সামলে নিলেন, না ভয়ের কিছু নয়—তবু যতদূর মনে হল এই একটা বছর অনিয়ম করেছে খুব ।

মুহূর্তের জন্য সরমা ভুলে গেল সে ল্যাবরেটারিতে দাঁড়িয়ে, এবং সামনের মানুষটি তার ভূতপূর্ব শিক্ষক । তিক্ত শ্লেষে বলে উঠল, এখনই বা আসতে গেল কেন, আর চলছিল না ।

অপ্রস্তুত পরক্ষণে ।

চন্দ্রর মুখে হাসির আভাস । একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলেন, একটা জরুরী দরকারে আমিই তাকে বিশেষ করে আসতে লিখেছিলাম ।

সরমার জিজ্ঞাসু চোখে চোখ রেখে থামলেন একটু ।—তা দেখো, ওকে সামলাবার মতো তিনকুলে নেই কেউ এ আর তোমার থেকে ভালো কে জানে...আবারো যাতে শরীরটা না মাটি করে বসে সেদিকে একটু নজর রাখতে বলি ।

অবিনাশ বলেছিল, সরমাব ভিতরের সন্ধান পায়নি বলেই নাকি বাইরের সন্ধানটা এমন করে হাতড়ে বেড়াচ্ছে বিপিন চৌধুরী । আজও ভোলেনি সরমা । শান্ত মুখে বলল, আমি আর কি করতে পারি ।

জবাবটা অপ্রত্যাশিত । চন্দ্র হাসলেন একটু ।—না যদি পারো তাহলে আর কথা কি । যাকগে, আজ-কালের মধ্যেই ও তোমাদের বাড়ি যাবে বলছিল, বিপিনের সঙ্গে কি কথা আছে । আচ্ছা, কাজ করো তুমি ।

বাকি সারাক্ষণ ওর অন্যমনস্কতায় ভুটা এমন কি হরিআনন্দও বিস্মিত ।

বাড়িতে রাত দশটা পর্যন্ত নিষ্ফল আগ্রহে অপেক্ষা করে কাটল সরমার । অস্বস্তি দ্বিগুণতর । অবিনাশকে চন্দ্র ডেকে আনিয়েছেন জরুরী দরকারে । অথচ কি দরকার বললেন না । অন্যদিকে, একটা দিনের জন্যেও যে মানুষ তাদের বাড়িতে পদার্পণ করল না, আজ

এক বছর বাদে সকলকে ছেড়ে তার সঙ্গেই নাকি কথা আছে এবং সেজন্যেই তার এ বাড়িতে আসার সম্ভাবনা । সরমার গোলমেলে·লাগছে সব কিছু । সম্প্রতি বিপিনের দিক থেকেও এমন কিছু পরিবর্তনের আঁচ পাচ্ছে সরমা, যার সবটাই ব্যবসায়গত দুর্বিপাকের কারণ বলে মনে হয় না ।

অবিনাশ সেদিন এলো না ।

পরদিনও সকাল ন'টা বেজে যায়, তার দেখা নেই । বিপিন তখন পর্যন্ত বাড়িতেই ছিল । সরমা ইচ্ছে করেই কিছু বলেনি তাকে । এলে দেখা তো হবেই ।

গঙ্গাবাঈ সংবাদ দিল, ফোনে কে ডাকছে দাদাবাবুকে । বিপিন নিচে নেমে গেল । একটু বাদেই ফিরে এসে তাড়াতড়ি জামা টেনে নিল একটা । সরমা জিজ্ঞাসা করল, বেরুচ্ছ নাকি ?

উত্তরে অস্ফুট একটা স্বর নির্গত হল শুধু । উদ্‌ভ্রান্ত ব্যস্ততায় আবাব নেমে গেল সে । সরমা ছাতের কার্নিশের কাছে এসে দেখে, বাড়ির দরজা থেকেই রীতিমতো জোরে স্টার্ট পড়ল গাড়িতে ।

সরমা আর অপেক্ষা করবে কিনা ভাবছে । কিন্তু একটু বাদেই অদূরে অবিনাশের রোগা লম্বা মূর্তি চোখে পড়া মাত্র এক রকম দৌড়েই নিচে নেমে এলো সে ।

চন্দ্রর আশঙ্কা মিথ্যে নয় । পাঁচ সাত বছর বযেস বেড়ে গেছে যেন অবিনাশের । দু'চাব মুহূর্তের নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময় ।

সরমা বলল, বোসো ।

দেখছ কি, চনতে পারছ না ?

সরমা নিরুত্তরে তার কাছেই আর একটা চেয়ার টেনে নিল ।

অবিনাশ মৃদু হেসে কুশল প্রশ্ন করল, কেমন আছ ?

ভালো ।

বিপিনবাবু ?

ভালো ।

বেশ, গ্রেট মন্টু কোথায়, তাকে ডাকো—

বেবিং

গুড় ।...আমি একটু আগেই আসব ভেবেছিলাম, হয়ে উঠল না । তোমার ল্যাবরেটাবির সময় উতরে যাচ্ছে না তো ?

গেলেও পার্সেন্টেজ কাটা যাবে না, বোসো তুমি । সরমা উঠে দাঁড়াল ।

শোনো, অবিনাশ বাধা দিল, চা ছাড়তে হয়েছে, আর অসময়ে খাবার তাগিদ থেকে একমাত্র তোমার কাছেই রেহাই পেয়েছি, ওসবের চেষ্টায যাচ্ছ না তো ?

সরমা শান্ত চোখ মেলে অপেক্ষা কবল ক্ষণকাল । কোন কথা না বলে আবার বসে পড়ল ।

মৃদু হাসিটুকু ঠোঁটের ফাঁকে লেগে আছে অবিনাশের । ঘরের আসবাবপত্র এবং দেয়ালের সাজ-সজ্জা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল । পরে বলল, বিপিনবাবুর সঙ্গে আজ আর দেখা হল না তা হলে—খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন দেখলাম । কখন ফিরবেন বলতে

পারো ?

না । তাঁকে দরকার কেন ?

চন্দ্রর অনুমান সত্যি বলেই মনে হলো অবিনাশের । চিঠির প্রহসন সরমা এখনো জানে না । বিপিনের গোপনতা বিস্ময়ের কারণ । মনোভাব স্পষ্ট নয় । তবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অবিনাশ, সরমার কাছে এ প্রসঙ্গ তুলে গ্লানি বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন ।

জবাব দিল, দরকার আবার কি, বাড়ি এসেও মালিকের খবর নেব না ?

সরমা অনুসন্ধিৎসু ।—ডাক্তার চন্দ্র বলছিলেন তোমার কি কথা আছে তাঁর সঙ্গে ?

অবিনাশ মনে মনে মুণ্ডুপাত করল ওই ভদ্রলোকটিব । পরে বলল, ছাপোষা মানুষ, এক বছর ধরে বাজারের সঙ্গে সংস্রব নেই, চেনা লোক হিসেবে কাজ-কর্মের দাবি নিয়েও তো আসতে পারি ।

সরমা বিশ্বাস করল না । আঘাত পেল । একদিন ওর আপদে-বিপদে সেই বড সহায় ছিল নিঃসন্দেহে । কিন্তু আজ তার হাজারগুণ অসহায় হযে পড়লেও বিপিন চৌধুরী তো দূরের কথা, তাকেও যে জানতে পর্যন্ত দেবে না মানুষটা এ এখন সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে ।

অবিনাশই হাল্কা হেসে বলল আবার, এতদিন বাদে দেখা, কেমন আছি না আছি খবর নিলে না তো ?

দেখতেই তো পাচ্ছি ।

বেশ উঠি তা হলে ?

বোসো ।

ইচ্ছে আছে । কিন্তু তোমাব ওই দু' শব্দ আব তিন শব্দেব কথায় অস্বস্তি লাগছে । স্কুলের হেড-মিস্ট্রেসের সামনে বসে আছি যেন ।

সামান্য একটু হাসি দেখা দেয সরমাব মুখে ।—কথা বলছি এই ঢের, না যদি বলি ?

কেঁদে টেঁদে ফেলব হয়তো । অবিনাশ চেষ্টা করে আগেব মতোই সহজ হতে ।

সরমা সোজাসুজি চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ । পবে চট্ কবে উঠে গিযে দবজার কাছে দাঁড়িয়ে দোতলার দিকটা নিরীক্ষণ করে এলো । চেয়ারটা অবিনাশের আরো কাছে টেনে নিয়ে বসল আবার ।

অবিনাশ অবাক । কি ব্যাপার ?

কিছু না । একটা কথার জবাব দাও, কার ওপর এ অভিমান নিযে এমন করে কাটালে এক বছর, আমি তো নিজেব স্বার্থ না দেখে এক পা চলিনে কখনো ?

মনে মনে শঙ্কিত হলেও ছদ্ম-বিস্ময়ে বিস্ফারিত দেখায় অবিনাশকে ।—মাটি করেছে । ভালো লাগছিল না, চলে গেলাম, আবার ইচ্ছে হল ফিরে এসেছি, ব্যস ।

ইচ্ছে করে আসনি, তোমাকে ডেকে আনা হয়েছে ।

অবিনাশ হাসল । ওই তো তোমার বুদ্ধি ইচ্ছে না থাকলে ডেকে কাউকে আনা যায ! পরে যথাসম্ভব গম্ভীব হয়ে বলল, দেখ সরমা, এবারে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি ওসব গুরু-গম্ভীর আলোচনা আর কোনদিন নয়—ও আমার ধাতে পোষায় না, পারিও না তাল রাখতে ।

সবেগে মাথা নেড়ে সরমা রুদ্ধ-কণ্ঠে বাধা দিয়ে ওঠে, ওসব কথা আমি শুনিনে, সব

পারো তুমি। টেবিলে তার একটা হাতের ওপর নিজের কনুই পর্যন্ত প্রায় জোর করেই চেপে রাখল সে।—তোমার তুলনায় কত তুচ্ছ আমি জানো না, আমার গা ছুঁয়ে বলো, আর কোনদিন কোন কারণে নিজের অযত্ন করবে না।

অবিনাশ বিব্রত। ছি, সরমা—কেউ এসে পড়বে।

আসুক, তুমি বলো।

সহসা দুকূল ছাপিয়ে জল ভরে আসতে চায় অবিনাশের দুই চোখে। এ আনন্দেব কি বেদনার জানে না। সামলে নিল।—কথা দিচ্ছি। ঠিক হয়ে বোসো।

সরমা শাড়িব আঁচলে ভালো করে চোখ মুছে নিয়ে শান্ত হল।

একান্ত নীরবতায় অনাস্বাদিত অনুভূতির মতো কি যেন ঘুরে ফিবে বার বার আনাগোনা করছে অবিনাশের মনে। সকল ব্যর্থতা, সকল নিষ্ফলতা এ অমূল্য সঞ্চয় চিরদিন সে স্মবণ রাখবে। নিজের মনেই বলল বার বার, তুচ্ছ চাওয়া-পাওয়ার শেষ অভিমানটুকু পর্যন্ত আজ এতবড় প্রাপ্তির গভীরে যেন নিঃশেষে মিলিয়ে যায়। এই দেহটা সুস্থ রাখতে আসমুদ্র-হিমাচল ঘুরে আসতেও পিছপা হবে না। উঠল। জিজ্ঞাসা কবল, কাল দুপুরে বিপিনবাবুব আপিসে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে ?

সবমা নীরবে ঘাড নাড়ল শুধু।

সবমা কথা নেওযা এবং অবিনাশের কথা দেওয়াব আর একদিকে সুসম্পন্ন কাল-পুরুষের চক্রান্ত।

শেয়ার মার্কেট।

বেদনা-বিবর্ণ মুখে বসে আছে বিপিন চৌধুরী। অদূরে ঘনশ্যামবাবু। বিবস বদন তাঁবও। রুক্ষ-কণ্ঠে বলে উঠলেন, কতদিন আপনাকে সাবধান কবেছি, এখন সব ডুবল তো!

স্টপ। উগ্র-কণ্ঠে প্রায় চিৎকার কবে উঠে বিপিন চৌধুরী। অসম্বৃত পদক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায ঘর থেকে।

বাড়ি।

সিঁড়িতে চারুদেবীর সঙ্গে দেখা।—এত বেলা পর্যন্ত না খেয়েদেযে...ও কি! অসুখ করেছে নাকি ?

সব ঠিক আছে।

পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে এসে বিপিন মাথায হাত দিযে বসল। মনে হল ঘুমে চোখ বুজে আসছে। শুয়ে পড়ল। না তাও না...।

খাবার তাগিদ দিতে এলেন চারুদেবী। মস্তিষ্কের ক্রিযা সুস্থ রাখার জন্যই নিঃশব্দে উঠে চান করে খেয়ে এলো। খর মধ্যাহ্নেও চোখের সামনে বার বার ঝাপসা দেখছে সব কিছু।

ব্যবসায়ের সকল পরিণাম আজ ভয়াবহ শূন্যতায় এসে ঠেকেছে।

নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পাবে নেই আর এমন মরীচিকারও সম্বল।

বাইরে আকণ্ঠ ঋণের বোঝা।

ঘরেও দেউলে সম্পূর্ণ।

ভবিষ্যতের এই নিঃসীম যূপ-কাঠেই গলা বাড়িয়ে দেবে ?

অবজ্ঞাব কানাকানি আর ব্যঙ্গমিশ্রিত করুণা ।

পাওনাদারের ভ্রূকুটি আর আদালতের কাঠ-গড়া ।

সম্মান নেই সম্ভ্রম নেই অর্থ নেই বাড়ি নেই, আজ যা আছে তার নেই কিছুই । বীভৎস কঙ্কালময় পরিণতি ।

আর তাব স্ত্রীও থাকবে না ।

কিন্তু সরমা থাকবে ।

...অবিনাশও ।

নিঃশ্বাস নিতে লাগছে কেমন । সব বাতাস যেন হাল্‌কা হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে । আব একদিন, বড জোব দু'দিন, যত ভাবনা এরই মধ্যে শেষ করতে হবে । কিন্তু পারছে না কেন !...ঘুম পাচ্ছে আবার । হাসিই পেল, ভাবী আর্শ্চয তো !...আচ্ছা পরে ভাববে ।

মুক্তিব রুদ্ধ আগলটা সহসা ভেঙ্গে গেল খান্ খান হয়ে । খোলা উন্মুক্ত পথ । জোরে আবো জোরে । পঁচিশ...ত্রিশ...চল্লিস...পঞ্চাশ মাইল বেগ ছুটেছে গাডি । স্পীডোমিটারে একটা পা আটকে আছে আঠার মতো । পাশে সরমা—স্থিব, আড়ষ্ট । আডচোখে একবার দেখে নিল বিপিন । হিংস্র উল্লাসে সমস্ত হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে চলল গতির আগে আগে । স্পীডোমিটাবে চাপ পডল আবাব । আবো, আবো—

গাড়ি থামাও !

মৃত্যুব আতঙ্কে তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকাব কবে ওঠে সবমা ।

বিপিনেব উন্মত্ত অট্টহাসিতে ডুবে যায় কণ্ঠ-স্বব ।

গাডি থামাবে ? কেন ? অ্যাকসিডেন্ট হবে ? হোক না ? দুটো চূর্ণ-বিচূর্ণ তালগোল-পাকানো দেহ খুঁজে পাবে সকলে ।

সে থাকবে না, সবমাও না—শুধু অবিনাশই থাকুক ।

আকাশে বাতাসে ঝন-ঝন্-ঝন শব্দে বাজছে মৃত্যুর আমন্ত্রণ ।

চমকে উঠে বসল বিপিন । ভবা শীতকালেও ঘামে সমস্ত গা ভিজে গেছে । কাঁপছে থবথব কবে । খাট থেকে নেমে ঘবেব আলো জ্বালল ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ অনেকক্ষণ ।

নিজেই এক গ্লাস জল গডিযে খেল । পবে চেযাব টেনে বসল নিস্পন্দের মতো । এখনো গোলমেলে লাগছে সব কিছু ।

সবমা ঘরে ঢুকে থমকে গেল একটু । পবে হাতেব কাগজপত্র টেবিলে বেখে জিজ্ঞাসা কবল, এমন কবে বসে যে ?

বিপিন নীববে মুখ তুলে একবাব তাকালো শুধু ।

সবমা আবাব জিজ্ঞাসা করল, কখন ফিরলে ?

নিরুত্তর ।

সরমা কযেক নিমেষ দাঁডিযে বইল তেমনি, পরে দরজার দিকে এগোলো ।

শোনো—

ফিরে দাঁড়াল ।

বিপিন ডেকেছে । কেন ডেকেছে ? চলে যাচ্ছিল বলে ডেকেছে । কিন্তু এখন কি বলবে ? চুপচাপ চেয়ে রইল একটু । ভাবল । বলল, মনটা ভালো নয়, দিনকতক বাইরে ঘুরে আসব ভাবছি । তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

সরমা নীরব কিছুক্ষণ । বিগত ক'টা দিনে বিপিনের আচরণে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করেছে সরমা । তাঁর স্তব্ধতার আড়ালে কি এক ক্রূর প্রতীক্ষার আভাস যেন । আজকে এই আহ্বানও এমন নয় যাতে করে ডাকা মাত্র হাতের সব কাজ ফেলেই সঙ্গে আসার কথা ভাবতে পারে । একটু থেমে জবাব দিল, মন ভালো নয় সে তো অনেক দিনই দেখছি । বাইরে যাবে ভালো কথা, কিন্তু আমি যাই কি করে ।

তোমার কাজ আছে, না ?

হ্যাঁ । একটু অপেক্ষা করে সরমা চলে গেল ঘর থেকে ।

ঘড়িতে রাত্রি এগারোটা বাজে । সরমা একাগ্রচিত্তে খাতায় নোট্ করছে কি । সমাদ্দার পঙ্গু হয়ে বেশ ভালো রকমে আবদ্ধ করেছেন ওদের । বিপিন ঘরে প্রবেশ করল ।

মনোযোগ তিরোহিত । তবু ইচ্ছে করেই সরমা মুখ তুলল না । চুপ করে দাঁড়িয়ে বিপিন তার কাজ দেখল স্বল্পক্ষণ । ঘরের মধ্যেই নিঃশব্দে পায়চারি করল বার দুই । রাসায়নিক দ্রব্য-সম্ভার সাজানো কাঁচের আলমারিটার সামনে দাঁড়াল একবার । অন্যমনস্কের মতো খানিক চেয়ে রইল শিশিগুলির দিকে ।

অকস্মাৎ কি মনে পড়তে চেতনার সূক্ষ্মতম পরদায় প্রচণ্ড এক ঘা খেয়ে বিপিন চমকে উঠল যেন ।

মাটি সরে যাচ্ছে পায়ের নিচে থেকে ।

স্বপ্নে শোনা ওই মৃত্যুর ঝন-ঝনানি যথার্থই কানে বাজছে এবার । এক নিমেষে দেহের সকল তন্ত্রী কেঁপে উঠল ভয়ে । ধীরে ধীরে সামলে নিল । সরমার দৃষ্টি গবেষণার খাতায় নিবিষ্ট তখনো । এক পা দু'পা করে বিপিন পাশে এসে দাঁড়াল আবার । বেশ সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা সরমা, পৃথিবী উল্টে যাক, তোমার বিজ্ঞান-চর্চার ব্যাঘাত ঘটবে না তাতেও, না ?

খাতার ওপর হাত থেমে গেল সরমার । মাত্র মুহূর্তের জন্য । মুখ না তুলেই হাসল তারপর । বলল, পৃথিবী উল্টে যাবে কেন হঠাৎ—।

যদি যায়, তোমার সায়েন্স কি বলে ?

এবার সোজাসুজি তার দিকে তাকালো সরমা ।—সায়েন্স বলে, মনের বিকার দেখা দিলে এ ভয়টা আসে বটে মাঝে মাঝে, কিন্তু সত্যি সত্যি পৃথিবী ওলটায় না কখনো ।

হাসতে চেষ্টা করে বিপিন । দেখছে নিষ্পলক । আর একটা ক্রূর আনন্দ যেন উপচে উঠছে ভিতর থেকে ।

রয়ে-সয়ে খুব মোলায়েম করে জিজ্ঞাসা করল, অবিনাশকে বিয়ে করোনি কেন ?

সহসা বাক্স্ফূরণ হল না সরমার । বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ ।

বুঝল একটা বোঝাপড়ার স্থির সঙ্কল্প নিয়েই এত রাতে তার এখানে পদার্পণ সকালে অবিনাশের এখানে আসার পর থেকে সব কিছুর বিকৃত পরিবেশন ঘটেছে কিনা কারো মারফত, চকিতে এ সন্দেহও জাগল একবার । হাতের কাগজপত্র সরমা সরিয়ে রাখল এক-

ধারে ।

হঠাৎ এ কথা ?

হঠাৎই । অবিনাশকে ফেলে এসেছিলে তোমার বিজ্ঞান-চর্চার উপকরণ যোগাতে সে অক্ষম বলে । আর, আমিও ওই জন্যেই একটা উপলক্ষ মাত্র. কেমন না ?

সরমা অবাক বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ । একটু একটু করে রক্তিম দেখায় সমস্ত মুখ ।

মুক্তি চাও তুমি ?

কিরকম ? বিপিন হাসছে ।

তোমার ঐশ্বর্য আব এই ল্যাবরেটাবি এক মুহূর্তও ধবে রাখতে পাববে না আমাকে, তাই চাও ?

তোমাকে ধবে বাখতে পাববে না কিছুই সে আমি জানি । হাসল আবার, সমাদ্দারের ওখানে আগে জায়গা পেলে ছেড়ে আসতে না অবিনাশকে এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে ।

বিয়ের আগেই সমাদ্দাবের ওখানে স্থান নির্দিষ্ট ছিল, প্রতিবাদের ছলেও কথাটা বলতে বাধছে সরমার । শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে !

মুক্তি চাই আমি ! ঘব ফাটিযে বিপিন হেসে উঠল । সময় লাগল সে হাসি থামতে । হাসির দমকে হাঁপিয়ে উঠেছে প্রায় । দম নিযে বিডবিড কবে বলল—কিন্তু সেটা কতবড বাঁধন হবে তোমাব জানলে শিউরে উঠতে ।

আবাব হাসতে হাসতেই ঘর থেকে বেবিযে গেল সে ।

সরমা নির্বাক ।

শীতকালেব সমস্ত রাত্রি ছাতে পায়চারি করে কাটল বিপিনেব । অন্ধকারে নিজেব আবছা ছাযা দেখেও চমকে উঠেছে বাব বাব । বাত্রির স্তব্ধতায যেন কোন অশবীরী বাব বার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তাকে !

পরদিন ।

ল্যাবেবেটারিতে যাবাব জন্যে প্রস্তুত হয়ে সবমা খোঁজাখুঁজি করতে লাগল কি । বিগত রাত্রিব ব্যাপারটার মীমাংসা এখনো বাকি । সুস্থ মাথায় কিছু চিন্তা কবার জন্যই একটু তাডাতাড়ি বেরিয়ে পডতে চায় বাড়ি থেকে ।

বিপিন শুয়ে আছে । শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, কি খুঁজছ ?

চাবিটা—

বিপিন পাশ ফিরল ।

সরমা প্রস্থানোদ্যত হয়েও ফিরে দাঁড়াল । মানুষটাকে দেখে মনে হয় না আজ কাজে বেরুবে...কিন্তু অবিনাশ শেয়ার-মার্কেটে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে হয়তো । তথাপি কিছু জিজ্ঞাসা করতে প্রবৃত্তি হল না । চলে গেল ।

বহুক্ষণ স্থাণুর মতো পড়ে থেকে বিপিন উঠল এক সময় । মন্টুকে ডেকে বলল একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে । আধঘন্টার মধ্যেই চিকিৎসক সাধারণ সর্দি-কাশির প্রেসকিপশান লিখে দিয়ে গেলেন ! মন্টু ওষুধ এনে দিল ।

বিপিন মন্টুকে নির্দেশ দিয়ে রাখল, তাকে কেউ ডাকতে এলে বা টেলিফোন করলে যেন বলা হয় সে বাড়ি নেই ।

দুপুর । চারুদেবী একবার খোঁজখবর নিয়ে একটু আগে গিয়ে শুয়েছেন । তিনতলায় আর করো আসার সম্ভাবনা নেই । ওষুধের শিশি নিয়ে বিপিন পাশের ঘরে তালা-বন্ধ আলমারির সামনে এসে দাঁড়াল !

জামার পকেটে সরমার চাবির গোছা । শিশি বোতলের আড়াল থেকে বিপিন সাইনাইডের শিশিটা বার করল ।

সোনার ওপর অ্যাকশান্ দেখতে এনেছিল মন্টু ।

ওষুধের শিশিতে সন্তর্পণে খানিকটা গুঁড়ো মিশিয়ে ওটা জায়গা মতো রেখে আলমারির তালা বন্ধ করল আবার ।

শেয়ার বাজারের আপিসে অবিনাশ অপেক্ষা করছে ঘন্টার পর ঘন্টা । বার তিনেক ফোন করিয়েছে ঘনশ্যামবাবুকে দিয়ে । তাঁর দিকে চেয়ে আর অনুরোধ করার সাহস নেই ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ ।

বিপিন শুয়ে আছে চুপচাপ । অদূরে টেবিলে ওষুধের শিশি । অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু পরে-পরেই চোখ পড়ছে ওটার ওপর । পাশের ঘরে মন্টু পড়তে বসেছে । নিচে চারুদেবী রাতের আহার তদারকে ব্যস্ত ।

সরমার পায়ের শব্দ শোনামাত্র বুকের ভেতরটা কেমন গুড়গুড় করে উঠল বিপিনের । যথাপূর্ব শান্ত তারপর ।

ওষুধেব শিশি গ্লাস চোখে পড়তে সরমা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখল একবার । হাতের বাঁধানো খাতা এবং ব্যাগ টেবিলে রেখে চেয়ারে বসে জিরিয়ে নিল একটু । উঠল । মুখ হাত ধুয়ে কাপড় বদলে আধ ঘন্টার মধ্যে ফিরে এলো আবার । আগের শাড়িটা ভাঁজ করে আলনায় রাখল । আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়ে নিল । ব্যাগ থেকে কলম বার করে বাঁধানো খাতাটা হাতে তুলে নিল । পাশের ঘরে গিয়ে বসবে । বিপিন চেয়ে আছে নিষ্পলক নেত্রে ।

শোনো—

ফিরে দাঁড়াল ।

ওগুলো রেখে এখানে এসো ।

সরমা খানিক অপেক্ষা করে খাতা কলম রেখে সামনে এলো ।

বোসো—

কি বলবে ?

আজ আর তোমার পড়াশুনা হবে না, বোসো । হাসল সে, সেই দুপুর থেকে অপেক্ষা করছি...

মোলায়েম কণ্ঠ-স্বরের সঙ্গে রক্ত-রাঙ্গা দুই চোখের অদ্ভুত অমিলটা চোখে ঠেকছে সরমার । বসল পাশে ।

বিপিন বলল, তাড়া কিসের, এতক্ষণ তো করে এলে কাজ—

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে সরমা। পরে নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করল, ওষুধ কিসের ?

আমার।

খাওনি ?

খাব।

চোখ দু'টো তেমনি হাসছে বিপিনের। সহসা দু'হাতে সবলে বুকের ওপর টেনে নিয়ে এলো তাকে। সরমা নীরব বিস্ময়ে চেষ্টা করল ছাড়িয়ে নিতে। পারল না। বাধা দিতে গিয়ে অস্ফুট একটা স্বর নির্গত হল শুধু। বিপিনের ঘন ওষ্ঠদ্বয় ওর সমস্ত অধর বিদীর্ণ করে দেবে যেন। ঘরের দরজা খোলা, মণ্টু পাশের ঘরে পড়ছে।

নিবিড় আকর্ষণে বিপিন কান খাড়া করে ওর বুকের স্পন্দন শুনল অনেকক্ষণ। ছেড়ে দিল তারপর।

খাট থেকে নেমে চকিতে বসন সম্বৃত করে নিয়ে সরমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে।

বিপিন হেসে উঠল, ভয় পেলে নাকি ? বোসো।

সরমা দরজার দিকে এগোতে সানুনয়ে বাধা দিল, আচ্ছা, একটু দাঁড়াও—এক দাগ ওষুধ দিয়ে যাও আমাকে।

তীক্ষ্ণ চোখে সরমা আবার নিরীক্ষণ করল তাকে। অবাক পরক্ষণে।

বিপিন চৌধুরীর চোখে জল।

নীরবে কাঁচের গ্লাসে এক দাগ ওষুধ ঢেলে তার হাতে দিল সরমা। সেটা নিয়ে বিপিন অন্য হাতে বালিশের তলা থেকে বার করল কি।—এই তোমার চাবি।

কিছুই ঠাওর করে উঠতে পারছে না সরমা।—কোথায় ছিল ?

আমার কাছেই।—হাসছে।—মানুষ সব চেয়ে প্রিয় কারো ওপর সকলের বড় প্রতিশোধ কি করে নিতে পারে জানা আছে তোমার ?

সরমা বাক্‌শক্তিরহিত।

হাসছে বিপিন।—সোনার ওপর সাইনাইডের অ্যাক্‌শান তো অনেক দেখেছ, মানুষের ওপর দেখেছ কখনো ?

নির্বোধ বিমূঢ় নেত্রে চেয়েই থাকে সরমা।

বিপিন হাসছে। দেখনি তো ? আচ্ছা, দেখো। ওষুধ তুমি ঢেলে দিয়েছ কাউকে বলো না যেন।

তীক্ষ্ণ, তীব্র আর্তনাদ করে উঠল সরমা। মিল আছে বিপিনের স্বপ্নে-শোনা সেই আর্ত-কণ্ঠের সঙ্গে। কিন্তু সে শুনল কি ?

ঘর দরজা সব কিছু সবেগে দুলে উঠল সরমার চোখের সামনে। একটা ভয়াল অন্ধকার যেন গ্রাস করতে আসছে তাকে। দৌড়ে কাছে এলো। দেখল চোখ টান করে। শিশির মুখ খুলে খানিকটা তরল পদার্থ হাতে ঢালল। দেখল বিহ্বল নেত্রে। তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে সভয়ে সরে দাঁড়াল দু'পা। শাড়িতে হাত ঘষতে লাগল স্তব্ধ আতঙ্কে।

মণ্টু চারুদেবী গঙ্গা-ঝি চাকর সবাই ছুটে এসেছে ততক্ষণে। সরমা বাইরে দাঁড়িয়ে

তেমনি হাত ঘষছে শাড়ির আঁচলে । বুকের দ্রুত স্পন্দনে নিঃশ্বাস রুদ্ধ । ঘরের মধ্যে আর্তরোল উঠেছে মন্টু এবং তার মায়ের ।

## ।। ১৪ ।।

শীতের রাত্রি । অঝোরে হিম পড়ছে । বাইরে একটানা পায়চারির বিরাম নেই মানুষটার । অবিনাশ । বিগত অনেকগুলি রাত এই করে কাটাল । সান্ত্বনা নেই, অহর্নিশি একটা দাহ কেবল । বসে দু'দণ্ড ভাববার স্থৈর্যও হারিয়েছে । পাগলের মতো পটাপট্ চুল উপড়ে তোলে মাথার । অবিশ্রান্ত অভিশাপ দেয় নিজেকে ।

সরমা দু'মাস জেল-হাজতে ।

চন্দ্র এবং সমাদ্দারের তাকে জামিনে ছাড়িয়ে আনার সকল চেষ্টা ব্যর্থ । প্রধান অন্তরায় সরমার নিজের স্বীকৃতি—ওষুধ সে-ই ঠেলে দিয়েছে, বিষ মেশানো ছিল জানত না । কিন্তু আত্ম-হত্যার উদ্দেশ্যে বিষ ওষুধে মেশানো নিষ্প্রয়োজন । সরমার হাত দিয়েই বা বিপিন চৌধুরী সেটা নেবে কেন ?

স্বপক্ষের উকিল বলেন, দুপুরে আনা ওষুধ বিপিন রাত্রিতে খেল প্রথম দাগ । কেন ? বাকিটুকু তেমনি আছে, সামান্য যেটুকু যাতে ঢেলেছিল সরমা, তারও দাগ পাওয়া গেছে ওর শাড়ির আঁচলে ।

হাতের লেখা বিশারদের পরীক্ষা, মণিময়ের সাক্ষ্য এবং অবিনাশের জবানবন্দীতে সরমার নাম লেখা চিঠি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে । চিঠি বিপিনের জামার পকেটেই ছিল । সম্প্রতি এ-তরফের আইনজীবীও আশ্বাস দিচ্ছেন, সরমা মুক্তি পাবে শেষপর্যন্ত ।

কিন্তু এতটুকু শান্তি পাচ্ছে না অবিনাশ ।

আগে প্রকাশ্যেই বিরক্ত হয়েছেন চন্দ্র ।—এ সময়ে এত অধীর হলে চলবে কেন, সরমাকে তো বাঁচাতে হবে । তাছাড়া তোমার অপরাধ কি ?

কিছু না ।

তবে ?

অবিনাশের ঘরের সামনে পথের ধারে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল । অদূরে একটা কুকুর শুয়ে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে । অবিনাশ ছোট একটা ঢিল তুলে হঠাৎ তাড়া করতে দেখা গেল তিন পায়ে ভর দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে ওটা—একটা পা ভাঙ্গা ।

চন্দ্রর দিকে চেয়ে অবিনাশ হাসল একটু ।

কি ?

অবিনাশ বলল, এক সাইকেলওয়ালা সেদিন বিষম তাড়ায় ভিড় কাটাতে গিয়ে বেমালুম ভেঙ্গে দিয়ে গেল ওর ঠ্যাংটা । কিন্তু অপরাধ ছিল না বলে ওর ভাঙ্গা পায়ের বেদনা যাবার নয় ।—যাক, আপনি ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন ?

হ্যাঁ সেদিকে সব ঠিক আছে ।

বিপিনবাবুর কাকীমা ?

চন্দ্র ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, তাঁকে ঠিক বোঝানো গেল না ।

বস্তুতঃ, সেখান থেকে নিরাশ হয়েই ফিরেছেন চন্দ্র। রাগে গর্জে উঠেছেন চারুদেবী। এতবড় ছেলে গেল ওর জন্যে, একটা দিন শান্তি পেল না—কক্ষনো ওকে ক্ষমা করবেন না তিনি, লোহার গারদ থেকে জীবনে যাতে আর না বেরুতে পারে সে চেষ্টাই করবেন, ইত্যাদি—

কিন্তু সম্প্রতি সে আশঙ্কাও অপগত। বিচারের পরিবেশটা অহরহ ভাসছে অবিনাশের চোখে। আশা নিরাশার সঙ্কটময় পরিস্থিতি। সাক্ষীর চত্বরে চারুদেবী, অদূরে কাঠগড়ায় একটা টুলে সরমা বসে। ক্লান্ত শুষ্ক পাংশু মূর্তি।

বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ মোচড় দিয়ে উঠেছিল চারুদেবীর, ক'টা মাস বাদে এই প্রথম সাক্ষাৎ।...ও যেন আর কেউ।

ওঁদের বিয়ে দিয়েছিলেন কতদিন ? সরকারি উকিলের জেরা।

আমি দিইনি, নিজেরাই করেছে।

কতদিন ?

পাঁচ বছর।

বনিবনা কেমন ছিল ?

বাঙ্গালীর ঘরে যেমন থাকে।

তবু ?

বনিবনা না থাকলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত, কাগজের বিয়ের দাম কি।

আশায় আশ্বাসে নিঃশ্বাসে রুদ্ধ মণ্টুর, ডাঃ চন্দ্রর...। জবাবের ধরনে সরকারি উকিলও ঈষৎ বিস্মিত। এই মহিলাটির প্রতিকূলতা আশা করেছিলেন তিনিও। সরাসরি শেষ প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন, বিপিনবাবুর ওষুধে উনি বিষ মিশাতে পারেন বলে মনে হয় আপনার ?

চারুদেবী তাকালেন সরমার দিকে। হঠাৎ একটা কান্না যেন গুমরে উঠতে লাগল ভিতর থেকে। সামলে নিলেন। স্পষ্ট করে জবাব দিলেন, না, দরকার হলেও নিজে পারে বিষ খেতে।

আনন্দে সব কিছু ঝাপসা ঠেকে মণ্টুর চোখে। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে চন্দ্র সোজা হয়ে বসেন।

অবিনাশের তলব পড়েছে।

খানিকটা চেতনা ফেরে যেন সরমার। উঠে ধীরে ধীরে কাঠগড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। সাক্ষাতের অনুমতি পেয়ে সরমা একমাত্র তাকেই ডেকেছিল, কিন্তু একদিনও দেখা করতে আসেনি অবিনাশ। আজও একবার ফিরে তাকালো না ওর দিকে। সোজা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন ? উকিলের প্রশ্ন।

আমি অসুস্থ।

সরমা দেবীর সঙ্গে আপনার জানাশোনা কতদিন ?

দশ বারো বছর।

কোথায় প্রথম আলাপ আপনাদের ?

কলেজে একসঙ্গে পড়তাম।

ও, কিন্তু বয়সে তো অনেক বড় মনে হয় আপনাকে ।

সাত বছর ফেল করে ওকে ধরেছিলাম ।

অস্ফুট হাস্যগুঞ্জন । অবান্তর প্রশ্নের এই জবাবে কক্ষের গুরুভার লাঘব হল খানিকটা । সরমা শান্ত। চন্দ্র উদ্‌গ্রীব ।

পরের প্রশ্নটা সচকিত করল সকলকে ।—সরমা দেবীকে ভালোবাসতেন আপনি ?

এখনো বাসি ।

তিনি ?

তাঁর ভালো লাগত আমাকে...

এখন ?

এখনো লাগে ।

বিপিনবাবুর সঙ্গে তাঁর বিয়ের আগে আপনি বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন কখনো ?

না ।

কেন ?

ক্ষয়রোগ সন্দেহে আমাকে ভয় পেতে দেখেছি মেয়েদের । তাছাড়া সামর্থ্যও ছিল না

পরিবেষ্টনী আবার শান্ত । অনুকম্পা নয়, নিঃসার পাণ্ডুর মানুষটির ব্যক্তিত্ব নয়, এ অনুভূতির নাম হয়তো আর কিছু । সরমা মাথা নিচু করল ।

অবিনাশের উক্তির সত্যতা তার স্বাস্থ্য এবং চেহারায় পরিস্ফুট ।

পূর্বের জেরাই নিক্ষিপ্ত হল আবার ।—সরমা দেবীর সঙ্গে বিপিনবাবুর বনিবনা ছিল ?

অবিনাশ ভাবল একটু ।—ছিল না ।

ডাঃ চন্দ্র মণ্টু চারুদেবী এমন কি সরমাও সবিস্ময়ে তাকালো তার দিকে । সরকারি উকিলের মনের মতো খোরাক মিলেছে এতক্ষণে ।—কি রকম ?

থাকলে নিজের স্ত্রীকে এভাবে জড়িয়ে যেতেন না ।

জড়িয়ে গেছেন জানলেন কি করে ?

বিষ কেউ এ ভাবে দেয় না, দিলেও বলে না ।...তাছাড়া ও চিঠি মিথ্যে হলেও আমাকে নিয়ে আগাগোড়াই বিপিনবাবুর সন্দেহ ছিল । ডাঃ চন্দ্রর কাছে তাঁর লেখা চিঠিও এর প্রমাণ ।

সন্দেহ সত্যি কি মিথ্যে একবারও যাচাই করে দেখেন নি বিপিনবাবু ?

না । ব্যবসায়ের দুর্বিপাকে বহুদিন থেকেই তিনি অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন, আর এ যে তাঁর মতো মানুষের কাছে কতবড় দুর্ঘটনা এ খবর তাঁর আত্মীয়রা দেবেন । এতে না ডুবলে হয়তো সব ঠিক হয়ে যেত, তিনি নির্বোধ ছিলেন না ।

প্রশ্নের মোড় বদলালো হঠাৎ ।—বিবিনবাবুর প্রতি সরমা দেবীর মনোভাব কি রকম ছিল ?

অবিনাশ শান্ত জবাব দিল, ল্যাবরেটারির গবেষণা ছাড়া আর কোনদিকে তাঁর মন দেবার অবকাশ ছিল না । এ ত্রুটি বিপিনবাবু কোনদিন ক্ষমা করেন নি ।

ত্রুটি ছিল ?

ছিল ।

বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত সকলের । প্রস্তরমূর্তির মতো সরমা দাঁড়িয়ে তেমনি ।

ঘনশ্যামবাবু এবং পাওনাদারদের বিবৃতি অনুকূল ।—তিন লক্ষ টাকা দেনা এবং ব্যবসায়ে সর্বস্ব হারানোর ফলে বিপিন চৌধুরীর আত্মঘাতী মনোভাব সুস্পষ্ট ছিল । তার বাড়ির অংশ-বিক্রয়ের রহস্য এবং কারণও ব্যক্ত করে দিলেন ঘনশ্যামবাবু ।

সন্ধ্যার দেরি আছে তখনো । সমুদ্রের ধারে সেই নিরিবিলি জায়গাটিতে অবিনাশ বসে আছে । সব ভুলে অনুভব করতে চায়, ওই বিরাটের সঙ্গে তারও আছে কিছু রূপের মিল । কিন্তু মানুষ তার ব্যথা-বেদনার গণ্ডি ছাড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ ।

চন্দ্র সাহেব বলেন, তার কোন অপরাধ নেই ।

নিজের সঙ্গেও এই বোঝাপড়া চলছে অনুক্ষণ, কোন অপরাধ নেই ।

কিন্তু নেই কি ?

সরমার জীবনে প্রথম থেকে নিজেকে বাদ দিলে কি দাঁড়ায় । ব্যবসায়ে এর শতগুণ দুর্বিপাকেও বিপিন চৌধুরীর জীবনের প্রলোভন এমন তুচ্ছ হয়ে যেত কি ?

ব্যবসায়ে ডুবেছে, কিন্তু কেন ডুবল ?

অদূরদর্শিতা ?

দুর্মতি ?

কিন্তু আগে তো এমন হয় নি ?

সহসা নারীকণ্ঠ শুনে সবিস্ময়ে ঘাড় ফেরাল অবিনাশ । অপর্ণা । সমুদ্রের ধারে বেড়াতে আসায় অভিনব কিছু নেই, তবু এখানে আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত । যোগাযোগটা আকস্মিক অথবা ইচ্ছাকৃত সঠিক বুঝল না ।

আপনি !

অপর্ণা জবাব দিল, বলেন তো ফিরে যাই—

বিব্রত ভাবটুকু দমন করে অবিনাশ হাসল একটু ।—বসুন, কিন্তু এখানে কোথা থেকে ?

এলাম বেড়াতে বেড়াতে । করছেন কি, ঢেউ গুনছেন বসে ?

মনে যাই থাক, বাইরের হাসিখুশিতে বোঝবার উপায় নেই একদিন এই লোকটার বিরুদ্ধেই অপর্ণা ছুরি শানিয়েছে ।

অবিনাশ ঈষদহাস্যে জবাব দিল, চেষ্টা করছি । বসে আপনিও গুনুন না দু'চারটে ।

মাঝখানে খানিকটা ব্যবধান রেখে অপর্ণা বসল । সমুদ্র-বায়ু-বিলাসীর ভিড় এবং যশস্বিনী চলচ্চিত্র-অভিনেত্রীর প্রতি তাঁদের সাগ্রহ দৃষ্টিবাণ এড়িয়ে যথার্থই বেড়াবার উদ্দেশ্যে এই নির্জন দিকটায় এসেছিল অপর্ণা । অনেক দূর থেকে ধ্যানমূর্তির মতো একা বসে থাকতে দেখেই আঁচ করেছে লোকটি কে । বিগত ক'টা মাসের ঘাত-প্রতিঘাত অজ্ঞাত নয়, কিন্তু ইতিমধ্যে তার সাক্ষাৎ আর পায়নি । আজ লোভ সংবরণ করতে পারল না অপর্ণা ।

অবিনাশই কুশল প্রশ্ন করল প্রথম, কেমন আছেন ?

অপর্ণার অনুসন্ধিৎসু চোখ দু'টি খানিক নিবদ্ধ থাকে তার মুখের ওপর ।—কেমন দেখছেন ?

সহাস্যে জবাব দিল অবিনাশ, ভরসা করে দেখে উঠতে পারিনি এখনো ।

ভয়টা কিসের ?

কি জানি ।...আপনি ছাড়াও আর যাঁকে ভয় তিনি শুধু শিক্ষাগুরুই নন, দরকার হলে ভদ্রলোক তুলে আছড়ে দিতে পারেন আমাকে ।

দরকার হল তো ! মুখ টিপে হাসছে অপর্ণাও ।

তবেই তো ভয়ের কথা !

বিপিন চৌধুরীর মৃত্যু এবং সরমার মুক্তির অনিশ্চয়তা কতটা নিয়ে গেল, অপর্ণার কৌতূহল সেদিকে । সঠিক ঠাওর করে উঠতে পারল না । চন্দ্র অন্যরকম আভাস দিয়েছিলেন । কিন্তু অপর্ণা স্তুতিতে ভুলল না আজ আর । ওর সংযমের পরীক্ষা ভালো করেই হয়ে গেছে । চেয়ে আছে তেমনি, অধরে মৃদু হাসির রেখা । বলল, তুলে আছড়ে দিতে পারেন তেমন করে ভদ্রলোকটির জিনিস আপনি দেখতেই বা যাবেন কেন ।

হাসতে লাগল অবিনাশও । আসন্ন গোধূলির এই পরিবেশ হঠাৎ ভারী ভালো লাগছে যেন । বিগত ক'টা মাসের চিন্তাধারায় দেহ মন আচ্ছন্ন । দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা অপগত নয় আজও । ক্ষণিকের এই অনাবিল বিস্মৃতিটুকু সম্পদের মতো মনে হয় । নিতান্ত অকারণেই খাপছাড়া আর একটা অনুভূতি মনে জাগে । যে নারীকে পরম সম্পদের মতো আগলে রাখবে পুরুষ, সরমা তাদেরই একজন—আর তাদের একজন অপর্ণাও । সরমার সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে গেছে হতভাগ্য বিপিন চৌধুরীর । চন্দ্ররও দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়. যদি কোনদিন কোন কারণে অপর্ণাকে তাঁর হারাতে হয় ।

জবাব দিল, নিজের চোখকে বিশ্বাস নেই তাই বলছিলাম । থামল একটু, একা বসেছিলাম, আপনাকে দেখে সত্যি কত ভালো লাগছে বলতে পারিনে ।

খুসি হয়েছেন ?

খুব । আরো হই যদি আর একটা কথা মনে মনেও বলেন একবার । অপর্ণার জিজ্ঞাসু নেত্রের সম্পূর্ণ মুখোমুখি হল সে—শুধু বলবেন, অবিনাশবাবু, আর আমার কোন রাগ নেই আপনার ওপর ।

মুহূর্তে একটা কঠিন রেখা মিলিয়ে গেল অপর্ণার মুখে । হেসেই প্রশ্ন করল, আমার রাগ অনুরাগে আপনার কি আসে যায় ?

অবিনাশ উৎফুল্ল মুখে জবাব দিল, ভাগ্য-ক্ষেত্রের চাঁদে রাহু মহারাজের শ্যেন দৃষ্টি —শেষেরটার দুরাশা রাখিনে, দুঃখ আপনার রাগটুকুর জন্যই ।

আমাকে দেখে দুঃখটা মনে পড়ল ?

সত্যিই তাই ।

কিন্তু এই না বললেন খুশি হয়েছেন ?

মিথ্যে বলিনি । খুশি হয়েছি আপনাকে দেখে, দুঃখ পাচ্ছি আপনার চোখে নিজেকে দেখে ।

অপর্ণা স্বল্পকাল নিরীক্ষণ করল তাকে ।—আমার চোখ আমারই থাক্ ।...আপনার শরীর তো একেবারে সারেনি দেখছি ?

না...রোজই জ্বর হচ্ছে এর ওপর !

ডাক্তার দেখাচ্ছেন ?

যতটা সম্ভব ।

আপনার মাস্টরমশাইয়ের ধারণা, আপনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, সত্যি নাকি ?

মনে মনে সচকিত হল অবিনাশ । লঘু হাস্যে পাল্টা প্রশ্ন করল, এতক্ষণ কথা বলে তাই মনে হল আপনার ?

তবে শরীর সারছে না কেন ?

তেমনি হাল্কা করেই বলল অবিনাশ, মাস্টারমশাইয়ের অতিরিক্ত স্নেহে অতিশয়োক্তি নেই বলতে পারলে খুশি হতাম । এ দুর্দিনে উপার্জনের অক্ষমতা এমন একটা কিছুতে চাপা দিতে পারলে আত্মসম্মানটা অন্তত বাঁচে ।

স্বাস্থ্য-হানির প্রসঙ্গে স্থূল দারিদ্র্যের উল্লেখ শ্রুতিমধুর তো নয়ই উপরন্তু কোথায় যেন লাগে অপর্ণার । নিজের বর্তমান উপার্জনের স্ফীত অঙ্কটা চকিতে মনে পড়ে । বিক্ষোভ বাড়ে আরো । নিজের সব টাকা লোকটার ঘাড়ে চাপিয়ে এমন দার্শনিক দারিদ্র্যের দম্ভ চূর্ণ করতে পারলে ঝাঁজ মিটত । সম্ভব নয় । নিঃশব্দে কাটে কিছুক্ষণ । দিনের আলোয় প্রদোষের ছায়া পড়ছে একটু একটু করে । সামনে উচ্ছল জলরাশির ক্ষ্যাপা উন্মত্ততা ।

কি ভেবে অপর্ণা কথাবার্তার মোড় ফিরিয়ে দিল হঠাৎ ।—শুনলাম, অনেকদিন আগে সরমা আপনার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেয়েছিল ।...আপনি নাকি দেখা করেন নি । কেন বলুন তো ?

অবিনাশ প্রস্তুতই ছিল । এই প্রসঙ্গ উঠবে জানত । নিস্পৃহ জবাব দিল, কি আর হত দেখা করে ।

অপর্ণা মন্তব্য করে, তার জানাশুনা সকলের মধ্যে একমাত্র আপনাকেই সে ডেকেছিল, আর কিছু না হোক মনে বল পেত খানিকটা ।

একটু ভেবে অবিনাশ শান্ত মুখে জবাব দিল, তার জানাশুনা সকলের মধ্যে একমাত্র আমার কাছেই খানিকটা দুর্বলও হয়ে পড়তে পারত সে ।

সামনে ঢেউয়ের তাণ্ডব-লীলা দেখছে অবিনাশ । অপর্ণা আড়চোখে নিরীক্ষণ করল তাকে ।—কিন্তু আপনি এমন উদাস মনে ভাবছিলেন কি একা বসে, সরমা ছাড়া তো পাবেই !

অন্যমনস্কের মতো অবিনাশ বলল, অপরাধ যখন করেনি কিছু, ছাড়া না পাওয়ার কোন কারণ নেই ।

ওকে আঘাত দেবার অভিসন্ধি অপর্ণার হয়তো ছিল না আজ । থাকলেও সহানুভূতির দাক্ষিণ্যে প্রকাশ পেত না কিছু । কিন্তু জবাব শুনে মরচে-ধরা ছুরিতে নতুন শান পড়ল একপ্রস্থ । নীরব ক্ষণকাল । ঠোঁটের কোণে অকরুণ হাসির রেখা ।

বেশ ।—সরমা ছাড়া পেয়ে ফিরে আসবে আনন্দের কথা, কিন্তু তার আগে যে ভদ্রলোকটি গেলেন তাঁর আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই কোনকালে । একেবারেই গেলেন তিনি ।

উদ্গত একটা নিঃশ্বাস রোধ করল অবিনাশ । বড় একটা ব্যথার জায়গায় কাঁটার মত বিঁধছে কি । দুর্বলতা আছে বলেই জবাবটা নির্মম শোনাল আরো । আস্তে আস্তে বলল, জানাশুনা কারো মৃত্যুতে বেদনাবোধটুকু এমনই হয় বটে । যে জায়গায় গেছেন সেখান থেকে ফিরে আসা চলে না আর, চরম নির্বুদ্ধিতার সময়েও ভদ্রলোকটির এ জ্ঞানটুকু ছিল বোধহয় ।

ও । আর এ নির্বুদ্ধিতার জন্য সরমার কোন কৈফিয়ৎ নেই ? প্রায় রূঢ় শোনায় কণ্ঠস্বর ।

কিছুমাত্র না । অবিনাশ নির্লিপ্ত ।—ব্যবসায় যেদিন ডুবেছেন সেই দিনটাই বিপিনবাবুর মৃত্যুর তারিখ, আত্মহত্যায় দেহটা গেছে শুধু । সরমা এই দুর্ভোগ ভুগছে বলে মাঝে মাঝে এখনো তাঁকে ধাওয়া করার বাসনা জাগে আমার ।

সত্যি ? অপর্ণা ব্যঙ্গ করে উঠল ।

সত্যি ।

কিন্তু কোর্টে তো সে কথা বলেন নি ।

কোর্টে ভাবাবেগের জায়গা কম, সেখানে কিছুটা ছলাকলার দরকার ।

অপর্ণা তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে প্রশ্ন করে আবার, কিন্তু বিপিনবাবুর আত্মহত্যায় আপনার নিজের দিক থেকেও জবাবদিহি করার নেই কিছু ?

আদালতে করেছি । অবিনাশ নির্বিকার, আমার লেখা ওই চিঠি পাঁচ বছর আগের একটা হাস্যকর উপলক্ষ ছাড়া আর কিছু নয় ।

কিন্তু হাস্যকর উপলক্ষও কতবড় মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়ায়, এ শিক্ষা হল বোধহয় ?

অবিনাশের ক্লান্ত দু'চোখ কিছুক্ষণ যেন আটকে থাকে অপর্ণার মুখের ওপর । আস্তে আস্তে বলল, এমন শিক্ষা আর আমি কখনো পাইনি বৌদি, কিন্তু বড় দেরিতে পেলাম, এ আর আমার কোন কাজে লাগবে না ।...তবু সময় থাকতে মাস্টারমশাইয়ের কথা ভেবে এ থেকে আপনিও যদি কিছু শিখতে পারেন, আমার শিক্ষা পাওয়া একেবারে ব্যর্থ হবে না হয়তো ।

অকস্মাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সিড়সিড় করে উঠল অপর্ণার । জ্বলন্ত দৃষ্টিতে যেন ভস্ম করে দিতে চাইল তাকে । তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়াল পরমুহূর্তে ।

যাচ্ছেন ? চলুন আমিও যাব, জ্বর এলো বোধহয় ।

উঠল অবিনাশও । অদূরে পথের ধারে অপর্ণার গাড়ি দাঁড়ানো দেখে মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে আবার বলল, আপনার গাড়ি দেখছি ...আমাকে পৌঁছে দেবেন ? ভারী ক্লান্ত লাগছে—

দু'চোখে তখনো আগুন ঠিকরে পড়ছে অপর্ণার । এক ঝলক তার আপাদমস্তক দেখে নিল আবার । কোন কথা না বলে হন্ হন্ করে হেঁটে চলল গাড়ির দিকে ।

যতক্ষণ দেখা যায় তাঁকে, অবিনাশ দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে । তার পরেও অনেকক্ষণ । মুখে ব্যথাতুর হাসির প্রয়াস একটু ।

পিছনে একটা বড় ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দে চমক ভাঙলো ।

## ।। ১৫ ।।

সরমা জেল-আঙিনার বাইরে এলো প্রায় ছ'মাস বাদে । অদূরে মণ্টু অপেক্ষা করছিল । পরিচিত আর কেউ নেই । সরমা আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল তার দিকে । তিমির রাত্রির অবসানে শান্ত স্তব্ধতার মতো আচ্ছন্ন । মণ্টুকে দেখে উদগত অনভতি দু'চোখ ছাপিয়ে ভেঙ্গে আসতে চায় ।

ভালো আছ ?

জবাবে দ্বিধা কাটিয়ে মণ্টু জিজ্ঞাসা করল, গাড়ি ডাকি ?

কোথায় যাব ?

মণ্টু বলল, মা পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে...।

ও বাড়িতে প্রবেশের পথ বিপিন চৌধুরী রুদ্ধ করে দিয়ে গেছে বরাবরকার মতো। ইচ্ছেও নেই। অষ্টপ্রহর সেখানে কানে বাজবে এক ব্যর্থোম্মত্ত জীবনের নিঃশ্বাস। বুকের ভিতরটা সরমার পুড়ে যাচ্ছে আজও। জলজ্যান্ত মানুষ, অভিশপ্ত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বে এমন করে এ যদি এক মুহূর্ত আগেও জানত! তার শেষের উদ্‌ভ্রান্ত স্পর্শটুকু যেন দাহ্য অনুভূতির মতো এখনো লেগে আছে সমস্ত দেহে। বিগত পাঁচ-ছ'টা বছর ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত সরমা শান্তি পাবে না।

আর কারো কথা ভাবার অবকাশ পায়নি জেলে বসে। মণ্টুকে কাছে দেখে সহসা মনে হল, বুকের ক্ষত তার যত বড়ই হোক, ওই একজনের মৃত্যুতে ক্ষতির পরিমাণ তো এদেরও কম নয়। আজ ওই বাড়িতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলতেও দুঃসহ যাতনার মতো লাগছে।

তবু সরমা শান্ত মুখেই বলল, কেউ না পাঠালেও তুমি আসতে জানি, কিন্তু এর পরে তুমিও কি আমাকে বুঝবে না মণ্টু ?

এরকম কিছু শুনব সে ভয় মণ্টুর একেবারে ছিল না এমন নয়। তবু বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে তাকে এ বিশ্বাসটুকু ছিল। কিন্তু সামনাসামনি এসে কেমন যেন হয়ে গেল ও নিজেই। জোর করতে মন সরল না একটুও। একটু থেমে শুধু জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যেতে চাও ?

ঠিক করিনি। ওর দিকে চেয়ে ওর নীরব আকৃতিটুকুই যেন উপলব্ধি করল সরমা। বলল, আর কারো জন্য না হোক তোমার জন্য আমার মন কাঁদবে মণ্টু। যেখানে থাকি খবর দেব।...আসবে তো ?

হ্যাঁ না কিছুই বলল না মণ্টু। একটু বাদে দেখা গেল ডাঃ চন্দ্র লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে আসছেন তাদের দিকে। কি ভেবে মণ্টু জানালো, অবিনাশদার খুব অসুখ বৌদি।

সরমা চেয়ে থাকে তার দিকে। অবিনাশের এখানে না আসার হেতু যে অসুস্থতার দরুণ হতে পারে ভাবেনি।

কি হয়েছে ?

অসুখ অনেকদিনই, মাসখানেক হল হাসপাতালে আছেন। আগে একবার সেখানে গেলে হয় না ?

অন্তস্তলের একটা ব্যাকুল আলোড়ন সংবরণ করেও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সরমা।

চন্দ্র সাহেব কাছে এসে বললেন, দেরি হয়ে গেল...তুমি বাড়ি যাচ্ছ ?

সরমা ঘাড় নাড়ল শুধু, না।

কোথায় যাবে ?

নিরুত্তর।

চন্দ্র বললেন, সমাদ্দার সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন, এসো—

সেখানে থাকব আমি ?

হ্যাঁ, কোন অসুবিধে হবে না ।

সরমা একটা বড় রকমের নির্ভর পেল যেন । বলল, চলুন ।

থামল আবার । মৃদুকণ্ঠে মণ্টুকে বলল, আমার যাওয়া সম্ভব নয় এখন...যদি পারো কেমন থাকে না থাকে মাঝে মাঝে দেখে এসে আমাকে জানিও ।

চন্দ্র বিস্মিত নেত্রে তাকালেন মণ্টুর দিকে । সরমা এগিয়ে গেছে ততক্ষণে ।

সকাল থেকে সমাদ্দারের হাঁকডাকে চাকর-বাকর তটস্থ । শয্যাশায়ী হলেও তাঁর তাগিদের জোর কম নয় । দোতলার একটা ঘরে সরমার থাকার ব্যবস্থা । এত বড় বাড়ির প্রায় সব ক'টা ঘরই বারোমাস খালি পড়ে থাকে, এই উপলক্ষে সেগুলিরও সংস্কার ঘটল কিছু কিছু । ভাবছেন আর কি করা যায় ।

সরমাকে দেখা মাত্র একটা অজ্ঞাত ব্যথা হয়ত মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্ত করল তাঁকে । কিন্তু বিজ্ঞানীর মুখোশে আসল মানুষটা তলিয়ে গেল পরক্ষণে । ডাকলেন, এসো । থাক, প্রণাম করতে হবে না, এক বছর শুয়ে আছি, পায়ে আর ধুলো কোথায় ! হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে বসালেন তাকে । দেখলেন একটু ।

তারপর...এখানেই থাকবে ঠিক করলে ?

সরমা নীরব ।

এ প্রশ্ন চন্দ্রও প্রত্যাশা করেন নি । অদূরের কৌচে বসলেন তিনি । বললেন, সেই ব্যবস্থা মতোই তো নিয়ে এলাম ।

সমাদ্দারের ব্যবসায়ীর ছদ্ম গাম্ভীর্য ।—বেশ । থাকা খাওয়া বাবদ এবার থেকে ওর হাত খরচাটা কাটান যাবে তাহলে ।...তাতেও কুলোবে না, সি উইল্ হ্যাড্ টু ওয়ার্ক মোর ।

এক সময় ছিল, যখন সরমা এসব কথায় হাসিমুখে ঝগড়া করতে ছাড়ত না । আজ ও সান্ত্বনাই পেল । অনুগ্রহের ছলেও কাউকে এঁরা ছোট করে দিতে চান না ।

চন্দ্র হেসে বললেন, এসব হিসেব-নিকেশ পরে হবে'খন, ওপরে কোন্ ঘরে থাকবে পাঠিয়ে দিন, বিশ্রাম নিক আপাতত ।

সমাদ্দার তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, এখানেই বা পরিশ্রমটা হচ্ছে কিসে ? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সরমার দিকে তাকালেন তিনি । সি লুক্স বেটার, কোনদিন হয়তো বা সত্যিই সাইনটিস্ট্ হবে । হবেই বলছি না, হলেও হতে পারে ।...সি নিডেড্ দ্যিস্...পারহ্যাপস্ মোর ...।

সরমার আড়ষ্ট পাংশু মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন । বললেন, সাধনার পথে দুঃখ বড় ভূষণ...কেমন সুন্দর কথাটা বললাম ! এ ড্যাম্ জিনিয়াস্—চন্দ্র হাসছ ? ও, আরো কেউ বলেছে বুঝি ? বলবেই তো, সত্যি কথা সকলেই বলবে । অভিজ্ঞতা চাই, নইলে মন স্থির হয় না ।

নিরীহ মুখে টিপ্পনী কাটলেন চন্দ্র, আপনার দুই একটা অভিজ্ঞতার কথা বলুন না শুনি ।

বিপদগ্রস্ত হয়ে গম্ভীর মুখে গাল দিলেন তিনি, তুমি পণ্ডিত-মূর্খ । আমার আবার অভিজ্ঞতার দরকার কি, আমি অনুভবজ্ঞানী ।

নিজের অজ্ঞাতে হয়তো বা অতি বড় সত্যি কথাই নির্গত হল মুখ দিয়ে । হেসে উঠলেন

হা-হা করে । সরমাকে বললেন, যাও গিন্নি, চন্দ্র বলছে তোমার বিশ্রাম দরকার—সেই তো মাতব্বর এখন, করোগে বিশ্রাম যত খুশি । সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডান দিকে তোমার ঘর । —বেয়ারা !

আদেশ মতো বেয়ারা সরমাকে নিয়ে গেল । কি ভেবে সমাদ্দার গম্ভীর মুখে ডাকলেন, চন্দ্র—

বলুন ।

ওকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দেবে না ।

কিন্তু...

তিনি বাধা দিয়ে উঠলেন, আমি ডাক্তার ভুলো না, ছ'মাস জেলে বিশ্রাম করেছে —কোল্ড রেস্ট্ । মাথা খারাপ হবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট সময় ।

দু'টো দিন কাটল । সরমা ওপর থেকে নিচে নামেনি । চন্দ্র এসে তত্ত্বাবধান করেছেন, বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে একতরফা আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন কখনো । কিন্তু অন্য দিক থেকে সাড়াশব্দ নেই । ভুটা এসে সমবেদনা জানিয়েছে । পরে রিসার্চের কথাবার্তা তুলতে গেছে সেও । মৌন আবহাওয়ায় টিকতে পারেনি বেশিক্ষণ ।

মুখচোরা হরিআনন্দ সিঁড়ি পর্যন্ত এসেও ফিরে গেছে বার দুই ।

চন্দ্র সেদিন কি ভেবে তার ঘরে এসে বসলেন । ঈষৎ ভারাক্রান্ত । জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার শরীর ভালো আছে তো ?

সরমা জানলার ধার থেকে কাছে এসে দাঁড়াল ।

চন্দ্র বলল, বুড়োকে তো চেন, নিচে নামছ না বলে ভেবে অস্থির । বোসো । একটু থেমে বললেন, অবিনাশের অসুখ...শুনেছ ?

নীরবে শয্যার একধারে বসল সরমা ।

চন্দ্র বললেন, সকালে তাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম । বার বার জিজ্ঞেস করল তোমার কথা...এখানে আছ শুনে খুব খুশি ।

সরমা শান্ত মুখে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে ।

দ্বিধা কাটিয়ে চন্দ্র সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে দেখতে যাচ্ছ কবে ?

এবারেও জবাব নেই ।

নিজের মনেই চন্দ্র কি যেন ভাবলেন একটু । তারপর আস্তে আস্তে বললেন দেখো, অবিনাশের সেদিনের সাক্ষিতে শুধু তুমি কেন, আমরাও অবাক হয়েছিলাম । কিন্তু ভেবে দেখা গেল সে ভালোই করেছে।... তোমাকে নিয়ে বিপিনের অশান্তিটুকুও সত্যি নয় এ প্রমাণ করতে গেলে শেষপর্যন্ত কোন মীমাংসায় এসে পৌঁছানো যেত না ।—অবিনাশের অসুখটা এবারে একটু বাড়াবাড়ি রকমের, ভয়ের কারণ আছে ।

সরমার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে নিজেও অসহায় বোধ করছেন চন্দ্র । যে অপরিসীম মর্ম-যাতনায় তিলে তিলে দগ্ধ হতে দেখেছেন অবিনাশকে, এসময়ে তার কতটুকু ব্যক্ত করা চলে ওর কাছে ভেবে পাচ্ছেন না । এ পরিস্থিতি নিঃসংশয়ে সামলে নিতে পারত যে সে অপর্ণা । একটা বড় নিঃশ্বাস সঙ্গোপনে বাতাসে মিশল ।

হাসপাতালের ফটকে গাড়িটা ভালো করে থামার আগেই নেমে পড়ে সরমা ছুটল ভিতরের দিকে। একটা সাধারণ ওয়ার্ডে সন্ধান মিলল অবিনাশের। আরো পাঁচ-সাতজন রোগী ভাগ্য গুনছে সেখানে শুয়ে। হঠাৎ তাকে দেখে খুশিতে সমস্ত মুখ ভরে উঠল অবিনাশের। নিঃশব্দে শীর্ণ হাত দু'টি বাড়িয়ে দিল তার দিকে। দ্রুত কাছে গিয়ে সরমা ধরল সে হাত। পাশে বসে পড়ে ওই হাতেই মুখ ঢাকল নিজের।

অপরাপর শয্যাশায়ীরা স্বল্পক্ষণের জন্যও রোগ-যন্ত্রণা ভুললো। ভোরের হাসি অবিনাশের রোগ-পাণ্ডুর মুখে।

সমাদ্দারের ল্যাবরেটারি। রাত হয়েছে। শ্রান্ত পায়ে সরমা সিঁড়ির দিকে এগোতে বাধা পড়ল। কে যায়, গিন্নি!

সরমা দাঁড়িয়ে পড়ল।

সমাদ্দারের ঘরে প্রবেশ করতে তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, বোসো। ঘরের সবুজ আলোয় তাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন আবার।—কাজে নামছ না কেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সরমা জবাব দিল, নামব। কাজ করব বলেই তো এখানে এসেছি।

হুঁঃ। ছদ্ম-অসন্তোষে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি। বললেন, অনাহারে আধমরা কচি শিশুর মায়ের মতো একটা জ্বালা সবার আগে তোমাদের থাকা চাই আমার ল্যাবরেটারির জন্য —রোজ তার ব্যবস্থা করে তারপর যত খুশি ভাবোগে নিজের দুঃখ বেদনার কথা।

পাশ ফিরে শুতে চেষ্টা করলেন তিনি। সরমা সাহায্য করল। পরে চুপচাপ অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। আজ এই প্রসঙ্গ তিক্ততাই আনল শুধু। ভাবল বলে দেয়, অনাহারে বুভুক্ষু শিশু তার না থাক, আছে এমন কেউ, যার সম্পূর্ণ পরিচর্যার আগে আর কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব হবে না তার দ্বারা।

ওপরে উঠে এলো। নিজের অজ্ঞাতে ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস পড়ল একটা। কিন্তু অবিনাশের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে গুরুভার যত বাড়ুক, মন সচেতন হয়েছে সন্দেহ নেই। ভাবল, এমন একটা পরিপূর্ণ আশ্রয় পেয়েছে বলেই নিজের বোঝা বয়ে কাটিয়ে দিল ক'টা দিন এও তো মিথ্যে নয়।

পরদিন। ল্যাবরেটারিতে যে যার কাজে লেগে গেছে এতক্ষণে। ছ'মাস অনভ্যাসের অবসাদ সহজে কাটিয়ে উঠতে পারছে না সরমা। সংকোচ লাগছে কেমন। ভুটার মুখে শুনেছিল নতুন সহকারীর সমাগম হয়েছে আরো জনাকতক। নীরব কৌতূহলে হয়তো তারা চেয়ে দেখবে ওকে। এতবড় একটা বিচার-পর্ব আর কিছু না দিক, পরিচিতি দিয়েছে নিদারুণ।

হঠাৎ খেয়াল হতে দেখে, সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত উঠে হরিআনন্দ দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। লাজুক মানুষ, নিচ থেকে ওপরের ব্যবধানটুকু অতিক্রম করে ফেলেছে শেষপর্যন্ত।

সরমা কাছে এসে হাত ধরে ডাকল, এখানে দাঁড়িয়ে কেন আনন্দ, ঘরে এসো।

তাকে বসতে দিয়ে সরমা কাছেই দাঁড়াল। হরিআনন্দ ঘরের ভিতরটা একবার নীরবে পর্যবেক্ষণ করে সুগম্ভীর মনোযোগে হাত দেখতে লাগল নিজের। আগে ওকে নিয়ে ভুটার

ঠাট্টা কানে এলে সরমা রাগ করত না বরং হাসত মনে মনে । আজও তার এ নিঃশব্দ আগমনে সবল সুস্থতাই অনুভব করল যেন ।

এতদিন আমার খবর নাওনি যে আনন্দ ?

হরিআনন্দ্ মুখ তুলে তাকালো একবার । পরে আস্তে আস্তে বলল, কাজে আসছ না কেন, মন ভালো থাকত—

অনাড়ম্বর সহানুভূতিটুকু অন্তর স্পর্শ করে । বৃথাই মন দ্বিধান্বিত ছিল এতক্ষণ । মানুষের বেদনাকে ওরা মর্যাদা দিতে জানে ।

আজ যাবো । তুমি এলে ভালোই হল, চলো ।

ল্যাবরেটারি । বার্নারের ঘষ্ ঘষ্ আর স্টীমের মৃদু শোষণগর্জনে সেই সমাহিত স্বপ্নময় পরিবেশে । সরমার জায়গা খালি পড়ে আছে তেমনি । এগিয়ে গেল সেদিকে । সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে হরিআনন্দ্ নিজের ডেস্ক-এ গিয়ে দাঁড়াল । ভুটা মহাখুশি । চন্দ্রর মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না । অন্য দু'চারজন নবাগতর চোখে কৌতূহল ছাড়া আরো যে অভিব্যক্তি পরিস্ফুট তাকে অবিমিশ্র সম্ভ্রম বলা চলে । তারা জানে, এই একজনের অপেক্ষায় ভুটা হরিআনন্দ্ চন্দ্র এমন কি শয্যাশায়ী বৃদ্ধ সমাদ্দার পর্যন্ত দিন গুনছেন ।

সরমার লেশমাত্র সঙ্কোচ নেই আর । সমাদ্দারের গত সন্ধ্যার অনুযোগটুকু যেন সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করল এখন । অনাহারে আধমরা কচি শিশুর মায়ের মতো ওমনি একটা জ্বালা তাদের থাকাই চাই ল্যাবরেটারির জন্য ।

দিন অবসানে সহকারীরা বিদায় নিয়ে গেছে । চন্দ্র ফ্যাক্টরীর হিসেবপত্র দেখছেন । সমাদ্দারের ঘরে প্রবেশ করল সরমা ।

একগাল হেসে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন, এসো এসো গিন্নি এসো—সব বুঝেটুঝে নিলে ওদের থেকে ?

হ্যাঁ ।

বোসো ।

সরমা কাছে গিয়ে দাঁড়াল । পরে সকল দ্বিধা কাটিয়ে শান্ত মুখে বলল, আমার কিছু টাকা চাই ।

সমাদ্দারের মেজাজ প্রসন্ন । ছদ্ম-ভীতি প্রকাশ পেল মুখে সে আবার কি ! একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, কত চাই ?

সরমা নীরবে চিন্তা করল ক্ষণকাল ।—ঠিক জানিনে, যা লাগে দেবেন ।

ও বাবা ! একেবারে তৃতীয় পক্ষের গিন্নির মতো আব্দার দেখি যে ! হাঁক পাড়লেন, ওহে চন্দ্র, শুনছ ।

সরমার দিকে চেয়ে থেমে গেলেন, আচ্ছা যাও, চন্দ্রকে বলে দেব'খন ।

সরমা নিজের ঘরে চলে আসার একটু বাদেই চন্দ্রও উঠে এলেন ।

টাকা কি অবিনাশের জন্য দরকার ?

হ্যাঁ, তাকে আলাদা কেবিনে নিয়ে যাব ।

সে রাজী হয়েছে ?

তাকে বলিনি কিছু ।

চন্দ্র একটু মৌন থেকে বললেন, আমি চেষ্টা করেছিলাম, দেখো তুমি... ।

সুপ্রশস্ত কেবিনেই আসতে হল অবিনাশকে । বাধা দেবার অবকাশও পেল না। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা করে সরমা স্ট্রেচারে করে সোজা সরিয়ে আনল তাকে ।

অনতিদূরের জানলায় ঠেস দিয়ে সরমা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে বাইরের দিকে চেয়ে। অস্তগামী সূর্যের গৈরিক আভায় ওকেও পাণ্ডুর দেখাচ্ছে কেমন । খানিকটা অন্যমনস্ক, খানিকটা ক্লান্ত । সেদিকে চেয়ে চেয়ে দু'চোখ সজল হয়ে আসে অবিনাশের । গলা পর্যন্ত টেনে দিল চাদরটা । কঙ্কালসার জরাজীর্ণ দেহ যতটা আড়াল পায় । ডাকল, এখানে এসে বোসো সরমা, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ।

সাড়া পেল না । হয়তো শুনতে পায়নি, হয়তো বা শুনেও ইচ্ছে করেই এলো না। অনেকক্ষণ বাদে একজন নার্স ঘরে প্রবেশ করতে ফিরে দাঁড়াল । ওষুধ খাইয়ে এবং জ্বর দেখে নার্স চলে গেল । সরমা কাছে এলো ।

বোসো ।

শয্যাপাশে বসল সরমা । অবিনাশের বড় বড় দুই প্রতীক্ষাতুর চোখের সঙ্গে মিলল তার চোখ ।

এমন ঢেকে ঢুকে শুয়ে আছ কেন, শীত করছে ?

না, ভালো লাগছে ।

আবার নীরব কিছুক্ষণ । তারপর সরমা মৃদু গলায় বলল, সেদিন আমাকে কথা দিয়েছিলে শরীরের যত্ন নেবে, রাখলে না তো ?

অবিনাশ হাসতে চেষ্টা করল একটু ।—কিন্তু এর পরে যা ঘটল তার জন্যে কে আর প্রস্তুত ছিল বলো । বিপিনবাবু যাবেন আর যাবার আগে খুনের দায়ে তোমাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে যাবেন এমন করে, এ কথাও তো ছিল না ।

খুনের দায়ে তো জড়াতে চান নি আমাকে...।

চান নি ?

শান্ত মুখেই সরমা জবাব দিল, না । বলেছিলেন, ওষুধ আমি দিয়েছি এ যেন না বলি । তখন বুঝিনি... ।

শান্তির নিঃশ্বাস ফেলল অবিনাশ—বাঁচালে, তিনি পুরুষমানুষ বলেই বোধহয় এত বড় অমানুষিকতা নিজেরই কোন অপরাধের মতো লাগছিল । এ খবর জানতুম না।

সরমা আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু তার বদলে আমার হাত থেকে বিষ নিয়ে যে আঘাত দিয়ে গেলেন সেও কি ভোলবার । সেও কি পুরুষমানুষের সাজে ?

অবিনাশ নিরুত্তর ।

জবাব দিলে না ?

কি বলব ?

সেদিন আদালতে যা বলে এলে তাই কি ঠিক ? আমিই দায়ী তাঁর এ মৃত্যুর জন্য ?

অবিনাশ হাসল । বলল, কিছুদিন আগে অপর্ণা চন্দ্রও এ প্রশ্নই করেছিলেন, তাঁকে জবাব দিয়েছি । দেখা হলে শুনে নিও ।

তোমার জবাব শুনতে অপর্ণা চন্দ্রর কাছে যেতে হবে আমাকে ?

সে কথা নয়। কিন্তু এ আলোচনা থাক সরমা।

সত্যি কথা শুনতে আর আমি ভয় পাব না, বলো শুনি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়ে রইল অবিনাশ। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো তার দিকে। সরমার চোখে আগ্রহ নেই, শুধু শ্রান্ত প্রতীক্ষা। বলল, দায়ী নও বলতেও তো মন মানবে না তোমার।...তা ছাড়া নিজেই ঠিক বুঝিনে। অবিনাশ ভাবল আবারও একটু, তোমাদের বিজ্ঞান বলে, কত জীবাণুর মৃত্যুর কারণ আমাদের প্রতিটা নিঃশ্বাস, আবার কত মানুষেরও মৃত্যুর কারণ ওরাই। এর মধ্যে কার জন্যে দায়ী কাকে করব, যা হবার তাই হয় শুধু। দু'টো মানুষ যখন পাশাপাশি চলে, সমস্যা থাকে না, কিন্তু একই রাস্তায় যখন উল্টো দিকে আনাগোনা শুরু হয় তাদের, ইচ্ছে না থাকলেও ঠোকাঠুকি লেগে যায় কখনো। এর জন্য দায়ী যদি কাউকে করতে হয় সে অদৃষ্ট।

অন্যমনস্কের মতো বসে থাকে সরমা। কথাগুলো তার কানে গেছে বলেও মনে হয় না।

ল্যাবরেটারিতে কর্ম-নিবিষ্ট সকলে।

শুধু সরমাই কাজে মন দিতে পারছে না।

সমাদ্দারের মেজাজ উগ্র। নতুন গবেষণার কিছু ফলাফল আশা করছেন। মেডিকাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জবাবের প্রতীক্ষায় থেকে বিরক্তি ধরে গেছে। বিকেলের দিকে আবার হাঁক পাড়লেন গিন্নি।

সরমা!

কাজ ফেলে সরমা তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ভিতরে আসব?

না। গাধাগুলো জানালে কিছু?

সরমা বিপন্ন মুখে চন্দ্রর দিকে তাকাতে তিনি ইশারায় ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ শান্ত থাকেন এমন কিছু বলো।

সরমা জানাল, অ্যানিমেল বডিতে এবার রিঅ্যাক্‌শন দেখা যাবে বলে আশা করছেন তাঁরা।

দ্যাট্‌স্ ফাইন্‌। সময় নষ্ট কোরো না, কাজে যাও।

সরমা জায়গায় ফিরে এলো আবার। এমনি বুঝ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কোন প্রকার উত্তেজনা সহ্য হবার নয় সমাদ্দারের।

সরমার শুষ্ক মূর্তি লক্ষ্য করে চন্দ্র মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলেন, ক্লান্ত লাগছে খুব?

না।

হলেও ক্ষতি নেই, ওষুধটা বেরুলে নিজেরাই আগে খানিকটা করে খেয়ে নেব'খন।

সরমা চেষ্টা করল হাসতে। কিন্তু দুশ্চিন্তার পাষাণভার অপসৃত হবার নয়। ঘড়িতে পাঁচটা না বাজতে ডেস্ক গুটিয়ে ফেলল। চন্দ্রকে বলল, আমি যাই?

হ্যাঁ, যাও।

এ সময়টায় নিয়মিত হাসপাতালে আসছে সরমা। কাছাকাছি গিয়ে পা কাঁপে রোজই। কি শুনবে, কি দেখবে। একটা ক্লান্তির বোঝা নিষ্ক্রিয় করে ফেলছে তাকেও। চোখ ছলছল

করে ওঠে যখন তখন । মন বলে, আবার একটা কিছু ঘটবে শিগগীরই ।

দরজার বাইরে নার্সকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, কেমন ?

এক রকমই । নার্স গম্ভীর মুখে অন্য দিকে চলে গেল ।

প্রতিদিনই ঝিমিয়ে আসছে অবিনাশ ।

ঘরের সবুজ আলোয় আজ আরো বেশি নিঝুম দেখাচ্ছে তাকে । চোখ বোজা । ঘুমিয়ে কি জেগে বোঝা গেল না । শব্দ না করে পাশে গিয়ে বসল সরমা ।

বহুক্ষণ বাদে চোখ মেলল অবিনাশ । হাসল অল্প একটু । কখন এলে ?

এই তো ।

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুঝল সে ।

মাঝে মাঝে ডাক্তার আনাগোনা করছেন । তাঁদের কথাবার্তা উদ্‌গ্রীব হয়ে শোনে সরমা । একটা হিম-শীতল অনুভূতি যেন পা বেয়ে নামছে তার । নামছেই ।

রাত হয়েছে ।

সরমা এক সময়ে উঠে এখানে থাকার অনুমতি নিয়ে এলো ।

বসে আছে । রোগীর পাশে নিস্পন্দের মতো দেখায় তাকেও । প্রায় মাঝ রাত্রিতে আবার চোখ মেলে তাকালো অবিনাশ ।

যাওনি এখনো, রাত কতো ?

বেশি না, তুমি ঘুমোও ।

আর ঘুম আসবে না, ক'টা বাজল ?

তিনটে...আজ আমি এখানে থাকব বলেই এসেছি ।

অবিনাশ বিস্মিত নেত্রে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ ।—কিন্তু কাল তো আবার খাটুনি আছে—

ছুটি নেব'খন । এখন কেমন লাগছে তোমার ?

ভালোই...ঠিক বুঝছি না—।

চোখ বুজে অনেকক্ষণ স্থাণুর মতো পড়ে থাকে সে ।

সরমা—

বলো ।

ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে তোমার, যখন একসঙ্গে পড়তাম—

আছে ।

আমারো প্রায়ই মনে পড়ে । তুমি আমার ওপর মাঝে মাঝে রেগে যেতে খুব, না ?

প্রবল এক কান্নার ঢেউ সবলে দমন করে ফেলে সরমা । তারপর প্রফুল্ল কণ্ঠে জবাব দেয়, তুমিই তো রাগিয়ে দিতে ।

প্রসন্ন হাসির মতো দেখা দেয় অবিনাশের মুখে ।—আর সায়েন্স কলেজে গিয়ে কেমন হাজির হতুম...মনে আছে ?

তা আর নেই, প্রায়ই যা জব্দ করতে আমাকে !

আর একবার অসুখের সময় বার্লি খাওয়া নিয়ে কেমন জ্বালিয়েছি ? তুমি রেগে আগুন—

তার সঙ্গে হাসতে গিয়ে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হবার উপক্রম সরমার। হাসছে তবু। বলল, চন্দ্র সাহেবের সামনেও নাস্তানাবুদ করেছিলে একদিন।

শিশুর মতো উৎফুল্ল হয়ে ওঠে অবিনাশ। আবার কি মনে পড়ে যায় তার।—আর, সমুদ্রের ধারে আমাদের সেই বসার জায়গাটা? লোকজন নেই দেখে কতদিন মুঠো মুঠো বালি নিয়ে আমার পিঠময় ছড়িয়ে দিয়েছ তুমি!

তুমিও ছাড়তে না।

বড় একটা নিঃশ্বাস উম্মোচন করে অবিনাশ আস্তে আস্তে বলল, তোমার বিয়ের পর আমি একাই গিয়ে বসতাম সেখানে...ভালো লাগত।

সেরে ওঠো, দুজনে একসঙ্গে যাব আবার। নিজের অজ্ঞাতে শাড়ির আঁচলটা মুখে গুঁজে দিয়েছে সরমা।

মেরিন্-লাইন্স্।

সরমা দিনের আলোর প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু একা ঘরে টিকতে পারল না বেশিক্ষণ। যথাসময়ে নিচে নেমে এসেছে। নৈমিত্তিক কাজও শুরু করেছে সকলের সঙ্গে। নিজেকে ভুলতে চায়, অবিনাশকে ভুলতে চায়, ভুলতে চায় সব কিছু। গবেষণার আসন্ন ফলাফলের প্রতি উন্মুখ সকলে, ওর দিকে লক্ষ্য নেই কারো।

টেলিফোন বেজে উঠল।

একটু বাদে চন্দ্র রিসিভার নামিয়ে রেখে চকিতে সরমার কাছে এলেন।—কাল অবিনাশকে কেমন দেখে এসেছিলে?

সরমা আঁতকে উঠল প্রায়। কেন, কে ফোন করেছে?

মণ্টু ডাকছে হাসপাতাল থেকে...আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে।

অবিনাশের ঘরে ঢোকার মুখে নার্সকে দেখে থামল সরমা। কেমন...?

ভালো না।

অ্যাঁ! অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে সরমা।

নার্স জানালো, জ্ঞান আছে রোগীর।

ঘরে প্রবেশ করতে অবিনাশ তাকালো চোখ মেলে। চন্দ্রকে দেখে হাসতে চেষ্টা করল একটু।

সরমা তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ল প্রায়। কেমন আছ অবিনাশ?

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বলতে চায়, ভালো আছে।

একটু ভালো আছ? অবিনাশ?

গলা কাঁপছে সরমার।

অবিনাশের মুখে হাসির আভাস একটু। চন্দ্র দাঁড়িয়ে চিত্রার্পিতের মতো। মণ্টু নির্বাক দ্রষ্টা।

ডাক্তার এসে গম্ভীর মুখে ইন্‌জেকশান দিয়ে গেলেন একটা।

কিছুক্ষণ...।

মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে আসছে মুখে। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে অবিনাশ ধরতে চাইল কি যেন।

খুঁজে পেল সরমার হাত । বিবর্ণ ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা সুস্পষ্ট হল ।

সরমা ঝুঁকে পড়ল আবার । ভুলে গেল চন্দ্র সামনে দাঁড়িয়ে । ভুলে গেল মণ্টু বসে আছে । দিশেহারার মতো বলে উঠল, আজ একটু ভালো আছ শুনে খুব খুশি হয়েছি অবিনাশ, শুনছ ?

চেয়ে দেখো আমার দিকে, আর কাজ করব না, তোমাকে নিয়ে দূরে চলে যাব কোথাও, বুঝলে ?

অবিনাশ— ?

সেখানে আমি তোমাকে দেখব, তুমি ভালো থাকবে বুঝেছ ?

অবিনাশ— ?

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল অবিনাশ ।

সরমা মুখ গুঁজল তার বুকের ওপর ।

চন্দ্র স্থির দাঁড়িয়ে ।

মণ্টু পালিয়ে গেছে ঘর ছেড়ে ।

মাথার ওপর সূর্যগোলকের অগ্নি-উদ্‌গিরণ । সরমা শ্লথ গতিতে পথ চলেছে । মণ্টুর সাহায্যে লোক ডেকে শবদাহ সম্পন্ন করতে গেছেন চন্দ্র সাহেব । একটু বাদে দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে । বিপিন চৌধুরীরও তাই হয়েছে । সবারই এই পরিণতি...। তবু এমন লাগছে কেন ?

সরমা শান্ত হয়ে ভাবতে চেষ্টা করল অবিনাশ মারা গেছে । আর দেখা হবে না । যা সে বলত আর বলবে না । এই যে লোকগুলো যাতায়াত করছে পথে, কেউ ওরা জানে না অবিনাশ মারা গেছে । ডেকে বলবে ?

কাঁদবে চিৎকার করে ?

মুখোমুখি মণিময়ের সঙ্গে দেখা ।

দাদা ? অবিনাশ মারা গেছে ।

নিজের কানেই ভারী অদ্ভুত শোনায় কণ্ঠস্বর । হাঁ করে চেয়ে আছে মণিময় । সরমার হাসি পায়, অবিনাশ মারা গেছে এই সহজ কথাটাও বুঝছে না নাকি ।

ল্যাবরেটোরি ।

ভুটা কাজ করছে, হরিআনন্দ কাজ করছে । কাজ করছে আর সব ছেলেরা । সরমার বাইরে চোখ দু'টো অবাক হয়ে দেখছে তাদের । ভেতরটা ডুকরে উঠছে থেকে থেকে, অবিনাশ মারা গেছে, শুনেছ তোমরা ? শব্দ বেরোয় না ।

ভুটা, হরিআনন্দ সকলে ঘিরে ধরল তাকে । নির্বাক প্রশ্ন তাদের ।

কিছু না, অবিনাশ মারা গেছে ।

ওদিক থেকে হাঁক পাড়লেন সমাদ্দার সাহেব, সরমা এদিকে এসো ।

ঘরে গেল ।

কি হয়েছে ?

অবিনাশ মারা গেছে স্যার ।

আরাম-কেদারায় দেহ এলিয়ে দিল সে ।

অবিনাশ মারা গেছে এইটুকুই মনে আছে, আর কিছু মনে নেই ।

বাড়ির দরজায় অপর্ণার গাড়ি দাঁড়িয়ে । বৈঠকখানায় মণিময় বসে আছে । বাইরে থেকে চন্দ্র ঘরে প্রবেশ করলেন । মণিময় উঠে দাঁড়াল তাড়াতাড়ি ।

নমস্কার, ভালো আছেন ?

চন্দ্র নীরবে একবার তার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করলেন শুধু । দোতলায় উঠে এলেন তারপর । অপর্ণা বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করছে ।

কোটটা আলনায় ফেলে কাছে এলেন, যাচ্ছ কোথাও ?

কেন ?

কেন পরে শুনো, আগে জবাবটাই দাও না ।

অপর্ণা তাঁর উস্কো-খুস্কো মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে কয়েক নিমেষ । কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন রুক্ষতায় ঈষৎ বিস্মিত । সম্প্রতি ল্যাবরেটারি থেকে তাঁর বাড়ি ফেরার সময়টাও লক্ষ্য রাখছে । আজও দশঘন্টা অনুপস্থিতির পরে হঠাৎ এ সম্ভাষণ বরদাস্ত হল না । তবু জবাবই দিল আগে ।

হ্যাঁ—।

কোথায় ?

নাইট-শুটিং আছে ।

না গেলে নয় ?

না । কিন্তু বারণ করছ কেন ?

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে চন্দ্র পাশের ঘরে চলে গেলেন ।

একটু বাদে নিচে থেকে মোটর ছাড়ার শব্দ কানে এলো ।

অপর্ণা এক কোণ ঘেঁষে নীরবে বসে আছে । ফাঁকা রাস্তায় মোটরের দ্রুতগতি । মণিময়ই কথা বলল প্রথম, ডাঃ চন্দ্র বোধহয় পছন্দ করেন না আমি যখন তখন এখানে আসি...।

অন্ধকারে অন্যদিক থেকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল একটা ।

কেন ?

মনে হল...

অপর্ণার বিরক্তি বাড়ল । কৌতূহলও ।—এমন সম্মানটা নিজেই নিজেকে দিচ্ছেন, না কোন কারণ ঘটেছে ?

আহত মুখে মণিময় ফিরে তাকালো সম্মান !

অপছন্দর হেতু যখন আমি, সম্মান বই কি । কি বলেছেন তিনি ?

অপমানিত বোধ করলেও আর ঘাঁটাবার সাহস নেই মণিময়ের । অধুনা অপর্ণার উগ্র মেজাজের খবর স্টুডিও মহলে সর্বজনবিদিত । তা ছাড়া, সম্প্রতি ওর মতো আর্টিস্ট প্লে করতে রাজী হলে মণিময়ের লেখা যে কোন গল্প চড়া দামে বিকিয়ে যাচ্ছে ।করুণা-সৃজনের প্রয়াসই শ্রেয় মনে হল ।

বলেন নি কিছু, সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করতে কোন জবাব

না দিয়ে চলে গেলেন ।...হয়তো শুনতেই পাননি...মনটা আমারই এমন খারাপ হয়ে আছে সেই দুপুর থেকে । তবু তো রাত হোক দিন হোক, কথামতো সব জায়গায় হাজিরা না দিলে চলে না ।

বিনম্র ভঙ্গিটা বিরক্তিকর আরো । অপর্ণা অন্ধকার পথের দিকে চেয়ে থাকে আবার । মণিময় বলে গেল, কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে সরমাকে দেখলাম প্রায় পাগলের মতো চলেছে রাস্তা দিয়ে । আমাকে দেখে ছোট মেয়ের মতো কেঁদে ফেলল একবারে ।

অপর্ণার হুঁশ ফেরে এতক্ষণে । মন খারাপের প্রসঙ্গে কি বলতে চায় লোকটা খেয়াল করেনি । সরমা পাগলের মতো পথ চলছিল, রুক্ষ শুষ্ক মূর্তিতে চন্দ্রর বাড়ি আসা...ঘুরে বসল অপর্ণা ।—কি হয়েছে ?

মণিময় বিস্মিত, আপনি শোনেন নি ?

না, কি শুনব ?

অবিনাশ মারা গেল আজ ।

হঠাৎ যেন একসঙ্গে হাজার মুগুরের ঘা পড়ল বুকের মধ্যে । অপর্ণা নির্বাক বিমূঢ় । মণিময়ের বাকী বক্তব্য কর্ণগোচর হল না একবর্ণও ।

স্টুডিও পৌঁছে গাড়ির দরজা খুলে দিল মণিময় । নিজের অজ্ঞাতে ঘরে এসে বসল অপর্ণা । মেক্‌আপ-ম্যান্‌ তাড়া দিয়ে গেল ক'বার । দেরি দেখে স্বয়ং পরিচালক এলেন খবর নিতে ।

অপর্ণার সম্বিৎ ফিরল যেন । উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, আমার শরীর অসুস্থ—

কোনদিকে না চেয়ে সোজা গিয়ে মোটরে উঠল আবার ।

বাড়ির চাকরদের মুখে সংবাদ পেল, বাবু একটু আগে স্নান করে শুয়ে পড়েছেন কিছু খান নি ।

নিঃশব্দে ওপরে উঠে এলো অপর্ণা । শোবার ঘরে আলো নেবালো । দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ ।

বাইরের বারান্দায় এসে বসল চুপ করে ।

সমুদ্রের ধারে বসে অবিনাশ সানুনয়ে অনুরোধ করেছিল সেদিন, একবার যদি অপর্ণা মনে মনেও অন্তত বলে, আর কোন রাগ নেই তার ওপর ।

সময় দিল না অবিনাশ । ওর বিদ্বেষটুকুই জেনে গেল শুধু ।...তার শেষ সময়েও কেউ ওকে একবার ডাকলে না পর্যন্ত ।

অব্যক্ত যাতনায় আতপ্ত প্রতিটি নিঃশ্বাস । বেদনাভারে সরমার বাহ্যজ্ঞান রহিত, কিন্তু বুকচাপা অন্ধকারে সমস্ত রাত্রি নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে কাটলো আরো একজনের । কেউ তার খবর রাখে না ।

। ১৬ ।।

রূপহীন রসহীন বেদনাচ্ছন্ন জীবনের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির মধ্যে সরমা দাঁড়িয়ে আবার ।

দীর্ঘ দু'টো বছর অতিবাহিত ।

এর মধ্যে ওদের একটানা কাজে শুধু একটি দিন ছাড়া আর ছেদ পড়েনি । বৃদ্ধ সমাদ্দারকে সেদিন তাঁর ল্যাবরেটারি প্রদক্ষিণ করিয়ে বরাবরকার মতো বার করে নিয়ে যাওয়া হল । ঘটা করে সেদিন শোক প্রকাশ করেছে বাইরের বিজ্ঞানী মহল । খবরের কাগজগুলি বড় বড় হরফে তাঁর জীবনের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে । কাছের মানুষ যারা, শোক প্রকাশের অবকাশ তাদেরই ছিল না শুধু । বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গমগমে অসহিষ্ণুতাটুকু রেখে গেছেন সমাদ্দার সাহেব,—গো টু ইওর ওয়ার্ক, ডোণ্ট্ ওয়েস্ট টাইম ।

ব্যবসায়ী মহলে ল্যাবরেটারি সুনাম অর্জন করেছে বোঝা যায় । নামজাদা দুই একটা প্রতিষ্ঠান থেকে হরিআনন্দ্ এবং ভুটার কাছে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের প্রলোভন এসেছে একাধিক বার । চন্দ্র অথবা সরমাকে ছাড়িয়ে আনা যাবে না তাঁরা জানেন । ভুটা ইতস্তত করেছিল, চন্দ্র আটকে রেখেছেন । সমাদ্দারের লেখাপড়া অনুযায়ী ল্যাবরেটারি এবং সমগ্র ব্যবসায়ের বিধি-ব্যবস্থা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ । তবু যাবে কি না ভাবছিল ভুটা, কারণ, ওর স্বভাবে ল্যাবরেটারির এ গুমোট আবহাওয়া দুঃসহ । হরিআনন্দ্কে ঠেকাতে হয় নি । উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের আমন্ত্রণ একপাশে সরিয়ে রেখে শান্ত মনে কাজ করে যাচ্ছে । অবসাদ আসে না এমন নয় । হাত গুটিয়ে তখন চুপ করে চেয়ে দেখে সকলকে, বিশেষ করে ভুটাকে । ভুল করেও সে যদি আগের মতো টিপ্পনী কাটে দুই একটা ।

ওদের পরে যারা ল্যাবরেটারিতে এসেছে তাদের নিয়ে অবশ্য কোন সংশয় নেই । এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারাটাই তারা বড় বলে জেনেছে ।

ফ্যাক্টরি তত্ত্বাবধানের পর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে নিয়মমতো হাজিরা দেন চন্দ্র । সেখান থেকে ল্যাবেরেটারিতে । অদ্য সকলের বাড়ি ফেরার সময় হয়ে আসে তখন ।

বাইরের কাজ সরমার তত্ত্বাবধানেও ছেড়ে দিয়েছেন কিছু কিছু । কিন্তু পারতপক্ষে সে ল্যাবরেটারি ছেড়ে যায় না কোথাও । কাজে নেমে আসে সকলের আগে, যায় সকলের পরে । প্রায়ই তাকে তাগিদ দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে তবে বাড়ি ফেরেন চন্দ্র । কোন দিন বা কথা শোনে না সরমা ।—আপনি যান, আমার দেরি হবে একটু ।

চন্দ্র বসে থাকেন চুপ করে ।

গেলেন না ?

তুমি না উঠলে আমার যাওয়া হবে না ।

জবাব না দিয়ে হাতের কাজ গুটিয়ে ফেলে সরমা । কাজের প্রসঙ্গ ছাড়া ক্বচিৎ কথার বিনিময় হয় ।

এ হেন নিস্তব্ধ পরিবেশে মণ্টু নবাগত ।

এম. এস্‌সি ভালো পাস করেছে । চন্দ্র তাকে ডেকেছিলেন ব্যবসায়ের দিকটা দেখবার জন্য । ঈষৎ চঞ্চল হলেও ছেলেটার বুদ্ধি আছে জানতেন । সংগঠনের ব্যস্ততায় থাকতও ভালো । কিন্তু ব্যবসায়ে দক্ষতা অর্জনে তার কোন আগ্রহ দেখা গেল না । ঝোঁক চাপল, ল্যাবরেটারিতে আসবে ।

সরমা মনে মনে কৃতজ্ঞ থাকে চন্দ্রর কাছে । তবু সংশয় প্রকাশ করল একটু, ওর কি ভালো লাগবে এখানে—

চন্দ্র বললেন, দেখা যাক, ভালো না লাগলে নিজেই বলবে'খন ।

প্রথম দিনকতক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে কাটল মণ্টুর । সরমার কাছে আসে, কথা বলে । কিন্তু বৃথা চেষ্টা । একজনের স্তব্ধতায় সকলেই আচ্ছন্ন প্রায় ।

হঠাৎ দেখা গেল কাজ করা থেকে কাজ পণ্ড করার দিকে মণ্টুর ঝোঁক বেশি । সুগম্ভীর অন্যমনস্কতায় কখনো গ্যাস ছেড়ে দিয়ে বসে আছে । নয়তো, আগুন লাগিয়েছে স্পিরিটের আরকে । এক্সপেরিমেণ্ট ভুল করে নিজেকে গাল দিচ্ছে জোরে জোরে, মণ্টুরাম তুমি আস্ত গাধা । অ্যাপারেটাস হাত থেকে ফেলে ভাঙ্গা কাঁচ কুড়োতে গিয়ে আঙুল কেটে এসে দাঁড়াচ্ছে সরমার কাছে, বেঁধে দাও—। বায়না ধরেছে যখন তখন, এটা শেখাও, ওটা বলে দাও ।

সরমা আঙুল বেঁধে দেয়, কাজ শেখায়, বলেও । বিরক্ত হয়ে আবার হেসেও ফেলে দৈবাৎ । ভুটার ভালো লাগতে শুরু করল আবার । হাল্‌কা নিঃশ্বাস ফেলল স্বল্প-ভাষী হরিআনন্দ্‌ । খুশির উন্মেষ মণ্টুর সমবয়সীদের মুখে । চন্দ্রর নির্বিকার গাম্ভীর্যে প্রশ্রয়ের আভাস ।

সকলে বিদায় নিয়ে গেলে সেদিন রাত্রিতে সরমা চন্দ্রকে বলল, ফ্যাক্টরীতে কোন কাজের ভার দিন মণ্টুকে, এখানে মিছিমিছি সময় নষ্ট শুধু ।

সে বলেছে নাকি ?

না, আমিই বলছি ।

অন্য ব্যবস্থা চন্দ্রর মনঃপুত কিনা বোঝা গেল না । জবাব দিলেন, জিজ্ঞেস করে দেখব তাকে ।

জিজ্ঞাসার ফল বিপরীত দাঁড়াল । উপর্যুপরি এক সপ্তাহ মণ্টুর দেখা নেই আর । কার ওপর অভিমান বুঝেও সরমা চুপ করে থাকে ক'টা দিন । শেষে টেলিফোনে ডেকে পাঠালো তাকে, একবার এসো, কথা আছে ।

রাত্রিতে সরমা নিজের ঘরে একটা বই খুলে বসেছে। মণ্টুর সাক্ষাৎ মিলল । তার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারবে না এবং আসবে আজই এ একরকম জানাই ছিল ।

এসো । বই থেকে মুখ না তুলেই দুই একবার লক্ষ্য করল তাকে । কি ব্যাপার ?

খাটে হেলান দিয়ে বসল মণ্টু, কি আর—।

দেখা নেই যে ?

চাও না এখানে কাজে আসি, কি করে দেখবে ।

দুই একটা পাতা উল্টে বই বন্ধ করল সরমা ।—কিন্তু সত্যিই কি এখানে কাজে আসো তুমি ?

না ।

তা হলে ?

তা হলেও ফ্যাক্টরিতে চালান যেতে রাজী নই ।

কিসে রাজী বলো—

মণ্টু নিরুত্তর ।

সরমা আবার জিজ্ঞাস করে, কি জন্যে এমন ফাঁকি দিচ্ছ নিজেকে ?

মণ্টু অধোমুখে বসে থাকে অনেকক্ষণ । পরে আস্তে আস্তে বলল, চন্দ্র সাহেবের মুখে

তোমার কথা শুনে সত্যিই লেগেছিল বৌদি...যদিও বুঝি তুমি ঠিকই বলেছ, এখানে আমার দ্বারা হবে না কিছু । না হোক, তবু তোমাকে একবার সেই আগেরই মতো দেখবার জন্য সারাজীবন এমনি ফাঁকির মধ্যে কাটিয়ে দিতেও আপত্তি হবে না আমার ।

খুব ঠাণ্ডা গলায় সরমা বলল, কিন্তু আমার তো হবে মণ্টু । তোমার দাম তো আমার কাছে কারো থেকে কম নয় । আই. এস্‌সিতে ফেল করেছিলে বছরের পর বছর—সেখানে থেকে এ পর্যন্ত আমি টেনে তুলেছি তোমাকে, এখন আমিই বাধা হয়ে বসব ?

অনেক্ষণ বাদে মণ্টু উঠে দাঁড়াল ।—এবার থেকে কাজে আর গাফিলতি হবে না বৌদি । তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, আমি চেষ্টা করব ।

বেশ, আর একটা কথা—

মণ্টুর নীরব জিজ্ঞাসার উত্তরে দ্বিধা কাটিয়ে বলল, আমাকে বৌদি ডেকো না আর, দিদি ডেকো ।

এমন একটা নিষেধ কোনদিন আশা করেনি মণ্টু । নামের পর সরমা আবার ব্যানার্জী লিখতে শুরু করেছে অনেকদিনই জানে । এ নিয়ে দুঃখ করার ছিল না কিছু । কিন্তু আজ আঘাত পেল । বিপিন চৌধুরীকে ভুলতে হলে ওর সঙ্গে এ সম্পর্কটুকুও নিশ্চিহ্ন হওয়া প্রয়োজন, আগে ভেবে দেখেনি ।

ল্যাবরেটারিতে বৌদির উদ্দেশ্যে একজনের মিষ্টি হাঁক ডাক আর কোনদিন শুনল না কেউ । মণ্টু কাজ করে মুখ বুজে, কামাই করে প্রায়ই । মাস দুই বাদে হঠাৎ একেবারেই আর সন্ধান মিলল না তার । খবর নিতে গিয়ে বিস্ময়ের সীমা নেই চন্দ্রর । বাড়িঘর বিক্রি করে দিয়ে চারুদেবী দেশে চলে গেছেন । মণ্টুর খবর রাখে না কেউ ।

সেদিন সন্ধ্যার আগেই সরমা ওপরে উঠে গেল । জানালার কাছে চেয়ার টেনে বসল চুপ করে । হাতের নীল খাম থেকে চিঠিখানা বের করে পড়ল আর একবার ।

বৌদি গো, নিষেধ মানা আছে, তবু অন্য ডাকে মন ওঠে না । দাদার জন্যে দুঃখ হয়, কিন্তু আমার পাওয়াও ব্যর্থ হবে কেন ?

সাগর পাড়ি দিলুম । আগে জানাই নি বলে দুঃখ করো না । তুমি বাধা দিতে না হয়তো, কিন্তু আমি বাঁধা পড়তুমই । তোমার কাছে থাকলে তোমার থেকেও তোমার কাজকে বড় করে দেখা এখন অন্তত সম্ভব হবে না আমার দ্বারা । একদিন তোমার নাম ছড়াবে নিশ্চয় জানি । যেখানেই থাকি সার্থকতার খবর কানে আসবেই । যোগ্য মণ্টুর সন্ধান যেন পাও সেদিন এই আশায় দূরে চলেছি । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর কাজের তাড়ায় তখন অনেক ব্যথা তুমি ভুলবে, অনেক কথা আমিও ভুলব । পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের গম্ভীর গবেষণায় আর তখন ফাঁকি থাকবে না । কিন্তু আজ কিছুতে ভুলতে পারছি না শুধু বৌদি আমার । শতকোটি প্রণাম নিও । তোমার মণ্টু ।

চিঠি কোলের ওপর পড়ে থাকে । অন্যমনস্কের মতো সরমা হাসতেও চেষ্টা করে একটু । কিন্তু শুকনো দু'চোখ জ্বালা করে আসে থেকে থেকে ।

মণিময় এসেছিল স্টুডিওর সংবাদ নিয়ে। ছাড়া পায় নি এখনো। অপর্ণার ভিতরে ভিতরে অনেকদিন ধরে একটা ভাঙচুর চলছে সর্বক্ষণ সেটুকু উপলব্ধি করতে পারে। অস্বস্তির দুর্ভোগ তারও। প্রযোজক পাঠিয়েছেন পরদিন নাইট-শুটিং-এর নোটিস সই করে নিয়ে যেতে। কিন্তু দু'ঘ'টা পার হতে চলল এই উপলক্ষে। একথা-সেকথায় আসল কাজ চাপা দিয়ে অপর্ণা একেবারে চুপ একসময়।

এগারোটা বাজে রাত্রি।

অপর্ণা আড়চোখে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে ঘড়ির দিকে।...এর পর মানুষটি ফিরবেন। কোন দিকে দৃকপাত না করে ওপরে উঠে যাবেন সোজা। কথার বিনিময় হবে না একটিও। রাত্রিতে পড়াশুনার অজুহাতে ঘর বদলে নিয়েছেন অনেকদিন।

কি খেয়াল হতে উঠে দাঁড়াল অপর্ণা। চলুন বেরুব।

মণিময় হাঁ।—এত রাত্তিরে!

হুঁ।

কোথায় যাবেন?

চলুন না—।

আর জিজ্ঞাসাবাদের সাহস হল না। চুপচাপ তাকে অনুসরণ করে মণিময় গাড়িতে উঠল। অপর্ণা মৃদুকণ্ঠে ড্রাইভারকে গন্তব্য স্থানের নির্দেশ দিল মেরিন্‌-লাইনস্‌—

অন্ধকারে বসে ঘামতে লাগল মণিময়।

ল্যাবরেটারি। অপর্ণা নেমে পড়ল।—আপনি বসুন, আমি আসছি।

চন্দ্র একটু আগে বিদায় নিয়ে গেছেন। সরমা তখনো একাগ্র মনে লিখছে কি। দূরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে তাকে নিরীক্ষণ করছে কেউ, খেয়াল নেই। এক পা দু'পা করে তার পাশে এসে দাঁড়াল অপর্ণা।

আপনি...।

খুব অবাক হয়ে গেলে তো? উৎফুল্ল হাস্যধ্বনি, এলাম একবার দেখতে রোজ এত রাত্রি পর্যন্ত কিসের এমন গবেষণা। আর একজনকে দেখছিনে যে...?

একটু আগে বেরুলেন।

ও...। ইচ্ছে করেই অপর্ণা হাত-ঘড়ির দিকে তাকালো একবার।—তারপর, তুমি কেমন আছ?

ভালো। বসবেন? বলল বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে আমন্ত্রণও নেই, আগ্রহও নেই।

উল্টে অস্বস্তির মতো লাগছে অপর্ণারই। এই সরমাকে সে কোনদিন দেখে নি। কিন্তু তা বলে নিজের জ্বালা ভুলতে পারল না একেবারে। বলল, থাক।...সম্প্রতি সাইনটিস্ট কি তোমরা দু'জনেই না আরো কেউ আছেন?

বহুদিন আগে অবিনাশের একটা ইঙ্গিত মনে পড়ে যায় সরমার। ক্ষুদ্র জবাব দিল, আরো আছেন।

এত রাত পর্যন্ত খাটাও তাঁদেরও? অপর্ণার লঘু বিস্ময়।

তাঁরা আগেই যান ।

ও, তোমাদেরই বুঝি আর জ্ঞানের পিপাসা মেটে না ! উচ্ছল-কণ্ঠে হেসে উঠল অপর্ণা । ল্যাবরেটারির চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখল একবার । বলল, জায়গাটি বেশ তো...। তোমাকে বিরক্ত করলাম খুব না ?

না । সরমা চেয়ে আছে চুপচাপ ।

তোমার দাদা আবার বাইরে বসে আছেন গাড়িতে । চলি, কি বলো ?

হ্যাঁ, আসুন । সরমা শান্ত মুখে তাকালো তার দিকে, কিন্তু একটা অনুরোধ, আবার যদি কখনো এখানে আসেন, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন এটা সায়েন্স ল্যাবরেটারি, স্টুডিও-ফ্লোর নয় । নমস্কার ।

স্বস্থানে এসে লেখায় মন দিল সে । হতভম্বের মতো খানিক দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল অপর্ণা । গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করল সশব্দে । গাড়ি চলল ।

সাহস সঞ্চয় করতে সময় লাগে মণিময়ের, ডাঃ চন্দ্র নেই ?

জবাব পেল না ।

একটু থেমে মণিময় আবার বলল, সরমা, আমার বোন অপর্ণা দেবী, তাকে আমি জানি...আপনি যা ভাবছেন ঠিক তেমন নয় সে ।

এবারে অপর্ণা ফিরে তাকায় তার দিকে । রুক্ষ কণ্ঠে ফিরে প্রশ্ন করে, কি ভাবছি আমি ?

ওই দৃষ্টির মুখোমুখি পড়ে মণিময় হকচকিয়ে গেল কেমন । বারকতক ঢোঁক গিলল শুধু ।

বাড়ির দরজায় গাড়ি থামতে নামল দু'জনেই । ছুটির আবেদন জানাল মণিময়, আমি যাই...?

অপর্ণা থমকে দাঁড়াল । তাকালো ।—আপনি এসেছিলেন কেন ?

শুটিং-নোটিস...

সই নিয়েছেন ?

না...।

আসুন ।

বাইরের ঘরেই মুখোমুখি বসে আছে আবার । চন্দ্রর আগেই ফিরেছে তারা । ট্রেনে আসছেন তিনি, বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক ।

সামনে স্টুডিওর ছাপানো নোটিস ফর্ম এবং নিজের কলম রেখে মণিময় অপেক্ষা করছে । তাকে সচকিত করে হঠাৎ হাসতে লাগল অপর্ণা । হাসির দমকে ভেঙে পড়ল যেন । পরে বলল, আপনার বোন যেমনই হোক, তার মতো একজনের পাশে দাঁড়িয়ে শুধু কাজই করছেন ল্যাবরেটারির—এমন মানুষই যদি হন আমার ভদ্রলোকটি তাহলেও ভাবনার কথা । হাসি থামিয়ে দম নিল একটু, বুঝতে পারলেন ?

ধাঁধায় পড়ে তার সঙ্গে হাসিতে যোগ দেওয়াই নিরাপদ মনে হয় মণিময়ের ।

দরজার কাছে চন্দ্র দাঁড়িয়ে । বাইরে থেকে হাসির শব্দ শুনেছেন ।

মণিময় নড়েচড়ে বসল । মুখের হাসি ভালো করে মিলায় নি অপর্ণার । কপালে কুঞ্চিত

রেখা দুই একটা । নোটিস ফর্ম এবং কলম তুলে নিল সে । তারপর ধীরেসুস্থে বলল, তোমার দেরি দেখে ল্যাবরেটারিতে খোঁজ করতে গিয়েছিলাম আমরা ।

একটু আগে নিজে সেধে যে আঘাত পেয়ে এসেছে, সে তুলনায় এতটুকু উষ্মা নেই কোথাও ।

কিন্তু সামান্য ক'টা কথায় বিপর্যয় ঘটে গেল একটা । এতদিনের অভ্যস্ত সংযম চন্দ্র হারিয়ে ফেলেলেন এক নিমেষে । জবাব না দিয়ে ধীর পায়ে মণিময়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি ।

নোটিস ফর্ম এবং কলম একপাশে সরিয়ে রেখে অপর্ণা আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠল । কিছু বলার আগেই চন্দ্র বাধা দিলেন, থামো ।

দু'চোখের স্থির দৃষ্টি মণিময়ের মুখের ওপর ।—ক'টা বছর এমনি কেটেছে, আমি বাধা দিই নি । ভদ্রতার আড়ালে যে পশুটা ঘুমিয়ে থাকে তাকে জাগিয়ে তুলেছেন প্রায় । এরপরে কতটুকু সহ্য হবে আপনার ?

মণিময় আড়ষ্ট ।

যান ।

যন্ত্র-চালিতের মতো নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সে । অপর্ণার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন চন্দ্র । বলো—

এতদিনের পুঞ্জীভূত দাহ্য অনুভূতির ওপর এত বড় স্ফুলিঙ্গেরও প্রয়োজন ছিল না কিছু । এর অনেক কমেও অপর্ণার ভাঙার বিপর্যয় সুসম্পূর্ণ হতে পারত । অবাক বিস্ময়ে তাঁকে শুধু দেখছে চেয়ে চেয়ে ।

অস্ফুট কণ্ঠে বলল, এ অপমান তুমি কাকে করলে ?

অপমান-বোধ যাদের আছে তাদের কেউ নও তোমরা । একদিন বলেছিলাম আমার সম্মানও তোমার হাতে রইল, সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলে, ও-কথা কেন । আজ বুঝছ ?

অপর্ণা চেয়েই আছে ।

চন্দ্র ভিতরে চলে গেলেন ।

পরদিনও বেশি রাত্রিতেই বাড়ি ফিরেছেন তিনি । টেবিলের ওপর ক্ষুদ্র চিঠি চোখে পড়ল ।

আমার খোঁজ কোরো না, তোমার সম্মান তোমারই থাক ।—অপর্ণা ।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্র ঠিক নেই স্তব্ধ, বিবর্ণ । একটু একটু করে সমস্ত মুখে সুকঠোর ছাপ পড়ে একটা । এক পা দু'পা করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন আবার ।

পুরুষ-জীবনে একটা বড় ট্র্যাজেডি পুরুষকারের অভিমান । সংসার-জীবনে এর পরিণাম বিষম । কাছে এসে দাঁড়ানো দায়, দূরে সরে এসেও শান্তি নেই । দু'হাত বাড়িয়ে নিতে সঙ্কোচ, দু'হাত ভরে দিতেও । মিলনে বাধা, বিচ্ছেদ দুঃসহ । এ অভিমান অপরকে যতটুকু ভোলায় তার থেকে অনেক বেশি ভোলায় নিজেকে—আসল ট্রাজেডি এইখানে । এই ট্রাজেডি ছিল বিপিন চৌধুরীর । আবার এই ট্রাজেডির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ডাঃ মোহিনী চন্দ্র ।

প্রথম ঘা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও রক্তের কণায় আগুন লেগেছিল । কিন্তু এক নয় পুরুষকার আর পুরুষকারের অভিমান । চন্দ্র নিজের কাছে ধরা পড়েছেন ।

অপর্ণাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন । কোথায় গেছে অপর্ণা ? স্টুডিও মহলে । স্টুডিও মহলের কোথাও । কিন্তু পথে পথে ঘুরে কাটল দু'দিন । যেখানে সেখানে কাটল দুই রাত । তবু যেখানে সন্ধান মিলতে পারত অপর্ণার, একবারও সে পথ মাড়ালেন না । চন্দ্র নিঃশেষে ধরা পড়েছেন নিজের কাছে । ধরা পড়েছে অনেক কিছু ।

ল্যাবরেটারি ।

অপর্ণাকে সে রাত্রিতে ওভাবে বিদায় দেবার পরে দুদিন বিগত । ইতিমধ্যে চন্দ্রও আসেন নি আর । তাঁর বাড়িতে ফোন করেও সাড়া মেলে নি । সরমা ভাবছে সেই থেকে । শুধু এখানকার এই কাজ ছাড়া কিছুই সে ভাবতে চায় না আর । কিন্তু তবু ভাবছে । ভাবতে হচ্ছে । সেই রাত্রিতে যাকে সে অপদস্থ করেছিল সে শুধু অপর্ণা নয় । অপর্ণা চন্দ্র । ডাঃ চন্দ্রের স্ত্রী । সামনাসামনি সেদিন কিন্তু একবারও মনে হয়নি সে-কথা । পরেও হয় নি । কিন্তু এখন হচ্ছে । চন্দ্রর না আসার সঙ্গে সেদিনের ঘটনার যোগ আছে কিছু । নইলে এমন তো হয়নি কখনো ।

দুপুরে হরিআনন্দ খবর নিয়ে এলো, চন্দ্র বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন দুদিন আগে । বাড়িও ফেরেন নি, কোন খবরও দেন নি । বাড়িতে তাঁর চাকর ছাড়া অন্য কেউ নেই ।

সরমা বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে থাকে শুধু । সব গোলমেলে ঠেকে কেমন । ঘটনার সঙ্গে ঘটনা মেলাতে পারে না । অপর্ণার সঙ্গে তার সেই ব্যবহারের পরের দিনও তো তিনি এসেছিলেন । সারাক্ষণ কাজ করেছেন ।

রাত্রি ।

সকলে চলে গেছে । ল্যাবরেটারি নিঝুম ।

সরমার কাজ এগোচ্ছে না । অবিনাশ মারা যাবার পর থেকে এটাই সে বরদাস্ত করতে পারে না একটুও । একটা পুরুষ নিবিষ্টতায় কাজ করে যায়, কাজ করে যেতে চায় । কিন্তু আজ পারছে না । চেষ্টা করছে । পারছে না ।

হঠাৎ এক সময় চোখ তুলে দেখে দোর-গোড়ায় চন্দ্র দাঁড়িয়ে । শুকনো উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি । পায়ে পায়ে কাছে এলেন ।

সরমার বাক্‌শক্তি লোপ পেয়ে গেল যেন । কি হয়েছে ?

কিছু না । সহজ হতে চেষ্টা করলেন তিনি ।

দ্বিধা কাটিয়ে সরমা আবারও জিজ্ঞাসা করল, এমন দেখাচ্ছে কেন আপনাকে ? কোথায় ছিলেন এ দুদিন ?

চন্দ্রের চুপ করে থাকার কথা । নয় তো যাহোক কিছু বলার কথা । দু'দিন ধরে সংযত করেছেন নিজেকে । কিছু বলবেন না স্থির করে এসেছেন । কিন্তু এই পরিবেশে, এই মুহূর্তে সরমার দিকে চেয়ে বলার তাড়নাটাই বড় হয়ে উঠল হঠাৎ । বললেন, খুব সাদাসিধে ভাবেই বললেন, ওদের খুঁজতে বেরিয়েছিলাম । অপর্ণাকে...আর তোমার দাদাকে ।

সরমা বুঝে উঠছে না কিছু । চন্দ্র বুক-পকেট থেকে অপর্ণার ক্ষুদ্র চিঠিখানা তার হাতে দিলেন, পড়ো ।

সরমা পড়ল । পড়ার পরে বোবার মতো বসে রইল ।

নিজের সমস্ত রিক্ততা উজাড় করে ফেলে চন্দ্র স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকেন কয়েক

মুহূর্ত। সম্বিৎ ফেরে তারপর। অসহিষ্ণু পায়ে বারকতক ঘরময় পায়চারি করে নিজের ডেস্কএর সামনে এসে দাঁড়ান। একমাত্র সম্বল পুরুষকারের অভিমানটাই বড় করে তোলেন আবার। এক্সপেরিমেন্টের সরঞ্জাম গুছিয়ে নেন।

হাতের কাছে যা পেলেন তাই দিয়ে একটা সলিউশন করে বার্নারে চাপিয়ে দিলেন। কিসের সলিউশন, কি হবে, সেটা অবান্তর। বার্নারে নিজেকে আড়াল করছেন। আড়াল খুঁজছেন। সরমাকে আদেশ দিলেন, প্রোসিডিংস-এর ফাইলটা দাও—

সরমার কানে গেল না। অথবা, শুনেও বসে রইল চুপ করে।

নিজেই এসে ফাইল নিয়ে গেলেন তিনি। পাতা ওলটালেন একটা, দুটো—।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন আবার। সম্পূর্ণ।

বার্নারে ব্লু ফ্লেমের শাঁ শাঁ শব্দ। বড় 'বীকার'এ সলিউশন ফুটছে টগবগ করে। 'বীকার' এর মুখ পর্যন্ত গ্যাস জমে উঠল।

চন্দ্রর হুঁশ নেই। ডেস্কএ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আর, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্রকায় খলের মতো পাত্রে কি একটা পদার্থ পিষছেন। সময়মতো সলিউশনে মেশাবেন। কিন্তু মেশাবার কথা ভুলে গেছেন। শুধু পিষছেন। ভাবছেন কিছু। আবার পিষছেন। এক-একবার ভাবনাটাকেও পিষে ফেলতে চাইছেন যেন।

হঠাৎ একসময় সচেতন হয়ে দেখেন, সরমা চেয়ে আছে তাঁর দিকে। ভাবলেশহীন নিষ্পলক চাউনি। লজ্জায় ধিক্কারে সচকিত হয়ে উঠলেন চন্দ্র। বিব্রত মুখে বীকার-এর ওপর ঝুঁকে খলের পদার্থটুকু ঢেলে দিতে গেলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু ঢালা হল না। খলসুদ্ধ হাত থেকে পড়ে গেল ফুটন্ত সলিউশনে।

চন্দ্র দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন। একেবারে অনাড়ম্বরে ঘটে গেল একটা অঘটন।

সরমা দেখছিল বটে। কিন্তু কি দেখছিল সে-ই জানে। চমক ভাঙল যেন। সত্রাসে অস্ফুট শব্দ করে উঠল একটা। ত্রস্তে কাছে এসে বার্নার নিবিয়ে দিল।—চোখে লাগল?

জবাব না দিয়ে চোখ দুটো একবার রগড়ে দিলেন তিনি।

সামনে বসে হাত টেনে নামাতে চেষ্টা করল সরমা।—দেখি, কোথায় লাগল?

চন্দ্র বাধা দিলেন। সম্পূর্ণ আত্মস্থ হয়েছেন। খুব শান্তমুখে বললেন, থাক, একটু জল নিয়ে এসো আগে।

জল আনতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সরমা। 'বীকার'-এর মুখে তখনো ধোঁয়া উঠছে গলগলিয়ে। বড় নিঃশ্বাস টেনে বুঝতে চেষ্টা করল জিনিসটা কি। তারপর তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসে তাঁর সামনে ঝুঁকে বসল আবার।

জলের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে হাত অসাড় হয়ে গেল সরমার। জল ফেলে দিয়ে ব্যাকুল উদ্‌বেগে দু'হাতে জোর করে টেনে তুলল তাঁকে।

টি-পার্টির মজলিস বসেছে প্রযোজক দেশাইয়ের স্টুডিও আপিসে। হাস্যোজ্জ্বল সমাবেশ। প্রযোজক দেশাই এবং তাঁর অনুগতদের বিশেষ আগ্রহটুকু কার প্রতি নিবদ্ধ, অবিদিত নয় কারো। একজনের বাড়ি ছেড়ে আসায় এতগুলি পুরুষের গোপন উল্লাস উপস্থিত তরুণী অভিনেত্রীদের মনোবেদনার কারণ। সুচঞ্চল হাস্য-রসে কার্পণ্য নেই তা

বলে । লঘু কৌতুকের পরিবেশন চলেছে মুখে মুখে ।

অপর্ণার নিখুঁত প্রসাধনে তিন রাতের মর্মচ্ছেদী যাতনা ঢাকা পড়ে গেছে । হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিচ্ছে সেও । এরই মধ্যে চিরাভ্যস্ত মর্যাদাবোধটুকুও সুপরিস্ফুট । মাঝে মাঝে ভাবছে একটা কিছু, বোঝা যায় । হাতে সেদিনের খবরের কাগজ । খবর আছে । ছোট্ট খবর । এতবড় বোম্বাই শহরে বেশি লোকের চোখে পড়ার মতো খবর নয় কিছু । কিন্তু অপর্ণার চোখে পড়েছে । এবং তার পর থেকেই ভিতরে ভিতরে নিঃশব্দ কাটাছেঁড়া চলেছে একটা ।

একজন বললেন, অপর্ণা দেবী কি আজ অসুস্থ নাকি...কেমন যেন আনমনা দেখছি আপনাকে ?

হেসে জবাব দিল, অসুস্থ তো বটেই, নইলে এমন জায়গায় এসে পড়েছি ।

ছদ্ম-ত্রাসে প্রশ্ন-কর্তা চক্ষুবিস্ফারিত করে বিব্রত ভাবটুকু চাপা দিলেন । যশস্বিনী অভিনেত্রীর সুপরিচিত মেজাজ আজ শুধু দেমাক বলেই প্রতীয়মান হল অন্যান্য অভিনেত্রীদের চোখে ।

অনুযোগের আড়ালে ভক্তি জ্ঞাপন করলেন আর-একজন ।—আপনি পরদায় যেমন বাইরেও তেমনি, একটা এই কি বলে—ঝকঝকে ছুরি হাতে করেই আছেন যেন !

আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করলেন ক্যামেরাম্যান্ কাপুর । আপনার 'অনার'এ আজকের পার্টি, ছুরি হাতে থাকলেও ভয় করিনে—আমরা গলা বাড়িয়ে দেব—আওয়ার থ্রোট্স্ অ্যাট্ ইওর ডিস্পোজাল্ ।

সম্মিলিত হাস্যধ্বনির মাঝখানেই অপর্ণা উঠে দাঁড়াল । দেশাই এগিয়ে এলেন, এরই মধ্যে যাবেন ?

হ্যাঁ, কাজ আছে ।

সকলের উদ্দেশে ছোট নমস্কার করে বাইরে এলো সে । মণিময় অনুসরণ করল তাকে । জিজ্ঞাসা করল, সত্যিই যাবেন কোথায় ?

বললাম তো কাজ আছে ।

আমি আসব সঙ্গে ?

আসবেন ? হাসল অল্প একটু, আচ্ছা আসুন ।

অপর্ণার নির্দেশমতো একটা হাসপাতালের সামনে ড্রাইভার গাড়ি থামাল । নামল তারা । মণিময় বিস্মিত । এখানে কোথায় ?

ডাঃ চন্দ্র অসুস্থ, ল্যাবরেটারিতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল—তাঁকে দেখতে ।

মণিময় দাঁড়িয়ে পড়ল স্থাণুর মতো । জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট ঘষে নিল বারকতক ।

অপর্ণা হাসছে তেমনি নির্মম হাসি । মাথা নিচু করে দ্রুত প্রস্থান করল মণিময় ।

নিরালা কেবিনে চন্দ্র শুয়ে আছেন । চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা । অপর্ণার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল কেমন । আস্তে আস্তে কাছে এসে বসল ।

কে, সরমা ?

সাড়া নেই ।

এত তাড়াতাড়ি এলে আজ ?

সাড়া নেই ।

হাত বাড়িয়ে চন্দ্র তুলে নিলেন অপর্ণার হাত । গায়ে কাঁধে হাত দিয়ে অনুভব করতে চাইলেন কি যেন । উত্তেজনায় উঠে বসলেন পরক্ষণে । দু'হাতে চোখের ব্যাণ্ডেজ টেনে খুলতে গিয়েও থেমে গেলেন ।

কিছুক্ষণ...।

আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লেন আবার । খুব নিস্পৃহ মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে আছি তুমি কি করে জানলে ?

অপর্ণা জবাব দিল, খবরের কাগজে দেখলাম ।

আরো সহজ হতে চেষ্টা করলেন চন্দ্র । বললেন, কাগজেও বেরিয়েছে বুঝি ...দেখো তো কাণ্ড, সামান্য লেগেছে, দুদিনেই সেরে যাবে ।

মনে মনে মস্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অপর্ণা । জিজ্ঞাসা করল, কি করে লাগল ?

চন্দ্র জবাব এড়িয়ে গেলেন । বললেন, কাজ করতে গেলে এমন একটু-আধটু হয়, ও কিছু নয় ।

সত্যি কথা বললেন না ডাঃ চন্দ্র । কি হয়েছে জানেন । কি হতে পারে চোখের অবস্থা, তাও জানেন । অন্তত অনুমান করতে পারেন । কিন্তু সে কথা শুনিয়ে অপর্ণাকে কাছে টানতে চান না তিনি । সুস্থ জীবনে যা হয় নি, আজ ওর অনুকম্পা দিয়ে সে ফাঁকটাকে ভরে তুলতে চান না ।

দুর্ঘটনা তেমন কিছু নয় জেনে অপর্ণা আশ্বস্ত হয়েছে বটে । কিন্তু নিস্পৃহ দু'চার কথায় অসুস্থতার প্রসঙ্গ এড়ানোর চেষ্টাটাও লক্ষ্য করছে সেইসঙ্গে । যেন পরিচিতি কেউ একজন দেখতে এসেছে তাঁকে । যেটুকু না বললে নয়, সেটুকুই বলা ।

একটু থেমে নিরুত্তাপ কণ্ঠে চন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, এ ক'টা দিন কোথায় ছিলে ?

অপর্ণা জবাব দিল না । চুপচাপ চেয়ে রইল ।

সেটা উপলব্ধি করেই চন্দ্র ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন একটু । তিনি দেখতে পাচ্ছেন না । চোখে ব্যাণ্ডেজ । কিন্তু অপর্ণাকে দেখতে চাইছেন তিনি । খুব ভালো করে দেখে নিতে চাইছেন । তার বদলে অপর্ণা দেখছে তাঁকে । হয়তো খুঁটিয়ে দেখছে । আর যে ঝড় বয়ে গেল এ ক'টা দিন, তার আভাস পাচ্ছে । প্রচ্ছন্ন ক্ষোভে বললেন, অ্যাকসিডেণ্ট যেমনই হোক, তোমাকে আমি ঠিক আশা করি নি অপর্ণা ।

দুই-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অপর্ণা শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, চলে যাব ?

অনুমানে তার দিকে মুখ ফেরালেন চন্দ্র । কণ্ঠস্বর থেকেই কিছু যেন উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলেন ।—বোসো । অনেকক্ষণ বাদে আবার বললেন, দোষ তোমার নয়, দোষ আমারই ।

অধর-প্রান্তে দুটো দাঁতের দাগ পড়ে যায় অপর্ণার ।

দোরগোড়া থেকে তার অলক্ষ্যে সরমা নিঃশব্দে সরে গেল ।

চন্দ্র হঠাৎ বললেন, কিন্তু তাহলেও তোমার পক্ষে আর কি ফিরে আসা সম্ভব নয় ?

অপর্ণা নিরুত্তর ।

আসবে ? শয্যার ধারে ঝুঁকে এলেন তিনি ।

তার যাওয়াটা বড় করে দেখেছেন বলেই আজ এ প্রশ্ন । মৃদু কণ্ঠে অপর্ণা ফিরে জিজ্ঞাসা

করল, ক'টা দিন আমি ছিলাম না তোমার সঙ্গে, কেউ জানে ?

শোনামাত্র চন্দ্রর বিব্রত ভাবটুকু গোপন থাকল না আর। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা চোখের ওপর একটা হাত রাখলেন। মুখের কাছটা বিবর্ণ দেখাচ্ছে। অস্ফুট জবাব দিলেন, জানে...। কি একটা দুর্বলতা যেন ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন পরমুহূর্তে। আরো জোর দিয়ে বললেন, সরমা জানে। তাতে কী ?

সাড়াশব্দ নেই। তাঁর অসহিষ্ণুতা উপলব্ধি করেও অপর্ণা চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, কিছু না। এর পরে আমার ফিরে আসাটাই হয়তো সবচেয়ে বড় দুঃখের কারণ হবে তোমার। এসব কথা এখন থাক, তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠো তুমি...তোমার কাজ আছে, সাধনা আছে, সত্যিই এ-সবের কাছে আমি কিছু না।

উঠে দরজার দিকে এগোলো সে।

চন্দ্র ডাকলেন, অপর্ণা যেও না, শোনো—

অপর্ণা দাঁড়াল না, একপ্রকার জোর করেই বেরিয়ে এলো যেন। থমকে দাঁড়াল সরমাকে দেখে। পাশ কাটিয়ে চলল আবার।

দাঁড়ান।

অপর্ণা ঘুরে দাঁড়াল। দৃষ্টি বিনিময়।—বলবে কিছু ?

হ্যাঁ। চলেই যদি যাবেন, এখানে আসার তো কোনো দরকার ছিল না ?

অপর্ণা খানিক দেখল তাকে। হাসল একটু। বলল, কি জানি...। সেদিন তোমার মুখ থেকে একটা অতবড় সত্যি কথাই শুনেছিলুম ভাই, জীবনটা নাটক নয় এ কিছুতে ভুলতে পারলুম না। যাক, অসুখ শুনলে লোকে তো দেখতেও আসে...চোখের অবস্থা কেমন এখন ?

ভালো না।

অপর্ণা সচকিত হল যেন—কিন্তু উনি যে বললেন তেমন কিছু নয় ?

ঠিক বলেন নি !

তার চোখে চোখ রেখে অপর্ণা অপেক্ষা করল একটু।—ভালো নয় উনি জানেন ?

জানেন।

আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে অপর্ণা সিঁড়ির দিকে এগোলো।

স্টুডিও, নতুন বাসা, সমুদ্রের ধার—কোথাও টিকতে পারল না অপর্ণা। সমস্ত দিন অফুরন্ত যাতনায় ঘোরাঘুরি করে শিবাজী পার্কের বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। পুরানো চাকর দৌড়ে এলো শশব্যস্তে।

ভিতরে ঢুকল। দোতলায় উঠতে গিয়ে পা চলে না। সমস্ত বাড়িটার বোবা শূন্যতায় যেন একটা নিঃশব্দ হাহাকার কানে বাজছে।

হাসপাতাল থেকে অপর্ণা চলে যাবার পরেও সরমা কিছুক্ষণ বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। তারপর কেবিনের কাছে এসে দেখল, চন্দ্র বিছানায় উঠে বসেছেন। কারো প্রতীক্ষায় বসে আছেন যেন।

ভিতরে ঢুকে অপর্ণার পরিত্যক্ত চেয়ারে এসে বসল সরমা।

ঈষৎ ব্যগ্রতায় তার হাত খুঁজে পেতে সময় লাগে চন্দ্রর। কণ্ঠস্বরে সাগ্রহ অনুনয়, আমি সব ভুল শুধরে নিতে চেষ্টা করব অপর্ণা—

আমি সরমা ।

নিমেষে অসাড় নিস্পন্দ হয়ে গেলেন যেন মানুষটি । লজ্জায় বেদনায় সঙ্কুচিত সমস্ত মুখ । হাত ছেড়ে দিলেন ।

চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলতে মাসাধিক কাল সময় লাগল । লাঠি ভর করে চন্দ্র হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন একদিন । পাশে সরমা । একটু আগে তাকে ডেকে ডাক্তার জানিয়েছেন, চোখে যেটুকু দেখতে পাচ্ছেন এখনও, তাও বেশিদিন পাবেন বলে মনে হয় না । সাবধানে রাখতে হবে ।

সরমার হাত ধরে চন্দ্র গাড়িতে উঠলেন । কিছুদূরে রাস্তার উল্টোদিকে অপর্ণা দাঁড়িয়ে । আড়ালে সরে গেল ।

চন্দ্র আদেশ দিলেন, ল্যাবরেটারিতে যেতে বলো ।

সরমা জবাব দেয়, হ্যাঁ, সেখানেই থাকবেন আপনি ।

সমাদ্দারের ঘরেই ব্যবস্থা করে দিও আমার । অনেকদিন কামাই হয়ে গেল—এ ক'দিনে তোমরা কতদূর কি করলে ?

কিছুই না । কিন্তু এখন কিছুদিন বিশ্রাম দরকার আপনার ।

আমার কথা ভেবে সময় নষ্ট করতে হবে না তোমাদের ।

সরমা চমকে উঠল, হঠাৎ যেন সমাদ্দারের কণ্ঠস্বর শুনল সে ।

মেরিন্-লাইনস্এর পথে যতদূর দেখা যায় গাড়ি, অপর্ণা দাঁড়িয়ে রইল । পরে অন্যমনস্কের মতো বাড়ি ফিরল এক সময় ।

প্রযোজক দেশাই সদলবলে অপেক্ষা করছেন বাইরের ঘরে ।

গত এক মাস অপর্ণার কোন সন্ধান না পেয়ে শিবাজী পার্কে চন্দ্রর গৃহেই হানা দিয়েছেন । চাকরের মুখে সংবাদ পেলেন, অপর্ণা এখানেই আছে বরাবর ।

সমবেত বিস্ময়ে এবং কুশল প্রশ্নের জবাবে অপর্ণা মৃদুস্বরে বলল, বসুন ।

ভিতরে চলে এলো । দোতলা থেকে চেক বই এবং কলম নিয়ে নিচে নেমে এলো আবার । সকলকেই দেখে নিল একবার । আজ আর মণিময় আসে নি । দেশাইকে লক্ষ্য করে বলল, আপনারা মিছেই কষ্ট করে এসেছেন, আমি আর ছবিতে নামব না । চেয়ার টেনে বসল ।

ভাবগতিক প্রাঞ্জল ঠেকছে না দেশাই-অ্যাণ্ড্-কোম্পানির । তবু মুখভাবে মনে হল এমন কথা এই যেন প্রথম শুনলেন ।—মানে, কোন ছবিতেই প্লে করবেন না আর ? দেশাইয়ের মর্মচ্ছেদী বিস্ময় ।

না ।

কিন্তু নতুন ছবিটা অন্তত শেষ করে দিন, কন্ট্রাক্ট হয়ে আছে—

মাপ করবেন ।

চলচ্চিত্র প্রযোজক এক নিমেষেই হৃদয়ঙ্গম করলেন আবেদনে ফল হবে না । বিপরীত গাম্ভীর্যে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, মাপ করবেন বললেই আমরা শুনি কি করে, কন্ট্রাক্ট সই করেছেন, আমরা টাকা অ্যাড্‌ভান্স করেছি—।

টাকা ফেরত নিয়ে যান । অপর্ণা চেক বই টেনে নিল ।

কিন্তু ওতে তো আমাদের ক্ষতিপূরণ হবে না, এ ছবি আপনাকে শেষ করে দিতে হবে।

চেক বই বন্ধ করে অপর্ণা উঠে দাঁড়াল।—কোর্টএ যান তাহলে, সেখানে আপনাদের ক্ষতিপূরণের মীমাংসা হবে। এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে ওপরে চলে এলো।

ল্যাবরেটারি।

চন্দ্র দেখতে পান না ভালো। হাতড়ে হাতড়ে কাজ করেন। সরমা নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে এটা ওটা এগিয়ে দেয় হাতের কাছে। তিনি বিরক্ত হন, আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি, তোমার কাজ করো তুমি।

ল্যাবরেটারির চতুরাঙিনার মধ্যে চন্দ্র নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন আস্তে আস্তে। ফ্যাক্টরির সকল ব্যবস্থাও এখন বেশিরভাগই সরমার তত্ত্বাবধানসাপেক্ষ। চন্দ্র তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন সব। দিচ্ছেনও। এ কিসের প্রস্তুতি সরমা উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করে না। কিছু হবে না, কি-চ্ছু হবে না। আর কত হবে ? আর কত হতে পারে ? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যন্ত্র-চালিতের মতো কোথা দিয়ে কেটে যায় তার টের পায় না। হরিআনন্দ্ যথাসম্ভব সাহায্য করছে তাকে। ভুটা বড় চাকরি নিয়ে চলে গেছে কিছুদিন আগে। চন্দ্র আর বাধা দেন নি।

নিয়মিত ডাক্তার আসেন। চোখ দেখে যান। সে সময়টুকু সরমার বিষম এক সংকটের মধ্যে কাটে যেন, পাছে এমন কিছু শুনতে হয় যা সে শুনতে চায় না। ডাক্তার চলে গেল স্বস্তির নিঃশ্বাস পেলে। তাঁর নির্দেশমতো চালাতে চায় চন্দ্রকে। নির্দেশমতোই চলেন তিনি। আর কাজ করেন মুখ বুজে।

তাঁর দিকে চেয়ে সরমার মনে হয় নিজের ওপর নীরবে কি যেন একটা নির্মম প্রতিশোধ নিয়ে চলেছেন তিনি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। একটু আগে হরিআনন্দ্ বাড়ি চলে গেছে। বাইরে থেকে যারা আসে তাদের মধ্যে সে-ই সব থেকে আগে আসে আর সবার পরে যায়। চন্দ্র খোঁজ করলেন, রেডঅক্সনের ফাইলটা কোথায় ?

সরমা এগিয়ে এসে তাঁর ডেস্ক থেকেই টিউবটা কাছে বাড়িয়ে দিল।

ঠিক আছে যাও।

অদ্ভুত অবসাদের মতো লাগছে চন্দ্রর। মাথাও ভার তখন থেকে। এ কাজটুকু শেষ হলেই আজকের মতো ক্ষান্ত হবেন। কিন্তু হচ্ছে না শেষ। থেকে থেকে চোখের সামনে ঝাপসা দেখছেন সব কিছু।

সহসা ভয়ে ত্রাসে একেবারে যেন দিশেহারা হয়ে গেলেন তিনি। মনে হল যা হবার তার সময় হয়ে এলো। দেহের সব স্নায়ু একসঙ্গে কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। নিষ্ঠুর দৃষ্টিনাশা অন্ধকার যেন গ্রাস করতে আসছে তাঁকে। ব্যাকুলমুখে তাকাতে লাগলেন এদিক-ওদিকে। দুই চক্ষু রগড়ে নিলেন দুই হাতে। চোখ টান করে দেখতে চেষ্টা করলেন সব কিছু।

সরমা !

সরমা দৌড়ে এলো কাছে।

সরমা—

এই যে আমি, কি হয়েছে ?

হঠাৎ থতমত খেয়ে আত্মস্থ হলেন চন্দ্র সাহেব। সামলে নিলেন। যা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে তার থেকেও এই উত্তেজনাটুকুই যেন বেশি অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। বিব্রতমুখে বললেন, ঠিক যেন দেখতে পাচ্ছিনে আর...।

সরমা চেষ্টা করল একটা টুলের ওপর তাঁকে বসিয়ে দিতে। সক্ষম হল না। ডেস্ক থেকে একটা অ্যাপারেটাস মাটিতে পড়ে ভাঙল ঝনঝন শব্দে। অস্ফুট মৃদু কণ্ঠে চন্দ্র বললেন, ব্যস্ত হয়ো না...।

পায়ে পায়ে নিজের ঘরে এসে শয্যার উপর বসলেন, তিনি। নিজের অজ্ঞাতে সরমাও এলো। তারপর সম্বিৎ ফিরতে তাড়াতাড়ি টেলিফোনের রিসিভার তুলে নম্বর ডায়াল করতে লাগল।

ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছে বুঝেই চন্দ্র বাধা দিলেন, ওটা রাখো, রাত করে আর কে কি করবে, কাল সকালে দেখা যাবে। তুমি তোমার হাতের কাজ সব গুছিয়ে রেখে এসো চট করে।

পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে সরমার। টেলিফোনের রিসিভার রেখে চেয়ে রইল তাঁর দিকে। আবার তাড়া দিলেন তিনি, তাড়াতাড়ি যাও, কথা আছে।

বেরিয়ে এসে নিজের ডেস্কের সামনে সরমা বসে রইল মূর্তির মতো। কিছু ভাবছে না। ভাবতে পারছেও না। অনেকক্ষণ বাদে চন্দ্রর ডাক শুনে সচকিত হল। তাড়াতাড়ি ঘরে এলো আবাব।

কোথাও যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন চন্দ্র। বললেন, তোমার হয় নি ?

সরমা জবাব দিল না। দেখছে বিস্ফারিত নেত্রে। শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, তুমি ভয় পেয়েছ বোধহয়...আমিও হঠাৎ কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম...বেশিদিন এ ভাবে চলতে পারে না জানা কথাই।

একটা কথাও সরমার কানে ঢুকল কিনা সন্দেহ। ব্যাকুল মুখে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু এ অবস্থায় আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

বাড়ি যাব...অনেকদিন ধরেই যাব ভাবছিলাম। চিকিৎসাপত্র যা করা দরকার বাড়ি থেকেই করব, এখানে থাকলে শুধু শুধু সকলেরই কাজের ক্ষতি। একটু থেমে আবার বললেন, পুরনো চাকর আছে বাড়িতে, আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

যেন কিছুই ঘটে নি। একটা ঘরোয়া ব্যবস্থাব বদল হচ্ছে শুধু। কিন্তু সব দুর্বোধ্য লাগছে সরমার। প্রাণপণ চেষ্টায় মাথা ঠিক রাখতে চেষ্টা করল সে। খুব কাছে এসে বলল, আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন মাস্টারমশাই, আমি ডাক্তারকে খবর দিই, নয়তো আনন্দকে ডেকে পাঠাই—

এই মুহূর্তে, সকলের অনুপস্থিতিতে চলে যেতে পারাটাই সব থেকে বেশি কাম্য চন্দ্র সাহেবের। শুধু এ জন্যেই এই একটা রাতও তিনি থাকতে রাজী নন। সকলের চোখের সামনে এরকম একটা বিদায়ের প্রহসন ভাবতেও বিষম সঙ্কোচ। তা ছাড়া, ওরা বাধা দেবে, চেষ্টা করবে ধরে রাখতে। ঈষৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন চন্দ্র। বললেন, কিছু দরকার নেই, তুমি দরোয়ানকে ডাকো, ড্রাইভারকে গাড়িটা বার করতে বলুক।

বলার সঙ্গে সঙ্গে সরমা ভেঙে পড়ল সম্পূর্ণ। ব্যগ্র দুই হাতের শক্ত মুঠিতে আঁকড়ে ধরল তাঁর হাত।...কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়? এতবড় ব্যবসা নিয়ে ল্যাবরেটারি নিয়ে আমি কি করব? সমাদ্দারের কাজ কি হবে?

ওর বেদনাবিকৃত কণ্ঠস্বর কানে যেতে চন্দ্র আত্মস্থ হলেন খানিকটা। আস্তে আস্তে বললেন, আমি থেকেই বা কি করব সরমা, অক্ষম...পঙ্গু...

সরমা বাধা দিয়ে উঠল, আপনি শুধু এখানে থাকুন, আমি করব সব কাজ।

সরমার হাতের মধ্যে নিজের হাত দুটো কাঁপছে অনুভব করেই ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিলেন নিজেকে। অন্যমনস্ক খানিকক্ষণ। নিষ্প্রভ নিষ্প্রাণ সমস্ত মুখ। স্পষ্ট মৃদু কণ্ঠে ব্যক্ত করলেন সেই সর্বনাশা রাত্রির বিস্মৃতিজনিত অঘটনের আড়ালে সংগোপন কথা গোটাকতক। বললেন, আমি যেতে চাইছি সমাদ্দারের ল্যাবরেটারিতে আমারো আর জায়গা নেই বলে।—অবিনাশ মারা যাওয়ার পর আমি ভাবতুম, বিপিনের সঙ্গে সঙ্গে সেও মুছে যাক তোমার জীবন থেকে—আর যেন তোমার কোনো পিছুটান না থাকে, আর যেন তোমাকে কোনো ঘা না খেতে হয়, তোমার কাজের মধ্যেই এবারে যেন তুমি বেঁচে যেতে পারো। ...কিন্তু তা নয় তা সত্যি নয়!

সরমা নিস্পন্দ, কাঠ। একটা অব্যক্ত অনুভূতি চন্দ্র আস্তে আস্তে সামলে নিলেন আগে। বললেন, অপর্ণা যেদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বেরিয়েও পারলুম না। অবাক হয়ে দেখলাম, আমার ভিতরের কেউ এই যেন চেয়েছিল—দেখলাম, তুমি বাঁচবে বলে নয়, সমাদ্দারের ল্যাবরেটারির জন্যেও নয়—আমিই তোমাকে আগলে বসে আছি।

একান্ত সান্নিধ্যে মুখের ওপর একটা তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করল সরমা। চেয়ে আছে বিভ্রান্ত, বিমূঢ় নেত্রে।

একটা দম নিয়ে তিনি আবার বললেন, সেই জন্যেই কাজে এসেও অন্যমনস্ক হয়েছিলাম সেদিন—এব আগে আমি আমার ভিতরটাকে এমন করে আর কখনো দেখি নি সরমা। কিন্তু অপর্ণা দেখেছিল—অপর্ণা চিনেছিল। লাঠি হাতে দরজার কাছে এগিয়ে তিনি হাঁক দিলেন, দারোয়ান!

দারোয়ান দৌড়ে এলো।

ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলো, আর আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে চলো।

লাঠি ভর করে ল্যাবরেটারির বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বড় বড় দু-ফোঁটা জল টলমল করছে ক্ষীণদৃষ্টি দুই চোখে।

বহুক্ষণ বাদে যেন হুঁশ ফেরে সরমার।

চন্দ্র চলে গেছেন।

অসংবৃত পায়ে সরমা ঘোরাঘুরি করতে লাগল হলের এ মাথা থেকে ও মাথা। হাতের ধাক্কায় কতকগুলি কাচের সরঞ্জাম ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল তছনছ হয়ে। সরমা থমকে দাঁড়াল। ...ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার করে দেবে সব কিছু?

সভয়ে সরে গেল সেখান থেকে। সমাদ্দারের ঘরে কাছাকাছি আসতে পা আড়ষ্ট। তাঁর উৎক্ষিপ্ত অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে।—গো টু ইওর ওয়ার্ক, ডোণ্ট্ ওয়েস্ট টাইম্

প্লিজ্— !

সামনের ডেস্ক্-এ মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠল সরমা । সে পারবে না, পারবে না, পারবে না ।

চমকে উঠল । নিশুতি রাতে এতবড় ল্যাবরেটারির নিঝুম শূন্যতা সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলবে বুঝি । দ্রুত ওপরে উঠে এলো নিজের ঘরে । বসল বিছানায় । ধড়ফড় করছে বুকের ভিতরটা ।

দেয়ালে টাঙানো অবিনাশের ফোটোর দিকে চোখ পড়তে তাড়াতাড়ি নামিয়ে আনল সেটা । হোক ফোটো, তবু সান্নিধ্য পেতে চায় কারো । অবিনাশের ওই দুটি চোখ বুঝি এখনো সান্ত্বনা দিতে পারে তাকে ।

আকুল আগ্রহে তাকালো সরমা । নীরব জিজ্ঞাসার উদ্বেলিত বক্ষস্থল । কি করবে সে ?

ফিরিয়ে আনবে চন্দ্রকে ?

আনবে ফিরিয়ে ?

আনবে ?

সহসা সমস্ত দেহে ঝাঁকুনি লাগে কিসের । জ্বালা করে আসে দু'চোখ । দুর্বলতা অপসৃত । এইমাত্র বিদায় নিয়ে গেলেন যে মানুষটি, আনবে তাঁকে ফিরিয়ে ?

সে সমাজ মানে না, সংস্কার মানে না, আনবে...?

তিমির-তৃষ্ণায় সিরসির করে ওঠে সমস্ত দেহ । দৃপ্ত, ঋজু, কঠিন । চকিতে ফোটোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আবার ।

অন্যমনস্ক...।

ভোর হল । ফোটো টাঙিয়ে রাখল যথাস্থানে । বসন সংবৃত করে শান্ত মুখে রওনা হল চন্দ্রর বাড়ির দিকে ।

কারো সাড়া নেই । দোতলায় উঠল ।

ঘরের দিকে চেয়ে পা থেমে গেল হঠাৎ ।

চন্দ্রর বুকে মুখ গুঁজে পড়ে আছে অপর্ণা । অপরিসীম স্নেহে তিনি পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন তাকে ।

নিঃশব্দে ফিরে এলো ।

মেরিন্-লাইনস্ ।

শয্যায় বসল আবার ।...জীবন-পথে কর্ম-পথে একা সর্বত্র ।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যায় । চমক ভাঙে এক সময় । হরিআনন্দ্ সামনে দাঁড়িয়ে ।

কী ?

কাজে আসবে না ?

হাসবে না কাঁদবে সরমা ! কাজে ডাকছে তাকে । কিন্তু শেষপর্যন্ত হরিআনন্দ্ ও থাকবে কি ! কাউকে তো ধরে রাখতে পারল না । চেয়ে আছে নির্নিমেষে ।

আসব । চন্দ্র সাহেবের চোখের অবস্থা খারাপ, কাল রাতে বাড়ি চলে গেছেন তিনি, আর আসবেন না, শুনেছ ?

হরিআনন্দ্ নিরুত্তর ! দরোয়ানের মুখে শুনেছে কিছু ! একটু আগে টেলিফোনও করেছিল চন্দ্রর বাড়িতে ।

তুমিও যদি থাকতে না চাও আর, সময় নষ্ট কোরো না । ভুটা ডেকেছিল না ?

খানিক চুপ করে থেকে হরিআনন্দ্ জবাব দিল, তুমি না তাড়ালে এখান থেকে যাবার ইচ্ছে নেই আমার ।

সরমা অবাক । কই কাউকে তো তাড়ায় নি সে । তবু সবাই তো গেল । বিপিন অবিনাশ মণ্টু চন্দ্র...

চেয়ে আছে বোবা চোখে । হঠাৎ ইচ্ছে হল অত্যন্ত সাধারণ দুটো কথা বলে ওর সঙ্গে । নিষ্প্রয়োজনের কথা । কিন্তু পারবে কি... । চেয়েই আছে তেমনি ।

বাড়িতে তোমার কে আছে আনন্দ ?

হরিআনন্দ বুঝে উঠল না প্রশ্নটা ।

বউ আছে ?

আছে ।

ছেলে ?

আছে ।

বাঃ ! চেষ্টা করলে সরমা হাসতেও পারে এবার । কিন্তু মস্তিষ্কের বিকার ঘটল কিনা ভাবছে মানুষটা । তাড়াতাড়ি বলল, আচ্ছা তুমি নিচে যাও, আমি আসছি— ।

মুখে চোখে জল দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশবাস সুবিন্যস্ত করে নিল । নিচে নেমে এলো তারপর । ল্যাবরেটারির অপর প্রান্ত পর্যন্ত সব ক'টি মানুষকে দেখল একবার । যে যার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে । বিগত রাত্রির ঘটনা অবিদিত নয় কারো ।

সরমা এসে দাঁড়াল নিজের জায়গায় । বার্নার ধরাল শান্ত মুখে । পরে ফিরে তাকাল আবার । শান্ত অনুচ্চ-কণ্ঠে বলল, তোমরা—যারা কাজ করতে চাও কাজ করো, সময় নষ্ট কোরো না ।

সূর্য-মন্ত্রের দীক্ষা শুরু সরমার বিজ্ঞানী জীবনে । আলো দেবে, জ্বলবেও । বিরাম নেই বিশ্রাম নেই, শুভ্র ভয়াবহ একটানা গতি ।

বিপিন চৌধুরীর মৃত্যুর জ্বালা জুড়ায় নি, জুড়াবে না । অবিনাশের মৃত্যুর স্তব্ধতা মিলায় নি, মিলাবেও না । মণ্টুর দীর্ঘনিঃশ্বাস কানে বাজছে, বাজবেও । চন্দ্রর বেদনা-করুণ মর্মদাহ ভোলে নি, ভুলবেও না ।

কিন্তু সব নিয়েই আবার যখন সে উঠে দাঁড়াল আর থামবেও না ।

দশ বছরের ব্যবধানে আজ যারা দেখবে ওকে কতটুকু দেখবে ওর ?

সরমা ব্যানার্জী বিজ্ঞানী ।

জ্ঞানীর আসর, বৈজ্ঞানিকের আসর সম্মান জানাবেন তাকে ।

সেদিন সমাদ্দারের ক্লাসে যে মেয়েটি হাসছিল মিটিমিটি আজ তার সঙ্গে ওর তফাত আছে কোনো ?

থাকলেও সে কতটুকু ?

শান্ত অবকাশে, চৈত্র-সন্ধ্যার নিভৃতে, বার বার জল ভরে আসে দুই চোখ ছাপিয়ে। ব্যথায় টনটন করে ওঠে বুকের ভেতরটা। মেরিন্-লাইনসএ সমাদ্দারের তিন মহল অট্টালিকার সরমা ব্যানার্জীকে জানে সবাই। প্যারেলের সুসমৃদ্ধ ফ্যাক্টরির মহিলা-সর্বাধিনায়িকা সরমা ব্যানার্জীকে জানে সবাই। কিন্তু বিগত-যুগের সেই সবমাকে খুঁজে বার করবে এমন নেই কেউ। বিপিন চৌধুরী অবিনাশ মণ্টু ডাঃ চন্দ্র—কেউ না। সব ক'টি মানুষ তাদেব শিখা রেখে গেছে ওর আজকেব এই আলো-করা দীপে।

তাকে যেতে হবে জ্ঞানীর আসরে, সেখানে ওর মুখের দুটি কথা শোনার আগ্রহে ব্যগ্র উন্মুখ সকলে। তাঁদের জানা নেই, এক ছোট্ট অসচ্ছল সাধারণ ঘরের মেয়েই আজ খবরের কাগজের সরমা ব্যানার্জী। এত লোকের সামনে পাদু'টো তার কাঁপবে থরথর করে, কথা আসবে না মুখে। সেখানে অবিনাশ নেই দাঁড়িয়ে যার নীরব দুটি চোখের ওপর ভরসা করে কত বাধা উত্তীর্ণ হয়ে আজকেব দিনটিতে এসে পৌঁছল। নিঃস্বার্থ, অনাদৃত মানুষ—সকলেব বড় দার্শনিক তার জীবনে।

আব নেই মোহিনী চন্দ্র। তাঁর চোখের অন্ধকার অপর্ণা দূর কবতে পারল কি ?

কিন্তু তবু যেতে হবে। হবিআনন্দ্ তাড়া দিয়ে গেল এইমাত্র।

এই তো একটানা ঘুমিযে উঠল বাবো-ঘণ্টা। এমনি কেটে যেতে পাবত না বাকি জীবনটা ? বাঁচত। অবিনাশকে দেখল না যাবা, চন্দ্রকে জানল না যারা, মণ্টুকে চিনল না যাবা, কি হবে তাদের কাছে অকাল মৃত্যুর থিওবি নিয়ে বক্তৃতা কবে। ওর আড়ালে কত চোখের জল, কত মৃত্যুব স্তব্ধতা, সে তো প্রকাশ কববাব নয় কাবো কাছে।

উঠল।

দেযালেব গাযে তেমনি টাঙানো আছে অবিনাশেব ফোটো। দাঁড়াল কাছে গিযে। অবিনাশ হাসছে ফোটোর মধ্যে। শান্ত, প্রসন্ন হাসি।

# সাত পাকে বাঁধা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র
পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

মফস্বল শহরের এক পাশ দিয়ে গঙ্গার ধার-ঘেঁষা রাস্তার এক মাথা এসে থেমেছে মেয়ে-ইস্কুলের সামনে। উঁচু বাঁধানো রাস্তা। নিচে গঙ্গা। অসতর্ক মুহূর্তে গাড়ি-ঘোড়া রাস্তা ছেড়ে যাতে নিচের দিকে না গড়ায় সেইজন্য সে-দিকটায় হাঁটু-উঁচু দেড়-হাত চওড়া বাঁধানো কার্নিস। একটু দূরে দূরে এক-একটা অতিবৃদ্ধ বট-অশ্বত্থ ডালপালা ছড়িয়ে মাঝে মাঝে গঙ্গাকে আড়াল করেছে। অন্য দিকটায় বাড়িঘর, দু-চারটে দোকানপাট, চুন-সুরকির আড়ত, আড্ডিদের মস্ত আমবাগান, কোম্পানি-আমলের মুসলমান গোরখানা, পাড়ার ক্লাব-ঘর, শর্টহ্যাণ্ড টাইপ শেখার ছোট্ট প্রতিষ্ঠান, কেশ-বাহার আর বাবু-আসুন সেলুন—ইত্যাদি।

সকাল নটা না বাজতে রাস্তাটার ভোল বদলায়। ইস্কুল-মুখী মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া পেয়ে এতক্ষণের ঝিমুনিভাব কাটিয়ে যেন সজাগ হয়ে ওঠে। সাদা লাল নীল হলদে বেগুনী ফ্রক আর শাড়ির শোভাযাত্রা শুরু হয়। কিশোরী মেয়েদের কলমুখরতায় লাল গঙ্গা আর লালচে অশ্বত্থ-বটের শান্ত উদাসীনতায় বেশ একটা ছেদ পড়ে কিছুক্ষণের জন্য।

দোতলার বারান্দায় অথবা ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে কোন কোন বাড়ির বউয়েরা খানিক দাঁড়িয়ে অলস চোখে এই প্রাণ-তারুণ্য দেখে। দত্ত স্টেশনারির প্রৌঢ় মালিক চকোলেট লজেঞ্জুস বিস্কুট ডালমুট ভরা কাচের বয়ামগুলির ওধারে এসে দাঁড়ায় চুপচাপ। বয়ামগুলি এবারে খানিকটা করে খালি হওয়ার আশা। বুড়ো মুদি মাখন শিকদার চাল ডাল তেল নুন মসলাপাতি ওজনের ফাঁকে অনেকবার অন্যমনস্ক হয়ে সামনের হাফ-জানলার ভিতর দিয়ে মেয়েদের যাওয়া দেখে। তার নাতনী আছে একটি। ছেলে নেই। নাতনী বড় হচ্ছে। আর একটু বড় হলে এই মেয়েদের মত সাজিয়ে-গুজিয়ে ইস্কুলে পাঠানো সম্ভব হবে কিনা তাই ভাবে বোধহয়।

চুন-সুরকির আড়তের কাছে এসে রাস্তা-ঘেঁষা সুরকির স্তূপের মধ্যে জুতোসুদ্ধ পা ঢুকিয়ে দেয় এক-একটা ফ্রকপরা মেয়ে। ইস্কুলে পৌঁছে পা ধোয়ার একটা কর্তব্য পালন করতে পারবে। তাদের দেখাদেখি আবার আরো ছোট এক-আধজন হয়তো পা ঢুকিয়ে দেয় চুনের ঢিপির মধ্যেই। অন্যেরা শাসন করে তক্ষুনি, পা খেয়ে যাবে মরবি—গঙ্গার জলে ধুয়ে আয় এক্ষুনি!

টাইপ-রাইটিং স্কুলের সামনে দিয়ে যেতে যেতে মুখ দিয়ে টকটক টকটক শব্দ বার করবেই কোন না কোন একদল ছোট মেয়ে। আরো-ছোটরা অনুকরণ করে তাদের। ক্লাব-ঘর পেরুনোর সময় উঁচু ক্লাসের মেয়েরা চেষ্টা করে গম্ভীর হয় একটু। নতুবা দাড়ি-গোঁপের আভাস নির্মমভাবে নির্মূল করে, মাথার চুল পাট করে আঁচড়ে, ফর্সা ধুতি আর ফর্সা স্যাণ্ডো-গেঞ্জি পরে এই সময়টায় নিস্পৃহ গাম্ভীর্যে ক্লাব-ঘর ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ায় দু-পাঁচজন নতুন বয়সেব ছেলে। কেউ কলেজের ফার্স্ট সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, কেউ বা সেটুকুও ছেড়ে সম্প্রতি শুধুই শরীরচর্চা করছে। উঁচু ক্লাসের মেয়েরা মুখ গম্ভীর করে এদের প্রতীক্ষার মর্যাদা দেয়। কিন্তু একটু এগিয়ে এরাই আবার মুখে কাপড় গুঁজে হাসে সামনের কেশবাহার বা বাবু-আসুন সেলুনের দোর দিয়ে কাউকে ঢুকতে-বেরুতে দেখলেই। বিশেষ করে সদ্য চুল ছেঁটে কাউকে বেরুতে দেখা গেলে কম করে বিশ-তিরিশ জোড়া চপল চোখ সেই মাথাটা চড়াও করবেই।

দলে দলে মেয়েরা যায় বই বুকে করে বইয়ের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে অথবা বই ভরা

ছোট ছোট রঙ-করা টিনের বাক্স দোলাতে দোলাতে । রাস্তা জুড়ে চলে তারা । এরই মধ্যে সাইকেল-রিকশর ভেঁপু কানে এলে দু-পাশে সরে আসে । তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখে কে যায় ।

মাস-ভাড়া সাইকেল-রিকশয় ঠাসাঠাসি হয়ে চলেছে মীরাদি আর প্রভাদি । মীরা সান্যাল, প্রভা নন্দী । ওই দুজনের পক্ষে ওটুকু বসার জায়গা যথেষ্ট নয় । বড় মেয়েরা টিপ্পনী কাটে আর হাসে । ছোট মেয়েরা তাদের হাসির কারণ বুঝতে চেষ্টা করে । একটু বাদে আবার শোনা যায় সাইকেল-রিকশর ভেঁপু ।

কে আসে ?

প্রতিভাদি আর শোভাদি । প্রতিভা গাঙ্গুলী, শোভা ধর । তাদের দুজনের মাঝখানে আবার একটা ছোট মেয়েকে অন্ততঃ বেশ বসিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে । সাইকেল-রিকশ অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে দু-পাশ থেকে রাস্তার মাঝখানে জড়ো হয়ে চলতে চলতে বড় মেয়েরা এক-একদিন সেই পুরনো গবেষণায় মেতে ওঠে—উল্টে পাল্টে ঠিক করলেই তো পারে সাইকেল-রিকশ—মীরাদির সঙ্গে প্রতিভাদি, আর প্রভাদির সঙ্গে শোভাদি । নয়তো, মীরাদি আর শোভাদি আর প্রভাদি আর প্রতিভাদি । চিরাচরিত সিদ্ধান্তেই এসে থামতে হয় আবার । অর্থাৎ যার সঙ্গে যার ভাব ।

আবার কে আসে ?

ও বাবা ! মালতীদি আর স্মৃতিদি ! মালতী রায়, স্মৃতি কর । হেডমিসট্রেস আর সহকারী হেডমিসট্রেস । সর্ সর্ !

রাস্তার দু-পাশ ঘেঁষে চলে মেয়েরা । একটানা ভেঁপু বাজিয়ে সাইকেল-রিকশ তরতরিয়ে চলে যায় । সাইকেল-রিকশর চালক ও আরোহিণীদ্বয়ের মর্যাদা জানে যেন ।

এদিক থেকেই আসেন মেয়ে-স্কুলের বেশিরভাগ টিচার । শেয়ারের মাসভাড়া সাইকেল-রিকশ, সকালে নিয়ে আসে বিকেলে পৌঁছে দেয় ।

শুধু একজন ছাড়া । অর্চনা বসু ।

হেঁটে আসে, হেঁটেই ফেরে ।

পৌনে দশটা নাগাদ যে মেয়েরা ইস্কুলের কাছাকাছি এসেছে, নিজেদের অগোচরে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাবে তারা । দেখতে পেলে অস্বস্তি, না পেলে উসখুসুনি । ঠিক সময় ধরে এলে এক জায়গায় না এক জায়গায় হবেই দেখা ।

হেঁটে আসে—তবু সামনের দিকের মেয়েরা ঘাড় না ফিরিয়েই বুঝতে পারে অর্চনাদি আসছে । কারণ, যেখান দিয়ে আসে তার আশেপাশের প্রাণতারুণ্য হঠাৎ যেন থেমে যায় একটু ।

কান সচকিত করা ভেঁপু নেই সাইকেল-রিকশর, তবু সরবার পালা মেয়েদের । পথের মাঝখান থেকে ধারে সরে আসা নয়, ধারের থেকে মাঝখানে বা ও-ধারে সরে যাওয়া । যে আসছে গঙ্গার দিকের কার্নিশ দেওয়া রাস্তার ধারটা যেন তার দখলে ।

ফ্যাকাসে সাদা গায়ের রঙ । ধপধপে সাদা পোশাক । সাদা ফ্রেমের চশমা । সাদা ঘড়ির ব্যাণ্ড । পায়ে সাদা জুতো । সব মিলিয়ে এক ধরনের সাদাটে ব্যবধান । মেয়েদের আভরণে যে-সাদা রিক্ত দেখায়, তেমন নয় । যে-সাদা চোখ ধাঁধায়, প্রায় তেমনি ।

বাড়ির বারান্দায় অথবা ঘরের জানলায় বউদের অলস চাউনিতে তখন ঔৎসুক্যের আমেজ লাগে একটু। কিন্তু এ সময়টায় দেওর-ভাসুরদেরও অনেক সময় বারান্দায় বা জানলার দিকে আসতে দেখা যায় বলে তাদের সতর্ক থাকতে হয়। মুদি-দোকানের বুড়ো মাখন শিকদার দোকান ছেড়ে এক-একদিন দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। রিকশয় চেপে যে-টিচাররা ইস্কুলে যান—তাঁরা কখন যান চোখেও পড়ে না। শুধু এই একজনের সঙ্গে আগামী দিনে তার পড়ুয়া নাতনীর একটা সহৃদয় সম্পর্ক কল্পনা করে মাখন শিকদার। কল্পনা করে, আর ভয়ে ভয়ে দেখে।

দত্ত স্টেশনারির প্রৌঢ় দত্ত ঘাবড়েছিল সেই দু-বছর আগে। সে-ও এই শ্বেতবসনা টিচারটিকে দেখে যত না, তার থেকে বেশি তাঁর সন্নিধানে মেয়েদের চকিত ভাব-ভঙ্গি দেখে। এ আবার কোত্থেকে জ্বালাতে এলো কে—তাকে দেখতে মেয়েগুলো দোকানে ঢোকা দূরে থাক, দোকানের পাশ ঘেঁষেও হাঁটে না যে! অনবধানে দোকানে ঢুকে পড়ার পরে কোন মেয়ের সঙ্গে যদি চোখাচোখি হয়েছে তো সেই মেয়ের মুখ যেন চোরের মুখ। কিন্তু ক-টা দিন না যেতেই মনে মনে খুশিতে আটখানা দত্ত, স্টেশনারির দত্ত। এক এক দঙ্গল মেয়ে নিয়ে ফেরার পথে নিজেই দোকানে ঢুকেছে নতুন শিক্ষয়িত্রী। মেয়েদের চকোলেট লজেন্স ডালমুট কিনে দিয়েছে। দত্ত ঠোঙা ভরেছে আর ভেবেছে, টিচার ঠিক এমনিটিই হওয়া উচিত। তা না, নিজেরা নাক উঁচু করে যাবেন সাইকেল-রিকশয়, আর মেয়েগুলো হেঁটে মরুক! লজ্জাও করে না!

কিন্তু দু-বছর বাদে এখন আবার ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে দত্ত। বিরক্ত হয় না। শুধু অবাক হয়। কি হল হঠাৎ? দোকানটাকে যেন আর চেনেও না। মেয়েগুলোকেও না। সকালে ওই গঙ্গার দিকের কার্নিস ঘেঁষে ইস্কুলে যায় আর বিকেলে ওই দিক ঘেঁষেই ফেরে। মেয়েগুলোর হাবভাবই বা এমন বদলে গেল কেন? ভাবে, ফাঁকমতো জিজ্ঞাসা করবে কোন মেয়েকে।

সে আসছে টের পেলে চুন-সুরকির ঢিপিতে গা গলাতে আসে না একটি মেয়েও। টাইপ-স্কুলের সামনে মুখের টকটক শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। স্যাণ্ডোগেঞ্জি পরা ছেলেরা সুটসাট ঢুকে পড়ে ক্লাবঘরের মধ্যে।

দু-বছর হল অর্চনা বসু এসেছে এই মেয়ে ইস্কুলে।

তার আসার গোড়ায় কটা দিন যেমন দেখা গিয়েছিল, এখন আবার ঠিক সেই রকমটিই দেখে আসছে মেয়েরা। কোনদিকে না চেয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে সোজা হেঁটে আসে। না, ঠিক কোনদিকে না চেয়েও নয়। মাঝে মাঝে গঙ্গার পাড়ের দিকে চোখ পড়ে। জলের ধারে ছোট কোন ছেলেমেয়ে দেখলে থমকে দাঁড়ায়। ইস্কুলের মেয়ে কিনা দেখে লক্ষ্য করে। চুন-সুরকিতে পা ডুবিয়ে অনেক মেয়ে ঘটা করে পা ধুতে যেত। অনেক চঞ্চল মেয়ে আবার আসার পথে খেলার ছলে রাস্তার ধারের সেই হাঁটু-উঁচু কার্নিস থেকে দৌড়ে গঙ্গার পাড়ে নেমে যেত। জলের ধার ঘেঁষে ছুটোছুটি করতে করতে ইস্কুলের পথে এগোত। বেশি দুরন্ত দুই একটা মেয়ে অনেক সময় জুতো আর বই হাতে করে জলে পা ভিজিয়ে চলতে গিয়ে আছাড় খেয়ে ভিজে ফ্রক আর ভিজে বই-জুতো নিয়ে ইস্কুলে এসে হাজির হত।

এখন সে-সব বন্ধ হয়েছে ।

হেডমিসট্রেস বা সহকারী হেডমিসট্রেস বা অন্য কোন শিক্ষয়িত্রীর তাড়নায় নয় । অর্চনাদির ভয়ে । যাকে একবার নিষেধ করা হয়েছে, তাকে দ্বিতীয়বার নিষেধ করতে হয় না আর । ছোট বড় সব মেয়েই জানে, অর্চনাদির বিষম জলের ভয় । শুধু তার চোখে পড়ার ভয়েই এখন আর জলের দিকে পা বাড়ায় না কেউ ।

চোখে পড়লে কি হবে ?

অর্চনাদি রাগ করবে না বা কটূ কথাও বলবেন না কিছু । শুধু বলবে, জলের ধারে গেছলে কেন ? খেলার তো এত জায়গা আছে । তোমাদের দেখাদেখি আরো ছোটরাও যাবে । আর যেও না ।

এইটুকুর মুখোমুখি হতেই ঘেমে ওঠে মেয়েরা । অথচ অন্য টিচারদের গঞ্জনাও গায়ে মাখে না বড় । অর্চনাদির বেলায় কেন এমন হয় বুঝে ওঠে না ।

মেয়েদের চোখে মহিলাটির এই জল-ভীতির পিছনে অবশ্য ঘটনা আছে একটা ।

এখানে আসার পর অর্চনা বসুর প্রথম হৃদ্যতা এই ইস্কুলের মালী ভগবান তেওয়ারীর বউ সাবিত্রীর সঙ্গে । ইস্কুল-চত্বরের এক প্রান্তে জোড়া আমগাছের পিছনের আটচালাতে বউ আর দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে ভগবান তেওয়ারী । থাকে সবাই জানে । কিন্তু লক্ষ্য করে না কেউ । লক্ষ্য করার কারণ ঘটেনি কখনো ।

ঘটল অর্চনা আসার পর ।

টিফিনের সময়টুকু সহ-শিক্ষয়িত্রীদের জটলা এড়িয়ে নিরিবিলিতে কাটানোর জন্যে অর্চনা এই জোড়া আমগাছের ছায়াটুকু বেছে নিয়েছিল । বই হাতে সেখানে এসে বসত । ইস্কুল-বাড়ি থেকে অনেকটাই দূর । তাই কারো চোখেই এটা স্বাভাবিক লাগেনি খুব । মেয়েরা প্রথম প্রথম সসম্ভ্রমে দেখত দূর থেকে । টিচাররা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতেন আর মুখ টিপে হাসতেন ।

অর্চনা বই খুলে বসত বটে, কিন্তু পড়া হত না । আমগাছের পিছনের আটচালায় দুটো ছেলেমেয়ের দস্যিপনার আভাস পেত । মাঝে মাঝে ছুটোছুটি করতে দেখত তাদের । ছেলেটার বছর সাতেক হবে বয়স, মেয়েটা বছর তিনেকের । দুটোই সমান দুরন্ত । কিন্তু দুরন্তপনা ভুলে এক-একদিন বেশ কাছে দাঁড়িয়েই হাঁ করে তারা ওকেই চেয়ে চেয়ে দেখত । অর্চনা বই থেকে মুখ তুলতেই আবার ছুটে পালাত । আটচালার ভিতর থেকে ওদের মায়ের মুখখানাও মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি দিতে দেখা যেত । ইস্কুলের অত বড় বাড়ি ছেড়ে এই গাছতলায় বসে বই-পড়াটা দুর্বোধ্য লাগত বোধহয় ।

একদিন ওই ছোট মেয়েটার আচমকা আর্ত চিৎকারে বই ফেলে অর্চনাকে উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল । ছাপরা ঘরের ভিতর থেকেই আসছে শব্দটা । মেয়েটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে । এগিয়ে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে যা দেখল, চক্ষুস্থির । গোবরলেপা মাটির মেঝেতে মেয়েটাকে চিত করে ফেলে তার বুকের ওপর চেপে বসে আছে ছেলেটা । মেয়েটা যত চেঁচায় ছেলেটার তত ফূর্তি ।

ঘরের ভিতরে ঢুকে এক হ্যাঁচকায় ছেলেটাকে টেনে তুলল অর্চনা । মেয়েটার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম । ততক্ষণে ওদের মা-ও এসে ঘরে ঢুকেছে । আধভেজা কাপড়ে অনুমান,

কুয়োতলায় ছিল। অর্চনাকে বলতে হল না কিছু, নিজেই দেখেছে ছেলের কাণ্ড। ছেলেটাকে একটু কড়া সুরেই ধমক দিল অর্চনা, ওর বুকের ওপর চেপেছিলে কেন, মরে যেত যদি?

মরে যাওয়া-টাওয়া বোঝে না, কিন্তু বোনের বুকে চেপে বসার এই ফলটা ভয়ানক অপ্রত্যাশিত। হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু। আর একরত্তি মেয়েটাও ব্যথা ভুলে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অবাক-নেত্রে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। অদূরে আধ-হাত ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে ওদের মা।

অর্চনার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে গাছতলায় বই নিয়ে বসল আবার। কিন্তু বইয়ে চোখ দেবার আগেই ছেলেটার বিকট কান্নায় সচকিত হয়ে উঠল। মায়ের শাসন শুরু হয়েছে বোঝা গেল। কিন্তু এ কি রকম শাসন! মেরে ফেলবে নাকি ছেলেটাকে!

থাকতে পারল না। আবার উঠতে হল। এগোতে হল। ভগবান তেওয়ারীর বউয়ের মাথায় ঘোমটা গেছে। ফর্সা হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। দেড়হাত প্রমাণ একটা সরু ডাল দিয়ে বেশ আয়েস করে ছেলে পিটছে সে। ছেলেটা মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে আর গলা ফাটিয়ে চিৎকাব করছে। মায়ের ভ্রূক্ষেপ নেই, ওইটুকু শরীরে জায়গা বেছে বেছে জুতমতো ঘা বসাচ্ছে। বোনের বুকে চেপে বসে ছেলে কতটা অন্যায় করেছে সেটা সে নিজেও সঠিক উপলব্ধি করেনি। এমন একটা অন্যায় করেছে যার দরুন গাছতলা থেকে ওই সাদা পোশাকের মাস্টারবিবিকে উঠে আসতে হয়েছে—এটুকুই শুধু বুঝেছে। তাই শাসন তেমনি হওয়া দরকার।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠক অর্চনা।—ও কি হচ্ছে! মেরে ফেলবে নাকি ছেলেটাকে?

চমকে ফিরে তাকালো ভগবান তেওয়ারীর বউ। থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে ছড়ি হাতে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওটা ফেলো হাত থেকে!

ফেলে দিল।

ধুলোমাটি মাখা শরীরে ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। নাকের জলে চোখের জলে একাকার। কিন্তু বিস্ময়েব ধাক্কায় কাঁদতেও পারছে না, হেঁচকি তুলছে শুধু। ছোট মেয়েটা এক কোণে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে কাণ্ডকারখানা দেখছে।

মায়ের উদ্দেশে এবারে একটু নরম সুরে অর্চনা বলল, এমন করে মারে! বুঝিয়ে বলতে হয়।

ফিরে আসতে গিয়েও ছেলেটার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল। দুই এক মুহূর্তের সঙ্কোচ কাটিয়ে তার হাত ধরে ডাকল, আয় আমার সঙ্গে।

গাছতলায় এসে বসল। ওকে বলল, বোস্—।

হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছতে মুছতে ছেলেটা বসল। ভড়কেই গেছে একটু। অর্চনা বই হাতে তুলে নিল! পড়ার জন্যে নয়, এমনি। চোখ পড়ল ছেলেটার ধুলোমাখা পিঠের ওপর। দাগড়া দাগড়া দাগ পড়ে গেছে, ফুলে উঠেছে এক-এক জায়গা। অস্ফুট কাতরোক্তি করে উঠল। ওর মায়ের ওপর রাগে লাল হয়ে উঠল প্রথমে। তারপর নিজের ধপধপে সাদা রুমাল বার করে পিঠটা মুছে দিল। রুমালটা ওর হাতে দিয়ে বলল, চোখমুখ

মুছে ফেল বেশ করে, দুষ্টুমি করিস কেন ?

ছেলেটা চেয়েই আছে। তার কচি পিঠের মারের দাগগুলোর ফলাফল বুঝলে খুশি হত। ফর্সা রুমালটা ময়লা মুখে লাগাতে সঙ্কোচ। অর্চনা আবার বলল, মুছে ফেল, রুমালটা তোকে দিলুম।

চোখ মুছে একটা সম্পত্তি হাতে নিয়ে বসে থাকার মতই রুমাল হাতে করে বসে রইল ছেলেটা।

তোর নাম কি ?

গণেশ।

তোর বোনের নাম কি ?

লছমী।

তোর বাবার নাম কি ?

ভগোয়ান।

তুই পড়িস ?

মাথা নাড়ল। পড়ে না।

টিফিন শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ল। অর্চনা বই হাতে করে উঠে দাঁড়াল।—আচ্ছা, এবারে ঘরে যা।

পরদিন সকালে গ্লাস-কেসের ওধারে দাঁড়িয়ে অন্য সব দিনের মতই বিদ্যার্থিনীদের মিছিল দেখছিল দত্ত স্টেশনারির দত্ত। কলবব থামিয়ে মেয়েদের ঘন ঘন পিছন ফিরে তাকানো দেখে বুঝেছিল তিনি আসছেন। রাস্তার ও-পাশ থেকে এ-পাশ সরে আসা দেখেও বুঝেছিল, আসছেন তিনি। অর্চনা ইস্কুলে যোগ দিয়েছে তিন সপ্তাহও হয়নি তখনো। কিন্তু তার যাওয়া-আসার স্বাতন্ত্র্যটুকু মফস্বল শহরের এই পথে তিনদিনেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিন সপ্তাহ তো অনেক দিন। পসারের দিক থেকে কাল্পনিক বাধা ভেবে দত্তব মনোভাব বিরূপ তখনো।

কিন্তু দত্ত হকচকিয়ে গিয়েছিল সে-দিন।

রাস্তার ও-পার দিয়ে দোকানটা ছাড়িয়ে যাবার মুখে অর্চনা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঘুরে দোকানটাকে দেখেছিল দুই একবার। দত্ত ভেবেছিল, কোন মেয়ে ঢুকেছে কিনা তাই দেখছে। কিন্তু না। রাস্তা পেরুলো। দোকানে ঢুকলো।

টফি আর লজেন্স কিনল। ছোট ছোট কলের পুতুল কিনল দুটো। তারপর দোকানের চারদিকে দেখল একবার, আর কি নেওয়া যায়। এক কোণে ঝকঝকে ট্রাই-সাইকেলটার ওপর চোখ পড়ল। দত্তর মনে হল ওটাই চাইবে। কিন্তু কি ভেবে মত পরিবর্তন করল বোধহয়। একটা রবারের বল নিল শুধু। কাগজের বাক্সয় পুতুল আর বল প্যাক করে দিয়ে হাত কচলাতে লাগল দত্ত।

আমগাছতলায় বই খুলে বসে অনেকক্ষণ কান পেতে ছিল অর্চনা। কিন্তু পিছনের চালাঘরে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। মালীর ঘরে কাল ঢুকে পড়েছিল, ঢুকতে হয়েছিল বলে। আজ সঙ্কোচ। মালীর বউটা অবাক হবে...।

অর্চনা বসুর তাগিদ কোথায় ও জানে না। কেউ জানে না। ওই মালীর ঘরেই আজও না এসে পারবে না। না এসে পারেনি।

পিছনের গলি-পথ দিয়ে ঠিক সেই সময় ছেলেমেয়ে নিয়ে গঙ্গার ঘাট থেকে চান সেরে ফিরেছে ভগবান তেওয়ারীর বউ সাবিত্রী। সিক্ত ছাপা শাড়ি ভিজে গায়ে লেপটে আছে। টানাটানি সত্ত্বেও মনমত ঘোমটা উঠল না মাথায়। ছেলেটা একটু থতমত খেয়েই এক দৌড়ে ভিতরের উঠোনের দিকে গা-ঢাকা দিল। ভিজে প্যান্ট ছেড়ে ফেলেছিল—সামনেই সেটা আবার টেনে তোলার বিড়ম্বনা ভোগ কবতে রাজী নয়।

ছেলেমেয়ে দুটোর সঙ্গে ভাব হতে এর পর তিন দিনও লাগেনি। গাছতলায় এসে বসলেই দুটিতে এসে হাজির হয়। কোন কোন দিনে আগেই আসে। গাছতলায় ছুটোছুটি করে আর টিফিনের ঘণ্টার প্রতীক্ষা করে। অর্চনা খালি হাতে এলেও অবিশ্বাসভরে লজেন্সের ঠোঙা বা রুমালে টফির ঠোঙার সন্ধান করে। ভাইবোনের রেষারেষিও কম নয়। ছেলের জন্যে বই-শ্লেট আনার ফলে মেয়ের জন্যেও আনতে হয় আর এক দফা। টিফিনের এই এক ঘণ্টার মধ্যে সামনে বসে একটু পড়াশোনাও করতে হয় গণেশচন্দ্রকে।

সাবিত্রীর লজ্জা কমেছে। দেখলেই আর ঘোমটা টানে না এখন। তবে তার সঙ্গে দেখা বড় হয় না। শালপাতায় করে মাঝে মাঝে আমের আচার, লেবুর আচার, লঙ্কার আচাব পাঠায় আমগাছতলায়। আর অবাক হয়ে এই অদ্ভুত শিক্ষয়িত্রীর কথা ভাবে। আট বছর ধরে সংসার পেতে বসেছে এখানে। এমন তো কখনো দেখেনি।

আমগাছতলার ব্যাপারটা ইস্কুলের মেয়েরা প্রথম প্রথম দেখেছে দূর থেকে। তারপর সহ-শিক্ষয়িত্রীরা দেখেছেন। ভগবান মালীর পরিবারের সঙ্গে অর্চনা বসুর হৃদ্যতা বেশ কৌতুকের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের কাছে। তবে, মেয়েদের অর্চনাদির সম্বন্ধে শুধু কৌতূহলই বেড়েছে। অর্চনাদি ছেলেমেয়ে ভালবাসে কত, এ কয় মাসে সেটা তারা নিজেদের দিয়েই বুঝেছে। তাঁর এই ধপধপে সাদা সাজসজ্জা সত্ত্বেও মেয়েদের সঙ্গে এমন সাদাটে ব্যবধান গড়ে ওঠেনি তখনো। বিশেষ করে খুব ছোট মেয়েদের সঙ্গে। ইস্কুলেব মধ্যেই খপ করে এক-একটা ফুটফুটে ছোট মেয়েকে কোলে কাঁধে তুলে নেয়। ক্লাসের মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়েকে টেনে কোলে বসিয়েই হয়তো ক্লাসের পড়া শুরু করে দেয়। ছোটবড় দু-পাঁচটা মেয়েকে তো বোজই বাড়ি নিয়ে যায়। চকোলেট দেয়, লজেন্স দেয়, বিস্কুট দেয়।

...কিন্তু তা বলে মালীর ছেলেমেয়ে!

অর্চনা বসুর রকম-সকম দেখে প্রথম থেকেই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন অন্য টিচাররা। নীরব বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছেন তাঁরা। অন্তরঙ্গ হতেও চেষ্টা করেছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু তাঁদের ভিতরের কৌতূহল বড় হয়ে উঠেছিল বলেই হয়তো বন্ধুত্ব জমেনি। উল্টে বিচ্ছিন্নতাই এসেছে এক ধরনের। নিজেদের মধ্যে অনেক জটলা করেছেন এই নবাগতাকে নিয়ে। চেহারা-পত্র, চালচলন, পুওর ফাণ্ড-এ চাঁদা দেওয়ার বহর দেখে তো বড়লোকের মেয়ে বলে মনে হয়। বড়লোক না হোক, নামজাদা লোকের মেয়ে যে সেটা এখন সবাই জানে। এম. এ. পাস। দেখতে সুশ্রী। শুধু সুশ্রী নয়, বেশ সুন্দর। কিন্তু বয়েস ঠিক বোঝা না গেলেও খুব কম তো হবে না বোধহয়। বিয়ে হয়নি কেন? আড়ালে কানাকানি করেন তাঁরা, হাসাহাসি করেন। মেয়েদের নিয়ে এসব কী কাণ্ড!

শেষে এই মালীর ছেলেমেয়ে নিয়ে । বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কি !

সংস্কৃতর টিচার প্রতিভা গাঙ্গুলীর সঙ্গে বেশি ভাব বিজ্ঞানের টিচার শোভা ধরের । মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী শোভা ধর—পড়ান বিজ্ঞান । সাইকেল-রিকশয় ফিরতি পথে সঙ্গোপনে বলেন প্রতিভা গাঙ্গুলিকে ।—আসলে এটা একটা রোগ । আমি বইয়ে পড়েছি । মনের রোগ । ওই ছত্রী মালীটাকে লক্ষ্য করে দেখেছ ? ছাঁদ-ছিরি আছে—

বুঝতে সময় লেগেছিল সংস্কৃতর টিচার প্রতিভা গাঙ্গুলির । বুঁঝে একবারে হাঁ করে ফেলেছিলেন তার পর । বিস্ময়াতিশয্যে ফিসফিস করে বলেছেন, তা যদি হবে তাহলে কল্যাণীদির ওই ভাইকে আমল দিচ্ছে না কেন ? অমন সুন্দর চেহারা, অমন শিক্ষিত ভদ্রলোক, তার ওপর সেক্রেটারির ভাইপো...

তাহলে আর রোগ বলছি কেন । বান্ধবীর সংশয়ে ঈষৎ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন শোভা ধর—রোগ হলে ওই রকমই হয় । আমি পড়েছি ।

বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া সত্ত্বেও ঠিক যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি প্রতিভা গাঙ্গুলি । তবে প্রতিবাদ করতেও ভরসা হয়নি আর । মনোবিজ্ঞান-পড়া বান্ধবীকেই রোগে ধরেছে কি না, আড়চোখে চেয়ে চেয়ে সেই খটকাও লেগেছিল সংস্কৃতর টিচার প্রতিভা গাঙ্গুলির মনে ।

আরো দেড় বছর কেটেছিল এইভাবে । তার পর সেই অঘটন ।

ইস্কুলের পিছনেই গঙ্গার বাঁধানো ঘাট । বাইরের অনেকেই চান করে সেখানে । বিশেষ করে আশেপাশের খড়ো ঘরের মেয়ে-পুরুষেরা । দুপুরে টিফিনের সময় ইস্কুলের ছোট মেয়েদের খেলার আর বড় মেয়েদের বসার জায়গা ওই ঘাট ।

ঘাটের দু-পাশের উঁচু উঁচু ধাপগুলোর ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা-নামা করে ছোট মেয়েরা । শীতকালে জল অনেকটা নিচে থাকে । কিন্তু বর্ষায় ওই সিঁড়ির অর্ধেকটা তো ডোবেই, উঁচু ধাপগুলোরও দুদিক ছাপিয়ে জল উঠে আছে ।

এই গেল-বর্ষায় এক দুপুরে ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘাটে চান করতে এসেছিল ভগবান তেওয়ারীর বউ সাবিত্রী ।

রোজ দুপুরেই আসে । সেদিনও এসেছিল ।

ছাপা শাড়ির আট হাত ঘোমটা টেনে পাকলে চান করাচ্ছিল লছমীকে । ছেলেটা নতুন সাঁতার শিখেছে, তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া ভার ।

সেই দুপুরে বর্ষার ভরা গাঙের বিষম স্রোত আট বছরের ছেলেটাকে টেনে নিয়ে গেল ।

তার মায়ের বুক-ফাটা কান্নায় আর চিৎকারে গোটা ইস্কুলটাই ভেঙে পড়েছিল এই ঘাটে । কোথা থেকে কত লোক জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঠিক নেই ।

গণেশকে তোলা গিয়েছিল অনেক পরে । অনেক দূরে । নিষ্প্রাণ কচি দেহ আপনি ভেসে উঠেছিল ।

এদিকে ঘাট থেকে নড়ানো যায়নি সাবিত্রীকে । ঘাটের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদছিল ।

তখন অনেকেই লক্ষ্য করেছিল, ওই শোকার্ত মায়ের দিকে চেয়ে দুই গাল বেড়ে নিঃশব্দে ধারা নেমেছে আর একজনেরও ।

সেদিন আর ক্লাস নিতে পারেনি অর্চনা বসু ।

তার পরদিন থেকে টিফিনের সময় তাঁকে আর সেই আমতলায় গিয়েও বসতে দেখেনি কেউ ।

এর পর গঙ্গার দিকে যতবার চোখ গেছে ততবার যেন শিউরে শিউরে উঠছে অর্চনা। বর্ষার লাল জলে শিশুদেহগ্রাসী লালসার বিভীষিকা দেখেছে ।

...মেয়েরা দৌড়োদৌড়ি করে, ছুটোছুটি করে ওই ধাপগুলোর ওপর । ফসকে বা টাল সামলাতে না পেরে একবার ও-পাশে পড়লে—

আতঙ্কে অস্থির হয়ে অর্চনা দৌড়ে গেছে হেডমিসট্রেসের কাছে । টিফিনে মেয়েদের ঘাটে যাওয়া বন্ধ করতে হবে । বড় মেয়েরা গেলে ছোট মেয়েরাও যাবে—সেটা অত্যন্ত ভয়ের কথা ।

হেডমিসট্রেস অবাক । বলেন, কিন্তু ওই মালীর ছেলেটা তো চান করতে গিয়ে ডুবেছে । মেয়েদের আটকাব কেন ?

ভয়ের কি আছে আর কেন আটকানো দরকার অর্চনা বুঝিয়ে দেয় । তার সেই বোঝানোর আকৃতি দেখে মনে হবে, যেন আর একটি ছোট মেয়েকেই বোঝাচ্ছে সে ।

হেডমিসট্রেস চুপচাপ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন খানিক । পরে বলেন, আচ্ছা, আমি তাদের সাবধান করে দেব ।

কিছু বলার জন্যেই বলা । নইলে কিছুই তিনি করবেন না জানা কথা । উদারমত-পন্থিনী প্রধান শিক্ষয়িত্রী কোন কল্পিত ভয়ে মেয়েদের স্বাধীনতা খর্ব করতে রাজী নন ।

কিন্তু অর্চনা বসুর চোখে এ ভয়টা ভয়ই ।

কাজেই, যা করবার নিজেই করতে বসল । একদিন দুদিনে কাজ হল না, কিন্তু চার পাঁচ দিনের মধ্যে হল । অর্চনা বসু তো মাস্টারি করে বাধা দিতে যায়নি কোন মেয়েকে । তার নিষেধের মধ্যে অব্যক্ত অনুনয়টুকুই বাধা হয়ে উঠেছিল বড় মেয়েদের কাছে । অবশ্য একেবারেই ঘাটের মায়া ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি তারা । কিন্তু অর্চনাদির চোখে চোখ পড়তে কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেছে । অনুযোগভরা ওই ঠাণ্ডা দু-চোখের অস্বস্তি তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি । ঘাটে আসা ছেড়েছে আর নিচু ক্লাসের ছোট মেয়েদেরও আগলে রেখেছে । ফলে টিফিনের সময় ঘাট খাঁ খাঁ করে এখন ।

মেয়েরা জেনেছে অর্চনাদির জলের ভয় খুব । কিন্তু সহ-শিক্ষয়িত্রীরা মুখ টিপে হেসেছে । কানে কানে ফিস-ফিস করেছে মীরাদি আর প্রভাদি, প্রতিভাদি আর শোভাদি । বিজ্ঞানের টিচার আর মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী শোভা ধর তাঁর মত বদলেছেন একটু । রোগ ঠিকই, কিন্তু যে রোগ ভেবেছিলেন সে-রোগ নয় । ভগবান তেওয়ারীর ওই কচি ছেলেটা জলে ডোবায় কয়েকদিনের মধ্যেই মত বদলাবার মত কারণ কিছু ঘটেছিল । অর্চনা বসুর এই বাৎসল্যজনিত আতঙ্কের পিছনে অন্য কিছু আভাস পেয়েছেন সকলেই ।

বিস্ময়কর কিছুর ।

॥ ২ ॥

বড় নির্মমভাবে ধরা পড়েছে অর্চনা বসু ।

এক ডানা ভাঙা পাখি যেন ধরা পড়েছে একদল দুরন্ত অবুঝের হাতে ।

এত কাছে থেকেও একদিন যাঁরা তাঁর হদিস পাননি, দিগন্ত-ঘেঁষা নীলিমার ব্যবধান কল্পনা করেছেন ঈর্ষাতুর সম্ভ্রমে—হঠাৎ এই আবিষ্কারের বিস্ময় তাঁদের আনন্দের কারণ হবে বইকি । তাঁদের প্রগল্‌ভ কৌতূহলে একটা দুমড়নো ব্যথা খচখচিয়ে উঠলেও মৌন যাতনায় সেটা সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই । ডানা-ভাঙা পাখির মতই মুখ বুজে একপাশে সরে থাকতে চেয়েছে অর্চনা বসু । সরে থাকতে চাইছে ।

মনের নিভৃতে অতলে সারাক্ষণ আলেয়ার যে আলো জ্বলে তারই মায়ায় নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করে ফেলেছিল ।

করে ধরা পড়েছিল ।

কিন্তু সে-মায়ার প্রলোভন একদিনের নয় । গোপন প্রশ্রয়ে দিনে দিনে বুকের কাছটিতে এসে জমেছিল । ইশারায় বিভ্রান্ত করেছিল । এখানে আসার পরেও একটানা প্রায় দু-বছর যুঝেছিল অর্চনা বসু । দু-বছরের প্রত্যেকটা দিন ।

আর এই দু-বছর ধরেই তার আত্মমগ্নতার একটা প্রচ্ছন্ন দম্ভ দেখে এসেছেন অন্য সকলে । সেই প্রথম যে-দিন অর্চনা বসু পা দেয় এই মেয়ে-ইস্কুলে সে-দিন থেকেই ।

এই দু-বছরের চিত্রটি আগে আর একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার ।

সেও ছিল এক ভরা দুর্যোগের দিন ।

সকাল থেকে এক ফোঁটা আকাশ দেখা যায়নি । কালি বর্ণ মেঘ গোটা দিন বর্ষানোর পরেও পাতলা হয়নি । দুপুর থেকেই খেয়া পারাপার বন্ধ ছিল । ওপার থেকে এপারে আসতে হলে ট্রেনে ব্রীজ পার হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না ।

সকলেই ভেবেছিলেন ইন্টারভিউ আর সে-দিন হল না । যাঁদের ডাকা হয়েছে তাঁরা আসবেন কেমন করে ? তবে স্থানীয় বা আশপাশ থেকে যে দু-তিনজনকে ডাকা হয়েছে তাঁরা আসতে পারেন । হেডমিসট্রেস অবশ্য কমিটিকে, অন্যথায় সেক্রেটারিকে টেলিফোনে জানিয়েছেন ইন্টারভিউ হবে । কারণ, এই দুর্যোগ মাথায় করেও যাঁরা আসবেন তাঁদের ফেরাবেন কি বলে ?

তাঁর আগ্রহের কারণও ছিল একটু । পদ-প্রার্থিনীদের মধ্যে তাঁর এক বান্ধবী আছেন । তিনি এসেই আছেন, এবং যথাসময়ে হাজিরও দেবেন । জলের দরুণ মনে মনে তেমনি খুশি হয়েছিলেন বিজ্ঞানের টিচার শোভা ধর । ইন্টারভিউ দেবার জন্য তাঁর এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া তাঁর বাড়িতেই এসে উঠেছেন । যথাসময়ে তিনিও আসছেন ।

কোন ক্লাসেই সেদিন দু-তিনটির বেশি মেয়ে আসেনি । ছাতা সত্ত্বেও তারা ভিজে চুপসে এসেছে আর এসেই টিচারদের কাছে কড়া ধমক খেয়ে সেই অবস্থাতেই বাড়ি ফিরে গেছে । নিশ্চিন্ত মনে এবং প্রসন্ন চিত্তে টিচাররা নিজেদের ঘরে বসে জল দেখছিলেন আর জটলা করছিলেন ।

কর্মপ্রার্থিনীদের আবির্ভাব ঘটতে লাগল একে একে ।

সাতজনের মধ্যে পাঁচজন এসে গেলেন। হেডমিসট্রেস আর শোভা ধর দেখলেন, তাঁদের বান্ধবী বা আত্মীয়ার মত চালাক প্রায় সকলেই। আগে থাকতেই যে-যার আত্মীয়-পরিজনের কাছে এসে উঠেছিলেন নিশ্চয়, টিচারদের ঘরেই তাঁদের বসার ব্যবস্থা। টুকরো টুকরো আলাপ পরিচয় চলল। কে কোথা থেকে আসছেন, কোথাও কাজ করছেন কি না, ইত্যাদি। শিক্ষয়িত্রীদের সহজতায় পদপ্রার্থিনীদের সঙ্কোচ বাড়ছে বই কমছে না।

সেক্রেটারি রামতারণবাবু হেডমিসট্রেসের টেলিফোন পেলেন আবার। সাতজনের মধ্যে পাঁচজনই এসে গেছেন। অতএব যেতে হয়। বুড়ো মানুষ, চাদরমুড়ি দিয়ে আয়েশ করে গড়গড়া টানছিলেন। আর বৃষ্টিঝরা আকাশ দেখছিলেন। কিন্তু গড়গড়া ছেড়ে এ দুর্যোগে আবার বেরুতে হবে বলে বিরক্তি নেই একটুও। বরং হেডমিসট্রেসের টেলিফোন পেয়ে খুশি।...ভবতারণ গার্লস স্কুলের চাকরি, ঝড়জল মাথায় করেও আসবে বই কি সব ইন্টারভিউ দিতে। পাঁচজন এসেছে, গিয়ে হয়তো শুনবেন আর দুজন এসে গেছে।

চাকরকে ডেকে তিনি গাড়ি বের করতে বললেন।

খুশি হওয়ার কারণ আছে রামতারণবাবুর। এই ছোটখাটো উপলক্ষ থেকেই ইস্কুলের কদর বোঝা যায়। বাছাই করা কোনো টিচার উন্নতির বা ভবিষ্যতের আশায় অন্যত্র চলে গেলে বিলক্ষণ রেগে যান তিনি। তবু বছরে দু-বছরে এ রকম এক-আধজন তো যায়ই। এবারেও ইতিহাসের শিক্ষয়িত্রীটি কলেজে চাকরি পেয়ে চলে গেছেন বলেই নতুন শিক্ষয়িত্রী নিতে হচ্ছে। কিন্তু এই ইস্কুলে যোগ্য শিক্ষয়িত্রীর অভাব হয় না তা বলে। বরং একজন গেছে বা যাচ্ছে শুনলে বাড়িতে সুপারিশের হিড়িক পড়ে যায়।

গোটা শহরে একটাই মেয়ে-ইস্কুল। সমস্ত জেলায় নামডাক। মেয়েদের একটা হোস্টেল করে দিলে বাইরে থেকেও কত মেয়ে পড়তে আসত ঠিক নেই। এ-জন্যেও অনেক আবেদন নিবেদন এসেছে সেক্রেটারির কাছে। কিন্তু এমনিতেই ইস্কুল ভর-ভর্তি, বছরের গোড়ায় ভর্তি হতে এসে ফিরে যায় অর্ধেক মেয়ে—হোস্টেল খুলবেন কি! ইস্কুলের এত সুনাম শুধু শিক্ষকতা বা বাৎসরিক ফলাফলের দরুনই নয়। সরকারের থেকে এক পয়সা সাহায্য না নিয়েও সরকারি ইস্কুলের দেড়গুণ মাইনে আর কোন্ ইস্কুলের টিচার পায়? কাগজে একটি শিক্ষয়িত্রী-পদের বিজ্ঞাপনের জবাবে দরখাস্ত এসেছিল দেড়-শ। ডাকা হয়েছে সাতজনকে। নেওয়া হবে একজন।

রামতারণবাবু একেবারে মিথ্যে অনুমান করেননি। তিনি এসে পৌঁছুবার আগে সাতজন পদপ্রার্থিনীর বাকি দুজন না হোক, আর একজন এসেছিল।

অর্চনা বসু এসেছিল।

তিন দাগ কাটা একটা ঝরঝরে ঘোড়ার গাড়ি বাগান পেরিয়ে টিচার্স-রুমের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াতে সকলেই বুঝেছিলেন ঝড়-বাদলা উপেক্ষা করে আর একজন এলো ইন্টারভিউ দিতে। যে পাঁচজন এসে আছেন তাঁদের সকলেই যে যাঁর মত ওজন করে নিয়েছেন শিক্ষয়িত্রীরা। নতুন কৌতূহলে ঘোড়ার গাড়ির দিকে চোখ ফেরালেন তাঁরা।

অর্চনা বসু নামল। গায়ে কাচ-রঙের হালকা লেডিস বর্ষাতি। ভিজে সপসপ করছে। মাথা-ঢাকা সত্ত্বেও জলের ঝাপটা থেকে মুখ বা সামনের চুলের গোছা বাঁচেনি। ভাড়া মিটিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো হলঘরের দিকে।

হল জোড়া বড় টেবিলের সামনের দিকে বসেন কল্যাণীদি। ছাত্রী শিক্ষয়িত্রী সকলেরই দিদি। এমন কি হেডমিসট্রেসেরও। বয়সের দরুন নয়, বয়স বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের এধারেই হবে। রামতারণবাবুর ভাই-ঝি তিনি, ভবতারণ মিত্রের মেয়ে—যাঁর নামে এই ইস্কুল। তাড়াতাড়ি উঠে এসে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন।

আর যাঁরা ইন্টারভিউ-এর জন্য এসেছেন তাঁদের চোখে পড়ল সেটুকু। স্বার্থসংশ্লিষ্ট কেউ কিনা অনুমান করতে চেষ্টা করলেন। অন্যান্য টিচাররা জানেন, তা নয়। কিন্তু নীরব আগ্রহে ঘাড় ফিরিয়েছেন তাঁরাও।

ঘরে ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল অর্চনা বসু। বর্ষাতিটা বেজায় ভেজা গা থেকে খুলে ফেলল ওটা, কোথায় রাখা যায় ঠিক বুঝতে না পেরে ঈষৎ কুণ্ঠায় কল্যাণীদির দিকে তাকাল।

বর্ষাতি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা সাদার মায়া ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কাচ-রঙা বর্ষাতির আড়ালে এই সাদারই আভাস পাচ্ছিলেন সকলে। সেটা সরে যেতেই সাদায়-সাদায় একাকার। খুঁটিয়ে দেখলে এই সাদার পরিপাটিতে আতিশয্যটুকু বড় হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু তার বদলে একটা অভিব্যক্তি বড় হয়ে উঠল।

হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি বর্ষাতিটা নিলেন কল্যাণীদি। দরজার আড়ালে ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখলেন সেটা। হালকা আনন্দে সুশোভন কিছু বলেও বসতে পারতেন কল্যাণীদি। মহিলা সুরসিকা। চেনা-অচেনা সকলের সঙ্গেই সহজে জমিয়ে তুলতে পারেন। কিন্তু সহজ হওয়া গেল না, চেষ্টাও করলেন না। সাদরে ভিতরে এনে বসালেন শুধু।

আলাপ-সালাপ হল একটু-আধটু। আর পাঁচজনের সঙ্গে যেমন হয়েছে, প্রায় তেমনি। সে-দিক থেকেও কোন ত্রুটি চোখে পড়েনি কারো। বরং ওই বেশবাসের মতই পরিচ্ছন্ন মনে হয়েছে। তবু টিচাররা বেশ একটু ব্যবধান অনুভব করেছিল সেই প্রথম দিনেই। সেটুকুই আর ঘোচেনি। বরং বেড়েছে।

ইতিহাসের শিক্ষয়িত্রী নির্বাচনের ব্যাপারটা মোটামুটিভাবে যেন ওখান থেকেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই নির্বাচনে নীরবে অংশগ্রহণ করেছেন টিচার্সরুমের সকলেই। যাঁরা এসেছেন ইন্টারভিউ দিতে তাঁরাও। শিক্ষয়িত্রীরাও। শেষপর্যন্ত ক-জন এলো না-এলো খোঁজ করতে এসেছিলেন হেডমিসট্রেস মালতী রায়। নাম লিখে নিতে এসেছিলেন। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুই চোখও ওই একজনের মুখের ওপরে গিয়ে আটকেছিল। একে একে নাম লিখে নিয়েছেন তারপর। কিন্তু লেখার যেন আর দরকার বোধ করেননি খুব।

অনুমানে ভুল হয়নি। চাকরি অর্চনা বসুই পেয়েছে। চারজনের সিলেকশন কমিটি। সেক্রেটারি রামতারণবাবু, তাঁরই সমবয়সী অবসরপ্রাপ্ত এক প্রফেসার বন্ধু, ভাইপো নিখিলেশ—বাইরের এই তিনজন। ভিতর থেকে হেডমিসট্রেস মালতী রায়। ইন্টারভিউ-এর একরাশ দরখাস্ত যাচাই বাছাই করার দায়িত্ব ছিল হেডমিসট্রেসের ওপর। এই কর্তব্যপালনে সততার কার্পণ্য করেননি—নিজের বান্ধবী পদপ্রার্থিনী, তা সত্ত্বেও না। কিন্তু নির্বাচনের আসরে বান্ধবীর জন্য পরোক্ষে যুঝতেও ছাড়েননি তিনি। যথার্থই সেটা বান্ধবীর জন্যে কি আর কোন কারণে সঠিক বলা শক্ত। অর্চনা বসুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর প্রাধান্যে কোন ছায়া পড়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন কি না তিনি জানেন। যদি পড়েও থাকে, সেটা রূপেরও নয়,

যোগ্যতারও নয় : টিচারদের মধ্যে রূপসী তাঁর থেকে প্রায় সকলেই । অন্যদিকে, তাঁর যোগ্যতা আর কর্মতৎপরতা বিবেচনা করেই স্কুল-কমিটি নিজ-খরচায় তাঁকে বাইরে থেকে ট্রেনিং দিয়ে এনে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর আসনে পাকাপোক্তভাবে বসিয়েছেন ।

তবু একটু হয়তো অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন হেডমিসট্রেস মালতী রায় ।

সেক্রেটারি বা অন্য বৃদ্ধটির জন্যে তেমন ভাবেননি তিনি । তাঁর অমতে কিছু একটা করে বসতেন না তাঁরা । অন্তত তাঁর মতামতটা ভেবে-চিন্তে দেখতেন । কিন্তু বাধ সেধেছিল তৃতীয় লোকটি । লোকটি কেন, মালতী রায় মনে মনে ছোকরাই ভাবেন তাকে ।—নিখিলেশ । সেক্রেটারির ভাইপো, যাঁর নামে এই স্কুল তাঁর ছেলে । কল্যাণীদির বৈমাত্রেয় ভাই । কল্যাণীদির চেয়ে অনেক ছোট, বয়স তিরিশের নিচেই । এম এস্-সি পাস, সুদর্শন । বড়লোকের ছেলে হলেও উদ্যম আর কর্মঠ বলে পাঁচজনে সুখ্যাতি করে । ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিল বছর দুই, মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে এইখানেই কণ্ট্রাক্টরি ব্যবসা ফেঁদে বসেছে । এরই মধ্যে রোজগারও ভালই বলতে হবে । দিনের মধ্যে বহুবার নিজের ছোট একটা মার্কামারা হলদে গাড়িতে শহরময় চক্কর খেতে দেখা যায় তাকে । দু-তিনটে বড় বড় ফ্যাক্টারিতে মাল সরবরাহ করে—এই কাজে মোটর হাঁকিয়ে কলকাতায় আসে সপ্তাহের মধ্যে কম করে চার দিন । স্থানীয় বাড়িঘরের কোন কাজ হলে ডাক পড়বেই তার । ইস্কুলের পুরনো দালানটাকেও ঢেলে নতুন করা হয়েছে তারই পরিকল্পনায় আর তত্ত্বাবধানে । নিজের যে-কাজেই ব্যস্ত থাকুক, বাবার নামের ইস্কুলটির যে-কোন প্রয়োজনে সে এক ডাকে হাজির !

এই নিখিলেশ দত্তও সিলেকশন কমিটির একজন । সে-ই বাদ সেধেছিল । সে-রকম আশঙ্কা অবশ্য মালতী রায় আগেই করেছিলেন । অর্চনা বসুকে টিচাররুমে দেখার পরেই । কমিটির আলোচনায় তাকে নিয়ে যে সংশয়ের কথা তিনি বলেছিলেন, ছেলেটা এক কথায় সেটা নাকচ করে দিয়েছে । যেন সেটা কোন সমস্যাই নয় । অথচ অর্চনা বসুর ইণ্টারভিউ-এর আগে পর্যন্ত তার হাবভাবে বেশ আশান্বিত হয়েছিলেন মালতী রায় । একে একে যে ক-জন ইণ্টারভিউ দিয়ে গেল, তাদের সকলকেই প্রায় যোগ্য মনে করেছে নিখিল । হাবভাবে সে-রকমই বুঝেছিলেন মালতী রায় । তার বান্ধবী ইণ্টারভিউ দেবার পর তো নিয়োগের ব্যাপারটা একরকম সাব্যস্তই হয়ে গিয়েছিল । সেই ভদ্রমহিলা এম. এ. পাস, অন্য ইস্কুলে কিছুদিনের চাকরির অভিজ্ঞতাও আছে ।

সব শেষে এসেছে অর্চনা বসু । সব শেষেই ডাকা হয়েছে তাকে ।

ডাকতে পাঠিয়ে তার দরখাস্তটা সেক্রেটারির সামনে ঠেলে দিয়েছেন মালতী রায় । নিস্পৃহ মুখে বলেছেন, এঁর এমনি কোয়ালিফিকেশন হয়তো সব থেকে বেশি—কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই...তাছাড়া বেশি কোয়ালিফিকেশন হলে থাকেও না বড় ।

সেক্রেটারির এ দুর্বলতা জানেন মালতী রায় । এটুকু সম্ভাবনার কাঁটা সেকালের মানুষটির চোখে অনেক গুণ নিষ্প্রভ করে দেবার মতই । যারা কাজ ছাড়ে, উন্নতির আশাতেই ছাড়ে । কিন্তু উন্নতি মানে কি ? বিশ পঞ্চাশ একশ টাকা বাড়তি ? তারই জন্যে মেয়েগুলোর মায়া মমতা ছেড়ে হুট করে মাঝখানেই তাদের পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়ে চলে যেতে হবে ? এ রকম মন নিয়ে ইস্কুলে পড়াতে আসা কেন ? মেয়ে তৈরি করতে আসা কেন ? গুণ যতই হোক, এই ত্রুটির দিকটা বরদাস্ত করতে রাজী নন সেক্রেটারি রামতারণবাবু ।

কিন্তু অর্চনা বসু ঘরে ঢোকার সঙ্গে এ-সবই বেমালুম ভুলে গেলেন তিনি। শান্ত নম্র অভিবাদনের জবাবে বৃদ্ধটি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন শুধু। সমবয়সী প্রফেসর বন্ধুটিও। নিস্পৃহমুখে গদি-আঁটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসে ছিল নিখিলেশ। নিজের অগোচরে আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসল। যে-ভাবে বসে ছিল, সেই ভাবে বসে থাকাটা যেন অসম্মানজনক হত। এমন কি হেডমিসট্রেস মালতী রায়ও ভিতরে ভিতরে একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন—একটু আগে তিনি যে প্যাঁচ কষেছিলেন, এই সাদার ওপর একটা কালো আঁচড় ফেলার মতই সেটা যেন অশোভন মনে হতে লাগল।

দু-চার মুহূর্ত নিষ্পলক চেয়ে থেকে ওই মুখে মহাশ্বেতার শুভ্র বেদনা পুঞ্জীভূত দেখলেন যেন সেক্রেটারী রামতারণবাবু। সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, বোসো মা, বোসো।

তাঁর সামনের শূন্য চেয়ারটিতে অর্চনা বসল। মা-ডাকটা হেডমিসট্রেসের কান এড়াল না।

ইন্টারভিউ হয়ে গেল। আর সকলের যতক্ষণ লেগেছিল তার অর্ধেক সময়ও লাগেনি। সংশয় যেখানে রেখাপাত করে না সেখানে যাচাই করবেন কতক্ষণ ? সাধারণ দু-চারটে মাত্র প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেও শুধু রামতারণবাবুই করেছিলেন, আর কেউ না। দরখাস্তের উপর চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, এম. এ. পাস করেছ চার বছর আগে—এর মধ্যে আর কোথাও কাজ করেছ ?

অর্চনা মাথা নেড়ে জানিয়েছে, কিছুই করেনি।

প্রশ্ন শুনে মনে মনে একটুখানি হিসেব করে নিয়েছিল নিখিলেশ। চার বছর আগে এম. এ. পাস করলে এখন কত হতে পারে ?—ছাব্বিশ-সাতাশ ! আর কারো দরখাস্ত চোখ চেয়ে দেখেনি। বয়েস দেখার জন্য এটাই বা কাকার কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে নেয় কি করে—! কিন্তু এই বয়সে ঠিক এ রকম কেন ? ভাল করে দেখেও ঠাওর করতে পারেনি কি রকম।

রামতারণবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন, এর আগে তাহলে ছেলেমেয়ে পড়াও নি কখনো ?

না।

এরপর হেডমিসট্রেসের কথাটা মনে পড়েছিল রামতারণবাবুর। দরখাস্তের ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমার যা কোয়ালিফিকেশন কলেজে চাকরি পাওয়া তো কঠিন নয়, ইস্কুলে আসতে চাও কেন ?

ইস্কুল ভাল লাগবে মনে হয়েছে।

জবাবটুকুও ভাল লেগেছিল রামতারণবাবুর। দু-চার কথার পর তাকে বিদায় দিয়ে সকলের মনোভাব আঁচ করতে চেষ্টা করেছেন। তার পর অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করে ফেলেছেন একটা।—মেয়েটির লক্ষ্মীশ্রী আছে—

প্রফেসর বন্ধু হালকা হেসে শুধরে দিয়েছেন, সরস্বতী-শ্রী বলো—

রামতারণবাবু খুশিমুখে স্বীকার করে নিয়েছেন, তারপর সকলের উদ্দেশে প্রশ্ন করেছেন, তাহলে— ?

তাহলে যে কি, হেডমিসট্রেস অনুমান করেছেন। জবাব এড়িয়ে সমনোযোগে দরখাস্তগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন তিনি। জবাবটা এবার প্রফেসর বন্ধুর কাছ থেকেই

আসার কথা। কিন্তু তিনিও বললেন না কিছু। অতএব রামতারণবাবুই নিজের মত ব্যক্ত করে ফেললেন, আমার তো মনে হয় এই মেয়েটিকেই নেওয়া উচিত।

প্রফেসার বন্ধু সায় দিলেন, আমারও সেই রকমই মনে হয়।

মালতী রায় বললেন, উনি থাকেন যদি ওঁকেই সিলেক্ট করা উচিত, কিন্তু শেষপর্যন্ত টিঁকে থাকবেন কিনা—

নিখিলেশ চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে আবার। হেসে বলল, তাহলে আর ইন্টারভিউতে ডাকলেন কেন ?

তেমনি হেসেই জবাব দিলেন মালতী রায়, আমি দরখাস্ত বাছাই করেছি—বিবেচনার দায়িত্ব সকলের।

সুদক্ষা হেডমিসট্রেস হিসেবে তার জোর কম নয়। সেই জন্যেই সেক্রেটারির বিশেষ স্নেহের পাত্রীও তিনি। তাঁর খটকাটা একেবারেই উড়িয়ে দিতে পারেন না রামতারণবাবু। কিন্তু কথাবার্তায় মার্জিত হলেও, বলার যা নিখিলেশ খোলাখুলিই বলে। বলল, থাকবে কি থাকবে না সে আর আপনাকে লিখে পড়ে দিচ্ছে কে ?

মালতী রায় সাফ জবাব দিলেন, যাঁকেই নেওয়া হোক, লেখাপড়া করেই নেওয়া উচিত এবার থেকে--সিজনের মাঝখানে ছেড়ে গেলে বড় অসুবিধে হয়।

বিসদৃশ শোনাবে জেনেও নিখিলেশ বলেই ফেলল, হলেও ওই লেখাপড়ার কোন মানে নেই। আপনি যদি এখন স্কুল ছেড়ে কলেজে প্রিন্সিপাল হয়ে যেতে চান, লেখাপড়ার দায়ে আপনাকে আটকে রাখার কোন অর্থ হয়, না তাতে ফল ভাল হয় ? সে-কথা থাক, কাকে নেওয়া হবে সেটাই ঠিক করুন।

মনে মনে রামতারণবাবু ভাইপোর ওপর ক্ষুণ্ন হলেন একটু। আবার প্রধান শিক্ষয়িত্রীর মতেও সায় দিতে পারলেন না। ফলে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যে প্রস্তাব করে বসলেন সেটা আশা করে নি বোধহয় কেউই। বললেন, ছেড়ে গেলে অসুবিধে তো হয়ই, আবার দেখেশুনে বাছাই করে না নিয়েই বা পারা যায় কি করে।—তা এক কাজ করো তোমরা, তেমন কোয়ালিফায়েড কাউকে না পেলে একই গ্রেড-এ আমরা হায়ার স্টার্টও দিতে পারি—একে না হয় তাই দাও, মাইনেটা গোড়া থেকেই ভালো হয়ে যাওয়ার কথা না-ও ভাবতে পারে।

হেডমিসট্রেস কয়েক নিমেষ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে পরে হেসেই ফেলছিলেন, চট করে সামলে নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, আচ্ছা।

ওদিকে ইন্টারভিউ শেষ করে আবার টিচার্স-রুমেই ফিরে এসেছে অর্চনা বসু। যাবে কি করে, অঝোরে জল পড়ছে গোটা আকাশটা গুরু-গম্ভীর। স্টেশন কম করে পাঁচ মাইল। জলের দরুণ চট করে গাড়ি পাওয়াও সহজ নয়। আর এই জলে গাড়ি ডেকেই বা আনে কে !

ইন্টারভিউ-পর্ব শুরু হতেই টিচাররা বেশির ভাগ যে-যার সুবিধে মত ছুটছাট সরে পড়েছেন। কেউ গেছেন সাইকেল রিকশয়, কেউ বা আকাশের মতিগতির দিকে লক্ষ্য রেখে ছাতা ভরসা করেই বেরিয়ে পড়েছেন ! পদ-প্রার্থিনীদের আত্মীয়-স্বজনরা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসেছেন একে একে—কে কোন্ দিকে যাচ্ছেন জেনে নিয়ে কেউ কেউ তাঁদেরও সঙ্গ

নিয়েছেন ।

অর্চনা বসু ফিরে এলো যখন, টিচার্স-রুম ফাঁকা বললেই হয় । কল্যাণীদি এবং আর দুই-একজন আছেন । কল্যাণীদির দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ইণ্টারভিউ শেষ হলে কাকাই তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবেন, নয়তো বাড়ি ফিরে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন । অবশ্য কাকার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকেন না তিনি, নিজের ছোট্ট আলাদা বাসা আছে । ভাই থাকে কাকার সঙ্গে । ঝড়জল দেখলে কাকা গাড়ি পাঠাতে ভোলেন না । আর যে দু-তিনজন টিচার বসে আছেন, তাঁরাও কল্যাণীদির কাকার গাড়ির আশাতেই আছেন ।

এরই মধ্যে অর্চনা বসুকে ফিরতে দেখে কল্যাণীদি অবাক । অন্য সকলকেই এর থেকে অনেক বেশি সময় আটকে রাখা হয়েছিল । এ তো গেল আর এলো !

হয়ে গেল ?

আগের চেয়ারটিতে বসে অর্চনা মাথা নাড়ল শুধু । বাইরের দিকে চেয়ে, ফিরবে কি করে সেই সমস্যাই তখন বড় হয়ে উঠেছে । ইণ্টারভিউ প্রসঙ্গে কল্যাণীদি বা আর কারো আগ্রহ খেয়াল করল না ।

কল্যাণীদি নিরাশ হলেন একটু । ইতিহাস শিক্ষয়িত্রীর শূন্যস্থানে একেই আশা করেছিলেন তিনিও । কি জানি কেন মনে হয়েছিল একে পেলে ইস্কুলেরই লাভ আর শ্রীবৃদ্ধি । কমিটি চারজনের মধ্যে দুজনেই তাঁর আপনজন, সে-কথা আভাসে ব্যক্ত করতেও লজ্জা । সে-ভাবে নিজেকে কোনদিনই জাহির করেন না তিনি । মেয়েদের ড্রইং টিচার পরিচয়েই খুশি । এমন কি গোড়ায় গোড়ায় এখানকার হেডমিসট্রেস অনেকদিন জানতে পারেননি যে কল্যাণীদির বাবার নামেই এই ইস্কুল । আর জেনে লজ্জিতও হয়েছিলেন বড় কম নয় । কারণ সেক্রেটারির সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতে গিয়েছিলেন, মেয়েদের ভালমত ড্রইং শেখানোর জন্য পাস করা আর্টিস্ট নিয়ে আসা উচিত কি না । সেক্রেটারী বিব্রতমুখে বলেছিলেন, কেন, ও তো বড় ভাল আঁকে, বাড়িতে অনেক যত্ন করে শিখেছে—তাছাড়া ইস্কুলটার জন্যে সেই গোড়া থেকে করেছেও অনেক, ওরই বাবার ইস্কুল তো—মায়া খুব ।

হেডমিসট্রেস বিব্রত হয়েছিলেন চতুর্গুণ । আলোচনা ছেড়ে পালিয়ে আসতে পথ পাননি । মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কেউ তাঁকে জানায়নি পর্যন্ত । আর আশা করেছেন কথাটা যেন চাপা থাকে ।

কিন্তু চাপা থাকেনি । কথা-প্রসঙ্গে রামতারণবাবুই ভাইপোকে বলেছিলেন । নিখিলেশ দিদিকে ঠাট্টা করেছে, চাকরিটি যে এবারে গেল তোমার !

একগাল হেসে হেডমিসট্রেসকেই বলে এসেছেন কল্যাণীদি, এ চাকরি গেলে বাগানে জল দেবার কাজটা অন্তত দিতে হবে, ইস্কুল ছাড়তে পারব না ।---সানন্দে শিক্ষয়িত্রীদেরও না জানিয়ে পারেননি দুশ্চিন্তার খবরটা । বলেছেন, মালতীদিকে বলে এলাম চাকরি গেলে বাগানে জল দেব, হব মালাকার—এই যাঃ । মালাকর, না মালাকরী ?

এ-হেন কল্যাণীদি অর্চনা বসুর চাকরি হওয়া সম্ভব কি না স্থির করতে না পেরে নিজের অগোচরেই ছোটখাটো ইণ্টারভিউ নিয়ে ফেললেন আবার একটা হালকা আলাপের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, বি-এ-তে অনার্স ছিল আপনার ?

বাইরে থেকে চোখ ফেরাল অর্চনা । মাথা নাড়ল । ছিল না ।

তাহলে আর কেমন করে হবে চাকরি । মনে মনে ভাবছেন কল্যাণীদি । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খটকাও বাধল, তাহলে ইন্টারভিউ পেল কি করে ? দরখাস্ত বাছাই করে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়েছে, চেহারা দেখে তো ডাকা হয়নি । তাহলে এম. এ. বোধহয়...।

আপনি এম. এ. ?

এবারেও বাধা না দিয়ে অর্চনা মাথা নেড়ে জানাল, তাই । বাইরের দিকে তাকাল, চট করে জল থামার কোন সম্ভাবনা দেখছে না ।

আবারও সমস্যা কল্যাণীদির । কেমন এম. এ. ? হেডমিসট্রেসের বান্ধবীর ক্যাণ্ডিডেটটি মাঝারি এম. এ. । তার ওপর মেয়ে পড়ানোর অভিজ্ঞতা আছে ।...দু-পাঁচ মাসের অভিজ্ঞতার ভারি তো দাম ! হেডমিসট্রেস তলায় তলায় কিছু কারসাজি করলেন কি না, চকিতে সে-সংশয় জাগল ।

কিন্তু এদিকে যে কথাই বলে না, কি হল-না হল বোঝা যাবে কি করে !

অবশ্য মুখ দেখে আঁচ করা যাচ্ছে খানিকটা । কিন্তু এই ইস্কুলের চাকরির ব্যাপারে এ ধরনের নিস্পৃহতা ভাল লাগে না কল্যাণীদির ! বুঝতে যখন চেয়েছেন, না বুঝে অথবা না বুঝিয়ে ছাড়ার পাত্রীও নন মহিলা । তাঁর কৌতূহলে রাখা ঢাকা নেই । তাছাড়া বলতেও পারেন দিব্যি রসিয়ে মজিয়ে । বললেন, আমি ভাই ড্রইং টিচার এখানকার, বিদ্যেবুদ্ধি বুঝতেই পারছেন । এঁদের নাকি বি. এ. অনার্স নয়তো ভাল সেকেণ্ড ক্লাস এম. এ. চাই । আপনাকে দেখেই ভাল লেগেছে, আপনার হলে বেশ হয় । আপনি সেকেণ্ড ক্লাস তো ?

এর পরের প্রশ্নটাই হত, কেমন সেকেণ্ড ক্লাস । কিন্তু সে প্রশ্নের আর অবকাশ পেলেন না কল্যাণীদি । তাঁর কথা শুনে অর্চনা বসু মুখের দিকে চেয়ে হাসল একটু । তারপর মাথা নাড়ল, সেকেণ্ড ক্লাস নয় ।

ও হরি । কল্যাণীদির ভাবনা-চিন্তা গেল । একটু যেন সঙ্কোচও বোধ করলেন, না তুললেই হত কথাটা । তাঁর ধারণা দ্বিতীয় শ্রেণীও নয় যখন, তৃতীয় শ্রেণী ছাড়া আর কি । কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসা করেছেন তার হাসির মধ্যে যেন বিব্রত ভাব দেখলেন না একটুও । চকিতে আবারও মনে হল ! তৃতীয় শ্রেণী হলে তো ইন্টারভিউতে ডাকার কথা নয় ! বিশেষ করে দ্বিতীয় শ্রেণীর দরখাস্তের যেখানে অভাব নেই !

তাহলে ? তাহলে আর যা সেটা ভরসা করে জিজ্ঞাসা করে ওঠাও সহজ নয় । চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকেন খানিক । একটাই মাত্র শ্রেণী মানায় বটে । শেষে বলেই ফেললেন ঝপ করে, তবে কি ফার্স্ট ক্লাস নাকি ?

অর্চনা হেসেই ফেলেছিল ।

অন্য দু-তিনজন টিচার ঘুরে বসে সরাসরি নিরীক্ষণ করেছেন তাকে । আর আনন্দের উত্তেজনা কল্যাণীদির কণ্ঠস্বরে । বিস্ময়ভরা চ্যালেঞ্জ গোছের । তাহলে আপনার চাকরি হবে না কেন ?

ঈষৎ বিব্রত মুখে অর্চনা বলেছে, হবে না কেউ তো বলেননি—।

কল্যাণীদি লজ্জা পেলেন । বললেন, কেউ বলেনি অবশ্য, আমারই মনে হচ্ছিল । ইন্টারভিউ থেকে এসেই যে-ভাবে আকাশ দেখছিলেন, ভাবলাম, এখানে যা হবার হয়ে গেছে, ভালয় ভালয় বাড়ি ফিরতে পেলে বাঁচেন ।

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অর্চনা আবারও হাসল একটু। ভদ্রমহিলার ওই বয়সের সঙ্গেও যেন সরল তারুণ্যের আপস দেখল। তাঁর অভিযোগটুকুও স্বীকারই করে নিল সে, তাই তো ভাবছিলাম, এ জল শিগগির থামবে না বোধহয়—

বোধহয় কেন, আজ আর মোটেই থামবে না ? আকাশ-বার্তাটি যেন কল্যাণীর দৃষ্টি-দর্পণে—আপনি তো যাবেন কলকাতায় ?

অর্চনা মাথা নাড়ল।

তাহলে তো মুশকিল। এখানে কেউ নেই আপনার ?

না—। বলতে যাচ্ছিল, স্টেশন পর্যন্ত কেউ যদি একটা গাড়ি ডেকে দেয়—। বলা হল না। বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। এই জলে কারো পক্ষে বেরুনোও সম্ভব নয়। কালীবর্ণ আকাশের ভাববিকার নেই।

কল্যাণীদি বললেন, না-ই যদি যেতে পারেন একটা দিন থেকে যাবেন। আপনার কোন অসুবিধে হবে না, আমি ব্যবস্থা করে দেব।

ঈষৎ বিড়ম্বিত মুখে অর্চনা জানালো, না, যেতে হবে—

কল্যাণীদি ভেবে বলেননি। মনের আনন্দে বলে ফেলেছেন, এই পর্যন্ত। ফার্স্ট ক্লাস শোনার পর থেকেই ভিতরে ভিতরে দারুণ আনন্দ হচ্ছে তাঁর। অত গুণের সঙ্গে বাইরের শ্রীর-বরাবরই একটা শুকনো বিরোধ কল্পনা করে এসেছিলেন। বোধহয়, সেটা সত্যি নয় দেখেই খুশি। যেতে হবে শুনে খেয়াল হল সত্যিই থাকা চলে না। ইন্টারভিউ দিতে এসে অজানা অচেনা জায়গায় গোটা একটা রাত কাটানোর সম্ভাবনায় যে-কোন মেয়েই অথৈ জলে পড়বে। কল্যাণীদি ঘড়ির দিকে তাকালেন। সবে তিনটে। মনে হচ্ছিল সন্ধ্যে। ঢের সময় আছে, জল একেবারে না ছাড়ুক ধরবে একটু নিশ্চয়ই।

বললেন, তা হলেও আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, আপনাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা অন্তত আমি করে দিতে পারব।

মনে মনে অর্চনা নিশ্চিন্ত হল খানিকটা। নীরবে তাঁর দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল।

বেয়ারার হাত দিয়ে হিডমিসট্রেসের ঘরে কাকার কাছে চিরকুট লিখে পাঠালেন কল্যাণীদি। —জনাকতক আছি। বাড়ি পৌঁছেই গাড়িটা পাঠাও আর নিখিলকে বাড়িতে থাকতে বোলো।

গাড়িটা মস্ত একটা সাবেকী আমলের চকমিলানো দালানের আঙিনায় ঢুকে পড়ল যখন, অর্চনা তখনো জানে না কোথায় এসেছে। কল্যাণীদির আহ্বানে গাড়ি থেকে নেমে দ্বিধান্বিত চরণে তাঁকে অনুসরণ করল।

রামতারণবাবু নিজের ঘরেই বসেছিলেন। উঠে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, এসো মা এসো, জলটা তোমাকে অসুবিধেয় ফেলেছে, কিন্তু আমার লাভ হল। বোসো—।

কোথায় এসেছে জানতে পেরে অর্চনার কুণ্ঠা আরো বেড়েছিল। কিন্তু বৃদ্ধটিকেও ভাল লেগেছিল। দু-কথার পরেই ইস্কুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রথম কি ছিল, এখন কি হয়েছে —আরো কি হতে পারে। এই স্কুলের জন্য অর্চনার দরদ থাকা চাই—দুদিন বাদে হুট করে

পালালে চলবে না । এখানে বাড়ির জন্যে ভাবনা নেই, গাড়ি তিনিই দেখে দেবেন, ইত্যাদি ।

চাকরিটা যে কার হল সেটা জানানোর কথা আর খেয়ালই হয়নি ।

ওদিকে কল্যাণীদি ভিতরে ঢুকে দেখেন, নিখিলেশ হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে । মনে মনে মতলব ভেজেই ঘরে ঢুকেছেন । ভাল মন্দ যাই বলুন তিনি, ভাইটি উল্টো রাস্তা খোঁজে । তাই ঘরে ঢুকেই বললেন, আজ আর তোর কলকাতা যাওয়া নেই তো ?

জবাব এলো, যাওয়া দরকার । দেখি—

এই ঝড়জলে আর যায় না, শুয়ে থাক ।

টিপ্পনী—এ তো আর তোমার ইস্কুলমাস্টারি নয়, এর নাম খেটে খাওয়া ।

তাহলে যাচ্ছিস ?

ভাইটি বোকা নয়, কিছু একটা কলে পড়তে যাচ্ছে অনুমান করে উঠে বসল—কি মতলব ?

কল্যাণীদি হেসে ফেললেন, যাবি তো যা, ভাল সঙ্গী দিচ্ছি—জল দেখে বেচারী ঘাবড়ে গেছে । আমি আশা দিয়ে নিয়ে এলাম—

কার জন্য সুপারিশ তাও অনুমান করে নিতে দেরি হল না । তবু ইস্কুলের কর্মকর্তার গাম্ভীর্যে নিখিলেশ জিজ্ঞাসা করল, কাকে নিয়ে এলে ?

কাকে আর, যাকে তোর চাকরি দিলি ।...ভাই উচ্চবাচ্য করছে না দেখে সংশয়ের ছায়া পড়ল ।—দিয়েছিস তো, না কি ?

তুমি ড্রইং মাস্টার, ড্রইং মাস্টারের মত থাকো, তোমার অত খোঁজে দরকার কি ।

মারব চাঁটি, বল না ?

নিখিলেশ হাসতে লাগল । কল্যাণীদি নিশ্চিন্ত হয়ে টিপ্পনী কাটলেন, আমি আগেই জানি, চারজনের মধ্যে তিনজনই পুরুষ যখন, ওই মুখ দেখে সকলেই ভুলবে ।—কলকাতা না যাস তো স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আয় ।

জোর করে চা-জলখাবার খাইয়ে কল্যাণীদি অর্চনাকে ছাড়লেন আরো ঘণ্টাখানেক বাদে । ছাতা মাথায় নিজেই গাড়িতে তুলে দিলেন । কিন্তু চালকের আসনে লোকটিকে দেখে অর্চনা আবারও বিব্রত । সামনের দরজা খুলে দিয়ে কল্যাণীদি বললেন, আমার ছোট ভাই নিখিলেশ দত্ত—স্কুল-কমিটির সদস্য, সে তো ইন্টারভিউতেই দেখেছেন । উঠুন—

নমস্কার জানিয়ে অর্চনা কুণ্ঠিত মুখে উঠে বসল । চাকরির চেষ্টায় এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ-ধরনের যোগাযোগ সঙ্কোচের কারণ ।

জলের জোর কমেছে, কিন্তু থামেনি । থামার লক্ষণও নেই । গাড়ির সব ক-টা কাচ বন্ধ । কাচ বেয়ে অঝোরে জলের ধার নেমেছে । রাস্তার দু-পাশে মেঠো জমিগুলি পুকুরের মত দেখাচ্ছে । গাছপালাগুলোও একঘেয়ে বৃষ্টির তাড়নায় বিষম ক্লান্ত । অর্চনা বাইরের দিকে চেয়ে দেখছিল ।

একটানা অনেকক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে নিখিলেশই প্রথম কথা বলল ।—আজকের এই জলটা আপনাদের খুব অসুবিধেয় ফেলেছে ।

অর্চনার কুণ্ঠা একটুও কমেনি । মৃদু জবাব দিল, আপনারও খুব কষ্ট হল—

না, আমি বেরুতামই ।

নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে নিখিলেশ যথেষ্ট সচেতন । তাই চুপচাপ গাড়ি চালিয়েছে অনেকক্ষণ । চাকরিটা যে এরই হয়েছে সেটা কাকা বা দিদির মুখে নিশ্চয়ই জেনেছে । ভেবেছিল, মহিলা ইস্কুল সম্বন্ধে দু-পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করবে বা একটু অনুগ্রহ দেখাবে । ওর পদমর্যাদার আবরণ সরানো তাহলে সহজ হত । কিন্তু কথা শুরু করেও আলাপ করা সহজ হল না । পার্শ্ববর্তিনী আবারও চুপ একেবারে ।

কিন্তু অর্চনা ভাবছে অন্য কথা । ভাবছে না, মনে মনে অবাক হচ্ছে সে । আসার সময় স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়িতে এসেছিল । কিন্তু তাও এতক্ষণ লেগেছিল বলে মনে হয় না । জলের দরুন অনেকটা ঘোরাপথে চলেছে কি না বুঝছে না । আরো খানিক চুপ করে থেকে শেষে জিজ্ঞাসা করে ফেলল, স্টেশন কি অনেক দূর নাকি ?

না । স্টেশন অনেকক্ষণ ছাড়িয়েছি ।

বিস্মিত নেত্রে অর্চনা এবারে সোজাসুজি ফিরে তাকাল তার দিকে । এবারে নিখিলেশও অবাক । আমরা তো কলকাতায় যাচ্ছি, দিদি বলেনি আপনাকে ?

অর্চনা ঘাড় নাড়ল শুধু । বলেন নি । মুখ দেখেই বোঝা গেল আবারও বিব্রত হয়েছে । শুধু তাই নয়, ব্যবস্থাটাও মনঃপূত হয়নি । স্কুল-কমিটির গণ্যমান্য সদস্যের পক্ষে সেইটুকুই হজম করা শক্ত । নিখিলেশ বলল, আমাকে প্রায়ই কলকাতা যেতে হয়, আপনি অসুবিধে বোধ করেন তো এখনো স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারি, আমি অবশ্য কলকাতা যাবই— ।

এবারে অর্চনা লজ্জা পেল একটু । বলল, না, চলুন ।

কলকাতায় পৌঁছে তার নির্দেশমত বাড়ির দরজায় গাড়ি দাঁড় করাল । বাড়ির সামনের নেম-প্লেটে চোখ আটকাল নিখিলেশের । জিজ্ঞাসা করল, ডক্টর গৌরীনাথ বসু আপনার কে হন ?

দরজা খুলে অর্চনা নেমে দাঁড়িয়েছে । মৃদু জবাব দিল, বাবা । আপনি চেনেন ?

চিনি নে, তবে অনেককাল তাঁর বই মুখস্থ করতে হয়েছে ।

প্রায় নিস্পৃহ মুখেই অর্চনা জিজ্ঞাসা করল, আপনি বসবেন না একটু ?

না আজ আর বিরক্ত করব না, নমস্কার—

গাড়িতে স্টার্ট দিল । দেখতে দেখতে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল । অর্চনা কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল । সাদর অভ্যর্থনা জানালে আসত বোধহয় । কিন্তু সে-ভাবে ডাকেনি । ডাকতে চায়ওনি ।

যথা সময়ে নিয়োগপত্র এসেছে, স্কুলের কাজও শুরু করেছে । আড়াইখানা ঘরের একটা বাড়ি সেক্রেটারিই ঠিক করে দিয়েছেন ।

কিন্তু অর্চনার সেই প্রথম দিনের বিচ্ছিন্নতা ঘোচেনি । টিচাররা তো এক রকমই দেখে আসছেন তাকে । সেই ধপধপে সাদা বেশবাস আর সেই সাদাটে ব্যবধান । সহ শিক্ষয়িত্রীরা প্রথম প্রথম দলে টানতে চেষ্টা করেছেন, শেষে দেমাক ভেবে নিজেদের মধ্যে আড়ালে-আবডালে টিকাটিপ্পনী কেটেছেন । প্রতিভাদির সঙ্গে শোভাদি, আর মীরাদির সঙ্গে প্রভাদি । এখানকার মহিলাসমিতিটির সঙ্গে যোগ আছে প্রায় সকল মহিলারই । শুধু শিক্ষয়িত্রী নয়, বহু মধ্যবিত্ত এবং বড়লোকের ঘরনীরাও ছুটির দিনে সেখানে নিয়মিত আসেন এবং জটলা

করেন। কল্যাণীদি তো বলতে গেলে পাণ্ডাই একজন। অর্চনার কাছে সেখান থেকেও তলব এসেছে। অর্চনা সভ্যা হয়েছে, চাঁদাও দিয়ে আসছে নিয়মিত—কিন্তু যোগ নেই।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ করে একেবারে ছোট মেয়েদের সঙ্গে সেই ব্যবধান ঘুচে যেতে দেখা গিয়েছিল। ছুটির দিনে দলে দলে মেয়েদের পাতা পেতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোটাও প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়েছিল। এর জের সামলাতে হত প্রৌঢ় চাকর দাশুকে। বলা বাহুল্য সে খুব খুশি হত না। কলকাতায় প্রথম অর্চনাদের বাড়িতে আসে যখন, অর্চনা তখন ফ্রক পরত। এখানে অর্চনার চাকর বলতেও সে, পাচক বলতেও সে, অভিভাবক বলতেও সে-ই। বাড়তি সওদা নিতে এসে মুদী-দোকানের বুড়ো মাখন শিকদারের কাছে সে রাগে গজগজ করত এক-একদিন।—তোমরা তো ভাল বলবেই, সওদা তো আর কম বিক্রি হচ্ছে না—তা যেও একদিন নাতনীকে নিয়ে, দিদিমণির যত্ন-আত্তিটা নিজের চোখেই দেখে এসো। বাচ্চা-কাচ্চা দেখলে তেনার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, নাতনীকে শিখিয়ে পড়িয়ে তিনিই ইস্কুলের যুগ্যি করে নেবেন।

অর্চনাদির কাছে নিজেদের কদর মেয়েরাও বুঝত। তাই অসময়ে গিয়ে হাজির হতেও বাধত না। লাগোয়া বাড়ির মালা মেয়েটার বয়েস মাত্র দশ, পড়ে ক্লাস সিক্স-এ। তার দেড় বছরের থপথপে ভাইটাকে নিয়ে অর্চনাদি যা করে, দেখে ওই ছোট মেয়েরাও মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আর হাসে। দু-দিন তাকে না দেখলে দাশুকে দিয়ে ভাইসুদ্ধ মেয়েটাকে ডেকে পাঠায়। আর বাড়ির জলখাবার মনের মত না হলে মেয়েটাও ভাই-কোলে এসে হাজির হয়। একা এসেও দেখেছে, কিন্তু ভাইকে নিয়ে এলেই লাভ বেশি।

শিক্ষয়িত্রীদের পক্ষে এতটা বরদাস্ত করা সহজ নয়। অনেক সময় সামনাসামনি ঠেস দিতে ছাড়েন না তাঁরা। বিশেষ করে বিজ্ঞানের টিচার আর মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী শোভা ধর। ক্লাস শুরু হবার আগে ইস্কুলে প্রাঙ্গণে কিণ্ডারগার্টেনের বাচ্চাগুলো রোজই একদফা হুটোপাটি করে ছেকে ধরে অর্চনাকে। গল্পের বায়না করে। অর্চনার মুখে আর সে গাম্ভীর্য দেখা যায় না তখন। আদর করে কারো গাল টিপে দেয়, কারো রিবন ঠিক করে দেয়, কারো বা ঘামে-ধুলোয় জবজবে মুখে নিজের রুমাল করে মুছে দিতে দিতে বলে, খুব দুষ্টুমি করা হয়েছে বুঝি, উঁ—?

সেই সময় শোভা ধরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কিছু না কিছু বলবেনই তিনি। বলবেন, বাচ্চাগুলোর সঙ্গে আপনাকে দেখলে মনে হয় যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে ওরা। ...আরো জোরালো ঠাট্টাও করেছেন, বলেছেন, আপনি নিজেই একটা কিণ্ডারগার্টেন খুলে বসুন, অনেক বেশি লাভ হবে। কি ছাই চাকরি করছেন!

বিব্রতমুখে অর্চনা পাশ কাটায়, ব্যবধানের আবরণ মুখে নেমে আসে।

এর উপর মালীর ছেলেমেয়ে দুটোর সঙ্গে সেই সম্প্রীতি দেখে প্রথমে তো চক্ষুস্থির সকলের। তারপর ফিসফিস, কানাকানি। মীরাদি প্রভাদিকে ঠেলেন, প্রভাদি মীরাদিকে। রোগ সম্বন্ধে প্রতিভাদির কানে কানে রোগনির্ণয় করেন শোভাদি। এমন কি সহকারী হেডমিসট্রেস স্মৃতি করও হালকা বিস্ময় জ্ঞাপন করেন হেডমিসট্রেস মালতী রায়ের কাছে।

কিন্তু শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যেও একজনের কিছু কাছাকাছি এসে গেছে অর্চনা। ড্রইং টিচার কল্যাণীদির। সেটা তার নিজের চেষ্টায় নয়, কল্যাণীদির স্বভাবে। নিজেই হুড়মুড়িয়ে তার

বাড়ি এসেছেন যখন তখন, বাচ্চাদের অত আদর দেওয়া নিয়ে মন-খোলা ঠাট্টা করেছেন, আবার নিজের বাড়িতেও জোর করেই ধরে নিয়ে গেছেন ওকে। অর্চনার ভাল লাগত, এর পর নিজেই যেত তাঁর বাড়ি, জোর করতে হত না। অনেক সময় অবাক হয়ে ভেবেছে, কাকার সঙ্গে ভাইয়ের সঙ্গে কেন নিজের বাড়িতে থাকেন না কল্যাণীদি ! সুন্দরী না হলেও কুৎসিত নন, কেন বিয়েই বা করেননি...। তাঁর ছোট্ট বাড়িটা যেন ছোটখাটো চিড়িয়াখানা একটা। খাঁচায় খাঁচায় কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না, বুলবুল হীরামন—একগাদা রঙবেরঙের খরগোশ, হাঁস, পায়রার ঝাঁক, রঙচঙা জারের মাছ—কত কি ! এদের সামলাতে গিয়ে কল্যাণীদি স্কুলেও লেট হন এক-একদিন।

প্রথম প্রথম অবাক হয়ে অর্চনা তাঁর পশুপাখির সেবাযত্ন দেখত। ভালও লাগত। কিন্তু এখানে আসায়ও ছেদ পড়েছে শিগগিরই। এলেই আর একজনকে দেখত। কল্যাণীদির ভাইকে। বিকালের দিকে দিদির কাছে একবার অন্তত আসেই নিখিলেশ। আড়াল থেকে ভাইয়ের উদ্দেশে দিদির ছদ্ম অনুশাসন আর বিদ্রূপও কানে আসত। কিন্তু অর্চনার কাছে তাঁর মুখে ভাইয়ের প্রশংসা যেন ধরে না। ভাইয়ের কথা বলতে গিয়ে দুচোখ তাঁর সজল হতেও দেখা গেছে।

ফেরার সময় কল্যাণীদি ভাইকে বলতেন ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। প্রথম প্রথম অর্চনা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি, নিখিলেশের গাড়িতেই ফিরেছে। তারপর কিছু একটা অজুহাতে এড়িয়ে গেছে। কখনো বলেছে পরে যাবে, কখনো বলেছে হেঁটে যাবে। কল্যাণীদি বুঝেছেন, বুঝেই আর সে-রকম ব্যবস্থা করেননি। তবু আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে অর্চনা, কখনো-সখনো কল্যাণীদি একেবারে স্কুল থেকে ধরে নিয়ে এলে আসে।

কল্যাণীদি বলতে ছাড়েননি, কি ব্যাপার বলো দেখি তোমার, এ ভাবে থাকো কেন ?

আর কেউ হলে অর্চনা জবাব না দিয়ে শুধু চেয়েই থাকত। এখানে একটু হেসে বলেছিল, আমিও যদি আপনাকে ফিরে এ কথাই জিজ্ঞাসা করি ?

কল্যাণীদি অবাক হতে চেষ্টা করেছিলেন প্রথম, ও মা, আমার আবার কি দেখলে ? তারপর হেসেই জবাব দিয়েছেন, আমরা কথা ছেড়ে দাও, সাধের কাজল পরতে গিয়ে চক্ষু হল কানা—তোমার কি ?

অর্চনার বাধা অনুমান করে নিখিলেশ দিদিকে বলেছে, তোমার এখানে আসার রুটিনটা আমি না-হয় রাত্রিতেই করে নেব এবার থেকে—ভদ্রমহিলাটিকে বলে দিও।

কল্যাণীদি সত্যিই বলেছেন। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন। অর্চনা শুনে মনে মনে দুঃখিত হয়েছে, কিন্তু কিছু বলতে পারেননি।

এর পর নিখিলেশের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কমই হয়েছে তার। ইস্কুলের গত বার্ষিক উৎসবে নিখিলেশ অবশ্য ওর বাড়িতেই এসেছিল আর নিজেদের বাড়িতে ধরেও নিয়ে গেছে। প্রতি বছর ওই একটা দিন ইস্কুলে আড়ম্বর করে উৎসব হয়, আর রাত্রিতে সব শিক্ষয়িত্রীদের সেক্রেটারির বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকে। অর্চনা ইস্কুলের উৎসবে উপস্থিত ছিল কিন্তু বাড়িতে যায়নি। নিখিলেশ গাড়ি নিয়ে একেবারে বাড়িতে হাজির।—আপনার না যাওয়াটা সকলে এত বেশি লক্ষ্য করেছেন যে না এসে পারা গেল না। চলুন—

অর্চনা আপত্তি করতে পারেনি। আপত্তি করতে গেলে পাঁচ কথা বলতে হয়, পাঁচটা

অনুরোধ-উপরোধ শুনতে হয়—তাতেই সঙ্কোচ বেশি। তাকে আসতে দেখে বিজ্ঞানের টিচার আর মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী শোভা ধর প্রতিভা গাঙ্গুলীর কানে কানে ফিসফিস করেছেন, এই জন্যেই অপেক্ষা করছিল...।

একটানা দিনযাপনে এই কানাকানি ফিসফিস আর কৌতূহল অনেকটাই থিতিয়ে এসেছিল। ইস্কুলের সেই বার্ষিক রাত্রির পর কল্যাণীদিও বাড়ি যাওয়া প্রায় বন্ধই হয়েছে, দু-চার দিনের অনুযোগের পর কল্যাণীদিও বলা ছেড়েছেন। মেয়েদের বাড়িতে ও ভাবে প্রশ্রয় দেওয়াটাও সকলেরই একরকম সয়ে গেছে—দেড় বছরের ভাই কোলে মালার আগমন প্রায় নৈমিত্তিক। শুধু মালীর ওই ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে বেশি বেশি করতে দেখলেই নিজেদের মধ্যে যা দু-চার কথা বলাবলি করতেন সহ-শিক্ষয়িত্রীরা, টীকাটিপ্পনী হয়তো।

এমনি একটানা কেটে যেতে পারত কাটতেন।

কিন্তু কাটল না।

ছোট একটা মর্মন্তুদ ঘটনা থেকে অর্চনা বসুর এই একটানা বিচ্ছিন্নতার বাঁধ ভেঙে সহসা অকরুণ কৌতূহলের এক বন্যা এলো যেন।

আলেয়ার আলো দু-হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরতে গিয়েছিল, মায়াব প্রলোভনে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করে বসেছে। কবে ধরা পড়েছে...।

উপলক্ষ, মালীর ওই কচি ছেলেটার জলে ডোবা। সেই থেকেই সূচনা।

কয়েকটা দিন মূল বেদনায় অর্চনা দিনরাত ছটফট করেছে শুধু। দিনের সেই ছটফটানি ইস্কুলের মেয়েরা কিছুটা টের পেয়েছে। দশ বছরের মালা ক্লাসের ক্লাসমনিটার। অর্চনাদির ক্লাসে সে পর্যন্ত সহপাঠিনীদের টুঁ-শব্দটি বরদাস্ত করতে পারেনি। নোটবই হাতে নিয়ে মেয়েদের ধমকেছে, এই, একেবারে চুপ সব, নাম টুকবো কিন্তু! অর্চনাদির ক্লাস না এখন? জানিস সেই দিন থেকেই কেমন হয়ে আছেন—

অনুশাসন শেষ হওয়ার আগেই অর্চনা ক্লাসে ঢুকেছে।

কিন্তু রাতের খবর শুধু একজন রাখে। দাশু। দাশুব বয়স হয়েছে, মেজাজটা সব সময় বশে থাকে না। এর দ্বিগুণ ধকল সামলাতেও আপত্তি নেই তার, কিন্তু এই গুমোট আর এত অনিয়ম ববদাস্ত হয় না। গত রাতেও বেশ পষ্টাপষ্টি একপশলা হয়ে গেছে এই নিয়ে।

ট্রেতে এক পেয়ালা চা নিয়ে নিঃশব্দ রাগে ঘবে ঢুকে দেখে বই হাতে দিদিমণি খাটে ঠেস দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে আছে। সে চা নিয়ে ঢুকেছে তাও টের পেল না। ছোট টেবিলের দেয়াল-তাকের কাছে ট্রে টেবিলে বাখতেই তাকের ওপব সারি সারি ট্যাবলেটের শিশিগুলোর ওপর চোখ গেল দাশুর। কম করে পাঁচটা, চার-পাঁচ রকমের। এই তিন চার দিনে কোন্ শিশি থেকে ক'টা ট্যাবলেট কমেছে একবার চোখ বুলিয়ে তাও বলে দিতে পারে। ক্ষুব্ধ রাগে দাশু একে একে সব ক'টা শিশিই চায়ের ট্রেতে নামিয়ে এনেছিল। তারপর সেই ছোট টেবিল সুদ্ধ তুলে এনে বিছানার পাশে ঠক করে রেখেছিল।

অর্চনার হুঁশ ফিরেছে। চায়ের সঙ্গে ট্রেতে ওষুধের শিশিগুলো দেখে জিজ্ঞাসু নেত্রে দাশুর দিকে তাকাতে সে বলেছে ঘুমোবার ওষুধ খাবে কি জেগে থাকবার ওষুধ খাবে কে জানে—সব ক'টাই এনে দিলাম।

ঈষৎ বিরক্ত মুখে অর্চনা চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়েছিল। পরের অভিযোগটা দাশু ঘরের দেয়ালকেই শুনিয়েছে যেন।—সন্ধ্যে থেকে চার পেয়ালা হল, বলো তো চাল ক'টাও চায়েতেই সেদ্ধ করে দিতে পারি।

অর্চনা অন্যদিন হলে হাসত, একটু তোশামোদও করত হয়তো। তার বদলে শুধু বিরক্তই হয়েছে। কিন্তু মেজাজ দাশুরও তেমনি চড়া তখন। তাক থেকে টাইমপীস ঘড়িটা এনে সশব্দে সেটাও টিপয়ের ওপর বসিয়ে দিয়েছিল। রাত তখন দশটার কাছাকাছি।

তুমি যাবে এখান থেকে ?

যাব—। বলেই অদূরের টুলটা একেবারে খাটের কাছে এনে টেনে গ্যাঁট হয়ে বসে জবাব দিয়েছে, একেবারেই যাব। কিন্তু এখন তুমি কি করবে জেনে যাই।

ছেলেবেলায় অনেক শাসন করেছে, হম্বি-তম্বি করেছে, এখন আর অতটা সম্ভব নয় বলেই আপসোস যেন।

আঃ, দাশুদা !

দাশুর গলা একটু নেমেছে বটে, কিন্তু ক্ষোভ যায়নি। বলেছে, জীবনভোর তো মেজাজের ওপরেই কাটালে, তার ফলে তো ওই—! ওষুধের শিশিগুলো একসঙ্গে সাপটে হাতে তুলে নিয়েছিল সে।—কালই আমি এগুলো গঙ্গায় দিয়ে আসব।

গঙ্গার বদলে আপাতত সেগুলি তাকের ওপরে রেখেই গজগজ করতে করতে প্রস্থান করেছে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে সত্রাসে অর্চনা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়েছে। চাঁদের আলোয় রাতের গঙ্গা চকচক করছিল।

পরদিন।

অর্চনাকে ইস্কুল থেকে ফিরতে দেখেই দাশু ময়দা মাখতে বসেছিল। খাবে না বলার অবকাশ দিতে রাজী নয় সে। তার দু-হাত জোড়া। বাইরের দরজায় ঠকঠক শব্দ।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই দাশু উঠে এসে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে দরজার হুড়কো খুলে দিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে মালা, কোলে তার দেড় বছরের ফুটফুটে ভাইটা। দেখেই দাশু বেজায় খুশি। এদের দেখে এমন খুশি শিগগির হয়নি বোধহয়।—তোমরা !

আনন্দাতিশয্যে হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে আদর করতে গিয়ে খেয়াল হল, হাতে ময়দা মাখা। উৎফুল্লমুখে অভ্যর্থনা জানাল, এসো এসো—! যেন বহু প্রতীক্ষিত অথচ অপ্রত্যাশিত কেউ এসেছে। হঠাৎ বাচ্চা ছেলেটার একেবারে মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, এই ক'টা দিন কি কচ্ছিলে চাঁদ। ওদিকে যে—

থেমে গিয়ে মালার উদ্দেশে তাড়াতাড়ি বলল, যাও যাও, ভিতরে যাও—

ভাইকে নিয়ে মালা ভিতরে ঢুকল। দাশুর মুখে প্রসন্ন হাসি।

ইস্কুল থেকে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে অর্চনা চায়ের প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু শুধু চা চাইলে আবার দু-কথা শুনতে হবে বলেই কিছু বলে নি। টেবিলের ওপর বিলিতি মাসিকপত্র উল্টে আছে একটা। মলাটের বিজ্ঞাপনে উজ্জ্বল প্রাণবন্ত এক শিশুর ছবি। অন্যমনস্কের মত অর্চনা চুপচাপ সেটাই দেখছিল। পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল।

মালার কোলে ছেলেটাকে দেখে হঠাৎ যেন ভারি খুশি হয়ে উঠল সেও। ক-দিন

ধরে অনড় বোঝার মত যে অনুভূতিটা বুকে চেপে আছে, সেটা একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করল। একঝলক জীবন্ত আলো দেখে যেন ক'টা দিনের এক দুঃসহ আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে ওঠার তাড়নাই অনুভব করল হঠাৎ।

একগাল হেসে এগিয়ে এসে ছেলেটাকে মালার কাছ থেকে লুফে নিল প্রায়। একবার মাথার কাছে তুলে, দুবার ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, ওরে দুষ্টু তুই এসেছিস !

অর্চনার সাদা চশমাটার ওপর ছেলেটার বরাবরই বড় লোভ। প্রথম সুযোগেই খপ করে সে টেনে ধরল সেটা।

এই দস্যি, ছাড় ছাড় !

চশমাটা নিয়ে আছড়ে ভাঙলেও অর্চনা অখুশি হত না বোধহয়। ছেলেটাকে বুকের কাছে ধরার সঙ্গে সঙ্গে একটা গুমোট যাতনা হালকা হয়ে হয়ে একেবারে যেন নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে। চশমাটা ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল। বেজায় খুশি প্রায় অস্বাভাবিক রকমের খুশি।

আনন্দে দু-হাতে ছেলেটাকে আবার সামনে তুলে ঝাঁকাতে গিয়ে থমকে গেল। কলরব শুনে ময়দা ফেলে হাস্যবদন দাশু একবার উঁকি দেবার লোভ সামলাতে পারেনি। তারই সঙ্গে চোখোচোখি। অর্চনা গম্ভীর হতে চেষ্টা করল, সঙ্গে সঙ্গে দাশুও গম্ভীর মুখে নিজের কাজে ফিরে গেল।

মালা ছবির খোঁজে টেবিলের সেই বিলিতি মাসিকপত্রের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অর্চনাদির কাণ্ডকারখানা দেখছে আর হাসছে মুখ টিপে। এখন তার আপসোস হচ্ছে খুব, কেন আর দুটো দিন আগে এলো না। ভরসা পায়নি বলেই আসেনি, আজও খুব ভয়ে ভয়েই এসেছিল।

অর্চনা ছেলেটাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল। ঝাঁকাল, আদর করল, তাকের ওপর থেকে বিস্কুট দিল তার হাতে। ভাল বিস্কুট মজুতই থাকে ওর জন্য। তার পর মুখোমুখি ওকে বুকের কাছে এনে বলল, তুই দুষ্টু—

ছেলেটার তাতে আপত্তি, বিস্কুটে কামড় বসিয়ে ভাঙা ভাঙা পাল্টা জবাব দিল, তুমি ডুট্টু—

উঁহু, আমি ভাল।

তুমি মন্ন—

আর তুই ?

আমি বা-ব্বু—

ভিতরে ভিতরে অর্চনার কি যেন আলোড়ন একটা। সুখের মত আবার ব্যথার মতও। ছেলেটার মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, আর আমি ?

ছেলে বিস্কুটে কামড় বসিয়ে জবাব দেবার ফুরসত পেল না।

কিন্তু হঠাৎ হল কি অর্চনার ? কি যে হল নিজেও জানে না। স্থান কাল ভুল হয়ে গেল। মুখের ভাব বদলাতে লাগল। একটা অব্যক্ত আকুতি বুক ঠেলে ওপরে উঠছে। চোখে মুখে অস্বাভাবিক আগ্রহ কিসের। দশ বছরের মেয়েটা ছবি ফেলে হাঁ করে চেয়ে আছে খেয়াল নেই।

আবারও ছেলেটার গালের কাছে, কানের কাছে মুখে এনে ফিসফিস করে বলল অর্চনা, আমি মা ! মা—

বিস্কুট ভুলে শিশুটি এবার ঘাড় ফিরিয়ে ড্যাব ড্যাব করে তাকাল তার দিকে। আর তিমির তৃষ্ণায় তাকে যেন একেবারে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইল অর্চনা। ছেলেটা ধড়ফড় করছে হুঁশ নেই। কণ্ঠস্বরে অস্ফুট আকুতি।—মা বল্ ! মা বল্ ! মা বল্—।

বিভ্রান্ত উত্তেজনার মুখেই সম্বিৎ ফিরল।

লজ্জায় বেদনায় সঙ্কোচে অর্চনা নিস্পন্দ, বিবর্ণ একেবারে। নিভৃতচারী বাসনার এমন মূর্তি এমন করে নিজেও বোধকরি আর দেখেনি কখনো। সেই লজ্জার ব্যথা নিজের কাছেই দুর্বহ, তার ওপর ওই মেয়েটা বিস্ফারিত বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে। দশ বছরের মেয়ে মালা—শুধু দেখছে না, কেমন ভয়ও পেয়েছে।

ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি বুকের থেকে নামিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিল। থালায় খাবার নিয়ে দাশু ঘরে ঢুকেছে। ব্যস্তসমস্তভাবে অর্চনা থালাটা তার কাছ থেকে প্রায় কেড়ে নিয়েই মালার সামনে রাখল।—নাও, খেয়ে নাও ! আমি আসছি—

দাশুর পাশ কাটিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দাশু অবাক। মেয়েটার খাবার তো সে এনেছিলই !

খেয়েদেয়ে ভাই কোলে করে মালা হৃষ্ট চিত্তেই ঘরে ফিরেছে। কিন্তু অর্চনাদির এমন নতুন কাণ্ডটা মাকে না বলে পারেনি সে। কাণ্ড বলে কাণ্ড, একেবারে তাজ্জব কাণ্ড !

দুই এক কথাতেই তার মা তাজ্জব কাণ্ডের মূলসুদ্ধ বুঝে নিলেন। তারপর খপ করে মেয়ের চুলের মুঠি ধরে কয়েক প্রস্থ ঝাঁকানি দিলেন বেশ করে। পাজী মেয়ে, রোজ নাচতে নাচতে তোর ওখানে যাওয়া চাই কেন ? ফের যদি ওকে নিয়ে আবার ও-মুখো হতে দেখি মেরে একেবারে হাড় গুঁড়ো করে দেব !

অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন নয় বলে মেয়েটা দ্বিগুণ হতভম্ব।

রবিবার সমিতির মধ্যাহ্ন-আসরে মালার মা চুপিচুপি শিক্ষয়িত্রী প্রভা নন্দীর কানে তুললেন কথাটা। ঘটনাটা জানিয়ে অনুযোগ করলেন, কেমন টিচার ভাই আপনাদের, চেহারা-পত্র তো ভাল, টাকাও রোজগার করে—বিয়ে-থা করলেই তো পারে !

প্রভা নন্দী সেই বিকেলেই ছুটেছেন মীরা সান্যালের বাড়ি। এতবড় বিস্ময়ের বোঝা একা বহন করবার নয়, বাসি করতেও মন চায় না। পরদিন টিচার্স-রুমের কানাকানিতে কান পাতলেন সকলেই। এমন কি সহকারী হেডমিসট্রেস স্মৃতি করও। শেষে কাজের অছিলায় উঠে গিয়ে হেডমিসট্রেস মালতী রায়ের ঘরে ঢুকলেন তিনি।

শিক্ষয়িত্রীদের হাবভাবে স্পষ্ট ব্যতিক্রমটা অর্চনার চোখে পড়তে সময় লাগেনি। অর্চনা যেন এতকাল ঠকিয়ে এসেছে তাঁদের। দূরে সরে থেকে একটা মর্যাদা আদায় করেছে। নতুন করে নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছেন তাঁরা ওকে। অনাবৃত কৌতূহলে রহস্যের কিনারা খুঁজেছেন।

শুধু কল্যাণীদি ছাড়া। কিন্তু তাঁর মমতাভরা দুই চোখেও কি এক নির্বাক জিজ্ঞাসা।

অর্চনা হঠাৎ বুঝে ওঠেনি ?

কিন্তু বুঝতে সময়ও লাগেনি।

অস্বস্তির বোঝা একটা অনড় হয়ে বুকে চেপেই ছিল । সেই দিনই বিকেলের দিকে হেডমিসট্রেস ওকে নিজের ঘরে ডেকে দুই একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রয়োজনের কথা বলে নিয়ে শেষে খুব মিষ্টি করে বলে দিলেন মেয়েদের একটু বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে—অতটা করা ঠিক ভাল নয়, অর্চনাকে তিনি স্কুলের গৌরব মনে করেন বলেই কথাটা বললেন—ইত্যাদি ।

আর বুঝেছিল, তার পরের ক্লাসে মালার চোখে চোখ রাখার সঙ্গে সঙ্গে । অন্য মেয়েগুলোর চোখে-মুখেও দুর্বোধ্য বিস্ময় আর কাঁচা কৌতূহল ।

অর্চনা বসু কি নিজের মৃত্যু কামনা করেছে সেদিন ?

কিছুই করেনি, কিছুই করতে পারেনি । ক্লাস ছিল আরও একটা, তাও শেষ না করে আসেনি । বাড়ি ফেরার পর দাশু খাবার এনে সামনে ধরেছে তাতেও আপত্তি জানায়নি ।

রাত গড়িয়েছে । দাশুও বিদায় নিয়ে গেছে ।

ছাই নতুন করে জ্বলবে কত । অর্চনা এক সময় উঠেছে । চুপচাপ চাকরির ইস্তফা-পত্র লেখা শেষ করে টেবিলে চাপা দিয়েছে । তারপরেও বিনিদ্র কাটেনি ।

কুঁজোতে জল ছিল, তাকে ওষুধের ট্যাবলেট মজুত ছিল ।

সকালে সহজে মাথা তুলতে পারেনি । দাশু ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙিয়েছে । চা খেতে খেতে অর্চনা ভাবতে চেষ্টা করল, রাতে ক'টা ট্যাবলেট খেয়েছিল । টেবিলের ওপর ইস্তফা পত্রটা চোখে পড়ল । অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল । তারপর খুব শান্তমুখে সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল ।

দুটো দিন কোনোরকমে চুপ করে ছিলেন কল্যাণীদি । তারপর ভরসা করে থাকতে পারেননি । কেমন করে যেন বুঝেছিলেন, আর দেরি করলে একেবারে দেরি হয়ে যাবে ! হাসি-তামাসায় অতিবড় স্তব্ধতার ধর্মও ভাঙতে পারেন তিনি, কিন্তু এখানে সেই চেষ্টাটাই যেন বিড়ম্বনা বিশেষ । সেদিন ছুটির পর স্কুল-ফটক পেরিয়ে অর্চনার হাত ধরলেন ।—ওদিকে নয়, আজ আমার বাড়ি ।

আজ থাক—

কাল তো তুমি আরো একটু দূরে সরবে । আজই এসো, কথা ছিল—

তাঁর দিকে চেয়ে অর্চনা অপেক্ষা করল একটু । তারপর চুপচাপ সঙ্গে চলল ।

যদি আবারও আপত্তি করত বা দু-কথা জিজ্ঞাসা করত কল্যাণীদি কিছুটা স্বস্তি বোধ করতেন । জোর-জুলুম ঝগড়া ঝাঁটি পর্যন্ত করা চলত । কথা কিছু সত্যিই ছিল কি না তিনিই জানেন । বাড়ি ফিরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথার ধার-কাছ দিয়ে গেলেন না । হৈ চৈ করে জলযোগের ব্যবস্থা করলেন, অর্চনাকে সঙ্গে নিয়ে পশু-পাখির তদারক করলেন একপ্রস্থ । কোন্ পাখির জন্য নতুন খাঁচা তৈরি করতে হবে, কোন্ খরগোশটার বজ্জাতি বাড়ছে দিনকে দিন, ময়নাটার খাওয়া কমেছে, ডাকও ছেড়েছে—অসুখ-বিসুখ করবে কিনা কে জানে, কাকাতুয়াটার একটা জোড় খুঁজছেন, পাচ্ছেন না—ফলে বেচারী একেবারে মনমরা হয়ে আছে, ইত্যাদি সমাচার শেষ করে শেষে ঘরে এসে বসলেন ।

এর পরেও কল্যাণীদি অর্চনার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে একটা কথাও তুললেন না । স্কুলে যা নিয়ে এমন কানাকানি সেই বিসদৃশ ব্যাপারেও তাঁর যেন কৌতূহল নেই । দু-পাঁচ কথার পর হঠাৎ নিজের কথাই জিজ্ঞাসা করলেন । খুব হালকা করে বললেন, আচ্ছা এই যে স্কুলে

আঁকিযুকি আর বাড়িতে এইসব নিয়ে দিব্বি কাটিয়ে দিচ্ছি—কেমন আছি বলো তো আমি ?

জবাবে অর্চনা তাঁর দিকে চেয়ে শুধু হাসল একটু । কল্যাণীদি এ-কথাটাই বলতে চান, না আর কিছু বলতে চান—হয়তো বলবেনও । তবু কল্যাণীদিকে বরাবরই যেমন ভাল লাগে আজও তেমনি লাগছে—বড় মিষ্টি লাগছে । ক্ষত যদি খোঁজেনও, জ্বালা-জুড়ানো প্রলেপ লাগানোর জন্যেই খোঁজেন ।

বেশ, আছি, না ?...হাসিমুখে নিজেই জবাবটা দিয়ে নিলেন ।—সকলেই বলে দিব্বি আছি । ব্যাপার কিছু আছে সকলেই জানে, জেনেও ভাবে বেশ কাব্যের মত কাটিয়ে দিচ্ছি । অথচ আমার দশা ভাবো একবার, সময় পার করে দিয়ে এখন কাকাতুয়ার জোড় খুঁজে বেড়াচ্ছি !

ছোট মেয়ের মতই খিলখিল করে হেসে উঠলেন কল্যাণীদি, যেন খুব মজার কথা কিছু । তারপর বলে গেলেন, অথচ কত কাণ্ড করে শেষে এই দশা ভাবো—বর্ণে অমিল বলে কাকা আর মা একজনকে বাতিল করে দিলেন, আর অমন বর্ণের মিলটা তাঁদের চোখে পড়ল না সেই রাগে আমি কাকার গার্জেন-গিরিই নাকচ করে দিলাম, আর মা যে নিজের মা নয় সৎ-মা সেটাও তাঁকে বুঝিয়ে আসতে ছাড়লাম না । তারপর ওই এক বর্ণে অন্ধ হয়ে বসে রইলাম, অথচ চোখের ওপর দিয়েই কত বর্ণ চলে গেল তাকিয়ে দেখলামও না একবার । কি লাভ হল বলো তো ? কেউ কি বসে থাকল, দিন কি থেমে রইল—নিজেই শুধু নিজেকে নিয়ে বসে রইলাম । বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি—

অর্চনার আর ভাল লাগছে না, ফাঁপর ফাঁপর লাগছে । চিকিৎসকের আন্তরিকতা সত্ত্বেও ক্ষতের ওপর ভুল ওষুধ পড়লে যেমন লাগে । কিন্তু কল্যাণীদি নিজের ঝোঁকেই বলে যেতে লাগলেন, অথচ যা হয়েছে সেটা মেনে নিলেই এক রকম না এক রকম করে ঘা শুকাতো--তা না, উজানেই সাঁতার কেটে গেলাম । কেউ পারে ?

অর্চনা বলল, এসব কথা থাক কল্যাণীদি—

থাকলে চলবে কেন, কল্যাণীদি মাথা নাড়লেন, দুঃখ যেমনই হোক, জীবন ছাড়া জীবনের ফাঁক ঘোচে না রে ভাই—মেয়েদের তো নয়ই । এই বুড়ো বয়সেও আমার সংসার করতে সাধ যায়, আমার বাপু স্পষ্ট কথা । আমাকে নিয়ে ওরা তোমার মত অমন হাসাহাসি কানাকানি করলে মুখের ওপর বলে দিতাম । আমি আর পাচ্ছি কাকে বলো—কিন্তু তোমার সামনে কেউ আছে কিনা একবার চোখ তাকিয়ে দেখবে না ?

অর্চনা এতক্ষণে আভাস পেলে কি বলতে চান কল্যাণীদি । ইস্কুলে ওই সদ্য রটনার ফলে নানা সংশয়ে এদিক থেকে আপনজনের বরং পিছপা হবার কথা । ঈষৎ বিস্ময়ে অর্চনা চুপচাপ চেয়েই রইল তাঁর দিকে ।

আসল বক্তব্যে পৌঁছে কল্যাণীদির আর রাখাঢাকা নেই । বললেন জলঝড়ের দিনে সেই যেদিন প্রথম দেখলাম, সেই দিনই তোমাকে ভাল লেগেছিল ।...আমারই ভাই তো, ভাল দেখলে ছেলেটারও ভাল লাগার চোখ—তার দোষ কি বলো ?

অর্চনা চেয়েই আছে । আরো শান্ত, আরো একটু নিষ্প্রাণ ।

কল্যাণীদিও লক্ষ্য করছেন আর ভিতরে ভিতরে দমে যাচ্ছেন একটু । তবু মুখের কথা বার করেছেন যখন শেষ না দেখেই ছাড়বেন না । হাসলেন আবারও, চুপ করে গেলে কেন,

কথা তো তোমার আমার মধ্যে হচ্ছে ।...একটু থেমে বললেন, নিজের ভাই—কত আর বলা যায়, তোমার দুঃখ ও কোনদিন ছোট করে দেখবে না—ঠিক আমার বাবার স্বভাবটি পেয়েছে। তোমার কথা ভেবে ছোঁড়াটা নিজের অনেক কাজকর্মে ঢিলে দিয়েছে জেনেও এতদিন কিছু বলিনি, আজ আর না বলে পারছি না । নেড়েচেড়ে দেখই না দু-দিন—ভাল লাগতেও তো পারে ।

নিজের ভাষাপ্রয়োগের বহরেই হয়তো হেসে উঠলেন । তারপর উৎসুক দুই চোখ ওর মুখের উপর রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো পাঠিয়ে দিই তোমার কাছে—পাঠাবো ?

নীরব দৃষ্টি-বিনিময় । তারপর হঠাৎ অর্চনা হাসল একটু ! বড় নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নিচু করে কি ভেবে নিল খানিক । তখনো হাসছে একটু একটু । শেষে খুব সহজভাবেই বলল, আচ্ছা পাঠাবেন ।

আনন্দে কল্যাণীদি বুঝি জড়িয়েই ধরবেন তাকে । কিন্তু আনন্দের মুখেও থমকেই গেলেন, ভরসা করে ঠিক যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না—সত্যি বলছ ?

যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে অর্চনা বলল, হ্যাঁ— । সন্ধ্যে হয়ে গেল, আসি—

সেই রাতেই নিখিলেশ এসেছে ! আসবে অর্চনা জানত । দাশুর হাত জোড়া, কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ও নিজেই শান্ত মুখে দরজা খুলে দিল । আসুন ।

যেন প্রতীক্ষাই করছিল । তবু নিখিলেশ বিব্রত বোধ করেছে একটু । দিদি কেন যে তাকে এক রকম ঠেলেই পাঠালো খুব স্পষ্ট নয় । বলল, অসময়ে বিরক্ত করলাম না তো ?

না, বিরক্তি কিসের, আসুন ।

ঘরে নিয়ে এলো তাকে । নিখিলেশ আবারও বলল, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে দিদি এমন তাড়া লাগালো যে—

জানি । বসুন— । অর্চনারই কোন দ্বিধা বা জড়তা নেই । এমন দ্বিধাহীন সহজ তাকে কোনদিন দেখা যায়নি । বরং যে এলো তার সঙ্কোচ লক্ষ্য করেই যেন হাসিমুখে বলল, দিদি তাড়া না দিলেও আসতে কোন বাধা নেই, কল্যাণীদির ভাই আপনি, আপনাকে আপনজন ভাবতে ইচ্ছা করে ।

নিখিলেশ অবাক হবে কি খুশি হবে ভেবে পাচ্ছে না ।

অর্চনা খাটের একধারে বসল ।—চা খাবেন একটু ?

অসুবিধে না হয় তো আপত্তি নেই ।

অসুবিধে কিসের— । উঠে দাশুকে দু পেয়ালা চায়ের কথা বলে আবার এসে বসল । —দাশুর চায়ের জল আর মেজাজ দুই-ই সবসময়ে চড়ানো থাকে । এখন আপনি আছেন, মেজাজ দেখাতে পারবে না ।

নিখিলেশ হেসে বলল, অনেক কাল আছে শুনেছি ।

অনেক কাল । তাকে ঘাড়ে চাপিয়ে বাবা আমাকে জব্দ করেছেন ।

আলাপের আর একটা সুতো পেল নিখিলেশ—আপনার বাবাকে খুব দেখার ইচ্ছে, দু-বছরেও হল না ।

বেশ তো, একদিন চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি, একেবারে সাদা মানুষ—

শোনার সঙ্গে সঙ্গে চকিতে অর্চনার সাদা বেশবাসের দিকে চোখ গেল নিখিলেশের ।

ইতিমধ্যে দাশু চা নিয়ে হাজির। অর্চনা উঠে একটা পেয়ালা তার হাতে দিয়ে অন্য পেয়ালাটা নিজে নিয়ে বসল। দাশু চলে গেল।

চুপচাপ পেয়ালার দু-চারটে চুমুক দিয়ে নিখিলেশ জিজ্ঞাসা করল, আজ দিদির ওখানে গেছলেন নাকি?

হ্যাঁ...। আপনার কথাও শুনলাম—।

আমার কথা?

দিদি বললেন, আপনি কাজের মানুষ অথচ আজকাল কাজকর্ম কিছু করেন না, আমিই নাকি উপলক্ষ।

নিখিলেশ যেমন বিব্রত, তেমনি অবাক। এই অর্চনা বসুকেই কি সে এত দিন দেখে আসছে!—দিদি বলেছে এ কথা।

বলেছেন। আপনাকে ভালবাসেন বলেই বলেছেন। কত বড় ভবিষ্যৎ আপনার সামনে, যে-কোন দিদিই বলবেন।—আপনার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

নিখিলেশ পেয়ালা তুলে নিল। হঠাৎ কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে একটু হকচকিয়েই গেছে সে।

অর্চনা তার পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে খুব সহজ অথচ শান্ত মুখে বলল, আপনাদের এই ইস্কুলে কাজ করছি এটা আমার কাছে কতবড় পাওয়া আমিই জানি। এ আমি হারাতে চাইনে।

নিখিলেশ বিস্মিত।—এ কথা কেন?

জবাবে দুই এক মুহূর্ত চুপ করে রইল অর্চনা, তারপর একটু হেসেই ফিরে বলল, কিছু যদি না মনে করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

নিখিলেশ নির্বাক জিজ্ঞাসু।

আপনার বয়েস কত?

নিখিলেশ প্রায় বিমূঢ়। অস্ফুট জবাব দিল, বছর ঊনতিরিশ-তিরিশ...।

অর্চনা মাথা নাড়ল—আমিও সেই রকমই ভেবেছিলাম। হাসল একটু, আমার ছত্রিশ। এম. এ. পড়তে পড়তে মাঝখানে কয়েক বছর পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম।

হতভম্বের মত নিখিলেশ চেয়েই আছে। জীবনে এমন একটা বিস্ময়ের মুহূর্ত আর আসেনি বোধহয়।

অর্চনা একটু থেমে খুব সাদাসিধে ভাবেই বলে গেল, কল্যাণীদি ঠিক বুঝতে পারেননি, আমি কোন হতাশা নিয়ে বসে নেই—বরং নিজেরই ভুলের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করছি। ...হাসতে চেষ্টা করল আবারও, আপনি বিদ্বান বুদ্ধিমান, আপনাকে আর বেশি কি বলব।

রাত বাড়ছে। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। খুব দূরে মাঝপ্রহরের শিয়াল ডেকে উঠল কোথায়। অর্চনা খাটে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নিঃশব্দে একটা যাতনার নিষ্পেষণ ভোগ করছে।

উঠে জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। সামনে আবছা নিস্তরঙ্গ গঙ্গা। ভিতরের যাতনাটা বাড়ছেই। মালীর ছেলেটা ডুবতে ডুবতেও ডাঙা খুঁজেছে অর্চনার সেই খোঁজার আকুতিও

গেছে ! সরে দেয়ালের তাকের কাছে এসে দাঁড়াল । ঘুমের ওষুধ । না থাক—।

ওষুধের শিশি রেখে দিয়ে ঘরের ঈজিচেয়ারটা অর্ধেকটা বাইরের বারান্দায় টেনে এনে বসল । বাইরে ঘোলাটে অন্ধকার । আকাশে নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারাদের মূক উৎসব ।

অর্চনা ভাবছে কিছু । ভাবছে না, কিছু যেন মনে পড়ছে । নতুন করে জন্ম হল ব্যথার, তার অব্যক্ত আর্তস্বর ছড়িয়ে পড়ছে ফেলে আসা জীবনের আনাচে-কানাচে । তারাই ভিড় করে আছে । বেদনার্ত আলোড়ন একটা । চোখের সামনে আবছা ভেসে উঠছে কিছু । দূরে, অনেক দূরে...।

...সারি সারি বিশাল সিঁড়ি আর সিঁড়ি । প্রায় আকাশ-ছোঁয়া ।

...তার শেষে ইতিহাসকালের বিরাট এক প্রাসাদের আভাস ।

...সেখানে এক অতিবৃদ্ধ মুসলমানের মূর্তি । শণের মত ধপধপে পাকা চুল পাকা দাড়ি বাতাসে উড়ছে...মুখ নেড়ে কিছু বলছে সে ।

...সামনে একটা জালি দোলায়...হিজিবিজি কি-সব জড়ানো তাতে...শতসহস্র, হাজার হাজার !

...সেই জালিদেয়ালের সামনে থেকে, সেই অবাক-চোখ মুসলমান বুড়োর কাছ থেকে, সেই প্রাসাদসৌধের ওপর দিয়ে সেই সিঁড়ি ধরে যে মেয়েটা তরতরিয়ে নেমে আসছে—সে ও নিজেই । সিঁড়ি সিঁড়ি সিঁড়ি সিঁড়ি—সিঁড়ি যেন আর ফুরোয় না ! কলকাতা কতদূর ?

ঈজিচেয়ারেই ধড়ফড়িয়ে সোজা হয়ে বসল অর্চনা ।

...ওটা শেষের অঙ্ক । শুরু ছিল । তারও অনেক আগে...

অস্পষ্টতার আবরণ ভেদ করে জনাকীর্ণ কলকাতা শহরের সদর রাস্তায় একটা দোতলা বাস স্পষ্ট হয়ে উঠল হঠাৎ ।

শুরু সেইখানে ।

## ।। ৩ ।।

ফাঁক পেয়ে অর্চনা সেদিন বাসে করেই য়ুনিভার্সিটি যাচ্ছিল ।

মা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁর সামাজিক কর্তব্যপালনে । সময়মতই ফিরবেন বলে গিয়েছিলেন । অর্চনা ঘড়ি ধরে ঠিক সাড়ে ন-টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে, তারপরেই বেরিয়ে পড়েছে । বাসে করে যেতে তার একটুও খারাপ লাগে না । মায়ের কচকচির জন্য কলের পুতুলের মত গাড়িতেই যেতে হয় বেশিরভাগ । কিন্তু ফাঁক পেলে ছাড়েও না । দশজনের ব্যস্তসমস্ততার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে এ-ভাবে যেতে শুধু ভাল লাগে না, বেশ আত্মনির্ভরশীলতার বোধটুকুও জাগে ।

অথচ অবস্থা তাদের এমন কিছু ভালো নয় । যেটুকু দেখায় সে শুধু মায়ের কেরামতিতে । ঠাট বজায় রাখার জন্য বাবা বেচারীকে এ-বয়সেও কম খাটতে হয় না । পেনসানের পর শুধু বড় বই ক'টার আয়েও চলছে না—স্বনামে বেনামে আরো এটা সেটা লিখতে হয়ই । বাবা বলেন, এইসব আজে-বাজে শটকাট আর নোট লিখে ছেলেগুলোর মাথা খাওয়া হচ্ছে । বাবা চেষ্টা করলেও আজে-বাজে লিখতে পারেন এটা অবশ্য অর্চনা

বিশ্বাস করে না। কিন্তু খুশি মনে যে লেখেন না সেটা বোঝা যায়। না লিখে উপায় কি, প্রিন্সিপালের আর কতই বা পেনসান—তাছাড়া মায়ের যা তাগিদ! একটা গাড়িতে আর চলে না, মেয়েদের অসুবিধে নিজের অসুবিধের ফিরিস্তি দেন ফাঁক পেলেই। বাবার সঙ্গে একটু-আধটু লেগেও যায় এই নিয়ে। অর্চনাকেও মা খুব রেহাই দেন না, এই আদরিণী মেয়ে যদি বাপকে গিয়ে ধরে আর একটা গাড়ির জন্যে তাহলে হয়তো কিছুটা এগোয় গাড়ির জন্যে একটা কিছু নতুন বই লেখা খুব অসম্ভব বলে তিনি মনে করেন না। অর্চনা মাকে খুশি করার জন্যেই বাবাকে আচ্ছা করে বলবে বলে আশ্বাস দেয়। আর বাবাকে বলে, মায়ের সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটি কোরো না, যা বলে বলুক না একটা গাড়ি আছে এই বেশি—আমরা অনায়াসে ট্রামে-বাসে যাতায়াত করতে পারি। বাবাকে আবার সাবধানও করে দেয়, আমি বলেছি বোলো না যেন মাকে, তাহলে দেবে শেষ করে—।

যে-বাসে যাওয়া নিয়ে মায়ের এই আপত্তি, সেই বাসেই আজ এক মন্দ মজা হল না।

অফিস টাইম। দোতলা বাসেও ঠাসাঠাসি ভিড়। বাইরে লোক ঝুলছে, ভিতরেও বহু লোক দাঁড়িয়ে। একটা লেডিস সীটে অর্চনা একা বসে, পাশের জায়গাটুকু খালি। ঠিক তারপরেই এক হাতে মাথার রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক, অন্য হাতে বুকের সঙ্গে ঠেকানো এক গাদা বই। লম্বা-চওড়া চেহারা, সাদাসিধে বেশভূষা। পিছনের চাপে ভদ্রলোকের দাঁড়াতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে বোঝা যায়, এক-একবার টাল সামলানো দায় হচ্ছে।

অর্চনা এক একবার ভাবছে বসতে বলবে, আবার বলছে থাকগে বাবা দরকার নেই, সে-দিনের মত হয় যদি—।

আগে সীট খালি থাকলে এবং কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে বসতেই বলত। আর যাকে বসতে বলা, তার কৃতার্থ ভাবটাও দিব্বি উপভোগ করত। কিন্তু সে দিন কি কাণ্ড, মাগো! ভয়ানক মোটা এক ভদ্রলোকের দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল দেখে বসতে বলেছিল। ভদ্রলোক ইচ্ছে করেই হোক বা সত্যি বেশি মোটা বলেই হোক—অর্চনার প্রাণান্ত অবস্থা। জানলার সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েও শান্তি নেই। আর কোন দিকে না তাকিয়েও অর্চনা বুঝতে পারছিল বাসসুদ্ধ লোক মজা দেখছে। এমনিতেই তো যেদিকে তাকায় জোড়া-জোড়া চোখ গায়ে বিঁধে আছে দেখে!

সেই দিনই অর্চনা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে আর কক্ষনো কাউকে পাশে বসতে বলবে না...তাছাড়া এই ভদ্রলোকও তেমন মোটা না হোক, হৃষ্টপুষ্ট কম নয়—আর হাবভাবও কেমন রুক্ষ-রুক্ষ। এক-একবার বেশ রাগ-রাগ ভাবেই তাকাচ্ছে খালি জায়গাটুকুর দিকে।

কিন্তু অতগুলো বই নিয়ে লোকটির দাঁড়ানো মুশকিল হচ্ছিল ঠিকই। বাস যত এগোচ্ছে, অফিসযাত্রীর ভিড়ও বাড়ছে, আর সেই অনুযায়ী ভারসাম্য রক্ষার ধকলও বাড়ছে। শেষে একটা জোরে ধাক্কা খেয়ে অর্চনার পাশে ধুপ করে বসেই পড়ল সে। অর্চনা ফিরে তাকাল।

কিছু মনে করবেন না, দাঁড়ানো যাচ্ছিল না—।

অর্চনা কিছু না বলে আর একটু ব্যবধান রচনার চেষ্টা করল।

কিন্তু বাসের লোকগুলোর ধরনই আলাদা। ট্রামে উঠলে অন্যরকম। থাকেও কত রকমের লোক! ভিড়ে চাপটা, কিন্তু রসিকতাটুকু আছে। পিছন থেকে একটা ছোকরা টিপ্পনী কেটে উঠল, দাদা ওটা লেডিস সীট—!

কিছু না বলে লোকটি শুধু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার। অর্থাৎ সেটা জেনেই বসা হয়েছে।

বাসে ফাজিল লোকের অভাব নেই। রসিকতার লোভে ঝগড়াটা যেন আর একজন সেধে নিল। দাঁড়ানো যাচ্ছিল না দেখে দাদা বসেছেন, তাতে আপনার মাথাব্যথা কেন মশাই, লেডিস সীট লেডি বুঝবেন—

সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের পাঁজা নিয়েই লোকটি উঠে দাঁড়াল এবং টাল সামলাবার জন্য অন্য হাতে রডটা ধরে বক্তার খোঁজে ফিরে তাকাল। রড ধরা হাতের ঢোলা পাঞ্জাবিটা নেমে আসতে তার পেশীবহুল পুষ্ট বাহুখানা অনাবৃত হল। অর্চনা বেশ ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে।

দ্বিতীয়বার আর টিকা-টিপ্পনী শোনা গেল না। লোকটি পিছনের দিকে একবার সরোষে চোখ বুলিয়ে নিয়ে যেন চ্যালেঞ্জের মাথাতেই অর্চনার পাশে বসে পড়ল আবার। এইভাবে দাঁড়ানো তাকানো আর আবার বসার অর্থ খুব স্পষ্ট। অর্থাৎ অমন ইতর উক্তি আর কানে এলে ফলটা খুব ভালো হবে না।

অর্চনা সবিস্ময়ে এক-একবার আড়ে আড়ে দেখছে লোকটাকে, তার এই জিদ করে বসাটাও খুব অপছন্দ হয়নি যেন।

বাড়ি এসে বরুণাকে বলেছিল কাণ্ডটা। ভাইবোনের মধ্যে বরুণাই ছোট সব থেকে। আই. এ পড়ে, কিন্তু ইয়ারকিতে টইটুম্বুর। অর্চনা অবশ্য খুব নীরস করে বলেনি বাসের গুণ্ডাগোছের ভদ্রলোকের কাণ্ডটা।

বরুণা আকাশ থেকে পড়েছে, গুণ্ডাগোছের ভদ্রলোক কি রে! তারপর গম্ভীর মুখে জেরা করেছে বেছে বেছে সে তোর সীটের গায়ে গিয়েই দাঁড়িয়েছিল কেন—বাসে আর লেডিস সীট ছিল না?

তিলকে তাল করতে বরুণার জুড়ি নেই। প্রথম সুযোগেই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সমাচারটা শোনাল ননিদাকে। দাদার বন্ধু এবং সাইকেল রিকশর ব্যবসায় পার্টনার ননিমাধব। দাদার থেকে বয়সে কিছু ছোট হলেও দাদার একেবারে একনিষ্ঠ ভক্ত। কিন্তু আসল ভক্ত কার, এবং দাদা বাড়ি থাক বা না থাক, যখন তখন বাড়ি এসে বসে থাকে কোন প্রত্যাশায়, সেটা অর্চনাও যেমন জানে বরুণাও তেমনি জানে। অর্চনাকে দেখলেই তার ফর্সা মুখ লাল হয় আর পকেট থেকে রুমাল বেরোয়। আর তার সামনা-সামনি কোন লজ্জার কারণ ঘটলে (দিদির সামনে লজ্জার কারণটা বেশিরভাগ বরুণাই ঘটিয়ে থাকে) রুমালের ঘষায় ঘষায় ননিমাধবের ফর্সা মুখ রক্তবর্ণ হয়। দাদার সাময়িক অনুপস্থিতির ফাঁকে তার কাছেই বরুণা প্রথম দু-চোখ কপালে তুলে বাসের মধ্যে দিদিকে গুণ্ডায় ধরার ব্যাপারটা নিবেদন করেছে।

কিন্তু বরাতক্রমে সেখানে মা এসে পড়বেন সে কি বরুণা জানত। এসে যখন পড়েছেন, তাঁকেও সানন্দে ঘটনাটা না বলে পারল না, আর এখানে গুণ্ডাগোছের ভদ্রলোক না বলে শুধু গুণ্ডাই বলল। শোনার সঙ্গে সঙ্গে মা যেমন উত্তেজিত তেমনি ক্রুদ্ধ। প্রথমে অর্চনার উদ্দেশেই হাঁকডাক করলেন একপ্রস্থ। অর্চনা তখন নিজের ঘরে বসে বরুণার উদ্দেশ্যে কিল জমাচ্ছে। ওদিকে ননিমাধব ইন্ধন যোগালো আরো। মন্তব্য করল, ট্রামে-বাসে আজকাল ভদ্রলোকের মেয়েদের চড়াই উচিত নয়।

হাতের কাছে আর কাউকে না পেয়ে মিসেস বাসু তাকেই দিলেন এক ঘা।—তোমরা তো ব্যবসাই করছ দেখি বছরের পর বছর, একটা গাড়ি পর্যন্ত কিনে উঠতে পারলে না —ট্রামে বাসে না চড়ে কিসে চড়বে ?

ননিমাধব আর ভরসা করে বলতে পারল না যে গাড়ি একটা আছেই।

গাড়ির জন্যে স্বামীকে নতুন করে এক প্রস্থ ঝালিয়ে নেবার সুযোগ ছাড়লেন না মিসেস বাসু। অর্চনাকে ছেড়ে আপাতত তাঁর উদ্দেশেই চললেন।

দোতলার কোণের দিকে একটা ঘরে থাকেন ডক্টর বাসু। তাঁর ডক্টরেক্টর বিষয়বস্তু দর্শনশাস্ত্র। অবশ্য ইংরেজিতেও এম. এ. ভদ্রলোক, কিন্তু দর্শনেরই যে প্রভাব বেশি সেটা তাঁর অবিরাম চুরুট-খাওয়া মূর্তি আর ঘরের অগোছালো অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। একদিকে অবিন্যস্ত শয্যা, তারই ওপর স্তূপীকৃত বই—র‍্যাকের বইগুলো উলট-পালট—টেবিলেও বইয়ের গাদা আর বইপত্র ছড়ানো। তারই মধ্যে কখনো বা টেবিলে-চেয়ারে বসে দিব্বি নিবিষ্ট মনে কাজ করে যান ভদ্রলোক। শুধু অর্চনা ছাড়া কেউ আর এইসব বইপত্র ছুঁতেও সাহস করে না। সপ্তাহের মধ্যে কম করে তিনদিন বাবার ঘর গোছায় অর্চনা আর অনুযোগ করে, কবে হয়তো দেখব তুমি বই চাপা পড়ে আছ—

বইপত্রের মধ্যেই আধশোয়া হয়ে আত্ম-তত্ত্বের একটা ইংরেজী প্রবন্ধ পড়ছিলেন তিনি। আর মনে মনে ভাবছিলেন, অর্চনা যদি এসে থাকে তাকে পড়ে শোনাবেন। বাবার কাছে বসে এই শোনার ধকলটা অর্চনাকে মুখ বুজে সইতে হয়। সয়ও, কারণ রিটায়ার করার পর আর সময় কাটে না, বেচারা বাবা করবেনই বা কি সারাক্ষণ ! কিন্তু ওর বদলে যিনি এলেন, ভদ্রলোকের আত্মতত্ত্বোপলব্ধির মেজাজটা রসাতলে গেল।

মিসেস বাসু ঘরের বাইরে থেকেই কণ্ঠস্বরে আগমন ঘোষণা করতে করতে এলেন। —কতদিন বলেছি একটা গাড়িতে চলে না, চলে না—আর একটা গাড়ি কেনো ! একটা বিপদ না বাধলে আমার কথা কি কানে যাবে।

ডক্টর বাসু আত্মতত্ত্ব থেকে মুখ তুলে বুঝতে চেষ্টা করলেন কি ব্যাপার, তারপর নিস্পৃহ মুখে জবাব দিলেন, কথা কানে গেলেই তো আর গাড়ি কেনা যায় না, টাকা লাগে—।

টাকা লাগে, টাকা লাগবে। এই এক অজুহাত আর যেন বরদাস্ত করতে রাজী নন মিসেস বাসু। মেয়েটা ধেই-ধেই করে ট্রামে-বাসে যাক আর যতসব পাজী গুণ্ডার খপ্পরে পড়ুক, কেমন ?

ডক্টর বাসু অবাক, ট্রামে-বাসে গুণ্ডা !

মাকে গজগজিয়ে বাবার ঘরের দিকে যেতে দেখেই তাল সামলাবার জন্যে অর্চনাকে মায়ের অগোচরে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতে হয়েছে। পিছন থেকে তার গা ঘেঁষে বরুণাও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। মা সামনের দিকে মুখ করে আছেন, কিন্তু বাবা দেখতে পাচ্ছেন তাদের। অর্চনা ইশারায় হাত নেড়ে বাবাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা কিছুই নয়।

স্বামীর অজ্ঞতায় মিসেস বাসু প্রায় হতাশ। জবাব দিলেন কোথায় কি সে জ্ঞান যদি তোমার থাকত তাহলে আমার আর ভাবনা ছিল কি। মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ কি হয়েছে আজ—

বলতে বলতে স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরে দেখেন দরজার ওধারে অর্চনা আর

বরুণা দাঁড়িয়ে। মায়ের চোখে চোখ পড়তে বরুণা কেটে পড়ল, অর্চনা সামলে নিয়ে নিরীহ হতে চেষ্টা করল। মেয়েকে ডাকার কাজটা মিসেস বাসুই করলেন।—এই যে, এসে বল কি হয়েছে আজ—

অর্চনা দরজার কাছ থেকেই ঢোঁক গিলে বলল, তুমিই বলো না আমি কি আর তোমার মত করে বলতে পারব—।

ব্যাপার কিছু নয় বুঝে ডক্টর বাসু আত্মতত্ত্বে ডুব দিতে চেষ্টা করলেন আবাব। কিন্তু সেই চেষ্টার আগেই স্ত্রীটি কাগজটা নিয়ে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে রাখল।—মেয়েরা আর একদিনও ওভাবে ট্রামে-বাসে যাবে না আমি বলে দিচ্ছি!

ডক্টর বাসু বিরক্ত হলেন, গাড়ি কি নেই নাকি! তাছাড়া হাজার হাজার মেয়ে দিনের পর দিন ট্রামে বাসেই যাচ্ছে।

সে যাচ্ছে যাক, আমি জানতে চাই তুমি আর একখানা গাড়ি কিনবে কি না!

স্ত্রীর এই অবুঝপনাই ডক্টর বাসু বরদাস্ত করে উঠতে পারেন না সব সময়। উঠে বসে অসহিষ্ণু বিরক্তিতে বলে উঠলেন, কিনব কি দিয়ে, টাকার জন্যে তো দিনরাত নোট লিখে লিখে ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছি—তাতেও রেহাই নেই। তোমার বাড়ি, তোমার গাড়ি, তোমার শাড়ি, তোমার পার্টি—

অর্চনা পালিয়ে বাঁচল। আর বরুণাকে হাতের কাছে পেয়ে সত্যিই গোটাকতক কিল বসিলে দিল গুম গুম করে।—পাজী মেয়ে, তোর জন্যেই তো—।

কিলগুলো খুব আস্তে পড়েনি, তবু সেগুলি হজম করে বরুণা হেসে গড়াগড়ি।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হবার কথা, কিন্তু উদ্দেশ্য নিয়ে ওপরওয়ালা যে যোগাযোগ ঘটান, সেটা সুদূরপ্রসারীও হয়।

বাড়ির গাড়িতে য়ুনিভার্সিটি যাবার পথে অর্চনা বাস-স্টপে সেই একরোখা লোকটাকে বাসের অপেক্ষায় একগাদা বই হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে পর পর আরো দুদিন। এক পথেই যায়, আর লোকটা এক জায়গা থেকেই ওঠে যখন, দেখতে পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। অর্চনা একদিন ভেবেছে, এই বয়সেও কলেজে পড়ে নাকি! আর একদিন ভেবেছে, মোটরে তুলে নিলে কি হয়? কিন্তু একা সাহস হয় না, বরুণা থাকলে ঠিক মজা করা যেত। বরুণার কলেজ বাড়ির কাছেই, সে অনেক আগেই নেমে পড়ে। তা বলে সত্যিই লোকটার সম্বন্ধে তেমন কোন কৌতূহলই ছিল না—ওই দেখার মুহূর্তটুকু যা।

কিন্তু কৌতূহলের কারণ ঘটল একদিন!

বাবার ঘরে সেদিন সন্ধ্যায় অর্চনা তাঁর কি একটা লেখা নকল করে দিচ্ছিল। মা-ও ছিলেন ঘরে। বাবার ট্রাঙ্ক খুলে ব্যাঙ্কের পাস-বইয়ের জমাখরচ দেখছিলেন। টেলিফোন বেজে উঠতে বাবা টেলিফোন ধরলেন। কথাবার্তায় মনে হল বাবা কারো স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার খবর শুনে খুশি হয়েছেন। অর্চনার মনে পড়ল, ইলা-মাসীর ছেলে মিণ্টু এবারে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে বটে। ইলা-মাসী বাবার ব্যারিস্টার বন্ধুর স্ত্রী, মায়ের অন্তরঙ্গ বান্ধবী। অর্চনা-বরুণারও যাতায়াত আছে সেখানে।

টেলিফোনে কিছু শুনেই বাবা যেন থমকে গেলেন। বিব্রত কণ্ঠ কানে এলো, অ্যাঁ? পা-পার্টি—হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়, কবে—?

মায়ের কানে কিছুই যায়নি বোধহয় এতক্ষণ, পার্টি শুনে ঘাড় ফেরালেন । তারপর ইশারায় জানতে চাইলেন, কে— ?

বাবার মুখভাব বদলেছে, কিন্তু মুখে খুশির ভাবই প্রকাশ করেছেন । মায়ের ইশারার জবাব না দিয়ে ফোনের জবাবটাই শেষ করলেন, খুব ভাল কথা, তা আপনি বরং আমার স্ত্রীর সঙ্গেই পরামর্শ করুন—( হাসি ) হ্যাঁ—আমি তো তাঁর ওপরেই সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, ধরুন একটু—

মিসেস বাসু ততক্ষণে কাছে উঠে এসেছেন । টেলিফোনের মুখটা চেপে তাঁর দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে ডক্টর বাসু সংক্ষিপ্ত উক্তি করলেন পার্টি—

অর্চনার মজা লাগছিল, পাছে বাবার চোখে চোখ পড়ে যায় সেইজন্য তাড়াতাড়ি মুখ নামালো । টেলিফোনে মায়ের আনন্দটুকু আরো উপভোগ্য । মিণ্টু স্কুল ফাইন্যালে একেবারে প্রথম হয়েছে শুনে একটু একটু আনন্দ প্রকাশ করলে চলে ! আর সকলে মিলে আনন্দের ব্যবস্থা একটু ? তা তো করতেই হবে, ওকে এনকারেজ করতে হবে না ! সে-জন্যে ভাবনা কি, কিছু ভাবনা নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে । উনি— ?

এবারে বাবার কথা বোধহয় । বাবা বইয়ে মন দিয়েছেন । অর্চনা ঘরে আছে তাও মায়ের খেয়াল নেই বোধহয় । বাবার হয়ে একেবারে নিশ্চিন্তে কথা দিয়ে দিচ্ছেন, আর বাবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ !—হ্যাঁ, নিশ্চয় যাবেন, নিজে কতবড় স্কলার জানো তো, এসব ব্যাপারে ওঁর খুব উৎসাহ । মেয়েরা একবার একটু খারাপ রেজাল্ট করলে ওঁর ভয়ে আমি সুদ্ধ চুপ— !

অর্চনার হাসি সামলানো দায় । চেয়ে দেখে বাবাও ওর দিকে চেয়ে হাসছেন । মা টেলিফোন রেখে বিছানায় বসলেন । দরজার ওধারে চোখ পড়তেই ডাকলেন এই দাশু, শোন্—

দাশু ঘরে এসে দাঁড়াল ।

দাদাবাবু কি করছে ?

দাশু নির্বিকার জবাব দিল, ব্যবসা কচ্ছেন—

কি— ? মায়ের বিরক্তি ।

দাশু ব্যাখ্যা করে বোঝালো, নিচে দাদাবাবু আর ননিবাবুতে বসে কাগজে ব্যবসা লিখছেন ।

মায়ের মাথায় অনেক ভাবনা । হুকুম করলেন, গিয়ে বল্, আমি ডাকছি—দাশু চলে গেল, মা ঘুরে বসলেন বাবার দিকে ।—শুধু হাতে তো আর যাওয়া যায় না, ছেলেটাকে একটা ঘড়িই দেওয়া যাক । বিজন গিয়ে দেখেশুনে আজই নিয়ে আসুক । কি বলো ?

বই রেখে বাবা চুরুটের বাক্সর দিকে হাত বাড়ালেন । বইয়ের সাইজের সুন্দর একটা কাশ্মীরী কাজ-করা কাঠের বাক্সে চুরুট থাকে । ভয়ে ভয়ে অর্চনা বাক্সটা বাবার দিকে এগিয়ে দিল । মুখ বন্ধ করার জন্যই যেন তিনি আস্ত একটা চুরুট নিজের মুখগহ্বরে ঠেলে দিলেন ।

ইলা-মাসির বাড়ির এই পার্টিতে অর্চনা এসেছিল । স্বেচ্ছায় আসেনি, আসতে হয়েছিল । মায়ের এইসব আভিজাত্য রক্ষার ব্যাপারে বরুণা তবু পার পায় কিন্তু ও বড় পায় না । অবশ্য এবারে বরুণাও রেহাই পায়নি । বাবা আসেননি । আসবেন না অর্চনা জানতই । ইলা-মাসি

খোঁজ করেছিলেন । মা জবাবদিহি করেছেন, আর বলো কেন ভাই, আসতে পারলেন না বলে তাঁর নিজেরই কি কম দুঃখ—হঠাৎ শরীরটাই খারাপ হয়ে পড়ল ।...যাই হোক, মায়ের সঙ্গে অর্চনা আজ পর্যন্ত যত জায়গায় গেছে, তার মধ্যে এবারে এই ইলা-মাসির বাড়ি থেকেই মনে মনে একটু খুশি হয়ে ফিরেছে ।

ছেলের পরীক্ষার কৃতিত্ব উপলক্ষে ঘরোয়া পার্টি হলেও অভ্যাগত একেবারে কম জোটাননি ইলা-মাসি । এখানে যাঁদের দেখল, তাঁদের সকলকেই কারো না কারো জন্মদিনের অনুষ্ঠানেও দেখেছে, সাংস্কৃতিক জলসা বা নাচের আসরেও দেখেছে আবার রিলিফ চ্যারিটি শোতেও দেখেছে । নতুনের মধ্যে শুধু মিণ্টুর দু-চারজন বন্ধু-বান্ধব । কাজেই এ অনুষ্ঠানেও অভিনবত্ব কিছু ছিল না, আর অর্চনা ভাবছিল কতক্ষণে শেষ হবে, কতক্ষণে বাড়ি যাবে ।

বৈচিত্র্যের কারণ ঘটল খাবার টেবিলে ।

হল-ঘরে মস্ত একটা ডিম্বাকৃতি ডাইনিং টেবিল । চারদিকে গোল হয়ে বসেছেন সব । একটা ধার নিয়ে বসেছিল অর্চনা আর বরুণা । মায়ের হয়তো টেবিলের মাঝামাঝি বসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মেয়েরা বসে পড়েছে দেখে বরুণার পাশে এসেই বসলেন তিনি । টেবিল ঘুরে তাদের উল্টোদিকে কয়েকটা আসন খালি, কেউ তখনো আসেননি হয়তো ।

খাবার টেবিলের প্রধান আলোচনা, ছেলে মিণ্টু ভবিষ্যতে কোন্ লাইনে যাবে আর কি পড়বে । ছেলে আর ছেলের বন্ধুরাও হাঁ করে সেই আলোচনা শুনছে । বরুণার ভাল লাগছিল না, অর্চনা অন্যদিকে তাকাতেই সে টুক করে তার প্লেটের কাটলেটটা নিজের প্লেটে তুলে নিল । অর্চনা দেখে ফেলে হাসি চেপে ভ্রূকুটি করে তাকাল তার দিকে । বরুণা চাপা গলায় বলল, তুই আর একটা চেয়ে নে না—।

দুই বোনে এমনই চলত বোধহয় । ঠিক সেই সময়ে নতুন আগন্তুকের আবির্ভাব । আর তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অর্চনা প্রায় হাঁ !...বাসের সেই লোকটা । বাসের মতই তেমনি সাদাসিধে বেশ-বাস । এ-রকম পরিবেশে একেবারে বে-মানান ।

মিণ্টুর বাবা উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন মিঃ মিত্র, আপনি কিন্তু লেট, বসে যান—।

লেট হওয়ার দরুন মিঃ মিত্রের কিছুমাত্র কুণ্ঠা দেখা গেল না । হাসিমুখে সে মিণ্টুর দিকে এগিয়ে গেল । অর্চনা বরুণার কানে কানে যোগাযোগের বৈচিত্র্যটা জ্ঞাপন করতেই সে যুগপৎ আনন্দ আর বিস্ময়ে আগন্তুকের দিকে চেয়ে দুই চোখের বিশ্লেষণের কাজটা সেরে নিল । লোকটা তখন মিণ্টুর পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে ।

আনন্দমিশ্রিত উত্তেজনায় বরুণা মাকে ফিসফিস করে বলল, মা—দিদির বাসের সেই গুণ্ডা ।

মিসেস বাসু আগে লোকটাকে এক নজর দেখেছেন কি দেখেননি । এবারে ভাল করে দেখায় মন দিলেন । মিণ্টুর কাছ থেকে এগিয়ে গিয়ে লোকটি তখন খালি আসনের একটাতে বসল । অর্চনা-বরুণার ঠিক উল্টোদিকে নয়—কিছুটা আড়াআড়ি । মিসেস বাসুর দৃষ্টিও সেখানেই এসে থামল । এ-রকম বেশভূষার একটা লোক এখানে কেন, সেটাও বোধ করি তাঁর কাছে বিস্ময় একটু ।

এদিকে অর্চনা আর বরুণাও চেয়ে আছে ।

সকলের অগোচরেই ছোট্ট প্রহসনের সূচনা একটু। খাবারের প্লেট কাছে টানতে গিয়ে ওধারে অর্চনার চোখে লোকটির চোখ পড়ল। অর্চনা খাবারের প্লেটে দৃষ্টি নামাল। কিন্তু বরুণার সে কাণ্ডজ্ঞান নেই। হাঁ করে সে আর একটি দুর্লভ খাদ্যবস্তুই দেখছে যেন।

খেতে খেতে লোকটি আরো দুই একবার দেখল তাদের। কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছে বোঝা যায়। অর্চনাব সঙ্গে আর একবার চোখাচোখি হতেই সামনের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো ?

ওখানে থেকে ওভাবে প্রশ্ন নিক্ষেপ করা সুশোভন নয়। দুই একজন প্রৌঢ় এবং প্রৌঢ়া হাসি গোপন করে গেল। না দেখে থাকলেও দেখার লোভটা যেন স্বাভাবিক সেটা তাঁরাও অস্বীকার করেন না। এটা তাঁরা প্রাথমিক আলাপের চেষ্টা বলেই ধরে নিলেন। অর্চনা অতদূর থেকে হঠাৎ এ-ভাবে আক্রান্ত হয়ে বিব্রত মুখে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, মনে পড়ছে না।

মিসেস বাসু ভুরু কোঁচকালেন। বরুণা চাপা পুলকে দিদিকে বেশ করে চিমটি কাটল একটা।

ওদিকে টেবিলের আলোচনাটা মিণ্টুর ভবিষ্যতের দিকেই ঘুরেছে আবার। এক ভদ্রলোক মিণ্টুব বাবাকে পরামর্শ দিলেন, আপনি এক কাজ করুন মিঃ খাস্তগীর, বি. এ. পাস করিয়ে ওকে সোজা আই. এ. এস্-এ বসিয়ে দিন—

তাঁর পাশের মহিলাটির তাতে আপত্তি। তিনি মত প্রকাশ করলেন, ও চাকরিতে আছে কি—আই. এস্-সি, পাস করিয়ে ওকে বরং ডাক্তারি পড়তে দিন।

এ ধার থেকে এক ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, ডাক্তারি থেকে আজকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ভাল—পাস কবে একবার বাইরে ঘুরে এলেই ব্রাইট ফিউচার।

বরুণা দেখল তার দর্শনীয় লোকটা খাওয়া ফেলে হাঁ করে মতামত শুনছে। পাশ থেকেহ এবারে তারই মা বলে উঠলেন, আমি বলি ইলা, আই. এস্-সি, পাস করিয়ে মিণ্টুকে তুমি মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংএ দিয়ে দাও। আমার সেই বোনপোকে তো জানো, ওই তো বয়েস—এরই মধ্যে কত বড় অফিসার।

নতুন কিছুই বলেছেন। মিসেস বাসু অন্তরতুষ্টিতে সকলের দিকে তাকালেন। আর শুধু বরুণা নয়, অর্চনাও দেখল, এবারে ঐ লোকটার নীরব বিস্ময় আর কৌতুকের কেন্দ্র তাদের মা।

এতজনেব পরামর্শের মধ্যে পড়ে মিণ্টুর বাবাকেও একটু চিন্তিত দেখা গেল। তিনি বললেন, তাই তো, এ এক সমস্যা। কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য একটি লোক উপস্থিত এখানে, সেটা যেন এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। খেয়াল হতে ঘাড় ফেরালেন, মিঃ মিত্র অমন চুপচাপ কেন আপনিই তো বলবেন—

সকলের চোখ এদিকে আকৃষ্ট হতে মিণ্টুর বাবা আবার বললেন, ও...এঁকে আপনারা চেনেন না বোধহয়—প্রফেসর সুখেন্দু মিত্র—মিণ্টু যে প্রথম হতে পেরেছে সে তো ওঁরই হাতযশ।

প্রশংসা শুনেও হাত-যশস্বী লোকটা তেমন প্রীত হয়েছে মনে হল না অর্চনার। বরুণা ফিস ফিস করে মাকে আবার বলল, গুণ্ডা নয় মা, প্রফেসর—।

মিসেস বাসু প্রায় আত্মগত মন্তব্য করলেন, মাস্টারের চেয়ে গুণ্ডা ভাল—

সকলেরই খাওয়া শেষ প্রায় । সুখেন্দু মিত্র ঝুঁকে দেখল, মিন্টুরাও হাত গুটিয়ে বসে আছে । বাপের কথার জবাব না দিয়ে ছেলের উদ্দেশ্যেই আগে বলল, তোমাদের তো খাওয়া হয়ে গেছে দেখছি মিন্টুবাবু...ভাল ভাল দুটো বই এনেছি তোমার জন্য, পড়ার টেবিলে আছে—দেখগে যাও । বন্ধুদেরও নিয়ে যাও—

এই রকম একটা অবতরণিকা অপ্রত্যাশিত । মিন্টুরা বেরিয়ে গেল । অভ্যাগতরা একটু যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন । এইবার ছেলের বাপের দিকে ঘুরল সুখেন্দু মিত্র, হেসেই বলল, পরীক্ষায় প্রথম হওয়াটা যে বিশেষ কিছু সেটা ও এভাবে না জানলেই ভাল হত । মিন্টু আই. এস্-সি পড়বে আপাতত এর বেশি ভাবার দরকার আছে বলে তো আমার মনে হয় না ।

সকলেরই একটু-আধটু অপ্রতিভ অভিব্যক্তি । কালচারের সংজ্ঞায় প্রতিবাদ সৌজন্য-বিরোধী, কাজেই এ-রকম শুনতে তেমন অভ্যস্তও নয় কেউ । বরুণা প্রথমে হাঁ, তার এবারের চিমটি খেয়ে অর্চনা অস্ফুট শব্দ করে উঠল একটু । অসহিষ্ণু মিসেস বাসুর ঠোঁটদুটো একবার নড়ল শুধু । অশ্রুত উক্তি, কাজেই শোনা গেল না ।

নিচের ঘরে টেবিলের একদিকে বসে কাগজ কলম নিয়ে নিবিষ্ট একাগ্রতায় সাইকেল-রিকশর ব্যবসা বাড়ানোর স্কীম ছকে যাচ্ছে অর্চনা-বরুণার দাদা বিজন । ব্যবসা অনেকদিনই করেছে, স্কীমও নতুন নয় । তবে এতদিনে সেটা কিছুটা পরিণতির মুখে এসেছে । টাকার আশ্বাস কিছুটা পেয়েছে । তাই স্কীম করার একাগ্রতাও বেড়েছে । তার সামনে চেয়ারে বসে তেমনি মন দিয়ে ঘরের কড়িকাঠ দেখছে ননিমাধব । বিজনের অগোচরে এক-আধবার ঘড়িও দেখছে । য়ুনিভার্সিটি চারটেয় ছুটি হলেও মোটরে বড়জোর আসতে লাগে আধ ঘন্টা । তার মানে এখনো আধ ঘন্টার ধাক্কা । গতকাল ছুটির দিনটা মাটি হয়েছে । ফ্যাক্টরি থেকে টেলিফোনে বরুণার অনুমতি চেয়েছিল, থিয়েটারের টিকিট কাটবে কিনা । অনুমতিটা আসলে কার দরকার সেটা বরুণাও ভালই জানে । তবু দিদিকে জিজ্ঞাসা না করেই সাফ জবাব দিয়েছে কোন আশা নেই, কাল ইলা-মাসির বাড়িতে পার্টি ।

আবার ছুটির দিন আসতে ছ'টা দিন...!

ঘরের কোণে ঈজিচেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে একটা নতুন উপন্যাসে ডুবে আছে বিজনের স্ত্রী ইন্দ্রাণী দেবী, সংক্ষেপে রাণু বউদি । কি একটা কাজে বিজন ফ্যাক্টরি থেকে আগেই বেরিয়েছিল । ননিমাধবকে বলে গিয়েছিল সে যেন সাড়ে তিনটেয় বাড়ি আসে —জরুরী আলোচনাটা সেখানে বসেই হবে । ননিমাধব সাড়ে তিনটেয় না এসে তিনটেয় এসেছিল । য়ুনিভার্সিটি তো কত কারণেই ছুটি থাকে, বরাত ভাল থাকলে আজও ছুটি থাকতে বাধা কি । বিজুদা আসার আগে আধ ঘন্টা সময় পাওয়া যাবে তাহলে । কিন্তু বরাত ভাল নয় । এসে শুনল য়ুনিভার্সিটি খোলাই । বাড়িতে আর কেউ না-থাকায় দাশু রাণু বউদিকে খবর দিয়েছে । ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাণু দেবীকে বই হাতে করেই উঠে আসতে হয়েছে । গল্পের বই হাতে পেলে আহার-নিদ্রা ঘুচে যায় মহিলার । তার ওপর তেমনই বই এটা । আগুন, আগুন । ডবল আগুনের তাপ বোধহয় অনেকদূর পৌঁছেছে । বিজনের সাড়া পেয়ে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে অতিথি-আপ্যায়নের দায় শেষ করে ঈজিচেয়ারে আশ্রয় নিয়েছে ।

এখানেই নিরাপদ, ওপরের ঘরে ঘরে এক্ষুণি শাশুড়ী ঠাকরুণ টহল দেবেন—তার হাতে বই দেখলে সকলেরই চোখ টাটায়। অবশ্য, আবার আগুন-আগুনে ঝাঁপ দেবার আগে দাশুকে খাবার আর চায়ের নির্দেশ দিয়ে এসেছে, নইলে পাঠে বিঘ্ন ঘটবে জানা কথাই।

খানিকক্ষণ হল দুজনের সামনেই খাবার রেখে গেছে দাশু। এবারে ট্রেতে চা এনে দেখে খাবারের প্লেট ছোঁয়াও হয়নি। সকলের অগোচরে একটা নীরব অভিব্যক্তি সম্পন্ন করে ব্যবসায়ী দুটিকে সচেতন করাবে আশায় দাশু যার দিকে ফিরে তাকাল—সে আরো অনেক দূরে। মলাটের গায়ে ডবল আগুন থেকে ত্রস্তে দাশু এদিকেই ফিরল আবার, তারপর গলা দিয়ে একটা ফ্যাসফেসে শব্দ বার করে নীরবতায় ব্যাঘাত ঘটাল।

বিরক্তমুখে বিজন মুখ তুলে তাকাল।—রেখে যা।

চা রেখে দাশুর প্রস্থান। এই সুযোগে ননিমাধব নড়েচড়ে বসে খাবারের প্লেটটা কাছে টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু হল না। বিজনের লেখার কাজ শেষ হয়েছে। ব্যবসায়ের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের চিত্রটা এঁকে ফেলে টাকার অঙ্কটা মোটামুটি হিসেব করে ফেলেছে। বলল, আচ্ছা শোনো—

ননিমাধব শোনার জন্য হাত গুটিয়ে নিল।

এখন আমাদের সাইকেল-রিকশর প্রোডাকশন ডেলি ধরো তিনটে—

ননিমাধব চিন্তা করল একটু।—সাড়ে তিনটেও ধরতে পারো।

ও সাড়ে-টাড়ে ছাড়ো—তিনটেই। আমাদের করতে হবে ডেলি কম করে দশখানা—তাহলে লোক বাড়াতে হবে অন্তত তিনগুণ, ফ্যাক্টরির স্পেস চাই দ্বিগুণ। এই মেসিন-পত্রের লিস্ট—এগুলো তো আনাতেই হবে।...সব খরচা ফেলেছি দেখ আপাতত তিরিশ হাজার টাকার নিচে হবে না। স্কীমটা নিয়ে গিয়ে তোমার বাবাকে বেশ বুঝিয়ে টাকার কথা বলো—

টাকার অঙ্কটা শুনে ননিমাধব ঢোঁক গিলে বলল, বলেই ফেলি, অ্যাঁ?

নিশ্চয়। এরপর আর যত দেরি হবে তত ক্ষতি—

ক্ষতিপূরণের মত করেই খাবারের ডিশটা হাতের কাছে টেনে নিল সে। কিন্তু এবারে তার সেই চেষ্টাযও ব্যাঘাত ঘটল। ননিমাধব আমতা আমতা করে বলল, আচ্ছা বিজুদা, টার্গেটটা একেবারেই দশটা না করে আমরা যদি এখন ছ'টা করি—

ছটা! পার্টনারের প্রস্তাব শুনে বিজন আহত।—দশটাই তো কিছু নয়। নতুন প্ল্যানে হাজার হাজার মাইল রাস্তা হচ্ছে এখন—সর্বত্র তো সাইকেল-রিকশই চলবে। যে-রেটে ডিম্যাণ্ড বাড়ছে, দাঁড়াও, দেখাই—

স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল—রাণু, আমার সেই চার্ট আর—

থেমে গেল। স্ত্রী এ রাজ্যে নেই। বিরক্তমুখে নিজেই চেয়ার ঠেলে উঠে চার্ট আর প্ল্যান আনতে বেরিয়ে গেল সে।

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে এবারে নানাবিধ খাবারের ডিশটা সামনে টেনে আনল। চা তো জুড়িয়ে জল। কিন্তু খাওয়া আজ কপালে লেখা নেই বোধহয়। বাইরের বারান্দা ধরে টকটক জুতোর শব্দ শোনা গেল। বলা বাহুল্য সে শব্দ কোন পুরুষ-চরণের নয়। ননিমাধবের মুখের রঙ বদলায় সঙ্গে সঙ্গে। খাবার ছেড়ে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল

বার করল সে। কিন্তু সেটা মুখ পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই দোরগোড়ায় যে এসে দাঁড়িয়েছে, সে বরুণা।

বরুণা জানান দিল, দিদি নয়, আমি।

হাসতে চেষ্টা করে ননিমাধব বলল, হ্যাঁ—। রুমালটা পকেটে।

বরুণা ঘরে ঢুকে সরাসরি দাদার চেয়ারেই বসে পড়ল। ঝুঁকে বউদির হাতের বইখানার নাম পড়ে ছোটখাটো মুখভঙ্গি করল একটা। তারপর ননিমাধবের দিকে তাকাল।

ননিমাধব জিজ্ঞাসা করল, কাল পার্টিতে গেছলে?

তাকে দেখে এই রসদটা পরিবেশন করার আগ্রহেই বরুণার ঘরে ঢোকা। সোৎসাহে জবাব দিল, হ্যাঁ—আর, কি কাণ্ড জানেন?

ননিমাধবের চোখে কাণ্ড শোনার আগ্রহ।

বরুণা বলল, পার্টিতে সেই বাসের গুণ্ডা—সেই যে সেই—

ননিমাধব ত্রস্তে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ বুঝেছে। গলা নামিয়ে বরুণা হতাশ ভঙ্গিতে যোগ করল, গুণ্ডা নয়, প্রফেসর! মা অবশ্য বলে, প্রফেসারের থেকে গুণ্ডা ভাল! চেয়ারে ঠেস দিয়ে আর একটুও জুড়ে দিল, সাইকেল রিকশাঅলাও বোধহয় ভাল।

ঠাট্টায় কান না দিয়ে ননিমাধব জিজ্ঞাসা করল—মানে, সে সেখানে ছিল?

শুধু ছিল। জাঁকিয়ে ছিল।—তারপর নির্লিপ্তমুখে খবরই দিল যেন, আমাদের সঙ্গে কত খাতির হয়ে গেল, আর দিদি তো সারাক্ষণ তার সঙ্গেই গল্প-সল্প করল।

বাইরে গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ। বিজুদা হয়তো হাতের কাছে কাগজপত্র খুঁজে পায়নি। ননিমাধব মনে মনে প্রার্থনা করল, চট করে যেন না পায়, কারণ এবারের শব্দটা আর ভুল হবার নয়। বরুণাও সেই শব্দের উদ্দেশে একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করল। অর্থাৎ, ওই আসছে—

ননিমাধবের হাতটা আপনা থেকেই পকেটে গিয়ে ঢুকল আবার।

অর্চনাই। দরজার কাছ থেকে একপলক সকলকে দেখে নিয়ে হাসিমুখেই বউদির পিছনে এসে দাঁড়াল। বইখানা দেখল। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে এগিয়ে এসে ঈজিচেয়ারের হাতলের ওপরেই বসল। রাণু দেবীর হুঁশ ফিরল এতক্ষণে।

আহা, আগুন নিভিয়ে ফেললাম?

বিব্রত হলেও রাণু দেবীর চোখের সামনেই জবাব মজুত। ননিমাধবের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি মশাই আগুন নিভেছে?

ননিমাধব বিগলিত, এর পরেই হাতের রুমাল মুখে না উঠে থাকে কি করে। দেখাদেখি বরুণাও গম্ভীর মুখে তার রুমাল বার করে মুখ মুছতে লাগল। হাসি চেপে অর্চনা ভ্রূকুটি করে তাকাল তার দিকে, এই—তুই ওখানে কি কচ্ছিস রে?

রুমাল নামিয়ে বরুণা ধীরে-সুস্থে জবাব দিল, কালকের পার্টিতে সেই গুণ্ডা প্রফেসারের সঙ্গে তোর কেমন ভাব হয়ে গেছে ননিদাকে সেই কথা বলছিলাম। রাগতে গিয়েও অর্চনা হেসেই ফেলল। ননিমাধব এতক্ষণে কথা বলার ফুরসত পেল।—আজ এত দেরিতে ছুটি যে?

রাণু দেবী যোগ করল, ভারি অন্যায়—।

অর্চনা হাসিমুখে ফিরে ননিমাধবকেই জিজ্ঞাসা করল, আপনার এত সকাল সকাল ছুটি যে, ফ্যাক্টরি তো পাঁচটা পর্যন্ত ?

ননিমাধব জবাব হাতড়ে পাওয়ার আগেই রসভঙ্গের মত মূর্তিমান জবাবটি এসে হাজির। বিজন। হাতের কাছে সত্যিই কাগজপত্রগুলো না পেয়ে বিলক্ষণ বিরক্ত। তার ওপর এরা। বরুণা অবশ্য জিভ কামড়ে তৎক্ষণাৎই উঠে পড়েছে, তবু রেহাই পেল না। বিজন বলল, কাজের সময় সব এখানে কেন, বাড়িতে আর জায়গা নেই ! যা পালা—

অর্চনা উঠে দাঁড়িয়ে দাদার বিরক্তি আর ব্যস্ততা নিরীক্ষণ কবল একটু। তারপর টিপ্পনী কাটল, বা-ব্বা ! সাইকেল-রিকশতেই এই—এরোপ্লেন হলে না জানি কি হত !

বরুণা ননিমাধবের কাছে যেমন ঠাট্টাই করুক, ফাঁক পেলে এবারে সেই লোকটার সঙ্গে একটু যোগাযোগের বাসনা হয়তো মনে মনে অর্চনারও ছিল। লোকটার আচরণে মা স্পষ্টই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে দোষ কাটানোব জন্যে সেদিনই ইলা-মাসি তার ঢালা প্রশংসা করেছেন মায়ের কাছে। বলেছেন, আজকালকার দিনে ছেলেটি রত্ন-বিশেষ, এককাঁড়ি টাকা খবচ করলেও এ-রকম লোক মেলে না। এর পর ইলা-মাসি যখন অনুযোগ করবেন এই নিয়ে তখন সে নাকি ভয়ানক অপ্রস্তুতও হবে। অর্চনার একটু-আধটু কৌতূহল ইলা-মাসির প্রশংসা শুনেই নয় বোধহয়...। ঘরে-বাইরে-য়ুনিভার্সিটিতে ওব সামনে পুরুষের সলজ্জ বা বিব্রত মূর্তি অনেক দেখেছে। আর তাদের চোরা কটাক্ষ তো এখন আর বেঁধেও না। কিন্তু এই লোকটাব রূঢ় সবলতার একটু ভিন্ন আবেদন। যে কারণে এরা সব প্রায় করুণার পাত্র, তাব বিপরীত কারণেই এই লোকটির প্রতি একটুখানি বিপরীত-কৌতূহল। বাসে রেষারেষি করে ওর পাশে বসার পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে কোথায় দেখেছে স্মরণ করতে না পারার নিরাসক্ততাও রমণীমনেব নিভৃতে একটু লেগেছিল কি না বলা যায় না। অর্চনা অন্যরকম দেখেই অভ্যস্ত। কিন্তু এইসব সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যাপার অবচেতন মনেই প্রচ্ছন্ন ছিল। য়ুনিভার্সিটির পথে পরিচিত বাস-স্টপের সামনে এসে এক-আধবার শুধু লক্ষ্য করেছে মানুষটাকে দেখা যায় কি না। দেখা গেলে কি করবে অর্চনা নিজেও জানে না। পব পর দুদিনের এক দিনও দেখেনি। আগে বা পরে ক্লাস থাকতে পারে, তাছাড়া মিনিটে মিনিটে বাস, দেখা না হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

তৃতীয় দিনে দেখল।

দেখল এক হাতে বুকের সঙ্গে ঠেকানো একগাদা বই, অন্য হাতে বড়সড় পোর্টফোলিও ব্যাগ একটা—দুই হাতই জোড়া, বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়িটা আচমকা পাশে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে যেতে প্রায় আঁতকে উঠেছিল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপের আগেই অর্চনা দরজা খুলে দিয়ে ডাকল, আসুন—

মায়ের পাল্লায় পড়ে বছরে একটা করে পাড়ার অভিজাত ক্লাবের সাংস্কৃতিক অভিনয়ে যোগ দিতে হয়। আসরে একবার নেমে পড়লে অর্চনা আলগা সংকোচের বড় ধার ধারে না। কিন্তু যাকে ডাকল তার অবস্থা নয়নাভিরাম।

আমাকে বলছেন ?

হ্যাঁ, আসুন—

যে-মেজাজের মানুষই হোক, সেই মুহূর্তে সুখেন্দু মিত্রের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। কি করবে ভেবে না পেয়ে বিব্রত মুখে আহ্বানকারিণীর দিকেই তাকাল সে।

পিছনে একটি বাস আটকে পড়ে হর্ন বাজিয়ে বিরক্তি ঘোষণা করল। অর্চনা বলল, তাড়াতাড়ি উঠুন, এটা বাস-স্টপ!

বেগতিক দেখে সুখেন্দু মিত্র উঠেই পড়ল। গাড়ি চলল।

অর্চনা ধারে সরে গেছে। সেদিকে চেয়ে সুখেন্দু মিত্র আরো একটু বিব্রত, এ-ভাবে টেনে তোলার পর পার্শ্ববর্তিনীর সাধারণ আলাপের ইচ্ছেটুকুও নেই যেন। এ-রকম একটা বিড়ম্বনার মধ্যে সে কখনো পড়েনি।

একটু বাদে অর্চনা নিস্পৃহ দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল। কিছু যেন স্মরণ করতে চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

নিরুপায় সুখেন্দু মিত্র হাসতে লাগল।

অর্চনা হাসিমুখেই ঘুরে বসল একটু। এই কাণ্ড করে বসার পরে সহজতাই স্বাভাবিক। বলল, গাড়িতে উঠতে চাইছিলেন না কেন, বাসের ভিড় ঠেলতেই ভাল লাগে বুঝি?...তাই বা পারতেন কি করে, দু-হাতই তো জোড়া।

সেদিনের বাসেব ব্যাপারটা মনে পড়তে সুখেন্দু মিত্র জোরেই হেসে উঠল। তাবপর আলাপটা অন্যদিকে ঘোরাবার জন্য তার হাতের বইগুলোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি পড়েন?

ভদ্রলোক কলেজেব প্রফেসার তাই বোধহয় আলাপের এই বিষয়-বস্তু তেমন পছন্দ হল না অর্চনার। বইগুলোর কোলের ওপর থেকে পাশে আড়াল করে জবাব দিল, না...আমার বোন পড়ে।

বোনটিকেও সেদিনের পার্টিতে এক পাশে দেখেছিল মনে পড়ছে! কি ভেবে আবারও জিজ্ঞাসা করল, আপনার বোন কি পড়েন?

আই—এ।

সুখেন্দু কৌতুক অনুভব করছে বেশ। টয়েনবী আজকাল তাহলে আই এ-তে পড়ানো হয়, আমাদের সময় ওটা এম. এ-তে পড়ানো হত।

ধরা পড়ে অর্চনা আবাবও হেসে ফেলল।

একটু বাদে সুখেন্দু মিত্র নিজে থেকেই বলল, সেদিন মিণ্টুদের বাড়িতে শুনলাম ডক্টর জি, এন, বাসু আপনার বাবা—

সঙ্গে সঙ্গে অর্চনার মনে দুই একটা নীরব প্রশ্নের উঁকিঝুঁকি...। শুনেছে যখন খুব সম্ভব ইলা-মাসির কাছেই শুনেছে। কিন্তু ও কার মেয়ে সেটা শোনার কারণ ঘটল কি করে? শোনার আগ্রহ না থাকলে ইলা-মাসি শোনাতেই বা যাবে কেন? মনে মনে তুষ্ট একটু। —হ্যাঁ, বাবাকে চেনেন নাকি আপনি?

ছেলে পড়াই আর তাঁর নাম জানব না! তবে তাঁর ছাত্র না হলেও তাঁকে চেনার আমার একটা বিশেষ কারণ ঘটেছিল। অনেক কালের কথা, এখন বোধহয় তাঁর মনেও নেই।

অর্চনা ঈষৎ আগ্রহ নিয়েই জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছিল বলুন তো?

না, তেমন কিছু নয়। প্রসঙ্গটা চাপাই দিল সে, আপনি তো য়ুনিভার্সিটিতে যাবেন,

আমি একটু এদিকেই নামব । সৌজন্য প্রকাশ করল, আজ ভালই আসা গেল...। আপনার বাবাকে প্রণাম দেবেন, চিনলে চিনতেও পারেন, খুবই চিনতেন—

এর পরেও একটা আমন্ত্রণ না জানানো বিসদৃশ ।—একদিন আসুন না আমাদের বাড়ি, বাবার সঙ্গে দেখা হবে—আসবেন ?

আসবে বলেই মনে হল, কারণ বাড়ির ঠিকানা নিয়ে রাখল সে ।

কিন্তু আসেনি । আসেনি বলেই অর্চনাও আর বাস-স্টপের মোড়ে গাড়ি থামায়নি ! পাছে দেখা হয় তাই রাস্তার উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে বাস-স্টপটা পেরিয়ে গেছে । অবশ্য সেই দিনই সে কলেজ থেকে ফিরে বাবাকে সুখেন্দু মিত্রের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল । আর তার ফলে মায়ের হাতে ধরা পড়ে নাজেহাল ।

বাবা কিছু একটা লিখছিলেন । অন্যমনস্কও ছিলেন । অর্চনা তাঁর লেখার টেবিলেই পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা বাবা, তুমি সুখেন্দু মিত্র বলে কাউকে চিনতে ?

বাবা মনে করতে পারেননি তাঁকে খুব চেনে শুনেই অর্চনা ভদ্রলোককে বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছে । এখন বাবা তাকে আদৌ না চিনলে মেয়ের নিজেরও একটু সংকোচের ব্যাপার । অর্চনা তাই চেনাতে চেষ্টা করেছে, বলছে, একজন প্রফেসার, তোমাকে খুব চেনেন বললেন —তোমার ছাত্র না হলেও অনেকদিন আগে কি ব্যাপারে তোমার সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল বললেন—

এর পরেও ডক্টর বাসুর মনে পড়েনি ।

কিন্তু এ নিয়ে যে আবার আর এক ঝামেলায় পড়তে হবে অর্চনা জানবে কি করে । মা ওদিকে ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ । এক বান্ধবীর বাড়ি যাবেন, মেয়েকেও নিয়ে যাবেন কথা দিয়েছেন । নিজে সাজসজ্জা করে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন । মেয়েকে বাপের ঘরে ঢুকতে দেখে প্রস্তুত হবার জন্যে তাড়া দিতে এসে তার জিজ্ঞাসাবাদ শুনলেন । বলা বাহুল্য, শুনে খুব প্রীত হলেন না ।

তার সঙ্গে তোর আলাপটা হল কখন ?

অর্চনা প্রায় চমকেই ফিরে তাকিয়েছিল, তারপর বিব্রতমুখে জবাব দিয়েছে, না, আলাপ না...য়ুনিভার্সিটি যাবার মুখে দেখা হয়ে গেল ।

তুই তো গাড়িতে গেছলি ?

অর্চনার কাহিল অবস্থা, তবু চেষ্টা করেছে সামলাতে ।—হ্যাঁ, রাস্তায় খুব ভিড় ছিল, ভদ্রলোক একেবারে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, এদিক থেকেই বাসে ওঠেন কিনা—

অকূলে কূল পেয়েছে, মায়ের সাজসজ্জার দিকে চোখ গেছে । তাড়াতাড়ি কাছে এসে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছে, বাঃ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে মা—বেরুচ্ছ নাকি ?

মুশকিল আসান । সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে তাড়া দেওয়ার কথাটাই মনে পড়েছে তাঁর । আর প্রীতও একটু হয়েছেন ।—থাক, তাড়াতাড়ি নিজে একটু সুন্দর হয়ে নে—মিতার ওখানে পাঁচটায় যাব কথা দিয়েছি, পাঁচটা তো এখানেই বাজল ।

. তক্ষুণি রেডি হবার উৎসাহে অর্চনা পালিয়ে বেঁচেছিল । কেন মরতে চেনাতে গিয়েছিল বাবাকে ভেবে সেই লোকটার ওপরেই রাগ হচ্ছিল তার ।

ডক্টর বাসু সেদিন অর্চনার মুখে শুনে স্মরণ করতে না পারলেও লোকটিকে চিনতেন যে খুবই সেটা এমন করে প্রকাশ হবে অর্চনা ভাবেনি ।

এমন মজার ব্যাপার আর হয় না যেন ।

কলকাতা শহরে জল হয়, জল হলে অনেক রাস্তা জলমগ্ন হয়, আর তখন অনেক রাস্তার মাঝখানেই যানবাহন অচল হয় । সেই অবস্থায় পড়লে অনেকেরই মেজাজ বিগড়োয় । পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বিধাতার চক্রান্ত সম্বন্ধে অথবা রাস্তাঘাটের দুরাবস্থার সম্বন্ধে তিক্ত অভিযোগ শোনা যায় । কিন্তু লজ্জায় কারো মাথা কাটা যায় না বোধহয় ।

মিসেস বাসুর সেদিন লজ্জায় মাথা কাটাই গিয়েছিল । তাঁদের গাড়িটা যে নতুন নয় সেই দুর্বলতা আর ক্ষোভ ছিল বলেই তাঁর মনে হয়েছে, পথচারীরা পুরনো গাড়ির অচল অবস্থা দেখে মনে মনে হাসছে । তাঁর ধারণা, শুধু ড্রাইভারের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার ফলেই এই দুর্ভোগ । তাই প্রথম অসহিষ্ণুতার ঝড়টা সেই বেচারার ওপর দিয়েই গেল ।

গাড়ির দু-ধারে বসে অর্চনা আর তার মা । মাঝখানে বাবা । সামনে বিজন আর ননিমাধব । ছুটির দিনে মার্কেট থেকে ফেরার পথে এই বিড়ম্বনা ।

রাস্তা জলে থৈ থৈ । দূরে দূরে আরো দুই একটা মোটর আটকেছে । এই গাড়ির চাকা এখনো অর্ধেকের বেশি জলের নিচে । জল এখনো টিপটিপ করে পড়ছে, কিন্তু গাড়ি নড়ে না । ড্রাইভার বিরস বদনে বনেট খুলে টুকটাক তদারক করে এসেও গাড়ি নড়াতে পারল না । অর্চনা ভয়ে ভয়ে এক-একবার মায়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছে আর ভাবছে, ড্রাইভারের কপালে আজ আরো কিছু আছে ।

মিসেস বাসু ঝাঁজিয়ে উঠলেন, গাড়ি চলবে না ? এভাবেই তাহলে বসে থাকি সমস্ত দিন ? এ রাস্তেমে তুমকো কৌন্ আনে বোলা ?

সুপারিশের আশায় ভিজে চুপসানো অবস্থায় বেচারা ড্রাইভার বিজনের দিকে তাকাল । কিন্তু তারও মুখে রাজ্যের বিরক্তি । শুধু ননিমাধবেরই বোধহয় খারাপ লাগছে না খুব, কিন্তু মুখভাবে সেটা প্রকাশ করার নয় ।

স্ত্রীর কোপ থেকে ড্রাইভারকে আগলাতে চেষ্টা করলেন ডক্টর বাসু । বললেন, ওকে বকছ কেন সেই থেকে, ও কি করে জানবে এরই মধ্যে এখানে এতটা জল জমে গেছে !

তুমি থামো !...উল্টে মেজাজ আরো চড়ানো হল তাঁর ।—ড্রাইভারি করছে আর ও জানবে না জল হলে কতটা জল জমে এখানে ! তুমি আর তোমার ওই ড্রাইভারই জান না, আর সকলেই জানে । ড্রাইভারের উদ্দেশে ধমকে উঠলেন, দেখতা কেয়া ? আদমী বোলাও !

অসীম বিরক্তিতে নিজেই ফুটপাথের দিকে চেয়ে হাঁক দিলেন, কুলি, কুলি—!

মহিলাটি যেখানে উপস্থিত, গাড়িতে আর সকলেরই সেখানে প্রায় নীরব দর্শকের ভূমিকা । দাদা আর তার পাশের মূর্তিটির ওপরেই বেশি রাগ হচ্ছে অর্চনার । একটা ব্যবস্থা কিছু করলেও তো পারে । মায়ের উগ্র কণ্ঠস্বরে রাস্তার লোকগুলোও যে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে ।

শুধু রাস্তার লোকগুলোই নয়, আর একজনও ফিরে তাকিয়েছে । আধভেজা অবস্থায় ওদিকের গাড়িবারান্দার নীচে দাঁড়িয়েছিল । অর্চনা হঠাৎ খুশিও, আবার অপ্রস্তুতও ।

সুখেন্দু মিত্র তাদের দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এলো। অর্চনা হাসতে গিয়েও মায়ের মূর্তি স্মরণ করে থমকে গেল। তাড়াতাড়ি বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে।

বাবা—

আঙুল দিয়ে বাইরের আগন্তুকটিকে দেখিয়ে দিল। জলের ওপর দিয়েই জুতোসুদ্ধ পা চালিয়ে গাড়ির দিকে আসছে সে। মিসেস বাসু অপ্রসন্ন স্বগতোক্তি করে উঠলেন, লজ্জায় মাথা কাটা গেল!

গাড়ির কাছে এসে সুখেন্দু মিত্র সকলের উদ্দেশেই দু-হাত জুড়ে নমস্কার জানাল। প্রতিনমস্শারের জন্য হাত তুলতে গিয়েও ডক্টর বাসু বিস্মিত নেত্রে তাকালেন তার দিকে। চিনতে চেষ্টা করলেন।—আপনি, তুমি, তুমি সুখেন্দু না?

হ্যাঁ স্যার।

খুশির আতিশয্যে ডক্টর বাসু মেয়েকে বললেন, সেদিন তুই সুখেন্দুর কথা বলছিলি? ওকে চিনব না, কি কাণ্ড...।

যেন অর্চনাই দোষী।

কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে ভিজছ যে!

সুখেন্দু বলল, আমি আগেই ভিজেছি—।

সামনের সীটের দুজনও ঘাড় ফিরিয়েছে। পরম উৎসাহে স্ত্রীর দিকে তাকালেন ডক্টব বাসু।—তোমার মনে নেই, সেই যে একবার ছেলেগুলো স্ট্রাইক করেছিল জোট বেঁধে, আমি চাকরি রিজাইন করতে যাচ্ছিলাম—এই সুখেন্দুই তো সব দিক সামলালে। ভুলে গেছ? কি বিপদেই পড়েছিলাম...

মিসেস বাসুর বিগত বিপদ স্মরণ করার কোন বাসনা নেই। চাপা রাগে বললেন, এখন জলে পড়ে আছে—তোমার এই ড্রাইভার দিয়ে আর চলবে না।

দোষটা যে গাড়ির নয়, ড্রাইভারের, সেটাই শোনালেন কিনা তিনিই জানেন।

ডক্টর বাসু বস্তুজগতে ফিরলেন। বিব্রতমুখে হাসতেই চেষ্টা করলেন, ও হ্যাঁ, কি মুশকিল দেখ, ড্রাইভার আবার...ইনি আমার স্ত্রী।

সুখেন্দু জানাল, সেদিন ছাত্রের বাড়িতে তাঁকে দেখেছিল। কিন্তু মিসেস বাসু শুনলেন না বোধহয়, ড্রাইভারের খোঁজেই তাঁর উষ্ণ দৃষ্টি অন্যত্র প্রসারিত।

ডক্টর বাসু হৃষ্টচিত্তে সামনের দুজনের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন। জলে পড়ার লজ্জা বা দুর্ভাবনা তাঁর তেমন নেই।—এ আমার ছেলে বিজন, আর ও ননিমাধব, আমাদের আত্মীয়ের মতই—দুজনে জয়েন্টলি সাইকেল-রিকশর ব্যবসা করছে।

বিজনের মনে হল, বাবা যে-ভাবে বললেন কথাটা যেন হাস্যকর কিছুই করছে তারা। প্রতিনমস্কারের হাত তুলল কি তুলল না। সামনের দিকে ফিরে এতক্ষণে সেও বিষম বিরক্তি সহকারে মন্তব্য করল, ড্রাইভারটা একটা আস্ত ইডিয়ট!

ননিমাধব অবশ্য হাত তুলেছে, নমস্কার করেছে, আর ডক্টর বাসুর হাস্যোক্তির সঙ্গে সঙ্গে হেসেছেও। তারপর ভাল করে লোকটাকে নিরীক্ষণ করেছে।

ডক্টর বাসু একদা-স্নেহভাজন লোকটির খোঁজখবর নিতে ব্যস্ত।—হ্যাঁ, কি করছ সুখেন্দু তুমি আজকাল?

এবার অর্চনাই স্মরণ করিয়ে দিল, বাঃ, সেদিন বললাম না তোমাকে !

মনে পড়ল ।—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলি : তুমিও মাস্টারি করছ । কোন কলেজে ? —বেশ বেশ, তুমিও এই রাস্তাই নিলে শেষপর্যন্ত—ভাল করোনি, মাস্টাররা আজকাল নো-বডির দলে ।

আনন্দ দেখে অর্চনাই শুধু বুঝল, মাস্টারি করছে শুনেই বাবা সব থেকে খুশি । আর মাস্টার ছাড়া অন্য সকলকেই যে নিজে তিনি নো-বডি মনে করেন সেটাও ভালই জানে । কিন্তু মায়ের জন্যই অর্চনা স্বস্তিবোধ করছে না, কথাবার্তা না বলে প্রায় চুপ করেই আছে । লোকটি হাসিমুখে বার বার তার দিকে তাকাচ্ছে দেখেও, এতদিনে একবার বাড়ি না আসার অনুযোগটা করে ওঠা গেল না ।

একে দেখে বাবা এতটা খুশি হবে তাও ভাবেননি । তিনি খোঁজখবর নিচ্ছেন তখনো —এদিকেই থাকো বুঝি ? এই কাছে ? কোথায় ? কত নম্বর বাড়ি বলো তো ?

যেন নিজেই তিনি যাবেন একবার দেখা করতে । ননিমাধব তখনো ফিরে তাকাচ্ছে এদিকে । অর্চনার চোখেও চোখ পড়ছে, অর্চনা নিরীহ মুখে চেষ্টা করছে যাতে না পড়ে ।

মা আর দাদার নীরব ধৈর্যচ্যুতির শেষ অবস্থায় দেখা গেল ড্রাইভার গাড়ি ঠেলার জন্য দুটো লোক এনে হাজির করেছে । ড্রাইভার স্টিয়ারিংএ বসল, লোকদুটো পিছনে ঠেলতে গেল । ডক্টর বাসু সুখেন্দুকে বললেন, বড় খুশি হলাম, একদিন এসো কিন্তু আমাদের বাড়ি, ঠিক এসো—

কিন্তু এই জল-লীলার শেষ দৃশ্যটি বাকি তখনো ।

গাড়ির দু-হাতও নড়ার ইচ্ছে দেখা গেল না । একে গাড়িটা নেহাত ছোট নয়, তার ওপর ড্রাইভার নিয়ে ভিতরে ছ-জন লোক বসে । বার দুই চেষ্টা করেই পিছনের লোকদুটো হাল ছাড়ল । সুখেন্দু দাঁড়িয়ে দেখছিল, হাত গোটাতে গোটাতে বিজন আর ননিমাধবের উদ্দেশে বলল, দুজনে হবে কেন, আসুন আমরাও একটু ঠেলে দিই—

প্রস্তাব শুনে গাড়ির সকলেই হকচকিয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল । শুধু ডক্টর বাসু ছাড়া । তিনি সানন্দে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, তুমি—তোমরা ! হা-হা করে হেসে উঠলেন তারপরেই, ছেলেকে বললেন, যা না—ব্যবসা তো খুব করিস, গায়ে কেমন জোর আছে দেখি—

অর্চনার মজা লাগছে । কিন্তু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রায় শঙ্কিত । নিরুপায় বিরক্তিতে বিজন গাড়ি থেকে জলে নামল । ননিমাধব নড়ে চড়ে পিছনের দিকে তাকাতে অর্চনা মাকে বাবার আড়াল করে ইশারায় বলতে চাইল, আর বসে কেন, নামুন— !

ননিমাধব বীরের মতই নেমে পড়ল ।

তারা দুজন গাড়ির ও-পাশ থেকে ঠেলছে । অর্থাৎ মিসেসবাসুর দিক থেকে ।পিছনে কুলি দুজন—এ-পাশে সুখেন্দু । অর্চনা মহা আনন্দে একবার তাকে আর একবার স-পার্টনার দাদাকে দেখছে । ডক্টর বাসু উৎফুল্ল হাস্যে স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকতেই মিসেস বাসু সরোষে রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন । সঙ্গে সঙ্গে সেদিক থেকে একটা চলন্ত লরী একেবারে চান করিয়ে দিয়ে গেল বিজন আর ননিমাধবকে । জলের ঝাপটা বাঁচাতে গিয়ে মিসেস বাসু স্বামীর গায়ের ওপর এসে পড়লেন ।

ওদিকে কিম্ভূতকিমাকার অবস্থা বিজন আর ননিমাধবের ।

সারাপথ মিসেস বাসু রাগে গজগজ করতে করতে যে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন, তাই ফলল ।

সেই থেকে বিজনের হাঁচি, কাসি আর জ্বরভাব । একবার গার্গলের জন্য তিনবার করে গরম জল করতে করতে দাশু মহাবিরক্ত । গা-হাত-পা টেপা আর নভেল পড়া দুটোই একসঙ্গে করতে গিয়ে রাণু দেবীও অনেকবার ধমক খেয়েছে । তার হাঁচির দমকে দাশুর হাতের গ্লাস থেকে ক-বার গরম জল চলকে পড়েছে ঠিক নেই । হাঁচির ভয়ে অতঃপর সন্তর্পণেই ঘরে ঢুকেছে সে ।

বিজন তিক্তবিরক্ত ।—কি ওটা ?

গরম জল ।

ফেলে দে ।

নভেলের আশা বিসর্জন দিয়ে রাণু দেবী ভয়ে ভয়ে দু-হাত লাগিয়েছেন ।—ফেলে দেবে কেন, গরম জল খাবে যে বললে ?

তুমি উপন্যাস পড়ো !...দাশুর ওপরেই মেজাজ ফলিয়েছে, এই—ওটা রেখে টেপ এসে । গা হাত-পা গেল, কোথাকার কে একটা থার্ডক্লাস লোক, সে বলল আর একগলা জলে নেমে গাড়ি ঠেললো !

যাঁর কথায় একগলা জলে নেমে গাড়ি ঠেলা তাঁকেও খুব রেহাই দেননি তাঁর গৃহিণীটি । নিরুপায় মুখে ডক্টর বাসু বসে চুরুট টেনেছেন আর স্ত্রীর তর্জন শুনেছেন । এর ওপর ননিমাধবেরও জ্বর হয়েছে শুনে নতুন করে আর এক দফা শোনাতে বসলেন তিনি ।—তোমার জন্যে, শুধু তোমার জন্যে, বুঝলে ? তিনদিন ধরে বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে ছেলেটা, ওদিকে ননিমাধবও জ্বরে পড়েছে—কে না কে বলল আর অমনি হুট করে ছেলে দুটোকে তুমি জলে নামিয়ে দিলে ! ওরা কি করেছে এসব কোনদিন ?

ডক্টর বাসুও শেষে বিরক্ত হয়েই পাল্টা জবাব দিয়েছেন, জ্বর হয়েছে সেরে যাবে । আমি ভাবছি আমাদের জন্য ওই পরের ছেলেটির আবার অসুখ-বিসুখ করল কিনা । কি ঠিকানাটা বলেছিল, ড্রাইভারকে একবার পাঠিয়ে দাও না খবর নিয়ে আসুক— ।

জবাবে মিসেস বাসু একটা উগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রস্থান করেছেন ।

ডক্টর বাসু জানতেন না, ড্রাইভারকে পাঠিয়ে নয়, সকলের অগোচরে ড্রাইভারকে নিয়ে একজন খবর করতেই গেছে । একজন নয়, দুজন । বরুণাও গেছে । শুধু তাই নয়, বরুণাই ইন্ধন যুগিয়ে নিয়ে গেছে তার দিদিকে । সব শুনে আসল ফূর্তিটা তারই হয়েছিল । এমন কাণ্ডটা নিজের চোখে দেখা হল না বলে আপসোসের শেষ নেই । এর আগে বাস-স্টপ থেকে দিদির সেই লোকটাকে গাড়িতে তুলে নেওয়ার সমাচার শুনেও বোধহয় এত আনন্দ আর নিজের অনুপস্থিতির দরুন এত দুঃখ হয়নি । আগের সেই খবর শুনে সেও লোকটার জন্য উৎসুকভাবে দিনকতক প্রতীক্ষা করেছিল । আসেনি দেখে দিদিকে জ্বালাতেও ছাড়েনি । বলেছে, এমন রসকষশূন্য লোকের বাসে পাশে বসা কেন ? আর তুই বা কোন্ মুখে তাকে সেধে গাড়িতে এনে তুললি আর বাড়ি আসার জন্যে সাধলি ? বেশ হয়েছে, খুব জব্দ !

কিন্তু এবারে আর ঔৎসুক্য চাপতে পারেনি। বার বার পবামর্শ দিয়েছে, নিশ্চয় বিছানায পাড়েছে, চল না একবারটি দেখে আসি, কাছেই তো—

অর্চনা ভ্রূকুটি করেছে, বিছানায় পড়ে থাকলে কি করবি, সেবা করবি ?

সেবা করতে হবে না, তোকে দেখলেই বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠবে। চল না, খেয়ে ফেলবে না।

বাড়ি কাছে হলেও একেবারে কাছে না। তবে মোটবে সামান্য সময়ই লাগল। লক্ষ্যের কাছাকাছি এসে বরুণাই আবার নিরুদ্যম একটু। একটা বিষয় মনে ছিল না, এখন মনে পড়েছে। তাই চুপ করেও থাকতে পাবেনি।—ভদ্রলোক আবার প্রফেসার যে রে...আমি আই. এ. পড়ি জানে ?

বেবিযে পড়ে অর্চনাব সঙ্কোচ গেছে। জবাব দিল, খুব জানে, মোটবে বসে সেদিন সাবাক্ষণ তোর কথাই তো জিজ্ঞাসা কবছিল—তোদের কলেজেই আবার মাস্টারির চেষ্টা করছে এখন।

রাস্তার ওপব ছোট বাড়িটা খুঁজতে হল না। দরজাব গায়ে লেটার বক্স-এ নাম আর নম্বর লেখা। অর্চনার নির্দেশে ড্রাইভার নেমে গিয়ে কড়া নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যে বাইরে এল, সে স্বয়ং সুখেন্দু মিত্রই। খুব সম্ভব বেরুচ্ছিল।

গাড়িতে আরোহিণী দুজনকে দেখে অবাক। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

অর্চনা নেমে দাঁড়াল। লোকটা সুস্থ শরীরে নিজেই হাজিব দেখে তারও বিসদৃশ লাগছে একটু।

আপনি...

অর্চনা হাসিমুখে বলল, দেখতে এলাম, বাড়িতে তো তিনদিন ধরে হ্যাঁচ্চো-ম্যাচ্চো চলছে-—আপনি কেমন আছেন ?

কেন।...প্রথমে হঠাৎ বুঝে ওঠেনি। তারপরেই মনে পড়তে হেসে উঠল।...ও, সেদিনেব সেই জলে ওঁদের শবীর খারাপ হয়েছে বুঝি ?

রীতিমত। আপনি ভাল আছেন তো একবারও গেলেন না কেন ? বাবা ওদিকে ভেবে অস্থিব, ভাবছেন, আপনাবও ভাল রকম কিছু হয়েছে—

সুখেন্দু হাসতে লাগল।—না, আমি ভালো আছি। ভিতরে ডেকে বসতে বলবে কি না ভাবছে। এ-রকম অতিথি আপ্যায়নের বৈচিত্র্যে পড়তে হয়নি কখনো। পিসিমাব পর্যন্ত গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার নাম নেই। আর সে যাচ্ছিল চা ফুরিয়েছে চা কিনতে—অতএব একটু চা-ও দেওয়া যাবে না। কিংবা এদের বসিয়ে আবাব চা আনতে যেতে হবে। কিন্তু না-ডাকাটা নিতান্ত অভদ্রতা। বরুণা এবং অর্চনা দুজনের উদ্দেশে বলল, ভিতরে এসে বসুন, পিসিমা অবশ্য বাড়ি নেই, এক্ষুনি এসে পড়বেন।

বোঝা গেল বাড়ির কর্ত্রী পিসিমা এবং তিনি ছাড়া ওদের সঙ্গে কথা কইতে পারে এমন আর কেউ নেই। পিসিমা থাকুন আর নাই থাকুন অর্চনা সরাসরি বাড়ি গিয়ে ঢুকতে রাজী নয়। তাড়াতাড়ি বাধা দিল, না আমরা এমনি একবার দেখতে এলাম, বাড়িতে হয়তো এতক্ষণ খুঁজছে আমাদের। থামল একটু, আপনি বেরুচ্ছেন কোথাও ? ফাঁক পেয়ে হাসিমুখে সত্যি কথাটাই বলে দিল সুখেন্দু মিত্র, আমার চা শেষ, চা আনতে যাচ্ছিলাম।

তাহলে আপনিই চলুন না আমাদের বাড়ি, বাবা খুব খুশি হবেন—

আপত্তি নেই সেটা মুখ দেখেই বোঝা গেল। ভিতরের কারো উদ্দেশে দরজা বন্ধ করতে বলে গাড়ির সামনের আসনে বসতে গেল সে।

অর্চনা বাধা দিল, আপনি পিছনে বসুন, আমি সামনে বসছি—

ঠিক আছে। দরজা খুলে সুখেন্দ ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ল।

গাড়ি বাড়ির পথ ধরতে হাসি চেপে অর্চনা বরুণার দিকে তাকাল। বরুণা যতটা সম্ভব নির্বিকার মুখে রাস্তা দেখছে। আর দিদিটা যে ওর থেকেও অনেক বেশি মানুষ হয়ে গেছে, গম্ভীর পুলকে মনে মনে তাই ভাবছে। সামনের দিকে চোখ ফিরিয়ে অর্চনা জিজ্ঞাসা করল, এঁকে চেনেন?

সুখেন্দু মিত্র ঘুরে বসল একটু। তারপর বরুণাকে দেখে নিয়ে বলল, আপনার বোন?

হ্যাঁ, বরুণা। আপনি কলেজের প্রফেসার আর ও মোটে আই. এ. পড়ে, বড় লজ্জায় পড়ে গেছে।

সুখেন্দু হেসে উঠল। সে সামনের দিকে চোখ ফেরাতেই বরুণার রামচিমটি। অর্চনা একটা কাতরোক্তি করে ছদ্ম কোপে জোরেই ধমকে উঠল, তাকে, এই! লাগে না?

॥ ৪ ॥

নিচের ঘরের ইজিচেয়ারে ননিমাধব চিৎপাত হয়ে প্রায় শুয়েই আছে আর ভাবছে। ভাবছে, ছুটির দিনের দুপুরগুলি এমন নীরস কাটত না। এই বাড়ির তলায় তলায় বেশ একটা পরিবর্তনের ধারা বইছে। সেটা ঠিক প্রত্যক্ষগম্য না হলেও অনুভব করা যায়। ননিমাধব অনুভব করছে।

আজও আপাতদৃষ্টিতে বিজনের জন্যেই অপেক্ষা করছে সে। আর তার আজকের প্রতীক্ষার মধ্যে বেশ জোরও ছিল একটু। পকেটে বাবার দেওয়া আঠারো হাজার টাকার চেকটা করকর করছে। দু-মাস আগেকার সেই প্ল্যানের রসদ বার করতে এতটা সময় লেগে গেল। তাও বাবা তিরিশ হাজার দেননি, বলেছেন, কাজ এগোক আস্তে আস্তে দেবেন। বিজনের ধারণা, পার্টনার যতটা তৎপর হলে সব সমস্যা সহজে মিটে যেতে পারে, ততটা তৎপর সে নয়। ধারণাটা খুব মিথ্যেও নয়। তাদের বিজনেস এক্সটেনশানের প্ল্যানের এই টাকাটাও বার করে আনতে আরো কতদিন লাগত বলা যায় না। আর আনা যে গেছে সেটা শুধু বিজনের অসহিষ্ণুতার ভয়েই নয়। পায়ের নিচে আজকাল নিরাপদ মাটির অভাব বোধ করছিল ননিমাধব। অলক্ষ্য থেকে আর কেউ যেন সেই মাটিতে পা ফেলে চলেছে। ননিমাধবের উদ্যম আর বাবার সঙ্গে ফয়সালা করে টাকা নিয়ে আসার আগ্রহের পিছনে বড় কারণ সম্ভবত এটাই। বিজুদাকে একটু শান্ত না করতে পারলে আর কোন সমস্যা তার মাথায় ঢোকানো যাবে না। আভাসে ইঙ্গিতে একটু-আধটু চেষ্টা করেছিল, বিজন কি বুঝেছে সে-ই জানে, ওর সমস্যার ধার-কাছ দিয়েও যায়নি। উল্টে বলেছে, দেখ, এই ব্যবসা দাঁড় করানো ছাড়া এখন আর কিছু ভেবো না—মা তো এখনো ভাবে তোমাতে আমাতে ছেলেমানুষিই করছি একটা।

ফলে ভবিষ্যৎ রচনার এই নব-উন্মাদনা ননিমাধবের। বিজনকে কথা দিয়েছে, আজ সে চেক নিয়ে আসছে। অবশ্য বাকি টাকাটা কিছুদিন বাদে সংগ্রহ হবে তাও জানিয়েছে। হাতে যা এসেছে তাও কম নয়, বিজন খুশি। টাকা ননিমাধব চেষ্টা করলে সংগ্রহ করতে পারে সেটা তার জানাই আছে। তার ফুরসৎ নেই একটুও, ঘোরাঘুরি করে সব বিধিব্যবস্থা তাকেই করতে হয়।

বাবার কাছ ছেকে চেক পেয়েই ননিমাধব সোজা এ-বাড়ি চলে এসেছে। ছুটির দিন, ফ্যাক্টরি বন্ধ। বিজন বাড়ি নেই জেনেও দুঃখিত হয়নি, কিন্তু বাড়িতে যেন আর কেউ নেই। একা বসে বসে বিরক্তি ধরে গেছে। দাশু অবশ্য রাণু বউদিকে খবর দিতে যাচ্ছিল, ননিমাধবই বাধা দিয়েছে, উনি পড়ছেন পড়ুন—ডাকাডাকি করে বিরক্ত করা কেন!

কিন্তু ছোট দিদিমণিও নাকি পড়ছে আর বড় দিদিমণি বাবুর ঘরে আটকে আছে। ননিমাধব দাশুকে পাঠিয়েছে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে। সে এলে একবার খবর দিতে বলা যেত। কিন্তু দাশু সিগারেট আনতে গেছে তো গেছেই, দুটো গোটা সিগারেট খাওয়া হয়ে গেল ননিমাধবের, নবাবের এখনো দেখা নেই।

বাইরে থেকে গুনগুন একটা গানের শব্দ কানে আসতে ননিমাধব সোজা হয়ে বসল। লঘু চরণে যে আসছে সে বরুণা। মেয়েটা যত ফাজিলই হোক, ওর মন বোঝে।

কিন্তু বরুণার তখন মন বোঝার আগ্রহ একটুও ছিল না। অন্য আগ্রহ নিয়েই সে নিচে এসেছিল একবার। তিনটে নাগাদ যার আসার কথা সে ননিমাধব নয় আর একজন। তিনটে বেজে গেছে, বরুণা নিচের ঘরটা একবার দেখে যেতে এসেছিল। তার বদলে সেখানে ননিমাধবকে দেখে দরজার ওপরেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। তারপর ছদ্ম হতাশার সুরে বলল, ও আপনি...

ননিমাধব হাসিমুখেই রসিকতা করল, আর কেউ ভেবেছিলে বুঝি?

বরুণা ঘরের মধ্যে দু-পা এগিয়ে এলো। বড় করে নিশ্বাস ফেলল।—হ্যাঁ।

কিন্তু রসিকতার ঠিক মুড নয় ননিমাধবের। কারণ সব ছুটির দিনে আর একজনের আবির্ভাবই তার অনেক আনন্দ পণ্ড করেছে। বলল, ও, ইয়ে—আর কারো আসার কথা আছে বুঝি?

হ্যাঁ।

অগত্যা ননিমাধব হাসতেই চেষ্টা করল।—আমি বিজুদার জন্যে বসে আছি—

বসে থাকুন, এসে যাবে—

বরুণা সরে পড়ার উদ্যোগ করতেই ননিমাধব বাধা দিল, তুমি বোসো না, দাঁড়িয়ে কেন।

ও বাবা, দাদা এসে দেখলেই—

বরুণা ছলনায় সেয়ানা। মুখের ত্রাসে মনে হল দাদা এসে ওকে সরাসরি খুনই করবে। আশঙ্কাটা শেষ না করেই বলল, আপনি বরং বসে বেশ করে ব্যবসার কথা ভাবুন।

তাড়াতাড়ি প্রস্থান করতে গিয়ে থামল একটু। হাত বাড়িয়ে পাখার রেগুলেটারটা আরো খানিকটা ঘুরিয়ে তরতরিয়ে চলে গেল।

ঈজিচেয়ার ছেড়ে ঘরের মধ্যেই বার দুই চক্কর খেল ননিমাধব। টেবিলের ওপর থেকে শূন্য সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল। হাঁ-করা খালি সেটা। দ্বিগুণ বিরক্তি। ফিরে দেখে

দাশু সিগারেট নিয়ে ঘরে এসেছে । তার হাত থেকে সিগারেট আর ফিরতি পয়সা নিয়ে যতটা সম্ভব মোলায়েম করেই জিজ্ঞাসা করল, এত দেরি ?

দাশু কৈফিয়ত দিল, দুপুরে কাছের দোকান বন্ধ ।

ননিমাধব ঈজিচেয়ারে বসল আবার । পয়সা পকেটে রাখতে গিয়ে কি ভেবে মুখ তুলল । দাশু ফিরে যাচ্ছিল, ডেকে থামাল । পয়সাগুলো তার দিকে বাড়িয়ে দিল ।—এ ফেরত দিলে কেন, তুমি রাখো-না, রাখো—

দাশুর নিস্পৃহ পর্যবেক্ষণ ।—রাখব ?

হ্যাঁ, ধরো— ।

দাশু পয়সা নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজল এবং আরো কিছু জবাব দিতে হবে বুঝেই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল ।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ননিমাধব অন্তরঙ্গ সুরে বলল, আচ্ছা এ বাড়িতে তো তুমি বহুকাল আছ, না ?

সম্ভব হলে দাশুকে একটা সিগারেটও দিত সে, মনিবের চুরুটের বাক্স থেকে তার চুরুট সরানোর অপবাদ ননিমাধব একাধিকবার শুনেছে । কিন্তু অতটা পেরে উঠল না ।

দাশু জবাব দিল, হ্যাঁ—বড় দিদিমণির জন্ম থেকেই বলতে পারেন ।

তুমি তো তা হলে একেবারে ঘরের লোক হে !...যেন ঘরের লোক বলে তারও বিশেষ আনন্দের কারণ কিছু আছে । একটু থেমে বক্তব্যের দিকে এগোতে চেষ্টা করল আবার : —আচ্ছা দাশু, এই তোমার গিয়ে মাস দুই হল তোমার দিদিমণির দেখাই নেই প্রায়...লেখাপড়া টড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত বুঝি ?

দাশু নিষ্প্রাণগোছের জবাব দিল, হ্যাঁ...ওই নতুন মাস্টারবাবুর সঙ্গে ।

মাস্টারবাবু ! ও সেই প্রফেসার ?...নিজের অগোচরে গুণ্ডা কথাটাই বেরিয়ে যাচ্ছিল মুখ দিয়ে ।

দাশু গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল ।

ননিমাধব উঠে গিয়ে সিকি-খাওয়া সিগারেটটাই জানলা দিয়ে ফেলে এলো । দাশু প্রস্থানোদ্যত ।

দাশু—

ঘুরে দাঁড়াল ।

ইয়ে—তোমার দিদিমণি এখন কি করছেন বলো তো ?

ছোড়দিদিমণি ?

পারলে ওরই মুণ্ডপাত করে ।—না, বড় দিদিমণি ।

হাত দিয়ে দোতলায় কোণের ঘর ঈঙ্গিত করে দাশু শুদ্ধ ভাষায় জবাব দিল, কর্তাবাবুর বাক্য শুনছেন ।

ননিমাধব বিরক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু দাশু খুব মিথ্যে বলেনি ।

বাবার ঘরে বসে অর্চনা বাক্যই শুনছিল আর বাবার অগোচরে মাঝে মাঝে দরজার দিকে তাকাচ্ছিল ।

বিছানায় একসঙ্গে তিনটে বালিশে মাথা রেখে আধ-শোয়া ভাবে অনর্গল কথায়

নিজেকেই যেন স্পষ্ট করে দেখেছেন ডক্টর বাসু। আর সামনের মোড়ায় বসে অর্চনাকে শুনতে হচ্ছে সেই আত্মদর্শন তত্ত্ব। অনেক সময়েই শুনতে হয়, ফাঁক খুঁজে না পালানো পর্যন্ত রেহাই নেই। কিন্তু ফাঁক আর পেয়ে উঠছে না, বাবার বলার ঝোঁকটা ক্রমশ বাড়ছে।

ডক্টর বাসু বইখানা বুকের ওপর রেখে ব্যাখ্যায় তন্ময়। তাঁর বক্তব্য যে-ভাবেই থাকুক আর যে-কাজই করুক মানুষ, ভিতরে ভিতরে সে খুঁজছে কাউকে। নিজের অজ্ঞাতে তার খোঁজার বিরাম নেই। ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন কিন্তু কাকে খুঁজছে ?

অর্চনার দৃষ্টি তখন দরজার দিকে। মনে মনে সেও এক খোঁজেই অন্যমনস্ক। কথাটা কানে যেতে অপ্রতিভ মুখে ঘুরে বসল।—হ্যাঁ বাবা, খুঁজছে...

তাই তো বললাম, কিন্তু কাকে ? একটা যেন ধাঁধার পরদা সরাচ্ছেন তিনি, এমনি আগ্রহ।...কার জন্য তার এই আকূতি ?

ভ-ভগবানের জন্য ? অর্চনার নিরুপায় মনোযোগ।

মেনেই নিলেন যেন। বললেন, বেশ কথা, ধরা যাক ভগবানকেই খুঁজছে। কিন্তু ভগবান কোথায় থাকে ?

বিষয়ের গভীরতায় ক্রমশই তলিয়ে যাচ্ছেন ডক্টর বাসু। ভগবানেব কোথায় থাকা সম্ভব সেই উপলব্ধি আগে স্পষ্ট হলে পরের আলোচনা। তাঁর বিশ্লেষণ, মানুষ তো সেই কোন্ কাল থেকে আছে—প্রথমে ছিল অনার্য, তারা মারামারি করত, কাটাকাটি করত, হিংসা ছাড়া আর কিছুই জানত না কিন্তু তাদেরও ভগবান ছিল, তাদের সেই ভগবানের মূর্তি আরো হিংস্র আরো বীভৎস। কিন্তু মানুষ যত সভ্য হতে লাগল, দেখা গেল তাদের ভগবানও আরো সভ্য হচ্ছে আরো সুন্দর হচ্ছে। তাহলে কি বলতে হবে ভগবানও মানুষেব মতই আগে অনার্য ছিল শেষে আর্য হল ? হেসে উঠলেন তিনি—তা নয়...আসলে আমরা যেমন দেখি। ভগবান বলতে আমরা যাকে ভাবি সে তো তাহলে মানুষেরই প্রতিবিম্বিত মহিমা।

ব্যাখ্যার প্রসন্ন আনন্দে আধ-শোয়া অবস্থাতেই একটা চুরুট ধরালেন। অর্চনার ঝিমুনি আসছিল, চুরুটের কড়া গন্ধে চোখ টান করে তাকাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ডক্টর বাসু চোখ বুজে বিশ্লেষণটুকুই ভাবতে লাগলেন।

দাশু অর্চনার এই বাক্য শোনার কথাই বলেছিল ননিমাধবকে।

বিজন ফিরেছে। আঠারো হাজার টাকার উষ্ণতায় তার উৎসাহ অনেকটাই পুনরুজ্জীবিত। কিন্তু পাছে পার্টনার ঢিলে দেয় সেই আশঙ্কায় টাকা যে কত ব্যাপারে কত কারণে দরকার সেটাই নানাভাবে বেশ করে বোঝাচ্ছে তাকে। ননিমাধব শুনছে। ম্রিয়মাণ। একটু আগে ওই বাইরের বারান্দা দিয়ে হাসিখুশি মুখে বরুণা যে লোকটাকে একেবারে ওপরে নিয়ে গেল—ম্রিয়মাণ তাকে দেখেই।

দেখেছে বিজনও। কিন্তু নিজের আগ্রহে আর উৎসাহে অত খেয়াল করেনি। দেখেছে এই পর্যন্ত। ফ্যাক্টরির ভবিষ্যৎ-চিত্রের সব সমস্যার ফিরিস্তি শেষ করে বলল, এখনই তিরিশ হাজার পেলে ভাল হত হে।

ননিমাধব অন্যমনস্কের মত জবাব দিল, বাকিটাও শিগগিরই পাওয়া যাবে—

ভেরি গুড ! চেকটা তুমি বিজনেস একাউন্টে জমা করে দাও, তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না।

কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল ভাবনা তার একটুও নিরসন হয়নি। আর ভাবনা কিসের তাও যেন বোধগম্য হল এতক্ষণে। বরুণার সঙ্গে একটু আগে যে লোকটা ওপরে উঠে গেছে তার ওপরেই মনে মনে বিরূপ হল একটু। কিছুদিন আগে ননিমাধবের সেই আভাসও মনে পড়ছে। এমন এক সময়ে ওই মেয়ে দুটোর কাণ্ডজ্ঞানহীনতা চক্ষুশূল। ব্যবসায় নেমে কোন আলোচনাতেই কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই। ঝোঁকের মাথায় সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বিনা ভণিতায় পার্টনারকে কিছুটা আশ্বাসই দিয়ে ফেলল সে। গলা খাটো করে বলল, দেখ, একটা কথা শুনে রাখো—ওসব মাস্টার-টাস্টার মা দু'চক্ষে দেখতে পারে না, তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই, বুঝলে ?

কিন্তু বুঝেও খুব যেন স্বস্তি বোধ করল না ননিমাধব। তবে প্রসঙ্গটা সুবাঞ্ছিত বটে। শুকনো মুখে একটু হাসল, আমতা আমতা করে বলল, আমি বলছিলাম কি বিজুদা, কথাটা একবার মাসিমার কাছে পেড়ে রাখলে হত না ? মা—মা বলছিলেন আর কি...।

তাকে আশ্বাসটা একেবারে মিথ্যে দেয়নি বিজন, অবস্থা ফেরাতে পারলে মায়ের মত পাওয়াই যাবে এটা তার বিশ্বাসই। আর অবিশ্বাসই বা হবে কেন, ননিমাধব ছেলে খারাপ নয়। তাছাড়া মেয়ে দুটোর ইয়ারকি ফাজলামো দেখেও মনে হয়েছে কোনদিকে আটকাবে না। তবু নিজেদের জোরে দাঁড়ানোর জোরটাই আগে অভিপ্রেত মনে হয়েছে বিজনের। জবাব দিল, কথা তো পাড়লেই হয়, কিন্তু ব্যবসাটা জাঁকিয়ে দাঁড়াক একটু। মুশকিল কি জানো, তোমাকে তো সেদিন বললাম—আমরা যে কিছু একটা করছি তা এরা বিশ্বাসই করে না। আর করবেই বা কি দেখে, লাভ তো সবই প্রায় ব্যবসাতেই খেয়ে যাচ্ছে, অথচ এখনো তো আমাদের কোম্পানির একটা গাড়ি পর্যন্ত হল না।

ননিমাধব তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব দিল, গাড়ি কিনে ফেল।

বিজন অবাক।—গাড়ি কিনে ফেলব ! এই টাকা থেকে ?

না তা কেন, টাকা তো আমি দু-চার দিনের মধ্যেই আনছি—তুমি একটা গাড়ি দেখ।

পার্টনারের এতবড় সহযোগিতায় বিজন যথার্থই বিচলিত এবারে। ওর জন্যে যা বলার মাকে সে বলবে ; শুধু বলবে না, বাজীও করাবে। ভারি তো— ! একটু চিন্তা করে সম্মতি জ্ঞাপন করল, আচ্ছা...। আর মায়ের সঙ্গেও আমি কথা বলব'খন।

কলেজের মাস্টারের প্রতি মায়ের বিতৃষ্ণা সম্বন্ধে বিজন যথার্থই নিঃসংশয়। কিন্তু মায়ের সঙ্গে কথার বলার আগে যে আর একপ্রস্থ সেই দিনই ওপরেও হয়ে গেল, সেটা জানলে বোধ করি তারও অস্বস্তির কারণ হত।

সেই কথা বলেছেন ডক্টর বাসু নিজে।

তিনি নিজে থেকে বলেননি, বা বলার কথা হয়তো চট করে তাঁর মনেও হত না। সেই রাস্তা করে দিয়েছেন মিসেস বাসু। স্ত্রীর অসহিষ্ণুতা একদিনের দুদিনের নয়। বড় মেয়েটি তাঁর কোন কথার মুখোমুখি অবাধ্য না হলেও তাকে যে সব সময় ইচ্ছেমত আগলে রাখা সহজ নয় মনে মনে এটুকু তিনি ঠিকই উপলব্ধি করতেন। বাড়িতে যে-একজনের আদৌ শাসন নেই, তার কথাই বরং মেয়েটা শোনে অনেক বেশি। অথচ সেই-একজনেরই প্রশ্রয়ে দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে কোথাকার কে একটা প্রাইভেট কলেজের মাস্টার, এটা মায়ের পক্ষে বরদাস্ত করাও খুব সহজ নয়। মেয়েটা না হয় নিজের ভালমন্দ বোঝে

না, কিন্তু এই একটা মানুষেরও একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকতে নেই ! এ নিয়ে অনেকদিনই স্বামীকে দু-পাঁচ কথা বলেছেন, কিন্তু যত জ্বালা তাঁরই, মাথায় কিছু ঢোকে কি না সন্দেহ ।

তার ওপর সেদিন শূন্য-মোড়ার উদ্দেশে স্বামীকে বক্তৃতা করতে শুনে মেজাজ যথার্থই বিগড়ালো । মেয়েটা উঠে পালিয়েছে সে-খেয়াল পর্যন্ত নেই । চোখের ওপর হাত রেখে তত্ত্বকথা শোনাচ্ছেন বিড়বিড় করে । একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যেই যেন মিসেস বাসু মোড়ার ওপর এসে বসলেন । লোকে এর পর পাগল ভাববে না তো কি ?

এক ঘায়েই তত্ত্বের সব জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন । চোখ থেকে হাত নামিয়ে ডক্টর বাসু মোড়ার ওপর কন্যার বদলে স্ত্রীকে দেখে অপ্রস্তুত ।—অর্চনা গেল কোথায়...

মিসেস বাসু ঝাঁজিয়ে উঠলেন, কোথাও যায়নি, নিজের ঘরে বসেই তোমার সেই আদরের মাস্টারের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে—এখন বোঝো মেয়ের মতিগতি !

মেয়ের মতিগতি বোঝার বদলে মানুষটা যেন পিত্তি জ্বালিয়ে দিলেন । হৃষ্টকণ্ঠে বললেন, ও, সুখেন্দু এসেছে বুঝি...ওদের এখানে আসতে বলো না ’

মিসেস বাসু গম্ভীর মুখে তাঁর দিকে খানিক চেয়ে থেকে রাগ সামলাতে চেষ্টা করলেন প্রথম ।—খুব আনন্দ, কেমন ? চোখ দুটো আছে, না নোট লিখে লিখে তাও গেছে ?

ভদ্রলোক এবারে বুঝলেন সমাচার কুশল নয় । তবু হালকা জবাব দিলেন, নোট তো তোমার তাগিদেই লিখি । কি হয়েছে ?

এইটুকুরই অপেক্ষা । তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন, কি হয়েছে আর কি হচ্ছে সবই আমি বলব—তোমার চোখ নেই ? দু-মাস ধরে দেখছি মেয়ে যখন-তখন হুট হুট করে বেরিয়ে যায়—য়ুনিভার্সিটি থেকে আসতেও এক-একদিন সন্ধ্যে—কোথায় যায় কি করে ভেবে দেখেছ ? আজকাল শুধু বাইরে নয়, বাড়িতেও ঘন ঘন ডেকে আনা হচ্ছে আর তাই শুনে উনি আনন্দে আটখানা একেবারে ! শুধু তোমার জন্যেই মেয়ের এত সাহস, শুধু তোমার জন্যে ।

একদমে এতখানি উদগিরণের পর তিনি হাঁপাতে লাগলেন ।

আর ডক্টর বাসু আচমকা একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে যথার্থই হাবুডুবু খেলেন খানিকক্ষণ । এই ভাবনার কথাটা ভাবা হয়নি বটে । ভাবতে ভাবতে উঠে বসে চুরুট ধরানোর উদ্যোগ করলেন তিনি ।

কিন্তু শেষপর্যন্ত চুরুট আর ধরানো হল না । তার আগেই সমাধান একটা খুঁজে পেলেন । দুই চোখে আবিষ্কারের আনন্দ । চুরুট ভুলে স্ত্রীর দিকে আর একটু ঝুঁকেই বসলেন তিনি । —এ তো বেশ ভাল কথা । আমার মনেই হয়নি কথাটা—সুখেন্দু খাসা ছেলে, চমৎকার ছেলে, ওদের যদি বিয়ে হয়...আমি বলব সুখেন্দুকে ?

মিসেস বাসু যেন পাগলের প্রস্তাব শুনলেন । প্রথমে হতভম্ব তারপর ক্রুদ্ধ ।—মাথা খারাপ নাকি ! অ্যাঁ ? ওই চারশ টাকা মাইনের কলেজের মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে ! তার ওপর কালচার বলতে ‘ক’ নেই, ওই রকম গোঁয়ারে হাবভাব—

এই সরস প্রস্তাবটা এভাবে নাকচ হতে দেখে ডক্টর বাসু বিরক্ত হয়ে মাঝখানেই বাধা দিলেন ।—তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি, ছেলেটা খারাপ কিসে হল । চার শ টাকা মাইনে কম নাকি । ক'টা ছেলে পায় ? অমন উপযুক্ত বিদ্বান ছেলে—পরে আরো হবে ।

আমার মাথা হবে আর মুণ্ডু হবে ! আর পেরে ওঠেন না মিসেস বাসু ।—তার চেয়ে মেয়েটার হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়ে এসো ।

আর তুমি তোমার কালচার ধুয়ে জল খাও বসে বসে ।...রাগের মাথায় ডক্টর বাসু হাতের চুরুট বিছানায় রেখে বিছানা থেকে দেশলাই তুলে জ্বালতে গেলেন । তারপর মুখে চুরুট নেই খেয়াল হতে দেশলাই ফেলে চুরুট তুলে মুখে দিলেন । শেষে দেশলাইয়ের অভাবে চুরুট হাতে নিলেন ।—এই তো, তোমার বোন মস্ত বড়লোক দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, ভগ্নীপতির ওদিকে দেনার দায়ে চুল বিক্রি—আমারও সেইরকম অবস্থা হোক, কেমন ? কোথা থেকে আনব, কোথা থেকে দেব—

মুখের কথা মুখেই থেকে গেল । শুধু তাই নয়, এতবড় খোঁচাটা দিয়ে ফেলে তার ফলাফল থেকেও অব্যাহতি পেলেন । সহাস্যে ঘরে আসছে বরুণা, অর্চনা—তাদের সঙ্গে সুখেন্দু । ঢুকে পড়ে সুখেন্দু না বুঝলেও মেয়ে দুটো ঘরের তাপ উপলব্ধি করে একটু থমকেছে ।

ডক্টর বাসু সামলে নিয়ে ডাকলেন, এসো, সুখেন্দু এসো—

স্ত্রীর দিকে চেয়ে অতঃপর কিছু একটা আলোচনারই উপসংহার টানলেন যেন ।—ভাল করে ভেবেচিন্তে দেখা দরকার বইকি, তুমি যা বলেছ তাও ঠিক, এক কথার ব্যাপার তো নয়...।

বলা নেই কওয়া নেই এইভাবে বাইরের লোক নিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢোকার দরুন মিসেস বাসু মেয়ে-দুটোর ওপরেই মনে মনে জ্বললেন একপ্রস্থ । মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কষ্টকৃত আপসের সুরে স্বামীর উপসংহারের ওপর মন্তব্য করলেন, তোমার কথাও মিথ্যে নয়, আমার যা মনে হল তাই বললাম, নইলে এসব ব্যাপার তোমরাই ভাল বোঝো—

বাইরের লোকের সামনে অর্চনা-বরুণা বাবা মায়ের এ ধরনের পরোক্ষ স্তুতিবিনিময় শুনে অভ্যস্ত । তারা যে-যার অন্যদিকে চোখ ফেরাল । ডক্টর বাসু একটু সরে বসে আপ্যায়ন জানালেন, সুখেন্দু দাঁড়িয়ে কেন, বসো—আজ কলেজ নেই ? ও আজ ছুটি বুঝি, আমার সবদিনই ছুটি তো, মনেই থাকে না ! এতক্ষণের বাক্-বিতণ্ডার কারণ ভুলে হেসে উঠলেন তিনি ।

মায়ের চোখে চোখ পড়তেই অর্চনার সঙ্কট । তার মুখের ওপর একঝলক উগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি কাজের অছিলায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন । অর্চনা আর বরুণা এবারে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসি চাপতে চেষ্টা করল । বাবা প্রসন্নমুখে চুরুট ধরাবার উদ্যোগ করছেন ।

ক'টা দিনের মধ্যে ননিমাধবের উদ্যমের বেপরোয়া পরিবর্তন দেখে বিজন পর্যন্ত ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল । স্ত্রী দিনরাত নভেলে ডুবে থাকলেও বাড়িতে যখন থাকে, অন্দরমহলের সমাচার কিছু কিছু কানে আসেই । তার কাছ থেকে যেটুকু খবর পায় তাতেই অনুগত পার্টনারটির জন্যে মনে মনে একটু চিন্তিত । অতটা হত না, যদি না ব্যবসায়ে ননিমাধবকে হঠাৎ অমন উৎসাহের বন্যায় ফুলে-ফেঁপে উঠতে দেখত । এত উৎসাহ আর উদ্যমের উৎস কোথায় সেটা সে ভালই জানে । আর সেখানে কোন প্রতিকূল ছায়া পড়লে সবেতেই যে শুকনো টান ধরে যাবে তাও সহজেই অনুমান করতে পারে ।

গত এক মাসের মধ্যে ননিমাধব অসাধ্যসাধনই করেছে প্রায় । তার সমস্ত আশা কেন্দ্রীভূত একখানা মোটর গাড়ি কেনা আর ব্যবসায়ে টাকা ঢালার মধ্যে । নিজের মাকে ধরে বাবার সঙ্গে পষ্টাপষ্টি একটা ফয়সালা করে নিয়েছে সে । বাপের টাকা যত, ছেলের প্রতি আস্থা তত নয় । তবে বিশ্বাস কিছু বিজনের ওপরে আছে, তার হাতে টাকাটা একেবারে নষ্ট হবে না । কিন্তু আপাতত নির্দিষ্ট অঙ্কের বাইরেও তাঁকে চেক কাটতে হয়েছে ছেলের মতিগতির ব্যতিক্রম দেখেই ।

গাড়ি হয়তো এতে শিগগির সত্যিই কেনার ইচ্ছে ছিল না বিজনের । কিন্তু গাড়ির খাতে পার্টনার আলাদ টাকা বার করে এনেছে, গাড়ি না কিনেই বা করে কি ! না কেনা পর্যন্ত ননিমাধবের তাগিদেরও বিরাম ছিল না ।

অতএব ফ্যাক্টরি বাড়ানোর জন্য আশাপ্রদ মূলধনই শুধু জোটেনি, নতুন গাড়িও একটা হয়েছে ।

গাড়ি কেনার পর ননিমাধবের সর্বাগ্রগণ্য ডিউটি মাসিমা অর্থাৎ অর্চনার মাকে সেই গাড়িতে চড়ানো । তাতেও কিছুমাত্র বেগ পেতে হয়নি, কারণ ছেলেদের যে ব্যবসাটা মহিলা অবহেলার চোখে দেখে এসেছেন এতদিন, গাড়ি কেনার পরেই আর সেটা হেলাফেলার বলে মনে হয়নি । অতএব খুব খুশি হয়েই গাড়িতে চড়েছেন তিনি, আর চড়ার পরে ননিমাধবকেও একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন । প্রসন্ন মুখে গাড়ির প্রশংসা করেছেন, চমৎকার গাড়ি হয়েছে, এতটা পথ ঘুরে এলাম একটুও ঝাঁকুনি নেই—

ননিমাধব বিগলিত । সাফল্যটা নাগালের কাছাকাছি এসে গেছে যেন । বলেছে, আর ক'টা দিন অপেক্ষা করুন না মাসিমা, আমি নিজেই ড্রাইভিংটা শিখে নিচ্ছি—ও ব্যাটার থেকে অনেক ভাল চালাব ।

এর পর মায়ের কাছে আর একটা প্রসঙ্গ উত্থাপনে বিলম্ব করাটা একটুও সমীচীন বোধ করেনি বিজন ! অবশ্য দুপুরে খেতে বসে সেই উত্থাপনের সুযোগ মা-ই দিয়েছেন । অর্চনা-বরুণা কলেজে, কাজেই আলোচনার ব্যাঘাতও ঘটেনি । সকালে নতুন গাড়ি চড়ে আসার আনন্দটা মায়ের মনে লেগেছিল । তিনি বলেছেন, হ্যাঁ রে, এরই মধ্যে তোমাদের গাড়ি হয়ে গেল, ব্যবসা বেশ ভাল চলছে বল ?

বিজন জবাব দিয়েছে, সবে তো শুরু, আর একটা বছর সবুর কর না, দেখ কি হয়—

আলোচনার সাক্ষী শুধু দাশু । অদূরে বসে একটা কি নাড়াচাড়া করছিল । দাদাবাবুর পরের কথাগুলো কানে যেতে গম্ভীর কৌতুকে মুখখানা তার আরো গম্ভীর । ওই এক প্রসঙ্গ থেকেই বিজন পার্টনারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ।—ননিমাধবকে তো আর জান না, ওই রকম থাকে বলে । ওর মত ছেলে ক'টা হয়, ব্যবসায়ও তেমনি মাথা—

যেন সমস্ত ব্যবসাটা ওর মাথার জোরেই চলেছে । পাছে নজরে পড়ে যায় সেই ভয়ে দাশু একেবারে ঘুরে বসে নিঃশব্দ মুখভঙ্গি করেছে একটা । মা ওদিকে ছেলের প্রশংসাটা মেনেই নিয়েছেন, কারণ এরই মধ্যে একখানা গাড়ি করে ফেলা তো কম কথা নয় ।

বিজন জানিয়েছে, একখানা কেন, আরো হবে । তার পরেই একবারে আসল বক্তব্যে এসে পৌঁছেছে—দেখ মা, ব্যবসা ছাড়া কোনদিন কেউ কিচ্ছু করতে পারে না, বুঝলে ?

একটা কলেজের মাস্টারকে এভাবে মাথায় তুলছ কেন তোমরা—অর্চনার বিয়ের ভাবনা তো ? সব ঠিক আছে, সে-ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও ।

মিসেস বাসু অকূলে কূল পেয়েছেন । অতঃপর গৃহকর্তার কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ফলাও করে বিস্তার করেছেন তিনি । ছেলে গম্ভীর মুখে পরামর্শ দিয়েছে, বাবার কথায় কান দিও না, অর্চনাকেও একটু বুঝিয়ে-সুজিয়ে বোলো ।

অর্চনাকে বুঝিযে বলার আগেই বিকেলে দাশু ছোট দিদিমণির খাবার দিতে গিয়ে তার কাছে বিপদেব পূর্বাভাস জ্ঞাপন করে বেখেছে একটু । দাদাবাবুরা তকতকে গাড়ি কিনেছেন, সকালে মাকে চড়ালেন, দাদাবাবু মায়ের কাছে খেতে বসে খুব সুখ্যাতি করছিল ননিবাবুর, বড় দিদিমণিব আব ভাবনা নেই, বিযের পব গাডি চেপে খুব হাওয়া খাবে, ইত্যাদি—।

দাশুর বচন নিয়েই মনের আনন্দে বরুণা দিদির পিছনে লেগেছিল ।—ভদ্রলোকের আর কোন আশাই নেই, আমি না হয় পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিয়ে আসি, মশাই গাডিটারি কিনতে পারেন তো এগোন, নয় তো কেটে পড়ুন । দাশু বলছিল, তোর আব একটুও ভাবনা নেই, ননিদা তোকে দিনরাত হাওযা খাওযাবে—

অর্চনাব তাড়া খেযে পালাতে গিয়ে দোরগোড়ায় মায়ের সঙ্গে বরুণাব ধাক্কা লাগার উপক্রম । তিনি মেযেকে বোঝাতে এসেছিলেন । বরুণা পাশ কাটিয়ে পালালো । মিসেস বাসু বিরক্তি প্রকাশ করলেন, মেযেব চলাফেবা দেখ না !

মাযেব সাডা পেযেই অর্চনা পডাব টেবিলে বসে বই টেনে গম্ভীর হতে চেষ্টা করল । ঘরে এসে মিসেস বাসু দুই-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন, তারপব হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, খবব শুনেছিস ?

অর্চনা খবব শোনাব জন্য ঘুরে বসল ।

খাটেব বিছানায় উপবেশন কবে প্রসন্ন মুখে মেয়ের দিকে তাকালেন তিনি, বিজু আর ননি চমৎকাব নতুন গাডি কিনেছে—

তাই নাকি । অর্চনার বিস্মযে ভেজাল নেই ।

হ্যাঁ, সুন্দব গাডি—কাল তোদের চড়াবে'খন । ওদেব ব্যবসায়ও দিন-কে-দিন উন্নতি হচ্ছে, আব ননিমাধবেব কত প্রশংসা কবছিল বিজু—

ছদ্মত্রাসে অর্চনা চোখ বড বড ।—তুমি যেন করে বোসো না মা প্রশংসা, তাহলে এক ডজন রুমাল প্রেজেন্ট কবতে হবে ভদ্রলোককে ।

ঠাট্টাটা আজ মাযের একটুও ভাল লাগল না । বললেন, তোর সবেতে বাডাবাড়ি, ঠাস ঠাস কথা বলতে পাবলেই ভাবিস কি নাকি—

কিন্তু কথার মাঝে তাঁকেই হঠাৎ থেমে যেতে হল । একটু আগে জ্বলন্ত ধুনুচি হাতে দাশু ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘরে ঢুকেছিল । ঘবে ধুনো দেওযা আব কোণের তাকে বুদ্ধমূর্তির কাছে ধুনুচি বেখে প্রণাম কবাটা তা নৈমিত্তিক সান্ধ্য কাজ । আর প্রণামটা বুদ্ধমূর্তি বলে নয়, ঠাকুব-দেবতা বা সেই সদৃশ মূর্তি দেখলেই করে থাকে । তাকে ঢুকতে দেখা গেছে, কিন্তু বেরুলো কিনা সেটা মিসেস বাসু লক্ষ্য কবেননি । এবারে থেমে গিয়ে লক্ষ্য করলেন। তাকের বুদ্ধমূর্তিব সামনে ধুনুচি রেখে জোড় হাতে মাথা রেখে দাশু প্রণাম করেই আছে। অর্চনার হাসি চাপা দায় । এদিকের সাড়াশব্দ না পেয়ে দাশু আস্তে আস্তে মুখ তুলতেই

কর্ত্রীর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় ।

বেরো এখান থেকে, এক ঘন্টা ধরে প্রণামই করছে !

ধুনুচি হাতে দাশুর শশব্যস্ত প্রস্থান ।

মাকে আবার প্রস্তুত হতে দেখে অর্চনা হাসি সামলে গম্ভীর হল কোন প্রকারে ।

...হ্যাঁ, যা বলব ভাবছিলাম তোকে, তোর বাবার একেবারে ভীমরতি ধরেছে । একটু-আধটু আলাপ-সালাপ কত লোকের সঙ্গেই হয়, তা বলে ওই মাস্টারই নাকি খুব ভাল ছেলে, তার সঙ্গে তোর বিয়ের কথা পাড়তে চায় !

রাতে বলেই রক্ষা, শোনামাত্র অর্চনার মুখের রঙ বদল হয়েছিল কি না ধরা পড়ল না । আচমকা খুশির আলোড়ন গোপন করার জন্য তরল বিস্ময়ে নাকমুখ কুঁচকে ফেলল একেবারে, এ-মা, তাই নাকি !

অভিব্যক্তি দেখে মা একটু হয়তো আশ্বস্তই হলেন । আরো ঝুঁকে বসে মেয়েকে সংসার বিষয়ে একটু সচেতন করার উদ্দেশ্যে নিজের সংসার-জীবনের কষ্টক্লিষ্ট অভিজ্ঞতার সমাচার ব্যক্ত করতে ভুললেন না । মাস্টারের সংসার সচল রাখা যে কত কষ্টের সে শুধু উনিই জানেন, এর ওপর শেষজীবনে কি আছে কপালে কে জানে । পেনশনের তো ওই ক'টি টাকা, উনি দিন-রাত ঘাড়ে চেপে এটা ওটা লিখিয়ে কোনরকমে সংসারযাত্রা নির্বাহ করছেন —কত যে জ্বালা সে আব কে বুঝবে । তা ছাড়া বই লেখাও তো সকলের কম্ম নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি । উপসংহারে মেয়েকে সতর্ক করে দিলেন, তোর কাছে বলতে এলে খবরদার কান পাতিস না ।

অর্চনা বলল, তুমি ক্ষেপেছ মা ?

টেবিল থেকে পড়ার বই হাতে তুলে নিয়েছে সে । প্রকাশ, তার পড়াশুনার তাড়াটাই আপাত বেশি । মা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটা টেবিলের ওপরেই আছড়ে ফেলেছে আবার । উঠে সটান বিছানায় শুয়ে পড়েছে । বরুণাটা এক্ষুনি এসে হাজির হবে ভেবেই তাড়াতাড়ি আবার চেয়ারে এসে বসেছে ।

মিসেস বাসু শুধু মেয়েকে সতর্ক করেই নিশ্চিন্ত হতে পারেননি, সেই রাতেই স্বামীকেও একটু-আধটু সমঝে দিতে চেষ্টা করেছিলেন । গাড়ি কেনার প্রসঙ্গে ননিমাধবের সম্বন্ধে ছেলের উক্তিটাই স-পল্লবে আগে সমর্থন করে নিয়েছেন । শুধু বাড়ির অবস্থাই ভাল নয়, ছেলেটাও যে কাজের সেটা এতদিন বোঝেননি বলে একটু আক্ষেপও করেছেন । আর শেষে, বিয়েটা যে ছেলেখেলা নয়, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার একটা—সেই প্রসঙ্গে ছোটখাটো ভাষণ দিয়ে বলেছেন, কর্তাটি যা বোঝেন না তাতে যেন মাথা ঘামাতে না আসেন অথবা কাউকে কোনরকম আবোল তাবোল প্রশ্রয় দিয়ে না বসেন ।

ফল উল্টো হল ।

এই এক মাসের মধ্যে সমস্যাটা ঠিক স্মরণের মধ্যে ছিল না ভদ্রলোকের ।...মনে পড়ল । স্ত্রীর সব কথাই শুনতে হয় বলে শোনেন, কিন্তু করণীয় যা সেটা বেশির ভাগই নিজের মত অনুযায়ী করেন । অন্তত গুরুতর কোন ব্যাপারে স্ত্রীর মতামতের ওপর তাঁর আস্থা কমই । এদিক থেকে স্ত্রী একটা যথার্থ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁকে, বিয়ে তো ছেলেমানুষি ব্যাপার নয় । নয় বলেই ভাবনা । তার ওপর গাড়ির কেনার দরুন হঠাৎ আবার যে ছেলেটার

প্রশংসার সূচনা, তাও চিন্তার কারণ একটু।

পরদিন সকালে বই পড়তে পড়তেও এই সমস্যাটাই থেকে থেকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল। টেবিলের ওপর চুরুটের সামান্য একটু নেভানো অংশ পড়ে আছে। সেই কখন বাক্স নিয়ে দাশু দোকানে গেছে চুরুট ভরে আনতে, এখনো দেখা নেই। চুরুটের অভাবে ভাবা বা পড়া কোনটাই সুস্থির মত হচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে শেষে দাশুর উদ্দেশে হাঁক-ডাক শুরু করে দিলেন তিনি।

তাই শুনে ওদিকের ঘর থেকে অর্চনা উঠে এলো। বইয়ের ওপর চোখ রেখে তিনি হাত বাড়ালেন।

কি বাবা ?

ও তুই...দাশুটা গেল কোথায়, আর কেউ কোথাও পাঠিয়েছে ?

টেবিলে চুরুটের বাক্স না দেখে অর্চনা বুঝল দাশুর খোঁজে বাবা অত গরম কেন। বলল, আচ্ছা আমি দেখছি—

সে দরজার দিকে এগোতে কি ভেবে তিনি বাধা দিলেন, থাক তোকে দেখতে হবে না, এদিকে আয় কথা আছে—

অর্চনা ফিরল।

বোস—

একটু অবাক হয়েই অর্চনা মোড়াটা তাঁর সামনে টেনে বসল।

হাতের মোটা বইটা একদিকে সরিয়ে রেখে তিনি সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, তোর মা তোকে কিছু বলেছে ?

অর্চনা শঙ্কিত একটু, কি বলবে ?

তার মানেই বলেনি, বলবে না আমি আগেই জানি, তার তো সব বড় বড় ইয়ে—

আসল প্রসঙ্গটা দুর্বোধ্য রেখেই স্ত্রীর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে নিলেন একটু। অর্চনা ভয়ে ভয়ে একবার দরজার দিকটা দেখে নিল, তারপর বাবার দিকে তাকাল।

যাক্‌গে শোন্, ওই সুখেন্দু খুব ভাল ছেলে তুই কি বলিস ?

লজ্জায় আরক্ত হলেও জিজ্ঞাসার নমুনায় অর্চনা বাবার দিকে চেয়ে হেসেই ফেলল। মেয়ের কিছু বলা না বলার জন্য অপেক্ষা করলেন না তিনি। নিজের মনের কথাটাই ব্যক্ত করলেন।—তোর মা অবশ্য বলবে ওর মোটর নেই, মাস্টারি করে—মাস্টারি তো আজীবন আমিও করলাম, মোটর হয়নি ?

জবাব না দিয়ে অর্চনা ভয়ে ভয়ে দরজার দিকেই তাকাল আবার।

...তা শোন্, আমি বলছিলাম ওর সঙ্গেই তোর বিয়ের কথাটা পেড়ে দেখি তোর কি মত ?

বাবার কাছে সর্ব বিষয়ে নিজের মতামতটা স্পষ্ট ব্যক্ত করতেই অভ্যস্ত সে। কিন্তু বাবার কাণ্ডই আলাদা, এও যেন বাইরের আলোচনা একটা। লজ্জায় অর্চনা ঘেমে ওঠার দাখিল। কিন্তু এবারে জবাব না দিয়েও উপায় নেই, বাবার যা বলার বলা হয়ে গেছে।

অর্চনা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, তার পরে মোড়া ছেড়ে দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়াল।

খুশিতে ভদ্রলোক টুক্‌রো পোড়া চুরুটটা মুখে তুলে নিলেন ।

বাইরে এসে হাঁপ ফেলতে গিয়ে অর্চনা থমকে দাঁড়াল । দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাশু । হাতে চুরুটের বাক্স । তার মুখে খুশির চাপা অভিব্যক্তি, এবং সেই খুশির কারণে সে চুরুটের বাক্স থেকে একটা চুরুট সরিয়ে সবে পকেটে পুরছে ।

দাশু মুখ তুলেই দেখে সামনে দিদিমণি । চুরি ধরা পড়ে গেল ।

অর্চনা ভ্রূকুটি করে তাকাল তার দিকে, দাঁড়াও বাবাকে বলছি—

বিব্রত গোবেচারী মুখ দাশুর ।

ছদ্ম রাগে অর্চনা তার পাশ কাটাতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল । খোলা চুরুটের বাক্স থেকে আর একটা চুরুট তুলে নিয়ে দাশুর বুকপকেটে গুঁজে দিয়েই হন হন করে এগিয়ে গেল । হাস্যবদন দাশু ঘুরে দাঁড়াল, আর খানিকটা গিয়ে ফিরে তাকাল অর্চনাও । তার মুখভরা হাসি ।

ঘোষণা যা করার সেটা অতঃপর ডক্টর বাসুই করেছেন । আর সেটা করেছেন সুখেন্দুকে নিজের ঘরে ডেকে কথাবার্তা বলে এবং তার সম্মতি নিয়ে তারপর । শুনে তাঁর গৃহিণী স্তব্ধ পাথর । বিজন বিস্ময়াহত ।

মায়ের সামনা-সামনি অর্চনা মুখখানা এমন করেছে যেন অবুঝ বাবা হাত-পা বেঁধে তাকে জলে ফেলারই ব্যবস্থা করছেন । কিন্তু তাতেও মাকে তুষ্ট করা সম্ভব হয়নি, বাপের সঙ্গে মেয়ের চক্রান্তটা বুঝেছেন তিনি ।

বাড়ির এই হাওয়াটা একটু গোলমেলে ঠেকল ননিমাধবের কাছেও ।...বিজুদার হাবভাবে কেমন যেন সঙ্কোচ একটু । কাজের কথা ছাড়া কাছে ঘেষঁতে চায় না, কাঁচুমাচু ভাব, বাড়ি গেলে বরুণা রাণু বউদিও কেমন এড়িয়ে চলে । আর, যার প্রত্যাশায় যাওয়া তার তো দেখাই মেলে না । এমন কি, তার মায়েরও না ।

ষষ্ঠ চেতনার কারিগরি কি না বলা যায় না, বিকেলের দিকে সেদিন সে এসেও হাজির বড় মর্মান্তিক ক্ষণে । মনে হল নিচের ঘরটা একটু বেশি পরিপাটি সাজানো-গোছানো । সেই নিরিবিলিতে বসে একটু পড়ছিল রাণু বউদি, ওকে দেখে চমকেই উঠল যেন । ননিমাধব নিশ্চিন্ত মনে পড়তেই বলেছিল তাকে, তবু কর্তাটিকে খবর দেবার জন্যে প্রায় শশব্যস্তেই পালিয়েছে সে । বরুণাও বউদির উদ্দেশে বকাবকি করতেই একবার ঘরে ঢুকেছিল । বউদির বদলে ওকে দেখেই ত্রস্ত, বিব্রত । দাদাকে খবর দেবার অছিলায় সেও দ্রুত প্রস্থান করেছে । ওদিক থেকে মিসেস বাসুর গলা শোনা গেছে । কাজের সময় সকলের অলস নিশ্চিন্ততার কারণে ক্ষোভ তাঁর । এমন কি, ওপর থেকে কর্তার গলাও শোনা গেল, কতক্ষণের মধ্যে কে এসে পড়বে সেই কথা জানাচ্ছেন ।

অন্যমনস্কের মত একটা সিগারেট ধরিয়ে খালি প্যাকেটটা জানলা গলিয়ে ফেলতেই ওদিক থেকে যে-মূর্তিটি মুখ তুলল, সে দাশু । জানলার ওপাশে বসে আয়েস করে বিড়ি টানছিল সে । কর্ত্রীর সামনে পড়লেই তো ছোটাছুটির একশেষ, সবে ফুরসৎ পেয়ে আড়ালে সরেছিল ।

...ও তুমি—

জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখেই দাশু আবার জানলার ওধারে বসে পড়েছে । ঘরে কে আছে বাইরে গাড়ি দেখেই বুঝেছিল ।

কিন্তু ব্যতিক্রমটা বড় বেশি স্পষ্ট লাগছে । ননিমাধব দাশুকে না ডেকে নিজেই বাইরে এসে দাঁড়াল । বিড়ি ফেলে দাশুও প্রস্তুত ।

আচ্ছা দাশু...এঁরা সবাই একটু ব্যস্ত দেখছি যেন, কি ব্যাপার ? কি কথাবার্তা হচ্ছে শুনলাম—

দাশু সাদাসিধে জবাব দিল, হ্যাঁ, দিদিমণির বিয়ের কথাবার্তা—বড় দিদিমণির ।

ননিমাধবের সঙিন অবস্থা ।—কার সঙ্গে, মানে কে বলছে কথা ?

সকলেই । মা, বাবু, দাদাবাবু—

একটু আশ্বস্ত ।—দাদাবাবু বলছেন ?

দাশু নিস্পৃহ ।—দাদাবাবুই তো সব থেকে বেশি রাগারাগি করছিলেন ।

ননিমাধব হকচকিয়ে গেল আবারও ।—রাগারাগি কেন ?

আর বেশি সংকটের মধ্যে রাখতে দাশুরও মায়া হল বোধহয় । ঘ্যাঁচ করে খাঁড়াটা এবারে বসিয়েই দিল সে । ওই মাস্টারবাবুর সঙ্গেই দিদিমণির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল—তাই আজ আশীর্বাদ ।

ননিমাধব পাংশু হতভম্ব বেশ কিছুক্ষণ ।

হাতের আস্ত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে এক-পা দু-পা করে গাড়িতে গিয়ে উঠল । চালকের আসনে ।

ইতিমধ্যে ড্রাইভিংটা শিখে নিয়েছে সে ।

॥ ৫ ॥

অর্চনার বিয়ে হয়ে গেল ।

সংসারে কর্ত্রী পিসিমা । সুখেন্দুর বাবারও বড় । বাবা অনেককাল বিগত । সুখেন্দুর ছাত্রজীবনের শেষ দু বছর এই পিসিমাই দূরে থেকে তার আর তার মায়ের ব্যয়ভার বহন করেছেন । নইলে বি. এ: পাশ করেই সুখেন্দুকে চাকরির চেষ্টা দেখতে হত, এম. এ. পড়া হত না । বাবা মারা যাবার পর পিসীমা মাঝে মাঝে এই সংসারে এসে এক মাস দু-মাস থাকতেন । বি. এ. পাশ করার পর ভাইপোকে পড়া ছেড়ে শুকনো মুখে চাকরির কথা ভাবতে দেখে তিনিই জোর করে ওর আরো পড়ার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন ।

রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সময় সুখেন্দু পাকাপাকি ভাবে পিসিমাকে এখানে নিয়ে এসেছে । শেষ জীবনটা পিসিমা হরিদ্বারে কাটাবেন স্থির করেছিলেন । সেখানকার এক আশ্রমে তাঁর বড় জা থাকেন, বহুবার তিনি সেখানে আহ্বান জানিয়েছেন । পিসিমাকে কলকাতায় নিয়ে আসার সময় সুখেন্দুও তাঁর হরিদ্বারে থাকার ইচ্ছেয় আপত্তি করেনি । কথা ছিল, তার মা কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি যাবেন ।

কিন্তু মা আর সুস্থ হননি । মস্ত একটা খেদ নিয়েই তিনি চোখ বুজেছেন আর পিসীমাকে ভাল হাতে আটকে রেখে গেছেন ।

এই সব অর্চনা বেশিরভাগই সুখেন্দুর মুখে শুনেছে । শুধু শাশুড়ীর খেদের কথাটা পিসিমা নিজে বলেছেন । অর্চনা এ বাড়িতে পদার্পণ করার প্রথম সন্ধ্যাতেই পিসিমা তাকে

দোতলায় সুখেন্দুর ঘরে দেয়ালের গায়ে টাঙানো ছবিতে তার শাশুড়ীকে দেখিয়েছেন। প্রমাণ-সাইজের অয়েল-পেন্টিং ছবি—ফুলের মালা জড়ানো। পিসিমা বলেছেন, তোমার শাশুড়ী...আজ যেন হাসছে।

ছবিতে শাশুড়ী হাসুন আর না হাসুন, পিসিমা চোখ মুছছিলেন। রাশভারী মহিলাটি সেদিন আনন্দে অনেকবার হেসেছেন অনেকবার কেঁদেছেন। ছবি দেখিয়ে বলেছেন বড় সাধ ছিল ছেলের বউ দেখবে নাতির মুখ দেখবে। শেষের দিন কটা তো এই এক আশা নিয়েই বেঁচেছিল, কিন্তু গোঁয়ার ছেলে তো তখন—

আর বলেননি। শুভদিনে চোখের জল আটকাবার জন্যেই হয়তো ওকে বসিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অর্চনা তখন উঠে এসে ছবিটিকে নিরীক্ষণ করে দেখেছে। নিজের অগোচরে যুক্তকরে শাশুড়ীর উদ্দেশে প্রণামও করেছে।

বাড়িতে আর পাকা বাসিন্দা বলতে রাঁধুনী সাবি। একটা ছোকরা চাকর, হরিয়া—সে ঠিকে কাজ করে, দু-বেলা এসে কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। পিসিমার আপত্তি সত্ত্বেও সুখেন্দুর এই ব্যবস্থা, কোনভাবে যেন তাঁর অসুবিধে না হয়। তাঁর পূজো-আর্চা আচার-অনুষ্ঠানের বিঘ্ন যত কম ঘটে।

বিয়ের পর সব থেকে স্বস্তির নিশ্বাস বোধ করি এই পিসিমাই ফেলেছিলেন। ভাইপোর মেজাজ তাঁর থেকে বেশি আর কে জানে! ওই একরোখা ছেলে নিয়ে মস্ত দুর্ভাবনা ছিল তাঁর। যতবার বিয়ের কথা বলেছেন, ছেলের সাফ জবাব, অশান্তি বাড়াতে চাও কেন, মা যখন নেই আর দরকারও নেই—

পিসিমা অনুযোগ করেছেন, মা নেই বলে কি আমি নেই, আমি চিরকাল পড়ে থাকব এখানে?

সুখেন্দু বলেছে, পড়ে থাকবে কেন, যখন যেখানে ভাল লাগবে সেখানে থাকবে।

পিসীমার দুর্ভাবনা গেছে। মুখে না বলুক মনে মনে অর্চনার ওপরেও খুশি—এই ছেলের জন্য ও-রকম মেয়েই দরকার ছিল।

পিসীমার উপলব্ধি মিথ্যে নয়, সুখেন্দুর গুরুগম্ভীর ভারী দিকটা অর্চনা যেন দুদিনেই হালকা কবে ফেলেছিল। এমন যে, নিজের পরিবর্তনে সুখেন্দু নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হত। সপ্তাহে তিনদিন সকালে প্রাইভেট এম. এ. পরিক্ষার্থিনী এক বিবাহিতা ছাত্রী পড়াতে যায়, দেড়শ' টাকা মাইনে। সেখানে ঘড়ি ধরে হাজিরা দিয়ে এসেছে এতদিন। ওই তিনদিন সকালে বাড়িতে চা খাওয়ার অবকাশ বড় হত না। বিয়ের তৃতীয় দিনেই অর্চনা সেইখানে জুলুম করল, আর সেটা যে এত মিষ্টি লাগতে পারে সুখেন্দু কোনদিন কল্পনাও করেনি।

তখন সাতটাও নয় সকাল, অর্চনা নিচে। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি জামা গায়ে গলিয়ে নিচে নামতে যাবে, দেখে চায়ের পেয়ালা হাতে অর্চনা ওপরে উঠে আসছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই সুখেন্দু ব্যস্তভাবে বলল, এখন নয়, এসে খাব'খন দেরি হয়ে গেছে—

অর্চনা কিছু বলেনি, চায়ের পেয়ালা হাতে মাঝ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল শুধু। সুখেন্দু নাগালের মধ্যে আসতেই খপ করে জামার বুকের কাছটা ধরে হিড়হিড় করে আবার তাকে ওপরে টেনে এনেছে। সুখেন্দু অনুনয় করেও রেহাই পায়নি। ওই অবস্থায় ওপরে উঠতেই

বারান্দার অন্য কোণ থেকে পিসিমার সঙ্গে চোখাচোখি। জামা ছেড়ে দিয়ে অর্চনা দৌড়ে ঘরে পালিয়েছে। ব্যাপারটা বুঝে পিসিমা মনে মনে বলেছেন, এই রকমই দরকার ছিল। এক মিনিট দেরি হলে কতদিন ছেলে সাবির মুখ কালো করে দিয়ে ভাত না খেয়েই কলেজে চলে গেছে ঠিক নেই। কেউ ডাকতে সাহস পর্যন্ত করেনি। এখন চা না খেয়েও বেরুনো বন্ধ।

রাতে খাবার টেবিলে সেদিন এমন গম্ভীর দাদাবাবুর কাণ্ড দেখে আড়ালে গিয়ে সাবি রাঁধুনীও আনন্দে ক'বার জিব কেটেছে ঠিক নেই। ফাঁক বুঝে সুখেন্দু জোরজার করে অর্চনার মুখে কিছু গুঁজে দেবেই। অর্চনা তার হাত থেকে খাবে না, সুখেন্দু নাছোড়। শেষে বাহুবলে সেই চেষ্টা করার উপক্রম দেখে অর্চনা হঠাৎ ত্রস্তে বলে উঠেছিল, এই, পিসিমা— !

হকচকিয়ে গিয়ে সুখেন্দু নিজের জায়গায় বসে ফিরে দেখে প্লেটে, আরো ভাত নিয়ে দোরগোড়ায় সাবি লজ্জায় ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুখেন্দু অপ্রস্তুত, হাসতে হাসতে অর্চনার বিষম খাবার দাখিল।

শোবার ঘরের ঠিক পাশের ঘরটিতে বসে সুখেন্দু পড়াশুনো করে। দুই ঘরের মাঝখান দিয়েও দরজা আছে একটা। রাতের আহারের পর খানিক বই নিয়ে বসাটা বরাবরকার অভ্যাস। বিয়ের কয়েকদিন বাদে সেই অভ্যাসটাই বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল সেদিন। কিন্তু পড়ায় মন বসছে না, তবু অর্চনা ঠাট্টা করবে বলেই জোরজার করে বসে আছে। ওর সঙ্গে ছদ্ম রেষারেষি করেই পড়তে বসেছিল।

বই থেকে মুখ না তুলেই বুঝলে পা-টিপে অর্চনা মাঝের দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিচ্ছে। খুব সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে আস্তে আস্তে শিকল তুলে দিয়েই অর্চনা চমকে ফিরে তাকাল। এরই মধ্যে বারান্দার দরজা দিয়ে সুখেন্দু ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ে ঘড়ঘড় করে নাক ডাকাচ্ছে। জব্দ হয়ে অর্চনা হেসে ফেলে ঝন করে শিকলটা ফেলে দরজা খুলে দিয়েছে আবার।--থাক্, আর নাক ডাকাতে হবে না, বিছানায় গা ঠেকালে ও-নাক আপনি ডাকে।

অনুযোগটা মিথ্যে নয়। শুয়ে পড়লে ঘুমুতে তার দু মিনিটও লাগে না। তৎক্ষণাৎ উঠে বসে সুখেন্দু নিরীহ মুখে ঘোষণা করেছে, আজ আর বিছানায় গা ঠেকাবো না ভেবেছি।

ছুটির দিনে অর্চনার বাবা মা বরুণা সকলেরই নিয়মিত প্রত্যাশা, ওরা আসবে। কিন্তু প্রথম ক'টা দিন সে-সময়ও হয়নি ওদের। মা মনে মনে অসন্তুষ্ট হন জেনেও অর্চনা নিরুপায়। ছুটির দিন এলেই দেখা যায়, সুখেন্দু আগে থাকতেই কোথাও না কোথাও প্রোগ্রাম করে বসে আছে। সিনেমা থিয়েটার নয়, দশ-বিশ মাইল দূরে কোথাও বেরিয়ে পড়ার প্রোগ্রাম। আর সত্যি কথা, তখনকার সেই আনন্দের মধ্যে অর্চনারও বাড়ির কথা বা মায়ের কথা মনে থাকত না। এমন কি, সেদিন ডায়মণ্ড হারবার থেকে ঘুরে আসার পর মনের আনন্দে মায়ের ঘরোয়া চায়ের আমন্ত্রণে যেতে না পারার খেদও ভুলতে সময় লাগেনি। অর্চনা যাবে কথা দিয়েছিল, আর মিসেস বাসু তো ওর আসতে না পারার কথা ভাবতেও পারেন না। আগেও দুই-একবার আসবে বলে আসেনি। এটা তার থেকে একটু স্বতন্ত্র ব্যাপার। আরো দু-চারজন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার আসার কথা। কিন্তু দেখা গেল ওকে হঠাৎ খুশি করার জন্য আগে থাকতেই ডায়মণ্ডহারবার যাবার ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছে। অর্চনার

ভিতরটা খুঁতখুঁত করছিল, মা অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু সুখেন্দু আমলই দেয়নি।

সেখানে গিয়ে পড়ার পর অর্চনা নিজেই সব ভুলেছিল। সূর্যাস্তের পর ছোট একটা নৌকো ভাড়া করেছিল দুজনে। মাঝির কাছ থেকে নৌকোর হাল ধরতে গিয়ে সুখেন্দু নৌকো ঘুরপাক খাইয়েছে। অর্চনা ঠাট্টা করেছে, টিপ্পনী কেটেছে। হাল আর বৈঠা নিয়ে খানিক দাপাদাপি করে সুখেন্দু ঠাণ্ডা হয়ে বসেছে! বিকালের সূর্যাস্তের শেষ রঙে গোটা নদীটাই যেন অদ্ভুত রাঙানো। চলন্ত নৌকোয় সুখেন্দু একটা হাত জলে ডুবিয়ে বসেছিল, আর জলের বুকে লম্বা একটা দাগ পড়ছে তাই দেখছিল।

সামনে থেকে কৃত্রিম মোটা গলা শোনা গেল, সুখেন্দুবাবু, ও কি হচ্ছে?

হাত আর মুখ দুই-ই-তুলে দেখে, অর্চনা তার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে। সুখেন্দু ভুরু কোঁচকালো।

সঙ্গে সঙ্গে অর্চনাও—ওখানে হাত কেন, একটা কিছুতে ধরে টান দিলে—?

তা বলে তুমি আমার নাম ধরে টান দেবে! দাঁড়াও পিসিমাকে বলছি—

অর্চনা ঘটা করে নিশ্বাস ফেলেছে একটা।—আহা, কি খাসা নাম! সুখেন্দু...সুখের সঙ্গে তো কোনকালে কোন সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না।

সুখেন্দুর মতলব অন্যরকম, কাছে আসার উদ্যোগ করেছে, হয় না বুঝি...?

ভাল হবে না বলছি! সঙ্গে সঙ্গে জল ছিটিয়েই অর্চনা তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছে আর তার সেই বিব্রত অবস্থা দেখে খিলখিল করে হেসেছে।

স্বপ্নের ঘোর দিন কাটছিল যেন।

এই ঘোরটা মাঝে মাঝে অর্চনার মা-ই ভেঙেছেন। মেয়ের সাংসারিক ব্যাপারে আর তাঁর কোন দায়িত্ব নেই, এটা তিনি একবারও ভাবতে পারেননি—ভাবতে রাজীও নন। বরং এই অপ্রিয় দায়িত্ব তাঁর আরো বেড়েছে বলেই মনে করেন। মেয়ের বিচার-বুদ্ধি এই বিয়ের থেকেই বুঝে নিয়েছেন। তাই কিছু একটা মনে হলেই তিনি দাশুর হাতে চিঠি দিয়ে মেয়েকে ডেকে পাঠান। অর্চনা না গিয়েও পারে না। না গেলে পরামর্শ দেবার জন্য উনি নিজেই এসে হাজির হন। অর্চনা শোনে, শুনতে হয় বলেই শোনে। ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি, আর না কেউ শুনে ফেলে। ফাঁক পেলে জামাইকেও সাংসারিক বিষয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু-আধটু উপদেশদানে কার্পণ্য করেন না মহিলা। ফলে জামাই শাশুড়ীর ধারেকাছে ঘেঁষতে চায় না। অর্চনাকে বলে, তোমার মা-টি আমাকে তেমন পছন্দ করেন না।

অর্চনা হেসে উড়িয়ে দেয়। কখনো ছদ্ম সহানুভূতি দেখায়, আ-হা, এমন পছন্দের মানুষকে পছন্দ করে না! কখনো বিব্রত বোধ করেও ছদ্মকোপে চোখ রাঙায়, তাঁর মেয়ের পছন্দয় মন ভরছে না?

মায়ের সমস্যাটা কোথায় বা কাকে নিয়ে, অর্চনা মনে মনে সেটা খুব ভাল করেই জানে।

মায়ের সমস্যা পিসিমা।

প্রথমত মেয়ের সংসারের এই সেকেলে পরিবেশটাই মায়ের পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন। একজন গ্রাম্য বিধবা সেখানে কর্তৃত্ব করবেন আর মেয়ে তাঁর কথায় উঠবে বসবে সেটা সহ্য করা আরো শক্ত। তাঁর ধারণা, মেয়ে যে ডাকা মাত্র আসে না বা আসতে পারে না, তার কারণও ওই পিসিমা। পিসিমার কথা উঠলেই মেয়ে তাড়াতাড়ি সে-প্রসঙ্গ চাপা দিতে

চায়, সেটা লক্ষ্য করেও তিনি মনে মনে চিন্তিত এবং ওই মহিলাটির ওপর বিরূপ। এর ওপর গোড়ায় গোড়ায় দিদির বাড়ি থেকে ঘুরে গিয়ে বরুণা সপুলকে মাকে ঠাট্টা করেছে, দিদিটা যে মা একদম গেঁয়ো হয়ে গেল, বসে ব্রতকথা শোনে, ছাই দিয়ে নিজের হাতে বাসন মাজে!

কখনো এক আধটা রেকাবি-টেকাবি মাজতে দেখে থাকবে। কিন্তু এরই থেকে মা মেয়ের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল দেখেননি। তার ওপর অর্চনা আর য়ুনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না শুনে তো রীতিমত ক্রুদ্ধ তিনি। অর্চনা পড়বে না সেটা সুখেন্দুরও আদৌ ইচ্ছে ছিল না, আর সে-জন্য তাগিদও কম দেয়নি। তবু মিসেস বাসু সেই বেচারার সঙ্গেই এক-হাত বোঝাপড়া করতে ছাড়েননি। অর্চনা অবশ্য বলেছে, তার ভাল লাগে না। কিন্তু মা সেটা বিশ্বাস করেননি, এও সেই পিসিমারই অনুশাসনের ফল বলে ধরে নিয়েছেন। কোন্ সেকেলে বিধবা চায় ঘরের বউ এম. এ. পড়তে যাক—।

অর্চনার পড়া ছাড়াটা ডক্টর বাসুও ঠিক পছন্দ করেননি। বলেছেন, পড়াটা ছাড়লি কেন, ওঁরা আপত্তি করেন?

অর্চনা তাড়াতাড়ি বলেছে, না বাবা, ওঁদের তো পড়ছি নে বলেই রাগ...দেখি সামনের বছরে যদি হয়।

গৃহিণী তাঁকে অন্য কথা শুনিয়েছেন।—পড়বে কি করে, তার থেকে পাঁচালী আর ব্রতকথা শুনলে কাজ হয় না!

কেমন ঘরে মেয়ে পড়েছে স্ত্রীর সেই অভিযোগ বাবাকে ওর বিয়ের পর থেকেই শুনতে হচ্ছে। কিন্তু তিনি বড় গায়ে মাখেননি বা চিন্তিত হননি। নিজের সূক্ষ্ম দৃষ্টির ওপর ভদ্রলোকের আস্থা আছে। মেয়ের ব্যাপারে স্ত্রী অভিযোগ করতে এলেই একদিনের পরিপূর্ণতার একটা মূর্তি ভাসে তাঁর সামনে। সেটাই তিনি বিশ্বাস করে খুশি আর নিশ্চিন্ত। সুখেন্দুর বন্ধু-বান্ধব ওদের বিয়ে উপলক্ষেই ছোটখাটো একটা আয়োজন করেছিল। সেখান থেকে সুখেন্দুকে নিয়ে অর্চনা এখানে এসেছিল। এ ক'দিনের মধ্যে ভদ্রলোক নিরিবিলিতে দুটো কথা বলার সুযোগ পাননি। সুখেন্দুকে বরুণা আটকেছে, অর্চনা সোজা বাবার ঘরে চলে এসেছিল। তার গলায় সুখেন্দুর বন্ধুদের দেওয়া মোটা ফুলের মালা, হাতে ফুলের বালা আর রজনীগন্ধার ঝাড়।

প্রণাম করে উঠতেই ডক্টর বাসু তার দিকে চেয়ে মহা খুশি।—বাঃ! কোথাও গেছলি বুঝি?

অর্চনা জানাল কোথা থেকে আসছে।

বিয়ের পর ডক্টর বাসু সেই প্রথম যেন ওকে ভাল করে দেখছেন। তৃপ্তিতে দু-চোখ ভরে গেছে তাঁর। ওকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, বেশ, তুই কেমন আছিস বল।

অর্চনা মাথা নেড়েছে, অর্থাৎ ভাল।

খুব ভাল?

মায়ের কারণে বাবার ভিতরে ভিতরে সংশয় একটু থাকাই স্বাভাবিক। অর্চনা এবারে আরো বেশি মাথা হেলিয়ে হেসে ফেলেছিল।

সেই থেকে ডক্টর বাসু একেবারে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু মাকেও একটু খুশি করতে গিয়ে অর্চনা মাঝে মাঝে দু-নৌকোয় পা দিতে লাগল। এ বাড়িতে এলে সাজগোজ চালচলন আদব-কায়দা আর একটু বাড়ে। একটু-আধটু রঙ-চঙ মেখে মায়ের সঙ্গে কালচারাল অনুষ্ঠানেও যোগ দেয় আগের থেকে বেশি। অর্থাৎ মাকে সে বোঝাতে চায়, তার স্বাধীনতা একটুও খর্ব হয়নি বা নিজেও একটুও বদলায়নি। আর তাই দেখে সুখেন্দুরই খটকা লাগত একটু-আধটু। বাড়িতে পিসিমার সামনে যে অর্চনাকে দেখে, নিজের মায়ের সামনে সে-ই একেবারে বিপরীত। এই নিয়ে অনেকদিন ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছে। অর্চনা জবাব দিয়েছে, যেখানে যেমন রীতি, তুমি যদি আর এক রকম চাও, আর এক রকমও হতে পারে।

ক'টা মাসের এই একটানা ছন্দে ছোটখাটো একটা তালভঙ্গ হয়ে গেল সেদিন।

দিনের শুরুটা কিন্তু অন্যরকম হয়েছিল। অবসর সময়ে শেভ করার পর নাকের নিচের একটুখানি গুম্ফরেখা তদারকের অভ্যাস সুখেন্দুর অনেক দিনের। আর সেই নিবিষ্টতায় সময়ও একেবারে কম কাটত না। অর্চনা পিছনে লেগে লেগে সেই তোয়াজের গুম্ফরেখা নির্মূল করিয়েছিল। এরই মধ্যে একদিন দিদির কড়া শাসন প্রসঙ্গে এই নিয়ে বরুণার ঠাট্টার জবাবে দুজনকেই জব্দ করার জন্য সুখেন্দু ক'টা দিন নাকের নিচে ব্লেড ছোঁয়ায়নি। অর্চনাকে বলেছে, ফুসকুড়ির মত কি একটা উঠেছে, কাটতে গেলে লাগবে। ক'টা দিন ছুটির পর আজ কলেজ। একটু তাড়াতাড়িই চান খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে ধীরেসুস্থে সে আগের মতই গুম্ফ-বিন্যাস সম্পন্ন করে নিল। অর্চনা এ সময়টা পিসিমার কাছে। কলেজের সময় হলে তার ডাক পড়বে জানে। সুখেন্দুর সংকল্প, কলেজ থেকে ফোনে বরুণাকে কোন একটা কারণ দেখিয়ে বিকেলে বাড়ি আসতে বলবে।

কিন্তু সেই দিনই শাশুড়ীর যে একটা জোর তলব এসে আছে সেটা তখনো জানত না। সে তখন চানের ঘরে ছিল, ড্রাইভার অর্চনার হাতে মায়ের চিঠি দিয়ে গেছে। মর্ম, গত সন্ধ্যায় ভাগলপুর থেকে তার মাসিমা আর মেসোমশাই এসেছেন, আগামী কালই আবার চলে যাবেন—মেয়ে-জামাইকে দেখতে চান। অবশ্য যেন বিকেলে তারা আসে, তাঁর ওখানেই বিকেলে চায়ের ব্যবস্থা।

জামাইয়ের ডাক পড়লেই অর্চনা বিব্রত বোধ করে একটু। কারণ খুব স্বেচ্ছায় সে ওখানে যেতে চায় না। তার জন্য বেশ সাধ্য-সাধনা করতে হয়। তাছাড়া, মা-ও অনেকসময় আভাসে ইঙ্গিতে এমন কিছুই বলে বসে যা আরো বিসদৃশ। যাই হোক মাসিমা মেসোমশাই এসেছেন, না গেলেও নয়। বছর খানেক আগে এই মাসিরই ঘটা করে মেয়ের বিয়ে হয়েছে, তাঁর মেয়ে-জামাই এখন আমেরিকায় না কোথায়। কথায় কথায় মাসিমার জামাইয়ের গর্ব দেখে অর্চনা বরুণা একসময় অনেক হাসাহাসি করেছে।

চিঠিটা ড্রেসিং টেবিলে চাপা দিয়ে বারান্দার কোণে বসে অর্চনা থালায় ছড়ানো চালের কাঁকর বাছছিল আর পিসিমার কথা শুনছিল। কুলোয় চালের কুঁড়ো ঝাড়তে পিসিমা সুখেন্দুর ছেলেবেলার দাপটের কথা শেষ করে এই চাল বাছার প্রসঙ্গে এসে থামলেন।—ছেলের রাগ তো জান না, দুটোর বেশি তিনটে কাঁকর দাঁতে পড়ল কি উঠে চলল ভাত ফেলে—আমি এক এক সময় না বলে পারি নে, এত রাগ তোর, তুই ছেলে পড়াস কি করে?

অর্চনা শুনছিল আর মুখ টিপে হাসছিল।

সাবি রাঁধুনী একগোছা চাবি ঝন করে সামনে ফেলে দিয়ে গেল, ভাঁড়ারের চাবি নিচে ফেলে এসেছিলে—

আর আমার মনেও থাকে না বাপু অত, চাবিটা তোলো তো বউমা, যেভাবে ফেলে গেল যেন গায়েই লাগে না—

থেমে দুই এক মুহূর্ত কি-একটু ভেবে নিলেন তিনি। তারপর বললেন, আচ্ছা, ওটা এখন থেকে তোমার কাছেই রাখো বউমা—খুব যত্ন করে রাখবে।

আমার কাছে!

থাক, তোমার কাছেই থাক—তোমার শাশুড়ীর চাবি। এই এক চাবি দিয়ে হতভাগী এতকাল আমাকে এখানে আটকে রেখেছে—আর কতকাল টানব।

বিগত শ্বশুর বা শাশুড়ীর কথা উঠলেই পিসিমার চোখ ছলছল করে। আজও ব্যতিক্রম হল না। অর্চনা তাঁর আঁচল টেনে নিয়ে চাবির গোছা বেঁধে দিতে দিতে বলল, আপনি কোনকালে ছাড়া পাবেনও না পিসিমা।

পিসিমা খুশি হয়েই হাল ছাড়লেন।

ছোকরা চাকর হরিয়া এসে খবর দিল, দাদাবাবু কাপড় মাগুছেন। পিসিমা তাড়া দিলেন, যাও, কি চাই দেখে এসো।

ঘরে ঢুকে অর্চনা আলমারি খুলে জামা-কাপড় বার করতে গেল। সুখেন্দু ইচ্ছে করেই অন্যদিকে ফিরে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করল, পিসিমা কি বলছিলেন?

একটা জামা টেনে বার করতে করতে অর্চনা আলতো জবাব দিল, বলছিলেন, তুমি এক নম্বরের গোঁয়ার।

কেন?

আরো আগে বিয়ে করোনি কেন?

সুখেন্দু ফিরে ওকেই দোষী করল, আরো আগে তুমি আসনি কেন?

কেন, আমি ছাড়া কি আর—

হাসিমুখে কথাটা শেষ করবার আগেই জামাটার ওপর ভাল করে চোখ পড়তে থেমে গিয়ে ভুরু কোঁচকালো। মোটা জামা কালচে দেখাচ্ছে—কাপড়টাও সেই রকমই। আরো দুই একটা নাড়াচাড়া করে দেখল একই অবস্থা। বিরক্ত হয়ে, যা বার করেছিল তাই নিয়ে সুখেন্দুর সামনে রাখল সে।—আচ্ছা প্যান্ট কোট পরে কলেজ না করতে পার নাই করলে, তা বলে জামা কাপড়ের এই ছিরি!

কি হল...? সুখেন্দু তার দিকে ফিরল এবার।

আজই বিকেলে বেরিয়ে— ও কি!...অর্চনা বিষম অবাক।

সুখেন্দু নিরীহ মুখে জিজ্ঞাসা করল কি?

কি! নাকের নিচে কালির মত এক পোঁচ, এই জন্যেই ক'দিন—আবার হাসছে? কি টেস্ট গো তোমার! পিসিমা ঠিক বলেন, তুমি গোঁয়ার গোবিন্দ।

কাপড়টা টেনে নিয়ে সুখেন্দু হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল।—ওই জন্যেই তো তোমার এত পছন্দ।

অর্চনা আর পারে না যেন।—না সত্যি, তুমি আমার কোন কথা শোন না!

কাপড় পরা শেষ করে সুখেন্দু জামাটা টেনে নিল ।—সব কথা শুনি, বলে দেখো ।

রাগ ভুলে অর্চনার দরকারি কথাটাই মনে পড়েছে, মায়ের চিঠির কথাই বলা হয়নি এখনো । সুযোগ পেল ।—সত্যি ?

জামা গায়ে গলিয়ে সুখেন্দু মাথা নাড়ল ।

অর্চনা এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতে বোতাম লাগাতে লাগাতে আবারও বলল, ঠিক ?

এবার একটু ভয়ে ভয়েই মাথা নাড়ল সুখেন্দু ।

কলেজ থেকে ফিরছ ক'টায় ?

সাতটায়—

ভাল হবে না বলছি, ক'টা পর্যন্ত ক্লাস ?

কেন ?

জবাব না দিয়ে অর্চনা ড্রেসিং টেবিল থেকে মায়ের চিঠিটা এনে তার হাতে দিল । চিঠি পড়ে সুখেন্দু বড় নিশ্বাস ছাড়ল একটা ।—তাই হবে ।

কিন্তু তাই হলেও ঠিক সময়ে হয়নি । সুখেন্দুর গড়িমসিতে এমনি দেরি হয়েছিল একটু, তারপর তৈরি হবার আগেই বাড়িতে সস্ত্রীক তার এক বন্ধু এসে হাজির । তাদের আদর-অভ্যর্থনায় কম করে ঘণ্টাখানেক গেছে আরো । ওরা যখন বেরুলো, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত । ট্যাক্সিতে উঠে অর্চনা শুধু বলল, মা দেবে'খন চলো—

সুখেন্দুর ছদ্ম ত্রাস, তাহলে এখানেই নেমে পড়ি আমি ।

অর্চনা মুখে যাই বলুক, সত্যিই উতলা হয়নি । কিন্তু ওদিকে মা-টি তার যথার্থই রাগে জ্বলছিলেন । বোনের আড়ালে এরই মধ্যে বারকতক তাঁর স্বামীকে ঠেস দেওয়া হয়ে গেছে । মেয়ে-জামাইয়ের আসতে দেরি হচ্ছে বলে ভদ্রলোকটিই দায়ী যেন । শেষে সন্ধ্যাও পেরুতে দেখে হাল ছাড়লেন । ফলে মেজাজ আরো চড়ল । ঘরে এসে শেষদফা ফেটে পড়লেন তিনি—আমি বলছি ও-মেয়ের কপালে সুখ নেই । অত করে লিখলুম, তোর মাসিমা মেসোমশাই দুদিনের জন্যে এসেছে, জামাইকে নিয়ে একবার দেখা করে যা—আসতে পারল ? আসবে কি করে মেয়ের কি কোন স্বাধীনতা আছে, সেখানে তো পিসিই সব ।

ডক্টর বাসু স্ত্রীকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলেন, হয়তো কোন কাজে আটকে গেছে, আজ না আসুক কাল সকালেই আসবে ।

গৃহিণীর রাগ এতে বাড়ল বই কমল না ।—তুমি তো সবই বোঝো ওই পিসিই ওকে আসতে দেয়নি, নইলে আমি ডাকলেও আসে না ! মেয়েটাকে তুমি হাত-পা বেঁধে জলে ফেলেছ—

ক্রুদ্ধমুখে গজগজ করতে করতে নিচে নেমে মুখের ভাব বদলে বোন আর ভগ্নীপতি সন্নিধানে এলেন । বোনটি পান চিবুচ্ছেন আর বরুণা এবং রাণুদেবীর সঙ্গে গল্পসল্প করছেন । ভগ্নীপতি ঈজিচেয়ারে লম্বা হয়ে একের পর এক সিগারেট টানছে । মিসেস বাসু ঘরোয়া খোঁজখবর নিতে বসলেন, ভগ্নীপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ে-জামাই তাহলে কিছুকাল এখন আমেরিকাতেই থাকবে ?

হ্যাঁ...তা আরো বছরখানেক তো বটেই ।

জামাইয়ের কথা উঠতে বোন দিদির দিকে ফিরলেন । ওদিকে ওপর থেকে ডক্টর বাসুও

নেমে এসে বসলেন একটু। তাঁকে দেখে একে একে মেয়ে বউ দুজনেই উঠে গেল। দিদির আশায় এতক্ষণ ধরে বসে বসে আর মাসিমার তত্ত্বকথা শুনে শুনে বরুণার হাঁফ ধরে গেছে। রাণুদেবীর আশা, নিরিবিলিতে সদ্য-আনা উপন্যাসখানা এবারে একটু উল্টেপাল্টে দেখার সুযোগ হবে।

জামাই প্রসঙ্গেই কথা চলল। বোনের দিকে চেয়ে মিসেস বাসু বললেন, তা তুই খরচও যেমন করেছিস, জামাইও তেমনি পেয়েছিস—এ আর ক'জন পারে।

শেষের খোঁচাটুকু স্বামীর উদ্দেশে। কারো কথায় খুশি হলে ফিরে আবার খুশি করারও একটু দায়িত্ব থাকে বোধহয়। বোন ফিরে প্রশংসা করলেন, তুমিই বা খারাপ কি এনেছ দিদি, কতবড় স্কলার...হীরের টুকরো ছেলে। বেশ বিয়ে দিয়েছ।

ক্ষোভ প্রকাশ করে ফেলাও চলে না, আবার স্বামীর সামনে বসে এই প্রশংসা হজম করাও সহজ নয়। মিসেস বাসু দ্ব্যর্থক উক্তি নিক্ষেপ করলেন।—আমি কিছু করিনি রে ভাই, ওঁর সঙ্গে আগে থাকতেই ছেলেটির জানাশোনা ছিল, পাকেচক্রে হয়ে গেল। যা করার তোর ভগ্নীপতিই করেছেন—

ডক্টর বাসু স্ত্রীর এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রচ্ছন্ন কৌতুকে আলাপটা আর একটু রসিয়ে তুলতে ছাড়লেন না। যেন সত্যিই প্রশংসাই করা হয়েছে তাঁর, বললেন, জানাশোনা থাক আর নাই থাক, তোমার পছন্দ না হলে কি আর কিছু হত?

শুধু পলকের দৃষ্টিবাণে যতটুকু আহত করা চলে তাই করলেন মিসেস বাসু। কিন্তু ভদ্রলোক আর বসে থাকাটা যুক্তিযুক্ত বোধ করলেন না। কাজের অছিলায় তাঁদের গল্প করতে বলে প্রস্থান করলেন।

ভগ্নীপতি জিজ্ঞাসা করলেন, জামাই বাবাজী কতদিন প্রফেসারি করছেন?

বাড়ির কেউ না থাকাতে মিসেস বাসু স্বস্তি বোধ করলেন। এক প্রশ্নের জবাবে অনেক কথা বললেন। খুব বেশিদিন নয়, তবে উপযুক্ত ছেলে তো, চট করেই উন্নতি করেছে—এই শিগগিরই ভাইস-প্রিন্সিপাল হবে শোনা যাচ্ছে, তারপর থিসিস-টিসিস্ লিখছে, বিলেতও যাবে—। ফিরে এলেই প্রিন্সিপালও হবে আর কি...।

বেশ, বেশ—। ভগ্নীপতির খুশির অভিব্যক্তি।

মাসি বললেন, খুব ভাল।

একটু বাদেই বাইরে গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল। মিসেস বাসু গম্ভীর হলেন। বোন জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা এলো নাকি?

জবাব নিষ্প্রয়োজন, অর্চনা উৎফুল্ল মুখে দৌড়েই ঘরে ঢুকেছে। পিছনে সুখেন্দু। মাসি সানন্দে বলে উঠলেন, এই তো! আয় আয় আমরা সেই কাল থেকে তোদের জন্য বসে আছি—

অর্চনা হাসিমুখে মাসি আর মেসোকে প্রণাম করল।—বসে না থেকে একবার গিয়ে হাজির হলেও তো পারতে?

মিসেস বাসু সুখেন্দুকে বললেন, তোমার মেসোমশাই আর মাসিমা, প্রণাম করো।

যথা-নির্দেশ।

মাসিমা আশীর্বাদ করতে করতে জামাই যাচাই করে নিলেন। মেসোমশাই বললেন,

বোসো বাবা বোসো—তোমার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ, বড় খুশি হয়েছি ।

খুশির খবরে সুখেন্দুর বিড়ম্বিত মূর্তিটি দেখে অর্চনা হাসি গোপন করল । মাসি বললেন, আমি ভাবলাম আজ আর এলিই না বুঝি—

তোমরা এসেছ শুনেও আমি আসব না ! একটু দেরি হয়ে গেল অবশ্য—

একটু !...মায়ের ঠাণ্ডা বিরক্তি, দেরিটা হল কেন ?

বাড়িতে লোক এসে গেল ।—এক নিশ্বাসে মাসির যাবতীয় খবরাখবর নিয়ে অর্চনা উঠে দাঁড়াল ।—বাবা কোথায় মা ? ওপরে ? মাসিমা, আমি আসছি—

কিছুটা হেঁটে এসে সুখেন্দু ইশারায় একটা ট্যাক্সি থামাল ।

অর্চনা অবাক । বাবা বাড়ির গাড়ি দিতে চেয়েছিলেন, নেয়নি । বাবার সঙ্গে গল্প করে, বরুণা আর বউদির সঙ্গে হৈ-চৈ করে, ঘন্টাখানেক বাদে নিচে নেমে মানুষটার মুখের দিকে চেয়েই অর্চনা বুঝেছিল গোলযোগের ব্যাপার কিছু ঘটেছে । কিন্তু মাসি-মেসোর সামনে কি আবার হতে পারে ! জামাই শরীর ভাল নেই বলে চাটুকুও মুখে দিল না, তাই তাঁরা চিন্তিত । অর্চনাকে দেখে মাসি বলেছেন, একজন ডাক্তার-টাক্তার দেখা—এই বয়সে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হলে চলবে কেন !

অর্চনা আরো খানিক বসে মাসির সঙ্গে গল্প করত হয়তো, কিন্তু তাকে দেখেই সুখেন্দু যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে । বাবা গাড়ি নিয়ে যেতে বলায় মাথা নেড়েছে, গাড়ির দরকার নেই, হাঁটবে একটু— ।

ও-পাশে ধার ঘেঁষে বসে আছে । ট্যাক্সিতে ওঠার আগে অর্চনা বারকতক জিজ্ঞাসা করেও কি হয়েছে জবাব পায়নি । এখনো চুপচাপ রাস্তার দিকেই চেয়ে আছে । খানিক অপেক্ষা করে আবারও সেই এক কথাই জিজ্ঞাসা করল, এরই মধ্যে কি হল ? অ্যাঁ—?

গম্ভীর মুখে সুখেন্দু একবার তার দিকে ফিরে তাকাল শুধু ।

কথা বলছ না কেন ? বলবে তো কি হয়েছে ?

কিছু না ।

কাছে সরে এসে অর্চনা হাত ধরে নিজের দিকে ফেরাতে চেষ্টা করল তাকে ।—বা রে ! কিছু না বললে আমি বুঝব কি করে ? সেই থেকে ভাবছ কি ?

সুখেন্দু ঘুরেই বসল । বলল, ভাবছি আমার মত এমন একজন গরীব মাস্টারের হাতে তোমার মা তোমাকে কেন দিলেন ?

ঠাট্টার সময় হলে অর্চনা ফিরে বলত, মা দিতে যাবে কেন— । কিন্তু এখন হতভম্ব । —তার মানে...মা কিছু বলেছে ?

যা বলেছেন তার অর্থ এই দাঁড়ায় । রাগ আর ক্ষোভে গলার চাপা স্বর ব্যঙ্গের মত শোনাল ।—আমি শিগগিরই ভাইস-প্রিন্সিপাল হব, থিসিস লিখছি, বিলেত যাব, ফিরে এসে প্রিন্সিপালও হব—তোমার মায়ের মুখে এসব শুনে তোমার মাসিমা মেসোমশাই অবশ্য খুশি হয়েছেন ।

এবারে গোটা ব্যাপারটা অনুমান করা গেল । খানিক চুপ করে থেকে অর্চনা বিব্রত মুখে হাসতেই চেষ্টা করল একটু ।—তুমি এভাবে নিচ্ছ কেন, আপনজনেরা আশাও তো

করে...

এ-রকম আশা তুমিও করো বোধহয় ?

হঠাৎ উষ্ণ হয়ে সুখেন্দু ঘুরে বসল আরো একটু, আশা করে কি না তাই যেন দেখল। অর্চনা নিরুত্তর ।

এর নাম আশা নয় । আমি গরীব মাস্টার, এটা তোমার মায়ের সেই লজ্জা ঢাকার চেষ্টা ।

বাড়ির দরজায় গাড়ি থামতে সশব্দে দরজা খুলে নেমে এসে ভাড়া মেটাল । তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে হনহন করে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল ।

অর্চনার নিরুপায় অস্বস্তি আবারও হাসির মত দেখাচ্ছে ।

।। ৬ ।।

অনুকূল অবকাশে অনেক বড় ক্ষতও আপনি শুকোয় । এই ছোট ব্যাপারটা দুদিনেই মিটে যাবার কথা । যেতও হয়তো । সুখেন্দুর রাগ আর জেদ বেশি, দুদিনের জায়গায় না-হয় দশদিন লাগত । কিন্তু কাঁচা ক্ষতর ওপর বার বার ঘষা পড়লে ছোট ব্যাপারও দুষিয়ে বিষিয়ে বিষম হয়ে ওঠে । মেয়ের সংসারটিকে যুগের আলো-বাতাসে টেনে তোলার শুভ তাড়নায় মিসেস বাসু প্রায় নির্মম । মেয়ে একটা ভুল করে ফেলেছে বলেই তার সংসারযাত্রা সুনির্বিঘ্ন করে দেওয়ার দায়িত্ব যেন আরো বেশি । এই দায়িত্ব পালনের চেষ্টাটা আর একদিকে কেমন লাগছে সেটা তিনি বুঝলেন না বা বুঝতে চেষ্টাও করলেন না ।

মেয়ের বাড়িতে একটা টেলিফোন আনার তোড়জোড় অনেকদিন ধরেই করছিলেন তিনি । টেলিফোনের অভাবে অর্চনার কতটা অসুবিধে হচ্ছে সেটা ভাবেননি । নিজের অসুবিধে দিয়েই মেয়েব অসুবিধেটা বড় করে দেখেছেন । অযাচিত ভাবে হুটহুট করে মেয়ের বাড়িতে কত আর আসা যায়, একটা টেলিফোন থাকলে অনেক ঝামেলা বাঁচে ।

কিন্তু টেলিফোন চাই বললেই টেলিফোন মেলে না আজকাল । এর জন্যে তদবির তদারক যা করা দরকার তিনিই করছেন । খরচাপত্রও সব তাঁরই । টেলিফোনের স্যাংশান পাওয়া গেল সেই রাত্রে বোনকে জামাই দেখানোর কয়েকদিনের মধ্যেই । সেইদিন জামাই কি মন বা কি মেজাজ নিয়ে গেছে সেটা তাঁর পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব না । আপাতত টেলিফোন এনে ফেলতে পারার কৃতিত্বে বিভোর তিনি ।

সুখেন্দু খবরটা জানল, টেলিফোন অফিসের লোক এসে যখন বাড়ি দেখেশুনে গেল তখন ।

জনাকতক লোক বাড়ির সামনেটা অনেকটা খুঁড়ে ফেলেছে । গর্তের ভিতর দিয়ে টেলিফোনের তার বাড়ির দিকে গেছে । অর্চনা পাশের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল । টেলিফোন একটা এলে মন্দ অবশ্য হয় না, কিন্তু সুখেন্দুর নিস্পৃহতায় খুব স্বস্তিবোধ করছে না । এই ক'টা দিনের মধ্যে আগের মত হাসিমুখে কথাও বলেনি তার সঙ্গে । তারপর মায়ের এই টেলিফোন আনার ব্যবস্থাপত্র দেখে একেবারে চুপ ।

পিসিমাও রাস্তা খোঁড়ার ব্যাপারটা আজই নতুন দেখলেন । গঙ্গাস্নান পূজো-আর্চা নিয়ে

থাকলেও তাঁর চোখে বড় এড়ায় না কিছু । ক'দিন ধরেই ছেলের ভাবগতিক অন্যরকম লক্ষ্য করছেন । সেদিনও সকালে গঙ্গাস্নান সেরে ওপরে উঠে দেখেন, গম্ভীর মনোযোগে বসে কাগজ পড়ছে সে । কি ভেবে ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ রে সুখেন, বাড়ির সামনেটা ও-রকম খুঁড়ে ফেলেছে কেন ?

সুখেন্দু মুখের সামনে থেকে কাগজ সরাল ।—টেলিফোন আসছে ।

টেলিফোন ! আমাদের এখানে ?

সে রকমই তো শুনছি । মুখের ওপর খবরের কাগজ তুলল আবার ।

টেলিফোন আসছে সুখবরই, তা বলে ছেলের মুখ ও-রকম কেন পিসিমা বুঝে উঠলেন না । চুপচাপ একটু নিরীক্ষণ করে ফিরে এলেন তিনি । পাশের ঘরের জানলার কাছে অর্চনাকে দেখেছিলেন, বারান্দার এ-মাথায় এসে কি ভেবে ডাকলেন তাকে ।...মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে অর্চনা কাছে এসে দাঁড়াল ।

বাড়িতে নাকি টেলিফোন আসছে ? খুশি মুখেই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি ।

হ্যাঁ পিসিমা, উঠে পড়ে লাগতে হয়ে গেল, এত সহজে হয় না ।

পিসিমা হেসে বললেন, খুব ভাল হল, দুই বেয়ানে সারাক্ষণ দুদিক থেকে টেলিফোন কানে দিয়েই বসে থাকব ।

অর্চনাও হাসল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে । কিন্তু হাসিটা তেমন সহজে আসছে না । বলল, মা হয়তো এসে পড়বেন এক্ষুনি ।

তাই নাকি ! তোমার মা পারেনও, আমাদের মত জবুথবু নন । একটু থেমে হঠাৎ নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ বউমা, আজ ক'দিন ধরেই সুখেনকে যেন কেমন কেমন দেখছি—কি হয়েছে ? শরীর-টরির ভাল তো ?

অর্চনা বিব্রতমুখে জবাব দিল, ভালই...

যাক্, আমার ভাবনা হয়েছিল । যে রাগ-চাপা ছেলে । ভাল কথা, বেয়ানকে না খাইয়ে ছেড়ো না কিন্তু, আমি দেখি ওদিকে ওরা কি করছে—

তিনি চলে গেলেন । অর্চনা পায়ে পায়ে নিজের ঘরে এসে দেখে খবরের কাগজের দু-পাট খুলে সেই একভাবেই মুখ আড়াল করে বসে আছে মানুষটা । খানিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল । এই ভাবগতিক আর বেশি বরদাস্ত করতেও ভাল লাগল না তার । এগিয়ে এসে আলমারির মাথা থেকে আর একটা পুরনো খবরের কাগজ টেনে নিল । তারপর অন্য হাতে কোণ থেকে মোড়াটা তুলে পা-টিপে সুখেন্দুর ঠিক সামনে রেখে মুখোমুখি বসল ।

সুখেন্দুর হাতের কাগজ নড়ল এবার । কাগজ সরিয়ে দেখে, ঠিক তারই অনুকরণে অর্চনা দু-হাতে মুখের সামনে কাগজ মেলে সর্বাঙ্গ ঢেকে বসে আছে ।

ভুরু কুঁচকে দেখল একটু, তারপর আবারও কাগজ পড়ায় মন দিল—

মুখের সামনে থেকে এবারে অর্চনা আস্তে আস্তে কাগজ সরিয়ে তাই দেখে নিজের হাতের কাগজটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল । তারপর খপ করে সুখেন্দুর কাগজ ধরে এক টান । কাগজটা ছিঁড়ে গেল । অপ্রস্তুত হয়ে অর্চনা জিব কাটল । তার পরেই জোর দিয়ে বলে উঠল, বেশ হয়েছে—পিসিমা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করছিলেন তোমার কি হয়েছে ! মা সেই কবে কি না কি একটা কথা বলেছে, তুমি এখনো তাই ধরে বসে আছ !

সুখেন্দু নিস্পৃহ জবাব দিল, আমি কিছুই ধরে বসে নেই ।

তবে ? ও, টেলিফোন !

জবাব না দিয়ে সুখেন্দু খবরের কাগজে চোখ রাখল ।

তোমার আপত্তি সে কথা তুমি মাকে বলে দাওনি কেন ? ক'মাস ধরেই তো শুনছ টেলিফোনের কথা—

সুখেন্দু বলল, তোমার মা টেলিফোন আনছেন তোমার সুবিধের জন্য, আমি আপত্তি করতে যাব কেন ?

বিরক্তিতে অর্চনা মোড়া ঠেলে উঠে দাঁড়াল একেবারে ।—দেখ, এইজন্যেই তোমার উপর আমার রাগ হয়—আমরা সুবিধে কি অসুবিধে সেটা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো পারতে—আমি কি বাইরের কেউ ?

কিন্তু বোঝাপড়াটা ঠিকমত করে ওঠার অবকাশ পাওয়া গেল না । নিচে গাড়ি থামার শব্দে মায়ের আবির্ভাব ঘোষণা । অর্চনা অনুনয় করল, এভাবে বসে থেকো না, লক্ষ্মীটি, ওঠো—

বাইরের মাটি খোঁড়ার কাজ দেখতে দেখতে হৃষ্টচিত্তে মিসেস বাসু ভিতরে ঢুকলেন । পিসিমা নিচে ছিলেন, টের পেয়ে চাবির গোছা বাঁধতে বাঁধতে হাসিমুখে অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলেন ।—নমস্কার বেয়ান, আসুন—আপনি আসছেন বউমা বলেছে ।

ও-ভাবে চাবির গোছা আঁচলে বাঁধাটাও মিসেস বাসুর চোখেও বিরক্তিকর । আর কার চাবি কে আঁচলে বাঁধে ভিতরে ভিতরে হয়তো সেই খেদও একটু । আপ্যায়নের জবাবে মাথা নাড়ালেন কি নাড়ালেন না ।—অর্চনা কোথায় ?

দেখা গেল সিঁড়ি দিয়ে অর্চনা নেমে আসছে আর ওপরে রেলিং-এর মাথায় সুখেন্দু দাঁড়িয়ে । পিসিমা হাসিমুখে বললেন, এই তো—আমি একটু আগে বউমাকে বলছিলাম টেলিফোন এলে দু-বেয়ানে দু-দিক থেকে টেলিফোন কানে দিয়ে বসে থাকব !

মিসেস বাসু একবার শুধু তাকালেন তাঁর দিকে, পরে মেয়ের দিকে ফিরলেন । নীরব তাচ্ছিল্যটুকু এমনই স্পষ্ট যে পিসিমা বিব্রত মুখে ওপরের দিকে চোখ তুলে দেখেন সুখেন্দুও তাঁর দিকেই চেয়ে আছে ।

মিসেস বাসু মেয়েকে বললেন, কোথা দিয়ে কি হবে না হবে দেখতে এলাম—

অর্চনা বাধা দিল, আচ্ছা সে-সব হবে'খন তুমি ওপরে চলো ।

তুই হড়বড় করিস না, দেখতে শুনতে বুঝতে দে—

দেখতে শুনতে বুঝতে বুঝতে অর্চনার পাশ কাটিয়ে আগে আগেই ওপরে চললেন তিনি । সুখেন্দু সরে গেছে । অর্চনা এবং তার পিছনে পিসিমাও পায়ে পায়ে উপরে উঠতে লাগলেন । একটু আগের উপেক্ষা সত্ত্বেও গৃহকর্ত্রী হিসাবে পিসিমা নিচের থেকেই সরে যেতে পারলেন না ।

ওপরে উঠেই সামনের দেয়ালের বারান্দায় টাঙানো চিত্রিকরা কুলো, উবুড়করা ডালা আর পেরেকে ঝোলানো জপের মালার দিকে চোখ পড়তে মিসেস বাসু থমকে দাঁড়ালেন । টেলিফোন প্রসঙ্গ ভুলে গেলেন, চোখে যেন হুল ফুটছে তাঁর । এ-সব সামগ্রী কার জেনেও রাজ্যের বিরক্তিতে মেয়ের উদ্দেশেই বলে উঠলেন, ও কি রে ! এখনো সেই ডালা কুলো

মালা ? সেই কবে না এগুলো এখান থেকে সরাতে বলেছিলাম তোকে—কি যে রুচি তোদের বুঝি না, বাইরের লোক দেখে ভাবে কি !

ত্রস্তে ঘাড় ফেরাল অর্চনা ! পিসিমা তার পিছনেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে । লজ্জায় সঙ্কোচে অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, আঃ মা—চলো, ঘরে চলো—

তাঁকে একরকম ঠেলে নিয়েই ঘরে ঢুকে গেল সে । হতভম্ব মূর্তির মত পিসিমা দাঁড়িয়ে রইলেন আরো কিছুক্ষণ । তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে দেয়ালের পেরেক থেকে মালাটা তুলে নিলেন । শ্লথ পায়ে বারান্দার মাথায় নিজের ঘরের দিকে এগোলেন তিনি । অতিথি আপ্যায়নে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই বুঝে নিয়েছেন । এক কোণে হরিয়া বসে পূজোর বাসন মুছে রাখছিল । তাকে বললেন দেয়াল থেকে ওই ডালা কুলো নামিয়ে তাঁর ঘরে রেখে আসতে ।

ওগুলো ওখানেই থাকবে ।

চকিতে ফিরে তাকালেন পিসিমা । তাঁরই ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সুখেন্দু । এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করাও লজ্জার, পিসিমা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে সরে গেলেন ।

অর্চনাও মায়ের ওপর যথার্থই বিরক্ত হয়েছে । এসেই এ-রকম একটা কাণ্ড করে বসবে ভাবেনি । তাঁকে একটা চেয়ারে বসিয়ে ক্ষুব্ধ অস্বস্তিতে বলে উঠল, ছি ছি ছি, পিসিমা কি ভাবলেন বলো তো ?

পিসিমা যাই ভাবুন, মায়ের চোখে মেয়ের এই সঙ্কোচটাই বেশি দুর্ভাবনার কারণ । —তুই চুপ কর, পিসিমার মুখ চেয়ে আমাকে কথা বলতে হবে ?

মুখ চেয়ে কথা বললে ক্ষতিটা কোথায় সেটা মাকে বোঝানোর চেষ্টা বিড়ম্বনা । অর্চনার বিবক্তি বাড়লো আরো ।—কি দরকার মা তোমার এ-সব নিয়ে মাথা ঘামানোর, এমন এক একটা কাণ্ড করে বসো তুমি লজ্জায় মাথা কাটা যায় । হুট করে একটা টেলিফোন এনে বসলে—এই সেদিন মাসিমার কাছে প্রিন্সিপাল হওয়া-টওয়া নিয়ে কি-সব বলেছ—

আগের সঞ্চিত ক্ষোভটাও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ।

অবোধ মেয়ের কথা শুনে মিসেস বাসু অবাক প্রথমে । মাসিমা অর্থাৎ বোনের কাছে কি বলেছিলেন তাও মনে পড়েছে ।—ও...এই নিয়েও তোকে কিছু বলেছে বুঝি ? মেয়ের দিকে চেয়ে জামাইয়ের সাহসের পরিমাণটা আঁচ করতে চেষ্টা করলেন তিনি । তারপর চাপা রাগে ফিবে ধমকেই উঠলেন প্রায়, মাসিমার কাছে যা বলেছি তাই যাতে হয় সেই চেষ্টা কর—এই চারশ টাকাতেই দিন চলবে ভাবিস ?

সুখেন্দু ঘরে ঢুকল । মায়ের কথা কানে গেছে সেটা তার দিকে একবার চেয়েই অর্চনার অনুমান করতে ভুল হল না । আর জামাইকে হাতে কাছে পেয়ে তাকেই একটু সমঝে দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন মিসেস বাসু । স্পষ্ট অথচ মোলায়েম করে বললেন, এই যে সুখেন্দু, সেদিন তোমার মাসি-শাশুড়ীর কাছে কি বলেছি তাই শুনে নাকি রাগ করেছ শুনলাম !

আঃ, মা—রাগের কথা তোমাকে কে বলল ?

বাধা পেয়ে মা বিরক্ত চোখে মেয়ের দিকে শুধু তাকালেন একবার, তারপর জামাইয়ের দিকে ফিরলেন ।—যা বলি তোমাদের ভালর জন্যেই বলি । তোমাকেও উন্নতির চেষ্টা করতে

হবে, আর ওকেও ওর সংসার বুঝে নিতে হবে—তোমাদের সংসার চিরকাল তো কেউ আগলে বসে থাকবে না।

এ-ধরনের আভাস জামাইকে আগেও দিয়েছেন তিনি। অর্চনার নিরুপায় অবস্থা। মিসেস বাসু উঠে জানলার কাছে পানের কুঁচি ফেলতে গিয়ে নিচের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা সমস্যার সমাধান চোখে পড়ল যেন।—এই তো রে অর্চনা, এখান দিয়েই তো টেলিফোনের লাইনটা সরাসরি তোদের ঘরে আসতে পারে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন সুখেন্দু আলনা থেকে জামা টেনে নিয়ে গায়ে পরছে। আর অস্বস্তি নিয়ে তাই দেখছে অর্চনাও। উনি ফিরে চেয়ারে এসে বসলেন আবার। কর্তব্যবোধে যেটুকু বলা হয়েছে তার জন্য একটুও চিন্তিত নন। বললেন, ভাল কথা, সামনের শুক্রবার তো ছুটি তোমাদের ? সেদিন দুপুরে আমাদের ওখানেই খাবে, অর্চনাকে নিয়ে একটু সকাল সকালই যেও, বরুণা বলে দিয়েছে। বিজুই খাওয়াচ্ছে অবশ্য, কণ্ট্রাক্ট সাপ্লাই করল একটা—

দুই এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সুখেন্দু খুব শান্ত মুখে বলল, আমাদের যেতে হলে পিসিমাকে বলে যান।

মিসেস বাসু কথাটা শুনে যে-ভাবে তাকালেন, যেন মুখের ওপর ঠাস করে অপমান করা হল তাঁকে। প্রথমে অবাক, পরে ক্রুদ্ধ। সুখেন্দু ততক্ষণে ঘর ছেড়ে বারান্দার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। চকিত বিমূঢ় নেত্রে অর্চনা একবার সেদিকে আর একবার মায়ের রক্তিম মুখের দিকে চেয়েই উঠে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এলো। সুখেন্দু অর্ধেক সিঁড়ি নেমে গেছে।

তুমি বেরুচ্ছ নাকি ?

সুখেন্দু ঘুরে দাঁড়াল, তার দিকে শুধু তাকাল একবার, তারপর নিচে নেমে গেল।

অর্চনা সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

এইটুকু সংসারে খুশির বাতাস ক্রমশ যেন কমে আসছে। দিনে দিনে অনভিপ্রেত ছায়া পড়ছে একটা।

অর্চনা চেষ্টা করে আগের সেই আনন্দ-ছোঁয়া দিনগুলির মধ্যে ফিরে যেতে। কিন্তু সেটা আর সহজ হয়ে উঠছে না খুব। শাশুড়ীর নির্দেশমত না হোক, সুখেন্দু রোজগার বাড়ানোর ব্যাপারে সচেতন হয়েছে ঠিকই। সকালে সপ্তাহে তিনদিন এম. এ-র ছাত্রী পড়াত, বিকেলেও তিনদিন তিনদিন করে আরো দুটি কলেজের ছাত্রের ভার নিয়েছে। প্রাইভেট কলেজের মাস্টার, সেদিক থেকে কোন বাধা নেই।

ট্যুইশন সেরে ফিরতে তার রাত হয় প্রায়ই। চুপচাপ খাওয়া-দাওয়া সেরে তার পরেও বই নিয়ে পাশের ঘরে পড়তে বসে যায়। ইদানীং পড়ার ঝোঁক বেড়েছে। বেশ রাত করেই শুতে আসে। অর্চনা জেগে কি ঘুমিয়ে ভাল করে লক্ষ্যও করে না। শুয়েই ঘুম। অর্চনার এক-একদিন ইচ্ছে করে ঠেলে তুলে দিতে—এই মেজাজ নিয়ে বিছানায় গা ঠেকাতে না ঠেকাতে এমন ঘুম আসে কি করে ভেবে পায় না। ইজিচেয়ারে বই পড়তে পড়তেও ঘুমিয়ে পড়ে এক-একদিন। অর্চনা ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে নিয়ে আসে। আর বলেও, সুবিধে যদি

হয় তোমার বিছানাটা কাল থেকে এ-ঘরেই করে দেব না হয় ।

পিসিমা লক্ষ্য করেন সবই । কোথাও একটা গোলযোগ শুরু হয়েছে সেটা তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন । ছেলে বেশির ভাগই চুপচাপ, বউয়ের মুখেও আগের সেই হাসি লেগে নেই । তার মায়ের সেদিনের সেই বিসদৃশ ব্যবহার মন থেকে ঝেড়েই ফেলেছিলেন তিনি । কিছুটা সুখেন্দুর হাবভাব দেখে, কিছুটা বা বউয়ের প্রতি মমতায় । ওই ব্যাপারের কয়েকদিন পরেই গুরুদেবের সঙ্গ ধরে দিনকয়েকের জন্য কাশী যাবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন । অর্চনা একটু চুপ করে থেকে শেষে বলেছে, তার থেকে আমাকেই বিদেয় করে দিন পিসিমা !

বালাই-ষাট ! পিসিমা হকচকিয়ে দু-হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে শেষে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন । শেষে রাগ করে বলেছেন, আর কখনো যেন তোমার মুখে এ-কথা না শুনি বউমা । তুমি যে কি, জানলে আর এমন কথা মুখেও আনতে না । তোমার শাশুড়ীর ওই ছবিটার দিকে চেয়ে দেখো !

তিনি শুধু মনে কোন ক্ষোভ রাখেননি । এমন কি অর্চনার মায়ের ওপরেও না । ভেবেছেন আধুনিক শিক্ষিতা মহিলা, এসব সেকেলে ব্যাপার...চোখেও হয়তো সত্যিই লাগে—তাই বলে ফেলেছেন । না বলে মনে মনে পুষে রাখলে কি আরো ভাল হত—তাঁকে উদ্দেশ করে হয়তো কিছুই বলেননি ।

মায়ের কাছে জামাইয়ের তিন-তিনটে ট্যুইশনের খবর অর্চনা বলেনি । তবু জানতে বাকি নেই তাঁর । অন্তর্দাহ তাঁরও দিনে দিনে আরো পুষ্ট হচ্ছে বই কমছে না ।

কারণও আছে ।

এই দেড় বছরে বিজন আর ননিমাধবের ব্যবসা বলতে গেলে তিনগুণ স্ফীতি লাভ করেছে । অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যটা মহিলার প্রত্যক্ষভাবে যেমনই আনন্দের কারণ, পরোক্ষভাবে তেমনই অনুশোচনার উৎস—ব্যবসায়ের অর্ধেক মালিক ননিমাধব ছেলেটা একেবারে হাতের মুঠোয় ছিল । কেন জোর করেই বিয়েতে বাধা দেননি, সেই পরিতাপটা তিলে তিলে বাড়ছে এখন । এমন কি, বিজনও তাঁর মনের কথা বুঝেই যেন আপসোস করেছে, বাবার আর দুটো দিন সবুর সইল না, দেখলে তো...।

ননিমাধব যত বড় আঘাতই পাক, এ বাড়ির সংস্রব ত্যাগ করেনি । এখনো অর্চনাকে দেখলে মুখে তার রুমাল ওঠে, সন্তর্পণে বড় নিশ্বাস ফেলে । মিসেস বাসুর চোখ এড়ায় না, সখেদে নিশ্বাস ফেলেন তিনিও । মনে মনে ভাবেন, যেমন কপাল— । সম্ভব হলে বরুণার সঙ্গেই বিয়ে দিতেন । কিন্তু তা হয় না, বরুণা বি. এ. পড়লেও অর্চনার থেকে চার বছরের ছোট । বয়েসের অনেক তফাত হয়ে যায় । সেটা বিজনই মাকে বলেছে । মন বোঝার জন্য বরুণার বিয়ের ভাবনাটা প্রকারান্তরে ননিমাধবকে একদিন শুনিয়েছিল সে । ননিমাধব বলেছে, বরুণা ছেলেমানুষ, অল্পবয়সী একটি ভাল ছেলে খোঁজ করা দরকার । খোঁজটা সেও করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে ।

ব্যবসায় এমন আচমকা শ্রীবৃদ্ধির ফলেই নিজের জামাইকে আরো বেশি অকর্মণ্য মনে হয়েছে মিসেস বাসুর । তার ওপর এই ট্যুইশনের খবর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত । তাঁর মতে এ-ও নিশ্চেষ্টতার নজির ছাড়া আর কিছু নয় । জ্বালাটা গোপন করা সম্ভব হয়

নি তাঁর পক্ষে । কখনো টেলিফোন কখনো বা সামনাসামনি মেয়েকে বলেন, এভাবে বাড়ি বাড়ি ছেলে পড়িয়েই কাটবে তাহলে, কেমন ?

রাগের মাথায় অর্চনা ফিরে মাকেই পাঁচ কথা শুনিয়ে দেয়, আবার যার জন্যে বলে ঘরে এসে এক-একদিন তার সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে ছাড়ে না । এরই মধ্যে একদিন বাবাও তাকে ডেকে বলেছেন, সুখেন্দুর অত খাটুনির দরকার কি, খরচপত্র খুব বেশি নাকি রে ? দরকার হলে আমার কাছ থেকে কিছু কিছু নে না—বিজু তো টাকা-পয়সা দিচ্ছেই এখন, কোন অসুবিধে হবে না ।

নিরুপায় ক্ষোভে অর্চনা জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি এসেছিল সেদিনও । রাগ বাবার ওপরে নয়, তিনি সাদা মনেই বলেছেন জানে । রাগ মায়ের ওপর, তাঁর গঞ্জনাতেই বাবা ভুল বুঝে বলেছেন । দাদার সামনে বউদির সামনে বরুণার সামনে অর্চনা অনেক কষ্টে সামলেছে নিজেকে, আর বাড়ি এসেই ফেটে পড়েছে একেবারে ।—তুমি এসব ছেলে-পড়ানো মেয়ে-পড়ানো ছাড়বে কি না ?

জবাবে সুখেন্দু উঠে গিয়ে পাঁচখানা দশটাকার নোট তার সামনে ফেলে দিয়ে বলেছে, তোমার মাকে দিয়ে দিও ।

অর্চনা চুপ একেবারে । আগের দিনই মা কি এক চ্যারিটি শো-এর টিকিট পাঠিয়েছেন দুটো ।

নতুন কিছু নয় । উঁচু-মহলের পরিচিত জনেরা রিলিফ-ফাণ্ড, চ্যারিটি শো, অথবা অন্য কোন নিয়মিত উৎসবের টিকিট বিক্রি করতে এলে আত্মসম্মানের তাগিদে মা নিজের জন্য তো বটেই, তাঁদের অনুরোধে মেয়ে-জামাইয়ের জন্যেও টিকিট না কিনে পারেন না । অবশ্য মেয়ে-জামাইয়ের কাছ থেকে টাকা না নেবার কথা ভেবেই টিকিট কেনেন তিনি । কিন্তু প্রতিবারই মেয়ের কাছ থেকে হাত পেতে তাঁকে টাকা নিতে হয় । প্রথম যেবার নিতে চাননি, মেয়ে সেবার টাকা ক'টা একরকম ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই চলে গিয়েছিল । কারণটা অবশ্য তিনি জানতেন না ! কারণ ছিল । টাকা দেবার দরকার নেই বলায় সুখেন্দু অর্চনার সামনে ঠিক ওভাবেই টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল ।

শুধু এই ব্যাপারে নয়, মা একখানা ভাল শাড়ি কিনে পাঠালে পর্যন্ত সুখেন্দু প্রায় আদেশের সুরেই বলে, দাম জেনে দাম দিয়ে দিও । মাসকাবারে টেলিফোনের খরচটাও সে-ই যুগিয়ে আসছে, মা দেবে অর্চনা এ-কথাটা বলতেও ভরসা পায়নি । এমন কি বাড়ির গাড়ি অর্চনাকে নিতে এলেও অসন্তুষ্ট হয়, বলে, গাড়ি পাঠাতে বারণ করে দিও, ট্যাক্সিতে যাবে ।

অর্চনা হাসিমুখেই বলেছে একদিন, তুমি তো সঙ্গে যাচ্ছ না—ট্যাক্সিঅলা এই ভরসন্ধ্যেয় আমাকে নিয়ে যদি নিজের খুশিমত একদিকে গাড়ি ছোটায়, তখন ?

সুখেন্দু গম্ভীর মুখে টিপ্পনী কেটেছে, ট্যাক্সিতে উঠেই তোমার মায়ের পরিচয়টা দিয়ে দিও আগে, তাহলে আর সাহস করবে না ।

অতএব মাইনের টাকায় যে কুলোয় না সেটা ঠিকই । কিন্তু রাগের মাথায় অর্চনার সব সময় সেটা মনে থাকে না । আর থাকে না যখন সুখেন্দু এমনি শান্ত অথচ রূঢ়ভাবেই খরচের দিকটা স্মরণ করিয়ে দেয় তাকে । অর্চনা ভাবে মাকে নিষেধ করে দেবে এভাবে

যেন খরচ না বাড়ান তিনি। কিন্তু পারে না, তাতে করে ওবাড়ির সকলেই আরো একটু করুণার চোখে দেখবে। তাছাড়া এ-সংসারের কল্পিত অনটনের ক্ষোভটাই মা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে তুলবেন আরো।

এই টানাপোড়েনের মধ্যেই মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেল আবারও। বিজনের জন্মদিন উপলক্ষ সেটা। একান্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠান হলেও এবারে এই দিনটার সার্থকতা একটু অন্যরকম। বিজনের কাছে তো বটেই, তার মায়ের কাছেও। ইতিমধ্যে বিজনের একখানা গাড়ি হয়েছে, সেই গাড়ি চড়ে ননিমাধবকে নিয়ে আগের দিন সে নিজেই এসে অর্চনাকে বলে গেছে। সুখেন্দু বাড়ি ছিল না, সকালের ট্যুইশন সারতে বেরিয়েছিল।

অর্চনা খুশি হয়েছিল। তাদের বাড়িতে ননিমাধবের সেই প্রথম পদার্পণ। তাকে হাসিমুখে আদর-আপ্যায়ন করেছে। দাদাকে বলেছে, তুমি হোমরাচোমরা মানুষ এখন, নিজে নেমন্তন্ন করতে এসেছ, যাব না বলো কি?

চেষ্টা-চরিত্র করে ননিমাধব বলেছে, আজকাল তো তেমন আসোটাসো না—

অর্চনা তক্ষুণি জবাব দিয়েছে, আমাদের তো আর আপনাদের মত দুজনের দুটো গাড়ি নেই, ইচ্ছে থাকলেও যখন-তখন যাই কি করে! আরও বলেছে, আপনি আসাতে খুব খুশি হয়েছি, একদিনও তো আসেননি!

এর পর তার পকেটের রুমাল আর পকেটে থাকেনি। অর্চনা তার দিকে চেয়ে সকৌতুকে মন্তব্য করেছে, টাকাই করুন আর গাড়িই করুন, সাইকেল-রিকশর ব্যবসায় কিন্তু আপনাকে মানায় না।

পার্টনারের মুখের অবস্থা দেখে বিজনের পর্যন্ত হাসি পেয়ে গিয়েছিল। যাবার আগে আবারও বলেছে, যাস কিন্তু তোরা তাহলে, সুখেন্দুর সঙ্গে দেখা হল না—

দেখা হল না বলেই অর্চনা ভিতরে ভিতরে স্বস্তিবোধ করেছে। এসেই চান করে কোনরকমে দুটি মুখে দিয়ে কলেজে যাবার তাড়া। সেই ব্যস্ততার মধ্যে বসে দু মিনিট কথা বলার ফুরসৎও পাবে না। অতিথিরা সেটা না বুঝে ক্ষুণ্ন হতে পারে।

—আমি বলব'খন। চকিতে অর্চনা কি ভেবেছে একটু।—তুমি না হয় পিসিমাকেও বলে রেখে যাও।

বিজন তাই করেছে। পিসিমা খুশি হয়ে অনেক আশীর্বাদ করেছেন।

সকালে অর্চনা সুখেন্দুকে নিজে কিছু বলার অবকাশ পায়নি। তবে তার খাবার সময় পিসিমা বলেছেন শুনেছে। অর্চনা বিকেলে বলেছে। অন্যত্র যে-কোন জায়গায় যাবার কথা উঠলে সুখেন্দুর আগ্রহ অন্যরকম হত। কোথাও যাবার নাম করে অর্চনা দু-পাঁচদিন ছুটি নেবার কথা বললেও হয়তো খুশি হয়েই রাজী হয়। মাঝে-মধ্যে আশাও করেছে তার এত খাটুনি দেখে অর্চনা বলবে। প্রথম দিনের সেই একান্ত দুজনের দিনগুলির লোভ সুখেন্দুর এই একটানা নিস্পৃহতার তলায় তলায় ছড়িয়ে আছে এখনো। যাকে পেয়েছে সেটা কম পাওয়া নয় উপলব্ধি করে বলেই মনে মনে প্রত্যাশা বেশি। তাই অভিমানও বেশি। আর তাই উদাসীনতার রূঢ়তাও বেশি।

আমি যাব কি করে, কাল তো ছুটির দিন নয়!

রাত্রিতে তো—

রাত্রিতে বাড়ি বসে থাকি ?

অর্চনা জোর দিয়ে বলেছে, একটা দিনের ব্যবস্থা করে নাও—ও-কাজ তো রোজই আছে। দাদা নিজে এসে বলে গেছে, না গেলে ভয়ানক বিচ্ছিরি হবে।

সুখেন্দু গুম হয়ে বসে রইল। এ সামাজিকতার তাৎপর্য বোঝার মত সুস্থ মেজাজ নয় এখন। উল্টে ভাবল, তার কাজটা অবহেলার চোখে দেখে অর্চনাও, আর বড়োলোক দাদা নিজে এসে বলে গেছে সেটাই বড় ওর কাছে।

পরদিনও কলেজে যাবার আগে রাতের নেমন্তন্নের কথা অর্চনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সুখেন্দু চুপচাপ শুনেছে, চুপচাপ কলেজে চলে গেছে। অর্চনা নিশ্চিন্ত ছিল।

কিন্তু অভিমানের সঙ্গে বিবেচনার আপস নেই তেমন। সুখেন্দু বাড়ি ফিরল একেবারে রাতের ছেলে-পড়ানো শেষ করে। আর তারপরে ট্রামে-বাসে না উঠে দেড় মাইল পথ হেঁটে এলো।

হাতমুখ ধুয়ে একটা বই নিয়েই শুয়ে ছিল, আর মনে মনে একটুখানি উষ্ণ আনন্দ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছিল। এতখানি রূঢ়তার দরুন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না বলেই বোধহয়।

পিসিমা ঘরে এলেন।—তুই গেলি না যে ?

না।

না তো দেখতেই পাচ্ছি, না কেন ?

সুখেন্দু বলল, আমার কাজটা ওদের কাছে কিছু না হলেও আমার কাছে কম নয়। তারা টাকা দেয়।

পিসিমা বিরক্ত হলেন।—টাকা দেয় বলে কি লোক-লৌকিকতা কিছু নেই, না হয় তাড়াতাড়িই আসতিস একটু !

আমার জন্যে তো আটকায় নি কিছু, যার যাওয়া দরকার সে গেছে—

যাবে না তো করবে কি, কতবার করে টেলিফোনে ডাকাডাকি—তাও তো কতক্ষণ দেরি করেছে। সন্ধ্যে থেকে ঘর বার করেছে মেয়েটা, শেষে চোখের জল আর সামলাতে পারে না—তোর সবেতে বাড়াবাড়ি !

সঙ্গে সঙ্গে খচ করে লাগল কোথায়। এই শাস্তিই দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা ঠিকমত লেগেছে জেনে ভিতরে ভিতরে এখন অনুতপ্ত একটু। বউ নেই, এই অবকাশে পিসিমা কিছু বলবেন ঠিক করেই এসেছেন। বলেও গেলেন।—তোদের হল কি আজকাল আমি তো কিছু বুঝি না, তোর শ্বশুরবাড়ি ভাল লাগে না বলে কি মেয়েটা বাপ-মা ভাই-বোন সব ছেঁটে ফেলে দেবে ? সে তো ওই সংসারেই অত বড়টি হয়েছে, না কি, তা সত্ত্বেও এমন ভাল মেয়ে বলেই এ-ভাবে থাকে। ভাইপোকে নীরব দেখে পিসিমা আর একটু চড়লেন এবং আরো একটা খেদ না প্রকাশ করে পারলেন না।—এ-ভাবে চলিস তো নিজেদের সংসার নিয়ে নিজেরাই থাক তোরা, দু'বছর হতে চলল একটা ছেলেপুলে হবার নাম পর্যন্ত নেই, মা'টা তো কাঁদতে কাঁদতে চোখ বুজেছে, আমার অত পোষাবে না। সেই বউ এলো, দেখে চোখ জুড়লো, ভাবলাম এবার সব হবে, হতভাগী ওপর থেকে দেখবে—তোদের ব্যাপারখানা কি ?

ঠিক সময়টিতে বেশ ভালমতই একটা নাড়া দিয়ে গেলেন পিসিমা। সুখেন্দু উসখুস করতে লাগল। টেবিলের ওপর টাইমপীস ঘড়িটার দিকে চোখ গেল।...ছাত্রের বাড়ি থেকে হেঁটে না এলেও যাওয়া যেত। এখন গেলে হয়তো দেখবে অর্চনা রওনা হয়ে গেছে। অন্যমনস্কতার ফাঁকে মায়ের ছবিটাই নজরে পড়ল। মা ওর দিকেই চেয়ে আছেন।...তাঁর চোখেও পিসিমার অনুযোগ।

কিন্তু আর একদিকের মেঘ তখন ঈশান-কোণে। ওতে শুধু ঝড়ের উপকরণ। অত্যন্ত কাছের মানুষ অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় দূরে ঠেলে দিলে যে অপমান, সেই অপমানের যাতনা নিয়ে অর্চনা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। ফিরেছে তারও চারগুণ বিতৃষ্ণা নিয়ে।

বাপের বাড়িতে পা দিয়েই একটা আলগা খুশির আবরণে নিজেকে আড়াল করতে চেষ্টা করেছে সে। বাইরের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে, দাদার জন্মদিন উপলক্ষে ঘরের আগের চেহারা বদলে গেছে, দামী সোফা-সেটি এসেছে। মাঝখানের টেবিলে বড় একটা কাচের চৌবাচ্চার ওপর ঝুঁকে রঙিন মাছের খেলা দেখছে দাদা বউদি বরুণা আর ননিমাধব। চৌবাচ্চার জলের ভিতর ইলেকট্রিক বাল্‌ব ফিট্ করা, সেই আলোয় চৌবাচ্চাটা ঝকঝক করছে। ওপর থেকে বউদি খাবারের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছে বোধ হয়।

সকলের অগোচরে অর্চনা পা-টিপেই বারান্দা ঘরে সিঁড়ির দিকে এগোলো। এক্ষুনি আর-একজনের না আসার জেরার মুখে পড়তে চায় না। সিঁড়ির কাছাকাছি আসতে খাবার-ঘরের দিক থেকে মায়ের তপ্ত-কণ্ঠ কানে এলো। বকাবকিটা দাশুর উদ্দেশে সন্দেহ নেই। এক মুহূর্ত থেমে অর্চনা চুপচাপ ওপর উঠে গেল। উদ্দেশ্য, সকলকে একটু অবাক করে দেবার জন্য একেবারে বাবাকে নিয়ে নামবে। আসলে বাবার একটুখানি ছায়া কাম্য নিজের কাছেও সেটা স্বীকার করতে চায় না। বাবার কাছে থাকলে এক মা ছাড়া আর সকলের অন্তত মুখ বন্ধ। আর দরকার হলে মাকে মুখ বন্ধ করতেও শুধু তিনিই পারেন।

ওপরে এসে দেখে বাবাব ঘর ফাঁকা। অর্চনা অবাক, নিচেও তো দেখল না। এদিক-ওদিক ঘুরে দেখল একটু। ওপরে নেই। বাবার বিছানাতেই এসে বসল আবার। তাঁকে না পেয়ে তাঁর কাছে আসার দুর্বলতাটা নিজের চোখেই ধরা পড়ে গেছে হয়তো। ঘরের সর্বত্র অযত্নের ছাপ, অর্চনা সেই কারণেই যেন উষ্ণ হতে চেষ্টা করল। বরুণার ওপরেই চটে গেল, অতবড় মেয়ে করে কি! শেষবার ঘর গুছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল মাস দুই আগে, তারপর আর বোধহয় হাত পড়েনি। তাকের উল্টো-পাল্টা বইগুলি ঠিক কবে রাখল, টেবিলটাও হাতে হাতে গোছাল একটু। কিন্তু এ-ভাবে ওপরে এসে বসে থাকাটা বিসদৃশ। মুখে একটা হালকা ভাব টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সিঁড়ির কাছাকাছি আসতে ওপরেই দাশুর সঙ্গে দেখা। কিছু একটা হুকুম তামিল করতে এসেছিল বোধহয়। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে অর্চনা জিজ্ঞাসা করল, বাবা কোথায়?

তাকে দেখে দাশু সানন্দে এক কথার জবাবে অনেক কথা জানিয়ে দিল। যথা দিদিমণিরা এলো না ভেবে মা বহুক্ষণ ধরেই ফাটছিলেন, সেই অবস্থায় বাবু ওকে চুরুট কিনে নিয়ে আসার কথা বলতে মা বাবুকেই দাবড়ে দিলেন, আর ওকে হুকুম করলেন কাজে যেতে। দাশুর অবশ্য হাতে তেমন কাজ নেই, কিন্তু সেটা আর তাঁকে বলে কেমন করে। বাবু নিজেই চুরুট আনতে গেছেন।

অর্চনা দাশুর ওপরেই রেগে গেল হঠাৎ ।—চুরুট ফুরিয়েছে দেখে আগে থাকতে এনে রাখতে পার না ? বাক্স থেকে সরাতে তো খুব পারো !

এ-সব অনুযোগ গায়ে মাখার লোক নয় দাশু । গলা খাটো করে প্রায় উপদেশই দিল, তুমি নিচে যাও তো, ওদিকে তোমার কথাই হচ্ছে ।

কিন্তু নিচে বসার ঘরে কথা যা হচ্ছে তার একটুখানি কানে আসতে অর্চনা দরজার এধারেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল । অপমানের আঘাতে নিস্পন্দ । কারো কোন কথার জবাবে মায়ের নিদারুণ বিরক্তি ।—কি জানি আসবে কি আসবে না, মাসের শেষ, হয়তো হাতে কিছুই নেই—আসতে হলেও তো একটা কিছু অন্তত—

মা ওটুকু বলেই থেমেছেন । দাদার গলা শোনা গেছে, কি যে কাণ্ড, তা বলে আসবে না কেন ?

অর্চনার মাথায় দপ করে যেন আগুন জ্বলল একপ্রস্থ । খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে অতিকষ্টে নিজেকে সামলাল সে । বিতৃষ্ণায় মা আজকাল অনেক সময় অনেকের সামনেই তাদের অপদস্থ করে বসে সে-আভাস অর্চনা আগেও পেয়েছে । কিন্তু সেটা যে এ-পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে ভাবতে পারেনি ।

ঘরে এসে দাঁড়াতে বিজনই সর্বাগ্রে বলে উঠল, এই তো এসেছে ! এত দেরি ? সুখেন্দু কই ?

সকলের দৃষ্টি দরজার কাছ থেকে ফিরে এলো ।

প্রথমেই অর্চনার চোখ গেল ননিমাধবের দিকে । দাদার দিকে ফিরে জবাব দিল, আসতে পারলেন না, কাজে গেছেন এখনো ফেরেননি ।

তার বলার ধবনে বিজন মনে মনে অবাক একটু । বিস্ময় প্রকাশ করল, সে কি রে !

ওদিক থেকে বউদি বলে উঠল, ভারি অন্যায়, কোথায় গেছেন বলো গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি—

অর্চনা বলল, আমরা ট্রামে-বাসেই চলাফেরা করি বউদি...তাঁর আসা সম্ভব নয় ।

বউদি থমকে গেল । মা ভুরু কুঁচকে তাকালেন, তার মানে সে আসবে না ?

অর্চনা মায়ের চোখে চোখ রাখল । নিজেকে সংযত করতেই চেয়েছিল, কিন্তু সবটা সম্ভব হল না ।—সে তো কারো হুকুমের লোক নয় মা, আসতেই হবে ভাবছ কেন ?

রাগ ভুলে মা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন । মেয়ের কথাবার্তা হাব-ভাব দুর্বোধ্য । শুধু মা-ই নয়, অন্য সকলেও হকচকিয়ে গেছে একটু । বরুণাই সর্বপ্রথম ঘরের এই থমকানি ভাবটা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করল । অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গটাই বাতিল করে দিয়ে তাড়াতাড়ি কাছে এসে দিদির হাত ধরে টানল, ননিদা কি এনেছেন দেখে যা—!

লঘু আগ্রহে কাচের চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে এলো তাকে । জলের গাছ-গাছড়ার মধ্য দিয়ে লাল নীল হলদে সবুজ মাছগুলি খেলে বেড়াচ্ছে ।

চমৎকার, না ?

খুব সুন্দর । দুই এক মিনিট দেখে অর্চনা এগিয়ে এসে দাদাকে প্রণাম করল । তারপর হাত-ব্যাগ খুলে কেস থেকে ঝকঝকে একটা ফাউন্টেন পেন বার করে তার বুকপকেটে লাগিয়ে দিল ।

পেনটা আবার তুলে দেখে বিজন ভারি খুশি ।—বাঃ !

বরুণা সাগ্রহে এগিয়ে এলো, দেখি দাদা দেখি— । পেন হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বরুণার আনন্দে যেন লোভ ঝরে পড়ল, ও মা কি সুন্দর ! এর যে অনেক দাম রে দিদি, সেই যে তোতে আমাতে একবার দোকানে দেখেছিলাম—

বিয়ের অনেক আগে একবার কলম কিনতে গিয়ে এই জিনিসই একটা দুই বোনের খুব পছন্দ হয়েছিল । কিন্তু দাম শুনেই তখন সে কলম রেখে দিয়ে অন্য কলম কিনতে হয়েছে । অর্চনার মনে আছে । মনে আছে বলেই দেখার সঙ্গে সঙ্গে এটাই কিনেছে ।

বিজন জ্যেষ্ঠোচিত অনুযোগ করল একটু, কি দরকার ছিল তোর এত দামী জিনিস আনার ।

কিছু মনে করবার কথা নয়, বরং তুষ্ট হওয়ারই কথা । কিন্তু বাইরের একজনের সামনেই একটু আগে যে আলোচনা এখানে হয়ে গেছে, সেই ক্ষোভের মাথায় দাদার এই স্বাভাবিক অনুযোগের তাৎপর্য বিপরীত । অর্চনা হাসল একটু । মায়ের দিকে তাকাল এক পলক, পরে দাদার দিকে । তার পর নিরুত্তাপ জবাব দিল, জিনিস দামী না হলে যে দেয় তার দামও একটু কমে যায় দাদা, কিন্তু এমন কিছু দাম নয় ওটার, তবু যদি খুশি হয়ে থাকো সেই ঢের—

বিজন বিব্রত, একটু আগে মায়ের সঙ্গে আলোচনাটা কানে গেছে কিনা চকিতে সেই সংশয় মনে জেগেছে । মাও ক্রুদ্ধনেত্রে তাকালেন মেয়ের দিকে, খোঁচাটা বোধগম্য না হবার মত অস্পষ্ট নয় । বউদি গম্ভীর । ননিমাধব রুমালে মুখ ঘষছে । বরুণা চোখ বড় বড় করে দিদিকে দেখছে ।

আরো একটু বাকি ছিল ।

দরজার বাইরে থেকে ডক্টর বাসুর গলা শোনা গেল, অর্চনা এলো ? ঘরে এসে মেয়েকে দেখে নিশ্চিন্ত ।—এই তো, সুখেন্দু কই...?

তিনি আসতে পারলেন না বাবা ।

কেন ? অবাক একটু ।

জবাবটা দিলেন মিসেস বাসু । গম্ভীর শ্লেষে বললেন, সে কাজের মানুষ আসবে কি করে, তাছাড়া সে কি হুকুমের লোক আমাদের যে হুকুম করলেই আসবে !

বিরক্তি আর বিতৃষ্ণায় অর্চনা আরক্ত । কিছু না বুঝে ভদ্রলোক ফ্যালফ্যাল করে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলেন খানিক । শেষে মেয়ের দিকে ফিরে সহজ অর্থটাই গ্রহণ করলেন ।—ও, কাজে আটকেছে বুঝি ?

দিদিকে খুশি করার জন্যেই হোক, পরিবেশটা একটু সহজ করার তাগিদেই হোক, বরুণা কলমটা তাড়াতাড়ি বাবার দিকে বাড়িয়ে দিল, দেখ বাবা কি সুন্দর কলম, দিদি এনেছে !

বাবা কলম দেখলেন । তাঁর চোখেও সুন্দরই লাগল আর দামীই মনে হল। কলমের সুখ্যাতি করে সেই সঙ্গে আর যে কথাগুলো বললেন তিনি, তার জন্য দায়ী অন্তত তিনি নন । বললেন, তুই আবার এত খরচ করতে গেলি কেন, ক'টা টাকাই বা মাইনে পায় সুখেন ! বুঝেসুজে না চললে ও বেচারী সামলাবে কি করে ?

এই দুর্ভাবনা বাবার মাথায় কে ঢুকিয়েছে অর্চনা জানে । হয়তো আজও এই নিয়ে

কথা শুনতে হয়েছে তাঁকে, নইলে কলম দেখেই আগে খরচের কথাটা মনে হত না। ভিতরে ভিতরে অর্চনা বুঝি ক্ষেপেই গেল এবার। দাঁতে করে নিজেই ঠোঁট কামড়ে আড়চোখে ননিমাধবের দিকে তাকাল।

মিসেস বাসু স্বামীর দিকে একটা তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করে উঠে সোজা দরজার কাছে চলে এলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে নীরসকণ্ঠে আদেশ দিলেন, বউমা, আর রাত না করে খাবার দেবার ব্যবস্থা করো।

বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গটগট করে ওপরে উঠে গেলেন তিনি।

অর্চনা সকলের সঙ্গে খেতে বসেছে। কি খেল তাও বোধহয় সকলেই লক্ষ্য করেছে। খাওয়া শেষ হতেই ফেরার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। বাবা গাড়ি নিয়ে যেতে বলেছেন, তাতেও আপত্তি করেনি। বাড়ি ফিরে ধীর শান্ত পায়েই ওপরে উঠেছে।

পিসিমার ঘর অন্ধকার। শুধু ওর ঘরেই আলো জ্বলছে।

বিছানায় শুয়ে সুখেন্দু অন্যমনস্কের মত দেয়ালে ছবিটার দিকে চেয়ে, বুকের ওপর একটা খোলা বই উপুড় করা। বিছানায় গা ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের অপবাদটা আজ অন্তত প্রযোজ্য নয়। এক পলক দেখে নিয়ে অর্চনা সোজা তার ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

সাড়া পেয়ে সুখেন্দু ফিরে তাকাল। দেখল একটু। অনুতাপ প্রকাশের রীতি জানা নেই তেমন, চেষ্টা করে নিছক গদ্যাকারের প্রশ্নই করল একটা, হয়ে গেল?

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে অর্চনা দুল খুলছে কানের। জবাব না দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শুধু একবার, তারপর অন্য দুলটা খুলল।

তার দিকে চোখ রেখেই সুখেন্দু আধাআধি উঠে বসল। ওদিকে ফিরে থাকলেও আয়নার সামনা-সামনি আর পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণের আপসোচিত প্রতীক্ষার পর হঠাৎই খুব ভাল লাগছে সুখেন্দুর। লোভনীয় লাগছে। মেজাজের ঝোঁকে অনেকদিনের উপোসী চিত্তটা যেন অভীষ্টপ্রাপ্তির তটে বসেও মুখ ঘুরিয়ে ছিল। বুকের তলায় অনেক অতনু-মুহূর্ত হারানোর খেদ।

আয়নার ভিতর দিয়ে কঠিন নিস্পৃহতায় অর্চনাও লক্ষ্য করেছে তাকে। এই মুগ্ধ দৃষ্টির ভাষা জানে। একসঙ্গে বাপের বাড়ি যাবে বলে সচেতন সাজসজ্জায় নিজেকে ঘিরে প্রলোভনের প্রচ্ছন্ন মায়া একটু রচনা করেছিল বটে। কিন্তু যার জন্যে করা, তারই এই বিহ্বল দৃষ্টি-লেহন সব থেকে বেশি অসহ্য এখন। অর্চনা ভাবল, পরিপূর্ণভাবে অপমান করতে পারার অন্তস্তুষ্টির ফলেই এই ব্যতিক্রম, সেই তুষ্টির ফলেই আর এক আনুষঙ্গিক তৃপ্তির তাগিদ। দুল টেবিলে রেখে আস্তে আস্তে ঘুরে বসল তার দিকে।

সুখেন্দু চেয়েই ছিল, সপ্রতিভ মুখে হাসল একটু।—শোন—

বলো, শুনছি।

এখানে এসো না—

অর্চনা উঠে সামনে এসে দাঁড়াল। প্রত্যাখ্যানের বর্ম আঁটা।

সুখেন্দু তার হাত ধরে কাছে টেনে বসিয়ে দিল। নিজের একটা আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে সেই আনন্দটাই বড়।—রাগ করেছ?

সেটা তো তোমারই একচেটে সম্পত্তি ।

সত্যি, এমন হয়—। সুখেন্দু অস্বীকার করল না ।—যাইনি বলে নিজেরই খুব—

থাক । কঠিন শ্লেষে অর্চনা থামিয়ে দিল তাকে ।—কি বলবে বলো ।

তার রাগেব মাত্রা অনুমান কবে সুখেন্দু হাসল একটু । তাবপর বলল, তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ।

সুসময়ে তার চোখে এই ক'টি কথার আভাস দেখতে পেলেও অর্চনার খুশি ধরত না এখন বিদ্রূপেব মত লাগল । দারুণ বিরক্তিতে শয্যা ছেড়ে উঠতে গেল ।

পারল না । দুই হাতের বেষ্টনে সুখেন্দু তাকে বসিয়েই রাখল । বাপের বাড়ি থেকে অর্চনা কি মন নিযে ফিরেছে তার ধারণা নেই । শুধু জানে, ও যায় নি বলেই রাগ । মনোরঞ্জনেব কলাকৌশল জানা থাকলে বমণী-মনের দিকটাই আগে বুঝে নিতে চেষ্টা কবত, নিজের না যেতে পাবাব পিছনে নরম কৈফিয়ত কিছু খাড়া করত, আব সন্তপ্ত অনুরাগে তার ব্যথাটাই আগে নিজের বুকে টেনে নিত । কিন্তু সুখেন্দু তাব ধাব-কাছ দিয়েও গেল না, অর্চনার অপমানটা কোথায় গিয়ে বিঁধেছে খোঁজ নিতেও চেষ্টা কবল না । মেজাজের বেগটা তাব যেমন আকস্মিক, আবেগের মুহূর্তও প্রায় তেমনিই অশান্ত । সঙ্গতির পথে আনাগোনা নয় কোনটারই । তাই নিঃসঙ্গতার আবরণ থেকে নিজেব এই সদ্য-মুক্তিটাই বিনম্র আপসের বড় উপকবণ মনে হয়েছে । যেন সেইটুকুই অর্চনাব জানবার বিষয়, আর সেইটুকুই তাবও জানাবাব তাগিদ ।

দুই হাতের নিবিড়তার মধ্যে সুখেন্দু তাকে আরও একটু কাছে টেনে নিতে চেষ্টা করল । —সত্যি, শুযে শুয়ে আমি এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলাম...পিসিমা খানিক আগে খুব বকে গেল আমাকে । হাসতে লাগল মৃদু মৃদু, কি বলল শুনবে ?

অর্চনা কঠিন, শান্ত । শোনার কোনো আগ্রহ নেই ।

আরো একটু অনুকূল মুহূর্তের আশায় পিসিমার সেই নিগূঢ় বচনটি সুখেন্দু আর-একভাবে প্রকাশের চেষ্টা কবল ।—পিসিমা মায়েব কথা বলেও অনেক দুঃখ করে গেল...মা যে তোমাকে কত চেয়েছিল জান না ।

অন্য সময় হলে অর্চনা টিপ্পনী কাটত, মা তাকে চায়নি, মা যে কোন একটি ছেলেব-বউ চেয়েছিল । এখন নির্বাক চোখে শুধু তাকাল তার দিকে । স্পর্শটুকুও যন্ত্রণার মত লাগছে ।

সুখেন্দু আরও একটু কাছে ঘেঁষে এলো, মুচকি হেসে চোখে চোখ রাখল । প্রায় গোপন কিছু ফাঁস করে দেবার মত কবেই বলল, মা আরো কিছু চেয়েছিল...!

মা আরো কি চেয়েছিল অর্চনা সেটা খুব ভালই জানে । আভাসে ইঙ্গিতে কখনো বা সরাসরি পিসিমা সেটা অনেকবারই ব্যক্ত করেছেন । কিন্তু আজকেব দুঃসহ অপমানের পব এই একজনেব মুখেই সেই কথাটা শোনামাত্র দপ করে জ্বলে উঠল একেবারে । এতক্ষণের নির্বাক সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙে গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ হযে গেল । আচমকা তার হাত ছাড়িয়ে অর্চনা ছিটকে উঠে দাঁড়াল । তীব্র জ্বালায় অনুচ্চ-তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-কণ্ঠে বলে উঠল, থাক ! চাকরি করে ও ছেলে না পড়ালে যাদের দিন চলে না, একটা কলম কিনে নিয়ে গেলেও খরচ নিয়ে পাঁচজনের উপদেশ শুনতে হয়—তাদের আর কিছু চেয়ে কাজ নেই !

এক ঝটকায় পরদা ঠেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ।

সুখেন্দু বিমূঢ়, হতভম্ব । এতবড় সমর্পণের মুখে এমন এক বিপরীত আঘাত অনুভব করতেও সময় লাগে । তড়িতাহত বিস্ময়ে দরজার দিকে চেয়ে রইল সে ।

পরদাটা নড়ছে ।

বিয়ের পর ছদ্ম-অভিমানে প্রথম প্রথম এক-আধদিন সুখেন্দু ঘর-বদল আগেও করেছে ।

তাতে ব্যবধান রচনার অভিপ্রায় ছিল না একটুও, বরং গাঢ়তর অনুরাগের প্রত্যাশা ছিল । অর্চনা কোনদিন উঠে এসে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেছে, কোনদিন আপস করেছে, কোনদিন বা নিরীহ মুখে নিজে হাতে তার বালিশ টালিশ এনে দিয়ে গেছে—অসুবিধে যাতে না হয় । পাশের ঘরটা সুখেন্দুর শুধু পড়ার ঘর নয়, রাগ হলে গোসা-ঘরও ।

তাকে গুম হয়ে থাকতে দেখলে হাসি চেপে কখনো-সখনো অর্চনা নিজেও জিজ্ঞাসা করত, কোথায় শোবে—এই ঘরে, না গোসা-ঘরে ?

এবারে ঘর-বদলের সুরটাই একেবারে ভিন্ন-রাগের ।

কোন মান-অভিমানের তাপ নেই, সাধাসাধির প্রত্যাশাও নেই । পাশের ঘরেব চৌকিতে বারো-মাস একটা গালচে পাতাই থাকে । সুখেন্দু নিজের হাতেই দুটো বালিশ তুলে নিয়ে যায়, আবার সকাল হলে সে-দুটো এ-ঘরের খাটে ফেলে দিয়ে তারপর বারান্দার দিকের দরজা খোলে । অর্চনা চুপচাপ দেখে, একটি কথাও বলে না । রাগ চড়তে থাকে তারও, নির্মম মনে হয় মানুষটাকে । সহ্য করাও সহজ নয়, সাধতে যাওয়া আরো বিরক্তিকর । কাণ্ড একটা সে-ও বাধাত, পিসিমার ভয়ে চুপ করে আছে । নিস্পৃহতার আবরণে গুটিয়ে রেখেছে নিজেকে ।—ক'দিন চলে চলুক । পুরুষের দুর্বার তাড়নার দিকটা তার জানা আছে ।

ক'টা দিন বাদেই অর্চনা শুনল, কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে পাঁচ-সাত দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে সে । সুখেন্দু নিজে বলেনি, পিসিমা তাগিদ দিয়েছেন, ওর সঙ্গে কি যাবে না যাবে সব ঠিকঠাক করে দাও— ।

পিসিমা সেই চিন্তায় মগ্ন ছিলেন বলে অর্চনার অবাক হওয়াটা চোখে পড়ে নি । অর্চনাও মুহূর্তেই সামলে নিয়েছে । পরে সুখেন্দুর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করেছে, কোথায় যাচ্ছ শুনলাম ?

সুখেন্দু বই পড়ছিল । মাথা নেড়েছে ।

কোথায় ?

বলেছে ।

এডুকেশন টুরে ?

সুখেন্দু বইয়ের পাতা উল্টেছে ।

আমাকে জানানো দরকার মনে করনি ?

সুখেন্দু বই সরিয়েছে ।—তোমার মায়ের পারমিশান নেওয়া দরকার ছিল ?

মায়ের নয়, আমার জানা দরকার ছিল ।

যা যা লাগতে পারে অর্চনা গোছগাছ করে দিয়েছে । সে যাবার আগে মনটাও নরম

হয়েছিল একটু, কিন্তু সুখেন্দু একটা কথাও বলে নি ।

ফেরার কথা পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে । ফিরল প্রায় দিন বারো পরে । পিসিমার তাগিদে অর্চনা কলেজে টেলিফোন করে জেনেছে, কলেজের ছেলেরা যথাসময়েই ফিরে এসেছে, শুধু সে-ই ফেরে নি ।

ওর যেমন রাগ পড়ে এসেছে, অন্য দিক থেকেও অর্চনা সেই রকমই আশা করেছিল । স্বাভাবিক স্থলে এই ক'টা দিনের বিচ্ছেদ ব্যবধান ঘোচানোর অনুকূল । কিন্তু সুখেন্দুর একটুও পরিবর্তন নেই, বরং আরো সঙ্কল্পবদ্ধ কাঠিন্য নিয়েই ফিরেছে যেন । আগের মতই নিজের হাতে বালিশ তুলে নিয়ে গিয়ে পাশের ঘরে পৃথক শয্যা রচনা করেছে । আঘাত দেবার বাসনা পোষণ করতে থাকলে চরমে না ওঠা পর্যন্ত বাড়াতেই থাকে সেটা । ক'দিন বাদে, পিসিমা জানালেন সে-চক্ষুলজ্জাও কাটল । পাশের ঘরের চৌকিতে একটা স্থায়ী শয্যার ব্যবস্থা করে নিল সে । টেবিলসুদ্ধ তার বই আর ঈজিচেয়ারটাও পাশের ঘর চলে এলো । পিসিমা জানালেন, অনেক রাত পর্যন্ত আজকাল আলো জ্বেলে পড়াশুনা করতে হয় বলেই এই ব্যবস্থা ।

তারপর থেকে পিসিমা ভাইপোকে চুপচাপ লক্ষ্য করেছেন শুধু । অর্চনাকেও । মুখে কিছু বলেন নি

কিন্তু অর্চনা বলেছে । সে দিনের সেই একান্ত প্রত্যাশার মুহূর্তে ও-ভাবে আঘাত দিয়ে ফেলে নিরিবিলি অবকাশে অনুতাপ একটু নিজেরও হয়েছে । বাপের বাড়িতে ওর সেইদিনের অপমানে অনুতাপ আর-একজনের হবার কথা । হল না যে সেইখানেই অর্চনার ক্ষোভ । তার ওপর এই রূঢ়তা আরো অপমানকর । তবুও, আগের মত না হোক, মানুষটার স্বভাব জেনে যতটা সম্ভব হালকা গাম্ভীর্যে এই গুমোট কাটিয়ে তুলতেই চেষ্টা করেছে । জিজ্ঞাসা করেছে, তোমার এই এক-একটা রাগের ঝোঁক ক'দিন পর্যন্ত থাকে বলে দাও, ক্যালেণ্ডারে দাগ দিয়ে রাখি ।

ফল হয় নি । সুখেন্দুর মুখের রেখাও একটা বদলায় নি ।

সেদিন নিজের কাজ সেরে এসে অর্চনা দেখে, পাশের ঘরের দেয়ালের কাছে চেয়ার নিয়ে হরিয়া চাকর নিবিষ্ট মনে দেয়ালে কতকগুলো পেরেক ঠুকছে । অর্চনা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কি হবে । তার আগেই টেবিলটার ওপর চোখ পড়তে অবাক ! টেবিলে শাশুড়ীর সেই ছবিখানা । হরিয়া ওটা খুলে এনে এ-ঘরে টাঙাবার তোড়জোড় করছে । ওদিকে পিসিমাও এসে দাঁড়িয়েছেন কখন । অবাক তিনিও । হরিয়া জানাল, কলেজ যাবার সময় দাদাবাবু তাকে ছবি ও-ঘর থেকে নামিয়ে এনে এ-ঘরে টাঙিয়ে রাখতে বলে গেছে ।

পিসিমার চোখে চোখ পড়তেই অর্চনা তাড়াতাড়ি ঘরে চলে এলো । এই সামান্য একটা ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া কম নয় । প্রথমেই মনে হল হরিয়াকে ফিরে আবার আদেশ দেয়, ছবি যেখানে ছিল সেখানেই রেখে যেতে । পারল না । যেখানে লাগার লেগেছে, ছবি ফিরিয়ে এনে সেই যাতনার লাঘব হবে না । বরং হুকুম যে দিয়ে গেল হাতের কাছে তাকে পেলে সামনা-সামনি বোঝাপড়া হতে পারত । অর্চনা গুম হয়ে বসে রইল খানিক । ও-ঘরে পেরেক পোতার ঠুক-ঠাক শব্দগুলোও কানে লাগছে । অর্চনা নিজের ঘরের দেওয়ালের দিকে তাকাল । যেখান থেকে ছবিটা নামিয়ে নেওয়া হয়েছে সেখানে চৌকো দাগ পড়ে আছে

একটা । সেই দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ মনে হল দাগটা যেন অশুভ সূচনা কিছুর ।

অশুভ সূচনাই ।

জীবনের পাশায় মায়ের দানগুলো বড় নিখুঁত ভাবে পড়ে ।

টেলিফোন বাজল । অর্চনা উঠে এসে টেলিফোন ধরল । মায়ের টেলিফোন ।

এক জায়গায় বরুণার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল কিছুদিন ধরে । অর্চনা শুনেছিল, ছেলের বাড়ির মস্ত অবস্থা—নিজেদের বাড়ি-গাড়ি, ছেলেও বড় চাকরি করে । কোন একটা পার্টিতে ছেলের এবং ছেলের বাড়ির সকলের সঙ্গে মায়ের পরিচয় । অর্চনার বিয়ের পর থেকেই মায়ের সঙ্গিনী বরুণা । বড় মেয়ের বেলায় যা তিনি পাবেন নি, ছোট মেয়ের বেলায় সেটা পেরেছেন । মনোমত যোগাযোগ একটা ঘটেছে শেষ পর্যন্ত । মায়ের ছেলে পছন্দ হয়েছে, অপর পক্ষের মেয়ে পছন্দ হয়েছে । অবশ্য বরুণা অপছন্দের মেয়ে নয় । আর ছেলের তরফের পছন্দটা আরো জোরালো করে তুলতে হলে মেয়ে ছাড়াও আনুষঙ্গিক আর যা দরকার, বিজন দরাজ অন্তঃকরণে তার সবটা ভার নিয়েছে । খরচপত্র যা লাগে লাগুক, তবু ভাল বিয়ে হোক একটা— ।

সেই বিয়ের কথাবার্তা পাকা এতদিনে ।

টেলিফোনে মিসেস বাসু বড় মেয়েকে সেই সংবাদ দিলেন ।

অর্চনা যথার্থ খুশি । এমন কি ক্ষণকাল আগের গুরুভারও অনেকটা হালকা হয়ে গেল । সানন্দে বলল, খুব ভাল মা, খুব ভাল হল ।

ভাল যে হল সেটা মা খুব ভাল করেই জানেন । কিন্তু বড় মেয়ের ব্যাপারে সেই ভাল না হওয়ার খেদ তাঁর দিনে দিনে বেড়েছে বই একটুও কমে নি । ফলে এই মেয়ের জন্যেই তাঁর দুশ্চিন্তা আর দরদ বেশি । অথচ কিছুকাল ধরে তিনিও অনুভব করেছেন, মেয়ের নিরঙ্কুশ ভবিষ্যৎ-রচনার সব চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ । শুধু তাই নয়, মেয়েও যেন মনে মনে বিরূপ তাঁর ওপর । বিজনের জন্মদিনে সেটুকু স্পষ্টই উপলব্ধি করেছেন তিনি । মেয়ে অবুঝ, মেয়ের এই মনোভাব তিনি গায়ে মাখেন না অবশ্য । কিন্তু সেটাও দুর্ভাবনার কারণ তো বটেই । ওকে সুদ্ধু বিগড়ে দিলে আশার আর থাকল কি ? সেই কারণে জামাইয়ের ওপর সম্প্রতি আরো বেশি বিরূপ তিনি । শুধু জামাইয়ের ওপর নয়, এ-বাড়ির আর এক নির্বিরোধী মহিলার ওপরেও । অযাচিত অবাঞ্ছিত ভাবে যিনি মেয়ের সংসারটিকে আগলে আছেন বলে তাঁর বিশ্বাস, আগলে থেকে মেয়ের সামান্য ভবিষ্যৎটুকু ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছেন ।

সম্প্রতি মেয়ের অশান্তির একটু-আধটু আভাস তিনিও পাচ্ছেন । আগের মত আর তেমন হৈ-চৈ করে না, তেমন খোলা মেলা হাসে না । আসেও না বড় । দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় মিসেস বাসু মনে মনে অস্থির । তাই বরুণার বিয়ে উপলক্ষ করে শক্ত হাতে আর একবার হাল ধরবেন মনস্থ করেছেন । মেয়েকে কিছুকাল এখানে আটকে রেখে জামাইয়ের সঙ্গে পষ্টাপষ্টি ফয়সালা করে নেবেন একটা । তাঁর কাছে থাকলে মেয়ের আলগা-ভয়-ভাবনা সঙ্কোচও কাটবে কিছুটা ।

তাঁর টেলিফোন শুধু বরুণার বিয়ের খবর জানাবার উদ্দেশ্যেই নয় ।

কিন্তু সংকল্পটা আপাতত ঘুরিয়ে ব্যক্ত করলেন তিনি । প্রথমেই জেনে নিলেন সুখেন্দু ঘরে আছে কি না । তারপর প্রস্তাব করলেন, আসছে রবিবার বিজন আর বউমা ছেলের

বাড়ি যাচ্ছে আলাপ-পরিচয় করতে, অর্চনাকেও যেতে হবে । অতএব কালই যেন সে চলে আসে, শুধু তাই নয়, এবারে এসে মাস দুই তাকে থাকতে হবে—নইলে বাড়িটা একেবারে খাঁ খাঁ করবে ।

অর্চনা রবিবারে ছেলের বাড়ি যেতে রাজী, কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবে তার আপত্তি । বলল, অতদিন থাকব কি করে মা...।

টেলিফোনের ওধার থেকে মায়ের বিরক্তি ।—কেন, অসুবিধেটা কিসের, বিয়ের এই দু-বছরের মধ্যে একসঙ্গে দশটা দিনও এসে থেকেছিস ? বিয়ে হয়েছে বলে কি মাথা কিনেছে নাকি তারা ?

তার দিক থেকে বড় সুসময়ে বলেছেন কথা ক'টা । এখানকার এই আবহাওয়া অর্চনাও বরদাস্ত করে উঠতে পারছিল না । আজকের গ্লানি আরো দুর্বহ ।...দিনকতকের জন্য সরে গেলে মন্দ হয় না । ফোটো আপনিই আবার এ-ঘরে এনে টাঙাতে বাধ্য হয় কি না দেখা যেতে পারে । বিয়ে হয়েছে বলে সত্যিই তো মাথা বিকোয় নি । মেজাজের মাত্রাজ্ঞান নেই যখন মেজাজ নিয়েই থাকুক কিছুদিন ।

অন্যমনস্কের মত বলল, আচ্ছা, পিসিমাকে বলে দেখি—

পিসিমাকে আবার বলবি কি ! মায়ের কণ্ঠস্বর চড়ে গেল, সুখেন্দুকে বলে সোজা চলে আসবি, বলবি আমি বলেছি ।

আ-হা, তুমি বুঝছ না—

সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে উঁচু থেকে কিছু একটা পড়া এবং ঝন ঝন ভাঙার শব্দ । অর্চনা চমকে তাকাল । রিসিভার কান থেকে সরে গেছে, মায়ের কথা কানে গেল না । ওধার থেকে পিসিমার উদগ্রীব কণ্ঠ—বউমা, ও বউমা, কি ভাঙল ?

কি ভেঙেছে অর্চনা না দেখেই অনুমান করতে পারে । টেলিফোনে মুখ নামিয়ে বলল, এখন থাক মা, পিসিমা ডাকছেন—

মেয়ের কথায় ওদিক থেকে মায়ের গা জ্বলে গেল...টেলিফোনে কথা কইছিস—পিসিমা ডাকছেন কি !

পিসিমা পূজোয় বসেছিলেন, জবাব না পেয়ে আরো উৎকণ্ঠিত ।—কি ভাঙল ? ও বউমা—

অর্চনা এবারে সাড়া দিল, যাই পিসিমা— । এদিকে টেলিফোন ছেড়ে দিলে মা চটবেন ভেবে তাঁকে বলল, আচ্ছা তুমি একটু ধরো মা, আমি এক্ষুনি আসছি ।

রিসিভার টেবিলে নামিয়ে রেখে ভিতরের দরজা দিয়ে পাশের ঘরে এসেই অর্চনা স্তব্ধ । শাশুড়ীর ছবি মেঝেতে উল্টে পড়ে আছে, কাচ ভেঙে ছত্রখান । হতভম্ব হরিয়া হাতে করেই কাচের টুকরো কুড়োচ্ছে ।

পূজোর আসন ছেড়ে পিসিমাও উঠে এসেছেন । ঘরের অবস্থা দেখে তিনি আর্তনাদই করে উঠলেন । হরিয়ার উদ্দেশে বলে উঠলেন, ওরে ও হতভাগা, ছবিটা ফেললি কি করে ? ...বউমা, দেখ ছবিটা গেল কি না...

এগিয়ে এসে অর্চনা ছবিটা তুলল । কাচ নয় শুধু, ফ্রেমও ভেঙেছে । জায়গায় জায়গায় কাচ বিঁধে আছে । মূর্তিটি অক্ষত আছে এই যা । বলল, না ছবি ঠিক আছে ।

সুখেন কলেজ থেকে ফেরবার আগে ওটা বাঁধিয়ে আনার ব্যবস্থা করো ।...সখেদে হরিয়াকে তাড়া দিলেন তিনি, এই জংলি, ওগুলো রেখে ছবি নিয়ে আগে দোকানে যা শিগগির—

ঘাবড়ে গিয়ে হরিয়া কাচ কুড়ানো ছেড়ে তাড়াতাড়ি ফোটো নেবার জন্য হাত বাড়াতে অর্চনা দেখে তার হাত কেটে রক্তাক্ত ।—আবার হাতও কেটেছে, দেখি—ইস !

বেশিই কেটেছে মনে হল । সমস্ত হাত রক্তে মাখা । ছবিটা অর্চনা দেয়ালের এক ধারে সরিয়ে রেখে হরিয়াকে নিয়ে বাইরে এলো । তার হাতে জল ঢেলে দিতে দিতে ঘরে আয়োডিন-তুলো আছে কিনা ভাবতে গিয়ে কি মনে পড়ল ।...মা টেলিফোন ধরে আছেন । মুখ তুলে দেখে পিসিমা তখনো দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে । বলল, পিসিমা, মা টেলিফোনে রয়েছেন, আপনি একটু বলে দিন না আমি পরে টেলিফোন করব'খন ।

অর্চনা হরিযার হাত দেখায় মন দিল আবার, ক'জায়গায় কেটেছে ঠিক নেই ।

টেলিফোন কানে লাগিয়ে পলে পলে জ্বলছিলেন মিসেস বাসু । যে মেয়ের জন্য এত ভাবনা তাঁর, সে-ই যদি এমন হয় তিনি পাবেন কি করে । ডাক শুনেই ত্রস্ত এ-ভাবে টেলিফোন ফেলে চলে যাওয়াটা অসহ্য তাঁর কাছে । আর গেছে তো গেছেই । এমন নিরীহ বশ্যতার দরুন মেয়ের ওপরেই মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ । ওদিক থেকে টেলিফোন তোলা বা ভাল করে সাড়া পাওয়ার আগেই সপ্তকণ্ঠে ছিটকে উঠলেন তিনি ।—দ্যাখ, এখনো নিজের ভাল বুঝতে শেখ —উঠতে পিসিমা বসতে পিসিমা—টেলিফোনে কথা কইছিস, তাও পিসিমা—তোর হল কি ?

এদিকের মহিলাটি হঠাৎ যেন হকচকিয়ে গেলেন একেবারে । নিজের অগোচরে সাড়া দিতে গেলেন, আমি—

আমি-আমি অনেক শুনেছি ।...রাগের মাথায় মিসেস বাসু ভাবতেও পারেন না কি অঘটন ঘটাতে বসেছেন ! রূঢ় কণ্ঠেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন তিনি—অনাথা, বিধবা মানুষ বাড়িতে আছে থাক, তা বলে তার এত কর্তৃত্ব কিসের ? আর তোদেরই বা তাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন ? তুই এখানে এসে থাকবি দু-মাস তাকে বলেছিস ?

সাড়া নেই । আচমকা আঘাতে পিসিমা একেবারে বিমূঢ় ।

মেয়ে ঘাবড়ে গেছে ভেবে মিসেস বাসুর অসহিষ্ণু নির্দেশ, তোর ভয়টা কিসের ? স্পষ্ট জানিয়ে দিবি আমি বলেছি তুই এখানে এসে থাকবি দু'মাস ! না পারিস আমিই সুখেনকে বলব—

আরো দুই-এক মুহূর্ত পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে পিসিমা এবারে সাড়া দিলেন । শান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি সুখেন্দুর পিসিমা...বউমা আপনাকে পরে টেলিফোন করবেন জানিয়েছেন ।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন । পাংশু, বিবর্ণ সমস্ত মুখ । খেয়াল হতে দেখেন সাবি অবাক চোখে তাঁকেই দেখছে । সে ওপরে আসতে বউদিমণি তাকে ঘর থেকে আয়োডিন-তুলো এনে দিতে বলেছিল । তাঁর টেলিফোনের কথাগুলো নয়, মুখের এই ভাবান্তরটুকুই সাবির বিস্ময়ের কারণ ।

কি চাস ?

আয়োডিন-তুলো—

নিয়ে যা ।...তার পাশ কাটিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন । অদূরে ও-দিক ফিরে অর্চনা হরিয়ার হাত উল্টে-পাল্টে দেখছে । কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা নিজের ঘরে এসে অনুভূতিশূন্য মূর্তির মত বসে রইলেন তিনি ।

হরিয়ার হাতের ব্যবস্থা করে অর্চনা ফিরে এসে ঘর পরিষ্কার করল । তারপর কি ভেবে শাশুড়ীর ছবিটা নিজেই বেরিয়ে ছবি-বাঁধাইয়ের দোকানে দিয়ে এলো । সন্ধ্যার আগে আবার গিয়ে নিয়েও এলো । এ-বেলা হরিয়া আসেই নি । সদ্য-বাঁধানো ছবি অর্চনা পাশের ঘরে সুখেন্দুর টেবিলের ওপরেই রেখে দিল ।

পিসিমার সামনা-সামনি বার-কতক এসেছে । নিজের ভিতরটা সুস্থির থাকলে তাঁর স্তব্ধতা অস্বাভাবিক লাগত । যেটুকু চোখে পড়েছে, ভেবেছে ছবিটা ও ভাবে ভেঙেছে বলে মন খারাপ, আর ওদের ব্যাপারটা অনুমান করেই কিছুটা গম্ভীর এবং অপ্রসন্ন ।

বাড়ি ফিরে মায়ের ছবি টেবিলের ওপর দেখে সুখেন্দু প্রথমেই হরিয়ার উদ্দেশে হাঁক দিল । তারপর সদ্য পালিশ করা নতুন ফ্রেম নজরে পড়তে সেটা হাতে তুলে নিল । হরিয়ার বদলে জলখাবার হাতে অর্চনা ঘরে ঢুকেছে ।—হরিয়া এ-বেলা আসে নি, জ্বর হয়ে থাকতে পারে, হাত অনেকটা কেটেছে । ছবি টাঙাতে গিয়ে ফেলে ভেঙেছিল, কাল আসে তো আবার চেষ্টা করা যাবে ।

এই ফ্রেম আগে যা ছিল তার থেকে সুন্দর তো বটেই, দামীও । পছন্দটা হরিয়ার নয় বুঝেছে । ছবিটা টেবিলে রেখে সুখেন্দু চুপচাপ হাতমুখ ধুয়ে এলো । অর্চনা নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল, তার খাওয়া শেষ হতে বলল, কাল আমি মায়ের ওখানে যাচ্ছি, কিছুদিন সেইখানেই থাকব ঠিক করেছি ।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের প্রচ্ছন্ন অসহিষ্ণুতা উপলব্ধি করা গেল । সুখেন্দু উঠে টেবিলের একটা দরকারি বই-ই যেন উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল ।—পিসিমাকে বলে যাও।

তোমাকে বলার দরকার নেই ?

ঠিক করে ফেলার পর আর না বললেও চলে ।

অর্চনা চুপচাপ দেখল একটু ।—ঠিক আজই করেছি...ঘর থেকে তোমার মায়ের ছবি সরানোর পর । তখন তুমি ছিলে না ।

সুখেন্দু চকিতে তাকাল একবার । আঘাতের বিনিময়ে ক্ষোভ অথবা সমর্পণটাই হয়তো স্বাভাবিক প্রত্যাশা । অন্যথায় ফল বিপরীত । সশ্লেষে জিজ্ঞাসা করল, আপাতত তাহলে বেশ কিছুদিনই সেখানে থাকবে ?

তার দিকে চোখ রেখেই অর্চনা হাসল একটু, তারপর খুব সহজ ভাবেই জবাব দিল, কি করে বলি...আমার এখানে থাকাটা তেমন অসহ্য হবে না বুঝলে আগেই না-হয় গিয়ে নিয়ে এসো ।

চলে এলো । বই ফেলে সুখেন্দু গুম হয়ে চেয়ারে এসে বসল আবার । একবার ইচ্ছে হল তক্ষুনি ডেকে বলে দেয়, কোথাও যাওয়া হবে না । কিন্তু সেটা বলার মতও কোথাও যেন জোরের অভাব । অর্চনা হয়তো মুখের দিকে চেয়ে থেকেই হাসবে আবার আর বলবে, আচ্ছা যাব না ।

বাধা দেবার মত জোরালো অথচ নিস্পৃহতর একটা উপলক্ষ মনে পড়ে গেল ।...পিসিমা

কি মনে করবে ? পিসিমা দুঃখ পেতে পারে তেমন কারো ছেলেমানুষিই সে বরদাস্ত করবে না ! তক্ষুনি উঠে পাশের ঘরে এসে দেখে অর্চনা নেই । বারান্দায় নেই । বোধহয় নিচে । ঝোঁকের মাথায় সামনে পেলে বলে ফেলত । না পেয়ে ভাবল পরে বলবে ।

বারান্দায় পায়চারি করল দুই-একবার । পিসিমার পূজোর ঘরের দিকে চোখ পড়তে অবাক একটু । এ-সময়টা ও-ঘর অন্ধকার থাকে না বড় । পায়ে পায়ে সেই দিকে এগুলো । এমনিই— । পাশে পিসিমার শোবার ঘরেরও আলো নেবানো । ফিরে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল । মনে হল, কোণের দিকে মেঝেতে কেউ বসে । ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল ।

পিসিমাই । দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিঃশব্দে বসেছিলেন । দুই চোখে জলের ধারা । বিষম চমকে উঠে তাড়াতাড়ি আঁচলে করে চোখ মুছতে লাগলেন তিনি ।

সুখেন্দু নির্বাক খানিকক্ষণ ।—কি হয়েছে ?

কিছু না, এমনি বসেছিলাম ।...এই অবস্থায় তাকে দেখে ফেলাটা সামলে নিয়ে সহজ হতে চেষ্টা করলেন ।—তুই কখন এলি, খেতে-টেতে দিয়েছে ?

সুখেন্দু কাছে এগিয়ে এলো । আবারও নিরীক্ষণ করে দেখল ।—কি হয়েছে ?

কিছু না রে বাবা, ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন—কত সময় কত কি মনে পড়ে—যাই রাত হয়ে গেল ।

তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরের দিকে পা বাড়ালেন । চুপচাপ আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সুখেন্দু নিজের ঘরে চলে এলো । একটু বাদে বইখাতা নিয়ে ছেলে পড়াতে চলে গেল । পিসিমাকে ও-ভাবে দেখে হঠাৎ ধাক্কাই খেয়েছে একটা । কিছু ভাবতে পারছে না ।

সেই রাতেই অর্চনা পিসিমার কাছে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাপের বাড়ি গিয়ে কিছুদিন থাকার প্রস্তাবটা উত্থাপন করল । আগে বোনের বিয়ের খবর জানাল, তারপর বলল, মা কিছুদিন গিয়ে থাকার জন্যে বার বার করে বলেছেন—

পিসিমার শুকনো উত্তর, আমাকে বলার কি আছে, সুখেনকে বলো—

এভাবে কথা বলতে অর্চনা শোনে নি কখনো । বোনের বিয়ে শুনেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন না সেটা আরো অপ্রত্যাশিত । তবু নিজে থেকেই অর্চনা বোনের বিয়ের প্রসঙ্গে এটা-সেটা জানাল । কিন্তু কোন সাড়া পেল না বা আগ্রহ দেখল না । উল্টে কেমন একটা রুক্ষ নীরবতাই লক্ষ্য করল । এই প্রথম অর্চনা মনে মনে বেশ ক্ষুণ্ণ হল তাঁর ওপরেও। বাড়ির ছেলেটি তুষ্ট না থাকলে ও কেউ নয়, এই আচরণে পিসিমা সেটাই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন বোধহয় ।

রাত্রিতে খাবার টেবিলে বসে সুখেন্দু নিজে থেকে কথা বড় বলেই না আজকাল । খেয়ে চুপচাপ উঠে চলে যায় । এক একদিন অর্চনা সঙ্গে না বসেও দেখেছে, তাও কিছু জিজ্ঞাসা করে নি । কিন্তু সেই রাত্রিতে খেতে বসে ভাতে হাত দেবার আগেই ওর দিকে তাকাল । কিছু যেন নিরীক্ষণ করছে । অর্চনা ফিরে তাকাতে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল, পিসিমার কি হয়েছে ?

অর্চনা মনে মনে অবাক ; এ-রকম প্রশ্ন কখনো শোনে নি ।—কি হবে ?

জানো কি না জিজ্ঞাসা করছিলাম ।

জিজ্ঞাসাটা জেরার মত লেগেছে অর্চনার । নিরুত্তাপ জবাব দিল, তোমাদের এখানে

কার কখন কি হয় এই দু-বছরেও ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি ।

খেতে খেতে সুখেন্দু তেমন ঠাণ্ডা গলায় বলল, পারলে ভাল হত ।

অর্চনা চেষ্টা করল হাসতে, তার এবারের উক্তিটা বিদ্রূপের মতই শোনাল ।—কি আর করবে বলো, তোমাদের বরাত মন্দ !...কি ভাবে বুঝতে হবে বলে দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি—

পরদিন যাবার আগে পিসিমাকে প্রণাম করার সময়ও একটি কথা বললেন না তিনি । ক'দিন থাকবে বা কবে ফিরবে, কিছু না । পিঠে হাত রেখে শুধু নির্বাক আশীর্বাদ করলেন একটু । সুখেন্দু বাড়ি নেই, সকালের ট্যুইশনে বেরিয়েছে । তার ফেরার সময় হয়ে গেছে । ফেরে নি ।

অর্চনা নীরব অভিমানে বাপের বাড়ি চলে গেল ।

পাঁচ-ছ দিনের একটানা গাম্ভীর্যের পর পিসিমাকে প্রায় আগের মতই সহজ হতে দেখা গেল সেদিন । সকালে সাবি রাঁধুনী অগোছালো কাজের দরুন বকুনি খেয়ে নিশ্চিন্ত, হরিয়া চাকরও হুকুম তামিল করে হালকা একটু । এই ক'দিনের মধ্যে সেদিন রাতেই বউয়ের ঘরটা অন্ধকার দেখে নিজেই ভিতরে এসে আলো জ্বেলে দিলেন । শূন্য ঘরটার চারদিকে চেয়ে কেমন শূন্যতাও বোধ করলেন তিনি । দেয়ালের গায়ে ঠিক আগের জায়গায় সুখেনের মায়ের ছবিটা টাঙানো দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন । অর্চনা চলে যাবার পর সুখেন্দু নিজের হাতে এটা আবার এখানেই টাঙিয়ে রেখেছিল ।

ভিতরের দরজা দিয়ে পিসিমা পাশের ঘরে এসে দাঁড়ালেন । সুখেন্দু ঈজিচেয়ারে বসেছিল । এ ঘরে আলো জ্বলতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে এদিকেই তাকিয়েছিল সে । পিসিমা বললেন—এ ঘরটা অন্ধকার করে রাখিস কেন, মেয়েটা না থাকলে এমনিতেই ঘর খাঁ খাঁ করে ।

ব্যতিক্রম দেখে সুখেন্দুও বোধহয় হালকা নিঃশ্বাস ফেলল । পিসিমা সামনে এসে দাঁড়ালেন । হ্যাঁ রে, বউমা ফিরছে কবে ?

সুখেন্দু অবাক একটু ।—কিছুদিন তো সেখানে থাকবে শুনেছিলাম...তোমাকে বলে যায় নি ?

পিসিমা জবাব দিলেন, বলেছে হয়তো...আমারই খেয়াল নেই । যাক তুই কালই গিয়ে নিয়ে আয় তাকে, আর যে-দুটো বাড়িতে আছে তাদের তো খাসা জ্ঞানগম্যি—সময়মত হয়তো একটু ধূপধুনোও পড়বে না ।

সুখেন্দু নিরুত্তরে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। আরো কিছু বক্তব্য আছে অনুমান করেই শেষে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে ?

জবাবে খুব সাদাসিধে ভাবেই যে সঙ্কল্পটি ব্যক্ত করলেন, শুনে নির্বাক কিছুক্ষণ । আগামী পরশু তিনি হরিদ্বার যাচ্ছেন জায়ের কাছে । জা কতকাল ধরে লেখালেখি করছেন যাবার জন্যে, কিন্তু হয়ে আর ওঠে না । এবারে মনস্থ করেছেন যাবেন । হরিদ্বারে চিঠি লিখে জানানোও হয়ে গেছে । যাবার সঙ্গীও জুটে গেছে, তাঁর গুরুদেব-বাড়ির আরো কারা যাচ্ছে সেদিন । তাই বউমাকে কালই গিয়ে ওর নিয়ে আসা দরকার ।

যত সহজ ভাবেই ইচ্ছাটা ব্যক্ত করুন তিনি, শোনা মাত্র সুখেন্দুর মনে গভীর একটা

আঁচড় পড়ল। স্থির দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর সংবদ্ধ।...সেজন্যে তোমার যাওয়া আটকাবে না।...কবে ফিরবে?

জবাব দিতে গিয়ে বিব্রত বোধ করছেন, দৃষ্টি এড়াল না। বললেন, আমি আপাতত ওখানেই থাকব ঠিক করেছি রে।—আরো সহজ ভাবে প্রসঙ্গ নিষ্পত্তির চেষ্টা করলেন তিনি—ক'বছর আগেই তো যাব ঠিক ছিল, তোর মায়ের জন্য পশু—এবারে আর আটকাস না বাবা।

সুখেন্দু চেয়েই আছে। দেখছে। চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকাল একবার। টেবিলের কাছে এসে অন্যমনস্কের মত একটা বই নাড়াচাড়া করল। তারপর ক্ষুদ্র জবাব দিল, অচ্ছা।

পিসিমা যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন। দেখলেন একটু।—হ্যাঁ রে, রাগ করলি?

সুখেন্দু মাথা নাড়ল, রাগ করে নি। তারপর শান্ত মুখে বলল, তুমি এখানে থাকতে পারবে না আমি আগেই জানতুম পিসিমা, কিন্তু সে-যে এত শিগগির, ভাবি নি...

হাতের বইটা ফেলে পিসিমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল সে। কণ্ঠস্বর বদলে গেল।—পিসিমা, কেউ কিছু বলেছে তোমাকে?

স্পষ্ট বিড়ম্বনা—এই দ্যাখো...আমাকে আবার কে কি বলবে!

পিসিমার বাহুতে একখানা হাত রাখল সুখেন্দু। আবার জিজ্ঞাসা করল, কেউ বলেছে কিছু?

অর্থাৎ এবারে সে গা ছুঁয়ে জিজ্ঞাসা করছে, সত্যি না বললে ওরই অকল্যাণ। পিসিমার এই দুর্বলতা সুখেন্দুর জানা আছে। জবাব শোনারও আর দরকার ছিল না, তাঁর বিব্রত মুখভাবেই জবাব লেখা।

পিসিমা জোর দিয়েই বললেন, না রে না, যা ভাবছিস তা নয়, বউমা আমাকে কোনদিন এতটুকু অশ্রদ্ধা করে নি।

সুখেন্দু তাঁর বাহু থেকে হাত নামাল না তবু। স্থির নিষ্পলক চেয়ে আছে।—বউমা ছাড়াও অশ্রদ্ধা করার লোক আছে, তার মা বা আর কেউ কিছু বলেছে?

ধরা পড়ে পিসিমা ফাঁপরে পড়ে গেলেন একেবারে। নিরুপায় মুখে রাগ দেখালেন, পাগলামো করিস নে, আর কারো কথায় আমার কি আসে যায়—বউমাকে কালই গিয়ে নিয়ে আয়, বলবি আমি ডেকেছি।

সুখেন্দু হাত নামিয়ে নিল। যেটুকু বোঝার বুঝে নিয়েছে। আঘাতটা কোথা থেকে এসেছে অনুমান করতে পেরেছে। চুপচাপ চেয়ারে এসে বসল আবার।

তার মুখের দিকে চেয়েই পিসিমা নির্বাক খানিকক্ষণ। যা গোপন করে নিঃশব্দে চলে যেতে চেয়েছিলেন সেটা যেন উল্টে আরো বেশিই স্পষ্ট হয়ে গেল। গেল বলেই সমস্ত মুখে ব্যথার ছাপ দু'চোখ ভরে জল আসার উপক্রম। সামলে নিয়ে আর একটু কাছে এলেন। স্পষ্ট কোমল সুরে বললেন—দ্যাখ, তোকে একটা কথা বলব—

কঠিন গাম্ভীর্যে সুখেন্দু চোখ তুলে তাকাল শুধু।

বউমা খু-ব লক্ষ্মী মেয়ে, আমার চোখ অত ভুল করে না। তাকে তুই কক্ষনো দুঃখ দিস নে—

চোখের জল সংবরণ করে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ।

পরদিনও সকাল দুপুর পেরিয়ে বিকেল গড়াতে চলল । বউমাকে কোন খবর দেওয়া হয় নি বা হবে না সেটা তিনি আগেই অনুমান করেছেন । একবার ঠিক করলেন, নিজেই টেলিফোনে ডাকবেন তাকে । আবার ভাবলেন, হরিয়াকে পাঠিয়ে খবর দেবেন । সে বাড়ি চেনে । শেষে কি ভেবে কিছুই করলেন না । তার পরদিনও গোছগাছ করতে করতে সকাল কেটে গেল । সেই দিনই বিকেলে গাড়ি । সুখেন্দু কলেজে যাবার আগে বলে গেছে, সে-ই এসে সময় মত স্টেশনে পৌঁছে দেবে । গোছগাছের ফাঁকে ফাঁকে পিসিমা হরিয়া আর সাবিকে যাবতীয় খুঁটিনাটি নির্দেশ দিলেন । আর হরিয়াকে বলে রাখলেন, সে যেন চলে না যায়, কাজ আছে ।

দ্বিপ্রহরের মধ্যে সব সেরে চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে হরিয়াকে ডাকলেন, আয় আমার সঙ্গে ।

এই ক'টা দিন খানিকটা হৈ-চৈ-এর ওপরেই কাটিয়েছে অর্চনা । ভিতরের তাপ একটুও বুঝতে দেয় নি । বরুণাকে আলটেছে, বউদির নভেল পড়া নিয়ে খুনসুটি করেছে, বাবার তত্ত্ব-বিশ্লেষণ শুনেছে আগের মতই, সেজেগুজে মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে কেনা-কাটাও করেছে । আর এই করে মনের দিক থেকে হালকাও হয়েছে অনেকটা । নিরিবিলিতে বাড়ির কথা বেশি মনে হয় বলেই নিরিবিলি চায় না । তা সত্ত্বেও টেলিফোনে পিসিমার সঙ্গে কথা বলতে লোভ হয় মাঝে মাঝে । কিন্তু অভিমানটা এবারে তাঁর ওপরেই বেশি—একদিন টেলিফোন তুলেও আবার রেখে দিয়েছে ।

সেদিন দুপুরের শো-এ দাদা-বউদির সঙ্গে কি একটা ছবি দেখতে গিয়েছিল । বলা বাহুল্য, ননিমাধবও ছিল এবং তার আগ্রহেই যাওয়া ।

ফিরেও ছিল খুশি মনেই ।

ওপরে নিজেদের ঘরে ঢুকে বরুণাকে দেখবে আশা করেছিল । ওকে কলেজে পাঠিয়ে নিজেরা কত ভাল ছবি দেখে এলো একটা, সেই সমাচার শুনিয়ে ওকে রাগাবার ইচ্ছে ছিল ।

বরুণার বদলে মা বসে তাদের ঘরে ।

কিছু একটা ভাবছিলেন, অর্চনার সাড়া পেয়েই চকিতে হাসি টেনে আনলেন মুখে । —কেমন দেখলি ?

ভাল । তুমি একলাটি বসে যে, বরুণা কই ?

আছে ওদিকে— । কিছু একটা বলবেন বলেই যেন মায়ের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন তিনি । কিন্তু হাসিটা খুব প্রাঞ্জল মনে হল না অর্চনার ।

কি মা ?

ও-বাড়ি থেকে তোর পিসি-শাশুড়ী এসেছিলেন, তোরা বেরোবার একটু পরেই ।

অর্চনা অবাক ।—পিসিমা !

হ্যাঁ ।—আবারও মুখে হাসি টেনেই ড্রয়ার খুলে একগোছা চাবি বার করে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এটা তোকে দেবার জন্যে দিয়ে গেলেন—

নিজে অগোচরে চাবি হাতে নিল অর্চনা । বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত যেন । বাড়ির চাবি ! বিমূঢ়

মুখে বলল, চাবি...কেন ?

উনি যে আজ বিকেলের গাড়িতেই হরিদ্বার যাচ্ছেন...

অর্চনা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল শুধু ।

বিব্রত ভাবটুকু তল করে মিসেস বাসু বললেন, আদরযত্ন করতে গেলাম, এক গেলাস জলও মুখে তুললেন না, আমরা তো সব ম্লেচ্ছ কিনা—

অর্চনা অস্ফুট বাধা দিল—জল তিনি কোথাও খান না—কি বললেন ?

বলবেন আবার কি, হুকুম করেই গেলেন, চাবিটা তোকে দিতে হবে আর আজই তোকে ও-বাড়ি চলে যেতে হবে—আজ কি করে যাওয়া হয় তোর ?

অর্চনা অধীর মুখে বলে উঠল, কিন্তু উনি যাচ্ছেন কেন ?

মেয়ের এত উতলা ভাবটা মনঃপূত নয় মিসেস বাসুর ।—বুড়ো মানুষ, তীর্থ-ধর্ম করে কাটাবেন, ভালই তো—শুনলাম ওখানেই থেকে যাবেন ।

অর্চনা চমকে তাকাল মায়ের দিকে । সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে । পরক্ষণে ছুটে বেরিয়ে সোজা এসে ঢুকল বাবার ঘরে । বাবা ঘরে নেই দেখে স্বস্তি বোধ করল একটু । তাড়াতাড়ি টেলিফোন তুলে ডায়েল করল ।

টেলিফোন বেজেই চলল । সাড়া নেই ।

টেলিফোন রেখে ত্রস্তে বেরিয়ে আসতেই মায়ের মুখোমুখি আবার ।—মা গাড়িটা আছে তো ?

আছে, কিন্তু তুই যাবি কোথায় ?

জবাব না দিয়ে অর্চনা তাঁর পাশ কাটিয়ে তরতরিয়ে নিচে নেমে এসে ড্রাইভারকে বলল গাড়ি বার করতে ।

হাওড়া স্টেশন ।

অর্চনা খবর নিয়ে জানল, হরিদ্বারের গাড়ি প্রায় চল্লিশ মিনিট আগে ছেড়ে গেছে ।

শ্রান্ত অবসন্ন চরণে স্টেশন থেকে বেরিয়ে মোটরে উঠল । পরিত্যক্ত অনুভূতি একটা । জীবন থেকে এক নিশ্চিন্তনির্ভর বিচ্যুতির শূন্যতা ।

কিন্তু—কেন ? কেন ? কেন ? কেন ?

অর্চনার কোনদিকে হুঁশ নেই । এই 'কেন'টা আতিপাতি করে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছে । পিসিমা গেলেন কেন ? আগে ওকে একটা খবর পর্যন্ত দিল না কেউ । কেন দিল না ? অর্চনা ভাবছে । আসার আগের দিন আর আসার দিন পিসিমাকে একেবারে অন্যরকম দেখেছিল বটে । ওর দিক থেকেই যেন মুখ ফিরিয়ে ছিলেন তিনি । আসার দিন কিছু হয় নি, যা হয়েছে আগের দিনই । সেই দিনই রাত্রিতে খেতে বসে আর-একজনও জিজ্ঞাসা করেছিল, পিসিমার কি হয়েছে...। কেন জিজ্ঞাসা করেছিল ? কি দেখে ?

ওই দিনটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চোখের সামনে দেখতে চেষ্টা করল ।...শাশুড়ীর ছবি সরানো হয়েছিল...ছবিটা পড়ে ভেঙেছিল, পিসিমার ডাকাডাকি—ভাঙা ছবি দেখে তক্ষুনি বাঁধিয়ে আনার ব্যাকুলতা...চাকরটা হাত কেটে রক্তাক্ত...টেবিলে মায়ের টেলিফোন...

সহসা গাড়ির মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই চমকে উঠল অর্চনা । অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ সহ্যের অতিরিক্ত এক ঝলক আলো সরাসরি চোখে এসে পড়লে যেমন

হয় তেমনি। মা পিসিমাকে কিছু বলেছিল টেলিফোনে...মা ? অর্চনার সমস্ত মুখ সাদা পাংশু। প্রথম সাক্ষাতে ঘুরেফিরে মায়ের সেই জেরা...ও টেলিফোন ছেড়ে গিয়েছিল কেন...পিসিশাশুড়ী কেন ডেকেছিল...কিছু বলেছে কিনা...দুর্ব্যবহার করেছে কিনা...। অর্চনা ভেবেছিল, নির্দেশমত ও সত্যিই চলে এলো দেখে মায়ের কৌতূহল। ওর নিজেরই ভিতরটা ভাবাক্রান্ত তখন, মায়ের জেরায় তাই বিরক্তি বেড়েছিল।

এক সময় খেয়াল হতে দেখে গাড়ি বাপের বাড়ির রাস্তা ধরেছে। ড্রাইভারকে অস্ফুট নির্দেশ দিল অন্য ঠিকানায় যেতে।

গাড়ি থেকে নেমে অর্চনা দোতলার দিকে তাকাল। ঘরে আলো জ্বলছে। ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলে দিল।

দরজা খুলে সাবি ওকে দেখেই নিশ্চিন্ত।—তুমি এসেই গেছ বউদিমণি, বাঁচা গেল—

তার দিকে চেয়ে অর্চনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল একটু।—পিসিমা চলে গেলেন কেন সাবি ?

ওমা, পিসিমা তো দুপুরে তোমার ওখান থেকেই এলেন, দেখা হয় নি ?

অর্চনা মাথা নাড়ল।

সাবির কথায় কিছু বোঝা গেল না।—ক'দিনই থমথমে গম্ভীর দেখা গেছে তাঁকে, তারপর আজ চলে গেলেন।

অর্চনা পায়ে পায়ে ওপরে উঠে এলো।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে সুখেন্দু লিখছে কি। অর্চনা কাছে এসে দাঁড়াল। সুখেন্দু মুখ তুলে একবার তাকে দেখে নিয়ে আবার লেখায় মন দিল। বিস্মিত হয় নি, বরং জানত যেন আসবে। ও-বাড়ি গেছলেন, পিসিমা জানিয়েছেন। আর, বউমার সঙ্গে দেখা হল না সেই খেদও প্রকাশ করেছেন। লিখতে লিখতে ঠাণ্ডা প্রশ্ন করল, তুমি হঠাৎ...

পিসিমা চলে গেলেন কেন ?

একটু থেমে মুখ না তুলেই জবাব দিল, আর থাকা সম্ভব হল না বলে।

কেন ?

মুখ তুলে সুখেন্দু স্থির চোখে তাকাল। ওর ভিতরটাই দেখে নিতে চেষ্টা করল যেন। তারপর জবাব দিল, কেন সেটা আর তিনি মুখ ফুটে বলে যান নি।

আমাকে একটা খবর দিলে না কেন ?

রুদ্ধ ক্ষোভ সংবরণ করে সুখেন্দু ফিরে জিজ্ঞাসা করল, খবর দিলে কি হত ?

তিনি যেতে পারতেন না। কেন খবর দিলে না, এতটাই জব্দ করার জন্যে ?

জব্দ কিসের, খুশিই তো হওয়ার কথা। প্রচ্ছন্ন উষ্মায় বিদ্রূপের আভাস।

তার মানে ? অর্চনা নিষ্পলক চেয়ে আছে।

মানে তোমরাই জানো।

আমরা কারা ?

ঘাড় ফিরিয়ে সুখেন্দু আবারও তাকাল তার দিকে।—তোমরা, তুমি আর তোমার মা। ...অসহিষ্ণু হাতে কলমটা তুলে নিয়ে লেখার দিকে ঝুঁকল সে।

অর্চনা বেদনাহত, নিষ্পন্দ । অব্যক্ত ব্যথায় খানিক চেয়ে রইল তার দিকে । তারপর মাঝের দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে পাশের ঘরে চলে এলো । শয্যায় বসল । এ আঘাতের যেন সীমা-পরিসীমা নেই ।

দেয়ালের সেই পুরানো জায়গায় শাশুড়ীর ছবি । যাবার সময় মনে মনে আশা ছিল ফিরে এসে এই ছবি এখানেই দেখবে আবার । তাই দেখল । কিন্তু এরও আর যেন কোন সান্ত্বনা নেই । ছবি অনেক—অনেক দূরে সরে গেছে । সবই অনেক দূরে সরে গেছে ।

বসে আছে মূর্তির মত । ছবির দিকেই চেয়ে আছে ।

দুই চোখ-ভরা জল ।

॥ ৭ ॥

বরুণার বিয়ে ।

বিয়ে-বাড়ির আনন্দটা ঠিক কানায় কানায় ভরে ওঠে নি । অবশ্য আমন্ত্রিত অভ্যাগতজনেরা কেউ কিছু অনুভব করেন নি । বিজন আর ননিমাধবের সাড়ম্বর ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি নেই । সেদিক থেকে বিয়ে-বাড়ি সরগরম । আদর-অভ্যর্থনা, হাসি-খুশি, মাঙ্গলিক উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির ছড়াছড়ি ।

এরই তলায় তলায় শুধু বাড়ির মানুষ ক'টির মনে একটা চাপা অস্বস্তি ক্রমশ থিতিয়ে উঠেছে । এমন কি ঘর্মাক্তকলেবর দাশু পর্যন্ত সহস্র কাজের ফাঁকে গাছকোমর শাড়ি-জড়ানো কর্মব্যস্ত বড় দিদিমণিকে দেখে বিমনা একটু । ও সামনাসামনি হলে বিজনের মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ছে, মিসেস বাসু কলমুখর ব্যবস্থার মধ্যেও স্পষ্টই কিছু বলার ফাঁক খুঁজেছেন, আর ডক্টর বাসুও ওর দিকে চেয়েই অন্যমনস্ক হয়েছেন ।

বিয়ে-বাড়িতে এখনো একজনের দেখা নেই ।

সকলের সংশয়, হয়তো এর পর আর আসবেও না ।

অর্চনাই শুধু এখনো ভাবছে না যে আসবে না । ভাবতে পারছে না ।

পিসিমা যাবার পর থেকে এ পর্যন্ত একটা রাতও সে বাপের বাড়িতে থাকে নি । মায়ের ক্ষোভ, দাদা-বউদির অনুরোধ, বরুণার অভিমান, এমন কি বাবার অনুরোধ সত্ত্বেও না । শেষের এই ক'টা দিনও খুব সকালে এসেছে আর যত রাতই হোক ফিরে গেছে । আর সেই কারণে ঘরের মানুষটাকে ভিতরে ভিতরে সদয়ও মনে হয়েছে একটু। ওর এত পরিশ্রম আর ছোটাছুটি দেখে দিনতিনেক আগেও সে ওকে বলেছে, এই কটা দিন তুমি সেখানে থাকতে পার, আমার কোন অসুবিধে হবে না ।

অর্চনা নিরুত্তাপ জবাব দিয়েছে, আমার হবে ।

প্রগলভ সান্নিধ্যে এসে অর্চনা হয়তো অন্য কিছু বলতে পারত । আরো নরম, আরো বুকের কাছে টেনে নিয়ে আসার মতই কিছু । কিন্তু ইতিমধ্যে পিসিমার কাছে চিঠি লেখা, পিসিমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা বা ওর নিজের হরিদ্বারে যাওয়া নিয়ে আরো একাধিক রাত্রি নিঃশব্দে ওকে চোখের জল ফেলতে হয়েছে । সব-কটা আবেদনের বিকৃত প্রতিফলনে রূঢ় আঘাত পেয়েই ফিরে আসতে হয়েছে । সে-আঘাত আজও থেকে থেকে টনটনিয়ে ওঠে ।

দিনসাতেক আগে বাবা নিজে এসেছিলেন বড় জামাইয়ের কাছে । বলেছেন, সব দেখে-শুনে করে-কর্মে দিতে হবে, বলেছেন বাড়ির সকলেরই তো মাথা গরম—কাজের কাজ কারো দ্বারা হবে না ।

সব দেখে-শুনে করে-কর্মে দেবার জন্য যাবে, সুখেন্দু এমন কথা মুখে অবশ্য বলে নি । যায়ও নি । যাক, অর্চনাও মনে মনে চায় নি সেটা । মায়ের ভাবগতিক আর দাদার বড়লোকী কাণ্ডকারখানা জানে । এই লোকের এই মানসিক অবস্থায় আগের থেকে যাওয়া মানেই গোলযোগের সম্ভাবনায় পা বাড়ানো ।

তা বলে বিয়ের রাতেও আসবে না এমন সংশয় অর্চনার মনে রেখাপাতও করে নি । কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে দমেই যাচ্ছে । কাজের ফাঁকে ফাঁকে লোকজনের আনাগোনার দিকে সচকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে ।

কাঁচা ক্ষতর ওপর অতি নরম পালক বুলোলেও অসহ্য লাগে অনেক সময় । বড় জামাইয়ের খোঁজে ঘনিষ্ঠ অভ্যাগতদের স্বাভাবিক জিজ্ঞাসাবাদও বাড়ির মানুষদের সেই রকমই লেগেছে । ছোটখাটো উৎসব-অনুষ্ঠানে বা সামাজিক যোগাযোগে বড় জামাইটির সাক্ষাৎ কেউ বড় পায় নি বললেই চলে । অর্চনার বিয়ের পর অনেকেই হয়তো আর চোখেও দেখে নি তাকে। কাজেই এক বিয়েতে এসে ছোট জামাইয়ের প্রসঙ্গ থেকে বড় জামাইয়ের তত্ত্ব-তল্লাসটা অস্বাভাবিক কিছু নয় । অনেকে হয়তো কথায় কথায় নিছক সৌজন্যের খাতিরেই জিজ্ঞাসা করেছেন, বড় জামাই কোথায় বা বড় জামাইকে দেখলাম না— ! কিন্তু সেটুকুই বক্র কৌতূহলের মত লেগেছে বাড়ির লোকেদের । বিজনের চাপা রোষ, মায়ের তার দ্বিগুণ, এমন কি বাবাও বিব্রত একটু ।

সুস্থির বোধ করে নি অর্চনা নিজেও । একটু আগেই এক বান্ধবী সামনা-সামনি চড়াও করেছিল ওকে, কি রে অর্চনা, তোর বরকে দেখছি না...কই ?

অর্চনা হাসতে চেষ্টা করে ভ্রূকুটি করেছে—কেন, নিজেরটাতে পোষাচ্ছে না ?

বান্ধবী অনুযোগ করেছে—থাক্, খুব হয়েছে, দু-বছর ধরে তো এমন আগলে আছিস যে একটা দিনও দেখলাম না ভদ্রলোককে ।

অর্চনা বলেছে, তাহলে আর একটু ধৈর্য ধরে থাক্—এলেই দেখতে পাবি ।

তখনো ধারণা, আসবে ।

তারপর ইলা-মাসি জিজ্ঞাসা করেছে, ইলা-মাসির ছেলে মিন্টু খোঁজ করেছে, মাস্টারমশাই কোথায় ?

নিচে এসেছিল বরুণার জন্যে এক গেলাস সরবত নিতে । বউদি এসে চুপি চুপি জানাল, এ বড় বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে...সবাই সুখেনবাবুর খোঁজ করছে, তোমার দাদা তোমাকে একবার টেলিফোন করতে বলছিল ।

অর্চনা সরবত নিয়ে পাশ কাটাল । গম্ভীর মুখে বলে গেল, ইচ্ছে হয় তুমি কর গে—

বর এসেছে শুনে দোতলার মেয়েরা সব হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল । হাতের গেলাস বাঁচিয়ে অর্চনার উপরে উঠতেও কম সময় লাগল না । তাদের বর দেখার হিড়িকে কনে-সাজে বরুণা ঘরে একা বসে । দিদির মুখের ওপর চোখ রেখে সরবতের গেলাস হাতে

নিল । তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল—দিদি, জামাইবাবু এলো না রে ?

অর্চনা থমকে তাকাল একটু । তারপর অনুশাসনের সুরে বলল, তোমার নিজের ভাবনা ভাব এখন—ওদিকে এসে গেছে ।

দাঁড়াবার সময় নেই যেন, তাড়াতাড়ি বাইরে এলো । নিজের অজ্ঞাতেই বোধহয় বাবার ঘরের কাছাকাছি এসেছিল, সেইখানেও এই একজনের অনুপস্থিতির কারণে বাবা মায়ের বচসা কানে এলো...অর্চনা চুপচাপ সরে গেল । ডক্টর বাসু ঘরে এসেছিলেন আর একবার টেলিফোন করতে । টের পেয়ে মিসেস বাসু সেই নিরিবিলিতে এসে চড়াও হয়েছেন ।

তিনবার তো টেলিফোন করলাম, সাড়া না পেলে কি করব ?—ডক্টর বাসু বিরক্ত ।

সাড়া না দিলে সাড়া পাবে কি করে ! রাগে অপমানে মিসেস বাসু ক্ষিপ্ত ।—আমাদের মুখে চুন-কালি দেবার জন্যেই এ বিয়েতে সে আসছে না জেনে রাখো । কি লজ্জা, কি লজ্জা ! যার সঙ্গে দেখা হয় সে-ই জিজ্ঞাসা করে বড় জামাই কোথায় ? আমি আগেই জানতুম সে আসবে না—ওরা আজকাল একঘরে থাকে না পর্যন্ত সে খবর রাখো ?

খবরটা ডক্টর বাসু স্ত্রীর মুখেই আজ পর্যন্ত অনেকবার শুনেছেন । বললেন, এ সব কথা থাক এখন, ওদিকে ডাকাডাকি পড়ে গেছে ।

বিয়ের লগ্নও উপস্থিত একসময় । ছাদে বিয়ে । বাড়িসুদ্ধ লোক সেখানে ভিড় করেছে । এদিকটা ফাঁকা । অর্চনা পায়ে পায়ে বাবার ঘরে চলে এলো । আস্তে আস্তে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল নম্বর ডায়াল করল ।

টেলিফোন বেজে চলেছে । অর্চনার শান্ত প্রতীক্ষা । ওদিক থেকে রিসিভার তোলার শব্দ এলো কানে । কণ্ঠস্বরের অপেক্ষায় দাঁতে করে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল ।

কণ্ঠস্বর নয়, ওদিকে রিসিভারটা ঠক করে টেবিলে নামিয়ে রাখার শব্দ একটা । অর্চনা ফ্যাল ফ্যাল করে নিজের হাতের রিসিভারের দিকে চেয়ে রইল খানিক, আবারও কানে লাগাল ওটা । আর কোন সাড়াশব্দ নেই ।

রিসিভার যথাস্থানে নামিয়ে রেখে বাবার বিছানায় এসে বসল সে ।

কিছু একটা কাজেই হয়তো মিসেস বাসু ব্যস্তমুখে ঘরে ঢুকেছিলেন । মেয়েকে ও-ভাবে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ালেন । নীরব দৃষ্টি-বিনিময় । রুদ্ধ আক্রোশে যেন হিসহিসিয়ে উঠলেন তিনি, জামাই বলে একে আমি ছেড়ে দেব না, এ অপমানের কৈফিয়ত আমি নিয়ে ছাড়ব !

অর্চনা চেয়েই আছে ।

মিসেস বাসু কটূক্তি করে উঠলেন, আগে যদি জানতুম এত ছোট, এত নীচ—

মা !

মা থতমত খেয়ে থেমে গেলেন । অর্চনা তাঁর পাশ কাটিয়ে সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ।

অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা । বিয়ে হয়ে গেছে । বরকনেকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । হালফ্যাশানের বিয়ে, রাত দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে বিয়ে-বাড়ি অনেকটা হালকা । অর্চনা চুপচাপ নিচে নেমে এলো । ড্রাইভারকে ইশারায় ডেকে নিয়ে গাড়িতে উঠল । এত গাড়ি আসছে যাচ্ছে তখনো—কেউ লক্ষ্য করল না ।

দরজা খুলে সাবি বিস্ময় প্রকাশ করার আগেই অর্চনা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

বারান্দার দিকে দুটো ঘরের দরজাই আবজানো। দুই-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে অর্চনা নিজের ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে এসে দাঁড়াল। ঘরে আলো জ্বলছে। পাশের ঘরেও। টেবিলের ওপর চোখ পড়তেই স্তব্ধ রোষে সমস্ত মুখ কাগজের মত সাদা।

টেলিফোনের রিসিভারটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে তখনো।

মাঝের দরজার দিকে এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে রিসিভার তুলে রাখল। তার পর এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

সুখেন্দু ঈজিচেয়ারে বসে বই পড়ছে।

অর্চনার শিরায় শিরায় রক্তের বদলে আগুনের স্রোত। এক ঝটকায় তার হাত থেকে বইটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠল, আমি জানতে চাই এর অর্থ কি!

সুখেন্দু চমকেই উঠেছিল। চুপচাপ তার মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে উঠে মেঝে থেকে বইটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার এসে বসল।—কিসের অর্থ?

আমাকে এভাবে অপমান করার অর্থ কি?

অপমান কিসের...তোমাদের ও-বাড়িতে যে আমি যাব না এ তুমি জানতে না?

কেন? কেন যাবে না?—অর্চনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আবারও।

হাতের বইটা টেবিলে রেখে সুখেন্দু জবাব দিল, যাব না তার কারণ সেখানে গেলে তোমার মা যে-ভাব দেখান, যে-ব্যবহার করেন আর যে-উপদেশ দেন তাতে আমিও খানিকটা অপমান বোধ করি।

আমার মা উপদেশ দেবে না তো উপদেশ দেবে বাইরের লোক এসে?

উপদেশ হলে কিছু বলতাম না, তিনি অপমান করেন—তোমাদের ও-বাড়ি আমি বরদাস্ত করতে পারি নে।

তা পারবে কেন?...রাগে কাঁপছে অর্চনা, নিজের নেই বলে যাদের আছে হিংসেয় তাদের কাছেও ঘেঁষতে চাও না, কেমন?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সুখেন্দু রূঢ় কঠিন জবাব দিল, হিংসে করার মত তোমাদের কিছু নেই, সেটা জানলে এ কথা বলতে না। আমার বরদাস্ত করার থেকেও, তুমি আমার মত একজনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে কি-না সে কথাটাই তোমার আর তোমার বাবা-মায়ের আগে ভাবা উচিত ছিল।

কোন্ কথায় কোন্ কথা আসছে কারো হুঁশ নেই। আত্মসংবরণের চেষ্টায় অর্চনা টেবিলে একটা হাত রাখতে সেই বইটাই হাতে ঠেকল আবার। উষ্ণ ঠেলায় টেবিল থেকে পাঁচ হাত দূরে মাটিতে ছিটকে পড়ল ওটা। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, বাবা-মার কথা থাক, আমি নিজে সব দিক ভেবেই এ-বাড়িতে এসেছিলাম সেটা তুমি টের পাও নি? কিন্তু তুমি? আজ এত বড় অপমানের মধ্যে আমাকে ঠেলে দিতেও তোমার মায়া হয় নি! মানিয়ে চলার দায়িত্ব শুধু আমারই, তোমার নয়?

স্থির নেত্রে খানিক চেয়ে থেকে সুখেন্দু জবাব দিল, না। পিসিমাকে যেদিন তাড়াতে পেরেছ সে দায়িত্ব সেদিনই গেছে!

কি বললে।...অর্চনা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল প্রায়।

উত্তেজনা দমন করার জন্য সুখেন্দু উঠে মেঝে থেকে বইটাই কুড়িয়ে আনল আবার। অর্চনার দুই চোখে সাদা আগুন। অনুচ্চ স্বরে বলল, তুমি অতি ছোট অতি নীচ...! আর দাঁড়ানো সম্ভব হল না, এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে।

ভাঙার পর্ব শেষ।

সকল সংগতির মাঝখান দিয়ে ভবিতব্যের ছুরি চালানো শেষ।

যে-কোন তুচ্ছ উপলক্ষে শান্ত বিচ্ছিন্নতা সম্ভব এখন।

এর পরের তিন মাসে, একটা নয়, এমনি অনেকগুলো উপলক্ষের সূচনা। পাশা-পাশি দুটি ঘরের দিনাবসানের মাঝে নির্বাক চিত্রের মতই সেগুলির আনাগোনা। অর্চনা নির্বাক দ্রষ্টা।

...চা নিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছে, আর একজন বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নামছে। চায়ের সরঞ্জাম হাতে অর্চনা দেওয়ালের দিকে একটু ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। সুখেন্দু নেমে চলে গেছে। অর্চনা দাঁড়িয়ে দেখেছে। তারপর আস্তে আস্তে দোতলার বারান্দায় এসে দেয়ালের ধারে চায়ের সরঞ্জাম নামিয়ে রেখে নিজের ঘরে এসে বসেছে। ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে বুকের জামা ধরে ছদ্ম-অনুশাসনে এই একজনকেই ওপরে টেনে নিয়ে এসেছিল...। এই সেদিনের কথা, দু-বছরও নয়। কিন্তু বহুদিন যেন—বহু-দূরের কোন এক দিন।

...রাতে নিচের খাবারের টেবিলে দুজনের মুখোমুখি বসে আহারের যোগটুকুও বিচ্ছিন্ন। অর্চনা যথাসময়ে টেবিলে প্রতীক্ষা করেছে। সাবি এসে টেবিল থেকে সুখেন্দুর থালাবাটি সব তুলে নিয়ে গেছে।—দাদাবাবু ওপরে খাবেন, দিয়ে আসতে বলেছেন —নিয়ে গেছে। অর্চনা চেয়ে চেয়ে দেখেছে। সে-দিন অন্তত ওর খাওয়া হয় নি। উঠে চুপচাপ নিজের ঘরের খাটের কোণে এসে বসেছে। ও-ঘরের আহার সমাধা হল টের পেয়েছে—তারপর ঈজিচেয়ারে বসে রাতের পাঠে মগ্ন। আলো নিবেছে এক সময়।...গাত্রোত্থান, শয্যাশ্রয়, ঘুম। এ-ঘরের আলো জ্বলছে। মাঝের দরজা দিয়ে সেই আলোর খানিকটা ও-ঘরে গিয়ে পড়েছে। সেই আলোর ওপর ছায়া পড়েছে একটা। মাঝের দরজায় অর্চনা এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই আছে। ও-ঘরে সুপ্তির ব্যাঘাত ঘটে নি।

...খাটে অর্চনা বসে নিষ্প্রাণ মূর্তির মত, তার সামনেই একটা চেয়ারে বিজন বসে। সে-ও বিস্মিত, কিছুটা বিভ্রান্ত। কলেজ থেকে সুখেন টেলিফোনে বিজনকে জানিয়েছে, শিগগিবই সে এক মাসের জন্য বাইরে যাচ্ছে, কেউ এসে যেন অর্চনাকে নিয়ে যায়। বিজন নিতে এসেছে। অথচ অর্চনা কিছুই জানে না। তাই বিস্ময়, সেই সঙ্গে অস্বস্তি। এ-বাড়ির বাতাসের গতি তারাও উপলব্ধি করতে পারে। মা হাল ছাড়তে বাবা নিজেই হাল ধরতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অর্চনাই জামাইয়ের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ঘটতে দেয় নি তাঁর। নীরবে মাথা নেড়ে বাধা দিয়েছে। অস্বস্তি চেপে বিজন বসে থাকতে পারে নি বেশিক্ষণ, বলে গেছে, সুখেন্দু চলে গেলেই না হয় এসে তাকে নিয়ে যাবে। অর্চনা জবাব দেয় নি। কখন উঠে চলে গেছে তাও হুঁশ নেই।

উপলক্ষগুলি এই রকমের।

এমনি আরো দুটি ঘটনার পর উপলক্ষেরও প্রয়োজন থাকল না আর । একটা রাতের ঘটনা, অন্যটা দিনের ।

ঘরের আলো নিবিয়ে সুখেন্দু শুয়ে পড়তেই মাঝের দরজা দিয়ে ও-ঘরের আলোর ঝলক তার অন্ধকার শয্যার কাছাকাছি এসে থেমে আছে । বিছানায় গা ঠেকালেই ঘুম হয়, তবু কি জানি কেন সেদিন ওই আলোটুকুই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল এবং বিরক্তির কারণ হয়ে উঠল । শেষে একসময় উঠে এসে সরাসরি দরজাটা বন্ধ করে দিল ।

অর্চনা জানলার কাছে রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল । কিছুই দেখছিল না, এমনিই দাঁড়িয়েছিল । শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখে, মাঝের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল । নিজের অগোচরে দুই-এক পা সরে এলো । নিশ্চল তারপর ।...পাকাপাকি ব্যবধান রচনা, পাকাপোক্ত জবাব । দরজা বন্ধ হতে ঘরের আলোটা জোরালো লাগছে, হলদে, দরজাটা চকচক করছে । একটা অশুভ ইঙ্গিত চকচকিয়ে উঠছে যেন ।

অর্চনা আলোটা নিবিয়ে দিল ।

পরদিন ।

অর্চনা তখন নিচে স্নানের ঘরে ।

মেঝেতে উবুড় হয়ে সুখেন্দু মায়ের সাবেকী আমলের বড় ট্রাঙ্কটা খুলে বসেছিল । ট্রাঙ্কটা তার এই ঘরেই । গরম জামা-কাপড় সব ওতেই থাকে । বাইরে বেরুতে হলে যা-যা নেবে বার করে রোদে দিয়ে ঠিকঠাক করে রাখা দরকার । তাছাড়া কি আছে না আছে তাও স্মরণ নেই ।

তার পিছনে সাবি দাঁড়িয়েছিল । একটু অপেক্ষা করে সে যে চলে গেছে সুখেন্দুর খেয়াল নেই । মেঝেয় চাবির গোছাটা একটু জোরেই পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, এটা রেখে এসো— ।

চাবিটা সড়সড় করে টেবিলের নিচে গিয়ে থামল । যা-যা বার করেছিল একবার পরীক্ষা করে সুখেন্দু সেগুলো নিয়ে ছাতে উঠে গেল । সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁটা হাতে হরিয়া ঘরে ঢুকেছে । দাদাবাবু দু-দশ মিনিটের জন্য ঘর থেকে না বেরুলে ঘর ঝাঁট দেবার অবকাশ হয় না । এই কাজটুকু সারবার জন্য সকালের মধ্যে অনেকবারই ফিরে যেতে হয় আর সুযোগের প্রতীক্ষা করতে হয় ।

টেবিলের নিচে চাবিটা চোখে পড়ল । হরিয়া ওটা তুলে সামনের দেয়ালতাকের কোণে রেখে দিয়ে গেল ।

অর্চনার সেই চাবির খোঁজ পড়ল দুপুরে খেতে নামার আগে । রোজই খেতে যাবার আগে চাবি নিয়ে নামে । আসার সময় ভাঁড়ার রান্নাঘর সব বন্ধ করে আসে ।

বিছানা উল্টে-পাল্টে অর্চনা চাবি খুঁজছে । অবাক একটু ।

এদিকে দেরি দেখে সাবি তাড়া দিতে এসে জিজ্ঞাসা করল কি খুঁজছ, চাবি ?

কিছু না বলে অর্চনা শুধু তাকাল তার দিকে ।

সাবি জানাল, বউমণি ঘরে ছিল না বলে দাদাবাবু বিছানার নিচে থেকে চাবিটা তাকেই এনে দিতে বলেছিল । চাবি দাদাবাবুর কাছেই ।

অর্চনার মুখের দিকে চেয়ে সাবি যে-জন্যে এসেছিল তা আর বলা হল না, পায়ে পায়ে

**প্রস্থান করল। অর্চনা খাটের বাজু ধরে আস্তে আস্তে বিছানায় বসে পড়ল। নির্বাক, অনুভূতিশূন্য।...শুধু এটুকুই বাকি ছিল। এইটুকুই শুধু বাকি ছিল। মাঝের দরজার দিকে চোখ গেল।**

দরজা বন্ধ।

বিকেল থেকেই আকাশের রঙ অন্যরকম। সূর্যাস্তসীমার ওধারে কালো মেঘের ভিড়। একটার সঙ্গে আর একটা জুড়েছে, আর একটার সঙ্গে আর একটা। ছেঁড়া ত্বকের মত মেঘের গা-ছেঁড়া দগদগে লাল আলো। বিকল শেষ হতে না হতে পাটকিলে রঙের অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

অর্চনা উঠল এক সময়। আলো জ্বালল।

ও-ঘরের আলো জ্বলতে সে এসেছে টের পেল। আবার বেরুলো, তাও। ঘণ্টা দুই বাদে ফিরে আসাটাও। সাবি যথারীতি রাতের খাবার রেখে এ-ঘরে এলো তাগিদ দিতে দুপুরেও খাওয়া হয় নি বউমণির, তাই রাত্রিতে আর ভাত ঢেকে রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না সে। অর্চনা জানলার কাছ থেকে একবার ফিরে তাকিয়েছে শুধু। একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি চেপে সাবি ফিরে গেছে।

দূরে দূরে ক্ষীণদ্যুতি তারাগুলোর অসময়ে ঘরে ফেরার তাড়া। টুপটাপ করে একটার পর একটা নিবেছে। মেঘের পাঁয়তাড়া চলছে সেই থেকে। টিপটিপ দুই এক ফোঁটা পড়ছে কখনো-সখনো। বর্ষণের নাম নেই, ভ্রূকুটি বেশি।

রাস্তার লোক-চলাচল কমে আসছে।

টেবিলের টাইমপীস ঘড়িটায় রাত দশটা বাজে।

সুখেন্দু ঈজিচেয়ারে শুয়ে নিবিষ্ট মনে বই পড়ছে। শান্ত মুখে অর্চনা বারান্দা দিয়ে তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বাইরে থেকেই দু-চার মুহূর্ত দেখল। তারপর ঘরে ঢুকে পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

বই নামাও। কথা আছে!

সুখেন্দু বই নামাল, তাকাল।

খুব শান্ত কণ্ঠে অর্চনা বলল, বিয়ের পর থেকে আমাদের বনিবনা হল না, সেটা বোধহয় আর বলে দিতে হবে না?

একটু থেমে নিস্পৃহ জবাব দিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

অর্চনার দুই চোখ তার মুখের ওপর সংঘবদ্ধ।—তাহলে চিরকাল এভাবে চলতে পারে না বোধহয়?

সুখেন্দু নিরুত্তর। চেয়ে আছে।

অর্চনার মুখের একটা শিরাও কাঁপছে না। কণ্ঠস্বর আরো ঠাণ্ডা, আরো নরম। বলল, আমাদের তাহলে ছাড়াছাড়ি হওয়াই ভাল, কেমন?

সুখেন্দুর মুখে চকিত রুক্ষ ছায়া পড়ল একটা। তারপর স্থির সে-ও।—কি করে?

অর্চনা তেমনি শান্তমুখে বলল, আইনে যেমন করে হয়।

আত্মস্থ হবার জন্য সুখেন্দু হাতের বইখানা টেবিলে রাখল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরে পায়চারি করল একবার। ভাবল কিছুক্ষণ।

অর্চনা জবাবের প্রতীক্ষা করছে ।

সুখেন্দু জবাব দিল । বলল, যদি চাও আমার দিক থেকে কোন বাধা আসবে না ।

আর একটুও অপেক্ষা না করে ধীর শিথিল পায়ে অর্চনা এ-ঘরে চলে এলো । টেবিলের সামনের চেয়ারটাতে বসল । ভাবলেশহীন পাথরের মূর্তি ।

বেশিক্ষণ বসে থাকা গেল না । উঠল । আস্তে আস্তে আবার ওই জানলার কাছেই দাঁড়াল ।

দাঁড়িয়ে আছে ।

রাত বাড়ছে । নিচের রাস্তাটা নিঝুম । অবসানের মুহূর্তগুলি শূন্যতার মন্ত্রে নিটোল ভরাট হয়ে উঠল ক্রমশ ।

স্তব্ধতায় ছেদ পড়তে লাগল । বাতাস দিয়েছে । বিকেল থেকে আকাশের যে সাজ-সরঞ্জাম শুরু হয়েছিল সেখানে তাড়া পড়েছে । অর্চনার হুঁশ নেই । ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তেমনি । খোলা চুল উড়ছে । শাড়ির আঁচলের অর্ধেক মাটিতে লুটিয়েছে ।

বাতাসের জোর বাড়তে লাগল । মেঘে মেঘে বিদ্যুতের চলাফেরা, বাতাসে ঝড়ের সংকেত । অদূরে গাছ দুটোর সড়সড় মাতামাতি । লাইট পোস্টের আলোগুলো দস্যুকবলিত মেয়ের মত বিড়ম্বিত, নিষ্প্রভ ।

ঝোড়ো বাতাসে আর বৃষ্টির ঝাপটায় অর্চনার সম্বিৎ ফিরল ।

জানলা বন্ধ করে শাড়ির আঁচল গায়ে জড়াল । দু চোখ মাঝের বন্ধ দরজা থেকে ফিরে এলো । টেবিলের টাইমপীস ঘড়িতে রাত্রি একটা ! পায়ে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলো সে । সুখেন্দুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল আবার ! ঘরে আলো জ্বলছে ।

বই-কোলে ঈজিচেয়ারে শুয়ে সুখেন্দু অঘোরে ঘুমুচ্ছে । ঘরের খোলা জানলা দিয়ে ঝড়জলের ঝাপটা আসছে । অর্চনা ঘরে ঢুকে জানলা বন্ধ করল । ফিরে আসার মুখে ঈজিচেয়ারের সামনে দাঁড়াল একটু । দেখল চেয়ে চেয়ে । তারপর বিছানা থেকে পাতলা চাদরটা তুলে নিয়ে তার গায়ে ঢেকে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ।

॥ ৮ ॥

দু পক্ষের অনুমোদনের ফলে যা ঘটবার সহজেই ঘটে গেছে ।

বিচ্ছেদের পরোয়ানা বেরিয়েছে ।

বাপের বাড়ির আবহাওয়া রীতিমত গরম সেদিন । বাড়িতে যেন সাড়া পড়ে গেছে একটা । বিজনের উত্তেজনা, বরুণার উত্তেজনা, মায়ের উত্তেজনা । বিজন পারলে তক্ষুনি আর একটা বিয়ে দিয়ে দেয় অর্চনার । হাতের কাছে তেমন পাত্র মজুত নেই নাকি ?

আছে সকলেই জানে । এমন একটা দিনে ননিমাধবও এসেছে । তার ফর্সা মুখখানি একটু বেশি লাল হয়েছে, পকেট থেকে ঘন ঘন রুমাল বেরিয়েছে । ওদিকে শুভার্থী আত্মীয়-পরিজনও কেউ কেউ এসেছেন । আজকালকার দিনে এটা যে এমন কিছু ব্যাপার নয়, বার বার সে-কথাই ঘোষণা করে গেছেন তাঁরা ।

অর্চনা তার নিজের ঘরে । বিয়ের আগে যে-ঘরে থাকত । নিচের জটলায় তারও

নিঃসঙ্কোচ উপস্থিতি সকলের কাম্য ছিল । বিশেষ করে মায়ের আর দাদার । যার জন্য এত বড় গুরুভার লাঘব করার চেষ্টা, সে একপাশে সরে থাকলে নিষ্পত্তিটা খুব সহজ মনে হয় না ।

আর অনুপস্থিত বাড়ির কর্তা ডক্টর বাসু । অবশ্য এ-সভায় তিনি অবাঞ্ছিতও বটেন । তাঁর অনমোদন ছিল না সেটা সকলেই জানত । কিন্তু আজ আর তাঁকে আমল দিচ্ছে কে, হুট করে এমন একটা বিয়ে দিয়ে বসেছিলেন বলেই তো এ-রকমটা ঘটল । নিজের ঘরে বসে স্তব্ধ বিষণ্ণতায় চুরুট টানছেন । ইদানীং ঘন ঘন চুরুট ফুরোচ্ছে । দাশুকে পাঠিয়েছেন বাক্স ভরে চুরুট কিনে নিয়ে আসতে ।

তিনি না এলেও মিসেস বাসু অব্যাহতি দেন নি । তাঁর কাছে এসে থেকে থেকে জ্বলে উঠেছেন, সেই অমানুষ লোকটার বিরুদ্ধে, যে একটা দিন শান্তিতে থাকতে দেয় নি তাঁর মেয়েকে—এবারে হাড় জুড়োবে । সমর্থন না পেয়ে স্বামীর ওপরেই আগুন ।—যত কিছুর মূলে তুমি, তুমি তো চুপ করে থাকবেই এখন !

ডক্টর বাসু তারপরেও চুপ করে থাকেন নি । গম্ভীর আদেশের স্বরে বলেছেন, তুমি দয়া করে যাবে এখান থেকে ?

মিসেস বাসু হকচকিয়ে গেছেন । এ-ধরনের কণ্ঠস্বর বড় শোনেন নি । মুখে যতই বলুন, মেয়ের জন্য দুর্ভাবনায় ভিতরে ভিতরে মায়ের মন শুকিয়েছিল বটেই । অসহায় ক্ষোভে সেটুকুই প্রকাশ হয়ে গেছে !—ও...আমাকে বুঝি এখন তোমার সহ্য হচ্ছে না ! কোথা থেকে একটা অপদার্থ অমানুষ ধরে এনে সংসারটাকে একেবারে তছনছ করে দিলে, অপমানে অপমানে মেয়েটার হাড় কালি—তার দিকে একবারও চেয়ে দেখেছ তুমি ?

নারীর বল চোখের জল । কান্নার বেগ সামলাবার জন্যে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন ।

বাড়ির মধ্যে সেদিন বিমর্ষ দেখা গেছে আর একজনকে । দাশু । বাক্সভরা চুরুটের গোটাকতক অন্তত তার পকেটেই থাকার কথা । কিন্তু খেয়াল ছিল না । দিদিমণির ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গতি তার আপনি মন্থর হয়েছে ।...জানলার দিকে মুখ করে বসে আছে, বাইরে থেকে সে-মুখের আভাস দেখা যায় শুধু । চুরুটের বাক্সটার দিকে চেয়ে আর-একদিনের স্মৃতি তার মনে পড়েছে । বড় মিষ্টি স্মৃতি । সেদিনের পাওয়ার আনন্দে দিদিমণি নিজের হাতে ওর পকেটে একটা চুরুট গুঁজে দিয়েছিল ।

নিচের ঘরে বরুণার উত্তেজনা এবং আক্রোশ দুই-ই স্বতঃস্ফূর্ত । বার বার বলেছে —ঠিক হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে, যেমন লোক তেমন শিক্ষা হয়েছে । তার দিদিকে হেনস্থা করেছে যে লোকটা তার কত বড় শিক্ষা হল সেটা ভেবে ডগমগিয়ে উঠছে থেকে থেকে । বিজনকে জিজ্ঞাসা করেছে—আচ্ছা দাদা, খবরটা কাগজে বেরুবে ?

অদূরে বসে তার স্বামী বেচারা যে ওর আনন্দ-মিশ্রিত উত্তেজনাটুকু করুণ নেত্রে লক্ষ্য করছে, সেদিকে খেয়াল নেই ।

স্বামীর কাছে অশ্রুবর্ষণ করতে হলেও ছেলের কাছে সত্যিকারের সান্ত্বনা পেয়েছেন মিসেস বাসু । বিজন বলেছে—অত মুষড়ে পড়লে চলে, এ-রকম তো আজকাল হামেশাই হচ্ছে ! এই তো কোর্টে দেখে এলে তিন হাজার ঝুলছে এই কেস, তারা কি সব চোখে

অন্ধকার দেখছে ?

ভরসার অঙ্কটার ওপরেই জোর করে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন রাণু দেবী।—তিন হাজার !

কম করে। তোমরা তো তবু চট করেই রেহাই পেয়ে গেলে—যা হবার হয়ে গেল, ভালই হল। তারপর আভাসে ইঙ্গিতে বিজন আশ্বস্ত করেছে মাকে। বলেছে, আইনের কড়াকড়ির সময়টা পেরুলেই এমন বিয়ে দেবে অর্চনার যাতে গায়ে আর আঁচটি না লাগে সারা জীবনে।

এত বড় আশ্বাসের পাত্রটি কে তাও সকলেই জানে।

দিন কাটতে লাগল।

এর মধ্যে দুটি পরিবর্তন হয়েছে। এক, বাসা-বদল। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বিপরীত এলাকায় বিজন বড় বাড়ি ভাড়া করেছে। নিজেদের বাড়ি না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের বাসনা। তাছাড়া পূর্বস্মৃতির কাছাকাছির মধ্যে না থাকাই বাঞ্ছনীয়, নতুন পরিবেশে অর্চনারও কিছুটা পরিবর্তন সম্ভব।

দ্বিতীয়, অর্চনা আবার এম. এ. পড়া শুরু করেছে।

দিন যায়। অর্চনার মনে হত, কি করছে সেই মানুষটা, মনে মনে কেমন জ্বলছে, জানতে পেলে হত। জানার উপায় নেই বলেই নিজে জ্বলত। জীবন থেকে যাকে ধুয়ে মুছে ফেলেছে, মন থেকে তাকে বিদায় দেওয়াটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না বলেই আরো জ্বালা। পার্টি ভাল লাগে না, ক্লাব না, থিয়েটার না। বই পড়ে। দিনরাত্রির বেশির ভাগই বই নিয়ে কাটে। য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরি থেকে আসতেও বেশ রাত হয় এক-একদিন। কিন্তু বইও ভাল লাগে না সব সময়।

সকলেরই একটা চোখ আছে তার দিকে। কিন্তু বাড়ির মধ্যে যে একজনের সস্নেহ দৃষ্টি আর আহ্বানের আশায় ভিতরটা প্রতীক্ষাতুর সর্বদা, তিনি যেন চেনেনও না তাকে। তিনি বাবা। সামনাসামনি হলেও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যান। বিরক্তও হন। অর্চনা পারলে তাঁর সামনে আসে না। বাবা ঘরে না থাকলে সংগোপনে তাঁর ঘর গুছিয়ে রেখে তারপর একটা দুর্বহ বেদনা বুকে চেপে নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বসে থাকে।

বাবার উপেক্ষা মা অবশ্য দ্বিগুণ পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করে। নতুন বৈচিত্র্যের সন্ধানে মাঝে মাঝে কিছু একটা প্রোগ্রাম করে মেয়ের মত নিতে আসেন প্রায়ই। অর্চনা কখনো নিস্পৃহভাবে চুপ করে থাকে, আবার অকারণে ঝাঁঝিয়েও ওঠে এক-একদিন। ননিমাধবের সিনেমার টিকিট কেনা নিয়ে সেদিনও মায়ের সঙ্গে একপ্রস্থ হয়ে গেছে। অর্চনা সবে য়ুনিভার্সিটি থেকে ফিরেছিল। ননিমাধবের গাড়িটা প্রায়ই যেমন দাঁড়ানো দেখে, সেদিনও তেমনি দেখেছিল। নিজের ঘরে এসেই একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়েছিল সে।

মা ভিতরে ঢুকে প্রসন্ন মুখে সংবাদ দিয়েছেন, ননিমাধব সকলের জন্য সিনেমার টিকিট কেটে বসে আছে, তার জন্যেই সকলের প্রতীক্ষা এখন।

সকলের অর্থাৎ দাদা বউদি। অর্চনা মায়ের মুখের ওপর একটা শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বই হাতে আবার পাশ ফিরে শুয়েছে।

মা মনে মনে শঙ্কিত।—শুয়ে পড়লি যে, শরীর খারাপ হয় নি তো ?

না ।

ওঠ তাহলে, চট করে মুখ হাত ধুয়ে নে—আর সময় নেই ।

ওঁদের যেতে বলো ।

ওদের যেতে বলব...ননিমাধব যে চারখানা টিকিট কেটে এনেছে ।

বই রেখে অর্চনা আস্তে আস্তে উঠে বসেছে । মাকে নিরীক্ষণ করেছে একটু ! —আমার টিকিটে তুমিই যাও তাহলে ।

মিসেস বাসুর মেয়ের এই বুদ্ধি-বিবেচনার অভাবের সঙ্গেই যুঝতে হচ্ছে ক্রমাগত । বলেছেন, কি যে রঙ্গ করিস ভাল লাগে না, ওঠ—

ভাল আমারও লাগে না মা ।—অর্চনা চেষ্টা করেও খুব শান্ত থাকতে পারে নি, কতদিন তোমাকে নিষেধ করেছি তবু তুমি কেন এভাবে আমাকে বিরক্ত করো বলো তো ?

আমি তোকে বিরক্ত করি !—মা আকাশ থেকে পড়েছেন প্রথম । তারপর সখেদে প্রস্থান—আমারও হয়েছে যেমন জ্বালা তাই সবেতে আসি, তোর যা খুশি কর, আর কখনো যদি কিছু বলতে আসি—

কিন্তু আবারও বলতে না এসে পারেন নি তিনি । সরাসরি না বললেও চুপ করে থাকতে পারেন নি । ননিমাধবের কদর দিনে দিনে বাড়ছে । এলেই চা করে দেন, ভালমন্দ খবর নেন, কারণে-অকারণে অর্চনাকে ঘরে ডাকেন । বরুণা শ্বশুরবাড়িতে থাকে, আসে প্রায়ই, মায়ের সঙ্গে তার গোপন পরামর্শের আভাসও অর্চনা পায় একটু-আধটু । যে বরুণা ননিমাধবকে দেখলেই মুখ ভেঙচাত আর দিদিকে ঠাট্টা করত, সে-ও আজকাল ঠাট্টা দূরে থাক, কিছু একটা প্রত্যাশা নিয়েই ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে । পারলে একটু যেন তোয়াজ করেও চলে । আর, দাদা-বউদির কথাই নেই । ননিমাধবের মত এমন লোক তারা একজনের বেশি দুজন দেখেছে বলে মনে হয় না ।

দাদা বা মায়ের বিশেষ এক ধরনের ডাক শুনলেই অর্চনা বুঝতে পারে, ঘরে কেউ আর আছে, আর সে ননিমাধব ছাড়া এর কেউ নয় । ওর ভিতরের বিরক্তি বাইরে তেমন প্রকাশ পায় না । ডাকলে সাড়া দেয়, ঘরে আসে, কথা বলে । আর রুমালে মুখ ঘষতে-ঘষতে একখানা ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে তাও লক্ষ্য করে ।

অর্চনা আর বিয়ে করবে না এমন কথা কখনো বলে নি, এমন মনোভাবও কখনো প্রকাশ করেনি । সেই বিচ্ছেদের দিন থেকেই বলতে গেলে তার আবার বিয়ের কথা উঠেছিল । কিন্তু আইনগত বাধার আর সামাজিক চক্ষুলজ্জার খাতিরেই সম্ভবত প্রথম বছরটা কেউ সরাসরি এ-প্রস্তাব তোলে নি । তারপর তার ভাবগতিক দেখে কথাটা সামনা-সামনি তুলতে তেমন ভরসাও পেয়ে ওঠে নি কেউ । যেটুকু বলে, আভাসে ইঙ্গিতে । অর্চনা তার জবাবও দেয় না । সকলেই মনে মনে তখন তার এম. এ. পরীক্ষাটা শেষ হওয়ার প্রতীক্ষা করছে ।

সেই বহু প্রতীক্ষার এম. এ. পরীক্ষাও হয়ে গেল ।

ফল দেখে আনন্দে আটখানা সকলে । ননিমাধব সকালেই মস্ত এক ফুলের তোড়া এনে হাজির । মিসেস বাসু আনন্দে সেদিন তাকে সোজা অর্চনার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন । —তুমি তো ঘরের ছেলে, নিজের হাতেই দাও গে যাও ।

সিঁড়িতে রাণু বউদি আর একদফা চাঙ্গা করেছে তাকে। উৎফুল্ল ইশারায় ঘরে দেখিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ ঘরেই আছে, সরাসরি গিয়ে ঢুকে পড়ুন—

কিন্তু ঢুকে পড়ে অস্বস্তি অনুভব করেছে ননিমাধব। নিরাসক্ত মুখে পরীক্ষা পাসের কোন আনন্দ চোখে পড়ে নি। দোরগোড়া থেকে একটু নিরীক্ষণ করে ঢোঁক গিলে বলেছে, আসব ?

অর্চনা অন্যদিকে ফিরে ছিল। ফুলের তোড়া হাতে তাকে দেখে একটু থেমে বলেছে, আসুন—

ননিমাধব আরক্ত মুখে তোড়া এগিয়ে দিয়েছে।

ফুল হাতে নিয়ে অর্চনা খুশির ভাব দেখাতেও চেষ্টা করেছে একটু।...কি ব্যাপার—

সকালে উঠেই এম. এ-র রেজাল্ট দেখলাম—

ও...। অর্চনার মুখ হাসির মতই ! সহজভাবে বলল, এ পাবার মত এমন কিছু রেজাল্ট হয় নি।

ননিমাধবের সলজ্জ বিস্ময়ে, সে কি ! ফার্স্ট ক্লাস—

অর্চনা বলতে যাচ্ছিল, ফার্স্ট ক্লাস ফি-বছরই দুই-একজন পায়। কিন্তু রুমালের খোঁজে পকেটে হাত দেখে বলা হল না। ওদিকে উৎফুল্ল আনন্দে দিদিকে ডাকতে ডাকতে বরুণাও হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। ফুল এবং ননিমাধবকে দেখে যেমন খুশি তেমনি অপ্রস্তুত।

আপনি! আমি এসেছিলাম দিদিকে কংগ্র্যাচুলেট করতে—

ননিমাধব বলল, আমিও।

অর্চনা তাকের থেকে ফুলদানি এনে টেবিলে ফুলের তোড়া রাখছিল। বরুণা খুশি মুখে ননিমাধবকে আপ্যায়ন করল। টেবিল-সংলগ্ন চেয়ার আর বিছানা ছাড়া বসার আর জায়গা না দেখে ননিমাধব ইতস্তত করছিল।

বাইরে থেকে বিজনের ডাকাডাকিতে ছন্দপতন। সাড়া দিয়ে বিরসবদনে প্রস্থান করতে হল তাকে।

বরুণা হেসে ওঠার মুখেও সামলে নিল, দিদির গম্ভীর মুখের দিকে তাকালে হাসি আসে না। অর্চনা বিছানায় বসে তাকে ডাকল, বোস, তোর কি খবর ?

তার গা ঘেঁষে বসল বরুণা।—খবর তো আজ তোর, বা-ব্বা কি পড়াই পড়লি দুবছর ধরে।...তার আরো কাছে এসে উৎসুখ মুখে জিজ্ঞাসা করল, দিদি, বাবা খুশি হয়েছেন রেজাল্ট শুনে ?

কি জানি...

বরুণা থমকে তাকাল।

একটা উদ্গত অনুভূতি সামলে নিয়ে অর্চনা হাসল একটু। তারপর আস্তে আস্তে বলল, বাবা এই দু-বছরের মধ্যে একটা দিনও আমার সঙ্গে ডেকে কথা কন্ নি রে...।

বরুণা জানত। আজ বাবার ওপর রাগই হল তার। উঠে দাঁড়াতে গেল, তাই বুঝি, বাবাকে দেখাচ্ছি মজা—

অর্চনা হাত ধরে বসিয়েই রাখল তাকে, উঠতে দিল না। চুপচাপ দুজনেই। দুজনেরই

চোখ ছলছল ।

এর পর যত দিন যায়, অর্চনার বিয়ের চিন্তায় মনে মনে উদ্গ্রীব সকলে ! এম. এ. পাস করার পর ননিমাধবের হাজিরাও নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে । মায়ের গরজ বালাই । ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিবাহ-প্রসঙ্গটা তিনিই প্রথম উত্থাপন করলেন মেয়ের কাছে । করে, ধমক খেলেন । তারপর মায়ের তাড়নায় ভয়ে ভয়ে হাল ধরতে এলো বরুণা । এসে সে-ও ধমক খেল । সব শেষে বউদি । রঙ্গরস করে তিনি অগ্রসর হলেন, বলি ব্যাপারখানা কি ?

বসে কি একটা পড়ছিল অর্চনা । মুখ তুলে তাকাল ।

রোজ রোজ ভদ্রলোক এসে বসে থাকেন, দেখে মায়াও হয় না একটু ?

অর্চনা তেমনি চেয়ে আছে । একটু বাদে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, কি করতে বলো ?

অস্বস্তি চেপে বউদি একটু জোর দিয়েই বলল, বিয়েটা করে ফেললেই তো চুকে যায় !

ভিতরে ভিতরে তেতে উঠলেও সেটুকু প্রকাশ পেল না ।—বিয়ে করব কোনদিন তোমাদের বলেছি ?

বলছ না বলেই তো ভাবনা—

তোমরা এই ভাবনা টাবনাগুলো বাদ দিয়ে চললে আমার এখানে থাকাটা একটু সহজ হয় বউদি ।

গম্ভীর মুখে আবার বই টেনে নিল সে । বউদি পালিয়ে বাঁচল ।

বই রেখে অর্চনা জানলার কাছে এসে দাঁড়াল । পড়াশুনো নিয়ে ছিল ভাল । এই ঢালা অবকাশ দুর্বহ । স্মৃতিপথে যারা ভিড় করে আসে দুহাতে তাদের ঠেলে সরিয়ে রাখার চেষ্টায় ভিতরে ভিতরে ক্লান্ত সে । প্রতিটি দণ্ড পল মুহূর্ত ভারি বোঝার মত ।

রাস্তায় দুটো মেয়ে পুরুষ গান গেয়ে ভিক্ষা করছে । পুরুষের গলায় সস্তা একটা হারমোনিয়াম ঝোলানো, মেয়েটি কাঁধের দুদিকে দু-পা ঝুলিয়ে বসে একটা কচি বাচ্চা । হালকা গান । এই দুনিয়ায় নারী-পুরুষের অনাবিল বিনিময় গানের বিষয়বস্তু ! অনেকে শুনছে, কেউ কেউ পয়সা দিচ্ছে । অর্চনা নির্নিমেষে দেখছে । জীবন ধারণের একটা যৌথ প্রচেষ্টা দেখছে । মেয়েটার কাঁধের শিশুটিকে দেখছে ।

অর্চনার সর্বাঙ্গে কিসের শিহরণ । চেষ্টা করেও পারছে না অন্যমনস্ক হতে । ঝাপসা চোখের সামনে একটা অয়েল পেন্টিং ছবি এসে পড়ছে বার বার । সেই ছবিতে নারীর আকৃতি । অব্যক্ত নীরবতায় সেই নারী যেন ওরই প্রতীক্ষা করে ছিল, ওর কাছেই কিছু চেয়েছিল । সেই চাওয়ার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বসে ছিল আর একটি বৃদ্ধা বিধবা ।...আর তারা চাইবে না । তাদের চাওয়া শেষ ।

অর্চনা জানলা থেকে সরে এলো । ভিতরটা ধড়ফড় করছে কেমন ।

অব্যক্ত যাতনায় মন থেকে সবকিছু আবার ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল সে । আবার পড়বে । যা-হোক একটা বিষয় নিয়ে আবারও পড়ানো শুরু করবে ।

সঙ্কল্পটা টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোকের দ্বিগুণ ভাবনা । বিশেষ করে মায়ের আর বিজনের । এখনই একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার । পড়াশুনায় এগিয়ে গেলে আবারও দু বছরের ধাক্কা । এম. এ. পাশ করেছে তার সাত-আট মাস হয়ে গেল ।

অর্চনা জানে, ননিমাধবের সঙ্গে তার বিয়েটা সম্পন্ন করার পিছনে দাদারই আগ্রহ

আপাতত সব থেকে বেশি। শুধু বন্ধু নয়, এতবড় এক উঠতি ব্যবসায়ের অর্ধেক অংশীদার। তাকে আত্মীয়তার মধ্যে এনে ফেলতে পারলে ষোল-আনা নিশ্চিন্ত।

রাত্রিতে সেদিন দাদার ঘরে ডাক পড়তে অর্চনা এসে দেখে, ঘরে শুধু মা আর দাদা বসে। সঙ্গে সঙ্গে কেন ডাকা হয়েছে অনুমান করতে দেরি হল না।

বিজন মোলায়েম করে বলল, বোস, কি করছিলি ?

কিছু না।...বিছানার একধারে মা বসে, অন্য ধারে সে-ও বসল।

বিজন জিজ্ঞাসা করল, তুই আবার কি নিয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করছিস শুনলাম ?

অর্চনা জবাব দিল না। দোরগোড়ায় ডক্টর বাসু এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর দিকেই চোখ গেল সকলের। একবার দেখে নিয়ে তিনি দরজার কাছে থেকে সরে গেলেন। বিজন ভণিতা বাদ দিয়ে সোজা আসল বক্তব্য উত্থাপন করল।—এম. এ. পাস তো হয়েই গেছে, আবার পড়াশুনো কিসের—তাছাড়া, তুই এভাবে থাকবি কেন, আমি তো কিছু বুঝি না।

অর্চনা দাদার চোখে চোখ রাখল।—তোমার কি ইচ্ছে ?

মিসেস বাসু নীরবে ছেলের দিকে তাকালেন। বিজন আমতা-আমতা করে বলল, আমার ইচ্ছে, আমার কেন—আমার, মার, তোর বউদির, সকলেরই ইচ্ছে, হাতের কাছে এমন একটি ছেলে—

কিভাবে বলে উঠবে কথাটা ঠিক করতে না পেরে থমকাল একটু। মিসেস.বাসু সঙ্গে সঙ্গে পরিপূরক সুলভ মন্তব্য করলেন, হীরের টুকরো ছেলে...

অর্চনা অপলক চোখে বিজনের দিকেই চেয়ে ছিল।—এই জন্যে ডেকেছ ?

ভাবগতিক দেখে বিজন মনে মনে ঘাবড়েছে। আরো মিষ্টি করে বলল, হ্যাঁ, কথাটা তো ভেবে দেখা দরকার—

দরকার দেখতেই পাচ্ছি ! তোমার স্বার্থটা কোথায় আমি জানি দাদা, কিন্তু—স্থির কঠিন চোখে মায়ের দিকে ফিরল সে।

মিসেস বাসু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, এ আবার কি কথা ! আমরা তো তোর ভালর জন্যেই বলছি—

সঙ্গে সঙ্গে অর্চনা জ্বলে উঠল যেন। এতদিনের ধৈর্যের প্রয়াস এক মুহূর্তে তছনছ হয়ে গেল।—ভালর জন্যে বলছ, আমার ভালর জন্যে—না মা ?...মুখে চোখে নির্মম বিদ্রূপ। আমার শুধু ঘরে ঘরে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় তোমার মত ক'জন মা ক'টি মেয়ের এত ভাল করছে !...আরো তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সে, কিন্তু কেন ? কেন এত ভাল করতে চাও তোমরা ? কেন ভাল করার এত মোহ তোমাদের ? তোমাদের ভাল করার এই নিষ্ঠুর লোভে জ্বলে পুড়ে সব শেষ হয়ে গেল মা।

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। অন্য দুজন চিত্রার্পিত। প্রাণপণ চেষ্টায় অর্চনা সামলে নিল একটু। আস্তে আস্তে দাঁড়াল।—কিছু মনে করো না মা, আমার ভাল তোমরা অনেক করেছ...দোহাই তোমাদের, আর ভাল করতে চেয়ো না।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অদূরের রেলিঙের কাছে স্তব্ধ মূর্তির মত আরো কেউ দাঁড়িয়ে, চোখে পড়ল না। নিজের ঘরে এসে শয্যায় মুখ ঢাকল সে।

পায়ে পায়ে রেলিং ছেড়ে ওর দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল ডক্টর বাসু। দেখলেন। ভিতরে এসে বিছানার এক পাশে বসলেন। তারপর আস্তে আস্তে একখানা হাত রাখলেন মেয়ের পিঠের ওপর।

অর্চনা মুখ তুলল। গাল বেয়ে অঝোরে ধারা নেমেছে। নিঃশব্দ দৃষ্টিবিনিময়। দুই হাতে তাঁকে আঁকড়ে ধরে অর্চনা ছোট মেয়ের মত বাবার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজল এবার।

ডক্টর বাসু গভীর মমতায় মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

দু-চোখ তাঁরও চিক চিক করছে।

দিন যায়। বছর ঘুরে আসে আরো একটা।

মা বলতে গেলে একরকম তফাতেই সরে আছেন। আর কারো কোন ভাল-মন্দে নেই যেন তিনি। দাদাও চুপচাপ, নির্লিপ্ত। শুধু বাবার ঘরেই আগের মত ডাক পড়ে অর্চনার। আগের মত নয়, আগের থেকেও বেশি। আলোচনার ঝোঁকে এক-একদিন সব দুর্ভাবনা সত্যিই ভোলেন তিনি।

কিন্তু অর্চনা ভিতরে ভিতরে হাঁপিয়েই উঠছে। বিষয়ান্তরে প্রাইভেটে এম. এ. পরীক্ষা দেবে আবার, ঠিক করেও পড়াশুনা বলতে গেলে এগোয় নি। এক-একসময়ে ভাবে, চাকরি-বাকরি নিয়ে কোথাও চলে যাবে। এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার দরুন চাকরি সহজেই জুটতে পারে। কিন্তু তাতেও উৎসাহ নেই খুব। তার ওপর কোথাও দরখাস্ত করেছে দেখলে বাবাই প্রকারান্তরে বাধা দেন বলেন, করবি'খন চাকরি, এত তাড়া কিসের, চাকরি না করলেও তোর কোন ভাবনা নেই।

নেই বলেই এমন ক্লান্তিকর শূন্যতা। কোন কিছুর জন্যেই আর ভাবনা নেই তার। সব ভাবনা চুকিয়ে বসে আছে। এমন ভাবনাশূন্যতার মধ্যে নিজের অস্তিত্বটাই দুর্বহ বোঝার মত মনে হয়। বাড়িতেও আর অশান্তির কারণ নেই কিছু, গৃহকর্তার নিষেধ আছে কেউ যেন ওকে উত্ত্যক্ত না করে। দাদার সামনে মায়ের মুখের ওপর সেই মর্মান্তিক জ্বালা প্রকাশ করে ফেলে অর্চনা নিজেই অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে। মনে মনে অনুতাপ হয়েছে !...নিজেরই ভাগ্য, দোষ কাকে দেবে।

একটানা অবকাশে আর একজনের কথাও মাঝে মাঝে ভাবে। জীবনের সঙ্গী হিসাবে যাকে কখনো কল্পনাও করতে পারে নি, সেই একজনের কথা। ননিমাধব—। এখনো আসে। দাদা আর মায়ের মুখ চেয়েই বুঝতে পারে বোধহয় একটু কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। তবু আসে।...তার এই নীরব প্রতীক্ষা যাতনার মত বেঁধে। ইচ্ছে করলেই ভাল বিয়ে করতে পারে, সুখি হতে পারে। কিন্তু সেটা তাকে বুঝিয়ে বলে কে। অর্চনা ভাবে, সম্ভব হলে ও নিজেই একদিন বলবে। ননিমাধব এলে ওকে আর ডাকাডাকি করে ঘরে আনতে হয় না। নিজে থেকেই এসে বসে এক-একদিন। দু-পাঁচটা সাধারণ কথাও বলতে চেষ্টা করে, চা করে দেয়।

কিন্তু ওইটুকুই যে-ভাবে নাড়া দেয় ভদ্রলোককে, দেখে সব সময় আবার সামনে যেতেও ইচ্ছে করে না। তার চোখে মুখে প্রত্যাশার আলো দেখে থমকে যায়। অর্চনা দিনকতকের মত নিজেকে গুটিয়ে ফেলে আবার।

কিই বা করতে পারে এছাড়া। ওর জীবন বাস্তবে, যৌবন-বাস্তবে দস্যুর মতই আবির্ভাব যার তার আনন্দ বিষাদ হিংসা ক্রোধ সবই পুরুষের। সেই পুরুষ ছিনিয়ে নিতে জানে। নিয়েছেও। ওখানেই নিঃশেষে সর্বসমর্পণ ও বিধিলিপি।...আজও সেটুকু গোপন স্মৃতির মতই। ও-যে কিছুই আর হাতে রেখে বসে নেই। এই রিক্ততা নিয়ে নতুন করে আবার একজনের সঙ্গে আপস হবে কেমন করে!

এক বছরে মানুষ অতি বড় বিপর্যয়ও ভোলে, মায়ের আর দাদার রাগ বা অভিমান ভোলাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাছাড়া অর্চনার শান্ত পরিবর্তনটুকুও হয়তো কিছুটা আশার কারণ তাঁদের। দাদা বউদি আর মায়েতে মিলে গোপনে গোপনে আবার যেন কি পরামর্শ শুরু হয়েছে একটা।

অর্চনা হঠাৎ শুনল, কিছুদিনের জন্যে বাইরে বেড়াতে বেরুনো হবে। দাদা জানাল, অর্চনার জন্যেই বিশেষ করে চেঞ্জে ঘুরে আসা দরকার, দিনকে দিন তার শরীর খারাপ হয়ে পড়ছে। তাছাড়া একঘেয়ে ব্যবসায়ের ঝামেলায় ক্লান্ত নাকি নিজেরাও। নিজেরা বলতে আর কে অর্চনা বুঝে নিল। দাদার মুখের ওপর আপত্তি করতে পারল না। এমনিতেও বাদ-প্রতিবাদ আর কারো সঙ্গেই করে না বড়। তাছাড়া ভিতরে ভিতরে সত্যিই এমন ক্লান্ত যে কোথাও বেরুনোর প্রস্তাবটা নিজেরই খারাপ লাগল না। তার ওপর বাবাও ওকে ডেকে বললেন, তোর শরীর সত্যিই ভাল দেখছি না, ওদের সঙ্গে—দিনকতক ঘুরে-টুরে এলে ভালই লাগল।

সত্যিই বেরিয়ে পড়া হল একদিন। অর্চনার ইচ্ছে ছিল বরুণাও সঙ্গে থাক। কিন্তু তার নাকি শ্বশুরবাড়ি থেকে ছুটি মিলল না। আসলে বরুণা নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে এবং দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে রইল। চারজনে বেরিয়েছে। দাদা বউদি ননিমাধব আর অর্চনা। দিল্লীতে দিনকতক থেকে যাওয়া হবে আগ্রায়। আগ্রায় আবার দিনকতক থাকা, তারপর প্রত্যাবর্তন।

একেবারে কাছাকাছি থাকার দরুন এবারে কিছুটা সহজ হল ননিমাধব। তার রুমালে মুখ মোছা কমতে লাগল। দলের দুজন যে তার দিকে সে তো জানেই, এই বেড়ানোর তাৎপর্যও জানে। সুযোগ-সুবিধে মত অর্চনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার অবকাশ অন্য দুজনেই করে দেয়।

অর্চনাও সদয় ব্যবহারই করছে তার সঙ্গে। হেসে কথা বলে কথা শোনে। সে ইতিহাসের ছাত্রী। ইতিহাস স্মৃতি বা ইতিহাস-নিদর্শনের প্রতি ননিমাধবের সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে হেসেই জবাব দেয় যেটুকু জানে। অন্য দুজনের শোনার থেকেও দেখার দিকেই ঝোঁক বেশি। কাজেই দেখার সমারোহের মধ্যে দেখতে দেখতে এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে পড়বে তারা, সে আর বিচিত্র কি।

দিল্লী-পর্ব সেরে আগ্রায় আসার মধ্যেই ননিমাধব মনে মনে অনেকটা ভরসা পেয়েছে। তার থেকেও বেশি ভরসা পেয়েছে দাদা-বউদি। আগ্রায় এসে ইতিহাসের আশ্রয় ছাড়াও অন্য দু-চারটে কথা বলতে শুরু করেছে ননিমাধব। যেমন, বেড়াতে কেমন লাগছে, আজকাল কথা এত কম বলে কেন অর্চনা, ইত্যাদি।

তাতেও বিরূপ বা বিরক্ত হতে দেখা যায় নি অর্চনাকে। চতুর্থবার তাজমহল দেখতে দেখতে ননিমাধবের কথা শুনে তো বেশ জোরেই হেসে ফেলেছিল। ননিমাধব একটা বড়

নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, তাজমহল যে প্রেমের স্মৃতি-সমাধি, এখানে আসার আগে এমন করে কখনো মনে হয় নি—শাজাহানের দীর্ঘনিঃশ্বাসগুলোই যেন জমে পাথর হয়ে আছে।

অর্চনাকে হঠাৎ অমন হেসে উঠতে দেখে ননিমাধব অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। লজ্জায় ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। দাদা বউদি উৎফুল্ল মুখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছে। অর্চনা হেসেই বলেছে, কেন তোমরা রোজ রোজ এই তাজমহলে আস বল তো...ভদ্রলোকের মন খারাপ হয়ে যায়।

এতদিনে বিজন মনে মনে সত্যিই পার্টনারের তারিফ করল। খুশির কানাকানি চলতে লাগল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। একটা গুরু বোঝা হালকা।

পরদিনের প্রোগ্রাম ফতেপুর সিক্রি।

মাইল পঁচিশ দূর আগ্রা থেকে। মোটরে চলেছে সকলে। দূর থেকে ইতিহাসের স্মৃতি-সমারোহের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। অর্চনার দিকে চেয়ে ননিমাধব নীরব কৌতূহলের আভাস পেল।

মোটর থেকে নামতেই তিন-চারজন গাইড ছেঁকে ধরল তাদের। এই ব্যাপারটা দিল্লীতেও দেখেছে, আগ্রাতেও দেখেছে। অদূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল একজন অতিবৃদ্ধ গাইড। শনের মত সাদা চুল, সাদা দাড়ি। পরনে সাদা মলিন ঢোলা আলখাল্লা। জোয়ানদের সঙ্গে ঠিকমত পাল্লা দিতে পারে না বলেই হয়তো সবিনয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি কেউ নিজে থেকেই ডেকে নেয়।

ডেকে নিল। কে জানে কেন তাকেই পছন্দ হল ননিমাধবের। বুড়ো মানুষ দেখাবে-শোনাবে ভাল।

সামনে আকাশ-ছোঁয়া সিঁড়ির সমারোহ। বিশাল, বিস্তৃত সিঁড়ি। প্রতিটি সোপান মর্ত্যের মানুষের কালোত্তীর্ণ আকাঙ্ক্ষার স্বাক্ষর। সকলে উঠতে লাগল। অনেক দূর থেকে কোন মুসলমান পীরের যান্ত্রিক সুরের স্তোত্র-গান ভেসে আসছে। অদ্ভুত স্তব্ধ পরিবেশ। কাল যেন এক অপরিমেয় স্মৃতিভার বুকে করে এইখানটিতে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

সিঁড়ির শেষে বিশাল চত্বর। গাইড ঘুরতে লাগল তাদের নিয়ে। গল্প করতে লাগল। ইতিহাসের গল্প। এটা কেন, ওটা কি ইত্যাদি। চোস্ত উর্দুর অনেক কথাই বোঝা গেল না। কেউ চেষ্টাও করল না বুঝতে। গাইড আপন মনে তার কাজ করে যাচ্ছে, অর্থাৎ বকে যাচ্ছে—এরা নিজেদের মনে কথাবার্তা কইতে কইতে দেখেছে। শুধু অর্চনারই দু-চোখ ইতিহাস-স্মৃতি-প্রাচুর্যের মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেছে।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে শ্রান্তও হয়ে পড়েছে সকলে। শেষ নেই যেন। রাণুদেবী এক জায়গায় বসে পড়ল, তোমরা ঘোরো বাবা, আমি আর পারিনে—

জলের ফ্লাস্কের জন্য হাত বাড়াল সে। ফ্লাস্ক বিজনের কাঁধে। অতএব বিজনও বিশ্রামের সুযোগ পেল একটু। ওদিকে গাইডের পাশে অর্চনা, কাজেই তার পাশে ননিমাধব। তারা এগিয়ে চলল আবার। ওই দুজনের বসে-পড়াটা মিষ্টি কিছু ইঙ্গিত মনে করে শ্রান্তি সত্ত্বেও ননিমাধব তুষ্ট এবং উৎফুল্ল। কিছু একটা বলার জন্যেই এক সময় মন্তব্য করল, কি উদ্ভট শখ ছিল আকবর লোকটার, এ-রকম একটা ছন্নছাড়া জায়গায় এসে এই কাণ্ড করেছে বসে বসে!

গাইড তার কথাগুলি সঠিক না বুঝুক, বক্তব্য বুঝল । গল্পের খোরাক পেল আবার । —শখ নয় বাবুজি, শাহান-শা বাদশা এখানে ফকির চিশ্‌তির দোয়া মেঙে সব পেয়েছিলেন বলেই এখানে এইসব হয়েছিল ।

গাইড বলতে লাগল, এই তামাম জায়গা তো জঙ্গল ছিল, কেউ আসত না, শের আর বুনো হাতী চরত । শাহান-শা আকবর যুদ্ধফেরত এখানে এক রাতের জন্য আটকে পড়েছিলেন । এই ভীষণ জঙ্গলের গুহায় সাধন-ভজন করতেন এক পয়গম্বর পুরুষ — ফকির সেলিম চিশ্‌তি ।...

কথা শুনতে শুনতে এগোচ্ছিল ওরা । খুব যে আকৃষ্ট হয়েছিল এমনও নয় । ননিমাধব তো নয়ই । অর্চনার মন্দ লাগছিল না অবশ্য । গাইড গল্প বলে চলেছে, এতবড় বাদশা সেই ফকিরকে দেখামাত্র কেমন যেন হয়ে গেলেন !

...তাঁর দোয়া মাঙলেন বাদশা !

শাহান শার মনে ছিল বেজায় দুঃখু । খাস বেগমের দু-দুটো ছেলে হয়ে মরে গেছে, আর ছেলে হয় নি । তখৎ-এ-তাউসে বসবে কে ? কাকে দিয়ে যাবেন মসনদ ?

ফকির চিশ্‌তি বললেন, আল্লার দোয়ায় বাদশার আবার ছেলে হবে । বেগমকে এইখানেই নিয়ে আসতে বললেন সেলিম চিশ্‌তি । আকবর বাদশা তাই করলেন । ন-মাস ছিলেন এখানে খাস বেগমকে নিয়ে । তারপর ছেলে হল । ছেলের মত ছেলে । বাদশা জাহাঙ্গীর । শাহান-শা গুরুর নামে ছেলের নাম রাখলেন সেলিম । আর ফকিরগুরুর আশ্রমে বাস করবেন বলে সব জঙ্গল সাফ করে এখানে এত বড় রাজদরবার গড়ে তুললেন তিনি । ফকির বই বাদশা আকবর আর কিছু জানতেন না ।

কখন যে নিবিড় আগ্রহে শুনতে শুরু করেছে অর্চনা নিজেরই খেয়াল নেই । হঠাৎ কেন এমন করে স্পর্শ করল এই কাহিনী তাও জানে না । শুনতে শুনতে একটি সমাধির কাছে এসে দাঁড়াল তারা । মার্বেল পাথরের শুভ্র সমাধি লাল কাপড়ে জড়ানো চারিদিকে নক্সাকাটা পাথরের জালি দেয়াল ।

গাইড জানাল, এই ফকির চিশ্‌তির সমাধি ।

অর্চনা কেমন যেন অভিভূত । দেখছে চুপচাপ । আর কি-একটা অজ্ঞাত আলোড়ন হচ্ছে ভিতরে ভিতরে । হঠাৎ তার চোখে পড়ল, সেই জালির দেয়ালে অসংখ্য সুতো আর কাপড়ের টুকরো বাঁধা । সুতোয় আর কাপড়ের টুকরোয় সমস্ত দেয়ালটাই বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে ।

গাইডকে জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কি ?

গাইড জানাল, যাদের ছেলে হয় না তারা ছেলের জন্য ফকিরের দোয়া মেঙে এই সুতো বা কাপড় বেঁধে রেখে যায় । কত দূর দূর দেশ থেকে নিঃসন্তান মেয়েরা সুতো বাঁধার জন্য এখানে আসে । কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীস্টান, সবাই আসে । ছেলে কামনা করে এখানে এসে ভক্তিভরে সুতো বেঁধে দিলে ছেলে হবেই । ফকিরের আশীর্বাদ কখনো মিথ্যে হয় না—তিন-শ বছর হয়ে গেল কিন্তু লোকের বিশ্বাস আজও যায় নি ।

অর্চনার কানে আর এক বর্ণও ঢুকছে না । কি একটা সুপ্ত ব্যথা খচখচিয়ে উঠছে ভিতরে ভিতরে । টকটকে লাল হয়ে উঠেছে । সমস্ত মুখ । ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে । ফকিরের সব কথা ননিমাধব শোনে নি । কিন্তু অর্চনার দিকে চেয়ে থমকে গেল সে ।—কি হল ?

জবাব না দিয়ে অর্চনা সুতো-বাঁধা সেই জালির দেয়ালের চারিদিকে ঘুরতে লাগল। মুখে অব্যক্ত যাতনার চিহ্ন, চোখে নিষ্পলক, বিভ্রান্ত আকৃতি। অজস্র সুতো বাঁধা—সুতোর পর সুতো। ওই প্রত্যেকটা সুতো যেন এক একটা রক্তমাংসের শিশু হয়ে দেখা দিতে লাগল চোখের সামনে।

অজস্র, অগণিত তাজা শিশু।

কি এক অজ্ঞাত উত্তেজনায় অর্চনা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আবারও কাছে এগিয়ে এল ননিমাধব। কি হল? খারাপ লাগছে কিছু?

তার কথায় হঠাৎ যেন সচেতন হল অর্চনা। তাকাল। একপলকে ভেবে নিল কি। সমস্ত মুখ আরক্ত তখনো। বলল, না, গরম লাগছে, একটু জল পান কি না দেখুন তো...

হন্তদন্ত হয়ে জলের সন্ধানে ছুটল ননিমাধব। জলের তৃষ্ণা দু-চোখে এমন করে ফুটে উঠতে জীবনে আর দেখে নি কখনো।

ননিমাধব পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অর্চনা একটা কাণ্ড করে বসল। ফ্যাঁশ করে দামী শাড়ির আঁচলটা ছিঁড়ে ফেলল। বৃদ্ধ গাইডের বিমূঢ় চোখের সামনেই সেই শাড়ির টুকরো জালির দেওয়ালে বেঁধে দিয়ে দ্রুত সরে এল সেখান থেকে। সর্বাঙ্গে থরথর কাঁপুনি। দেহের সমস্ত রক্তই বুঝি মুখে উঠে এসেছে।

গাইড কয়েক নিমেষ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কি বুঝল সে-ই জানে। টেনে টেনে বলল ফকিরের দোয়া কখনো মিথ্যে হয় না মাইজী, শুচিমত থেকো আর বিশ্বাস করো।

জল নিয়ে এসে ননিমাধব হতভম্ব। কারণ অর্চনা অন্যমনস্কের মত বলল, জলের দরকার নেই। দাদা-বউদিও এসেছিল, ওর মুখের দিকে চেয়ে অবাক তারাও। বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল কি হয়েছে।

অর্চনা কথা বলতে পারছে না। নিজেকে আড়াল করতে পারছে না বলেই বিব্রত হয়ে পড়ছে আরো বেশি। ছেঁড়া শাড়ির আঁচল ঢেকে ফেলেছে, তবু অস্ফুটস্বরে শুধু বলল, শরীর ভাল লাগছে না, এক্ষুনি ফেরা দরকার।

দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগোল সে। ব্যাকুল, উদগ্রীব। একটা মুহূর্তও হাতে নেই যেন তার। তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে লাগল।

সিঁড়ি সিঁড়ি সিঁড়ি সিঁড়ি। মাগো! এ-সিঁড়ির কি শেষ নেই?

তাড়াহুড়ো করে সকলে হোটেলে ফিরল আবার। কিন্তু কি ব্যাপার ঘটে গেল হঠাৎ ভেবে না পেয়ে সকলেই বিভ্রান্ত একেবারে। দাদা-বউদি ননিমাধবকেই এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। কিন্তু সেও বিমূঢ় কম নয়।

অর্চনা ঘোষণা করল সেই রাতের ট্রেনেই কলকাতা ফিরবে। আবারও আকাশ থেকে পড়ল সকলে। কিন্তু তার দিকে চেয়ে মুখে আর কথা সরে না কারো। স্থানীয় ডাক্তার ডেকে ব্লাড-প্রেসার দেখিয়ে নেওয়ার কথাও মনে হয়েছে সকলেরই। কিন্তু শোনামাত্র অর্চনা রেগে উঠল এমন যে সকলে নির্বাক।

ট্রেনে সারা পথ এক অধীর প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে ছটফট করতে দেখা গেল তাকে। বেশি রাতে অন্য দুজন যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন, ননিমাধব কাছে এল। সত্যিকারের আকৃতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে বলবে না?

**অর্চনা সচকিত হয়ে তাকাল। কিছু একটা ভাবনায় ছেদ পড়ল। ও-টুকু স্নেহের স্পর্শেই দু-চোখ ছলছল করে এল। অস্ফুট জবাব দিল, কি বলব...।**

**এভাবে চলে এলে কেন ?**

তেমনি মৃদুকণ্ঠে অর্চনা বলল, আসা দরকার যে !...আবারও তাকাল। হঠাৎ এই মানুষটির জন্যেও বুকের ভিতরটা ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল। একটা উদ্‌গত অনুভূতি ভিতরে ঠেলে দিয়েই অস্ফুট স্বরে বলল, একটা কথা রাখবেন ?

উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় ননিমাধব আরো একটু কাছে এগিয়ে এলো শুধু।

আমাকে ভুলে যান। নইলে এত অপরাধের বোঝা আমি বইব কেমন করে !

জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে মুখ ফেরাল সে। বিস্ময়ে বেদনায় ননিমাধব বোবা একেবারে।

কলকাতা।

হঠাৎ এভাবে ফিরতে দেখে মিসেস বাসু পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। বিজন বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, জিজ্ঞেস করে দেখ তোমার মেয়েকে, আমরা কিছু জানি না।

মেয়েকে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করে ডক্টর বাসুও কিছু হদিস পেলেন না। ধীরে-সুস্থে জানা যাবে ভেবে আর উত্যক্তও করতে চাইলেন না।

দুপুরের দিকে বিজন বেরিয়েছে। বউদি রাতের ক্লান্তি দূর করছে।

অর্চনা চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল।

ট্রাম থেকে নেমে একটুখানি হাঁটা-পথ, তারপর বাড়ি। অর্চনা সমস্ত বাড়িটাকে একবার দেখে নিল।

দরজা বন্ধ। বন্ধই থাকে।

কড়া নাড়ল। একবার, দুবার—

সাড়া নেই।

আরো জোরে কড়া নাড়ল। মনে মনে হিসেব করছে, যতদূর মনে পড়ে এ-দিনটা অফ্-ডে। নাকি রুটিন বদলেছে কলেজের !...কিন্তু তাহলে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ কেন, বাইরে তালা ঝোলার কথা। অবশ্য, সাবি থাকতে পারে...

ও-দিক থেকে দরজা খোলার শব্দ।

শরীরের সমস্ত রক্ত আবার মুখে এসে জমেছে অর্চনার।

দরজা খুলল। অর্চনা স্তব্ধ।

দুপুরের ঘুম-ভাঙা চোখে দরজা খুলেছে একটি মেয়ে। বিবাহিত। সুশ্রী। স্বস্থ বেশবাস। কোলে একটি ফুটফুটে শিশু।

দরজা খুলে মেয়েটিও অবাক একটু।

আচমকা ধাক্কাটা অর্চনা যেন যন্ত্র-চালিতের মতই সামলে নিল। জিজ্ঞাসা করল, এ-বাড়িতে কে থাকেন ?

জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল না। দরজার নেম-প্লেটে সুখেন্দু মিত্রের নাম লেখা। আর শিশুটির মুখের আদলেও তার জবাব লেখা।

মেয়েটি ইশারায় নেম-প্লেটটাই দেখিয়ে দিল।

ও...। অর্চনা বিব্রত মুখে হাসল একটু, আমি ঠিকানা ভুল করেছি । হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি শিশুটির গাল টিপে দিল ।—বেশ ছেলেটি তো...আপনাদের ছেলে ?

মেয়েটির মুখে তুষ্টির আভাস একটু । মাথা নাড়ল । তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনি যাবেন কোথায় ?

অর্চনা ব্যস্তভাবে জবাব দিল, এই এ-দিকেই যাব, আপনাকে বিরক্ত করলাম...নমস্কার ।

আর জিজ্ঞাসাবাদের ফুরসৎ না দিয়ে ছেলেটির গালে আর একবার আঙুল স্পর্শ করে অতি-আধুনিকার মতই টক-টক করে রাস্তায় নেমে এলো অর্চনা বসু ।...

।। ৯ ।।

পাখি-ডাকা আবছা অন্ধকারে ভোরের আভাস ।

খরখরে দু-চোখের ওপর দিয়ে আর একটা রাতের অবসান । অর্চনা বসু উঠবে । ঈজিচেয়ারটা ঠেলে ভিতরে নিয়ে যাবে । তারপর, হাত-মুখ ধুয়ে এসে চেয়ারে বসে ঝিমুবে খানিক । দাশু চা নিয়ে আসবে । পর পর দু-তিন পেয়ালা চা খেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবে সে, চান করে আসবে । ইস্কুলের খাতা দেখে বা বই পড়ে কাটবে কিছুক্ষণ । তারপর শুচি শুভ্র বেশবাসে নিজেকে ঢেকে ইস্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হবে ।

সেই ধপধপে সাদা পোশাক । তার সাদাটে ব্যবধান ।

গাইডের শুচি-মত থাকার নির্দেশ ভোলে নি ।

আর, তার কথা-মত বিশ্বাসটাও দূর করে উঠতে পারে নি ।

---

# বলাকার মন

ক'দিন ধরেই মনে হচ্ছিল, এবারে ওরা নড়বে ।

ওদের মন উড়েছে । কথা উঠলেই একজন আর একজনের ওপর দোষ চাপায় । বিশেষ করে অন্তরঙ্গ তৃতীয় কেউ কাছে থাকলে । কিছুকাল হল এই তৃতীয় ব্যক্তির আসনে আমি কায়েম হয়ে বসেছি । দোষ চাপানোর ব্যাপারে সবিতাব্রতর থেকে মালা নন্দী বেশি পটু । কথা বলতে বলতে হঠাৎ হয়ত লক্ষ্য করে, তার ঘরের লোক ঈষৎ অন্যমনস্ক, জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে দু'চোখ দূরের শূন্যে উধাও ।

মালা নন্দীরও বক্তব্যের খেই হারিয়ে যাবে তখন । তবু কথার ফাঁকে ফাঁকে বার কয়েক লক্ষ্য করবে । দৃষ্টি সচকিত হবে একটু । তারপর ঠোঁটের ফাঁকে কয়েক টুকরো বাড়তি হাসি উঁকিঝুঁকি দিয়ে যাবে । দৃশ্যটা উপভোগ্য যত, কাগজে ফলানো সহজ নয় ততো । মালা নন্দীর এই হাসির প্রসঙ্গ আর একটু বিস্তারসাপেক্ষ ।

মনের আনন্দে গল্প ফেঁদে বসলে তার কথার স্রোত কখন কোন্ দিকে ঘুরবে, বইবে, বাঁক নেবে, ঠিক নেই । ছোট পাহাড়ী ঝরনা দেখেছি অনেক । উঁচু-নিচু শত শত পাথরের বাধা এড়িয়ে এদিক ঘুরে ওদিক বেঁধে অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি । অনেকটা সেই রকম । এর মধ্যে তার বক্তব্য অনুধাবন করতে হলে কান-মন সজাগ রাখতে হয় । কিন্তু তাও সহজ নয় খুব । অন্তরায় তার মুখের ওই হাসি । সেদিকে তাকালে কানের সঙ্গে চোখের অনেক সময়েই বিরোধ বাধে ।

কথা বলতে গেলেই মহিলার মুখখানা হাসি-হাসি দেখায় । এটা সহজাত গুণ বলব কিনা সে-সম্বন্ধে নিজেরই সংশয় আছে । হয়ত বহুদিনের অনুশীলনের ফলে মাধুর্যের এই দাক্ষিণ্যটুকু শ্রীমুখের বশীভূত হয়েছে । সুন্দর মুখের সর্বত্র জয় । সেই সুন্দর মুখ নিপুণ হাস্য-কলাবিন্যাসযুক্ত হলে দিগ্‌বিজয় । আর সেই হাস্যকলা-বিন্যাসযুক্ত সুন্দর মুখ যদি রমণীর মুখ হয় তাহলে ত্রিভুবন জয় ।

এক বিদেশী গল্পে রূপসী রমণীর হাসির মাহাত্ম্যের আরো বিচিত্র নজির পেয়েছিলাম । নায়িকা, অর্থাৎ আখ্যানের সেই রূপসী তরুণী জঙ্গলের ক্ষুধার্ত ভালুকের পাল্লায় পড়েছিল । মনে হয়, গল্পকার ভালুক আমদানী করেছিলেন, জলে ডাঙায় গাছে কোথাও অব্যাহতি নেই সেই সঙ্কট বোঝাবার জন্যে । নিরুপায় নারী তখন এক বিচিত্র কাণ্ড ঘটিয়ে বসল । সে-যে অবলা সেটাই আগে ভালুককে বোঝানো দরকার মনে করল । নিমেষে সম্পূর্ণ বস্ত্রমুক্ত করে নিল নিজেকে । তারপর অন্তিম ফলাফলের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল ।

ভালুক এই ব্যবহারের জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিল না । সে সামনে এসে আপাদমস্তক দেখল খানিক । রমণী তখন হাসল তার দিকে চেয়ে । অবলার সব থেকে সেরা অস্ত্রটি বুঝি নিক্ষেপ করল তার দিকে ।

বিধাতার সৃষ্টিতে রসবোধ নেই এমন আছে কেউ ?

ভালুক চলে গেল ।

এই রসবোধের দাবি ভালুকের থেকে অন্তত মানুষের কিছু বেশি । তাছাড়া, মানুষও উল্টে স্ত্রী-ভালুক আর পুরুষ ভালুক না চিনতে পারে, প্রজাতীয় নারী-পুরুষ চিনতে তার অসুবিধে হবার কথা নয় । অতএব এ ক্ষেত্রে রমণী-মুখের সুচারু হাসিটুকুই পুরুষ বক্ষে সমূলে বিদ্ধ করার মত যথেষ্ট ধারালো ।

কিন্তু সযত্ন অনুশীলন ভিন্ন এই ধারালো দিকটা সর্বদা স্ববশে থাকে কি না আমি জানি না। অন্যমনস্ক সবিতাব্রতর দৃষ্টি দূরের শূন্যে উধাও হুবার জের টানার আগে মালা নন্দীর স্বভাব-হাসির প্রসঙ্গে একদিনের ছোট্ট একটু স্মৃতি রোমন্থন করা যেতে পারে।

বছর পাঁচেক আগের কথা। কলকাতা থেকে দিল্লী যাচ্ছিলাম। মাটি থেকে চৌদ্দ পনের হাজার ফুট ওপরে উঠলেই মনটারও যে আনুপাতিক নির্বিকল্প উর্ধ্বগতি হবে এমন কথা নেই।

এরোপ্লেনে আগেও বার কয়েক ওটা হয়েছে, তাই বাতাসে ভাসার রোমাঞ্চ তেমন ছিল না। কিন্তু মনটা যে প্রসন্ন ছিল তার ভিন্ন কারণ। গ্লাস উইণ্ডো দিয়ে আমি মাঝে মাঝে আকাশ দেখছিলাম, অনেক নীচের মাটিও দেখছিলাম। কিন্তু এই সঙ্গে অন্যমনস্কের মত ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মাঝে পিছন দিকেও তাকাচ্ছিলাম। একেবারে ল্যাজের দিকে। যেখানে আলাদা একটা আসনে শিল্পীর গড়া শঙ্খ-ধবল মূর্তির মত হাওয়াই হোস্টেস মালা নন্দী বসে। না, মালা নন্দী নয় তখন, মালা বিশ্বাস। আর এই নামও তখন অজ্ঞাত আমার।

সিঁড়ি ধরে এয়ার ক্রাফট-এ ওঠার আগেই ওপরের দিকে চেয়ে শুধু আমার কেন, প্রায় সকলেরই জোড়া জোড়া চোখ প্রীত হয়েছিল বোধ করি! ওপরের দরজার ধার ঘেঁষে অভ্যর্থনায় দাঁড়িয়েছিল আমাদের হোস্টেস! মৃদু হেসে ঈষৎ মাথা নুইয়ে সকলকেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছিল।

তারপর সিঁড়ি সরেছে। দরজা বন্ধ হয়েছে। মাটির কর্মচারীরা তাদের কাজে ব্যস্ত হয়েছে। কণ্ট্রোল থেকে বিধিবদ্ধ নির্দেশ এসেছে। যন্ত্র-বলাকা গর্জন করে উঠেছে। ঘন-ঘন আলো জ্বলেছে সামনে, 'ফাসন্ ইওর বেল্ট প্লীজ'।

সামনের পাইলটদেব ক্যাবিনের দরজা একটু খোলা ছিল। সীট-এ বসেই সেখানকার ব্যস্তসমস্ত কর্মচারীদের দেখা গেছে। লঘু ঈষৎ চঞ্চল পায়ে আনাগোনা করছিল আমাদের সুদর্শনা হোস্টেস। তখন মনে হয়েছে এদের তৎপরতা শেষ হলেই প্লেন চলবে! সেই কিছুক্ষণ ক্যাবিনের ওধারের কর্মীদের প্রতি মনে মনে একটু ঈর্ষাও বোধ করছিলাম কি না জানি না।

শেষ বারে অর্থাৎ প্লেন নড়ার পূর্বমুহূর্তে সামনের ক্যাবিন থেকে ফেরার সময় সহৃদয়া মহিলা আমার দিকে চেয়ে একটু থমকে দাঁড়াল। মিষ্টি করে বলল 'ফাসন্ ইওর বেল্ট্ প্লীজ'।

গোড়ায় গোড়ায় প্লেনে উঠে লাল আলোর নির্দেশ পেলেই বেল্ট বাঁধার জন্য ব্যস্ত হতাম। পরের দিকে বেল্ট না বাঁধাটাই অভ্যস্ত যাত্রীর লক্ষণ ভাবতাম। লজ্জা পেয়ে বেল্ট্ টেনে নেবার আগেই মহিলা চলে গেল। এখন অবশ্য তাকে আর অত ফর্সা মনে হয়নি। নিপুণ প্রসাধনের আড়াল থেকে সঠিক রঙ ঠাওর করা শক্ত।

প্লেন আকাশ-পথে স্থিতি লাভ করার পর তার কাজ শুরু! খবরের কাগজ দিয়ে গেল। লজেন্স টফি চকোলেটের ট্রে নিয়ে এলো। মিষ্টি করে চা অথবা কফি জিজ্ঞাসা করে গেল। একটু বাদে হাসি মুখে চা আর প্রাতরাশ দিয়ে গেল। লাঞ্চের আগেই দিল্লী পৌছে যাব, তাই প্রাতরাশেই শেষ। খাবার আর চা কফির ট্রে হাতে আবার তাকে বার কয়েক ভিতরে ক্যাবিনে যাতায়াত করতে দেখা গেল। যাত্রীদের আর কিছু চাহিদা নেই, তাই শেষের বারে বেরুলো অনেকক্ষণ বাদে। হাস্যপ্লুত মুখ দেখে মনে হল কারো সঙ্গে কিছু রসিকতা করে

এলো । বিমানের ওই ভিতরের দিকটা আমার কাছে খুব রহস্যময় কিছু নয় । দেখা আছে । সময়ে পর পর আরো দুটি খুপরি থাকা সম্ভব । প্রথমটা রেডিও অফিসার, ন্যাভিগেশন অফিসার এবং অন্যান্য ক্রু'দের কর্মক্ষেত্র । আর তারপরে বিমানের অজস্র কল-কব্জায় কণ্টকিত ফ্লাইট ডেক অথবা ককপিট । সেখানে পাশাপাশি পাইলট আর কো-পাইলটের আসন ।

প্রথম দুই একবার ছাড়া ওই সামনের অদৃশ্য দিকটার সম্বন্ধে তেমন কৌতূহল কখনো অনুভব করিনি । কিন্তু সেদিন থেকে যতবার আমাদের হোস্টেস ওই ছোট দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেছে ততবার আমার মানসিক দৃষ্টি ওই অদৃশ্য দিকটাতেই বিচরণ করেছে । সেই দিনই হাওয়াই হোস্টেস আর হাওয়াই ক্যাপ্টেন নিয়ে একটা কাহিনী ফেঁদে বসার বীজ আমার অগোচরে মনে কেউ বোপণ করে দিয়েছিল কিনা জানি না ! সেদিন অন্তত এই চিন্তা মনে আসেনি । শুধু মনে হয়েছে এই এক দুনিয়া যেখানকার মেয়ে পুরুষকে আমরা সাধারণ মানুষেরা বলতে গেলে চিনিই না । চেনার বাসনা সেদিনই কেন হযেছিল মানব-রীতির সেটা দুর্বল দিক । মহিলা সকলের শেষে তার নির্দিষ্ট একক আসনটিতে গিয়ে বসতে আমার মনটা যেন একটু সুস্থির হয়েছিল মনে পড়ে ।

তারপর ।

তারপর আমি আকাশ দেখেছি, মেঘ দেখেছি, বহু নীচের সমতল ভূমির দিকে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করেছি, আশপাশের আর পিছনেব বয়স্ক যাত্রীদের ঢুলু ঢুলু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবও লক্ষ্য করেছি—আব এই করতে গিয়ে কতবার পিছন দিকের সেই রমণী অলঙ্কৃত একক আসনেব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবেছি জানি না । প্রতি বারেই মনে হযেছিল দেখাটা অসম্পূর্ণ থাকছে ।

বার কয়েক মহিলার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে । বসে থাকার ভঙ্গিটুকু সুন্দর, আরো মিষ্টি । হাওয়াই হোস্টেস না হয়ে মহিলা চিত্রকরের মডেল হলেও সুনাম কিনতে পাবত বোধ হয় । শিথিল আলস্যে ঢিলেঢালা বসা নয়, আবাব অতি সচেতন ঋজু বসাও নয । দুইয়ের মাঝামাঝি গোছেব । বসাব এই ভঙ্গিটুকুও যেন লক্ষ্য না করার নয় ।

নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে আমি চারদিক দেখছিলাম, আর নিজের প্রায় অজ্ঞাতে একটু গবেষণায় মগ্ন হয়েছিলাম । কেন ভালো লাগে, চোখ কেন প্রীত হয়, মন কেন প্রসন্ন হয় ? একেবারে অল্প বয়সী ছেলে ছোকরার মত সুশ্রী মেয়ে দেখলেই খুশি হবার সময় তো পাব হয়ে গেছে । আর এ সময়টা পার করে দিতে পারলে দোষ কেবল ওই ছেলে ছোকরাদেরই দিই । এই দোষ দেওয়াটা অগোচরের ঈর্ষা প্রণোদিত কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে । আসলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জটিলতার অভিজ্ঞতাও হয় । তারই ফলে শুকনো একটা নীতির ছুরি উঁচিয়ে এই ভালো লাগাটুকুও অস্বীকার করতে চেষ্টা করি হয়ত । তা বলে অশোভন আচরণের সুপারিশ করছি না । প্রবৃত্তিব লাগাম ছেড়ে দিতেও বলছি না । চোখে বা মনে সুন্দরের ছোঁয়া লাগাটাকে অসুন্দর বলে ঘোষণা করতে চায় না মন—শুধু এই কথা ।

রমণীর সৌন্দর্যের সঙ্গে পুরুষের চিত্তের একটা শাশ্বত যোগ—এই চিত্তের কখনো বয়েস বাড়ে বলে মনে হয় না । অবশ্য সুন্দর বলতে আমি রূপ সৌষ্ঠবের কথা বলছি না । অন্তরের

স্নেহ প্রীতি ভালবাসার মাধুর্যে অনেক রূপহীনা রমণীকেও অনিন্দ্যসুন্দরী মনে হতে পারে। সেই মনে হওয়াটা যে একটুও ভুল, তাও না। রমণীর আসল রূপ শেষ পর্যন্ত ওই টুকুই। কিন্তু এই রূপে পৌঁছনো সময়সাপেক্ষ, সুযোগসাপেক্ষ। তাই বাইরের রূপটাই আগে চোখ টানে, মনে হয় ওটাই বাঞ্ছিত নিভৃতরূপিণীর প্রতিচ্ছবি।

ডু ইউ ওয়ান্ট এনিথিং মিস্টার...?

কানের কাছে গুঞ্জন। কথার তাপ যেন কানের পরদা ছুঁয়ে গেল। আর, মালা নন্দী বা মালা বিশ্বাসের যে হাসির প্রসঙ্গে এত কথা— সেই হাসি শুধু তখনই দেখলাম। তার মুখ হাসছে, চোখ হাসছে, কানের পরদায় ওই কণ্ঠস্বরও যেন হাসছে। কিন্তু সেই হাসি স্পষ্টও নয়, প্রগলভও নয়। সূর্যের রঙিন আভাস যেমন সূর্য নয়, এই হাসির আভাসও সরাসরি হাসি নয় তেমনি। সরাসরি কৌতুক নয়, আবার নিতান্ত সরল প্রশ্নও নয় যেন।

আমাকে এতটা হকচকিয়ে যেতে দেখে সেও বোধহয় অপ্রস্তুত হল একটু। এবারে তেমন মিষ্টি করে বাংলায় জিজ্ঞাসা করল, আপনার কি কিছু চাই ?

ছেলেবেলা থেকে জেনে এসেছি মিথ্যে বলা পাপ। আবার এখন যাদের ছেলেবেলা চলছে তাদের বলেও আসছি তাই। কিন্তু এক্ষেত্রে মিথ্যে বলাটাই যে একমাত্র সু-নীতি স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও তা অস্বীকার করবেন না হয়ত। প্রশ্নের জবাবে অকপট আনন্দে হাসতে পারলে সেটা সত্যি হত। আর তারপর অবিমিশ্র সত্যি হত পাশের খালি আসনটা দেখিয়ে যদি বলা যেত, হ্যাঁ চাই, আপনি এখানে বসুন, গল্প করি গল্প শুনি—

না। ধন্যবাদ...।

মহিলা স্বস্থানে ফিরে গেল। আশপাশের লোক তাকালো আমার দিকে। মিথ্যে বলে এবং গম্ভীর হয়ে আমি মর্যাদা রক্ষা করতে সচেষ্ট হলাম। ভিতরে ভিতরে অপ্রস্তুত, কি করেছি রে বাবা, ঘাড় ফিরিয়ে ক'বার তাকিয়েছি। মনে মনে নিজের এই অবাধ্য চোখদুটোর উদ্দেশেই ভ্রূকুটি করেছিলাম, মনে আছে।

পালামে প্লেন একেবারে অনড় হওয়া পর্যন্ত আর যে পিছন দিকে ঘাড় ফেরাইনি, তাও সত্যি। শেষের দিকে মহিলা অবশ্য আবার বার কয়েক ওই সামনের ক্যাবিনের দরজা ঠেলে ঢুকেছে আর বেরিয়েছে। প্রয়োজনে কি অপ্রয়োজনে সেই প্রশ্নও মনের তলায় উকিঝুঁকি দিতে চেয়েছে। তখন লক্ষ্য করেছি তাঁকে। যাতায়াতের সময় চোখের কোণ দিয়ে দুই একবার সেও আমাকে দেখেছে বলে মনে হয়েছে।

সেদিনের সেই হাসির ছটা এখনো আমার চোখে মনে আর কানে লেগে আছে।

আজকের মালা নন্দীকে সেদিনের মালা বিশ্বাসের গল্প বার কয়েক শুনিয়েছি। ঠাট্টার ছলে সখেদে বলেছি, সেই মহাশূন্যে কি-মর্মান্তিক শুভদৃষ্টি হয়ে গেল, আর কানে সেই কি-যে অমৃত জ্বালা ছড়িয়ে গেল সে যদি জানতে ম্যাডাম। যে জন্যে অত খরচ করে হাওয়াই জাহাজে উড়ে দিল্লী যাওয়া—সেই কাজই ভণ্ডুল হবার দাখিল।

কিন্তু মালা নন্দীর মনেও নেই। প্রথম শুনে সত্যি অবাক হয়েছিল।— ও মা, কবে আবার ! আমি তো আপনাকে আগে কখনো দেখিইনি।

সবিতাব্রত ফোঁশ করে বড় নিশ্বাস ফেলেছে একটা, গায়ের চাদরটা আর একটু ভাল

করে জড়িয়ে নিয়েছে। শীত গ্রীষ্ম বারমাসই সে অমনি পা থেকে গলা পর্যন্ত চাদরে ঢেকে বসে। স্ত্রীর হয়ে জবাবদিহি করেছে যেন তারপর, বলেছে, মনে নেই, সত্যি কিছু মনে নেই, বুঝলে ? কি করে মনে থাকবে বল, হিসেব করলে দেখা যাবে সেদিনের ওই ফ্লাইটের তুমি হয়ত ওর দেড় হাজার নম্বরের প্রেমিক। তোমার পরেও আরো হাজার কয়েককে পার করেছে। এত মুখ মনে থাকতে পারে কখনো ? শুধু তোমরাই মনে রেখেছ আর জ্বলেছ। জ্বলেছ আর কাজ ভণ্ডুল করেছ। কাজ ভণ্ডুল করে আবার ওড়ার জন্যে ছুটে এসেছ।

মালা নন্দী হাসিতে ভেঙে পড়েছে। বলেছে, বেশ, যাও। যেমন চরিত্র তোমাদের সব। উড়ো জাহাজে এয়ার হোস্টেস থাকে কি করতে, এই জ্বলুনির আনন্দটুকু প্যাসেঞ্জাররা পাবার জন্য হাঁ করে থাকে বলেই তো।

সবিতাব্রত তক্ষুণি সায় দিয়েছে, তাই তো ! তা না হলে আর কি জন্যে ? উড়ো জাহাজে প্যাসেঞ্জারদের মন ওড়াবার জন্যেই তো এয়ার হোস্টেস !

বিতর্ক চালু রাখার আশায় আমি বলি, তা কেন, যাত্রাকালে সুলক্ষণা সুদর্শনা রমণী দর্শন এ দেশের সনাতন রীতি। তাতে যাত্রা শুভ। আগের কালে কেউ দূরে যাত্রা করলে বা কেউ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে রওনা হলে মঙ্গল-কলস কাঁখে নিয়ে সুন্দরী বরাঙ্গনারা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। শূন্যে যাত্রা তো আরো একটু সীরিয়াস ব্যাপার, তাই সেই প্রাচীন ঐতিহ্যটাই চালু হয়েছে।

সবিতাব্রত গম্ভীর মনোযোগে শুনেছে, তারপর জিজ্ঞাসা করেছে, কারা দাঁড়িয়ে থাকত বললে, বারাঙ্গনারা ?

বরাঙ্গনারা। দু'য়ে অনেক তফাৎ।

ওই একই হল। গম্ভীরমুখে সবিতাব্রত ফিরে প্রশ্ন করল, তাহলে অন্যান্য দেশগুলো আমাদের এই ঐতিহ্যটাই ধার করেছে বলতে চাও ?

বিপাক এড়ানোর জন্য আরো জোর দিয়ে বলি, হ্যাঁ। সুরূপা রমণী দর্শনের শুভফল ওরা পরে বুঝেছে, তবে আগে এরোপ্লেন চালাতে শিখে ব্যবস্থাটা ওরা আমাদের আগে চালু করেছে।

থামুন মশাই, আপনাকে আর ফোড়ন কাটতে হবে না। ভ্রূকুটি করতে গিয়েও হেসে ফেলে মালা নন্দী, শুনুন তাহলে প্যাসেঞ্জারদের কাণ্ড—

এরপর প্যাসেঞ্জারদের অনেক কাণ্ডর কথাই অনেকদিন শুনেছি তার মুখে। সব প্যাসেঞ্জারকেই সাদা-সাপটা তিন ভাগে ভাগ করে ফেলেছে সে।

—শতকরা জনা দুই পাবেন যারা বাজে মেয়ে ভেবে দস্তুরমত ঘেন্না করে আমাদের। যত মিষ্টি করে তাদের আদর যত্ন তদারক করতে যাই, ততো তারা বিরক্ত হয়। হাতে খেতে চায় না পর্যন্ত, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মাথা নাড়ে—

আমি বলে উঠি, পাষণ্ড—

মালা নন্দী হাসে মিটিমিটি, ওই পাষণ্ড যাত্রীর সংখ্যা যত বেশি হয় ততো নিশ্চিন্ত আমরা। এয়ার হোস্টেসদের এরকম প্যাসেঞ্জারই পছন্দ। একবার কর্তব্য করতে চেষ্টা করেই কাজ ফুরলো—

সবিতাব্রত টিপ্পনী কাটে, তারপরেই নিশ্চিন্ত মনে ককপীটে ঢুকে ক্যাপ্টেন-ট্যাপ্টেনের

সঙ্গে রসালাপে বসে পড়া গেল ।

থামো তুমি, নিজেদের গুণের কথা আর ঢাক পিটিয়ে বলতে হবে না—তোমার মত মেয়ে-জ্বালানো ক্যাপ্টেন বেশি থাকলে এয়ার হোস্টেসরা দল বেঁধে চাকরি ছেড়ে পালাতো। হাসি মুখে মালা নন্দী আমার দিকে ফেরে ।—শুনুন তারপর, এ তো গেল মাত্র শ'য়ে দু'জন —শতকরা এই ধরুন গিয়ে...আট জন হল কড়া মেজাজের কাজের লোক আর পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবার লোক । টিকিট কেনার সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যটুকুও কেনে । কর্তব্যে ত্রুটি হলে তারা রাগ করে, কথা শোনায়, এমনকি নালিশও করে । যা দরকার হুকুম করে চেয়ে নেয়—কোনরকম রস-কষের ধার ধারে না । তাদের সঙ্গে চিনিগলানো মিষ্টি ব্যবহার করলেও তারা বেশি খুশী হয় না—সেটুকুও তারা প্রাপ্য ভাবে—

অভদ্র, কাঠখোট্টা ! দ্বিতীয় বিস্তারের পর আমার দ্বিতীয় মন্তব্য ।

হ্যাঁ, মালা নন্দী সানন্দে সায় দেয়, এই কাঠখোট্টা যাত্রীদের নিয়েও আমাদের ঝামেলা কম, ঠিকমত কাজ করলেই আমাদের কর্তব্য ফুরালো । তারা পয়সার ওজনে আদর যত্ন আদায় করে নেবে । ব্যস, তার বেশি আর কিছু না । তাই তাদের সম্পর্কেও মোটামুটি নিশ্চিন্ত আমরা ।

হ'ল গিয়ে টু প্লাস এইট্—টেন পারসেন্ট—রইল বাকী নব্বুই । সবিতাব্রত হিসেব রেখেছে ।

শতকরা এই নব্বুইয়ের ফিরিস্তি দেবার মুখেই মালা নন্দী হেসে সারা ।—এই নব্বুই জনদের নিয়েই আমাদের যত ঝামেলা । প্লেনের টিকিট কাটার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তারা শুধু কর্তব্য নয়, আমাদের ওই ক'ঘণ্টার মালিকানা পর্যন্ত কিনে ফেলে । তারা অতি সভ্য-ভব্য, কেউ বেশি লাজুক, কেউ বেশি ফরওয়ার্ড । কথায় কথায় ধন্যবাদ দেবে, মার্জনা চাইবে —কিন্তু তাদের খুচখাচ চাওয়া আর টুক-টাক অসুবিধে লেগেই আছে । কারো জল তেষ্টা পেল কারো চায়ের, কেউ মাথা ধরার ট্যাবলেট চাইল, কেউ খবরের কাগজ । যতক্ষণ কাছ দিয়ে চলাফেরা করা গেল ততক্ষণ কারো কিছু দরকার হল না—বসলেই উসখুসুনি । সারাক্ষণের মধ্যে অনেকে আবার মুখ ফুটে চাইতে বা বলতেও পারে না কিছু—অথচ বেচারী-মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায় মনে মনে ডেকে ডেকে সারা একেবারে । উঃ, এই নব্বুই জনকে নিয়েই একেবারে হিমসিম অবস্থা আমাদের ।

সবিতাব্রত ব্যাখ্যা-বোধক মন্তব্য নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ, যে নব্বুই জনের তুমি একজন, কানে মুখ ঠেকিয়ে কথা না বলা পর্যন্ত রেহাই দেবে না ।

এর থেকে অনেক স্থূল আর অশালীন কথাও মুখে আটকায় না সবিতাব্রত নন্দীর । শুনে অভ্যস্ত বলেই হোক বা বিগত দিনের চাকরির অভিজ্ঞতার দরুনই হোক, তেমনি লজ্জা পাওয়ার মেয়ে নয় মালা নন্দী । মাঝখান থেকে আমিই বা লজ্জা পেয়ে মুখ নষ্ট করি কেন । তার থেকে ওই নব্বুই জনের পক্ষ নিয়ে লড়ার চেষ্টা বেশি মুখরোচক হবে মনে হয় । অভিযোগকারিণীর উদ্দেশে চোখ পাকাই :—যাত্রীদের নামে এ-রকম বদনাম রটাচ্ছ, এখনো তুমি ওই চাকরিতে থাকলে নির্ঘাত বরখাস্ত করার ব্যবস্থা করতাম । সব তোমার বানানো কথা ।

বানানো ! প্রতিবাদে সুনয়নার দু'চোখ কপালে উঠেছিল ।

স্ত্রীকে মিথ্যাভাষিণী বলার দরুনই যেন সবিতাব্রত আরো গম্ভীর । শিথিল চাদরটা কাঁধের দিকে ভাল করে চালান দিতে দিতে প্রশ্ন নিক্ষেপ করল, কাগজের সের কত করে ?

না বুঝে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছি, কি কাগজ ?

এমনি কাগজঅলার কাছে বিক্রীর কাগজ ?

খবরের কাগজ বোধ হয় চৌদ্দ আনা...

না, খবরের কাগজের কথা বলছি না, দু'হাত ফাঁক করে ছোটখাট মাপ দেখাল, এমন কাগজ—সাদা কাগজ নয়. লেখা কাগজ ।

প্রশ্নের তাৎপর্য তখনো দুর্বোধ্য আমার কাছে । কিন্তু মালা নন্দী বুঝেছে নিশ্চয়, তার বিড়ম্বিত মুখে লালের খেলা আর কণ্ঠে তর্জন । দেখো, ভালো হবে না বলছি ।

অতএব রসের খোরাক কিছু আছেই । সবিতাব্রতর চোখ থেকে গম্ভীর প্রশ্নটা মেলায়নি তখনো । জবাব দিলাম, যা দিন-কাল, আট দশ আনা হবে ।

সবিতাব্রত বলল, আচ্ছা আট আনাই ধরা যাক । আর, বই লিখে কত পারসেণ্ট রয়েলটি পাও তুমি ?

ফের ! প্রিয়দর্শিনীর নিরুপায় ভ্রূকুটি ।

ফলে আমি যেন হাকিমের জেরায় পড়েছি, জবাব দিলাম, কুড়ি—

কুড়ি পারসেণ্ট । সবিতাব্রত দুই এক মুহূর্তের হিসাবে মগ্ন ।—শোনো, সব মিলিয়ে আট বছর এয়ার হোস্টেসের চাকরি করেছে মালা । একুশ বছরে বি, এ, পাস করে বাইশ বছরে চাকরিতে ঢুকেছিল—কিন্তু ঢোকার সময় উনিশ বছর বয়েস লিখেও ধরা পড়েনি বা কেউ ধরতে চেয়ে ঝামেলা করেনি । তারও এক বছর আগে অর্থাৎ আঠারো বছর বয়সে আমাদের মেয়েরা সচরাচর বি,এ, পাস করে কিনা—চাকরি যারা দিয়েছে চেহারা দেখে তারা এ নিয়েও মাথা ঘামায়নি । মোট কথা চাকরিটা পাবার জন্য ও যত ব্যস্ত হয়েছিল, চাকরি দেবার জন্য তারাও তার থেকে কম ব্যস্ত হয়নি—

এই পর্যায়ে মহিলা উঠে পালানোর মতলব করেছিল । শাড়ির আঁচলে একটা টান দিয়ে সবিতাব্রত আবার তাকে বসিয়ে দিয়ে বলল, বোসো, প্রকারান্তরে তোমাকে মিথ্যেবাদী বলা আমার সহ্য হবে না—

কয়েক মুহূর্তের ফাঁকে ছোট একটু হিসেব সেরে আমি ঈপ্সিত বিষয় উপভোগ করেছি । হিসেব যা মিলল তাতে মালা নন্দীর এখন বয়স দাঁড়ায় কম করে পঁয়তিরিশ । বাইশ বছরে চাকরিতে ঢুকেছে, আট বছর হাওয়াই হোস্টেসি করেছে, আর বিয়ের পর গ্রাউণ্ডেড অর্থাৎ হাওয়াই অফিসে চাকরি করেছে তাও পাঁচ বছর হয়ে গেল । কিন্তু দু'বছর ধরে তাকে দেখেও আমার ধারণা ছিল ওদের বয়েসের ফারাক বেশি, মালা নন্দীর বয়েস বড় জোর আটাশ কি ঊনত্রিশ । তাও সবিতাব্রতর বয়েস ভেবেই ওই বয়েস মনে হয়েছিল, নইলে আরো কম ভাবতুম। সবিতাব্রতর বয়েস এখন বিয়াল্লিশ হবে—আমার থেকে এক বছরের ছোট ।

স্ত্রীকে বসিয়ে অপবাদ নাকচ করার জন্য সে আবার আমার দিকে ফিরল ।—নামকরা লেখক ছেড়ে আমরা নামকরা সঙ্কলকও নই, তাই অর্ধেক রয়েলটিই ধরা যাক । ওই আট বছরে প্রেমপত্র নেমন্তন্ন পত্র ডেট রাখা এবং দেওয়ার অনুরোধ পত্র, হা-হুতাশের পত্র, এমনকি আত্মহত্যার কান্না-ভেজানো হুমকি পত্রও ও যত পেয়েছে তার সব একসঙ্গে ওজন করলে

সের পনের হত । তার থেকে খুব কড়া করে বেছে বেছে একটা বই ছাপলে তোমাদের এই সব জলো উপন্যাসের থেকে অনেক ভাল হাজার পৃষ্ঠার একটা বই হতে পারত, আর তার পনের টাকা দাম ধরলেও হাজার পিছু টেন পারসেন্ট—পনের শ' টাকা ঘরে আসত। কিছু না করে শুধু সের দরে বেচে দিলেও সাড়ে সাত টাকায় একদিনের বাজার খরচ চলে যেত। বিয়ে করার ফলে হোস্টেসের চাকরি ছাড়তে হয়েছে বলে মনের দুঃখে সেই আট বছরের চিঠির বস্তা সব পুড়িয়েছে—নইলে হাতে-নাতে দেখিয়ে দিতুম। এখন বুঝলে প্যাসেঞ্জারদের ওই সব বিহেভিয়ার অ্যাবসল্যুট প্লেন ট্রুথ কি না?

চাপা হাসিতে টস টস করছে মালা নন্দীর মুখ। আমার সত্যিকারের আফশোষ। —বুঝলাম। কিন্তু চিঠিগুলো একেবারে সব পুড়িয়েছে?

স-ব। তবে তোমার আক্ষেপ আমি একটু আধটু দূর করতে পারি—দাঁড়াও, ভাবি। হ্যাঁ মনে পড়েছে। টেনে টেনে আবৃত্তি করল,

তোমার বক্ষের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে।

পড়েছ কোথাও?

জবাব দেব কি, রমণীর যে মুখ এখন দেখার মত হয়ে উঠেছে আমার দৃষ্টি সেই দিকে। এ-ধার থেকে সবিতাব্রত ঝাঁঝিয়ে উঠল, আমার সামনেই তুমিও পূর্ণিমা আবিষ্কার কবতে চেষ্টা করলে বরদাস্ত হবে না, এদিকে ফেরো—পড়েছ?

ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘাড় ফেরালাম। বললাম, 'তোমাব' নয়, 'আমার বক্ষের কাছে' পড়েছি—রবীন্দ্রনাথের!

তাহলে বোঝো মালার কবি কত উদার—আমার-কে স্রেফ তোমার কবে ছেড়ে দিয়েছে।

মালা নন্দীকে আর ধরে রাখা গেল না। উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ সামলাতে না পেরে সে উঠে পালালো।

এই আনন্দের কোনো মূল্য নিরূপণ হয় কিনা আমার জানা নেই। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় আর ফাঁক পেলে দিনেও হাজিরা দেবার পিছনে আমার কিছু উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যের কথা মালা না জানুক, সবিতাব্রত জানে। কিন্তু খানিকক্ষণের এই আনন্দটুকুই তলায় তলায় বড় আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। সবিতাব্রত তাও বোঝে। বেপরোয়া ঠাট্টা ইসারা করে বসে এক এক সময়। আমার মুখের করুণ অবস্থা দেখে মালা তাকে ধমকায়! জবাবে সবিতাব্রত ফিরে আবার তাকে জব্দ করার ফাঁক খোঁজে।

তেলে-জলে মেশে না। আলো-আঁধার মেশে না। এই আনন্দেও গ্লানি মেশে না।

।। দুই।।

কিন্তু এই সবিতাব্রত নন্দী যখন অন্যমনস্ক হয়, খোলা জানলা দিয়ে বিমনা দৃষ্টিটা যখন দূরের শূন্যে উধাও হয়, উড়ন্ত চিল বা পাখি যখন সেই দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, হাল্কা ভাসমান মেঘগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দু'চোখে যখন ক্লান্তি নামে—তখন আর এক দৃশ্য। শুধু মালা

নন্দী কেন, আমিও দেখেছি । তখনই শুধু মনে হয়, যা দেখেছি সেইটুকুই সব নয় । সমুদ্রের বুকে এত ঢেউ এত গর্জন এত কলোচ্ছ্বাস—কিন্তু ভিতরে ? পাহাড় এত স্থির এত শান্ত কিন্তু ভিতরে কোন তাড়নার আগুন জ্বলছে ?

একটু আগের হাসি-খুশী গঞ্জনা-ব্যঞ্জনা দেখলে বা শুনলে কেউ বলবে না যে এই লোক সেই সে-দিনের ডাকসাইটে হাওয়াই জাহাজের ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী—সুদিনে দুর্দিনে ঝড়ে জলে দুর্যোগে এ-যাবৎ বহু সহস্র যাত্রীর প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে যে ভারতের আকাশ ছেড়ে গোটা পৃথিবীর আকাশেও বারকতক চষে বেড়িয়েছে । গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা শান্ত মূর্তি এই নীলিমায়-বিলীন শূন্য দৃষ্টি দেখে কেউ বলবে না, এই সেই চার সোনালি স্ট্রাইপ আঁটা ভয়শূন্য দ্বিধাশূন্য আত্মনির্ভর প্রতীক দুর্দম ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী—সমস্ত আকাশ-লিপি যার দৃষ্টি-দর্পণে ।

এই দূরের তন্ময়তা থেকে মালা নন্দী প্রায়ই এক-একটা হ্যাঁচ্‌কা টানে যেন ফিরিয়ে আনে তাকে । সেদিন কথার মাঝে বার দুই তিন তাকে লক্ষ্য করেই আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, দেখছেন কি ? মন আর এই জগতে নেই, বাড়ি-ঘর স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে, ওই দূরের পাখিটা পেরিয়ে, ওই-ওই বহু দূরের মেঘটা ডিঙিয়ে, একেবারে মুক্ত নীলিমায় ডানা মেলে দিয়েছে ।

কথার ঘায়ে সবিতাব্রতর তন্ময়তা কাটে, দৃষ্টি গুটিয়ে আবার ঘরে ফিরে আসতে সময় লাগে না । ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে হাসে !

জিজ্ঞাসা করল, কি বলছিলে ?

ছদ্ম ঝাঁঝে মালা জবাব দিল, বলছিলাম আমি আর এখন অফিস থেকে ছুটি-ফুটি নিতে পারব না, ছুটি চাইতে গেলে সবাই হাসে এখন, পাসও দুই-সেটই খতম, তাছাড়া, ছেলের স্কুল ছুটি হতে এখনো ঢের দেরি—বছরে ক'বার করে কামাই করব ? আকাশই দেখো এখন, নট নড়ন-চড়ন—

গর গর করে শত বাধার ফিরিস্তি দিয়ে মালা নন্দী যেন কিছু একটা সকাতর প্রত্যাশা সাদা-সাপটা নাকচ করে দিল—এর ওপর আর আবেদন চলবে না ।

তার মুখের দিকে চেয়ে সবিতাব্রত হাসছে অল্প অল্প । অর্থাৎ এবারে নিজে মুখ খুলবে । বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমি ওদের এই মান-কলির নীরব দর্শক । কিন্তু নীরব দর্শকেরও সরস একটা ভূমিকা আছে । রসগ্রহণের ভূমিকা ! আমাকে লক্ষ্য কবে সবিতাব্রত বলল, ছেলেবেলায় কি একটা গল্প পড়েছিলাম, হরিভক্ত হরিনাম শুনলেই ছেলেদের কাছে চটার ভান করত—আর ছেলেরা তাকে দেখলেই বেশি করে হরি-হরি করত । ছেলেবা তো শেষে ব্যাপার বুঝতে পেরে দিলে হরিনাম বন্ধ করে । ভক্তের তখন প্রাণ যায় আর কি—সকলের কাছে হাতজোড় করে অনুনয়, ওরে তোরা হরিনাম কর— । সেই অবস্থা হয়েছে । নিজেই হাঁপিয়ে উঠে এখন আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বেরুবার ফাঁক খুঁজছে । এই ফাঁকটি না দিলে তখন হাত জোড় করবে ।

সবিতাব্রতর এই পাল্টা আক্রমণও অতিশয়োক্তি মনে হয়নি আমার । তার মন শূন্যে ধাওয়া করলে মালা নন্দী সচকিত হয় বটে, কিন্তু সে-শুধু নিজে প্রয়োজনের খাঁচায় আর চাকরির খাঁচায় আটকে আছে বলেই । খাঁচার দোসর খাঁচা ছেড়ে পালাতে চাইলে পড়ে যে

থাকল সে ধরে রাখতেই চায় । আমি জানি সে ধরে রাখতে চায় । আমি জানি, উড়তে পারলে ওরা দু'জনেই ওড়ে । আমি জানি, খাঁচা থেকে একটু ফাঁক পাওয়ার জন্য দু'জনেই ওরা উন্মুখ হয়ে থাকে ।

ঘরে বসে অসময়ে দুই একটা এরোপ্লেনের শব্দ কানে এলে মালা নন্দীর কৌতূহলই বরং বেশি দেখেছি ।

—কনস্টেলেশান মনে হচ্ছে, এ-সময় আবার চললেন কোথায় !

নিয়মিত সময়ের কখন কোন্ বিমান চলল, উঠে না দেখেই বলে দেয় ।— কাঞ্চনজঙ্ঘা চলল !

—এটা নন্দাদেবী । ওটা ধবলগিরি । কখনো বলে, নামগুলো সুন্দর, না ?

আমার মনে হয়েছে কোনো প্লেনের নাম পদ্মলোচন বা গজানন হলেও তার সুন্দরই মনে হত । কারণ, এই সৌন্দর্য কল্পনার উৎস নামে নয়, এর উৎস মনে— যে মন ওই যন্ত্র বলাকাগুলোর থেকেও অবিরাম অনেক অনেক দ্রুত ছুটছে ।

মালার চাকরিতে বছরে যদি বারো সেট ওড়ার পাস জুটত আর অফিসে হাজির দেবার বাধ্য-বাধকতা না থাকত তাহলে বোধহয় পরম নিশ্চিন্ত হতে পারত ওরা । না, তাও পারত না, আরো অন্তরায় আছে । পাসের জন্য নড়া আটকাত না, এইবেলা দরাজ হাত দুজনেরই । প্রধান অন্তরায় ছেলে—বড় ছেলে, বড় ছেলের পড়াশুনা । দুটি ছেলে তাদের, সুব্রত আর প্রিয়ব্রত । বড় ছেলের নাম মালা নাকি ঝগড়া করে আর জোর করে সবিতাব্রতর সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছে । ছোট ছেলের নামও তেমনি মিলিয়ে সত্যব্রত রাখার ইচ্ছে ছিল মালার, কিন্তু বাপের ঘোর আপত্তির দরুন সেই ইচ্ছের সঙ্গে কিছুটা আপস করতে হয়েছে ।

এই বড় ছেলের পড়াশুনার ব্যাপারে ওদের আলোচনা শুনেছি । অল্প খরচে ভাল কোনো হস্টেল পেলে সেখানেই দিয়ে দেবে । তারপর ছোটটা আর একটু বড় হলে তাকেও পাঠাবে । ছেলে দুটো ওদের চোখের মণি । গল্প করার ফাঁকে ফাঁকেও মালা উঠে পাঁচবার করে দেখে আসে ওরা কি করছে । খানিকক্ষণ সাড়াশব্দ না পেলে ঘাড় বাঁকিয়ে সবিতাব্রতও সামনের ঘরের দিকে উঁকিঝুঁকি দেয় । কিন্তু স্নেহ অন্ধ হলে যে চলে না সেই বোধও তাদের আছে । ওদের হস্টেলে পাঠানো দরকার নিজেদের স্বভাবের জন্যই । মন হাঁপিয়ে উঠলে থাকল স্কুল, থাকল পড়াশুনা । চল্ চল্ চল্—এসে হবে আবার, ডবল পড়ে শুধরে নিবি । কিন্তু শুধরে নেওয়া যে যায় না এ-ও তারা বোঝে । সেই কারণেই সমস্যা ।

আমার সব থেকে বেশি কৌতূহল বোধ হয় এদের ওই বড় ছেলে সুব্রতকে নিয়ে ।

ওদের বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর । বড় ছেলের বয়স দশ বছর । এও তেমন বিচিত্র বিস্ময় কিছু নয় । প্রবৃত্তির গ্লানি বিয়ের আগুনে শেষ পর্যন্ত পুড়ে নিঃশেষ হওয়াও হয়ত সম্ভব । কৌতূহলের তাড়নায় এই প্রসঙ্গে ঠাট্টা করেও কোনদিন একটু গ্লানি ছিটে ফোঁটাও দেখিনি ওদের চোখে-মুখে । প্রসন্ন পরিতুষ্ট কৌতুকে বরং দু'জনকে দুজনেব দিকে তাকাতে দেখেছি । আর এই বড় ছেলের প্রতিই যেন দু'জনেরই ওদের বেশি টান. বেশি স্নেহ লক্ষ্য করেছি ।

এয়ার হোস্টেসি ছেড়ে মালা নন্দী গ্রাউণ্ডেড হয়েছে অর্থাৎ এয়ার অফিসে বসা কাজ করছে মাত্র পাঁচ বছর, তার আগে নিয়মিত আকাশে উড়তে হত তাকে । এই কাজে লেগে

থেকে সন্তান সম্ভাবনা গোপন করা সম্ভব নয়। অন্তত সুদীর্ঘকালের অনুপস্থিতি ভিন্ন সম্ভব নয়। আবার পুরোপুরি গোপন না থাকলে এয়ার হোস্টেসের চাকরি বজায় রাখাও সম্ভব নয়। এ চাকরি আর কিছু তো দূরের কথা বিয়েও বরদাস্ত করে না।

কিন্তু আমার বিস্ময় এই কারণেও নয়। অন্য কারণে। আমার বিস্ময় ওই ছেলের দিকে চেয়েই। দেখলে আদৌ বাঙালী ছেলে বলে মনে হয় না ওকে, ওদের দুজনের একজনেরও সামান্য মুখের আদলও নেই মুখে। দেখতে সুশ্রী, স্মার্ট, কিন্তু কপাল সামান্য উঁচু, ভুরুর নিচে নাকের কাছটা সামান্য চাপা। চাপা নাক আর কপাল উঁচু, বাঙালী ছেলে অনেক আছে জানি, কিন্তু তবু অন্যরকম লাগে কেন জানি না।

সবিতাব্রতকে আমি তার আট বছর বয়স থেকে জানি। বাইশ তেইশ বছব বয়েস পর্যন্ত একটানা এক বাড়িতে এক সঙ্গে কাটিয়েছি আমরা। এক সঙ্গে খেলেছি, ঝগড়া মারামারি করেছি, একই স্কুল কলেজে পড়েছি। তারপর দীর্ঘ ষোল সতের বছরের ছেদ। দূরের স্মৃতির মত কখনো মাঝেসাঝে মনে পড়ত ওর কথা।

এই দু'বছর হল আবার দেখা। ওরা বাইবে না গেলে এই দু' বছরের যোগাযোগে ছেদ বড় পড়েনি। পড়েনি, কারণ আমি পড়তে দিই নি। অন্তরঙ্গতা বরং আগের থেকেও নিবিড় হয়েছে। তারও কারণ সম্ভবত সবিতাব্রতর নির্লিপ্ততা। ওকে দেখে মনে হয়েছে নিজের একটা বিচ্ছিন্ন বেষ্টনীর মধ্যে ও যেন অনেকটাই সম্পূর্ণ। জীবনে প্রস্তুতির গোড়ায় যে মানুষ চোখের আড়াল হয়েছিল সে এক সবিতাব্রত। আর, মর্মান্তিক মাশুল গুণে সেই বিপুল উদ্দাম কর্মজীবনের স্বর্ণচূড়া থেকে বড় অসময়ে এই অক্ষমতার বিবরে এসে আশ্রয় নিয়েছে যে, সে আর এক সবিতাব্রত। ওর মুখে নয়, ফোর স্ট্রাইপ পাইলট ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দীর অনেক গল্প আমি শুনেছি মালা নন্দীর কাছ থেকে। সে-ও গল্প শোনাবে বলে শোনায় নি কিছু, ওর সামনেই কোনো ঘটনার কথা হয়ত বা ফাঁস করেছে লঘু বিতর্কের মুখে।

সাফল্যের সেই দর্প সেই গর্ব হঠাৎ ধূলিসাৎ হলে কি হয়? পুরুষকারের সেই চূড়া থেকে হঠাৎ মাটিতে আছাড় খেলে কি হয়? এধরনের বিপর্যয়ের অভিশাপ মাথায় নামালে মানুষ সচরাচর গোটা দুনিয়াটাকে আঁকড়ে ধরতে চায়—ঘরের ছেড়ে সামান্য চেনা-জানা মুখগুলোর কাছ থেকেও সে সহানুভূতি চায়। তার বুকের তলায় প্রত্যাশার আগুন দ্বিগুন হয়ে জ্বলতে থাকে।

এই নজিরই আমি দেখে অভ্যস্ত। মালিকের কোপে পড়ে কোন পদস্থ অফিসার বন্ধু সাত দিন সাত রাত্রি ঘুমোয়নি মনে পড়ে। তাকে কাঁদতে দেখেছি, সেই মুখে ভয় আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বিভীষিকা দেখেছি। মালিকের কাছে সুপারিশ করার জন্য ওপরঅলা ছেড়ে তার অধস্তন কর্মচারীর কাছেও তাকে বিশীর্ণ আকুতি জানাতে দেখেছি। সকলকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে, সকলের সহানুভূতি কাম্য ভেবেছে। তারপর সেই দুর্বহ চিন্তাজ্বর আর বইতে না পেরে চুপিসাড়ে পালিয়েছে সে আত্মঘাতী হয়ে একেবারে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে।

সেই মুখ মনে পড়লে বুকের ভিতরে খচ্ খচ্ করে, চোখে জলও আসে। কিন্তু সম্ভ্রমে মাথা নত হয় না।

ঠিক এই না হোক, এইগোছের চিন্তাজ্বরক্লিষ্ট মুখ আরো অনেক দেখেছি আমি।

কিন্তু এই মানুষটা ? এই সবিতাব্রত ?

আকাশের নিথর শান্তি লণ্ডভণ্ড করে আর ভ্রূকুটি-দুর্যোগ তুচ্ছ করে গতির সাধনায় মাতোয়ারা হয়েছিল যে, দর্পোদ্ধত পদক্ষেপে মাটি কাঁপে ভাবত যে—তার জীবনের এই মারাত্মক ছন্দপতন কতটুকু বোঝা যাবে ওই গলা পর্যন্ত ঢাকা চাদর গায়ে শান্ত নিরীহ লোকটার মুখের দিকে তাকালে ?

কিছুই বোঝা যাবে না।

তার ওই দু'চোখ মাঝে মাঝে শূন্যে হারানো যারা না দেখেছে, তাদের মনে হবে ও যেন কিছুই হারায়নি। এক দুনিয়া থেকে খসে আর এক দুনিয়ায় এসে ঠেকেছে। সেখানে এসেছে সকৌতুকে সেটাই দেখছে চেয়ে চেয়ে। কোনো কিছুর সঙ্গেই সে আপস করেনি, শুধু মিশে গেছে।

দুটো ঘটনার কথা উল্লেখ করলে ওর মনের চিত্রটা স্পষ্টতর হতে পারে।

অন্তরঙ্গ কেউ এলে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে হাসি বিদ্রূপ ঠাট্টা ওর মুখে লেগেই আছে। নিয়মিত আগন্তুকের মধ্যে আমি একজন। পুরনো বন্ধু বলে হোক, বা আমি এলে লোকটা খুশি হয় বলে হোক. মালা নন্দী খাতিব যত্ন করে আমাকে। কোনো কাজে আটকে দু'দিন আসতে না পারলে টেলিফোন করে। এই নিয়েই সবিতাব্রত মনের আনন্দে এক এক সময় স্থূল ঠাট্টাও করে বসে। আমার এক-একটা জনপ্রিয় সাহিত্য সৃষ্টির মূল ধরে নাড়া দিয়ে প্রশংসার ছলে পরিহাসে জর্জরিত করে তুলতে চায় যখন আমাকে, মালা নন্দী তখন আমার হয়ে তর্ক করে, ওকালতি করে। না পেরে উঠলে ঠেস দেয়, পড়াশুনা তো শুরু করেছ সবে এই পাঁচ বছর, মনস্তত্ত্বের তুমি বোঝো কি, এর আগে তো পায়ে করে লোকের মন মাড়িয়েছ শুধু ! আমি বলে সহ্য করি.।

ঠিক। অম্লানবদনে সায় দেয় সবিতাব্রত, তোমার দয়ার শেষ নেই—দয়াবতী খেতাব মেলা উচিত তোমাব।

মালার চোখ মুখ রেগে লাল হয়ে ওঠে তক্ষুনি, ঝাঁঝিয়ে ওঠে, দয়ার কথা কে বলছে ? তোমাকে দয়া করতে যাবে কোন্ আহাম্মক্--

সামান্য ব্যাপারে প্রসন্নবয়ান মহিলার এই রাগ দেখে আমার অবাক লাগত একটু। কিন্তু কোন্ কথায় তাকে রাগানো যায় আর কোন্ কথায় হাসানো যায় সবিতাব্রত তা যেন খুব ভালো করেই জানে। উক্তি সংশোধন করে নিতে সময় লাগে না তার। মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, তা'হলে বোধহয় প্রেমের শেষ নেই তোমার, প্রেমবতী খেতাব মেলা উচিত।

মহিলার রাগে ফাটল ধরে তখন, সেই ফাটল দিয়ে হাসি উপছোয়।

সবিতাব্রত আবার ভয়ে ভয়েই যেন তাকায় তার দিকে। বলে, কিন্তু প্রেম যে বড় উদার জিনিস, সাহিত্যিকের প্রতি যে দরদ দেখেছি—তাকেও ছিটেফোঁটা বিলোচ্ছ না তো ? অসহায় দুই চোখ আমার দিকে ঘুরেছে তারপর, দেখো ভাই, অক্ষমের যষ্ঠি ও, বেশি নিয়ে আবার পথে বসিও না আমাকে।

বলার মত করে বলতে না পারলে এই পরিহাসের ফাঁক দিয়েও দৈন্য প্রকাশ হয়ে পড়া বিচিত্র নয়। আমি হেসেছি, কিন্তু লক্ষ্য করেছি তাকে। দৈন্যের ছিটে ফোঁটাও আবিষ্কার

করতে পারিনি । মালা শুধু হেসেছে, পরিহাস গায়ে মাখেনি । অথচ আগের ওই সামান্য উক্তিতে তাকে যথার্থই রাগতে দেখেছিলাম ।

সেদিন একদঙ্গল লোক এসেছিল দেখা করতে—সবিতাব্রতর পুরনো সঙ্গীর দল । কেউ পাইলট, কেউ রেডিও এঞ্জিনিয়ার, কেউ ফ্লাইট্ এঞ্জিনিয়ার । সবসুদ্ধ্ জনা পাঁচেক । অনেকেই মাঝে মাঝে আসে এখনো, চা খায়, গল্পগুজব করে বসে । এই সুবাদে আমার সঙ্গেও অনেকেরই আলাপ হয়ে গেছে ।

দল ভারী থাকায় আড্ডাটা ভালো জমেছিল সেদিন । মালা তিনবার চা সরবরাহ করার পর বলেছিল, এই শেষ, আর হবে না, আমাকে দু'দণ্ড বসতে দিলে না পর্যন্ত ।

যারা এসেছিল তারা সকলেই অবাঙ্গালী । আর সকলেই মালারও সুপরিচিত । একসঙ্গে সকলকে না হোক, তাদের প্রত্যেককেই অনেকবার দেখেছি এবাড়িতে । হুকুম করে আর আব্দার করে মালাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারলে তাদের ফূর্তি । সবিতাব্রত মজা দেখে, চুপি চুপি আবার ইন্ধনও যোগায় ।

সেদিনও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হৈ-হুল্লোড়ের পর তারা চলে যেতে আমি সবিতাব্রতর উদ্দেশে মন্তব্য করলাম, এঁরা সত্যি ভালবাসেন তোমাকে, এখনো টান আছে ।

জবাবে মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল সবিতাব্রত । ওর এই হাসি মালার ঈষৎ শঙ্কার কারণ মনে হল । শুধু আমার কাছেই এই হাসির অর্থ তেমন স্পষ্ট নয় ।

গায়ের চাদর মাঝে মাঝে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো স্বভাব তার । তাই করে আঁটসাঁট হয়ে বসল । তারপর নির্লিপ্ত মুখে একটি চরিত্র বিশ্লেষণে বসল যেন ।—আমাদের এক ডাক্তার বন্ধু ছিল, নাম ঝম্পটি । ভারী অমায়িক আর বন্ধুবৎসল, কারো কিছু হল তো অমনি নিজের সাত কাজ ফেলে ছুটল দেখতে । দরকার হলে দিনের মধ্যে তিনবার যাবে, দরকার হলে সমস্ত রাত্রি থেকে শুশ্রূষা করবে ।

গল্পের এই আবেষী ভনিতার ফাঁকে মালার ঠোঁটে চাপা হাসি আর মুখে বিড়ম্বনার ছায়া লক্ষ্য করেছি ।

সবিতাব্রত বলে গেল, একবার সেই ডাক্তার তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে সত্যই কঠিন রোগ থেকে সারিয়ে তুলল । কিন্তু সেরে উঠে সেই অকৃতজ্ঞ বন্ধু কেবল তার জীবনদাতার মাথাটা দু'ফাঁক করার তাল খোঁজে । শেষে এমন দাঁড়াল যে ঝম্পটিকে একদিন কাজ ছেড়ে চম্পট দিতে হল । তবে সে একা গেল না, রোগ সারানোর বিনিময়ে বন্ধুর স্ত্রীটিকে শুধু নিয়ে গেল । ঝম্পটির একটুও দোষ নেই, তার বন্ধুপ্রীতির সুনাম সকলেরই জানা ছিল । সে দেখতে এলেই রোগী রোগ ভুলে যে-যার বউ সামলানোর তাড়নায় আপনি তাড়াতাড়ি সেরে উঠত । কিন্তু এই বোকা লোকটা ওদিকে খেয়াল না করে সেরে উঠতে দেরী করেছে । আর তার ওপর ডাক্তার-বন্ধুর প্রগাঢ় টান দেখে মুগ্ধ হয়েছে । গল্প শেষ করে সশব্দে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, এরা কাকে হারিয়ে কার টানে যে ছুটে ছুটে আসে সে যদি জানতে বন্ধু—

মুখ লাল করে মালা বলে উঠল, কখখনো না, কেমন ছোট নজর দেখেছেন ?

সবিতাব্রত প্রসন্ন বদনে হাসতে লাগল । অগত্যা মালার পক্ষ নিয়ে আমি বললাম, এতটা বলা আবার তোমারও বেশি-বেশি ।

বেশি-বেশি ? মুখের হাসি নকল-গাম্ভীর্যের আড়ালে সরে যেতে লাগল ।

উক্তির ফলে আমার মুখখানাই যেন এবারে বিশ্লেষণের বস্তু । কাঁচা সাক্ষীর প্রতি প্রতিপক্ষের সদয় উকীলের জেরার মত করে বলল, তা হলে তোমাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করি, রাগ করো না । তুমি তো সেই ছেলেবেলার বন্ধু, একেবারে আসল টানের বন্ধু । মাঝে ষোল-সতের বছর ছাড়াছাড়ি, তারপর এই দু'বছর দেখা । তুমিও খুশী । আমিও খুশী । অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে ঘরে বসে খাচ্ছি-দাচ্ছি, তুমি রোজ এসে দেখে যাচ্ছ, গল্পগুজবে দিব্বি সময় কেটে যাচ্ছে । কিন্তু ধরো, আঙুল তুলে মালাকে দেখালো—এর মধ্যে ও যদি না থাকত তাহলে এই অক্ষম পুরনো বন্ধুর টানে ঠিক এই রকমই কি রোজ আসতে তুমিও ? সঙ্গে সঙ্গে নিজেই হেসে সারা, জাস্ট টেক্ ইট্ ইজি ম্যান, অ্যাণ্ড থিঙ্ক্—ইট্স্ অল ভেরি ন্যাচারাল হোয়াই ডিনাই ! আসতে রোজ ?

যতক্ষণে সে বলা শেষ করেছে, ঠিক ততটুকু সময়ই আমি ফাঁপরে পড়েছিলাম । আমাকে ভাবতে হয়নি, বলার সঙ্গে সঙ্গে মালা-শূন্য এই সংসারের নিষ্প্রভ দিকটা কল্পনায় এসেছে । তার অনুপস্থিতিতে যে আসা তাতে কর্তব্য থাকত, রঙে-রসে সেটা এমন পরিপূর্ণ হত না, তাতে মনের প্রত্যাশা কিছু থাকত না ।

এবারে আমি হাসছি । আর হাসতে দেখেই সবিতাব্রত পুলকিত । বলে উঠল, ইয়েস্ দ্যাটস্ স্পোর্ট ।

আমাকে হাসতে দেখে মালা নন্দীও স্বস্তি বোধ করেছে । তারই বিড়ম্বনার একশেষ । হাসি সামলে এবারে সে আমার উদ্দেশে চোখ পাকিয়েছে, আপনি আর হেসে আসকারা দেবেন না, নিজে যেমন অন্যকেও তাই ভাববে তো—এই লোকের সঙ্গে তর্ক কোনো ভদ্রলোকে করে !

বললাম, আমি অন্য কারণে হাসছি ম্যাডাম । ওর ওপর রাগ করব কি করে, এরোপ্লেনে দিল্লী যেতে সেই প্রথম তোমাকে দেখে ঠিক এই রকমই একটা ছোট-খাট গবেষণা আমিও করেছিলাম ।

আনন্দে চাদরের তলা থেকে হাত বার করে আমার একটা হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে সবিতাব্রত । এই বিশ্বাসঘাতকতায় হাল ছেড়ে মালা নন্দী বলল, সব সমান আপনারা, একেবারে নির্লজ্জ ।

আর একদিন ।

এই দিনের চিত্রটা মনে আরো বেশি দাগ কেটে আছে ।

সন্ধ্যা পার করে একটু দেরিতেই এসেছিলাম । এসে কেমন মনে হল, এখানকার সমাচার কুশল নয় খুব । এদিকের ঘরে ছেলেদের পড়াতে বসেছে মালা, ওদিকের ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে, বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে সবিতাব্রত একলা শুয়ে ।

কি হে, এসময় শুয়ে যে ?

হাসিমুখে সবিতাব্রত উঠে বসল, এসো তোমার আশাতেই ছিলাম । ইশারায় সামনের ঘর দেখিয়ে বলল, বেজায় চটেছে, একটু চেষ্টা করে দেখো, সন্ধিটা যদি হয়ে যায় ।

এই গোছের রাগ বিরাগ বড় দেখিনি । কিছু না জেনেও শুনতে পায় এমনি গলা উঁচিয়ে বললাম, তুমি একটি চিরকালের পাষণ্ড, আগে অপরাধটা কি করেছ শুনি ?

সবিতাব্রত আবার ইশারা করল, ডাকো না—

অতএব আমার জল তেষ্টা পেল প্রথম। চাকরটা রান্নায় ব্যস্ত। জলের জন্য হাঁক-ডাক করতে মহিলা জল নিয়ে এলো।

মুখখানা থমথমে গম্ভীর। আর, তক্ষুনি সবিতাব্রতর মুখ তেমনি করুণ। মুহূর্তে মুখের ভোল এমন বদলে ফেলাও খুব সহজ নয়।

জলের গেলাস নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার, ছেলের পরীক্ষা নাকি, একেবারে কোমর বেঁধে পড়াতে বসে গেছ ?

নির্লিপ্ত জবাব দিল, না এমনি।

আজ ওদের মাস্টার আসেনি বুঝি ?

মিষ্টি করে জবাবটা দিল সবিতাব্রত, বলল, এসেছিল, তাকে ছুটি দিয়ে আজ নিজেই পড়াচ্ছে। একেবারে মাস্টারের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা তো ঠিক নয়। মাঝে মাঝে নিজেদেরও একটু আধটু দেখাশুনা করা উচিত।

মালা নন্দী তার দিকে ফিরে তাকালো না বা কোনরকম মন্তব্য করল না। অগত্যা আমিই আবার হাল ধরতে চেষ্টা করলাম। গম্ভীর মুখের উপর দৃষ্টিটা সহজ করে রাখতে চেষ্টা করে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, এই মাস্টার তেমন ভালো পড়ায না বুঝি ?

জল খান।

ও...। জল উদরস্থ করতে হল তাড়াতাড়ি। গেলাস নিয়ে সে চলে গেল। ব্যাপার তো সুবিধের মনে হচ্ছে না, কি বাধিয়ে বসে আছ আবার ?

সবিতাব্রত হাসছে মৃদু মৃদু।—বলছি। আর একবার চেষ্টা করে দেখো না।

বিব্রত বোধ করে বললাম, এ ব্যাপারে আমি খুব পাকা নই হে, আমার ওপর বিগড়ে যাবে না তো আবার ?

মাথা নেড়ে সবিতাব্রত অভয় দিল, যাবে না। চাটুকারিতার রাস্তাও নিল একটু, বলল, পাঁচজনের কাছে তোমার বইয়ের পঞ্চমুখে প্রশংসা করে, আর লোকে প্রশংসা করলে আমাদের বন্ধু বলে গর্ব করে, তোমার ওপর চট করে বিগড়বে না।

আশ্বাসে বিগলিত হয়ে আমি আবার বললাম, তুমি একটি সত্যিকারের পাষণ্ড।

অগত্যা এবারে উঠতে হল, বসে হাঁক-ডাক করতে ভরসা হল না। দরজার কাছে এগিয়ে এসে সবিনয় আবেদন পেশ করলাম, একটু চা হবে ?

মহিলা ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। আরো মুসকিল, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেলে দুটোও। কিন্তু তাতেই সুফল হল একটু। অনুচ্চ অনুশাসন শোনা গেল, তোমরা কি দেখছ, মন দিয়ে পড়ো। আমার দিকে ফিরে বলল, দিচ্ছি—

উঠে ওদিকে চলে গেল। চোখের ভুল কিনা জানি না, আমার মনে হল গাম্ভীর্য ঈষৎ তরল হয়েছে, দুই ঠোঁটের বজ্র-আঁটুনি সামান্য শিথিল হয়েছে।

ওতেই খুশি হয়ে ফিরে এসে আশ্বাস দিলাম, একটু সদয় মনে হচ্ছে যেন, দেখা যাক্ চা আসছে—এবারে তুমি চট্ করে বলে নাও দেখি ব্যাপারখানা কি ?

সবিতাব্রত নিঃশব্দে হাসল খানিকক্ষণ, তারপরে জানালো কি ব্যাপার। কিন্তু এই বলার মধ্যেও যে নিজেকে আড়াল করেছে সে, সেটা পরে বোঝা গেছে।

খুব হালকা করেই বলেছে, তবু শুনে আমি নিজেই হকচকিয়ে গেলাম একটু ।

যেটুকু বোঝা গেল তার সারমর্ম, প্রায় প্রতিদিনের মতই সেদিনও মালার খাস অফিসার মিস্টার চোখানি তাকে বাড়ি পর্যন্ত লিফ্‌ট দিয়েছে । ভদ্রলোকের কিছু বয়েস হয়েছে, তার ওপর মেজাজী মানুষ । প্রায়ই নিজের গাড়িতে মালাকে লিফ্‌ট দিয়ে থাকে । ট্রামে-বাসে ঠেলাঠেলি করে যেভাবে মেয়েরা যাতায়াত করে দেখলেও নাকি ভদ্রলোকের মেজাজ চড়ে । এ-দিকেই থাকে সে, তাই একজনকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যেতে বাড়তি তো আর খরচ কিছু নেই । অফিসে যাবার সময়ও সানন্দে তাকে তুলে নিয়ে যেতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু ক'দিন এসে নিরাশ হয়ে ফেরার পর সে-চেষ্টা আর করেনি । মালা উচিত সময়ের আধ-ঘন্টা আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে । বলা বাহুল্য, এই আগে বেরুনোর জন্য তার যত রাগ আর বিরক্তি সবই সবিতাব্রতকে মুখ বুজে হজম করতে হয়েছে । যেন সেই চোখানির সঙ্গে যোগসাজসে তাকে সময়ের আগে বাড়ি থেকে বার করছে ।

কিন্তু ফেরার সময়ে যে মেজাজী অফিসার প্রস্তুত হয়ে বসে থাকে তাকে কাটান দেওয়া সহজ নয় । কাটান দেওয়া দরকার আছে বলেও সবিতাব্রত মনে করে না । এই সঙ্গটুকুর বিনিময়ে যাতায়াতের এত বড় ধকল যদি বাঁচে তো সেটা খুব উপেক্ষার বস্তু নয় । আর অফিসের লোকের হাসা-হাসি কানা-কানি ? মালা নন্দীর অন্তত তাতে গায়ে ফোস্কা পড়ার কথা নয় ।

কিন্তু অফিস ফেরৎ মালার মেজাজ প্রায়ই বিগড়তে দেখা যায় । রাগের মাথায় ঘোষণা করে চাকরি-টাকরি বেশি দিন আর করা পোষাবে না তার দ্বারা । কিন্তু পরের দিন আবার অফিসের সময় হলে আগের দিনের ঘোষণা সে নিজেই ভুলে যায় ।

আভাসে ইঙ্গিতে মিস্টার চোখানি তাকে জীবনের সার্থকতার দিকটা অনেকদিন বোঝাতে চেষ্টা করেছে । ফলে মালা অনেকবার সবিতাব্রতর পরামর্শ চেয়েছে, শান্তি বজায় রেখে কি করে লোকটাকে এড়ানো যায়, সবিতাব্রতর কোনো বন্ধুকে ধরে অন্য ডিপার্টমেন্ট-এ বদলী হওয়া যায় কিনা । কিন্তু সবিতাব্রত এ-সব কান দিয়ে শোনেওনি ভালো করে ।

ফলে লোকটা দিনকে দিন প্রশ্রয়ই পেয়েছে । আর আজ সে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে । সবিতাব্রতর ঠাট্টার ফলেই রাগের মাথায় মালা তাকে বলেও ফেলেছে কি বাড়াবাড়ি । চোখানি আজ তাকে কিছু সৎ পরামর্শ দিয়েছে । তার মত চালাক চতুর বুদ্ধিমতী মেয়ে এ ভাবে ওই এক অকর্মণ্য লোককে টেনে বেড়িয়ে নিজের জীবনটা বরবাদ করে দিচ্ছে—এটা কোনো কাজের কথা নয় । তার প্র্যাকটিক্যাল হওয়া উচিত, নিজের দিকে তাকানো উচিত, ইত্যাদি ।

আর এর পরেও সবিতাব্রত কিছুটা ঠাট্টার ছলেই কি একটা বলেছিল বলে এই রাগ ।

কি বলেছিল সবিতাব্রত তা আর শোনা হল না, বা সে-ও বলল না । তার আগেই চায়ের পেয়ালা হাতে মালা উপস্থিত । মুখ আগের মতই থমথমে গম্ভীর ।

পেয়ালা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এক পেয়ালা কেন, ওকে দিলে না ?

না । সবিতাব্রত মোলায়েম করে জানান দিল, শুয়ে বসে থাকি, বেশি চা খেলে অম্বল হয় ।

তার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে আমার দিকে চেয়ে মালা জিজ্ঞাসা করল, আপনার আর

কি কি চাই একবারে বলে ফেলুন ।

ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়েও বললাম, আর বেশি কিছু চাই না, তুমি শুধু ছেলেদের ছুটি দিয়ে এখানে এসে বোসো, তাহলেই হবে ।

মহিলার এই চাউনিটা আশাপ্রদ নয় মোটেই । রাগ চাপতে গিয়েও গোটাগুটি চাপতে পারল না । বলল, কেন, দিব্বি তো এক তরফা শুনছিলেন বসে, তাই শুনে যান, আমি থাকলেই তো কথা বাড়বে আর গণ্ডগোল হবে, নিজের দোষ ঢেকে সাধু সাজতে অসুবিধে হবে ।

খটকা লাগল একটু । সবিতাব্রতর এই ভালো মানুষের মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই । তবু সন্দেহ হল, সেও অপ্রিয় উক্তিই কিছু করে থাকবে । ভিতবে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছি । একমাত্র আশ্রয়ের দিকে কেউ হাত বাড়িয়েছে ভেবে সবিতাব্রতব একটু বিচলিত হওয়াও বিচিত্র নয় । হওয়াই বরং অনেক বেশি স্বাভাবিক । হয়ত তারই ফলে কিছু আঘাত দিয়ে থাকবে বা কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ করে থাকবে । ভাবতেও ভিতরটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল । আশ্রয়ের ভিত নড়ছে মনে হলে সব মানুষই বোধহয় সমান রিক্ত ।

একটু দার্শনিক মনোভাব নিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টায় এগোলাম—দেখো, কাদাব রাস্তায় চলতে হলে ছিটে ফোঁটা কাদা গায়ে এসে লাগেই—ঝেড়ে ফেললেই হল আব ধুয়ে ফেললেই হল । আর ওর ঠাট্টা তো—

ঠাট্টা ? উদগত রোষে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে বুঝি । মুখ লাল, নাক ফুলছে, ঠোঁট কাঁপছে । অস্ফুট রোষের উক্তি ঘরের লোকের দিকে চেয়েই—মিথ্যেবাদী...

হাসি মুখের এই সম্ভাষণ শুনেছি, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে শুনে সচকিত আমি ।

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সামনেব ঘবেব দরজা দুটো টেনে দিয়ে ফিরে এলো মালা নন্দী । সবিতাব্রত গলায় চাদর টেনে কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি মনোনিবেশ করল । আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না ।

দেখুন--কণ্ঠস্বর এবারে আর একটু চড়া, আট বছর এয়ার হোস্টেসি করেছি চোখানির মত অমন লোক অনেক দেখেছি, অনেক চরিয়েছি, তার থেকে অনেক খাবাপ লোকও টিট করেছি, আমি খুব ভালো মেয়ে নই সবাই জানে—ও-সব চোখানি-টোখানিকে আমি কেয়ার করি না । আর ওর ওই সব খুনসুটে ঠাট্টাও আমার গায়ে বেঁধে না । অফিসে সমস্ত দিন খাটা-খাটনির পর মেজাজ এমনিতেই ঠিক থাকে না, সব শুনে একটু সাহায্য করা দূরে থাক ফোঁস করে কি বলেছে জানেন ? বলেছে আপনাকে সেই কথা ?

আমার একটু আগের অনুমানই ঠিক ভেবে শঙ্কা বোধ করছিলাম । কিন্তু সে-অনুমান যে এতটা মিথ্যে রাগ দেখে তা কল্পনাও করা সম্ভব নয় । শুনলে প্রথমে মনে হবে মহিলার রাগ করাই উচিত নয় ।

নির্বিকার আসামীর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দুর্জয় রোষের মূল কারণটা ব্যক্ত করল এবার ।—সব শুনে-টুনে নির্লজ্জের মত হাসল বসে, যেন আমার জন্য কোনো দায় দায়িত্ব নেই । তারপরে চুপচাপ চিন্তা করতে দেখে আমি ভাবলাম কি করা যায় তাই ভাবছে । কিন্তু এরপর আমাকে ডেকে বলে কিনা, দেখো, বোসো, চোখানি যা বলেছে যদি সত্যিই সেরকম কখনো মনে হয়, আমাকে বোলো ; আমাকে দয়া দেখানো বা অনুকম্পা করার

মত ভুল যেন কখনো করে বোসো না । বলতে বলতে মালার নাসারন্ধ্র আবার স্ফীত হল, কণ্ঠস্বর আরো একটু তীক্ষ্ণ হল, জ্বলন্ত দৃষ্টিটা সবিতাব্রতর মুখে গিয়ে বিঁধলো ।—আমি তোমাকে দয়া দেখাই ? অনুকম্পা করি ? কেমন ?

আমি বিমূঢ় । আশ্রয়ের ভিত নড়ার আশঙ্কা যে কার বোঝা দায় । মনে পড়ে, আর একদিনও মহিলাকে দয়াবতী খেতাব দেওয়ার ফলে সে হঠাৎ অনেকটা এমনিই রেগে উঠেছিল ।

কিন্তু এদিকে জ্বলন্ত আগুনের ওপর প্রয়োজনের চার গুণ জল ঢাললে যা হয় তাই যেন হল হঠাৎ । চাদরের তলা থেকে দুই হাত বার করে এবং যুক্ত করে সবিতাব্রত বলে উঠল ।

এবারে নিরস্ত্র মদন পানে
চাহ দেবী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে—

এই নাটকীয় আত্ম-সমর্পণের জন্য দেবী প্রস্তুত ছিল না ।

চেষ্টা সত্ত্বেও মুখে মেঘ-রাগের বিপর্যয় ঘটিয়ে সেখানে প্রসন্ন বড়হংসিকার আত্ম-প্রকাশের তাড়না দেখা দিল । দুটোর একটাকেও বশে আনতে না পেরে রাগ অনুরাগের মিলিত আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে দেবী নিজেই দ্রুত প্রস্থান করল শেষ পর্যন্ত । আর আমি এত জোরে হেসে উঠেছি যে নিজেই অপ্রস্তুত—ও-ঘরের ছেলে দুটোও হয়ত সচকিত হয়েছে ।

## ।। তিন ।।

আট বছব বয়েস থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত যে সবিতাব্রতকে আমি চিনি, আর মাঝের ষোল বছবের ব্যবধান পেরিয়ে এই দু' বছর ধরে যে সবিতাব্রতকে দেখছি, তাদের মিল বা অমিলের দিকটা স্পষ্ট করে তুলতে হলে একবার গোড়ার দিকে ফেরা দরকার । এই দুইয়ের মধ্যে একটা যোগ মালা নন্দী খুঁজে পাবে ভেবেছিল কিনা জানি না, কিন্তু আগের এই অধ্যায়টুকু জানার প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করেছি । হাতে কাজ না থাকলে অনেক দিনই বলেছে, আপনাদের ছেলেবেলার গল্প করুন, শুনি—

সেদিনের কথা মনে হলেই যে দৃশ্যটা সবার আগে চোখে ভাসে, সেটা ঘরের মেঝেয় বালিশ দিয়ে সবিতাব্রতর বেপরোয়া ফুটবল খেলা ।

একই বাড়িতে দুই ফ্ল্যাটে থাকতুম আমরা । ওপরের ফ্ল্যাটে ওরা, নিচে আমরা । বাড়িটা ওদেরই, আমরা ভাড়াটে ছিলাম । ওদের বড় সংসার । সবিতাব্রতর মা পাঁচ বছরের ছেলে নিয়ে বিধবা । কাকারা গার্জেন । তাঁরা ভালো চাকরি করেন, পিতৃহীন ভাইপোর প্রতিও কর্তব্যে বিমুখ নন ।

কিন্তু সবিতাব্রতর নিজের বলতে মা-ই সব । কলেজে পড়ত যখন তখনো মা খাইয়ে না দিলে তার ভালো খাওয়া হত না । এই নিয়ে অনেক ঠাট্টা তামাসা করেছি আমরা । সবিতাব্রত মাকে ভয় যেমন করত, ভালও তেমনি বাসত । মা দু'দণ্ড চোখের আড়াল হলে ছটফট করত, খেলতে খেলতে কত সময় এক ফাঁকে ছুটে মাকে দেখে এসে আবার নিশ্চিন্ত

হয়ে খেলায় যোগ দিত। কিন্তু আমরা মহিলাটিকে অর্থাৎ তার মাকে শুধু ভয়ই করতাম। কারণ, যেমন গম্ভীর তিনি তেমনি চুপচাপ। সারাক্ষণই কিছু না কিছু কাজ নিয়ে আছেন, মুখে কথা নেই।

যেদিনের কথা বলছি, সবিতাব্রতর বয়স তখন নয়। সবিতাব্রত নামটা তখন শুধু স্কুলের খাতায় লেখা। আমরা ওকে ডাকতাম সতু বলে। সকলেই তাই ডাকত। সকালে দোতলায় উঠে আমি ওর কাছে প্রস্তাব দিলাম পাড়ার অনেকে দল বেঁধে আধমাইল দূরের রথের মেলায় যাচ্ছে—ছুটির দিন, বিকেলে ভিড় হবে, অতএব সকালেই দেখার কাজটা সেরে আসা ভালো—বিশেষ করে আরো অনেকে যখন যাচ্ছে।

শোনা মাত্র সবিতাব্রত উৎসাহিত হয়ে উঠল। আলনা থেকে জামা টেনে গায়ে পরতে পরতে বলল, মা-কে বলে আসি।

কিন্তু তাকে যেতে হল না, মা-ই ঘরে হাজির। গেঞ্জির ওপর জামা পরতে দেখে একবার তাকালেন শুধু। সবিতাব্রত আরজি পেশ করল, সকলে মেলায় যাচ্ছে, সে-ও যাবে।

তার মা বলল, না।

দ্বিতীয়বার বলার সাহস নেই, ছেলে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল। মা কিছু একটা নেবার জন্যে এসেছিলেন, নিয়ে চলে গেলেন।

সবিতাব্রত এখন কি করে? আমার সামনেই মুখের ওপরে এভাবে না বলে দেওয়াতে আত্মসম্মানেও লেগেছে। এখন রাগ সামলায় কি করে? তার পায়ের কাছে মেঝেতে ছিল একটা বালিশ, কোথাও ছিঁড়ে গিয়ে থাকবে, সেলাই করবেন বলে ওর মা-ই বোধহয় ওখানেই রেখেছিলেন। একেবারে পায়ের কাছে। সতু ওটার ওখানে থাকার আবশ্যকতা বোধ করল না হঠাৎ। জুৎসই একটা কিক বসালো ওর ওপর, বালিশটা সাত হাত দূরে দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেল।

আর একটা কিকে সে বালিশটা যথাস্থানে রাখা দরকার বোধ করল। কিন্তু যথাস্থান টপকে ঘরের আর এক কোণে গিয়ে পড়ল সেটা। মেলায় যেতে না পারার খেদ যুক্ত হওয়ায় এবারের কিকটা আরো জোরালো হল। রাগ ঠাণ্ডা করার এই ব্যবস্থাটা মন্দ লাগল না তার। কিকের পর কিক চলতে লাগল।

একটু শঙ্কা বোধ করলেও দেখতে আমারও ভালই লাগছিল। কিন্তু বেশি কিক ওই বালিশটার ওপর দিয়ে চলল না। পাঁচ সাত বার দেয়ালে বাড়ি খেতেই তুলো বেরিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু সতুর তখনো পায়ের আড় ভাঙে নি বা মেজাজও গোটাগুটি ঠাণ্ডা হয় নি। অতএব ওরই ওপর আরো কয়েকটা কিক চালিয়ে দিল সে। এবারে ঘরময় তুলো, তার হাতে পায়ে গায়ে মাথাযও।

ওর মায়ের চলাফেরা বরাবরই নিঃশব্দে। তিনি কখন কোথা থেকে দেখেছেন আমিও জানি না। এবারে ঘরে ঢুকলেন হাতে একটা পাখা নিয়ে। দরজাটা ওদিকেই বলে আমার পালানোর সাহস নেই। সতু ইচ্ছে করলেই পালাতে পারত, সে আমার আগেই মা-কে পাখা হাতে ঢুকতে দেখেছে। দেখেই স্থির ঠাণ্ডা।

ও রকম পিটুনি আর দেখিনি। পা থেকে কোমর পর্যন্ত সপাসপ পিটে গেলেন। যিনি মারছেন আর যে মার খাচ্ছে—দুজনেই একেবারে নিঃশব্দ। পাখাটা দুমড়ে বেঁকে গেল,

কিন্তু মার আর থামে না। ছেলেও শব্দ বার করবে না মুখ দিয়ে, মা-ও মার থামাবেন না। মারের শব্দে ওদিক থেকে সতুর এক কাকিমা এসে তাকে আগলাতে তবে ছেদ পড়ল।

এই গল্প শুনে মালা নন্দী হেসে বাঁচেনি। হাসতে হাসতে তার চোখে জল আসার উপক্রম। শেষে হাসি সামলে বলেছে, এখনো ভিতরে ভিতরে ঠিক এই রকমই আছে, বুঝলেন ? একটুও বদলায়নি—

ওই ছেলে বয়সে মায়ের হাতে আর একবারের মার খাওয়ার গল্প শুনে মালা নন্দী হাসতে গিয়েও হাসতে পারেনি। অদেখা শাশুড়ীটির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় বরং মুখখানা অন্য রকম দেখতে হয়েছিল। ছেলেপুলে নিয়ে ওদের বাড়িতে সতুর এক পিসিমা কিছুদিন থাকতে এসেছিলেন। অবস্থার ফেরে ওই পিসিমাটি বড় দুর্দশাগ্রস্ত তখন। পিসেমশায়টি আদবকায়দার লোক ছিলেন। রোজগার যা করতেন তাতে বোধহয় কুলোতো না। অফিসের টাকার কি গণ্ডগোল হতে সেই দায় পিসেমশায়ের ঘাড়ে পড়েছিল। চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হয়েছিলেন তিনি এবং তার ফয়সালা হতে হতে প্রায় বছর ঘুরে গিয়েছিল। সমস্ত পরিবারটি অনটনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আমরা তখন অতশত বুঝতাম না। ওর পিসি থাকতে এসেছেন এবং আছেন —এই শুধু জানতুম। তাছাড়া বিড়ম্বিত পিসির প্রতি কে সদয় আর কে-বা বিরূপ সে খবরও ভালো রাখতুম না। তবু মনে হত ওদের পরিবারের মধ্যে এক সতুর মা-ই ওঁদের খুব আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

সে যাই হোক, আমাদের মনোযোগ তখন সম্পূর্ণ টেনেছে, ওর সেই পিসির এক ছেলে —সমর। ছেলেটা হয়ত বা তার বাপের ধারা পেয়ে থাকবে। আমাদেরই সমবয়সী। কথায় বড় বড় চাল দিত, যা মুখে আসে তাই বলে গাল দিত, ঝগড়া মারামারি করত আবার বাড়ি ফিরে নালিশ করত। কিন্তু সতু মায়ের ভয়েই সম্ভবত ওকে কিছু বলত না।

ক্রমে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে লেগে গেল সেই দলের। তাদের সঙ্গেও ঝগড়া ঝাঁটি মারামারি চলতে লাগল। একদিন আমার আর সতুর সামনেই পাঁচ ছয়টা ছেলে ওর ওপর চড়াও হল। বাড়ি থেকে একটু দূরে—সেই পিসতুত ভাই পালাবার পথ পেল না। আমরা দু'জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেদম প্রহার খেতে দেখলাম ওকে। রাগ বা দুঃখের বদলে আমাদের বেশ আনন্দ হল। কারণ, হাত অনেক সময় আমাদেরই নিশপিস করত।

কিন্তু দুর্ভোগ একটু বেশিই হয়ে গেল। নাক মুখ ফুলে গেছে, পিঠে দাগড়া দাগড়া দাগ পড়েছে। সতুর বাড়ির লোক শুনল শুধু, ভালো মন্দ কিছুই বলল না। দু'জনে মিলে একজনকে মেরেছে কে কি করবে।

সতুর পিসিমাকে দেখা গেল ঘরের কোণে বসে কাঁদছেন নিঃশব্দে। সেই দৃশ্যটা অবশ্য কারো চোখেই ভালো লাগেনি। কিন্তু সতুর মায়ের চোখে যে কেমন লেগেছিল আমরা কল্পনাও করিনি।

বাইরে এসে আমার সামনেই আচমকা সতুর বাহু ধরে নিজের ঘরের দিকে টেনে নিয়ে গেলেন। আমাকে শুধু বললেন, আয়।

অনাত্মীয় হলেও এ আদেশ অমান্য করার সাহস আমার ছিল না। কাচ পোকার মত আমিও হাজির। কি ব্যাপার, কি অপরাধ কিছুই জানি না।

ঘরে ঢুকে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওকে যখন মারল তুই কোথায় ছিলি ?

সতুর মুখে জবাব নেই ।

আমার দিকে ফিরলেন, কোথায় ছিলি তোরা ?

...ওখানেই ।

ও ছিল ?

ঘাড় নাড়লুম । ছিল ।

ব্যস, আষ্টে-পৃষ্ঠে মার শুরু হল । সেই একই রকম ব্যাপার প্রায়, ছেলেও কাঁদবে না, মা-ও মারছে । সত্যি কথা বলতে কি, সেই মার যেন আমার ওপরে পড়ছিল । আমি তাড়াতাড়ি দোষস্খালনের চেষ্টা করলাম, ওরা যে অনেক ক'টা ছিল মাসিমা !

মার থামল । যে চোখে আমার দিকে তাকালেন, আমার কাঁপুনি । বললেন, বাড়ির ছেলেকে ধরে মারল, তোরা দেখলি, তোদের লজ্জা করল না ?

...কলেজে একবার এমনি অপ্রিয় এক ছেলেকে অন্য ক্লাসের ছেলেরা মেরেছিল । সতু তখন সামনে ছিল না । কিন্তু শোনার পর একা এর কৈফিয়ত নিতে ছাড়েনি ।

মায়ের মারের কথা নয়, সতুর একবারের রাগের কথা মনে পড়ে যখন আমরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি । কিন্তু এ শুধু রাগই নয়, ঘটনাটা ওর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল । কারণ কর্মজীবনের ষোল বছরের অজ্ঞাত পরদা তুললে ওই ঘটনার প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাবেই চোখে পড়বে । দু'বছর ধরে পরের এই ষোল বছরের ইতিবৃত্ত আমি একটু একটু করে আহরণ করেছি । সবিতাব্রত নিজেই বার কয়েক বিগত দিনের ওই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে । এমন কি, ঘটনাটা মালা নন্দীও জানে দেখলাম ।

ছোট ছেলেপুলে বড় ভালবাসত ও । বাড়ির লাগোয়া আর একটা ছোট বাড়িতে একটি পরিবার বাস করত । তাদের আড়াই বছরের একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে ভারি খাতির সতুর । ফুটফুটে ছেলে, নাম বাচ্চু । ওকে দেখলেই কাকু বলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত । তখন খেলাধুলো ছেড়েছে, কলেজ থেকে এসে ওকে নিয়েই সময় কাটত সতুর ।

ছেলেটার মায়ের বয়েস তখন বছর বাইশ চব্বিশ হবে । আমরা অঞ্জুদি বলে ডাকতুম । দেখতে বেশ সুশ্রী । বাড়িতেও সর্বদা পরিপাটি বেশবাস করে থাকত, বাইরে বেরুলে তো কথাই নেই । সপ্তাহে তিন চার দিন সেজেগুজে সিনেমা থিয়েটারে যেত, বাড়িতেও গান বাজনা চলত । ছেলেটা যেন পায়ের বেড়ি অঞ্জুদির । তাকে রেখে যখন তখন বেরুতে পারে না বলে কর্তার সঙ্গে গলা ছেড়ে ঝগড়া করতে দেখেছি । কর্তাটি গো-বেচারা গোছের ভালো মানুষ । স্ত্রীর কটূক্তিতে ফিরে কখনো গলা তুলতে শুনিনি । অঞ্জুদিকে নিয়ে পাড়ার অন্যান্য দিদি বউদিদের কানাকানি হাসাহাসি করতে দেখেছি । কিন্তু কেন সেটা সঠিক বোধগম্য হয়নি । আমাদের মধ্যে অঞ্জুদি একমাত্র সতুকেই একটু পছন্দ করত কারণ দিনে দরকার হলে সে সমস্ত দিন ছেলে আগলাত, আর তার মা ছেলেটাকে সময়মত খাইয়ে দাইয়ে দিত ।

অঞ্জুদিকে হঠাৎ একদিন বাড়িতে দেখা গেল না । কিন্তু ছেলেটা আছে । বাপের মুখ শুকিয়ে আমসি ।

জানা গেল, অঞ্জুদি অন্যত্র সরে গিয়ে ছাড়াছাড়ির নোটিস দিয়েছে । কিছুদিনের মধ্যে নাকি কেস উঠবে । আর পাড়ার কয়েকটা ফাজিল ছেলে খবর নিয়ে এলো অঞ্জুদি শিগগিরই

সিনেমা অ্যাকট্রেস হবে—এখন সেই তোড়জোড় চলছে। অঞ্জুদিকে নাকি স্টুডিওতে স্ব-চক্ষে দেখেছে তারা।

ছেলেটা কাঁদে আর আমি সবিতাব্রতর ছটফটানি লক্ষ্য করি। ও তাকে আনতে যায় আর ওই নিরীহ বাপ কার ওপর রাগ করে গোঁ ধরেই যেন ছেলেটাকে দিতে চায় না। অপারগ হলে দেয় অবশ্য, সতু তখন চট করে আর তাকে ফিরিয়ে দিতে চায় না। নিজের মায়ের কাছে নিয়ে আসে, খাইয়ে দাইয়ে হাসিয়ে খেলিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। মাঝ রাতেও কান্না শুনে ঘুম ভেঙে গেলে পা টিপে টিপে নেমে আসে, ওদের ঘরের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

সেটা জানাজানি হল একদিনের ঘটনায়। ওর বাপ বিরক্ত হয়ে ওই কান্নার ওপরেই বেশ দু'ঘা বসিয়ে দিয়েছিল। আর যায় কোথা, ছেলেটার তারস্বরে চীৎকার।

সেই শুনে সতুরও রক্ত মাথায়। হ্যাঁচকা টানে জানালার পরদা সরিয়ে শাসিয়ে উঠল, ফের ওকে মারবেন তো আপনার হাত আমি মুচড়ে ভেঙে দেব।

পরদিন ভদ্রলোক এসে নালিশ করল ওর কাকার কাছে। কাকা সতুর মাকে বলল। কিন্তু আশ্চর্য, মা কিন্তু ছেলেকে এই নিয়ে একটি কথাও বলল না।

তখন শীতকাল। এক রাতে হঠাৎ আমরা চমকে উঠলাম একদিন। ও-বাড়ি থেকে ছেলেটার কান্না কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। যাতনায় ছটফট করছে আর অবিরাম কাঁদছে। খবর নিয়ে জানা গেল, বিষম জ্বর ছেলেটার। আমরা শুনেই চমকে উঠেছি, তার কারণ, ছেলেটার টিকে দেওয়া হয়েছে কিনা কেউ জানি না। এ বাড়িতে আমরা সকলেই টিকে নিয়েছি, কিন্তু ওদের নেওয়া হল কিনা কেউ খেয়াল করেনি। করার কথাও নয়, প্রতিবার যে যার তাগিদে টিকে নিয়ে থাকে। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা যে স্বতন্ত্র সেটা এই জ্বর আর এই কান্না শোনার পর মনে হয়েছে।

সতু ছুটে বেরিয়ে গেল, আর খানিক বাদে একেবারে বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখে ফিরে এসে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ টিকে নেওয়া হয়নি, আর ছেলেটার সমস্ত শরীর লাল।

তারপর তিনটে দিন কানে আঙুল দিয়ে কাটাতে হয়েছে আমাদের। একটা শিশুর সেই প্রাণের যাতনার কথা মনে হলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। সতু পাগলের মত কাটালো এই ক'টা দিন। কাছে থাকতেও পারে না, দূরে পালাতেও পারে না।

তিন দিন বাদে কান্না থামল। সবই থামল। ছেলেটা একেবারে শান্তির রাজ্যে পৌঁছে তবে কান্না ভুলল। রাত পোহালে তার বাপ তাকে একাই নিয়ে চলল শ্মশানের দিকে।

সতু চিরদিনই একরোখা গোঁয়ার। কিন্তু এর পরে ক'টা দিন তার মুখের দিকেও তাকাতে ভয় করেছে আমাদের। কেবলই মনে হয়েছে ও যেন কিছু একটা সংকল্প আঁটছে। একদিন আমাকে বলল, আমার সঙ্গে চল—

কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে না বুঝেই চললাম। টালিগঞ্জের শেষপ্রান্তে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছিস ?

স্টুডিওতে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি সচকিত। স্টুডিওতে যাচ্ছে মানে, বাচ্চুর মায়ের খোঁজে যাচ্ছে। আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে বলল, না যেতে চাস তো ফিরে যা, আমি একাই যাব।

অগত্যা আবার সঙ্গ নিলাম । আর মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম অঞ্জুদির সঙ্গে যেন দেখা না হয় । দেখা হল না । তার খবরও কেউ দিতে পারল না ।

দেখা হলে কি হত জানি না । কিন্তু সেদিন আমার মনে হয়েছিল অঞ্জুদি বুঝি প্রাণেই বেঁচে গেল । সতুর বদ্ধ ধারণা অঞ্জুদি ছেলে ফেলে চলে না গেলে সময়ে টিকা নেওয়া হত, ছেলে তাহলে মরত না । এই মৃত্যুর জন্য একজনকেই দায়ী করেছে ও, সে অঞ্জুদি।

অঞ্জুদিকে কখনো ক্ষমা করেনি সে । পথে-ঘাটে সাজ-সজ্জা আর সিনেমা-থিয়েটার-প্রিয় বহু মেয়ে দেখেছি । অমনি মুখে কঠিন রেখা পড়েছে সবিতাব্রতর, চোয়াল শক্ত হয়েছে । তাদের সকলের মধ্যে অঞ্জুদিকে দেখেছে সে—ছেলে হত্যা করতে পারে যারা, তাদের দেখেছে । পরে জেনেছি, এই এক রোগের বীজ সে উত্তরকালেও বহন করেছে ; জীবনের হাল্‌কা দিক বেছে নিয়েছে যে-সব রমণী তাদের ওপর সে অনেক সময় নির্মম হয়েছে, তাদের পণ্য ভেবেছে, তাদের প্রতি তার নিষ্ঠুর আকর্ষণ ছিল, মমতা ছিল না ।

কিন্তু এ অনেক পরের কথা । সেদিনের ওই মানসিক বিপর্যয়ে তাকে দু'হাতে আগলে রেখেছিল তার মা । সবিতাব্রত যদি ছেলেটার দুঃখে কাঁদত তার মা অনেক নিশ্চিন্ত থাকতেন তাহলে । কিন্তু সে কাঁদেনি, রাতে না ঘুমিয়ে কেবল পায়চারি করেছে, যেদিকে বাচ্চুদের বাড়ি, অনেকদিনের মধ্যে সে-দিকটা মাড়ায়নি ।

মা অনেকদিন জিজ্ঞাসা করেছেন, তুই ও-ভাবে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখিস কি ?

সবিতাব্রত জবাব দেয়নি । কিন্তু আমি অনুমান করতে পারি কি ও দেখত । কি ভাবত । মায়ের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বড় নিশ্চিন্ত বোধ করত আর দুনিয়ার সব অঞ্জুদিদের রসাতলে পাঠাত, আর ভাবত বোধহয়, তার মা যদি এই মা না হয়ে অঞ্জুদির মত হত তাহলে কি অবস্থা হতে পারত তারও ।

অঞ্জুদির ব্যাপারটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র । সেটা কি-ভাবে ওর ভিতরে রেখাপাত করেছিল সেটা এক বছর পরেও আর একবার দেখা গেছে । আর পরবর্তী জীবনের এমনি অনুভূতিপ্রবণ এক বিস্ময়কর যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে ওর এই স্বভাবগত পারম্পর্যের হদিস হয়ত এই থেকেই মিলবে । কিন্তু এও অনেক পরের কথা ।

পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে আরো অনেকেই প্রিয় ছিল তার । মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ওদের চকোলেট লজেঞ্জুস কিনে দেওয়া প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল । অঞ্জুদির ছেলে মারা যাওয়ার পর অনেকদিন পর্যন্ত তাকে এদের দিক থেকেও মুখ ফিরিয়ে থাকতে দেখেছি । কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেনি ।

ওদের বাড়ির দাওয়ায় নিম্নশ্রেণীর ন'দশ বছরের একটা ভবঘুরে পাগলাটে ছেলে এসে রাতে শুতো । কোথাকার ছেলে কাদের ছেলে কেউ জানে না । কোথায় খায়, কি করে খায় তাও না । যে-দিন পেল খেল, যেদিন পেলনা খেল না । সতু মুখ দেখেই বুঝত ওর খাওয়া হয়েছে কি হয়নি । এই ছোঁড়াটাই মস্ত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল তার । খেতে বসলেই ওর কথা মনে পড়ে আর উঠে যায় । তখন আবার শীতকাল । রাতে কি গায়ে দেবে সেই ব্যবস্থা করার দায়ও ওরই ।

অঞ্জুদির ছেলে মারা যাওয়ার ঠিক এক বছর পরের কথা । টিকেঅলা টিকে দিতে এসেছে । আমরা সব ভিড় করে দাঁড়িয়েছি । একে একে টিকে নেওয়া হচ্ছে । হঠাৎ দেখি

সতু ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল ।

ফিরল প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে । টিকেঅলা চলে গেছে । বাড়ির সকলেই ওর ওপর বিরক্ত । কিন্তু দেখা গেল সেই পাগলাটে ছেলেটার ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে আসছে সে । এক ঘণ্টা ধরে খুঁজে তাকে বার করেছে ।

সকলেই বোবা । টিকেঅলা নেই দেখে তাকে নিয়ে আবার বেরিয়েছে । বাইরে থেকে নিজেও টিকে নিয়েছে, ওকেও দিইয়ে ছেড়েছে ।

এক বছরের ছোট হলেও আমার সঙ্গেই পড়ত সবিতাব্রত । সে বি, এসসি পাস করে বেরুলো ঠিক উনিশ বছর বয়সে । ফিজিক্স-এ ভালো অনার্স পেল । পড়াশুনায় মন থাকলে আরো অনেক ভালো করতে পারত । কিন্তু সোজাসুজি পড়াশুনা আর তাকে করানো গেল না ।

পাস করে বেরুনোর পর ও চাকরি খোঁজে । কিন্তু চাকরি খুঁজতে হলে সর্বদা একটা চাপা উত্তেজনা আর উদ্দীপনার মধ্যে দিন রাত কাটে কারো ? না কি চুপি চুপি কেউ বই পড়ে, আঁকিবুকি করে, অঙ্ক কষে, আর সপ্তাহে তিন চার দিন একটা ব্যাগে শার্ট প্যান্ট পুরে সমস্ত দিনের মত বেরিয়ে পড়ে ?

শুধু আমাদের নয়, ছেলের চাল-চলনে তার মায়েরও খটকা লেগেছিল । একদিন আমাকে বললেন, ও কোথায় অ্যাপ্রেনটিস হয়েছে, কি শিখছে একটু জিজ্ঞেস করে দেখ্ তো, আমি বললেই তো বলে এখন কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না, পরে দেখো'খন একদিন । কাজ শিখতে আবার এ-সব জামা-কাপড় জুতো লাগে কেন ?

আমার কৌতূহল ছিল । কারণ ইদানীং সবিতাব্রত যেন অনেক দূরে সরে গেছে । সম্প্রতি সে-যেন কিছু একটা গোপন নেশায় মেতে আছে । কলেজের পড়াশুনায় যাকে কোনদিন এত পড়াশুনা করতে দেখিনি, এত ভাবতে দেখিনি, সে এত কি পড়াশুনা করে, এত কি ভাবে ? কি এক চিন্তায় সর্বদা তন্ময় মনে হয় তাকে ।

ওর মায়ের কথায় ঝোঁক বাড়ল । আর তখনই জানা গেল ব্যাপারটা । আগে আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল ওর মাকে বলব না কিছু, তারপরে বলল । বলল না, আমাকে সঙ্গে করে এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল ।

যেখানে নিয়ে এলো সেটা ফ্লাইং ক্লাব ।

ওই ক্লাব দমদমে ছিল তখন । সেখানকার এরোড্রোমও এত বড় ছিল না তখন—মিনিটে মিনিটে দেশ বিদেশের এত এয়ারক্রাফট নামা-ওঠা করত না । তাই কাছাকাছি ওই সখের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার দরুন অসুবিধেও হত না ।

সেখানে এসে আমি হতভম্ব । সবিতাব্রত হাসছে মিটিমিটি । আমার ধারণা কোনো বড় ফ্যাক্টরি দেখব কিন্তু মায়ের কাছ ভাঁওতা দিয়ে এই অ্যাপপ্রেনটিসগিরি করছে ও ! ওড়া শিখছে !

অ্যাপ্রেনটিস ট্যাপ্রেনটিস কিছু নয় । ফ্লাইং ক্লাবের মেম্বার হয়েছে সবিতাব্রত । কিছু খরচাসাপেক্ষ ব্যাপার । কিছু একটা বলে মায়ের কাছ থেকেই টাকাটা আদায় করেছে বোধহয় । উত্তেজনার একশেষ আমারই । আকাশে ওড়াটা আজকের মত অত জল-ভাত

ব্যাপার ছিল না তখনো । উড়োজাহাজ চালানো তো আরো নয় ।

আর সবিতাব্রতর চোখে মুখে যে উদ্দীপনার শিখা দেখেছি তা ভোলবার নয় । আনন্দে ডগমগ হয়ে ক্লাবের গল্প করেছে । এই বাংলা দেশের দু'জন পাইলট করাচি থেকে দু'খানা জিপসি মথ প্লেন উড়িয়ে নিয়ে এসে ওড়ার ক্লাব ফেঁদে বসেন । দেশের এ একটা কম গৌরবের ব্যাপার নয় । এখন এ দস্তুরমত ট্রেনিং সেন্টার—এখন এখান থেকে 'এ' লাইসেন্স মেলে, 'বি' লাইসেন্স মেলে । নির্দিষ্ট মোট ঘন্টা হিসাবে ওড়ার অভিজ্ঞতা হলে আর কতগুলো বিশেষ বাধা কাটিয়ে এয়ারক্রাফট ওঠা-নামা করাতে পারলে 'এ' লাইসেন্স মেলে । শুনতে সহজ, কিন্তু এই ওড়া ঠিক মত সম্পন্ন করে 'এ' লাইসেন্স পেতে কারো লাগে পঁচিশ ঘন্টা, কারো বা পঞ্চাশ ঘন্টাতেও হয় না । এই ক'মাসে সবিতাব্রতর ওড়ার হিসেব মোট সতের ঘন্টা হয়েছে । কিন্তু এরই মধ্যে সে 'এ' লাইসেন্স পাওয়ার জন্য উদগ্রীব । তার ধারণা তার শেখা হয়ে গেছে । ইনস্ট্রাক্টর তাকে আরো আট ঘন্টা ওড়ার নির্দেশ দিয়েছেন । কিন্তু সবিতাব্রত এখনই 'সোলো' অর্থাৎ একলা উড়তে চায় । 'এ' লাইসেন্স পেতে হলে আগে সোলো উড়তে হবে । মাটি থেকে পাইলট ইনস্ট্রাক্টর লক্ষ্য রাখবেন লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য হয়েছে কি না । সবিতাব্রতর ইচ্ছা একলা ওড়ার পরীক্ষাটা এখনই হয়ে যাক ।

তারপর একশ ঘন্টা ওড়া হলেই 'বি' লাইসেন্স মিলবে—অবশ্য এটা পেতে হলে ক্রস কান্ট্রিফ্লাইটেরও রেকর্ড কিছু থাকা চাই । কিন্তু এ-সব কিছুই আর নাগালের বাইরে ভাবছে না সে । এক অবিশ্বাস্য সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনার আলো ওর মুখে । শুধু তাই নয় । ওর ওড়ার হাত দেখে আর চেষ্টা আর আগ্রহ দেখে চিফ ইনস্ট্রাক্টর নাকি আশ্বাস দিয়েছেন, শিগগিরই তাকে 'সোলো' উড়তে দেওয়ার কথা ভাববেন । সে-রকম আস্থা না থাকলে এত তাড়াতাড়ি কাউকে সোলো উড়তে দেওয়া হয় না ।

সাগ্রহে চিফ ইনস্ট্রাক্টরের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিল । মাঝবয়সী হাসি-খুশি ভদ্রলোক, বাঙালী, নাম মিস্টার চৌধুরী । চোখের সামনে আস্ত এক সজীব পাইলট দেখা সেই প্রথম । শুধু তিনি নন, আর একজন ইনস্ট্রাক্টরও সবিতাব্রতর প্রশংসা করলেন খুব । বললেন, হি হ্যাজ দি আই অ্যাণ্ড ফিলিং অফ এ ন্যাচারাল পাইলট ।

এ-যে কতবড় প্রশংসা, ফেরার সময় আনন্দে আর উদ্দীপনায় সারা পথ ধরে সবিতাব্রত সেই কথা বুঝিয়েছে ।

মেম্বার পিছু সপ্তাহে একদিন মাত্র দুই এক ঘন্টার ওড়ার মহড়া । বেশির ভাগ শিক্ষার্থীরা আসে ছুটি-ছাটার দিনে—তাই ছুটির দিনে সুযোগ পাওয়া লাভ । ফলে সবিতাব্রত এখানে আসে সপ্তাহে চারদিন পাঁচদিনও । যদি এয়ারক্রাফট্ বুকিংএর বাড়তি কোনো সুযোগ পেয়ে যায় । তার আগ্রহ দেখে চিফ কনস্ট্রাক্টর বা দ্বিতীয় ইনস্ট্রাক্টর যদি ডেকে নেন, নিদেন পক্ষে কিছু শিক্ষণীয় নির্দেশ উপদেশও যদি দেন । স্কুল কলেজে কোনদিন যা করতে দেখিনি এই শিক্ষার ব্যাপারে তাও করেছে ও । চিফ ইনস্ট্রাক্টরের বাড়ি গেছে, অবাঙালী ইনস্ট্রাক্টরের বাড়ি গেছে—যদি তাঁদের একটু বেশি সুনজরে থাকা যায় সেই চেষ্টা ।

এই চেষ্টার আরো কারণ আছে । ক্লাবের মেম্বাররা বেশির ভাগই অবস্থাপন্ন । আর তখন এই শিক্ষার মহড়া নেওয়ার উদ্দেশ্য নেশাও নয়, পেশাও নয় । আমার যতদূর মনে হয়েছে মেম্বারদের ওড়ার ইচ্ছেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটা অভিনব সখের ব্যাপার । যে

সখ বলবার মত সখ বটে , যে সখে বৈচিত্র্য আছে, থ্রিল আছে । এদের তুলনায় সবিতাব্রত নিতান্তই ছাপোষা মেম্বার । সে এসেছে প্রাণের বেগের তাগিদে, তাই তার আবেগের সঙ্গে অন্যান্য মেম্বারদের আবেগের কিছু তফাত হওয়াই স্বাভাবিক—আর ইনস্ট্রাক্টরদেরও সেই তফাতটুকু লক্ষ্য করাই স্বাভাবিক ।

ফাঁক পেলে বা ফাঁক খুঁজে সবিতাব্রতর সঙ্গে ফ্লাইং ক্লাবে আসাটা আমারও নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল । প্রায়ই আসতাম । ওড়ার গল্প শুনতাম । মনে মনে প্রায়ই হিসেব করতাম সবিতাব্রতর একা ওড়ার সুযোগ আসতে বা পঁচিশ ঘণ্টা পুরতে আর কত বাকি । ওর মায়ের কাছে, বাড়ির সকলের কাছে সব গোপন তখনো । এরই মধ্যে প্রাণের চাপা আবেগ প্রকাশ করার মত একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী পেয়ে ও যেন বেঁচে গেল । ওর সঙ্গে সঙ্গে উদগ্রীব আগ্রহে আমিও সেই বিশেষ দিনের প্রতীক্ষায় আছি । 'এ' লাইসেন্স পাওয়ার প্রতীক্ষা নয় । একটা আস্ত উড়োজাহাজ নিয়ে ও একা উড়বে কবে—সেই প্রতীক্ষা । প্রতীক্ষার সঙ্গে ভয়ও ।

ক্লাবের পরিবেশের দিকে ওর অত চোখ ছিল না । কিন্তু আমার ভালো লাগত । কম করে একশ' মেম্বার হবে বোধহয় । সকলেরই ঝকঝকে তকতকে বেশ-বাস, হাসি-খুশি মুখ । দেখলেই বোঝা যায় অবস্থা ভালো । ভিতরে 'বার'ও ছিল । শুধু পুরুষ নয় । অভিজাত মেয়েরাও আসত । রাজরাজড়ার ঘরের মেয়েদেরও দেখেছি এখানে । তারাও উড়ত, আর আমার বুক টিপ-টিপ করত, ফিরে নেমে এলে শান্তি । অনেক মেয়ে আবার পুরুষদের সঙ্গে দিব্বি সিগারেটও খেত । আমি হাঁ করে দেখতাম, বেশ খুশি মনে অবাক হতাম ।

কিন্তু সবিতাব্রত এসব কিছু লক্ষ্যও করত কিনা সন্দেহ । বাড়িতে নিরিবিলি গল্পের ফাঁকে কথায় কথায় একদিন এদের কথা তুলেছিলাম । সবিতাব্রতর নির্লিপ্ত বিরক্তি দেখে অবাক । বলল, রাবিশ ! ওদের দেখলেই আমার অঞ্জুদিকে মনে পড়ে । থতমত খেয়ে আমি চুপ ।

এত আগ্রহে কি পড়ত ও তাও দেখেছি এর পর । শুধু দেখা নয়, আমাকে পড়িয়েও ছেড়েছে অনেক কিছু । আকাশে ওড়ার রোমাঞ্চকর কাহিনী সব, কত চেষ্টা কত প্রাণপাতের গল্প । স্মরণীয় বৈমানিকদের জীবনের কথা, অধ্যবসায়ের কথা, স্বপ্নের কথা, ব্যর্থতায় কণ্টকিত সাফল্যের কথা ।—এ, ভি, রো, শৈশবে যিনি আকাশে পাখি উড়তে দেখে ভাবতেন মানুষ কেন উড়বে না । উড়ন্ত অ্যালব্যাট্রসের বহু মডেল তৈরি করে নিবিষ্ট মনে যিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানালা দিয়ে নিচের বাগানে ছাড়তেন আর দেখতেন কি হয়—কোন মডেল কি-রকম বাতাস কাটে । লোকে অবিশ্বাস করেছে, হেসেছে, টিটকিরি দিয়েছে । কিন্তু তিনি ওড়ার স্বপ্নে বিভোর । বহু বছরের মর্মান্তিক ঘাত-প্রতিঘাত, দারিদ্র্য, ব্যর্থতা, অনিদ্রা, অনশন, হতাশার পরেও যে সাফল্যের স্বর্ণ চূড়ায় পৌঁছেছিলেন তিনি । আকাশ-মঞ্চ থেকে যে যবনিকা তুলে দিয়েছিলেন, তাও স্বপ্নের মতই বিস্ময়কর ।

পথ-প্রদর্শক অ্যালকক আর ব্রাউন ! কে তাঁরা ? দুই বন্ধু, দুই সতীর্থ । ওড়ার স্বপ্নে মাতাল । প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁরা যথার্থই যুদ্ধবিমান উড়িয়েছেন । সেই বিমানের সঙ্গে আজকের সুসম্পূর্ণ বিমানের অনেক, অনেক তফাত । শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছিলেন তাঁরা । আর সেই বন্দীদশায় তাঁরা শুধু স্বপ্ন দেখে কাটিয়েছিলেন আবার তাঁরা উড়বেন—আকাশ-যাত্রার

নতুন যুগ আসবে, তাঁরা তাতে অংশ নেবেন। এসেছিল। অংশও নিয়েছিলেন। যুদ্ধ থামার কয়েক মাসের মধ্যে সমস্ত দুনিয়ায় চমক লাগিয়েছিলেন তাঁরা—কোথাও না থেমে সর্বপ্রথম তাঁরা আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন সেদিনের সেই অনিশ্চিত উড়োজাহাজে—পনের ঘণ্টা সাতান্ন মিনিটে এক হাজার আটশ' নব্বুই মাইল অতিক্রম করেছিলেন। তারপর একদিন মৃত্যু এসে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিল দুই বন্ধুর মাঝে—দুর্যোগে প্লেনে যাচ্ছিলেন অ্যালকক্। ফ্রান্সের এক পাহাড়ে লেগে উড়োজাহাজ চুরমার—তিনিও চিরনিদ্রায় শয়ান।

তারপর চার্লস্ কিংসফোর্ড স্মিথ! আশ্চর্য মানুষ, আশ্চর্য বৈমানিক স্মিথ। সেই সংঘাত, সেই বিপর্যয়, সেই হতাশার মধ্যে তাঁরও এক বিস্ময়কর সংগ্রাম। কিন্তু একদিন জনসাধারণের আকাশ-যাত্রার মন যাঁরা এনে দিয়েছিলেন, ইনি তাঁদেরই অবিস্মরণীয় একজন। আকাশ-পথেরও নতুন নতুন পথ আবিষ্কারের প্রতিভায় তিনি অনন্য, দীর্ঘ আকাশ-ভ্রমণের তিনি পথিকৃৎ। তারও শেষ শুনলে গায়ে কাঁটা দেবে। বেশি দিনের কথা নয়, ১৯৩৫ সালের ৬ই নভেম্বর ব্রিটেন থেকে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন তিনি। সাত তারিখে মাঝ রাত্রে যখন কলকাতার ওপর দিয়ে উড়ে যান তিনি, তখনো তাঁর বিমান 'অলটেয়ার' তেমনি শক্ত-সমর্থ। কিন্তু সেই তাঁর শেষ সংবাদ, এরপর কেউ আর তাঁর বিমানের হদিস পায়নি, তাঁকেও আর জীবিত বা মৃত দেখেনি। শুধু বছর দুই বাদে তাঁর বিমানের বাড়তি একটা ভাসমান চাকা বর্মার সমুদ্রতটে পাওয়া গিয়েছিল।

এমন আছে আরো কত, কবি বৈমানিক সেণ্ট একস্উপেরি, জেট-যুগের নেভিল ডিউক, আমেরিকার উপকথা-প্রতীক চার্লস লিণ্ডবার্গ...

লিণ্ডবার্গ!

এই আর এক নাম। বিমান-রূপকথার রাজপুত্র লিণ্ডবার্গ।

সবিতাব্রতকে কেউ কখনো কাঁদতে দেখেছে কিনা জানি না। কিন্তু আমি দুবার দেখেছি—একবার ওই প্রকৃতজয়ী মানুষটির সাফল্যের আনন্দে, আর একবার শোকে—তার মায়ের মৃত্যুতে।

শোকের কথা পরের কথা। পরিপূর্ণ আনন্দও যে এক-এক সময় দুর্বহ হয়, বুকের তলায় আনন্দের ঢেউ তোলে, সেই আনন্দের আবেগে দু'চোখের কোণ যে চিকচিক করে উঠে—আমি তাও দেখেছি। দেখেছি এই একজনের প্রসঙ্গে—লিণ্ডবার্গ, যাঁর গল্প ও আমাকে অনেক শুনিয়েছে। অনেক পড়িয়েছে, সে এক আনন্দবিহ্বল মূর্তি দেখেছি সবিতাব্রতর! চোখে জল এসে গেছে অনুভব করে ভয়ানক লজ্জা পেতে দেখেছি ওকে। আকাশ-পথের সব পথিকৃৎরাই ঋষিতুল্য ওর কাছে, তবু লিণ্ডবার্গ। অথচ ওই বিদেশী বৈমানিক তাঁর বেপরোয়া দুঃসাহসিক প্রথম অভিযানের পরে খেতাব পেয়েছিলেন, 'দি ফ্লাইং ফুল'।

সমস্ত পৃথিবীর মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন সেই সুশ্রী সদা হাসি-হাসি মুখ যৌবন প্রাচুর্যে ভরপুর অথচ নম্র বিনীত মানুষ—দি ফ্লাইং ফুল। কে শুনেছে, একটি মানুষ তাঁর খেলনার মত এরোপ্লেন নিয়ে এক মারাত্মক অভিযানে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন, শোনা মাত্র একটা গোটা দেশ তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করতে বসে যায়, উঁচু-নিচু নির্বিশেষে শঙ্কায় উদ্‌বেগে বিনিদ্র রজনী যাপন করে?

যুদ্ধোত্তর নবীন আমেরিকার হৃদয়ের মানুষ চার্লস লিণ্ডবার্গ। আর অনেক যুগের অনেক

সবিতাব্রতদেরও বোধ হয় ।

দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকেও আমেরিকার গ্রাম-প্রান্তের লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে এরোপ্লেন এক রোমাঞ্চকর জিনিস । ওদিকে একটা যুদ্ধ বিগত হওয়ার ফলেই অনেকেই বিমান চালনায় পটু হয়ে উঠেছে, অনেকে আবার পুরনো এরোপ্লেন কিনে মালিক হয়ে বসেছে । লিণ্ডবার্গের টাকা নেই এরোপ্লেন কেনেন কি করে ? কাজেই তিনি এই সব বৈমানিকদের সঙ্গে নিয়ে শহরের দূরে দূরে গিয়ে নানাবিধ কসরত দেখাতে লাগলেন । দর্শকেরা হতভম্ব, ওই যন্ত্র যেন তাঁর হাতের খেলনা একটা—শুধু তাই নয়, উড়ন্ত বিমানের ডানার উপর হাঁটেন, কসরত দেখান, প্যারাসুটে লাফানোর নানারকম ভোজবাজি দেখান । ফলে ফ্লাইং-ফুলএর এবারে নামকরণ হল 'ডেয়ারডেভিল লিণ্ডবার্গ ।'

শেষে অনেক কষ্টে পাঁচশ ডলার জমিয়ে যুদ্ধের এক বাতিল-করা ছোট্ট এরোপ্লেন কিনে বসলেন তিনি । বুকের ছাতি ফুলে উঠল তাঁর, বিমান যেমনই হোক নিজে মালিক তিনি । প্লেনখানার নাম জেনি—আমেরিকাবাসীরা সানন্দে এরপর জেনি আর জেনির মালিকের অনেক খেলা দেখেছে । পাঁচ ডলার মাশুল নিয়ে সেই বিমানে আবার লোক চড়াতেন লিণ্ডবার্গ—একজন বৃদ্ধা নিগ্রো মহিলা সঙ্গিনী শুধু জানতেন, বিমানের যে দশা—শুধু আকাশে ওঠা নয়, ওই পাঁচ ডলার মাশুলে যে-কোন মুহূর্তে স্বর্গে পর্যন্ত পৌঁছানো যেতে পারে ।

পাঁচ ডলার পাঁচ ডলার করে সমস্ত দিনে কম রোজগার করতেন না লিণ্ডবার্গ । দিন একটু বদলালো । এক বিমানসংস্থার চিফ পাইলট নিযুক্ত হলেন তিনি, মাল বহন করার কাজ । এই কাজ করতে গিয়েই বেপরোয়া স্নায়ু বোধহয় ইস্পাতের স্নায়ু হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর । রাতের অন্ধকারে ঝড়েজলে কুয়াশায় দুর্যোগে বিমান চালিয়েছেন—নিরুদ্বেগ নিঃশঙ্ক ।

১৯২৬ সালের শেষের ভাগ সেটা । নিউ আটলাণ্টিক অ্যাওয়ার্ডের কানাঘুষা শোনা যেতে লাগল আবার ! উড়তে হবে নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস—তিন হাজার ছ'শ দশ মাইল । একদিন ঘোষণা শোনা গেল, সেণ্ট লুই থেকে লিণ্ডবার্গও উড়বেন বলে কৃতসঙ্কল্প ।

হিড়িক পড়ে গেল কে আগে করবে এই অসাধ্য-সাধন । অনেকে অনেক রকমের বিমান নিয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন, প্রাণ দিতে লাগলেন । মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তেই থাকল । তবু চেষ্টার শেষ নেই । ওদিকে এই দুর্ধর্ষ অভিযানে নেমে পড়ার মত বিমান কোথায় লিণ্ডবার্গের ! সেণ্ট লুইয়ের হৃদয়ের মানুষ লিণ্ডবার্গ তখন ! সেখানকার অবস্থাপন্ন লোকেরা সোৎসাহে সাহায্যে এগিয়ে এলেন । কিন্তু তাতেও সম্বল দাঁড়ালো মাত্র ষোল হাজার ডলার । আর যে বিমানে এই অভিযানে নামা যেতে পারে সেই নতুন 'ফকার' এর দাম হল নব্বুই হাজার ডলার ।

ফকারের চিন্তা বাতিল করে দিলেন লিণ্ডবার্গ । বড় বিমান নিয়ে অনেকে চেষ্টা করেছে আর মরেছে । লিণ্ডবার্গের একখানা ছোট্ট বিমান চাই—বিমান না বলে সেটাকে খেলনা বলা যেতে পারে। নিজের পছন্দমত কলকব্জা শুধু থাকবে তাতে । তাঁর নির্দেশমত এক কোম্পানী বিমান প্রস্তুত করে দিতে রাজী হল—সর্বসাকুল্যে খরচ পড়ল মাত্র দশ হাজার ডলার ।

সকলে বিস্মিত কণ্টকিত, এই বিমান নিয়ে প্রায় চার হাজার মাইল পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন লিণ্ডবার্গ !

লিণ্ডবার্গ বিমানখানির নাম দিলেন 'দি স্পিরিট অফ সেণ্ট লুই'—সেণ্ট লুইয়ের আত্মা ।

আত্মাই বটে, সমস্ত সেন্ট লুইয়ের মন প্রাণ কেড়েছে স্পিরিট অফ সেন্ট লুই—ভয়ে আর রোমাঞ্চে বিহ্বল সেখানকার মানুষ ।

যাত্রার তোড়জোড়ের ব্যবস্থা দেখে বিস্ময়ের উপর বিস্ময় । দ্বিতীয় পাইলট নেবেন না লিণ্ডবার্গ—ন্যাভিগেটরও নেবেন না । কেন ? কারণ দেড়শ' পাউণ্ড ওজন লাঘব হবে তাতে । প্যারাসুটও নেবেন না ।—আরো বিশ পাউণ্ড ওজন বাঁচল, সেই বিশ পাউণ্ড ওজন তেল নিলে কাজ হবে । রাতে বিমান চালনার বাড়তি সরঞ্জামও সব বাতিল—বাড়তি তেল দাও তার বদলে । আই ওয়ান্ট মোর ফুয়েল ।

কয়েকটা ছোট বড় মহড়া দেওয়াব পর স্পিরিট অফ সেন্ট লুই প্রস্তুত ।

১৯২৭ সালের ১৯শে মে সকাল সাড়ে সাতটা ।

এক অনাড়ম্বর মানুষ ততোধিক অনাড়ম্বর এক বিমান নিয়ে একা আকাশের মহাসাগরে ভেসেছেন । মৃত্যুতে বিলীন হবেন কি অবিশ্বাস্য সাফল্যের মুকুট পরবেন কেউ জানে না ।

ঘন্টা চারেকের মধ্যেই পায়ে খিল ধরেছে, ক্লান্তি এসেছে । একঘেয়েমি কাটানোর জন্য নানান্ ছন্দে এগিয়েছেন তিনি । সকাল কেটেছে, দুপুর গড়িয়েছে, সামনে রাত্রি। রাত্রি মানেই চিরনিদ্রা । খেলে ঘুম পাবে, অতএব খেয়ে আর কাজ নেই । সামনে দু'হাজার মাইলের শুধু সমুদ্র-পথই—লিণ্ডবার্গ প্রস্তুত । কি আর হবে, মৃত্যুর থেকে বেশি তো আর কিছু হতে পারে না ।

দশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে চলেছেন তিনি । সামনে প্রচণ্ড ঝড় । স্পিবিট অফ সেন্ট লুই সেই ঝড়েব মুখে যেন শুকনো পাতা একখানা । হঠাৎ কি মনে হল বিমানের ডানা পরীক্ষায় মন দিলেন তিনি । সেখানে বরফ জমেছে । অর্থাৎ চুপিসাড়ে মৃত্যু এগিয়ে আসছে । দিশেহারা অবস্থায় প্রথমেই মনে হল ঝড় থেকে বেরুনোর জন্য যে-কোন দিকে প্লেন ঘুরিয়ে দেবেন । কিন্তু পরমুহূর্তে সেই পালানোর চিন্তা বাতিল করলেন—ঠাণ্ডা মাথায় নিজের পথেই এগোতে লাগলেন তিনি ।

ঘন্টা দুই বাদে দেখলেন আকাশে চাঁদ, তারা । জীবন । ওড়ার সাতাশ ঘন্টা বাদে আবার দিনের আলো দেখলেন । নীচে সমুদ্র । কোথায় এসেছেন, লক্ষ্য আর কতদূরে, জানেন না ।

তারপর, তারপর সাড়ে তেত্রিশ ঘন্টার অভিযান কি সত্যি শেষ হল, নাকি স্বপ্ন দেখছেন তিনি !

২১শে মে প্যারিসের সময়ের রাত্রি দশটা তখন । প্যারিসের আলো দেখা যাচ্ছে—বিমানঘাঁটি দেখা যাচ্ছে । আর সমগ্র বিমানঘাঁটির বিশাল এলাকা জুড়ে কালো কালো ও কি ?

মোটর গাড়ি ।

সেন্ট লুই থেকে যেদিন তিনি উড়েছিলেন, সেদিন সন্ধ্যায় সেখানকার এক বক্সিং অনুষ্ঠানের চল্লিশ হাজার দর্শক আগে উঠে দাঁড়িয়ে লিণ্ডবার্গের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিল । কিন্তু সমগ্র দুনিয়া যে মাতোয়ারা হয়ে আছে তিনি জানতেন না ।

জানলেন যখন, ধকলের শেষ নেই । তিনি তো সেই হাসি-হাসি বিনয়ী সহজ সরল মিষ্টি মানুষটি নেই । বহুক্ষণ পর্যন্ত বিশাল বিহ্বল জনসমুদ্রের হাতে হাতে শূন্যে ভেসেছেন

তিনি। তারপর পুলিশ দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করতে হয়েছে। আর তারপর বহুদিন ধরে সেই বিপুল অভ্যর্থনা এড়ানোর জন্য প্রাণপণে পালিয়ে থাকতে চেষ্টা করেছেন তিনি।

কিন্তু পালিয়ে থাকবেন কোথায়?

সমস্ত পৃথিবীর সংবাদপত্র আর অভিযানী মন যে তাঁকে নিয়ে লোফালুফি শুরু করে দিয়েছে!

জনসভা ডিনার বক্তৃতায় এই লাজুক বিনয়ী মানুষটিকে দেখে আরো মুগ্ধ সকলে। অজস্র টাকার টোপ ফেলা হয়েছে—প্রবন্ধ লিখতে হবে, ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সুযোগ দিতে হবে, চলচ্চিত্রে দেখা দিতে হবে। তিনি হাসেন, মাথা নাড়েন। বলেন, আমি সামান্য বৈমানিক, এ-সবে কাজ নেই।

এরপর যে-দেশে গেছেন সেই পাগল-করা অভ্যর্থনা, আর তাঁর পালানোর চেষ্টা।

তারপর প্রত্যাবর্তন।

ওয়াশিংটনে অভ্যর্থনার সে কি বিপুল সমাবেশ! বৈমানিকজীবনে এমন অভ্যর্থনার নজির খুব বেশী নেই। প্রেসিডেন্ট নিজের হাতে দুর্লভ ফ্লাইং ক্রস পরিয়ে দিলেন তাঁকে। পঞ্চান্ন হাজার অভিনন্দন টেলিগ্রাম পেলেন তিনি। একটি অভিনন্দন টেলিগ্রামে সই করেছে সতের হাজার পাঁচশ' ভক্ত—রোল-করা সেই টেলিগ্রামের কাগজের দৈর্ঘ্য পাঁচশ' কুড়ি ফুট—সেটা বহন করেছে দশজন লোকে। যে রাস্তা দিয়ে প্রোসেশান তাঁকে নিয়ে গেছে সেই সব রাস্তা থেকে মোট আঠার হাজার টন কাগজ কুড়িয়েছে রাস্তা যারা পরিষ্কার করে তারা।

লিণ্ডবার্গ, লিণ্ডবার্গ, লিণ্ডবার্গ।

লিণ্ডবার্গ স্ট্রীট, লিণ্ডবার্গ স্কুল, লিণ্ডবার্গ রেস্তোরাঁ! সাত লক্ষ ডলার পারিশ্রমিক দেওয়া হবে—লিণ্ডবার্গ একখানা ছবির কন্ট্রাক্ট সই করবেন?

না। তিনি বৈমানিক। অভিনেতা নন।

রূপকথার এই রাজপুত্রের জীবনের ভবিষ্যতের এক ঘটনা মর্মবিদারী। সমস্ত পশ্চিমের আকাশ শোকাচ্ছন্ন হয়েছিল, রাজপুত্রের বেদনার অংশ নিয়েছিল। কিন্তু ঘটনার সেই মানসিকতা এই কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত বলে সে-প্রসঙ্গ অনুক্ত থাক এখন!

এই লিণ্ডবার্গকেই সবিতাব্রতর আদর্শ স্বপ্নের মানুষ জানতাম আমি। পরিহাসচ্ছলে একদিন এই নামই তারও ললাট-ভূষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এও একটু পরের প্রসঙ্গ।

॥ চার ॥

প্রতীক্ষার অবসান হল। ইনস্ট্রাক্টর তাকে 'সোলো' ফ্লাইটের অনুমতি দিয়েছেন। সবিতাব্রতর সেই জ্বলজ্বলে মুখখানাই সম্ভবত মায়ের চোখে ধরা পড়ার কারণ হল।

ওড়ার দুদিন আগে। ওর মা ডাকলেন আমাকে। শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার বল, ও কিছু একটা করতে যাচ্ছে?

সেই মুখের দিকে চেয়ে মিথ্যে কেউ বলতে পারত বলে আমার মনে হয় না। আমিও পারিনি।

তিনি সব শুনেছেন। শোনার পর আরও স্থির, আরো শান্ত। আমি তাঁকে অভয় দিতে

চেষ্টা করেছি, সতুর কৃতিত্বের কথা দ্বিগুণ বাড়িয়ে বলেছি । তাঁর কানে গেছে কিনা জানি না ।

বাড়ির সকলে শুনেছেন । স্তম্ভিত হয়েছেন ! কিন্তু আশ্চর্য, মা যখন একবারও বাধা দেন নি, আর কেউও তাকে বাধা দেন নি । কিন্তু বাধা যে কোথায় সবিতাব্রতই শুধু অনুভব করেছিল । দুদিন ধরে মায়ের পিছনে ছায়ার মত ঘুরেছে, অভয় দিয়েছে, বুঝিয়েছে । তাঁর একটা মুখের কথার জন্য হাঁতে পায়ে ধরেছে ।

শেষে মা বলেছেন, আচ্ছা— ।

আনন্দে দু'হাতে মা-কে একেবারে শূন্যে তুলে ছেড়েছিল সবিতাব্রত ! বলেছে, কি-চ্ছু ভয় নেই, কিচ্ছু না । দু'টো প'য়ত্রিশ মিনিটে আমাদের এই বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে যাব দেখো—আমাকে দেখতে পাবে না অবশ্য, তবু জেনো সে আমি ।

যথাসময়ে মাকে প্রণাম করে ও বেরিয়ে গেল । মা ঠাকুরঘরে ঢুকলেন । দু'টো পঁয়ত্রিশ মিনিটের আগে ছাতেও উঠলেন ।

ছোট্ট 'টাইগার মথ' বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে দু'চক্কর ঘুরে গেল, ওর মধ্যে আছে আমাদের সতু—সবিতাব্রত । একা । সেই মুহূর্তে লিণ্ডবার্গের থেকে ওকে কোনো অংশে কম মনে হয়নি আমার ।

ওড়া ক্রমশ সহজ হয়ে এলো এরপর । আমাকে নিয়েও উড়তে চেয়েছে ও, কিন্তু আমার সাহসে কুলোয়নি । মা-কেও টানা-হেঁচড়া করেছে উড়তে হবে ওর সঙ্গে । মা আপত্তি করেননি । শেষে ওর নিজেরই মনে হয়েছে মায়ের হার্টের রোগ—কি আবার বিপত্তি হয়, কাজ নেই ।

এর পর 'বি' লাইসেন্সের জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল সবিতাব্রত । সে-ও ওর হাতের মুঠোয় ভাবছে । ফাঁক পেলে আমি ওর সঙ্গে ক্লাবে যাই তখনো । চিফ ইনস্ট্রাক্টর আর ইনস্ট্রাক্টর আগের থেকেও বেশি স্নেহ করেন ওকে ! বসে গল্প গুজব হয়, ঠাট্টা-তামাসাও হয় !

কথায় কথায় একদিন অবাঙালী ইনস্ট্রাক্টরটি বললেন, তোমার যে-রকম নেশা দেখছি তোমাকে মিস্টার বার্ড খেতাব দেওয়া উচিত ।

আমার কি মনে হল, বলে বসলাম, ওর আদর্শ হল লিণ্ডবার্গ—বার্ড বললে মানুষের দিকটা গেল ।

সকলেই হাসছিল । ইনস্ট্রাক্টর বললেন, ওকেও তাহলে লিণ্ডবার্গই বলা হোক, লিণ্ডবার্গ অফ দি ইস্ট ।

সকলে সত্যিই ভালবাসত ওকে, তাই সেই থেকে লিণ্ডবার্গ নামই পাকা । পরবর্তীকালে ওই ইনস্টাক্টরটিই পেশাদার পাইলট হিসেব টেনে নিয়েছিলেন তাকে । ফলে হাসি তামাসায় নামের ওপর সেখানেও 'লিণ্ডবার্গ' ছাপ পড়ে গিয়েছিল ।

'বি' লাইসেন্স-এর পথে ও অনেকটাই এগিয়ে যাবার পর আমার সাহস কিছু বেড়েছিল । ইতিমধ্যে পর পর কয়েকটা দুর্ঘটনার ফলে আমি মুষড়ে গেলাম আবার । কিন্তু তার থেকেও বেশি চোখ যেত তখন ওর মায়ের দিকে । তিনি মুখে কিছু বলতেন না, দিবারাত্র মুখ বুজে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতেন শুধু ।...সঙ্গিনীসহ উড়ছিলেন এক বাঙালী ভদ্রলোক, আর

অন্য এক বিমানে সঙ্গিনী নিয়ে উড়ছিলেন এক ইংরেজ—ধাক্কা লেগে দু'খানা প্লেনই চূর্ণ বিচূর্ণ—চারজনেই শেষ। সেই প্রথম দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে আমি আঁতকে উঠেছিলাম মনে আছে। কিন্তু সতুর মা শান্ত, স্তব্ধ। সেই মুখ দেখে আমার ইচ্ছে হত ওকে নিষেধ করি। বলি, মা-কে কষ্ট দিস্ না।

তারপর একদিন চিফ ইনস্ট্রাক্টর পাইলটের ছোট ভাই প্লেন নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল গিয়ে গঙ্গায়—তক্ষুনি সব শেষ।...পুরনো পাইলট ভবদেব মুখার্জী রোজ প্রথমে পুরী পরে দীঘায় এরোপ্লেন চালিয়ে সমুদ্রে স্নান করতে যেতেন। দীঘার সমুদ্র একদিন তাঁকেও নিল।

এই সব খবর কাগজে বেরুতে দেখে মায়ের মুখ পাংশু। কিন্তু এ-সব দুর্ঘটনা আমলেই আনত না সবিতাব্রত। কে কোন দোষে বিপদে পড়েছেন আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করত। মাকে ও ভাবত ছোট্ট এক ভীতু মেয়ে—নিজের ওপরে অফুরন্ত বিশ্বাস তার। এই বিশ্বাসে মাকেও সবল করে তুলতে চেষ্টা করত সে। 'বি' লাইসেন্স পাওয়ার পর এলাহাবাদে বামরৌলির শিক্ষাকেন্দ্র থেকে পেশাদার বৈমানিকের ট্রেনিং নিতে যাবার সময় মায়ের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে গেল, জীবনে কক্ষনো বিনা দরকারে বিপদের ঝুঁকি নেবে না সে, অতএব মা নিশ্চিন্ত থাকুক।

মা কতটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তাঁর মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই।

যতদূর মনে পড়ে মাস ছয়েকের মধ্যেই বামরৌলির ট্রেনিং-এর পাট চুকিয়ে ফিরে এসেছিল সে। মোট কথা, যে সময় লাগে সচরাচর তার অর্ধেক সময়ের মধ্যে ডাকোটা এনডোর্সমেন্ট পেয়েছে: আমাদের বিমানের মধ্যে তখন ডাকোটাই সম্বল। এরপর যে-কোনো বিমান-সংস্থায় কো-পাইলট হিসেবে কাজ করবার যোগ্য সে।

সহজেই কাজ পেল। সবিতাব্রতর বয়স তখন মাত্র কুড়ি।

সত্যি কথা বলতে কি আমরা তখন প্রায় ঈর্ষাই করেছি তাকে। হাতে পাঁচটা টাকা পেতে আমাদের প্রাণান্ত তখন। আর ওর মাসে রোজগার তখন হাজার টাকার ওপর: মোটা মাইনে, মোটা ওভার টাইম। ঝকঝকে তকতকে বেশ-বাস, বাড়িতে গাড়ি এসে তুলে নিয়ে যায়। অবশ্য এই তুলে নিয়ে যাওয়াটা ঈর্ষার ব্যাপার নয় মোটেই। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, সপ্তাহের মধ্যে চার দিন গাড়ি আসে রাত একটা দেড়টায়।

এর কারণ আছে। সবিতাব্রত তখন ফ্রেটার অর্থাৎ মালবাহী বিমানের কো-পাইলট। ইচ্ছে করেই গোড়ায় প্যাসেঞ্জার প্লেন সার্ভিসে যায়নি। রাত বিরেতে বিভিন্ন আবহাওয়ায় উড়বে, কড়াকড়ি কম বলে নিজে প্লেন চালানোর সুযোগ বেশি পাবে। ঘণ্টা ধরে মোট ওড়ার অঙ্ক যত বাড়বে, ততো লাভ। কো-পাইলট থেকে পাইলট হবার সুযোগ তাড়াতাড়ি পাবে।

আমরা সাগ্রহে ওর ওড়ার গল্প শুনতাম, আর ওকে দেখতাম চেয়ে চেয়ে। বয়সে এক বছরের ছোট কিন্তু অনেক বড় মনে হত। একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন তখনই অনুভব করতাম। কি এক সংহত শক্তি যেন পরিপুষ্ট হচ্ছে ওর মধ্যে! দুশ্চিন্তা ভয় ভাবনা এ-সব যেন আপনিই ওর জীবন থেকে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। সমস্ত কাজে এক অনাড়ম্বর তৎপরতা লক্ষ্য করতাম। আমরা কত দূর দূর ভবিষ্যতের মধ্যেই না ভাসতাম এক একসময়, কিন্তু ও আকাশে ভাসে, অথচ, সদ্য বর্তমানটুকুই সব। কালকের ভাবনা কাল ভাবা যাবে,

বিপদ যদি আসে তখন দেখা যাবে ।

একবার ভবিষ্যতের কি দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়েছিলাম মনে আছে । শুনে আর দুশ্চিন্তা দেখে ও বলেছিল, ডোণ্ট ক্রস দি ব্রিজ বিফোর ইউ হ্যাভ টু । নিশ্চিন্ত কতটা হয়েছিলাম জানি না, কিন্তু ওর জোরের দিকটা অনুভব করেছিলাম ।

পাইলটের সংখ্যা তখন বেশি নয়, কিন্তু বিমান সংস্থাগুলো দ্রুত বাড়ছে, বড় হয়ে উঠছে । এখানেও সচরাচর যা হয় না তাই হল । কোম্পানীর চীফ অ্যাণ্ড চেক পাইলট বিশেষ সুনজরে দেখল তাকে । তার সুপারিশে দেড় বছর যেতে না যেতে পুরোদস্তুর কম্যাণ্ডার হয়ে বসল সে । নিজেই বিমানের কর্ণধার । উৎসাহ সত্ত্বেও তখনই শুধু দিন কয়েকের জন্য একটু অসহায় ভাব লক্ষ্য করেছিলাম তার । বলেছে, একজনের দায়িত্বের ওপর নির্ভর করে প্লেন চালানোর আর নিজে ক্যাপ্টেন হয়ে বসার মধ্যে অনেক তফাৎ হে ।

যাই হোক, এই কর্তৃত্বও রপ্ত হতে সময় লাগল না খুব । কিন্তু চাঁদের কলঙ্কের মতই এই সময় থেকেই সুনামের ওপর কালির ছিটে-ফোঁটা পড়তে লাগল । মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞার কথা ভোলেনি, বিপদে না পড়ে গেলে ঝুঁকি নেবে না বৈমানিকের এটাই হয়তো সব থেকে বড় গুণ। কিন্তু বাণিজ্যের বা স্বার্থের ক্ষেত্রে এটা সব সময় গুণ নয় । আবহাওয়া কোথাও খারাপ শুনল কি যন্ত্রপাতির ব্যাপারে কিছু মনের মত হল না—অমনি ফ্লাইট ক্যানসেল করে দিল । এ-ব্যাপারে ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্তই সব, সে-ই সর্বে সর্বা । কিন্তু ফ্লাইট নাকচ করলে কোম্পানীর ক্ষতি, বিশেষ করে ফ্রেটারের ট্রিপ সহজে কেউ বন্ধ করতে চায় না, প্যাসেঞ্জার বিমানের থেকে পাঁচ গুণ বেশি ঝুঁকি নিয়েই থাকে ফ্রেটার বিমান ।

সতীর্থ পাইলটরা ভালবাসে তাকে, পছন্দ করে কিন্তু ভীতু অপবাদও দেয় । বলে, দ্যাট চিকেন হার্টেড ফেলো, ভয়ের নামেই ফ্লাইট বন্ধ করে দেয় ।

পরিষ্কার আবহাওয়া দেখলেও কোন পাইলট হয়তো গম্ভীর মুখে ঠাট্টা করে, মেডিটেরিনিয়নে জোর স্টর্ম রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে, ফ্লাইট ক্যানসেল করবে কি না ভেবে দেখো ।

সে তখন যাচ্ছে হয়ত কলকাতা থেকে ঢাকা বা বাগডোগরা । অবকাশ সময়ে এ-সব গল্প সবিতাব্রতই হাসি মুখে মা-কে শোনাতো । অর্থাৎ মায়ের সে কেমন বাধ্য ছেলে তাই বোঝাতো ।

এই কলঙ্ক মুছেও গেছে বড় সুন্দর ভাবে । দু'চার বার মাঝপথের দুর্যোগের মধ্যেও পাকা হাতে হাল ধরে নিরাপদে ফিরে এসেছে বা পৌঁছেছে । একবার এ-রকম হলে লোকে পিঠ চাপড়ায়, বারকয়েক হলে তখন আপনিই মনে হয় লোকটার পার্টসও আছে, স্নায়ুর জোরও আছে । কিন্তু যে যোগাযোগে তার ভীতু নাম খণ্ডন হয়ে উল্টে ছাই চাপা প্রতিভার সূর্যোদয় হল, সেটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার ।

সেদিন বাড়ি এসে দেখি গায়ে পিঠে গোটা কয়েক ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সে শুয়ে আছে । মায়ের মুখ শুকনো । ওদিকে সবিতাব্রতর ঘরে জনা কয়েক দিশী-বিদেশী পাইলট আনন্দ কলরব করছে । তাদের মধ্যে একটি মুখ পরিচিত মনে হল আমার । ফ্লাইং ক্লাবের সেই অবাঙালী সহকারী ইনস্ট্রাক্টর । পরে শুনলাম, বাইরে থেকে আরো পদস্থ ক্যাপ্টেন হয়ে সবে এখানে এসে কাজে যোগ দিয়েছেন তিনি—বিশাল স্কাই মাস্টার প্যাসেঞ্জার প্লেনের কর্ণধার ।

দুর্ঘটনার বিবরণ শুনলাম। সবিতাব্রতর বেশি কিছু হয়নি। কিন্তু হতে পারত। অন্যান্য ক্রুদেরও কারো কিছু হয়নি। কিন্তু হয়নি যে সেটা সবিতাব্রতর গুণ ধরে নিয়েছে সকলে।

ডাকোটাতে চারটে ফুয়েল বা তেলের ট্যাঙ্ক থাকে, কিন্তু স্বল্প মেয়াদের যাত্রায় পুরো তেল না নিতে হলেই লাভ বেশি। তাই সাধারণত দুটোতে তেল ভরে নিলেই কাজ চলে যায়। অন্য ট্যাঙ্ক খালি থাকলে ওজন কমে, বেশি যাত্রী বা মাল নেওয়া যায়। কিন্তু খালি ট্যাঙ্ক বলতেও কিছু তেল তলায় পড়েই থাকে। ট্যাঙ্ক সিলেক্টরের কাঁটা দেখে বোঝা যায় কোন ট্যাঙ্কে ফুয়েল বা তেল ভরতি আছে। কিন্তু ভুলক্রমে সেই কাঁটাই সেদিন জীবনের যোগ ছিঁড়ে দেওয়ার উপক্রম করেছিলো—সিলেক্টর প্রায় শূন্য ট্যাঙ্ক নির্দেশ দিয়ে বসেছিল।

যেটুকু তেল ছিল তাতেই এয়ারক্রাফট বাতাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনের বেতালা ব্যবহার! তেল আসছে না। বাতাসে আটকে গেছে (এয়ার লক্) ভেবে প্রাণপণে চেষ্টা করা হল কিন্তু তেল নেই তো তেল আসবে কোথা থেকে? প্লেন পড়তে লাগল, অনিবার্য মৃত্যুদূত মাটি হাঁ করে গিলতে এলো। ক্র্যাশ হল। কিন্তু এয়ারক্রাফট-এর 'নোজ্' কি করে যে মাথা নিচের দিকে না গুঁজে 'লেভেল' হয়ে পড়ল সেটাই বিস্ময়। বেশি উঁচুতেও ওঠেনি, পড়েছে এরোড্রমের মধ্যেই। কিন্তু 'নোজ্' অর্থাৎ সামনের দিকটা মাথা গুঁজে পড়লে আর আশা করার কিছু ছিল না। পড়ল না যে সেটাই সংকট-মুহূর্তে চালকের বিশেষ কোনো বাহাদুরি ধরে নিয়েছে সকলে। এরপব প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়েছে সে, কি করে 'নোজ্' লেভেলে রাখল—জবাবে সবিতাব্রত শুধু হেসেছে। পরে আমাকে বলেছে, সে কিছুই করেনি, কিংবা কিছু করে থাকলেও জানে না কি করেছে—সে শুধু মাকে ডাকছিল মনে আছে, মাকে ভাবছিল। আর কিছুই মনে নেই।

মায়ের কাছে অবশ্য এই দুর্ঘটনা সামান্য বলে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কর্মস্থলে তার ভীতু নামের কলঙ্ক একেবারে ঘুচেছে সেই থেকে। ঘুচিয়েছেন ফ্লাইং ক্লাবের সেই অবাঙালী প্রাক্তন সহকারী ইনস্ট্রাক্টর ক্যাপ্টেন ডুগার—যিনি হোমরাচোমরা স্কাইমাস্টার পাইলট এখন।

ভীতু! হি ইজ্ এ জেম! হি ইজ্ লিণ্ডবার্গ অফ দি ইস্ট! সবিতাব্রতর সেই পুরনো খেতাব গল্পের ছলে তিনিই আবার চালু করেছেন এখানে। সতীর্থদের হাসি-তামাসার মধ্য দিয়ে নামটা পাকা-পোক্ত হয়েছে ক্রমশ।

হ্যালো লিণ্ডবার্গ!

হ্যালো লিণ্ডবার্গ অফ দি ইস্ট।

সুস্থ হয়ে হাসি মুখে গল্প করছে সবিতাব্রত, কি নামই যে তুমি দিয়েছিলে ফ্লাইং ক্লাবে—ব্যাটাচ্ছেলেরা কেউ আর নাম ধরে ডাকে না এখন।

ওই সামান্য আঘাতের ফলে মায়ের সেদিনের হৃদয়ের কম্পন আমরা বুঝতে পারিনি—সবিতাব্রতও না। পরিবর্তনের মধ্যে তাঁর শুধু পূজা-আর্চা বেড়েছে দেখতাম! আকাশে এরোপ্লেন উড়ে গেলে তাঁকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জানালা দিয়ে সেদিকে চেয়ে থাকতে দেখতাম।

চাকরির দায়ে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ সবিতাব্রতর অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। যেটুকু যোগাযোগ সে শুধু মায়ের সঙ্গে। যতক্ষণ বাড়ি থাকত, মায়ের কাছে, মায়ের ঘরে বসে থাকত। ওর দেখা পেতে হলে আমাদের যেতে হত সেখানে। বাইশ বছর বয়েস না পুরতে

যার এতবড় কৃতিত্ব, যাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি—তার মায়ের মুখে সেই গর্ব বা সেই আনন্দের ছিটে-ফোঁটাও কখনো দেখিনি।

সেই দিনের কথা ভুলবো না কখনো।

বিমান নিয়ে নেপাল গেছে সবিতাব্রত। সেখান থেকে আরো কোথায় কোথায় যাবে। ভারতে বা ভারতের বাইরেও কোথায় কখন চলে যাচ্ছে শুনে এখন আর আমরা অবাক হই না। শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

পরদিন কাগজে বেরুল নেপালের দিকে একটা প্লেন ক্র্যাশ হয়েছে। আরোহীদের একজনও প্রাণে বাঁচেনি। আগের দিন শেষ রাতের খবর, কাজেই যাত্রী বা আরোহী কারা ছিল তাদের নাম ধাম কিছু প্রকাশ হয়নি।

দৌড়ে ওপরে উঠে এলাম। দেখি সবিতাব্রতর মা-কে ঘিরে অনেকে দাঁড়িয়ে। তিনি নিস্পন্দের মত বসে আছেন। রাত থাকতে ওঠেন তিনি, ভোরের কাগজ প্রথমে তাঁব হাতেই পড়ে। বাড়ির লোক উঠে দেখে, সামনে কাগজ খুলে তিনি ওইভাবে বসে আছেন।

এদিকে দৌড়োদৌড়ি ছোটাছুটির হিড়িক পড়ে গেল। উনি উঠে ঠাকুরঘরে গেলেন। অজানা লোকের পক্ষে চট করে যোগাযোগ করে বিমান ঘাঁটি থেকে খবর নিয়ে আসা সময়সাপেক্ষ একটু। তার ওপর সেখানকার খবরও পাকা কিনা আমাদের সেই সংশয় ঘোচে না।

ফিরে এসে শুধু আমি নয়, অনেকেই ঠাকুরঘরে ঢুকে সবিতাব্রতর মা-কে জানালাম, সে ভালো আছে, তার প্লেন কিছু হয়নি, এটা অন্য প্লেন।

তিনি মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। শুনলেন। তারপর আবার পূজোয় মন দিলেন। এতবড় খবরটা শোনার পরেও এই প্রায়-অনুভূতিশূন্য মূর্তি দেখে অবাক লাগল আমাদের।

তারপর আরো অবাক আমরা। সেই বিকেলে সবিতাব্রত এসে উপস্থিত। অথচ তার ফেরার কথা আরো দিন তিনেক পরে। এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করতে বলল, কি জানি কি হয়েছে, মায়ের জন্য হঠাৎ মন কি-রকম করছিল তার, প্লেন ক্র্যাসের খবর পেয়ে মা খুব ভাবছেন তাও মনে হয়েছে। অফিসের মারফত ওয়্যারলেসে মা-কে খবর পাঠাতে পারত, কিন্তু কিছুই ভালো লাগছিল না তার, শেষে অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ডিউটি বদল করে চলেই এলো।

সেই রাত্রিতে মা বললেন, আমার শরীরটা কি রকম করছে, তুই কাছে থাক্।

শোনামাত্র সবিতাব্রত ছুটে নিচে চলে এসেছে। আমার মনে হয়েছে, আমি উড়োজাহাজের পাইলটকে দেখছি না, এক অসহায় শিশুকে দেখছি সামনে। তাকে ওপরে পাঠিয়ে আমি ডাক্তারের সন্ধানে ছুটলাম।

ডাক্তার সেই রাতে অনেকবার এসেছেন। একজন নয় তিনজন।

রাত্রি প্রায় বারোটার কাছাকাছি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আর জ্ঞান হয়নি। ডাক্তার বলেছেন, করোনারি অ্যাটাক।

মা চোখ বোজার দিন চারেক বাদে সবিতাব্রতর চোখে এই দ্বিতীয়বার জল দেখেছিলাম আমি। জিজ্ঞাসা করছিল, মা-কে আমিই মেরে ফেললাম না কিরে ?

সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছি। বলেছি, হার্টের রোগ তো ছিলই। বলেছি, তোকে কত

বড় দেখে গেলেন তিনি, দুঃখ করিস কেন ।

সান্ত্বনা কতটুকু পেয়েছিল কে জানে । দিনকতক বসেছিল চুপচাপ । মনে হয়েছিল, হাওযাই জাহাজের চাকরিই বুঝি ছেড়ে দেবে ও । কিন্তু না, আবার কাজে গেছে । পিছু টান নেই, অনেকদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে আসে । এখানে থাকলেও ওভারটাইম ডিউটি আগের থেকে আরো বেশি করে । দেখাশুনা কম হয় ।

একদিন বলেছিলাম, এত খাটা-খাটি করিস কেন, দেখাই যে পাওয়া যায় না আজকাল ।

বড় ছেলেমানুষের মত চুপি চুপি একটা কথা আমাকে সেদিন ও বলেছিল । আমার আজও কানে লেগে আছে । বলেছিল, একটা মজার ব্যাপার হয়েছে, বুঝলি—খালি উড়তে ইচ্ছে করে—ওপরে উঠলেই কেবল মনে হয় মায়ের খানিকটা কাছাকাছি এলাম । রাত্রে উড়তে আরো ভালো লাগে, মনে হয় মা কাছাকাছি কোথাও থেকে দেখছে আমাকে । আবার খারাপ ওয়েদারে উড়লে মনে হয়, মা ভাবছে, উতলা হচ্ছে, আর ভুরু কুঁচকে বকছে আমাকে ।

শুধু তখনই মনে হয়েছে, যত বড় ক্যাপ্টেনই হোক, ওর বয়েস তো মাত্র বাইশ বছর ।

এরপর দু'তিন মাসের মধ্যে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ও । অপচয় কিছু নেই, দু'বছরের চাকরি, মোটা টাকা জমিয়েছিল । বাড়ির নিজের অংশও কাকাদের কাছে বেচে দিল । কোম্পানীর কাছ থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে সাগর পাড়ি দিল সে । স্কাইমাষ্টারের এনডোর্সমেণ্ট আনবে । এদেশে তখন এক ডাকোটা ছাড়া শুধু স্কাইমাষ্টার চালু—কিন্তু তার ট্রেনিং এখানে হয় না । সবিতাব্রতর ইচ্ছে, সম্ভব হলে সেখানকার আধুনিক অন্যান্য বড় এয়ারক্রাফট-এরও এনডোর্সমেণ্ট নিয়ে আসবে—অদূর ভবিষ্যতে সে-সব এয়ারক্রাফটও এ-দেশে চালু হবেই ।

ওর ধারণা মিথ্যে হয়নি ।

গোড়ায় গোড়ায় বাইরে থেকে চিঠি দিয়েছে দুই একখানা । তারপর তাও বন্ধ হয়েছে । আমরাও একদিন সেই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র উঠে গেছি । ক্রমশঃ স্মৃতির ওপরেও সময়ের পলি পড়েছে । একের পর এক বছর ঘুরে গেছে ।

কিন্তু বিধাতার অন্যরকম ইচ্ছে ছিল । আবার দেখা হয়েছে । হয়েছে বছর সতের বাদে । এই কলকাতাতেই । এই বাড়িতেই । এই বাড়িতে আজ বছর পাঁচেক আছে সে । ছোট, সুন্দর ঝকঝকে বাড়ি, ভাড়াটে বাড়ি নয়—ওদের কেনা বাড়ি । আর আমার বাসস্থান এখান থেকে আধ মাইলের মধ্যে—অথচ আশ্চর্য, একদিনও দেখা হয়নি ।

এই দ্বিতীয় যোগাযোগও বিচিত্র । ওই বাড়ির কাছ দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিলাম । ছোট একটা সাইকেল চালাচ্ছিল বছর আটেকের একটা বাচ্চা ছেলে । আমি দেখলাম, সরাসরি সাইকেল চালিয়ে একটা রিকশাওয়ালাকে সামনাসামনি ধাক্কা দিয়ে বসল ছেলেটা । রিকশাটা খালি ছিল, রিকশাওয়ালা চিৎপাত । আর সাইকেলসহ একেবারে রিকশার নিচে ছেলেটা ।

তাড়াতাড়ি তাকে টেনে বার করতে গিয়ে দেখি সামনের বাড়ির গেট দিয়ে ব্যস্তসমস্ত মুখে প্রায় দৌড়ে এলো একটি মহিলা । ঘাবড়েই গেছে । ছেলেটাকে ততক্ষণে আমি তুলে নিয়েছি, আঘাত যত না পেয়েছে তার থেকে সে-ও ঘাবড়েছে বেশি ।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ছেলে ?

মাথা নাড়ল । আঙুল দিয়ে বাড়িটাও দেখিয়ে দিল । উদ্দেশ্য, যদি ছেলেকে ওখানে দিয়ে আসি--কতটা লেগেছে তখনো বুঝছে না । রিকশাওয়ালা ততক্ষণে গা-ঝেড়ে উঠে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছে । তাকে ইশারা করলাম সাইকেলটা দিয়ে যেতে । মহিলাকে অনুসরণ করে অনুযোগের সুরে বললাম, কলকাতার রাস্তায় এভাবে এইটুকু ছেলেকে কেউ সাইকেল দিয়ে ছেড়ে দেয়—

জবাব না দিয়ে মহিলা আবার একবার ফিরে ঝুঁকে ছেলেকে দেখল । ছেলে তখন পিটপিট করে আমার মুখখানা দেখছে ।

মহিলার দিকে চেয়ে মনে হল কোথায় কখনো দেখেছি--কোথায় মনে পড়ল না ।

বারান্দায় চাদর গায়ে উদ্বিগ্ন মুখে এদিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন । তার দিকে চোখ পড়ামাত্র আমার ধোঁকা লাগল কেমন । দাঁড়িয়ে গেলাম । আমাকে ভালো করে লক্ষ্য করে সে-ও অবাক একেবারে । আর মহিলাকে সব থেকে বেশি অবাক করে দিয়ে ছেলে কোলে আমি তখন চাদর গায়ে লোকটির দিকে ছুটেছি ।

প্রায় সতের বছর বাদে এই আবার দেখা সবিতাব্রতর সঙ্গে ।

ছেলের প্রাথমিক শুশ্রূষার পরে মালা নন্দী আমাদের বিগত সম্পর্কটা ভালোমত আঁচ করল । কিন্তু তখনো তার মেজাজ ঠাণ্ডা হয়নি ভালোমত । এসেই একদফা চাপা ঝাঁঝ প্রকাশ করেছে, নাও, ছেলেকে রাতারাতি সাইক্লিস্ট বানাও আরো ।

আলাপের পর আবার ছেলের প্রসঙ্গ উঠতে বলেছে, দেখুন কাণ্ড, কাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা সকাল-বিকেল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাইকেল নিয়ে ছেলেটাকে নাস্তানাবুদ করে তবে ছেড়েছে--নিজে চাপতে না পারা পর্যন্ত ছুটি নেই । আর আজই একেবারে বাড়ির বাইরে পাঠিয়েছে । যেমন নিজে, তেমন—

সবিতাব্রতও আমার দিকে ফিরেই বলল, কিন্তু সাইকেলটা ছেলেকে কে কিনে দিল জেনে নাও ।

জবাবে মহিলার সুচারু ভ্রূকুটি, বেশ যাও, গাড়ি চাপা পড়ার জন্য আমি সাইকেল কিনে দিইনি ।

আমার আবারও মনে হয়েছিল, এই মুখ কোথায় দেখেছি ।

সবিতাব্রত বলল, যা হয় শেষ পর্যন্ত ভালোর জন্যেই হয়, ছেলে সাইকেল নিয়ে রিকশায় ধাক্কা না মারলে এতকাল বাদে ওর সঙ্গে দেখা হত ?

## ।। পাঁচ ।।

খাঁচার পাখি দেখেছি অনেক । বাইরের মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে তাকে স্থির নিস্পন্দ হয়ে থাকতে দেখেছি । চেয়ে থাকতে থাকতে হয়ত খাঁচার কথা মনে থাকে না কখনো । নিশ্চল ডানায় একটা ত্বরিত শিহরণ জাগে, মৃদু কাঁপন লাগে ।

বাইরের মুক্ত পাখিরও ডানার এই শিহরণ, এই কাঁপন লক্ষ্য করেছি । ঘাড় গুঁজে বসে আছে চুপচাপ, নিশ্চল । দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত উদাসী যেন । হঠাৎ ঘাড় সোজা হল, ডানায় ওই মৃদু শিহরণ আর কাঁপন লাগল ।

পরক্ষণে সে আকাশে উড়ল ।

ডানার এই শিহরণ আর এই কাঁপন আমি চিনি ! সবিতাব্রত বা মালা নন্দী আমাকে মুখে কিছু বলেনি । কিন্তু তবু ওদের দেখেই আমার মনে হয়েছে আবার শিগগিরই ওরা বেরুবে কোথায় । ওদের মনের ডানায় সেই কাঁপন লেগেছে ।

দু'বছর ধরেই এ-রকম দেখে আসছি । সর্বদা যে এরোপ্লেনের পাসের আশায় বা মালার ছুটির আশায় বসে থাকে তাও না । আগের দিন রাতে হয়ত গল্পগুজব করে গিয়ে পরের দিন এসে শুনেছি নেই ওরা । অর্থাৎ রাত্রিতে ঠিক করেছে বেরুবে, পরদিন প্লেনের বুকিং পেলে প্লেনে গেছে নয়তো ট্রেনে । ছুটিছাটার ব্যবস্থা করা তখন আর বড় সমস্যা মনে হয়নি ।

পাঁচ দিন, সাত দিন, বিশ দিন, এক মাস পরেও হঠাৎ আবার টেলিফোন মালার, আমরা তো সেই কবেই ফিরেছি—দু'দিন হয়ে গেল, একটা খবরও তো নেন না, সন্ধ্যায় আসুন ।

ফেরার বেলায় দু'দিন আগে আসাটাও 'সেই কবেই' ফেরা । আমি ঠাট্টা করেছি, এত ছুটি তুমি পাও কি করে, আর চাকরিই বা থাকে কি করে !

সবিতাব্রত টিপ্পনী কাটে, এখনো কিছু বয়েস আছে, চেহারার কিছু চটক আছে, আর ওপরওয়ালা মিস্টার চোখানি আছে—তাই থাকে । আর দু'পাঁচ বছর গেলে থাকবে না ।

মালা তার ঘাড়েই দোষ চাপায়, তুমি আর কথা বলো না, বেরুবার বেলায় তো আর জ্ঞান থাকে না—বছরের মধ্যে তিন মাস যায় উইদাউট পে, অফিসে মুখ দেখানো দায় ।

কিন্তু এই মুখ দেখে কখনো মনে হয়নি উইদাউট পে'র জন্য কোনো খেদ আছে, বা সত্যিই মুখ দেখানো দায় ।

অনেক ভেবেছি । দূরের টানের প্রসঙ্গে অনেকের অনেক ভালো ভালো উক্তি মনে পড়েছে ! দূরের জন্য আমারও মন মাঝে মাঝে অশান্ত হয় । দূরে গেলে আবার ফেরার তাড়া । তাদেরও অনেকটা তাই, কিন্তু কোথায় যেন তফাত !

কে একজন বলেছিলেন, ভ্রমণ তার পক্ষেই নিরাপদ আর আনন্দদায়ক—দারিদ্র্য যার প্রহরী আর প্রেম যার দিশারী । মনে হয় ওদের সঙ্গে মেলে কিছুটা । বাড়িটা যদিও নিজেদের তবু আর্থিক সঙ্গতির দিকটা নিশ্চিত সচ্ছল কিনা জানি না । হলে মালা চাকরি করবে কেন ? চাকর-বাকরও বাড়িতে একটির বেশি দুটি নেই, মালা নিজেই অনেক কাজ করে । দ্বিতীয়, প্রেম যার দিশারী । এক্ষেত্রে দিশারিনী । সবিতাব্রতর দূরের টান এই বিচারে হয়ত সুখপ্রদও । কিন্তু এইটুকুই সব মনে হয় না । এক একসময় মনে হয়েছে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার অসহিষ্ণু তাগিদটাই বুঝি ভেতরে ভেতরে ঠেলতে থাকে ওকে । আর সেই তাগিদের হাওয়া মালাকেও স্পর্শ করে ।

দু'বছরের একান্ত সান্নিধ্যের ফলে সবিতাব্রতর মাঝের এই অদেখা সতের বছরের চিত্র অনায়াসে আমি জুড়তে পারি । কিন্তু সেটা খুব সম্পূর্ণ চিত্র হবে না । কারণ, তার এই সতের বছরের ব্যক্তিগত দিকটাই জেনেছি । জানার আগ্রহ আমার কেন, সে তাও জানে । নিজের কোনো কথা গোপন করার মত দুর্বলতা তার নেই । কিন্তু মালার ব্যক্তিগত দিকটা সে এড়িয়ে গেছে । তার সঙ্গে যেটুকু যোগ সেটুকুই জেনেছি । তার বেশি যেন তার জানার কৌতূহলও নেই, জানানোর আগ্রহও নেই । রূপসী মহিলারা এ ধরনের চাকরিতে এলে

সাধারণত অনেক রকমের বাতাস গায়ে লাগে, জীবন-যাত্রায় অনেক জটিলতা দেখা দেয় ! দুনিয়ার রীতি এই । রূপ যেখানে. রূপের তৃষ্ণা সেখানে । আলোর সঙ্গে ছায়ার মত ফেরে । আজকের মালা নন্দীর বিগত জীবন-যাত্রা হয়ত এর ব্যতিক্রম নয় । এমনও মনে হয়েছে, ওর স্ত্রীর প্রতি পাছে আমি সম্ভ্রম হারাই, সেইজন্যই হয়ত স্ত্রীর ব্যক্তিগত অনেক প্রসঙ্গ সে এড়িয়ে যায় ।

কিন্তু আবার মনে হয়, তাও না । এই বলা না বলাটাই যেন তার এক্তিয়ারের বাইরে । আসলে কারো নিজস্বতার গণ্ডির মধ্যে উঁকিঝুঁকি দেওয়ার ধাতই নয় ওর, তাই নিয়ে জটলা করারও নয় । কখনো কৌতূহল প্রকাশ করলে হাসিমুখে বলে, নিজেই জিজ্ঞাসা করো না, কারোর ভিতরের ব্যাপার নিয়ে আমি তেমন মাথা ঘামাইনে ।

আর এক প্রসঙ্গ স্পষ্টতই এড়িয়েছে, সেটা ওদের বড় ছেলের প্রসঙ্গ । এই ছেলের সম্পর্কে আমার কৌতূহল দিনে দিনে বেড়েছে । বিয়ে করলে এয়ার হোস্টেসের চাকরি থাকে না । বিয়ের পাঁচ বছর আগে ছেলে হয়েছে । মেয়েরা অনেক কিছু গোপন করতে পারে, কিন্তু সন্তান-সম্ভাবনা গোপন করবে কি করে ? গোপন করতে হলে আর সেই সন্তানকে নিরাপদে আলোর মুখ দেখাতে হলে ছ'মাস আটমাসের জন্য অন্তত নিয়মিত আকাশে ওড়ায় ছেদ পড়ার কথা ।

এই গেল একদিক । আমার দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব ছেলেটার চেহারা নিয়ে । বাপমায়ের সঙ্গে ছেলের চেহারার মিল অনেক সময়েই থাকে না । কিন্তু তা বলে একেবারে মূলে তফাতও মনে হয় না বড় । এ-যেন আর এক ফুলের চারা, অন্য চারার সঙ্গে এনে বসানো হয়েছে । অবশ্য আমার এই সংশয়ের ভিন্ন কারণও থাকা সম্ভব । তেমন সরস প্রসঙ্গ উঠলে কয়েকটা বিদেশী মেয়ের নাম নিয়ে খোঁটা দিতে শুনেছি মালাকে, বলেছে, ক্যাপ্টেনের চাকরি, রসকস কতো জানেন না তো—যতক্ষণ প্লেন চলল, ততক্ষণ প্লেন ছাড়া আর কিছু জানিনে । তারপরেই অন্য দিকে মন, বেচারী রোজা মিস ইয়ং, কমলা ব্যাস—এদের কথা মনে হলে আমার আজও দুঃখ হয় । জবাবে সবিতাব্রতও একদিন ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠেছিল, আর বেচারা ডিক্রুজ্-এর কথা মনে হলে দুঃখে একেবারে বুকটা ফেটে যায় আমার ।

দেখো, ভালো হবে না বলছি ।

রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন ।

এই থেকেও খটকা লেগে থাকতে পারে আমার মনে । হতে পারে ছেলেটা শুধু সবিতাব্রতর, আবার হতেও পারে ছেলেটা শুধু মালার । অথচ দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা ওই আগের কারণেই, অর্থাৎ লোকচক্ষুর কাছ থেকে গোপন করা সম্ভব নয় বলেই সত্যি বলে মনে হয় না । কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই আবার মনে হবে, ওই বড় ছেলের প্রতিই মালার যেন একটু বেশি পক্ষপাতিত্ব, বেশি টান, তাকে নিয়েই বেশি চিন্তা ভাবনা । তাছাড়া ওদের দু'জনের ছেলে না হলে এ-রকম এক অনাবিল আপস সম্ভব কি করে তাও বুঝি না ।

মালার অনুপস্থিতিতে সেদিন সন্ধ্যায় সবিতাব্রতর সঙ্গে আলাপের মোড়টা এদিকেই ঘোরাতে চেষ্টা করেছিলাম । মালা অনেক সময়েই বাড়ি থাকে না, কেনা-কাটা করতে বেরোয় । আমরা গল্প-সল্প করি ।

মালা ঘরে ঢুকল । হাতের জিনিসগুলো রাখতে রাখতে বলল, ক'দিন ধরে যেন একটু

বেশি গুজগুজ করছেন, কি ব্যাপার ? আমি এদের আবার বাধাও পড়ে দেখেছি—

বললাম, হাতে আর সময় বেশি নেই মনে হচ্ছে, শিগগিরই হয়ত আবার তোমরা উধাও হবে, তাই যেটুকু পারি রসদ সংগ্রহ করে নিচ্ছি ।

মালা বলল, উধাও হতে বয়ে গেছে এখন ! তা কিসের রসদ, গোপন কিছু নাকি ?

গম্ভীর মুখে সবিতাব্রত জবাব দিল, অত্যন্ত । এছাড়া ও সত্যও গোপন করছে । মনে মনে এখন ওর তোমার ওপর দখল নেবার ইচ্ছে, সেইজন্যেই ক'দিন ধরে পটাতে চেষ্টা করছে আমাকে ।

রসিকতা হলেও এ ধরনের কথায় মালার দৃষ্টি ঈষৎ সচকিত হয় লক্ষ্য করেছি, চোখে এক ধরনের অস্বস্তি উঁকিঝুঁকি দেয় । সামলে নিতেও সময় লাগে না অবশ্য ।

বলল, দখল ছাড়ার জন্য তোমারও আবার খুব আগ্রহ নেই তো ?

না । আমি একজন অসহায় ব্যক্তি ।

ফের ! মালার ভ্রূকুটি । এ-ধরনের কথায় আগেও যেমন উষ্মা দেখেছি, সেই রকমই ।

এমন সময় সুব্রত অর্থাৎ বড় ছেলে ঘরে ঢুকল । মা-কেই হয়ত কিছু বলতে এসেছিল । কিন্তু মায়ের মুখের ওই 'ফের' শুনে আর ভ্রূকুটি দেখে কিছু না বলেই ফিরে গেল । মালা হেসে ফেলল, দেখেছ, ছেলেটা ঘাবড়ে গেছে ।

কি মনে হতে সরাসরি একটা আক্রমণের লোভ জাগল । বললাম, সতু সত্যি কথা বলেনি, আমি তোমার ওই ছেলের সম্বন্ধেই কথা তুলেছিলাম—

কি কথা ?

চোখ পাকিয়ে জবাব দিলাম, বিয়ে হয়েছে তোমাদের পাঁচ বছর, দশ বছরেব ছেলে হয় কি করে ?

শোনামাত্র লজ্জায় লাল হলে সেটা স্বাভাবিক ভাবতুম । এই বেপরোয়া উক্তির পবেও লজ্জাব ছিটে-ফোঁটা দেখলাম না । উল্টে শোনামাত্র হেসে আটখানা । আঙুল দিয়ে সবিতাব্রতকে দেখিয়ে দিল, বলল, চরিত্র—চরিত্র—চরিত্রটা বুঝুন একবার !

ব্যস,. আমার উদ্দেশ্য বা চেষ্টা তখনকার মত রসাতলে ।

কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই ছোটখাটো একটা সুযোগ এলো । এলো ঠিক বলা যায় না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুযোগ করে নিলাম । কিছুদিনের জন্য আমারই হঠাৎ বাইরে যাবার প্রয়োজন ঘটল । সেই কারণে একটু ব্যস্তও ছিলাম । ওদের কিছু বলিনি, কারণ, কিছু না বলে ক'য়ে ওদের মত নিরুদ্দেশ হয়ে ওদেরই একটু অবাক করার বাসনা হয়েছিল । যে দিন যাব, তার আগের দিন বিকেলে উত্তর কলকাতা থেকে একটা ট্যাকসি নিয়ে ফিরছিলাম । মাঝ পথে দেখি, বাসের অপেক্ষায় মালা নন্দী দাঁড়িয়ে ।

ট্যাকসি থামিয়ে ডাকলাম, উঠে এসো, আজ তোমার মিস্টার চোখানি বুক চাপড়াক ।

মালা নন্দী সানন্দে উঠে এলো । বলল, বাঁচা গেল, চোখানি কি একজন, বাসের গাদা গাদা লোকও বেশির ভাগই ওই । আপনি গেছলেনই বা কোথায়, চলেছেনই বা কোথায় ?

বললাম, গেছলাম উত্তরে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরছি নন্দীবড়ির টানে—এখন অবশ্য দু'ঘণ্টা দেরি হলেও আফসোস নেই ।

ড্রাইভার পাঞ্জাবী, আমি নিঃশঙ্ক ।

পার্শ্ববর্তিনী হেসে উঠল, বলল, দু'ঘণ্টা না হোক, দু'দশ মিনিট আপনাকে দেরি করাতে আর ট্যাকসির মিটার চড়াতে আমার আপত্তি নেই। ট্যাকসিটা মার্কেটের দিকে ঘোরাতে বলুন একটু, স্পোর্টিং গেঞ্জি আর হ্যাট চাই—নইলে মান সম্ভ্রম খোয়া যাচ্ছে ছেলের।

বুঝেও জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ ছেলে?

সুবু, আবার কে—

ও। এই জন্যেই...

মন্তব্য শুনে ঈষৎ কৌতূহলে ফিরে তাকালো। কিন্তু ট্যাকসি মার্কেটের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে আমি ততক্ষণে দরজা খুলেছি।

গেঞ্জি কেনা হল। টুপী কেনা হল। পছন্দ করে তার জন্য ছোট একটা টাইও কিনল। শেষে বলল, এত যখন হল, একজোড়া স্পোর্টিং জুতোও নিয়ে নিই চট করে—।

তাও নেওয়া হল। সব নিয়ে আবার গাড়িতে।

ট্যাকসি চলল। সুযোগ বুঝে এবারে বললাম, সবই বড় ছেলের জন্য নিলে, তোমাব ছোট ছেলের জন্য কিছু নিলে না?

ও মা,. ও-তো বাচ্চা, ও এ-সব দিয়ে কি করবে?

গলার স্বর তাৎপর্যপূর্ণ করতে চেষ্টা করে মন্তব্য করলাম, বুঝলাম—

ঘুরে তাকালো। ট্যাকসি থেকে নামার আগের মন্তব্যও মনে পড়ল বোধহয়—কি আবার বুঝলেন?

একজনের ওপর এত বেশি টান কেন...

কেন? চোখের পাতায় কৌতুক কাঁপল।

ধীরে সুস্থে বললাম, দেখো, আমি একজন জীবন-শিল্পী, জীবন হাতড়ে বেড়াই—লিখে একটু আধটু নামও হয়েছে—দু'বছর দেখেও তোমার ওই ছেলের রহস্য বুঝব না অত নিরেট নই! ছোট ছেলেকে নিয়ে কিছু সমস্যা নেই বলে তাকে নিয়ে ভাবনাও নেই তোমার।

আঃ! কি বুঝেছেন তাই বলুন না, আপনাকে বলেছে কিছু?

আমি নির্লিপ্ত।—তাহলে বলার আছে কিছু বলছ?

থতমত খেয়ে হেসে ফেলল। আমি বোকা বলেই আসলে আপনি কথার প্যাঁচে ফেলে ভাঁওতা দিচ্ছেন—বোঝবার আবার কি আছে!

একটা গুরু চ্যালেঞ্জের হাওয়া সৃষ্টির ইচ্ছে আমার।—যদি থাকে? যদি বলে দিই? কি বাজি বলো—

মালা নন্দীর কৌতূহল খুব চাপা নেই অনুভব করে পরিতুষ্ট আমি। উৎফুল্ল মুখেই বলল, আপনিই ফরমাস করুন কি বাজি রাখতে হবে—এই জামা জুতো তো আপনার গায়ে পায়ে হবে না। হারলে বাড়ি গিয়ে কাপ তিনেক চা খাওয়াতে পারি।

আমি ঠাট্টার দিকে না গিয়ে জবাব দিলাম, আমার আকাঙ্ক্ষাটি বড় কম নয়, হারলে যা চাইব তাই মঞ্জুর করতে হবে।

বাড়িতে এধরনের বেপরোয়া রসিকতা সবিতাব্রত অনেক করেছে—সঙ্গে আমি যোগ দিতে ছাড়িনি। তার অনুপস্থিতিতে ট্যাকসিতে পাশাপাশি বসে পার্শ্ববর্তিনীর মুখে হঠাৎ এই উক্তির চকিত প্রতিক্রিয়া দেখে মনে মনে নিজেই অপ্রস্তুত একটু। এ-ধরনের পরিহাসের

প্রসঙ্গে চোখের এই অস্বাচ্ছন্দ্য চকিত চাউনি আগেও লক্ষ্য করেছি। জীবনে অনেক টানা-হেঁচড়া গেছে বলেই বোধহয়। হেসেই জবাব দিল. কথার ধরনধারণ সবিধের লাগছে না আপনার।

আমি গম্ভীর। বাজির প্রসঙ্গ রেখে আগে এদিক সামলাতে চেষ্টা করলাম। বললাম, দু'বছর ধরে আমাকে দেখেও কি ওই চোখানিদের একজন বলে মনে হয় তোমার? অমন ঘাবড়ে গেলে কেন?

ঈষৎ অপ্রস্তুত।—ঘাবড়েছি কে বলল?

তোমার চোখ। সতু আমার কোন্ দিনের বন্ধু আর কতখানি বন্ধু জানলে বোধহয় তুমি আর একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতে। তা'ছাড়া ওই অসহায় লোকটির যে তুমি কতখানি সম্বল তা চোখানিরা না জানুক আমি জানি।

এবার একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। পিছনে ঠেস দিয়ে বসল। প্রায়-নির্লিপ্ত দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত। কয়েক মুহূর্ত বাদে আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, লোকটা যে অসহায় আপনাকে কে বললে?

এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। জবাব না দিয়ে তাকালাম শুধু।

একটু থেমে তেমনি শান্ত মুখে মালা বলে গেল, ক্ষতিপূরণ লাইসেন্স, ইনসিওরেন্স, লাইফ-ইনসিওরেন্স, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড—সব মিলিয়ে দু'লক্ষ একাশি হাজার টাকা আপনার বন্ধু পেয়েছিল। তা ছাড়া টাকা ওড়ানোর ধাত খুব নয় বলে চাকরির টাকাও ব্যাঙ্কে কম জমেনি। গ্রাউণ্ডেড হয়ে অফিসার টফিসারের চাকরি করতে পারত, তারা অনেক সাধাসাধি করেছিল—করল না। ...নব্বই হাজার টাকা দিয়ে আমার নামে এই বাড়িটা কেনা হয়েছে, আর বাদ বাকি সব টাকা ব্যাঙ্কে আমার নামে জমা করে দিয়েছে। সেই টাকা কি করছি, কতটা খরচ করছি, কোনদিন খোঁজও করে না!...কম্যাণ্ডার পাইলটের স্ত্রীরা সাধারণত একই অফিসে চাকরি করে না, মর্যাদায় লাগে। আমি চাকরি করছি অভাবের জন্যে নয়, অ্যাভিয়েশনের সঙ্গে একটু যোগ থাক, এটা তার মনে মনে ইচ্ছে বলে। ছেলেরা নামজাদা পাইলট হবে এখন থেকেই সেই স্বপ্ন দেখে। যাক সে কথা, নিজের জন্যে কিছুই না রেখে এমন নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে তাকে কি খুব অসহায় বলে মনে হয় আপনার?

আমি নির্বাক। নিজের উক্তি নিজের কানেই খোঁচা দিচ্ছে এখন।

এবারে আর একটু সহজ গলায় মালা বলল, অসহায় বরং আমার নিজেকে মনে হয় এক একসময়। ওই লোকেব পাশে নিজেকে বড় তুচ্ছ মনে হয়। তার সঙ্গে থাকব, তাকে ধরে রাখব—আমার শুধু এই চিন্তা। অসহায় কে বুঝুন তাহলে।

আমার মুখে কথা নেই। ট্যাকসির এই স্বল্পক্ষণের স্মৃতি কোন্ মণিকোঠায় জমা হয়ে থাকল সে শুধু আমিই জানি। সবিতাব্রত ঠাট্টার ছলে দয়ার কথা অনুগ্রহের কথা বললেও স্ত্রীটি কেন অমন রেগে যায় তাও আর উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হল না। মনে মনে বললাম, মালা নন্দী তোমার এই অসহায়তাটুকু অফুরন্ত হোক, এ যতদিন থাকবে ততদিন তোমার ভাবনা নেই।

এ প্রসঙ্গ যেন মন থেকেই বাতিল করে দিয়ে মালা নন্দী সহজ মুখে সোজা হয়ে বসল আবার।—যাক গে, আসল কথাই তলিয়ে গেল। বাজির কথা। কি বলছিলেন বলুন।

হারলে কি করতে হবে ?

একটু চাঙ্গা হয়ে জবাব দিলাম, নির্জলা জবানবন্দী দিতে হবে । তোমার—

থাক আর বলতে হবে না, আপনার মতলব আমার জানা আছে । হাসল মুখ টিপে, কিন্তু এ-ও কি কম চাওয়া । শরীরটা ফালা ফালা করলে ভিতরে তো রক্ত মাংস কঙ্কাল —দেখতে কার ভালো লাগে ? এ-ও সেই রকমই, মাঝখান থেকে লোক ভোলাবার সম্বলটুকুও খোয়াব ?

বললাম, জগতের অনেক মহীয়সী বীরাঙ্গনারা নির্ভয়ে খুইয়েছে ।

আমি মহীয়সীও নই. বীরাঙ্গনাও নই., হাওয়াই অফিসের অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট । আচ্ছা, পরোয়া করি না । রাজী । এখন বলুন দেখি কি বুঝেছেন ?

বেশ একটু উৎসাহ বোধ করছি ভিতরে ভিতরে । ধীরে সুস্থে জবাব দিলাম, এই বড় ছেলেটি তোমার নয়, সবিতাব্রতর ।

আমাকে বিচলিত করে খিল খিল করে হেসে উঠল । হঠাৎ এই হাসির তোড়ে পাঞ্জাবী ড্রাইভারও সচকিত হয়েছিল কিনা জানি না । হাসি থামতে বলল, বাঁচা গেল, বাজিতে হেরেছেন—এ মা, আপনি হারলে কি হবে শর্ত করা হয়নি তো ।

আমার বিমূঢ় অবস্থা । মুখের দিকে চেয়ে আছি । মিথ্যে বলবে এমন কথা একবারও মনে হয়নি, তবু ওই মুখ দেখেই তার মনের তলায় কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছি ।

আমার এই চাউনি দেখেই মুখে আবার এক রাশি বিড়ম্বনার কারুকার্য মহিলার মুখে । তাড়াতাড়ি বলে উঠল, এবার যেন আবার বলে বসবেন না ছেলেটা তাহলে তোমার, সবিতাব্রতর নয়—সে আরো বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে—বলতে বলতে আবার হেসে সারা ।

বোকার মতো চেয়ে থাকাই সার আমার ।

শাড়ির আঁচলে মুখটা মুছে নিল একবার । হাসি গেছে, কিন্তু সমস্ত মুখে হাসির আভা লেগে আছে তখনো । হাল্‌কা করেই বলল, ওই ছেলে আমার যতখানি আপনার বন্ধুর ততখানিই ।

আমি সাদা অর্থই ধরেছি, কথাটার নিগূঢ় ঠকানো তাৎপর্য আছে কিনা সেদিকে মাথা ঘামাইনি । কারণ, আমার মনে তখন আশাভঙ্গের খেদ । অনেক মাথা খেলিয়ে এই বাজির প্রহসনে ঢুকেছিলাম । কিন্তু হার সার ।

পূর্ব ব্যবস্থামত পরদিন কলকাতা ছেড়েছি । ওদের না জানিয়েই । ফিরলাম প্রায় দিন পনের বাদে । বাড়িতে খবর পেলাম আমার বেরুনোর পরে দু'দিন মিস্টার নন্দীর বাড়ি থেকে টেলিফোন এসেছিল ।

কিছু মিষ্টি বিস্ময় আর কিছু মিষ্টি অনুযোগ অভিযোগের আশা নিয়ে সেই সন্ধ্যায়ই ওদের বাড়িতে হাজিরা দিলাম ।

বাড়ির দরজা কপাট সব বেশির ভাগই বন্ধ । কারো সাড়া শব্দ নেই ।

বিস্ময় কাটতে না কাটতে ওদিকে থেকে ছোকরা চাকরটা এসে সেলাম জানালো ।

কোথায় সব ?

জানালো, বাহার চলা গিয়া । কোথায় গেছে কবে ফিরবে বলতে পারল না । শুধু বলল, ঠারিয়ে, আপকো একঠো চীজ হ্যায় ।

একটু বাদে চীজটা এনে হাতে দেওয়া মাত্র আশায় উদ্দীপনায় মনে মনে লাফিয়েই উঠলাম বোধ করি। পুরু লম্বা বড় খাম একটা, ওজনও মন্দ নয়। মুখ আঁটা খামের বড় বড় মেয়েলি অক্ষরে লেখা, 'পরাজিত সমীপেষু'।

পরাজিতের অপ্রত্যাশিত পুরস্কার নিয়ে হাওয়ায় ভেসে বাড়ি ফিরেছি।

সেই পুরস্কারের মধ্যে বিচরণ করে রাত ভোর হয়েছে।

অনেকদিন ধরেই এক জীবন ধারার চিত্র আঁকছিলাম আমি। এবারে আবার সেটা অনেক কাট ছাঁট করতে হবে, অনেক অদলবদল করতে হবে। তুলির অনেক আঁচড় বাকি আব অনেক আঁচড় বাড়তি। আমি বৈমানিক নই, তারপরেও যন্ত্রগত পরিবেশের সূক্ষ্ম বিচারে অনেক ত্রুটি থাকা সম্ভব। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই জীবনধারার চিত্রটি যে এবারে সম্পূর্ণ হতে পারে, তাতে সংশয় নেই।

## ।। ছয় ।।

মনীষী কবির উক্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়ো বাপু, ওই পাপে দেবদূতীরও পতন। ওটা স্বপ্নের ছায়া, তার বেশি কিছু নয়।

অর্থাৎ উঁচুতে উঠতে চাও, কিন্তু কত উঁচুতে উঠবে ? ওই উঁচুতে ওঠাব আকাঙ্ক্ষা বুকের তলায় জ্বলে যখন, সেটা আর বড় নেভে না। তখন ওটা আশ্রিতকেই দহন করে।

মালা নন্দী নয়, সেদিনের বহুজন বাঞ্ছিতা হাওয়াই হোস্টেস মালা বিশ্বাসের এই উক্তি জানা থাকলে বলত, শুধু তাদের পেশার মেয়েদের লক্ষ্য করেই কবি এ-কথা লিখেছেন। এয়ার হোস্টেসদের মত এত উঁচুতে কে আর ওঠে। পাইলট ওঠে, ক্রু-বা ওঠে, যাত্রীরা ওঠে, কিন্তু তাদেব মন পড়ে থাকে মাটিতে, কখন নামবে, কখন নেমে সুস্থিব হবে কিন্তু তারা ? তারা মাটিতে থাকলেও সর্বদাই হাওয়ায় ভাসছে—স্বপ্নেরও চার ধাবে ছায়া বযে বেড়াচ্ছে।

আর বলত, আকাঙ্ক্ষার ওই আগুন তাব পোড়ানোর কাজটা তাদেব বেলায যত তাড়াতাড়ি শুরু করে তেমন আর কারো বেলায় নয়। আর, আরো মজা, তাদের বুকেব তলায় আগুন জ্বলে উঠে, আগুনেব আভা চোখে মুখে মিষ্টি হাসি হয়ে ফোটে—লোকে মুগ্ধ হয়। লোকে কেন, মনের আয়নায় সে-মুখ দেখে তাদের থেকেও নিজেরাই বেশি মুগ্ধ হয়। অপরকে ভোলানোর থেকেও তারা নিজেকে ভোলায় অনেক, অনেক গুণ বেশি।

তারপর ?

তারপর সেই মরুভূমির গল্প আর মরীচিকার গল্প। যা কতকাল আগে পড়েছে কিন্তু কখনো ভেবে দেখার বস্তু মনে হয়নি। আজও ভাবতে মোটেই চায না, কিন্তু এই এক জিনিস, যা না চাইলেও নির্লজ্জের মত এসে দেখা দেবার ফাঁক খোঁজে। হ্যাঁ, সেই মৃগতৃষ্ণার মতই বটে ব্যাপারটা। তৃষ্ণায় তোমার যত বেশি ছাতি ফাটে, জলাশয়ের বিভ্রম ততো বেশি সত্যি মনে হয়। তুমি যদি দাঁড়িয়ে থাকো—ওটাও স্থির। তুমি নড়লে ওটা সরবে। তুমি ছুটলে তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওটা পিছু হটবে।

সেই রকমই দশা ওদের। গোড়া থেকেই 'কিছু একটা হব' আশা। শেষে দেখা যাবে

আশায় আশায় বেলা কাটল কিন্তু খুলে আর পৌঁছুনো গেল না।

ক্রীতদাসের এক প্রভু। যখন যার তখন তার। আকাঙ্ক্ষা বহুবল্লভা। একই সঙ্গে সে বহুজনের। লক্ষ্যের চূড়ায় পৌঁছে দেবে বলে যেখান থেকেই হাতছানি আসে সেখানেই ছুটতে হয়। তাই নিরিবিলি অবকাশ যদি জোটে, বহু জনের নয়ন মনোলোভা হাওয়াই হোস্টেস মালা বিশ্বাসও কবির মত একসময় ভাবে, আকাঙ্ক্ষা শত্রু, গোড়াতেই যদি কেউ এই শত্রুর টুঁটি টিপে মেরে দিত।

কিন্তু এও অনেক পরের ভাবনা—জীবনের একটা অনিশ্চিত মোহনায় এসে দাঁড়ানোর পরের। আসলে ভাবনা-চিন্তার নিরিবিলি অবকাশ মালা বিশ্বাসের তেমন জোটে না। জোটাতে চায়ও না। মদের নেশা যার সে আরো বেশি মদ খেয়েই নেশার খেদ আর শোক ভুলতে চায়; ওদেরও সেই অবস্থা। তবু তো ওকে স্বতন্ত্র ভাবে সকলে, আর পাঁচজন সহকর্মিণীর মত হৈ-হুল্লোড় করে বেড়ায় না বলে একটু স্বতন্ত্র মর্যাদাও দেয়। আবার দেমাকও ভাবে অনেকে। রূপেব দেমাক, চালচলনের দেমাক, লোকের একটু বেশি চোখ পড়ে বলে মর্যাদার দেমাক। কিন্তু মর্যাদার মুখোশ খুলে ভিতরের অশান্ত মনটাকে কে আর দেখেছে? অপরে ছেড়ে মালা বিশ্বাস নিজেই রাজী নয় দেখতে, মুখোশ খুলতে।

তাই অবকাশও শত্রু।

এই শত্রুকে সে অবশ্য অনাযাসে পরাজিত করতে পারে। আকাশে যেদিন উড়তে হয না সে-দিনটা বড় আনন্দের দিন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কিছু না কিছু আনন্দের প্রোগ্রাম থাকে। ডিউটি অফ থাকলে সহকর্মিণীরা আসে, মিস ইয়ং আসে, কমলা ব্যাস আসে, চা খায়, আড্ডা দেয়। বোজা গ্র্যাণ্ড আসে, রোগা পটকা মিস দত্তগুপ্ত আসে, পাহাড়ী মেয়ে পার্বতী রাঙ আসে।

সাধারণত গল্প শুরু হয় কোনো প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে আর শেষ হয় হাওয়াই জাহাজেব পদস্থ কর্মচাবীদেব দিয়ে।

কবে কার প্যাসেঞ্জার কি কাণ্ড করল। কাণ্ডটা প্যাসেঞ্জার থেকে যার যার ব্যক্তিগত দিকে গড়ায। রোজা গ্র্যাণ্ড পার্বতী রাঙকে জিজ্ঞাসা করে, গোয়াতে তো দু'রাত হল্ট্ করে এলে, হোয়াট অ্যাবাউট ইওর ব্ল্যাক ম্যান, ডিড হি বিহেভ ওয়েল?

রসিকতা রেডিও এঞ্জিনিয়ার শর্মাকে নিয়ে। মিস্ রাঙ ভারী মুখ আরো ভারী করে জবাব দেয়, ও, হি ইজ্ ওয়র্স্ দ্যান ইওর লিট্ল্ মঙ্কি—

লিট্ল মঙ্কি বলতে ক্যাপ্টেন জোন্স্। রোজা গ্র্যাণ্ড তখন তার হাওয়াই জাহাজে উড়ছে।

গম্ভীর মুখে মিস ইয়ং পরিবেশটা আর একটু জমাটি করে তুলতে চেষ্টা করে।—এ ভেরি অড্ ম্যাচ্—দ্যাট্—লিট্ল্ মঙ্কি শুড ফ্লাই উইথ্ মিস ডাট্টাগুপ্টা—উইল্ সাজেস্ট মিস্ লরি—

রোজা গ্র্যাণ্ডের সঙ্গে ক্ষুদে ক্যাপ্টেন জোন্স্কে একদম মানায় না, চীফ এয়ার হোস্টেস মিস লরিকে সে বলবে মিস রিনা দত্তগুপ্তকে যেন তার সঙ্গে উড়তে দেওয়া হয়।

মিস দত্তগুপ্ত ফোঁস করে ওঠে অমনি, আবার আমাকে নিয়ে কেন, নিজে সতের ঘাটের জল খাচ্ছ খাও না—তোমার হার্ডল কিট্ কি বলে?

আদর করে মিস ইয়ং কালো কুলো ক্যাপ্টেন জোসেফের নাম রেখেছে হার্ডল কিট্

—হোদল কুতকুত। তার বপুখানা এখন আর ককপিটের ক্ষুদ্র আসনে প্রায় ধরে না নাকি। ঘাড়ে কাঁধে একটা অসহায় ঝাঁকুনি তুলে মিস্ ইয়ং জবাব দেয়,...দ্যাট ইমপসিবল ফুল উইল টেক্ মি টু হেল্ সাম ডে—

কমলা ব্যাস ফোড়ন কাটে, কত যেন বাকি আছে—

নানা কণ্ঠের নানা ভঙ্গিমার হাসি। মিস্ ইয়ং চোখ রাঙায়, ইউ—।

এবারে কমলা ব্যাসকে নিয়ে পড়বে সকলে এও জানা কথাই। মিস ইয়ংই পথ দেখায়, তোমার মত 'লাকি' কে আর বলো— একনাগাড়ে ক্যাপ্টেন নন্দীর সঙ্গে উড়ছ—ফ্লাইং উইথ্ দি লিণ্ডবার্গ অফ দি ইস্ট।

ঠিক এই একজনের প্রসঙ্গ উঠলে মালা বিশ্বাস সচকিত হবে একটু। ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দীর প্রসঙ্গে। ভালো করে আলাপ না হতে বন্ধুর পক্ষ নিয়ে যে তাকে খামোকা অপমান করেছে। তোয়াজ তোষামোদ করে আর লিণ্ডবার্গ করে সকলে যাকে মাথায় তুলেছে। মাটির ওপর দিয়ে চললেও নিজের মাথাটা যে এরোপ্লেনের থেকেও উঁচু ভাবে। অল্প-স্বল্প আলাপের পরেও যার সহজ ব্যবহারের মধ্যে বিদ্রূপের হুল থাকে।

না। শুধু এই নয়, মালা বিশ্বাসের সচকিত হবার আরো কারণ আছে। লোকটার একটা সহজ জোরের দিক আছে যেদিক থেকে ইচ্ছে করলেই মুখ ফিরিয়ে থাকা যায় না। কিন্তু নিজের এই জোরটুকু সম্বন্ধে সে যেন সচেতন। ক্যাপ্টেন নন্দী সদয় ব্যবহার করলেও মনে হয় অনুগ্রহ করছে। অনুগ্রহই করে থাকে, নিজে অনুগৃহীত বোধ করে না কখনো। এয়ার হোস্টেস অনেক আছে। কিন্তু মালা বিশ্বাসের মত এয়ার হোস্টেস গণ্ডায় গণ্ডায় নেই। ওই লোকটা সাধারণ মানুষের খুব ঊর্ধ্বে নয়, মালা বিশ্বাসের দিকে চোখ আগেও পড়েছে, ইদানীং আরো বেশি পড়ছে মনে হয়। কিন্তু সে-ও তার দাম্ভিক অনুগ্রহেরই সামিল।

তার প্রসঙ্গ ওঠামাত্র বান্ধবীরা উঃ আঃ করে ওঠে। কমলা ব্যাসের প্রতি ঈর্ষার কপট বাণ নিক্ষেপ শুরু হয়।

রোজা গ্র্যাণ্ড বলে, রিয়েলি লাকি সি ইজ্, আ-রিমেম্বার মাই ডেজ্ উইথ দ্যাট্ ক্রাক্ ইডিয়ট।

পার্বতী চোখ রাঙায়, ও-রকম বোলো না, মিস ব্যাস মূর্ছা যাবে—হি ইজ্ এ চার্মিং ফেলো—

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মিস ইয়ং বলে, দ্যাট প্রিন্স অফ ডেনমার্ক—ওর কথা হলে হোদল কুতকুতকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করে।

মুখ খোলে মিস দত্তগুপ্তও, জিজ্ঞাসা করে তা এগুলি কদ্দূর, এয়ার হোস্টেসি ঘুচবে না ওড়াই সার ?

ছদ্ম খেদে কমলা ব্যাস জবাব দেয়, ওড়াই সার ভাই, এখন মুখ থুবড়ে মরতে পারলে বাঁচি।

হোয়াই ? হোয়াই ? আর পছন্দ করছে না ?

করবে না কেন, বেড়াল আবার ইঁদুর অপছন্দ করে—হি অলওয়েজ লাইকস্ অ্যাণ্ড অলওয়েজ হেট্স্।

সত্য কথা বলেছে। মালা নন্দী কেন, এরা সকলেই জানে এটাই তার আসল পরিচয়।

রোজা গ্র্যাণ্ড জানে, মিস্ ইয়ং জানে, পার্বতী রাঙও জানে। এদের যে-কেউ একজন যে-কোন একদিন ক্যাপ্টেন নন্দীর ঘরণী হতে পারত। হয়নি। কমলা ব্যাসও হবে না জানা কথাই।

মালা বিশ্বাস মন্তব্য করে ওঠে এবারে, তবু তো রস্টারে একদিন ডিউটি বদল দেখলে চোখে অন্ধকার দেখিস, সকলে বলে ওই ভদ্রলোকের প্লেনে ওড়ার জন্য মিস লরিকে তুই ঘুষ খাওয়াচ্ছিস।

পাল্টা জবাব দিতে ছাড়বে না কমলা ব্যাসও। কি করব বলো, সাধু বাছতে গাঁ উজাড়, তা ভাই তোমার ওই গোয়ান্ প্রেমিকের থেকে অনেক ভালো।

এইটুকুরই প্রতীক্ষা।

আসলে মালা বিশ্বাসকে নিয়েই পড়তে চায় বান্ধবীরা। সে মুখ না খোলা পর্যন্ত সুযোগ খোঁজে। সে রাগলেও ভালো লাগে, হাসলেও। মিস লরি বিদায় নিলে অনেককে টপকে এই মালা বিশ্বাসই যে একদিন চীফ এয়ার হোস্টেস হয়ে বসবে, এ-রকম ভবিষ্যদ্বাণীও করতে শোনা গেছে বান্ধবীদের। এই চাকরীতে সে-ই প্রথম গ্রাজুয়েট মেয়ে। তা'ছাড়া রূপ যার ভাগ্য তার। এর ওপর চাল-চলনে নিজের কদর বাড়াতে জানে। মিস লরি হেন দাম্ভিক মেয়েও ওকে অবজ্ঞা করে না খুব।

দু'চোখ গোল করে রোজা গ্র্যাণ্ড চড়াও করে তাকে।— তাই তো, হোয়াট অ্যাবাউট ডিক্রুজ ? সে নাকি আজকাল মদের বদলে জল খাচ্ছে শুনলাম ?

পার্বতী রাঙ মন্তব্য জোড়ে, শুধু খাচ্ছে, সাদা জলে খাবি খাচ্ছে শুনেছি—

মিস দত্তগুপ্ত অবাক হতে চেষ্টা করে, গঙ্গা জল নয় তো রে ? কেমন মনে হচ্ছে ?

মুখ টিপে হাসে মালা বিশ্বাস, কেমন আর, ও তো একটি মূর্তিমান শনি।

অতিশয়োক্তি করেনি। এখানকার কাজের শুরু থেকেই প্রায় ঘুরে ফিরে একটা লোক কাঁধে চেপে আছে তার। আর বর্তমানে অনেক তিক্ততার মূলেও এই লোকটাই। জাতে গোয়ান্। পাইলট ভালো। মাত্রা ছাড়িয়ে মদ খায় বলে সঙ্গী সাথীরা প্লেন চালানোর অনেক আগে থেকে তাকে সতর্ক করে দিযে থাকে। সম্ভ্রমবোধের বালাই নেই, সকলের সঙ্গেই ঠাট্টা ইয়ারকিতে মেতে আছে। সে এখানে বদলি হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মালা বিশ্বাসের ওপর ভর করেছে।

ও আসার আগে পর্যন্ত একরকম ভালই ছিল। ঘুরে ফিরে অনেক ক্যাপ্টেনের প্লেনেই ডিউটি দিয়েছে মালা বিশ্বাস। ক্যাপ্টেন নন্দীর সঙ্গেও দিন কয়েক আকাশে উড়েছে। অবশ্য খুব কমই, কারণ সে দূরের পাল্লার প্লেন নিয়েই সাধারণত চলাফেরা করে, আর মালা বিশ্বাস তখনো অতটা পাকা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া, এদিকে যে ক্যাপ্টেনের সঙ্গেই যাতায়াত করেছে সে-ই তাকে পছন্দ করেছে—ক্যাপ্টেনের পছন্দ জানলে চীফ এয়ার হোস্টেস ঘন ঘন ডিউটি বদল্ করবেই বা কেন।

কিন্তু পাইলটদের এই পছন্দ কখনো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়নি। অল্প স্বল্প হাসি-খুশি রসিকতার মধ্যেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে কাজ করে গেছে সে।

গণ্ডগোল পাকিয়েছে ওই শনি আসার পর। ক্যাপ্টেন নন্দী আর আরো অনেকেরই পুরনো বন্ধু বোধহয় সে। তাই এক মালা বিশ্বাস ছাড়া আর কেউ সম্ভবত অপছন্দ করেনি

তাকে ।

মালা বিশ্বাসের বাড়িতে এসে বান্ধবীরা যে হাসি-ঠাট্টা আর বেপরোয়া রসিকতায় মেতে ওঠে, তার মধ্যে অনেকটাই আতিশয্য থাকে, অনেকটাই রঙ ফলানো হয় । নারী-পুরুষের মিলিত কর্মক্ষেত্র আর পাঁচটা যেমন হয় এও অনেকটাই তেমনি । খুব বেশি কিছু ব্যতিক্রম নেই । স্পোর্ট যারা খোঁজে না, সচরাচর কেউ তাদের নাকে দড়ি বেঁধে রঙ্গরসে টেনে আনবে না । অনেক প্রবীণ পাইলট আছেন, যাঁরা বাইরে প্লেন নিয়ে গেলে হোটেলে রেস্তরাঁয় রাত্রিবাস কালে দরদী গার্জিয়ানদের মতই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সুবিধে অসুবিধের খোঁজ করেন, উচিত পরামর্শ দেন । তবে অনেক স্থলে, নিয়মিত আকাশে ওড়ার ফলে একটু বেপরোয়া মনোভাবও এসে যায় । কি পুরুষের কি মেয়েদের । জীবন কবে আছে কবে নেই ঠিক নেই—তাই বোধহয় আনন্দের ছোট ছোট মুহূর্তগুলোকে নিয়ে তারা একটু বেশি কাড়াকাড়িও করে অনেক সময় । সেটা এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয় ।

আবার স্পোর্ট যে মেয়েরা হতে চায়, তাদের সুযোগেরও অভাব নেই । হতে চাইলে সুযোগের অভাব কোথায়ই বা আছে ? এয়ার হোস্টেসদের সঙ্গে পাইলট বা অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের নাম যে অনেক ক্ষেত্রে যুক্ত হয়, তার পিছনে স্বাভাবিক কারণও আছে একটা । যাত্রীদের আর বিমান কর্মীদের দেখাশুনার কাজ তাদের । এই দেখাশুনার পিছনে মনোরঞ্জনের মনস্তত্ত্বগত দিকটাও আছে । এই কলা-কৌশলেও স্বাভাবিকভাবেই রপ্ত হয়ে পড়ে তারা । কিন্তু ক'দিনের এই হাসি-খুশির হাল্কা দিক, কাজের কতটুকুই বা মেয়াদ তাদের ? তিরিশ বছর বয়স হলেই চাকরি শেষ । আঠের থেকে তিরিশ—ব্যস তারপরেই সব শূন্য । অদৃষ্ট ভালো থাকলে এরপর গ্রাউণ্ডেড হয়ে অফিসে চাকরি জুটতে পারে । কিন্তু তাই বা ক'জনের জোটে ?

টাকা জমাতে চেষ্টা করলে এয়ার হোস্টেসরা এই সময়ের মধ্যেই মন্দ জমাতে পারে না অবশ্য । মাইনে ভালো । ওভার টাইমের পাওনা গণ্ডা আরো ভালো । প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আছে । ওদিকে খরচ বলতে গেলে কিছুই নেই । মাসে আশী ঘণ্টা উড়তে হবে—এর সঙ্গে বাঁধা-ধরা আরো বহু ঘণ্টা ওভার টাইম । অর্থাৎ, ডিউটি লেগেই আছে। আর ডিউটিতে থাকলে খাওয়া-দাওয়া পোশাক-আশাক সবকিছুর ব্যয়ভার সংস্থার ঘাড়ে ।

কিন্তু ওই তিরিশ বছরে চাকরির শেষই তো জীবনের শেষ নয় । অথচ যৌবনের প্রায় শেষের দিকের তট ওটা । তার পরে কি ? এই তারপরের সমস্যা সমাধানের চেষ্টাটাও স্বাভাবিক । নিরাপদ ঘর, নিরাপদ বন্দর কে না খোঁজে ? দীর্ঘ সাহচর্যে কেটে গেল যাদের সঙ্গে তাদের মধ্য থেকেই একজনকে আটকে ফেলার স্থূল চেষ্টায়ও হয়ত এগোয় অনেকে । কেউ সফল হয় । কেউ হয় না । সফল হলেও জীবন সুখের হতে দেখে না মালা বিশ্বাস । আর সফল না হলে বিড়ম্বনাটুকুই কালির মত কপালে লেগে থাকল ।

সফল মালা বিশ্বাস এই মুহূর্তে হতে পারে। মুখ খুললেই মিসেস ডিক্রুজ হয়ে বসতে পারে সে । বিরাট চাকরি ক্যাপ্টেনদের, মোটা মাইনে, মোটা ওভার টাইম । কিন্তু এই নিরাপত্তার আকাঙ্ক্ষা মালা বিশ্বাসের একটুও নেই । জীবন তার ওই শেষের তটে পৌঁছুতে এখনো অনেক বাকি । তাছাড়া লোকটার কথা মনে হলেই তার গা ঘিন ঘিন করে । ফূর্তিবাজ লোক বলেই অন্য পাইলটরা ওকে এত পছন্দ করে । কিন্তু এদিকে জের সামলাতে মালার হিমসিম

অবস্থাও হয়েছে অনেক দিন ।

আর এই নিয়েই একদিন একটা কঠিন উক্তি করে বসেছিল বলেই ওই দাম্ভিক ক্যাপ্টেন নন্দী ডিক্রুজের হয়ে সাদাসাপটা অপমান করেছে তাকে । এর আগে মনে মনে কিছুটা সে শ্রদ্ধাই করত ওই লোকটাকে । কিন্তু সে-শ্রদ্ধা সে পশুর মত দু'পায়ে মাড়িয়েছে ।

মালা নন্দী নিছক স্পোর্ট হতে চায়নি । আবার মেয়েদের ললিত রীতি একেবারে ছেঁটে ফেলে কঠোর বৈরাগ্য-সাধনেও মেতে উঠতে চায়নি । কিন্তু চাক বা না চাক, চোখে পড়ার মত মেয়ে থাকলে সর্বত্র যেমন একটা ঝামেলা এসে উপস্থিত হয়—এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি । তাকে যে সাধারণত লোকের ভালো লাগে সেটা সে এখানে চাকরি নেবার অনেক —অনেক আগে থেকেই জানে । আর তা অবাঞ্ছিতও নয় । এখানে কাজে এসেছিল যে বৈচিত্র্যের ঝোঁকে, সেটা আর নেই । তার ওপরে এই ভালো লাগার ব্যাপারটা হঠাৎ যদি অত্যাচারের মত হয়ে ওঠে তো কাঁহাতক সয় ?

গোড়ায় গোড়ায় ডিক্রুজ সহজ চাটুকারিতার রাস্তা ধরেছে ।

ইউ আর এক্সকুইজিট ম্যাডাম !

ইউ আর সিম্প্লি ওয়াণ্ডারফুল !

বিলিভ মি ম্যাডাম, আমার কল্পনায় একটা স্বপ্নের মেয়ে ছিল । আই ওয়াজ্ সার্চিং এ্যাণ্ড সার্চিং—এ্যাণ্ড নাউ আই হ্যাভ ফাউণ্ড ।

মিষ্টার নাণ্ডিকে দেখে আমি বাঙালী পুরুষদের ভালবেসেছি, আর তোমাকে দেখে বাঙালী মেয়েদের । আর তোমাদের শাড়ি—শাড়ি ইজ্ দি ওন্‌লি ড্রেস ইন দি ওয়ার্লড !

এরকম অজস্র স্তুতির খই ফোটে সকলের সামনেও, হাটের মাঝে ।

মালা বিশ্বাস হাসত, সে হাসি ঠোঁটের ডগায় সর্বদাই ওদের মজুত রাখতে হয় । ক্যাপ্টেনদের একটু-আধটু খাতির সব এয়ার হোস্টেসকেই করতে হয় । এরোপ্লেন মাটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাই সম্রাট । যাত্রী কর্মচারী সব তখন তার খাস দখলে । কারো ওপর বিরূপ হলে ঝামেলা বাড়ানোর ক্ষমতা তাদের কম নয় । নেমে এসে রিপোর্ট করলেই হল । তোমার জামা কাপড়ের ক্রিজ্ ঠিক ছিল না, প্যাসেঞ্জারদের ঠিক মত সার্ভ করোনি শুনলাম, ওমুক প্যাসেঞ্জার তোমার নামে এই নালিশ করেছে । কৈফিয়ৎ দাও ।

বলা বাহুল্য, কৈফিয়ৎ যদি চায় সে কৈফিয়ৎ কখনই যথেষ্ট হয় না ।

মালা বিশ্বাসের বেলায় কখনো এরকম বিড়ম্বনা ঘটেনি বটে, কিন্তু অনায়াসে ঘটতে যে পারে সেটা তার জানা আছে ।

তাই গোড়ায় গোড়ায় দুর্ব্যবহার সে ওই মদখোর ডিক্রুজের সঙ্গেও করেনি ।

কিন্তু লোকটার বেহায়াপনা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল । কক্‌পিটে হাসি মুখে চা কফি খাবার নিয়ে গেলে সকলের সামনেই বলবে, ম্যাডাম তোমার হাসি দেখলে আমি পাগল হয়ে যাই—এতগুলো যাত্রীর প্রাণ আমার হাতের মুঠোয়, ডোণ্ট মেক মি ম্যাড !

প্রশ্রয় পেয়ে তার সহকর্মীরাও হাসাহাসি করে, তরল ঠাট্টা তামাসায় মেতে ওঠে । নিজের আসনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে হাঁপ ফেলার উপায় নেই । অটো-পাইলট অন্ করতে না পারা পর্যন্তই যত ব্যস্ততা ওই ক্যাপ্টেনের—তারপর নামার আগে পর্যন্ত চলল খুনসুটি । খানিক বাদে বাদেই ডেকে পাঠাবে, আর হাসবে দাঁত বার করে। বলবে, যাত্রীদের সেফটির

জন্যেই তোমার মাঝে মাঝে আসা উচিত, মন উতলা হলে এয়ারক্র্যাফট চালানো যায় ?

মিস লরিকে বলে কয়ে ডিউটি বদল করে দেখেছে । তাতেও অব্যাহতি নেই । খাতির ওর সকলের সঙ্গেই । বেহায়ার মত চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, চোখ পাকিয়ে মিস লরিকে যা মুখে আসে বলে বসে । আবার তলায় তলায় অনুরোধও করে বলে মালার ধারণা । মিস লরিও মালার মতে হাড়-বজ্জাত । ঘুরে ফিরে এই চক্ষুশূল লোকটার সঙ্গেই তাকে এনে ঠিক আবার জুড়ে দেবে ।

ডিক্রুজের এয়ারক্র্যাফট-এ দূর-পাল্লার ডিউটি পড়লে অসুস্থতার অজুহাতে দু'চার বার ফ্লাইট ক্যানসেল পর্যন্ত করতে হয়েছে । গন্তব্যস্থলে সন্ধ্যায় পৌঁছে সেখানকার হোটেলে রাত্রিবাস—এরকম হামেশাই হয় । মাসের মধ্যে বহুবার । কিন্তু সে-ও অনেক সময়েই ভরসা পেয়ে উঠত না সে ।

হাওয়াই হোস্টেস হয়ে কত আর ফ্লাইট নাকচ করবে ? তাতে লোকসানও বটে । কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তবু ওর সঙ্গে বাইরে বেরুবার নামে বেশ একটা মানসিক ধকল যায় । যেখানেই যাক, বিমানের কর্মীদের জন্য হোটেলে ভালো ব্যবস্থা থাকেই । কিন্তু রাতে ভালো ঘুম হয় না তার । ফিরে হেড কোয়ার্টারস-এ পা না দেওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই ।

ডিক্রুজের অদৃশ্য দু'টো হাত ক্রমেই যেন এগিয়ে আসছিল তার দিকে । আর ভিতরে ভিতরে ততো তিক্ত হয়ে উঠছিল সে । কিন্তু তখনো ক্যাপ্টেন বলে কিছুটা সমীহ করতে হয় । ককপিট থেকে ডাক এলে যেতে হয় ।

ফলে লোকটার হাত দু'টো সবসময় আর অদৃশ্যও থাকছিল না । ককপিটের ভিতরটা হাজারো যন্ত্রপাতিতে কণ্টকিত । এমনিতেই সাবধানে চলা ফেরা করতে হয় সেখানে । তার ওপর মালা বিশ্বাস ক্ষীণাঙ্গী নয় মোটেই । এরই মধ্যে ডিক্রুজ তার কাঁধে পিঠে হাত চালিয়ে দেয়, ইয়ারকি করে বাহু ধরে টেনে বসতে বলে । মালা বিশ্বাস কণ্টকিত হয়ে ওঠে, মুখের অভ্যস্ত হাসিতে টান ধরে । নির্লজ্জ লোকটা আরো বেশি হাসে তখন, তার সঙ্গী-সাথীরাও মজা দেখে । এও স্পোর্ট ধরে নিলে মানসিক ধকল থাকে না, অনেকেই তাই ধরে নেয় । কিন্তু মালা বিশ্বাস পারে না বরদাস্ত করতে !

একটা কথা মনে হলে সর্বাঙ্গ সিরসির করে ওঠে তার । দু'হাতে ট্রে নিয়ে ককপিটে যায় যখন—অনেক সময় কাঠ হয়ে থাকে । একটা বিষম দুর্ঘটনার চিত্র মনে জাগে । সত্যি হোক, মিথ্যে হোক বা অতিরঞ্জিত হোক, সেই দুর্ঘটনার গল্প সব এয়ার হোস্টেসদেরই শোনা আছে ।

এরোপ্লেন ক্র্যাশ করেছিল । তখন মাঝ রাত্রি । একটিমাত্র জীবন বেঁচে ছিল, সে ওই এয়ার হোস্টেসের । একেবারে পিছনে ল্যাজের দিকে সিটটা তার । ক্র্যাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকটা দু'ফাঁক হয়ে যাবার ফলে সে ছিটকে বাইরে গিয়ে পড়েছিল অনেক দূরে । তাইতেই বেঁচে গিয়েছিল । আর একজনও প্রাণে বাঁচেনি—পাইলট, কো-পাইলট, সহকর্মীরা, যাত্রী—কেউ না ।

অজ্ঞাত কারণে ক্র্যাশ । কেন হল অনেকদিন পর্যন্ত অজ্ঞাতই ছিল । ভাঙা এঞ্জিন ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা গেছে পাইলটের মাথার কাছের মাষ্টার সুইচ বন্ধ অবস্থায় আছে । এ-রকমটা থাকার কথা নয় । মাষ্টার সুইচ টেনে দিয়ে ইচ্ছে করে সকলকে নিয়ে আত্মহত্যা

করেছে পাইলট, এ অবিশ্বাস্য ।

নানান্ রকমের সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠল, সম্ভব অসম্ভব নানা জটলা দানা পাকিয়ে উঠতে লাগল । শেষে হাসপাতালে সেই এয়ার হোস্টেস সুস্থ হয়ে উঠতে জেরায় জেরায় আসল ঘটনা প্রকাশ পেল ।

...রাত্রি দু'টোয় ককপিট থেকে কফির হুকুম আসতে দু'হাতে ট্রে নিয়ে কক্‌পিটে ঢুকেছিল সুদর্শনা এয়ার হোস্টেস ! যাত্রীরা ঘুমুচ্ছে । কক্‌পিটের ভিতরেও যার কাজ নেই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন । কফি চেয়ে পাঠিয়েছিল স্বয়ং পাইলট । ভিতরটা অন্ধকার । রাত্রিতে অন্ধকারই থাকে কারণ আলো না জ্বললে বাইরের ভিজিবিলিটি স্পষ্টতর হয়, আবহাওয়া নিরীক্ষণের সুবিধে হয় । সব আলো স্তিমিত করে আল্ট্রা-ভায়োলেট অন্ করে দিলে নীলাভ আলোয় শুধু কক্‌পিটের যন্ত্রপাতিগুলো ঝকঝক করে । অটো-পাইলট অন্ করা, প্লেন আপনি চলছে, ক্যাপ্টেনের হাত খালি ।

দু'হাতে ট্রে ধরে এয়ার হোস্টেস পাশে এসে দাঁড়াতে প্রবৃত্তির বশে হোক বা স্থূল রসিকতার লোভেই হোক, ক্যাপ্টেনের হাত অবাধ্য হয়ে উঠেছিল হঠাৎ । ভেবেছিল হয়ত, দু'হাতে ট্রে-ধরা, কি আর করবে । কিন্তু পর-পুরুষের হাত আচমকা যতটা অবাধ্য হলে নিজের আগোচরে লাফিয়ে উঠবেই যে-কোনো মেয়ে, সেই রকমই হয়েছিল ।

এই ! বলে হাতের ট্রে-টা ছেড়ে দিয়ে দু'হাত মাথার ওপর তুলে লাফিয়ে উঠেছিল এয়ার হোস্টেস । মাথায় কার সঙ্গে বাড়ি লাগল, হাতই বা কোথায় ঠোক্কর খেল খেয়াল নেই । হাতের ট্রে গায়ের ওপর পড়তে পাইলটও ও-দিকে লক্ষ্য করেনি ।

পরমুহূর্তে দেখা গেল প্লেন মাটির দিকে নামছে । সঙ্গে সঙ্গে কক্‌পিটের ভোল বদল ! দিশাহারার মত যন্ত্রের আঁতি-পাতি খুঁজছে পাইলট কো-পাইলট । এয়ার হোস্টেসের হাতে লেগে হোক বা মাথায় লেগে হোক, ওপরের মাষ্টার সুইচ যে অফ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে —এই হঠাৎ বিপর্যয়ে সেই চিন্তা কারো কল্পনায় আসেনি ।

এয়ার হোস্টেস ছুটে এসে নিজের আসনে বসেছে । ঘুম ভেঙে গেছে অনেক যাত্রীর । সামনে চির-ঘুম মুখ-ব্যাদান করে এগিয়ে আসছে কেউ জানত না । হঠাৎ কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে এইটুকুই মনে হয়েছে তাদের ।

তিন মাইল সাড়ে তিন মাইল ওপর থেকে কঠিন মাটিতে নেমে আসতে কতক্ষণ আর লাগে ? বড়জোর মিনিট কতক । নিয়তি টেনেছে ! সকলেই বিভ্রান্ত ! কে বলে দেবে যে মাস্টার সুইচটা টেনে দিলেই সব ঠিক হয়ে যায় ? মাস্টার সুইচ শেষ পর্যন্ত কল্পনার বাইরেই থেকে গেল ।

ক্র্যাশ হল । মৃত্যু নামল ।

সকলেই, বিশেষ করে এয়ার হোস্টেসরা সকলেই জানে এ গল্প ! সত্যি মিথ্যে তারা যাচাই করেনি, যে-যেমন শুনেছে সে তেমনি বিশ্বাস করেছে । ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে আবার কোনো নবাগতার কাছে গল্প করেছে ।

ট্রে হাতে কক্‌পিটে ঢুকলে এই দুর্ঘটনাটাই মনে পড়ে যায় মালা বিশ্বাসের । পারতপক্ষে ডিক্রুজের হাতের নাগালের মধ্যে যেতে চায় না । কিন্তু যেতে হয়ই ।

বেশিদিনের কথা নয়। বেশ একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল ডিক্রুজের সঙ্গে। ভয় করলে ভয় আরো পেয়ে বসে! তাই মনে যাই থাক, বাইরে একটু বেপরোয়া ভাব নিয়ে চলছিল সে-ও। বেচাল দেখলে চোখ পাকাতে শুরু করছিল। অশালীন উক্তি করলে কড়া উত্তরও দিচ্ছিল মাঝে সাঝে।

সেবারে মাদ্রাজে এসেছে বিকেলে। ফিরবে পরদিন বেলা এগারোটায়। চিরাচরিত ব্যবস্থানুযায়ী বিমানকর্মীরা হোটেলে এসে উঠেছে।

সন্ধ্যে হতে না হতে ডিক্রুজের মদ নিয়ে বসার কথা। যে পাইলট এরোপ্লেন চালাবে —আগের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তার মদ খাওয়া আইনে নিষেধ। কিন্তু আইনের বই সঙ্গে নিয়ে আকাশে ওড়ে না ডিক্রুজের মত পাইলট— আইনকানুনের ধারও ধারে না।

এই আর এক জিনিস যা ঘৃণা করে মালা বিশ্বাস। মদ। কিন্তু এই লোকটা মদ গিললে সে বিদেশ বিভূঁইয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকে। নেশা জমলেই ঘুম। অতএব নিশ্চিন্ত।

কিন্তু সেদিন মদের খোঁজে উতলা হতে দেখা গেল না ডিক্রুজকে। দলের অন্য লোকেরা কেউ বিশ্রাম করছে, কেউ বা অবসর বিনোদনে বেরিয়েছে। ডিক্রুজ এসে প্রস্তাব করল, চলো সিনেমায় যাই।

মালা মাথা নাড়ল, সিনেমা দেখার মেজাজ নেই তার।

তাহলে চলো, সমুদ্রের দিকে বেড়িয়ে আসি একটু।

মালা তাও বাতিল করে দিল। শরীরটা ভালো নেই। এখন সে কোথাও বেরুবে না। মুখের দিকে চেয়ে আবারও মনে হল, এর থেকে মদ খেলে লোকটা অনেক বেশি নিরাপদ। আবার প্রস্তাব এলো, চলো তা'হলে লাউঞ্জে বসে গল্প করা যাক।

মালা রাগ চাপতে চেষ্টা করল। সবটা পারল না।—বললাম তো আমার শরীর ভালো না, বিশ্রাম করব এখন।

ডিক্রুজ চলে গেল। মালা অস্বস্তিবোধ করতে লাগল।

ঘন্টাখানেক বাদে তার সঙ্গে আবার দেখা খাবার টেবিলে। সাথীরা ঈষৎ বিস্ময়ে ডিক্রুজকে লক্ষ্য করছে। সে বেরোয়নি, মদ খায়নি, আবার এখনো চুপচাপ। খাবার নাড়াচাড়া করছে শুধু, আর এতগুলো দৃষ্টি অবজ্ঞা করে ঘুরে ফিরে তাকেই দেখছে চেয়ে চেয়ে। শুধু দেখছে না, দুই চোখে লেহন করছে যেন। রাগে খাওয়া মাথায় উঠেছে মালা বিশ্বাসের। এই লোকগুলো সব কি ভাবছে কে জানে।

নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। গা জ্বালা করছে তখনো। ক্যাপ্টেন হ'ল হাওয়াই জাহাজের প্রধান! তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তারই হাতে। কিন্তু সে যদি নিজেই এ রকম হয় তাহলে বিড়ম্বনার একশেষ।

ঘুম আসছে না। মালা এ-পাশ ও-পাশ করছে শুয়ে। রাজ্যের চিন্তা এসে ছেঁকে ধরতে চাইছে তাকে। কেন এসেছিল এই চাকরিতে? কি লোভে কি মোহে এসেছিল? না, মালা বিশ্বাস ভাবতে চায় না। ভাববার আর সময় নেই। যা হবার হয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে যেমন ভেতরে এসে আশ্রয় নিয়েছে সে, তেমনি মনের ভিতরেও একটা দরজা করেছে সে। বেগতিক দেখলেই সেই দরজা বন্ধ করে দেয়। চিন্তারা সব ওই দরজার বাইরে থাক, সে নিশ্চিন্ত—

হঠাৎ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল সে । মনে হল দরজাটা শব্দ না করে বাইরে থেকে ঠেলছে কে । ঘর আবছা অন্ধকার, কানের ভুল কিনা সঠিক ঠাওর হল না । না, ভুল নয় । দরজার গায়ে মৃদু মৃদু টোকা পড়ছে । ঠুকঠুক শব্দ হচ্ছে । ওধার থেকে কেউ দরজা খুলতে ইঙ্গিত করছে তাকে ।

বিছানায় কাঠ মালা বিশ্বাস ।

পা টিপে উঠল একসময় । ঘড়িতে বারোটা বাজে রাত্রি । বন্ধ দরজার কাছে এসে দাঁড়াল । দরজার গায়ে ওধার থেকে মৃদু টকটক শব্দ হচ্ছে তখনো ।

একটু বাদে মালা কান পেতে শুনল । মৃদু পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে । চলে যাচ্ছে ।

বিছানায় এসে বসল মালা বিশ্বাস ।

খেয়াল হতে দেখল থেমে গেছে । উঠে আলো জ্বালল । চোখে মুখে জল দিল । জল খেল । আজ আর ভাববে না, কাল ভাববে । কাল হেডকোয়ার্টাসে পৌঁছে একটা রিপোর্টই করে দেবে কিনা ভাবছে । যা হয় হবে, তবু কিছু একটা করবেই সে ।

পরদিন মালা বিশ্বাস গম্ভীর । ডিক্রুজ ততোধিক গম্ভীর । যথাসময়ে এয়ারক্রাফট্ আকাশে উড়ল, গন্তব্যস্থানে পৌঁছল । সারাক্ষণের মধ্যে ককপিটে একবারও ডাক পড়েনি তার । নির্দিষ্ট যে ক'বার চা কফি দিয়ে আসার কথা, দিয়ে এসেছে । অটোপাইলট অন্ করার পরেও ডিক্রুজের ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে মনোযোগ ।

মালা বিশ্বাসের আগের রাতের সংকল্প অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে । কিছু একটা করা দরকার এখনো ভাবছে । কিন্তু এয়ার হোস্টেসের পক্ষে কাগজে কলমে কোনো ক্যাপ্টেনের নামে নালিশ করা খুব সহজ কথা নয় । হৈ-চৈ পড়ে যাবে ।

এরোড্রোম অফিসে বসে বিশ্রাম করছিল একটু । ফোনে ব্যস্তসমস্ত ডাক এলো মিস লরির—এক্ষুনি একবার তার সঙ্গে দেখা করতে হবে । মালা বিশ্বাস মনে মনে অবাক একটু, এ-রকম ডাক বড় পড়ে না ।

চলল । চীফ এয়ার হোস্টেসের তলব অমান্য করার রীতি নয় ।

ঘরে ঢুকতেই দুই চক্ষু কপালে তুলে সে জিজ্ঞাসা করল, কি করেছ তুমি ? ক্যাপ্টেন ডিক্রুজ এমন মারমুখো কেন ?

মালা বিশ্বাস সংযত করতে চেষ্টা করল নিজেকে ।—কি হয়েছে ?

ক্যাপ্টেন ডিক্রুজ রিপোর্ট করেছে তোমার নামে, দু'পাতা রিপোর্ট । তুমি কাজে অবহেলা করো, প্যাসেঞ্জার আর স্টাফের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো, তোমাকে আগেও ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে লিখছে—

আয়নায় তখন নিজের চোখমুখ দেখেনি মালা বিশ্বাস, কিন্তু চীফ এয়ার হোস্টেস মিস লরি দেখছিল ।

এ-রকম একটা রিপোর্ট চাকরির ভবিষ্যৎ নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট । কিন্তু মালা বিশ্বাস সে কথা ভাবছিল না । সে কিছুই ভাবছিল না, এক দুর্নিবার আক্রোশে ফুঁসছিল শুধু ।

বলল, রিপোর্টটা আমারই করার কথা ছিল । তোমার স্টেপ যা নেবার নাও, আমি লিখেই জবাবদিহি করব ।

চলে এলো । সোজা বাড়ি । আসার আগে পরের দিনের ওভার টাইম ডিউটিও ক্যানসেল

করে আসতে ভুলল না। এমনিতে অফ সে-দিনটা। একটা দিন অন্তত এখানকার কারো মুখ দেখতে হবে না।

সকাল গড়িয়েছে। দুপুর গড়িয়েছে। খুব ভেবে-চিন্তে একটা ড্রাফট করবে ঠিক করছিল, কিন্তু কিছুই করা হয়নি। ভিতরটা এত তেতে আছে যে মাথা ঠাণ্ডা করে কিছু করা দায়।

বাইরে ভারী পায়ের শব্দ। মালা কান খাড়া করল, কোনো বান্ধবীর পায়ের শব্দ নয়। পরমুহূর্তে দোরগোড়ায় যে মূর্তি দেখা দিল, মালা আর যাই হোক তাকে কল্পনাও করেনি।

ডিক্রুজ।

দুই হাত ট্রাউজারের দুই পকেটে ঢোকানো, হাসছে দাঁত বার করে। মে আই কাম ইন ?

স্পর্ধা দেখে মালা বিশ্বাস স্তম্ভিত ! চেয়ে আছে।

অনুমতির অপেক্ষা না রেখে সে ভিতরে এলো। একটা চেয়ার টেনে বসল। আপ্যায়নের সুরে বলল, ইউ লুক ওয়াণ্ডারফুল ম্যাডাম হোয়েন ইউ গেট অ্যাংরি, আই উইশ আই কুড ব্রিং মাই ক্যামেরা হিয়ার—

খুব মৃদু অথচ কঠোর গলায় মালা জিজ্ঞাসা করল, এখানে কি চাই ?

ও নাথিং...হ্যাভ কাম ওনলি টু অ্যাপলোজাইস।

কিসের অ্যাপলজি ?

আমার ব্যবহারের। কিন্তু মাদ্রাজে তুমি সত্যি আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছ, আমাকে অপমান করেছ—

কিসের অপমান ? মাঝরাত্রে দরজা খুলিনি বলে ?

হাসল। বলল, সেটা পরে। আমার গোঁ চাপতে মাথা বিগড়েছিল। তার আগে দস্তুর মত অপমান করেছ—আই ডিডণ্ট ড্রিঙ্ক, আই ওয়ানটেড টু বি গুড়—বাট ইউ রিজেকটেড মি লাইক ইওর ওলড় শুজ্—। হাসছে।—দরজা না খুলে ভালো করেছ, আই কুড হ্যাভ কিলড় ইউ।

রাগে কাঁপছে মালা বিশ্বাস। তবু ঠাণ্ডা প্রশ্ন করল, এখন কেন এসেছ, তোমার রিপোর্টের কি কৈফিয়ৎ দেব জানতে ?

ও...হেল্ উইথ্ ইট্। পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা কাগজ বার করল, এই তোমার সেই রিপোর্ট. মিস লরির কাছ থেকে উইথড্র করে এনেছি। কাগজটা দুমড়ে মেঝের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলল। হাসিমাখা দুটো চোখ যেন তার গায়ে বিঁধছে। আবার বলল, অন্য ক্যাপ্টেন হলে রিপোর্ট করে সে আবার ফিরে সেটা চেয়ে আনত না, বাট আই অ্যাম এ গুডম্যান।

কঠিন গলায় মালা বিশ্বাস বলল, কিন্তু তুমি উইথড্র করলেও আমি করব না, আমি তোমার নামে কালই রিপোর্ট করব—

চোখ মুখ ভুরু কুঁচকে ডিক্রুজ কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করল তাকে, হাসি চুয়ে চুয়ে পড়ছে। যেন ভারী কৌতুককর কিছু শুনল।—দ্যাট্ উইল বি ওয়াণ্ডারফুল, একটা নতুন কিছু হবে, দে উইল গেট সামথিং টু টক অ্যাবাউট্। দিন বড় নীরস যাচ্ছে, সকলেই খুশি হবে। মি ট্যু...আমার মনে হয় এটা একটা ভালো মতলব, এর ফলে হয়ত আমরা আরো

কাছাকাছি আসতে পারব ।

মালা বিশ্বাসের সংযম ফুরিয়ে এসেছে জানে না । স্থির, নিষ্পলক চেয়ে আছে সে ।

ডিক্রুজ আবার বলল, এখনি লিখে ফেল না, আই মে হেল্প ইউ, ভাবছ কি ?

...ভাবছি, কোনো এয়ার হোস্টেস যদি এর পরে কোনো ক্যাপ্টেনের গালে ঠাস করে দুটো চড় কষিয়ে দেয় তাহলে এর থেকে বেশি কাজ হয় কি না, আর এয়ার হোস্টেসেরই বা তাতে কতটা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা । তুমি যাবে এখন এখান থেকে, না লোক ডাকব ?

এতক্ষণে ডিক্রুজের মুখের হাসি গেছে। ফ্যালফ্যাল করে সে মুখের দিকে চেয়ে ছিল খানিকক্ষণ । তারপর উঠে চলে গেছে ।

মালা বিশ্বাস তার পরেও রাগে ফুঁশেছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ।

ব্যাপারটা জানাজানি হবার কথা নয় । কিন্তু জানাজানি হল । কানাকানি হতে লাগল । মালা বিশ্বাস অবাক একটু, সে কাউকে বলেনি । বলেছে তাহলে ওই নির্লজ্জ বেহায়া লোকটাই ।

বান্ধবীরা অবাক । চুপি চুপি তারা এসে জিজ্ঞাসা করেছে, কি ব্যাপার ? তুমি নাকি ডিক্রুজকে চড় মেরেছ ?

আর একজন সংশোধন করল, মারেনি, মারবে বলেছে ।

ও একই কথা হল । বলেছ নাকি ?

মালা বিশ্বাস জবাব দেয়নি । পরদিন ডিউটি বদলেছে সে । লক্ষ্য করেছে, এই বিমানের পাইলট বা তার সহকর্মীরা ঈষৎ বিস্ময়ে আড়ে আড়ে তাকিয়েছে তার দিকে । চা কফি খাবার দিতে গেলে একটু আলাদা সম্ভ্রম দেখিয়েছে । অর্থাৎ খবরটা তাদেরও কানে গেছে ।

মালা বিশ্বাস পরে জেনেছে । চীফ এয়ার হোস্টেস মিস লরি প্রকারান্তরে তার কাছে রহস্যটা ব্যক্ত করেছে । ডিক্রুজ নাকি তাকেই বলেছে, এমন মেজাজী এয়ার হোস্টেস সে আর দেখেনি যে ক্যাপ্টেনের গালে চড় বসাতে চায় । সে নাকি স্টেপ নেবে কি অভিনন্দন পাঠাবে সেই সমস্যায় পড়েছে ।

মিস লরির মুখ থেকেই পাঁচ কান হয়ে থাকবে । আর খাতিরের ক্যাপ্টেন-ভাইদের কাছে ডিক্রুজের নিজেরও সমস্যাটা ব্যক্ত করা বিচিত্র নয় !

তাজ্জব হবার মতই কথা বটে, একজন পুরো দস্তুর ক্যাপ্টেনকে সামান্য এক এয়ার হোস্টেস গালে চড় বসাবে বলেছে, এমন কাণ্ড কেউ শোনেনি । বান্ধবীরা এখন তাকে প্রকাশ্যে বাহবা দেবে, কি ফলাফলটা না দেখা পর্যন্ত কিছুদিন সরে সরে থাকবে তার কাছ থেকে ঠিক করে উঠতে পারছে না ।

ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দীর কাছে দুঃখের ব্যাপারটা যে ডিক্রুজই জানিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই ! কি বলেছে মালা বিশ্বাস জানে না, কিন্তু বন্ধুর অপমানের ফয়সালা সে-ই গায়ে পড়ে করতে এসেছিল । সামান্য পরিচয়েও ক্যাপ্টেনদের মধ্যে মনে মনে একটু একটু শ্রদ্ধা করত যাকে মালা বিশ্বাস, তার এমন অকারণে অভদ্র ব্যবহার সে কল্পনাও করেনি ।

মাঝে একটা দিন গেছে । এরোড্রোমের রেস্তোরাঁয় বসে মালা বিশ্বাস চুপচাপ খেয়ে নিচ্ছিল । ফ্লাইটের আগে চিরাচরিৎ ব্যবস্থা এটা । এসব ব্যবস্থায় সংস্থার কোনরকম কার্পণ্য নেই । কিন্তু খাওয়ার দিকে মন দিতে পারছিল না তেমন । মাঝের দুটো টেবিল ছাড়িয়ে

খাবারের প্লেট সামনে রেখে তাকে ফিরে ফিরে দেখছে যে লোকটা সে ক্যাপ্টেন নন্দী। সে-ও এয়ারক্রাফট নিয়ে যাবে কোথাও। পাইলটের পোশাক পরা, ব্যাজ আঁটা। কিন্তু তার এই দেখার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে একটু। অলস চাউনি, ঠোঁটের ফাঁকে বক্র হাসির আভাস। একটু আগে ডিক্রুজ ঢুকেছিল, তাকেও দেখেছে, ক্যাপ্টেন নন্দীকেও। নন্দীর দিকেই এগিয়ে গেছে ডিক্রুজ। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আঙুল বেঁকিয়ে অদূরের মালা বিশ্বাসকে দেখিয়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন নন্দী! কিছু একটা রসিকতা হল কি অন্য কিছু ইঙ্গিত করল, মালা জানে না। বন্ধুর টেবিলে ঝুঁকে দুই একটা কি কথা বলে ডিক্রুজ চলে গেল।

মালা বিশ্বাস খাবারের ডিশে চোখ নামালো। তার টেবিলের পাইলট কো-পাইলট রেডিওএঞ্জিনিয়ার ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারও সকৌতুকে তাকেই লক্ষ্য করছে খেয়াল হল। ওদিকের টেবিল থেকে ক্যাপ্টেন নন্দীর সহকর্মীরাও। সেই টেবিলের মিস কমলা ব্যাস সকলের অগোচরে তাকে যেন কি একটু ইশারাই করল মনে হল।

চেয়ার ঠেলে ক্যাপ্টেন নন্দী উঠে দাঁড়াতে মালা বিশ্বাস অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেদিকে তাকালো আবার। চোখাচোখি হল। মনে হল ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো শ্লেষ খোদাই করে রেখেছে সে। তার দিকে চোখ রেখেই এগিয়ে আসছে। বিদ্রূপ মাখা চোখ। মালা বিশ্বাস খাবারের ডিশে দৃষ্টি ফেরালো।

একটা নিঃশব্দ অভিনয় ঘটে যাচ্ছে যেন। আর সকলে নিঃশব্দে উপভোগ করছে। ক্যাপ্টেন নন্দীর দুটো টেবিল ঘুরে তার টেবিলের পাশ দিয়েই যাওয়া দরকার হল কেন! কিন্তু চলে গেল না। দু'হাত কোমরে তুলে দাঁড়িয়ে গেল। একেবারে তার চেয়ারের হাতল ঘেঁষে। কোমরের ওপর দুই হাত তুলে সকলকে সচকিত করে বলে বসল, গুড মর্ণিং!

মালা বিশ্বাস মুখ তুলল আস্তে আস্তে। এই ব্যঙ্গাত্মক সুপ্রভাত জ্ঞাপন তারই উদ্দেশে। রাগ দমন করতে চেষ্টা করে সে-ও সরাসরি চেয়েই রইল।

আপনার সঙ্গে আমার একটু কথাবার্তা কওয়ার ইচ্ছে থাকল। স্যাল সি ইউ আফটারওয়ার্ডস।

বুকের ওপর মুখের ওপর আর একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে চলে গেল।

সেই দিন অন্তত যাত্রীরা ইচ্ছে করলে মালা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারত পাইলটের কাছে। কারণ যেতে আসতে সারাক্ষণের মধ্যে সে কাজে মন দিতে পারেনি। ভিতরে ভিতরে জ্বলেছে, আবার লোকটার হাবভাব মনে হতে কেমন একটু ভয় ভয় করেছে। ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী পাইলটদের মধ্যমণি, সকলের প্রিয়পাত্র। সে গায়ে পড়ে এমন ব্যবহার করে কেন তার সঙ্গে।

সেই সন্ধ্যাতেই কমলা ব্যাস তাকে এসে বলেছে, তুমি ভয়ানক খারাপ কাজ করেছ, ডিক্রুজ যে ক্যাপ্টেন নন্দীর প্রাণের বন্ধু।

মালা তেতে উঠেছে, সে কি করবে আমার?

কি করবে কমলা ব্যাস বলতে পারেনি। কিন্তু ইচ্ছে করলে কিছু যে করতে পারে সেই রকমই ধারণা সকলের।

সমস্তক্ষণ রাগে জ্বলছে এরপর মালা বিশ্বাস। সকালের দৃশ্য আর সকালের ব্যবহার

যতবার মনে পড়েছে, অশান্ত ক্ষোভটা ততো বেশি অসংযত হয়ে উঠতে চেয়েছে। কিন্তু এই রাগ আর ক্ষোভের তলায় তলায় অস্বস্তিও আবার একটু। ক্যাপ্টেন নন্দীর তার সঙ্গে কথা কওয়ার ইচ্ছে থাকল বলে গেছে, পরে দেখা করবে জানিয়ে গেছে। কিন্তু বলাও নয়, জানানও নয়, আসলে সে তাকে শাসিয়ে গেছে। কমলা ব্যাসের কথা শুনে তাই আরো বেশি রাগ হয়েছে তার। এরাই সকলে মিলে একেবারে মাথায় তুলেছে ওই ক্যাপ্টেনকে। যে-ভাবে হোক, একটু তোয়াজ করতে পেলে একেবারে বর্তে যায়।

জানে। মালা বিশ্বাস সবই জানে। কার কি আশা আর কার কি স্বপ্ন সবই জানা আছে তার। কিন্তু লজ্জাও করে না। ফল কি হবে তা তো জানিস। মুখ পুড়বে, বুক পুড়বে। ওরা ফিরেও তাকাবে না। কমলা ব্যাস যদি ঘাবড়ে না গিয়ে ফিরে তার ক্যাপ্টেনকেই দু'কথা শোনাতে পারত, যদি বলত, মালা বিশ্বাস ঠিক কাজ করেছে—উচিত কাজ করেছে—তাহলে এত রাগ হত না। কিন্তু এত বুকের পাটা ওদের নেই। ওরা কার চাকরি করে তাও ওদের মনে থাকে না, এমনি মর্যাদাজ্ঞান ওদের।

মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করেছে মালা বিশ্বাস। তপ্ত মাথায় অনেক রকম জল্পনা কল্পনা করেছে। আগ বাড়িয়ে সে অভদ্রতা করবে না কারো সঙ্গে। কিন্তু কেউ অভদ্রতা করলে সেও ছেড়ে কথা কইবে না।

তবু তলায় তলায় অস্বস্তি একটু থেকেই গেল।

কিন্তু চার পাঁচটা দিন নির্বিবাদে কেটে গেছে এর পর। ডিক্রুজের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কথা হয়নি। মুখখানা কাঁচুমাচু করতে চেষ্টা করে পাশ কাটিয়েছে ডিক্রুজ। ক্যাপ্টেন নন্দীর সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা আর হয়নি।

বান্ধবীরা আবার জটলা শুরু করেছে। মালা বিশ্বাসও আশা করেছে, ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হল।

ওভার টাইমের ছোট ফ্লাইট ছিল একটা সেদিন। বিকেলের আগেই ফিরেছে মালা বিশ্বাস। কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে এরোড্রোম রেস্তরাঁর দিকে চলেছে—একটু চা খেয়ে বাড়ি যাবে।

হঠাৎ পিছনের একটা শিস শুনে দাঁড়িয়ে গেল। বিলিতি ছবির বেপরোয়া নায়কেরা অনেক সময় যেমন বিরক্তিকর শিস দিয়ে নায়িকাকে ডাকে—অনেকটা সেইরকম লাগল শুনতে। ঘুরে দেখল শিসটা তারই উদ্দেশে বটে, লম্বা লম্বা পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী। যে-ভাবে শিস দিয়ে থামালো তাকে আর যেভাবে আসছে, মনে হবে এই গোটা এলাকাটাই তার রাজত্ব।

আর একেবারে দূরে, সেই কোন লাউঞ্জে বসে এদিকে হাসি-হাসি মুখে চেয়ে আছে ক্যাপ্টেন ডিক্রুজ।

ভয় নয়, রাগের মুহূর্তে ভয় ডর কিছু থাকে না মালা বিশ্বাসের। তবু কি এক অজ্ঞাত অনুভূতিতে শরীরটা সিরসির করে উঠল কেমন। যে আসছে স্থির চোখেই চেয়ে আছে তার দিকে। এক নজর দেখেই বুঝেছে, লোকটার ডিউটি নেই এখন, পরনে ফুল ট্রাউজার, গায়ে ফিটফাট শার্ট কোট, গলায় ঝকঝকে টাই।

সামনে এসে সুপরিচিতের মতই জিজ্ঞাসা করল, ডিউটি করে এলেন, না ডিউটিতে যাচ্ছেন ?

উত্তর দেবে কি দেবে না মালা বিশ্বাস চিন্তা করার অবকাশ পেল না । অস্ফুট জবাব দিল, করে এলাম ।

ও. কে, দেন্ উই হ্যভ টাইম ।

দরজা ঠেলে নিজে অর্ধেক ঢুকে ক্যাপ্টেন নন্দী ফিরে এদিক-ওদিক তাকালো একবার । ধারে কাছে কেউ নেই । অভ্যস্ত সৌজন্যের খাতিরেই যেন তার কাঁধের ওপর একখানা হাত চালিয়ে দিল ।—আসুন । আপনার চা খাওয়ার ফাঁকে কথাটা সেরে নিই ।

দরজার বাধা কাটিয়ে ভিতরে ঢুকেই মালা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে পড়ল । একটু ঘুরে সোজাসুজি তাকালো তার দিকে ।

—কাম অন্ প্লীজ !

মালা বিশ্বাস বলতে যাচ্ছিল, হাত সরান । বলা হল না । একটা বেয়ারা শশব্যস্তে দৌড়ে এসেছে । ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দীকে দেখলে এরাও একটু আধটু ব্যস্ত হয়ে খাতির করতে এগিয়ে আসে আগেও লক্ষ্য করেছে ।

দু'পা এগিয়ে সে নিজেই কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিল । বিলিতি সৌজন্যের খাতিরে যতটুকু দরকার ততটুকুই করেছে যেন । মালা চেষ্টা করছে রাগ যেন প্রকাশ না হয়, মুখ যেন লাল না হয় ।

কোণের দিকেরই একটা টেবিলে বসা হল । ক্যাপ্টেন নন্দী একটা চেয়ার ঘুরে তার মুখোমুখি চেয়ারে বসল । বেয়ারা অপেক্ষা করছে ।

কি খাবেন ?

চা ।

নাথিং এল্স্ ?

মালা বিশ্বাস চোখে চোখ রাখতে পারছে এখন । রাগ হলে সে অনেক কিছু পারে! —নো । থ্যাঙ্ক ইউ ।

বেয়ারা চা আনতে গেল, চেয়ারে ঠেস দিয়ে সবিতাব্রত হাল্কা শিস দিল একটু । চা আনার প্রতীক্ষা । কিন্তু মালা বিশ্বাস আসামীর মত বসে থাকতে রাজি নয় ।

আপনি আমাকে কি বলবেন ?

ক্যাপ্টেন নন্দীও কিছু বলার জন্যেই সামনের দিকে ঝুঁকল এবার । বাইরের গাম্ভীর্য যেমনই হোক, ভিতরে ভিতরে আবার দুর্বল বোধ করেছে মালা বিশ্বাস । এই লোকের ব্যক্তিত্ব আলাদা ।

শুরুর আগেই বাধা পড়ল । চা এলো । সবিতাব্রত নিজেই চা ঢেলে চিনি দুধ মিশিয়ে একটা পেয়ালা তার দিকে এগিয়ে দিল, একটা নিজে টেনে নিল । তারপর নাটকের ভণিতা বাদ দিয়ে একেবারে শেষ অঙ্কে পৌঁছুল যেন ঝপ করে ।

এখানকার পাইলট আর ক্রুরা সকলেই আপনাকে বেশ পছন্দ করে ।...আপনি জানেন, কেন ?

মালা বিশ্বাস নিরুত্তরে চেয়ে আছে, কানের কাছটা গরম ঠেকছে ।

আই অ্যাম সিওর ইউ নো, হোয়াই। আপনি যা তা যদি না হতেন কেউ কেয়ার করত না, কিছু একটা স্টেপ নিত, ফুরিয়ে যেত। কিন্তু আপনার বেলায় কেউ নির্দয় হতেও চায় না। অথচ একজন এয়ার হোস্টেস ক্যাপ্টেনদের চড়-চাপড় দিয়ে বেড়াবেন এ-ও ঠিক বরদাস্ত হবার নয়। সো দে আর ট-কিং—

মুখ আস্তে আস্তে লাল হচ্ছে মালা বিশ্বাসের, চা তেমনি পড়ে আছে। যা বলল, তার সাদা অর্থ, রূপের জোরে তার এত দেমাক আর স্পর্ধা। তবু আত্মপক্ষ সমর্থনেরই চেষ্টা কেন মালা বিশ্বাসের, নিজেই জানে না। বাধা দিয়ে বলে উঠল, একজন এয়ার-হোস্টেসের কোনো ক্যাপ্টেনকে এ-কথা বলার দরকার হয় কেন আপনি জানেন ?

আই ডোন্ট কেয়ার, বাধা পেয়ে চোয়াল শক্ত হল সবিতাব্রতর, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইউ আর হিয়ার ফর ? বি,এ পাস করে আর এই চেহারা নিয়ে আপনি এ কাজে কেন এসেছেন ? ডিক্রুজ ইজ এ সোয়াইন, আপনার পছন্দমত লোক হলে ওই ব্যবহারের জন্যে আপনার আপত্তি হত না। আপনাদের আমি অনেক দেখেছি—

কি অনেক দেখেছেন আপনি ? দু'চোখ ধকধক করে জ্বলে উঠল মালা বিশ্বাসের।

আস্তে। আপনি এখন ডিক্রুজের সঙ্গে কথা বলছেন না। আমি আপনাকে একটি কথা জানাতে এসেছি, আপনার জোরটা এত বড় নয় যার ওপর ভরসা করে কোনো ক্যাপ্টেনকে এ-কথা বলা যেতে পারে—আই উইল বি হ্যাপি ইফ উই রিমেম্বার—উইল ইউ ?

রাগ রাগ রাগ, যতখানি রাগ হলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, মালা বিশ্বাসের ততখানিই রাগ হয়েছে। যে-সব কথা বলেছে একজন মহিলার পক্ষে তার থেকে বেশি অপমানকর কি আর হতে পারে ?

চেয়ার ছেড়ে এক ঝটকায় মালা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে উঠল একেবারে। সাবটেনলি নট ! ও যে ব্যবহার করেছিল তার জন্য সব ভদ্রলোকেরই লজ্জিত হওয়ার কথা। কিন্তু এখানকার ভদ্রলোকদের সেই জ্ঞান কম। আমি ওকে চড় দেব বলেছি শুধু, দিইনি—দেওয়া উচিত ছিল, আপনার বন্ধুকে গিয়ে বলুন পরের বারে আর ভুল হবে না।

চা দু'চুমুকও খাওয়া হয়নি। মালা বিশ্বাস আর বসল না। রাগে জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে চলে গেল। চেয়ারের পিছনে আবার ঠেস দিয়ে সবিতাব্রত দেখল যতক্ষণ দেখা গেল। তারপর খেয়াল হল, দেখছে আরো কেউ কেউ—বয়গুলো। নিজের পেয়ালার চা শেষ করে উঠে হালকা শিস দিতে দিতে সেও বেরিয়ে গেল।

পরিণামের জন্য নতুন করে আবার মালা বিশ্বাস প্রস্তুত হচ্ছে মনে মনে। কিন্তু এই প্রস্তুতির পিছনে অব্যক্ত ক্রোধ একটা। নিজে বাঙালী হয়েও বাঙালী মেয়ের অপমান জেনেও এমন নির্লজ্জ ক্রুর ব্যবহার করতে পারে এত অপদার্থ ভাবেনি লোকটাকে। তারও পাকা চাকরি—কি করবে ? কি করতে পারে সে ? বড় জোর অন্য বেস্‌এ ট্রান্সফার হতে হবে —হোক।

. একে একে আট দশ দিন কেটে গেল আরো। তারপর একদিন রস্টারে ডিউটি দেখে মালা বিশ্বাস থমকালো হঠাৎ।

এরকম ডিউটি বদল স্বাভাবিক কারণেই হতে পারে। নির্দিষ্ট এয়ার হোস্টেস হঠাৎ অসুস্থ হলে তো হতেই পারে। কিন্তু এই মানসিক অবস্থায় এটা একবারও স্বাভাবিক মনে হল

না মালা বিশ্বাসের। ওভারটাইমের ছোট ফ্লাইট—ডিউটি পড়েছে ক্যাপ্টেন পাইলট সবিতাব্রত নন্দীর এয়ারক্রাফটএ।

মালা বিশ্বাস স্থির মনে ভাবল খানিকক্ষণ। সিক্ রিপোর্ট করে ডিউটি নাকচ করতে পারে, কিন্তু করল না। আজ ওভারটাইম ডিউটিতে দিয়েছে, কাল হয়ত রেগুলার ডিউটিতে দেবে! বাধ্যবাধকতা না থাকলেও ক্যাপ্টেন নন্দীর ইঙ্গিত হেলা ফেলা করার পাত্রী নয় চীফ এয়ার হোস্টেস মিস লরি।

সকাল আটটায় ডিউটি। পিক-আপ এসে তাকে তুলে নিয়ে যাবে ভোর ছটায়। তার অনেক আগে উঠে বাড়িতেই চা-টা খেয়ে প্রস্তুত হল। এরোড্রোম রেস্তরাঁয় ক্যাপ্টেনের টেবিলে সকলে মিলে চা খাওয়ার রীতি। রীতিই শুধু, তাতে পয়সা বাঁচে। খাওয়াটা আইন নয়।

রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে বাইরের হলএ এলো ওরা। সকলের আগে ক্যাপ্টেন নন্দী। ব্যস্ত পদক্ষেপ। ব্যস্ত হবারই সময় এখন। কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়িয়ে গেল দূরের এক কোণের চেয়ারে মালা বিশ্বাসকে বসে থাকতে দেখে। বড় বড় পা ফেলে এদিকেই এগুলো। মালা বিশ্বাস উঠে দাঁড়াল। কারণ যে এলো সে ক্যাপ্টেন পাইলট অন্ ডিউটি, আর সে এয়ার হোস্টেস অন্ ডিউটি।

আপনি চা খেলেন না।

মালা বিশ্বাস মাথা নাড়ল।

ফ্লাই-ইং?

ইয়েস স্যার!

চলে গেল। চারটে ব্যাজ আঁটা এই সাজ আর চলার এই পুরুষের অভিব্যক্তি দেখাবই মত। মালা আগে দেখেছে। কিন্তু আজ দেখার মত লাগছে না।

যথাসময়ে এয়ারক্রাফটএ উঠল। বাসনপত্র, খাবার-দাবার, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, ইত্যাদি বুঝে নিল। হাতের কাগজ দেখে যাত্রী মিলিয়ে নিল। এ-সব যান্ত্রিক কাজ এখন, যন্ত্রের মতই করে গেল।

এয়ারক্রাফট আকাশে ভাসল। এবারে তার কাজ শুরু। যাত্রীরা কে তাকে দেখে খুশি হয়েছে, বা কার কি রকম হাবভাব—এ-সব দেখে দেখে এত অভ্যস্ত যে চোখ গেলেও মন সেদিকে যায় না আজকাল। আজ চোখও গেল না।

প্যাসেঞ্জার ক্যাবিনের প্রাথমিক কাজ ফুরলো। স্থির ঠাণ্ডা মুখে ট্রে হাতে ককপিটে ঢুকল এবার! আগে জিজ্ঞাসা করে আসেনি, চা কফি দুই-ই নিয়েছে।

ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার, রেডিও এঞ্জিনিয়ার, ন্যাভিগেটর সকলের মুখেই আলগা গাম্ভীর্য একটু। যে যার চা কফি স্ন্যাক নিল, ধন্যবাদ দিল। ক্যাপ্টেন সুইচ প্যানেলের দিকে ঝুঁকে কিছু একটা করছে। ট্রে হাতে চুপচাপ তার পিছনের দিকটায় দাঁড়াল মালা বিশ্বাস।

ঘুরে দেখলে ক্যাপ্টেন। চায়ের গেলাস তুলে নিল।—থ্যাঙ্ক ইউ।

আবার সামনের দিকে ফিরতে গিয়েও ফেরা হল না। হালকা গাম্ভীর্যে একটু ভুরু কুঁচকে চেয়েই রইল ক্যাপ্টেন নন্দী।

ট্রে হাতে মালা বিশ্বাস ককপিট থেকে বেরিয়ে এলো।

হাত খালি করে নিজের জায়গায় বসে রইল চুপচাপ।

খানিক বাদে ক্যাপ্টেন বেরিয়ে এলো ! এসেই থাকে । টুকিটাকি দেখাশুনা করে, প্রসন্নমুখে যাত্রীদের সঙ্গে দুটো কথাও বলে থাকে । কোনো একটা সরঞ্জাম দরকার হলে নিজেই এসে নিয়ে যায় ।

ফেরার মুখে আবার এয়ার হোস্টেসের দিকে চোখ পড়ল তার । হুকুমের প্রতীক্ষায় মালা বিশ্বাস উঠে দাঁড়িয়েছিল । কিছু চাইলে দেবে । তেমনি গম্ভীর । আবারও তার মুখের এই গাম্ভীর্যটুকুই যেন লক্ষ্য করে গেল ক্যাপ্টেন ।

একটু বাদে ককপিটে ডাক পড়ল তার । মালা বিশ্বাস যেন জানত ডাক পড়বে । ...সে ডিউটি করছে ভুলবে না । ধীর সংযত পায়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ।

না, ক্যাপ্টেন ডাকেনি । সুইচ প্যানেলের দিকেই অখণ্ড মনোযোগ তার । এঞ্জিন ঠিক চলেছে জেনেও কিছু একটা খুঁত ধরার একাগ্রতা । মালা বিশ্বাসকে ডেকেছে ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার —লেমন স্কোয়াশ চাই তার ।

ফিরে আসা দু'মিনিটের মধ্যে লেমন স্কোয়াশ নিয়ে আবার ঢুকল । এবারে ক্যাপ্টেনের চোখ তার দিকে ফিরল । ভুরুর মাঝে কুঞ্চন রেখা পড়ল দুই একটা । চেয়েই আছে ।

ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার লেমন স্কোয়াশ নিল, ধন্যবাদ দিল । মালা বিশ্বাস ফেরার উপক্রম করতেই বাধা পড়ল ।

ওয়েট ম্যাডাম ।

আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল আবার । চোখে চোখ রাখল । তেমনি স্থির, গম্ভীর । হুকুমের প্রতীক্ষা । ক্যাপ্টেনের এই কণ্ঠস্বর শুনে তার সহকর্মীরাও ঈষৎ চকিত ।

ক্যাপ্টেনের ভুরু আরো একটু কুঁচকেছে । পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল একবার । মালা বিশ্বাসের বেশ-বাসের ত্রুটি এ-পর্যন্ত কোনো পাইলট আবিষ্কার করেনি । কিন্তু এ পর্যবেক্ষণ যেন ঠিক বেশ-বাসের ত্রুটি আবিষ্কারের জন্যে নয় । সব মিলিয়ে গোটাগুটি তাকেই দেখে নিচ্ছে ।

আর ইউ সিক ?

প্রশ্নের তাৎপর্য তেমন স্পষ্ট বুঝে উঠল না । জবাব দিল, নো সার ।

আর ইউ টায়ার্ড ?

নো সার ।

দেন ?

এ প্রশ্নের জবাবে কি শুনতে চায় না বুঝে চুপচাপ চেয়ে রইল শুধু ।

আপনি কি সর্বদা এই মুখ করে আপনার যাত্রী দেখাশুনা করেন নাকি ?

চেষ্টা সত্ত্বেও দৃষ্টি খরখরে হয়ে উঠেছে মালা বিশ্বাসের । সেটুকুও ক্যাপ্টেনের নজর এড়ালো না বোধহয় । আরো রূঢ় গম্ভীর গলায় বলে উঠলো, আই ডোণ্ট্ ওয়াণ্ট টু সি ইওর ফেস্ লাইক দিস । ইউ আর টু স্মাইল হিয়ার, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ? ভিতরে গিয়ে প্যাসেঞ্জারদের হাসিমুখে দেখাশুনা করুন গে যান—সেটাই এখানকার চাকরি আপনার ।

মালার ধৈর্য আর সংযম অনেকগুণই বেড়েছে বোধহয় । আগে হলে হাতের এই ট্রে-ই ছুঁড়ে মেরে দিতে পারত । হুকুম মাত্র পা নড়ল না, তার বদলে ওই মুখের ওপর চোখের আগুন ছড়ালো নিঃশব্দে । দাঁড়িয়ে আছে ।

ফল আরো খাবাপের দিকে গড়ালো। ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করল। কিন্তু না উঠে তার দিকে ঘুরে বসল।—আই ওয়ার্ন ইউ ফর দি লাস্ট টাইম ম্যাডাম, আবার যদি আপনার এই মুখ আমার চোখে পড়ে, নেক্সট এয়ারপোর্টে এয়ারক্রাফট ল্যাণ্ড করলে আপনাকে আমি নামিয়ে দিয়ে যাব—নাউ গো!

মালা বিশ্বাস চলে এসেছে। ট্রে যথাস্থানে রেখেছে। নিজেব জায়গায় বসেছে। বসে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে শুধু সংযত কবেছে। যাত্রীরা টুকিটাকি যা চেয়েছে দিয়েছে। কিন্তু এই মুখ দেখে তারা খুশি হয়েছে কি অবাক হয়েছে জানে না। সে শুধু সারাক্ষণ অপেক্ষা করেছে। কিসের অপেক্ষা তাও জানে না।

পারে। হাওযাই জাহাজ থেকে নামিয়ে দিতেও পারে। মাটি ছেড়ে একবাব আকাশে উড়লে ওবাই সম্রাট। তাই এখন নয়। এখন মালা বিশ্বাস ডিউটি করবে। শুধু ডিউটি করবে। আর কিছু না। গন্তব্যস্থলে পৌঁছুলো। খানিক বাদে খাওয়া দাওযাব ডাক পড়ল। কিন্তু মালা বিশ্বাসের মুখ হাতও ধোয়া হয়নি। খাওয়া দাওয়ার পরই আবার উড়তে হবে। ফিরতে হবে।

একবার ভাবল বলে পাঠায খাবে না। কিন্তু না, তাই বা কববে কেন? এখন সে ডিউটি কবছে না, অন্তত হাসি মুখে দেখাশুনা করা বা কাউকে অভ্যর্থনা জানানোর ডিউটি করছে না। হাসাটা এখন ডিউটি নয়। বাইবেব এয়াবপোর্ট—ছোট ক্যানটিন। আলাদা টেবিলে বসল মালা বিশ্বাস। সকলেই আড়ে আড়ে দেখছে তাকে, ঠোঁটের ডগায় হাসি চেপে আছে। মালা বিশ্বাস না তাকিযেও অনুমান কবতে পারে।

খাবার সামনে ফেলে রেখেই ওই ক্যাপ্টেনের হাসি হাসি মুখটা ঝলসে দেবাব ইচ্ছে। কিন্তু এখন না। কিছুই করবে না। আবার উড়তে হবে। ফিবতে হবে।

এয়াবক্রাফট ফিবে এলো প্রায় চারটে নাগাদ।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ক্যাপ্টেন নন্দী—ক্যাপ্টেন নন্দী না, যেন বাজ বাজেশ্বব চলে যাচ্ছেন। ফিবে তো এলো, এবারে কি কববে মালা বিশ্বাস? কি কববে ভেবে পাচ্ছে না বলেই চাবগুণ জ্বলছে সে। কিছু করবে। সকলেব মনে রাখাব মতই কিছু করা দবকার।

অফিসে এসে হাতের কাগজপত্র টেবিলে আছড়ে ফেলল। আপাতত বাড়ি যাবে, বাড়ি গিয়ে ভাববে।

লিসন...। কি বলার জন্য চীফ এয়ার হোস্টেস মিস লরি থামালো তাকে।

আসামী যেন ওই মিস লরি। মালা বিশ্বাসের আগের ধারণা এখন আরো বদ্ধমূল। ষড়যন্ত্র করেই তাকে ওই লোকটার সঙ্গে ডিউটি দেওয়া হয়েছে—অপমান কবা হবে জেনেই। জ্বলন্ত চোখে মালা বিশ্বাস তাকালো তার দিকে।

মিস লরির কাগজপত্রের দিকে দৃষ্টি, খেয়াল না করে বলতে গেল, কাল তোমাকে একবার—

কাল আমি আসছি না। মালা বিশ্বাস ঝাঁঝিয়ে উঠল।

মিস লরি অবাক।—আর ইউ সিক?

এই প্রশ্ন এয়ারক্রাফট-এও একজন করেছিল—আই অ্যাম নেভার সিক! এবারে যেন একটা রাস্তা পেয়েছে মালা বিশ্বাস। অপেক্ষাকৃত মৃদু কঠিন গলায় বলল, আমি কাল আসছি

না, পরশু আসছি না, আর কোনদিন আসছি না। তোমাদের ওই আদবের ক্যাপ্টেনকে বলে দিও তার মত অভদ্র ইতর লোক যেখানে কাজ করে মালা বিশ্বাস সেখানে কাজ করে না। তুমি শিগগিরই আমার রেজিগনেশন লেটার পাবে।

গট্ গট্ করে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

ভেবেছিল, মিস লরিকে যা বলে এলো সে সেটা ঠিক কানে তুলে দেবে। দিলে যন্ত্রণা জুড়াবে একটু। কিন্তু মনের প্রতিক্রিয়া বিপরীত হল। এতবড় অপমানের পর চাকরি আর করবেই না। এইতো সবে শুরু, আরো কত অপমান হতে হবে ঠিক নেই কিন্তু এ-ভাবে চাকরি ছাড়লে ওই লোকটার কি হল ? সে-তো হাসবে আর বহাল তবিয়তে শিস দিয়ে বেড়াবে। চাকরি এর পর আর সে করবে না বটে, কিন্তু ওই দাম্ভিক লোকটার দর্প খর্ব না করতে পারা পর্যন্ত এই অপমানের কি জবাব হল ?

সন্ধ্যায় একে একে বান্ধবীরা এসে গেল। ক্যাপ্টেনকে না হোক, মিস লরি এদেরকে বলেছে। এমন একটা কৌতূহলের ব্যাপার শোনার পর না এসে পারল না তারা। রোজা গ্র্যাণ্ড এলো, মিস ইয়ং এলো, পার্বতী রাঙ এলো।

কি ব্যাপার ?

কি হয়েছে ?

চাকরিই ছেড়ে দিচ্ছ শুনলাম ? দিনে দুপুরে আবার কি কাণ্ড করল ক্যাপ্টেন নন্দী ?

কৌতূহল মিটল না কারো। মালা বিশ্বাস এই মুহূর্তে এদের কাউকে চায় না। কারো সহানুভূতিও না। তারা শুধু জানল, দুর্ব্যবহার করা হয়েছে তার সঙ্গে।

যাই বুঝুক তারা, চাকরি ছেড়ে চলে যাবে একজন এটা কারোরই মনঃপূত নয়। এই চাকরির সুখ কত সকলেই জানে, তাই একজন ছেড়ে চলে যাচ্ছে শুনলে মনে মনে হয়ত ঈর্ষাই হয় তাদের। অনেক করে বোঝাতে লাগল তারা, চাকরি ছাড়াটা কোনো কাজের কথা নয়—এতে বরং ওদের দর্প আর স্পর্ধা আরো বেড়েই যাবে। ছাড়তেই যদি হয়, মুখের ওপর সরাসরি জুতো মেরে ছাড়া ভালো। তা'ছাড়া ক্যাপ্টেন নন্দী তো চলেই যাচ্ছে—চার মাসের ছুটিতে বাইরে যাচ্ছে জেট-বোইং আর আরো কি সবের লাইসেন্স ট্রেনিং নিতে যাবে, পাইলট তো নাম-করা, হয়ত ওদেশেই থেকে যাবে আর ফিরবেই না—চাকরি ছাড়লে তার আর কি শিক্ষা হল ? মাঝখান থেকে সে চাকরিটা খোয়াবে কেন ?

বিদেশে চলে যাচ্ছে এ খবরটা মালা বিশ্বাস জানত না। মনে মনে মন্তব্য করল, শিখে দিগ্‌গজ হবে একেবারে—

বান্ধবীদের খেদ থেকে এই উপলক্ষেই ওই লোকটার প্রতি এদের একটা মনোভাব যেন নতুন করে আবিষ্কার করল সে। এর আভাস হয়ত পরিহাস ছলে আগেও পেয়েছিল সে কিন্তু এত স্পষ্ট করে পায়নি। রোজা গ্র্যাণ্ড, মিস ইয়ং, পার্বতী রাঙ, কমলা ব্যাস—সকলেই একদিন মনে মনে আশা করছে কোনো এক শুভক্ষণে তারা মিসেস নন্দী হয়ে বসবে। মালা বিশ্বাস জানে তা।

এক কমলা ব্যাস ছাড়া নিরাশ যে সকলেই হয়েছে তাও জানে। কিন্তু হতাশার দরুন ভিতরে ভিতরে ওরা হিংস্র ছুরি শানাচ্ছে একটা করে, তা জানত না।

বলা বাহুল্য, জেনে সত্যিই খুশি হয়েছে সে। বন্ধুদের দরদী মনে হয়েছে।

রোজা গ্র্যাণ্ড বলেছে, হি ইজ্ ডিফারেন্ট, বাট হি ইজ এ ব্রুট । লাগলে ভালো করেই লাগা উচিত ওর সঙ্গে—নট বাই সাচ্ টেম্ বেজিগনেশনস্ ।

মিস ইয়ং বলেছে, ও মেয়ে ভোলাতে পারে, চাকবি না ছেড়ে তুমি বরং চেষ্টা করে দেখো ওকে ভোলাতে পারো কিনা, পারলে একমাত্র তুমিই পারবে—ফার্স্ট ক্যাচ হিম অ্যাণ্ড দেন লীভ হিম লাইক ইওর ওল্ড় শূ । আই উইল বি গ্ল্যাড ইফ ইউ ক্যান কিল্ হিম । কিন্তু তাই বা করবে কি করে, চলেই তো যাচ্ছে—

পার্বতী বাঙ বলেছে, লোকটা কত বড় দাম্ভিক তুমি এখনো জানো না ? ফুর্তির সঙ্গিনী পেলে ওর আপত্তি নেই কিন্তু স্ত্রী চায় না । আসলে ও আমাদের অপমান করতেই চায় । কমলা ব্যাস সব জেনেও আশায় আশায় আছে, একদিন সাবধান করেছিলাম ওকে, মুখ মুচকে চলে গেল । এরপর কেঁদে কূল পাবে না দেখো । সক্কলের হাল আমার জানা আছে ।

সব থেকে বেশি বোধহয় জানা আছে মালা বিশ্বাসের নিজের হাল । কিন্তু এ নিয়ে আর ঘাঁটাতে রুচি হয়নি তার । ইন্ধন জুগিয়ে ওদের উত্তেজনা বাড়াতে চেষ্টা করেনি । ক্যাপ্টেন-পাইলটের ঘরণী হবার আশায় প্রত্যেকেই ওরা হয়ত নিজের নিজের কিছু পুঁজি খরচ করে বসে আছে । প্রত্যাখ্যানের অপমান নিঃশব্দে মুখ বুজে হজম করেছে । তাই এত বীতরাগ । এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় ।

কিন্তু তার জ্বালা গোড়াটা নতুন ওদের বিতৃষ্ণা উল্টে দ্বিগুণ তিনগুণ ক্রোধের ইন্ধন জুগিয়েছে তাকে । সত্যিই তো চাকরি কেন ছাড়বে ? কার চাকরি করছে সে ? চাকরি ছাড়লে মেয়েদের খেলার পুতুলের মত এ-ভাবে অপমান করে যে, তার দর্প দম্ভ স্বেচ্ছাচারিতার জবাব কি হল ? সব-দিক না ভেবে রাগের মাথায় মিস লরিকে চাকরি ছাড়ার হুমকি দিয়ে আসাটা ঠিক হয়নি । সামনাসামনি মিস লরিও তো ওই ক্যাপ্টেনকেই তোয়াজ করবে, আর তার কথা নিয়ে হাসাহাসি করবে ।

পরদিন মিস দত্তগুপ্ত আগুনের উপর ঘৃতাহুতি দিল যেন । মিস লরির মুখে মালা বিশ্বাস চাকরি ছেড়ে দেবে শুনে ক্যাপ্টেন নন্দী নাকি হেসেছে, আর বলেছে, চাকরি ছাড়লে মিস বিশ্বাসের ভবিষ্যৎ আরো ভালো ছেড়ে মন্দ হবে না । চেহারা-পত্র ভালো, ফিল্ম লাইনে গেলে এর থেকে ঢের ঢের বেশি পয়সা হবে, নাম হবে । তবে এরোড্রোমটা অনেকের নীরস লাগবে বটে । তাহলেও ক্যাপ্টেন নন্দী এই উপকারটুকু করতে পেরে খুশি হয়েছে নাকি ।

সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে । মালা বিশ্বাস উঠল । প্রস্তুত হয়ে এয়ারপোর্টে চলল । এখন তার ডিউটি নেই, পিক-আপও আসেনি । মিস দত্তগুপ্তও জানিয়েছে লোকটা আট-দশ দিনের মধ্যে চলে যাচ্ছে, তারও ধারণা আর না ফিরতেও পারে । ফিরলেও কোন বেস্-এ এসে কাজে লাগবে ঠিক নেই । অতএব বাস্তবের দিক চেয়েও আর একটুও পরোয়া করার কারণ নেই তাকে । কারণ থাকলেও পরোয়া করত না মালা বিশ্বাস ।

মিস লরি তাকে দেখে খুশি । চাকরি ছাড়ার চিন্তাটা তার মতেও একেবারে ছেলেমানুষি । জিজ্ঞাসা করল, রাগ পড়েছে ?

জবাব না দিয়ে সে ফিরে প্রশ্ন করল, তোমাদের স্টার ক্যাপ্টেন ছুটিতে যাচ্ছে কবে ?

যে তারিখটা শুনল সেই দিনটা আরো দিন বারো তফাতে । মালা বিশ্বাস ক্যালেণ্ডার

দেখে মনে মনে হিসেব করছে একটু, ওদিকে মিস লরি নিজের মনেই বলে চলেছে, ছুটির হুকুম আসেনি এখনো, কিন্তু ক্যাপ্টেন নন্দী যাবে শুনে সকলেরই মন খারাপ—কি পাইলটদের, কি মেয়েগুলোব, একমাত্র মিস বিশ্বাসের ছাড়া। ঠাট্টা করল, না কি ভিতরে ভিতরে তোমারও মন খারাপ ?...এ ধরনেব রাগারাগির পরে সাধারণত ভালো কিছু ঘটে।

মালা বিশ্বাসের কিছু কানে গেছে কিছু যায়নি। নিবিষ্ট মনে সে দরখাস্ত লিখে উঠল একটা। দু'সপ্তাহের ছুটির দরখাস্ত—পরদিন থেকেই। এই ভাঙা সপ্তাহ থেকে ছুটি মঞ্জুর হবে না জানে, হ'লে ওভার টাইমগুলো লোকসান। ... দেখা যাক, প্ল্যান খাটে কি না।

দরখাস্ত পেয়েই মিস লরি লাফিয়ে উঠল, কেউ ছুটি চাইলেই চীফ এয়ার হোস্টেসের মেজাজে ফাটল ধবে। গোটা রস্টার নিয়ে বসতে হয় তখন আবার তাকে।...ও মাই...হুট্ করে দু' সপ্তাহের ছুটি, কি ব্যাপার। ঠাট্টা করছ না তো ?

গম্ভীর মুখে মালা বিশ্বাস জবাব দিল, ঠাট্টা নয়। ছুটির খুব দরকার।

মুখের দিকে চেয়ে মিস লরি দরকারটা বুঝতে চেষ্টা করল। বলল, কিন্তু উইদাউট নোটিসে এ-ভাবে আমি ছুটি বেকমেণ্ড করি কি করে, কাজই বা চলবে কি করে ? আর একদিন দুদিন নয়, টানা একেবারে দু-সপ্তাহের ছুটি।

বললাম তো খুব দবকার, তুমি পাঠিয়ে দাও।

পাঠালে সে রাজি হবে না তাও জানে মালা বিশ্বাস। যা আশা করেছিল সেই কথাই বলল মিস লরি—কিন্তু কাজ তো আমাকেই চালাতে হবে, সপ্তাহেব মাঝখান থেকে এভাবে আমি ছুটি রেকমেণ্ড করলে সব ঝামেলা তো ফিরে আমাকেই পোহাতে হবে। নেহাত দরকার হলে সামনের সপ্তাহ থেকে ছুটি নাও, এসপ্তাহেব কাজ চালিযে দাও।

অন্যের হলে সরাসরি প্রস্তাব নাকচ করে দিত মিস লরি, কিন্তু তার বেলায় অতটা ভরসা পায় না। সে রাজি না হলে এই মেয়ে সোজা ওপরঅলার কাছে গিয়ে অনায়াসে ছুটি স্যাংশন করে নিয়ে আসবে। এইখানে চাকরি করে করে তার অনেক কিছুই জানা হয়ে গেছে। সব থেকে বেশি জানা আছে বোধহয় সুন্দর মুখের জোবের দিকটা।

মালা বিশ্বাসও মনে মনে এই ব্যবস্থাই চাইছিল। মিস লরি আপত্তি কবলেই বরং অসুবিধেয় পড়ত। আবার ক্যালেণ্ডার দেখল সে। তারপব খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, সপ্তাহ শেষ হতে এখনো চার দিন বাকি, সামনের সপ্তাহ থেকে ছুটি নিলে এই চার দিন কোন্ ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার ডিউটি দিচ্ছ।

ব্যাপারটা এতক্ষণে যেন স্পষ্ট বোধগম্য হল মিস লরির।—ও ইউ কাওয়ার্ড, ক্যাপ্টেন নন্দীর ভয়ে তুমি ছুটি নিচ্ছ। সে কি তোমাকে গিলে খাবে বলেছে ?

কাব সঙ্গে ডিউটি দিচ্ছ ?

এনিবডি ইউ লাইক, তোমার মেজাজ দেখে সকলেরই একটু তাক্ লেগে গিয়েছিল, আর তুমি কি না...। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হলে কেমন ভীতু তুমি, আমি কিন্তু বলে দেব।

বোলো। মালা বিশ্বাসের মুখে উত্তেজনার এতটুকু চিহ্ন মাত্র নেই।—কিন্তু তোমার প্রমিস মনে থাকবে তো ? এর মধ্যে ওর সঙ্গে ডিউটি দিলেই আমি সিক্ করব বলে দিলাম।

ও কে। তা'হলে ছুটি আর চাইনে তো ?

চাই। দরখাস্তটা টেনে নিয়ে আবার লিখতে বসল সে। চারটে দিন হাতে পাওয়া গেল।

সুযোগ মেলার পক্ষে চারদিনই যথেষ্ট সময় । পরের সপ্তাহটা ছুটি নিল । বলল, দরকার হলে এরপর আবার এক্সটেণ্ড করব ।

মিস লরি হাসতে লাগল । এবারে আর তার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না । অর্থাৎ পরের সপ্তাহে যদি ক্যাপ্টেন নন্দী না যায় তাহলে সে ছুটি বাড়াবে । ক্যাপ্টেন নন্দীর বিরুদ্ধে এ যাবত কোনো মেয়েকে সামনাসামনি রুখে দাঁড়াতে দেখেনি । তাই এই ব্যাপারে সে কিছু রোমাঞ্চ আশা করেছিল । কিন্তু বাঙালী মেয়ের মুখেই যত দাপট ভাবল সে ।

প্ল্যান মতই কাজ হয়েছে । মালা বিশ্বাস প্রতীক্ষা করছে ।

এখন এই চার দিনের মধ্যে দেখা হলে হয় । চেষ্টা থাকলে না হবার কোন কারণ নেই । ডিক্রুজের হয়ে রেস্তরাঁয় এসে গায়ে হাত দিয়েছে, যা মুখে আসে তাই বলে অপমান করেছে, আর সব লোকজনের সামনে চূড়ান্ত অপমান করেছে—এয়ারক্রাফট থেকে নামিয়ে দেবে বলেছে । চাকরি ছেড়ে ফিল্ম অ্যাকট্রেস হলে বেশি লাভ হবে বলেছে । এত অপমানিত মালা বিশ্বাস জীবনে আর হয়নি —শুধু সে কেন, সব মেয়েদেরই মান-সম্ভ্রম পায়ে করে মাড়াতে বাধে না । এর শোধ সে ভালো করেই নেবে । ছুটিতে যাবার আগে তার প্রাপ্য সে মিটিয়ে ছাড়বে ।

অপমানের জবাব দিতে না পারা পর্যন্ত তার গায়ের জ্বালা জুড়বে না । বাইরে থেকে ফিরে লোকটা যদি আবার এই বেস্-এই আসে, তখন যা হয় হবে । তেমন বুঝলে না হয় ছেড়েই দেবে চাকরি—দিচ্ছিলই তো । সে চাকরির মায়ায় ফিরে আসেনি; চাকরি ছাড়ার কোনো মানে হয় না বলে ফিরে এসেছে ।

ভাবনা যেমন, সিদ্ধিও তেমনি । দুপুরের একেবারে নিরিবিলি ফাঁকায় দেখা হল তৃতীয় দিনে । বিকেলে ডিউটি থাকলে দুপুরের মধ্যেই এসে যাচ্ছিল মালা বিশ্বাস । আর ওপরঅলার চক্রান্তে পাশার সেই দানই যেন ঘুরে এসেছে—তফাতের মধ্যে এবারে দানটা তার—মালা বিশ্বাসের । এই সুযোগ সে হেলায় হারাবার জন্যে বসে নেই ।

অন্যমনস্কের মত ঈষৎ মন্থর পায়ে এরোড্রোম রেস্তোরাঁর দিকেই যাচ্ছিল ক্যাপ্টেন নন্দী —হাত বিশেক পিছন থেকে মালা বিশ্বাসের চোখ পড়েছে । আর তক্ষুনি দাঁড়িয়ে গেছে ।

মিস্টার লিণ্ডবার্গ !

রমণী-কণ্ঠের হালকা ডাক শুনে সবিস্ময়ে ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী । তারপর যথার্থই অবাক । অল্পবয়সী বা বেশি বয়সী নেহাত অন্তরঙ্গ ক্যাপ্টেন ছাড়া জুনিয়র পাইলটরাও কেউ তাকে এভাবে ডাকতে সাহস করে না । কিন্তু যে ডাকল এ-ভাবে তার মুখখানা বড় অদ্ভুত লাগল দেখতে ।

মালা বিশ্বাস এগিয়ে এলো, ঠোঁটে চাপা হাসি । বলল, সেদিন আপনি চা খাইয়েছিলেন, ওয়াণ্ডারফুল টী, অ্যাণ্ড ইউ অয়্যার সো কাইনড অ্যাণ্ড সো জেনারাস্ দ্যাট্ ডে—চলুন আজ আমি আপনাকে চা খাইয়ে দিই ।

দরজা ঠেলে সে-ই আগে রেস্তোরাঁয় ঢুকল, আর বিগত দিনের সেই টেবিলটাই বেছে নিল । ওই লিণ্ডবার্গ ডাক না শুনলেও সবিতাব্রত হয়ত ভাবত, বেগতিক দেখে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার চেষ্টা মহিলার । কিন্তু এই সম্ভাষণের পর সে-রকম একবারও মনে হল না ।

রাগের বদলে বরং মুখের দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সবিতাব্রতর গম্ভীর মুখে কৌতুক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বিস্ময়ও। চেয়ার টেনে বসল। চেয়ে আছে। বেয়ারা সেলাম ঠুকে দৌড়ে এলো।

মালা বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করল, ওনলি টী?

সবিতাব্রত মাথা নাড়ল। কৌতুক-প্রচ্ছন্ন গম্ভীর দৃষ্টি তার মুখখানা চড়াও করে আছে। উদ্দেশ্য কিছুটা অনুমান করতে পারছে হযত। অবাক হবার মতই সাহস বটে। প্রতীক্ষার গাম্ভীর্যে মুখের দিকে চেয়ে সে যেন মজা দেখছে কিছু।

কিন্তু মালা বিশ্বাস কিছু বলছে না। ... বেয়ারা চা দিয়ে যাক আগে। সেটা অনুমান করে সবিতাব্রতই সাদাসিধে মুখে জিজ্ঞাসা করল, আপনি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন শুনলাম?

মালা বিশ্বাস পাল্টা প্রশ্ন করল, ফিল্ম কন্ট্রাক্ট সই করেছি শোনেন নি?

সবিতাব্রতর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস স্পষ্টতর হল একটু। মুখের ওপর থেকে চোখ সরানো গেল না। মাথা নাড়ল। বলল, এখনো শুনিনি।

চা এলো। আক্রোশে মালা বিশ্বাসের মুখে লালের কারুকার্য দেখা দিচ্ছে নিজেও জানে না। এই মেজাজের মুখে বক্তব্য গুছিয়ে বলার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। চা ঢেলে একটা পেয়ালা তার দিকে ঠেলে দিতে দিতে বলল, শুনবেন। আপনাকে কিছু শোনাবার আশায় দিন গুনছিলাম। আপনার সঙ্গে টেপ রেকর্ডার আছে?

কৌতুকের থেকেও সবিতাব্রতর বিস্ময়ই উত্তরোত্তর বাড়ছে শুধু। তেমন অন্তরঙ্গ হয়ে না উঠলে এ ধরনের বেপরোয়া হাব-ভাব কোনো এয়ার হোস্টেসের অন্তত দেখেনি। দেখলেও সেটা একেবারে প্রত্যাশাশূন্য ভাবেনি কখনো। এই মুখ তার দেখা কোনো মেয়ের মুখের সঙ্গে মেলে না। ঘাড় নাড়ল। নেই।

থাকলে ভালো হত। এতবড় একজন হোমরাচোমরা ক্যাপ্টেন আপনি, তার ওপর বাইরে থেকে ট্রেনিং নিয়ে আরো অসামান্য হতে চলেছেন—সামান্য এক এয়ার হোস্টেস কি বলেছে না বলেছে দু'দিন বাদে ভুলে যাবেন। থাকলে মাঝে মাঝে শুনতে পারতেন।

ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত রাগের পরিমাণ আঁচ করতে পারছে, সাহস দেখে অবাকও হচ্ছে, কিন্তু সতিাকারের বৈচিত্র্যের খোরাক পেয়েছে যেন সে। এরকম অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। বাধা দিয়ে মোলায়েম করেই বলল, তা'হলে এখানে এই পাঁচ জনের মধ্যে কেন, নিরিবিলি কোথাও যাই চলুন, মনে রাখার মত কিছু যদি বলেন, থাকতেও পারে। আই হ্যাভ টাইম—

মালা বিশ্বাসের এবারের চেহারা আরো অন্য রকম। তীব্র শ্লেষে বলে উঠল, না এখানেই হবে। আমি ডিউটিতে নেই, চাকরি বজায় রাখার মত মুখ করেও কাউকে দেখাশোনা করতে হচ্ছে না। তবু বলেন তো আপনাদের মন ভেজাবার মত করে হাসি মুখেই বলতে পারি যা বলার—

তা'হলে মন্দ হয় না। দ্যাট উইল বি মোর চার্মিং, মনে রাখতে আরো বেশি সুবিধে হবে।

মালা বিশ্বাস থমকালো। কিন্তু চোখের আগুনে এই মুখ পোড়ানো যায় না।

বলে ফেলুন। সবিতাব্রতর কণ্ঠস্বরে ছদ্ম আগ্রহ।

বলছি । সেদিন চা খাওয়াবার নাম করে এই টেবিলে বসে একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে আপনি যে-রকম ব্যবহার করেছেন, তাতে আপনার বন্ধু-প্রীতি দেখে আমি অবাক হয়েছি। আর একেবারে মুগ্ধ হয়েছি আপনার মত ডাকসাইটে ক্যাপ্টেনের দাপট দেখে--একজন এয়ার হোস্টেসকে অনায়াসে অপমান করে আপনি এয়ারক্রাফট থেকে নামিয়ে দিতে পারেন পর্যন্ত। এরকম ক্ষমতাবান মানুষ আর বড় দেখা যায় না—ইউ আর এ রিয়েল লিওবার্গ। আপনার এই ব্যবহারের জন্য সে-দিন ভিক্রুজকে যে কথা বলেছিলাম আপনাকেও তাই বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আপনি মস্ত একজন নামজাদা ক্যাপ্টেন বলেই মুখ ফুটে বলতে ভরসা হচ্ছে না। হাজার হোক সামান্য চাকরি করি।

মনোযোগ দিয়ে শোনার মত করেই শুনছে যেন ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত। আর আর কিছু বলছে না দেখে গম্ভীর মুখেই ইন্ধন জোগালো, বলল, ভরসা দিচ্ছি, বলে যান। আপনাকে আমার ভালো লাগতে শুরু করেছে।

রাগে বিদ্বেষে মালা বিশ্বাস চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। এ-ধার ও-ধারে কে আছে, কে দেখছে না দেখছে হুঁশ নেই।—তা'হলে বলি শুনুন, মেয়েদের আপনি সম্মান করতে জানেন না, তাদের সম্মান আপনি পায়ে করে মাড়ান, আপনি অভদ্র, আপনি ইতর, আপনি অতি ছোট, অতি নীচ–

চায়ের পেয়ালা ফেলে আজও নিজেই সে চলে যাবার উপক্রম করল। কিন্তু চেয়ার ঠেলে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ধীর ঠাণ্ডা গলায় কেউ যেন আচমকা ফেরালো তাকে।—চায়ের দামটা কে দেবে?

ঘুরে দাঁড়িয়ে এক ঝটকায় হাত-ব্যাগ খুলে টেবিলের ওপর চায়ের দাম রাখল মালা বিশ্বাস।

গম্ভীর মুখে ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী মন্তব্য করল, থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি কমপ্লিমেণ্টস, বাট সো-মেনি ইন নাম্বার—তবু মনে রাখতে চেষ্টা করব।

জিভ সামলে আর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মালা বিশ্বাস হনহন করে প্রস্থান করল সেখান থেকে।

ধীরে সুস্থে আগের দিনের মতই চায়ের পেয়ালা খালি করল ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস লেগে আছে তেমনি। রমণীর রোষ এই প্রথম বোধ করি বড় বিচিত্র মনে হয়েছে তার। নীরব হাসিটা ক্রমশ পুষ্টি লাভ করেছে খেয়াল নেই।

সবিতাব্রতর মধ্যে সেই বেপরোয়া উদ্দাম প্রায়-অপরিণত মানুষটি আজও সজীব—যে শুধু নামজাদা ক্যাপ্টেনই নয়। তাই তার ভালো লেগেছে। এক মেয়ের মধ্যে এই আগুন দেখে তার ভালো লেগেছে। আগেও লক্ষ্য করেছে অনেকদিন, নজর করে দেখেছে। মেয়েদের সে সম্মান করে না সত্যি কথাই। করে না কারণ, সম্মান করার মত বেশি মেয়ে তার চোখে পড়েনি। এই সম্মানটুকুর তেমন মূল্য দিতে সে কাউকে দেখেনি। বাইরের আনন্দ আর বাইরের জগতের থেকে সংসার যাদের বেশি কাম্য এমন মেয়ের সঙ্গেও বেশি মেশেনি সে। আর তার মায়ের মত সারা জীবন শুধু ছেলের জন্য বেঁচে আছে, এমন রমণীর সংস্পর্শেও সে আর আসেনি। কিন্তু সম্মান করুক না করুক, তাদের আকর্ষণও কাটাতে পারে না। তাই অনেক সময় মালা বিশ্বাসকেও লক্ষ্য করেছে, দেখার মত বলেই

দেখেছে । কিন্তু তার এত তেজ ভাবেনি, তেজ দেখতে সে অভ্যস্ত নয় ।

কিন্তু এও তার সম্মান করা নয় । শুধু ভালো লাগাই । এখানে এতদিন আর যে সব মেয়েদের দেখে আসছে, তাদের থেকে একে একটু বেশি ভালো লাগত হয়ত । সেটা তার চাল-চলন আর চেহারার দরুন হওয়াই স্বাভাবিক । মেয়েদের মধ্যে সম্মান সে একজনকেই করেছে, এখনো করে । তার মাকে । আর তার মায়ের মত যারা, তাদের । কিন্তু তারা মেয়ে নয় । তারা মা-ই । প্রায় সব বয়সেই তারা মা ।

কিন্তু এই মেয়েরা ? এরা অঞ্জুদি । বাইরে এরা নানা জনে নানা রকম—কিন্তু যাদের সে দেখে আসছে, ভিতরে ভিতরে সবাই ওরা অঞ্জুদি । নিজেই কতদিন ভেবেছে সবিতাব্রত, এ এক রোগে দাঁড়িয়েছে তার । অঞ্জুদি দেখার রোগ । রোগ যাতনা-ক্লিষ্ট এক শিশুর আর্তনাদ আজও কানে লেগে আছে তার । এমন কত অঞ্জুদি আছে দুনিয়ায়, কত অশান্তি ঘটাচ্ছে তারা, কত শিশু মারছে, কত সংসার জ্বালিয়ে দিচ্ছে ।

তাই এখানে ওই মেয়েদের দেখে সে অখুশি হয় না একটুও । ভাবে, ভালই হয়েছে, সংসার না করে এরা এখানে এসেছে । এরা তো তারাই, যারা অঞ্জুদির মত জীবনের শান্তি নষ্ট করে । তাই যত আসে ততো মঙ্গল । ততগুলো সংসার নিশ্চিন্ত । এদের সঙ্গে মিশে ওই অঞ্জুদিদেরই দেখেছে সে । যাদের দেখেনি, চেনেনি, তাদেরও ওই একই ছাঁচে ফেলেছে । সেজেগুজে ইউনিফর্ম পরে মুখে রঙ মাখিয়ে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে ওরা মন ভোলায়, চোখ ভোলায় । সবিতাব্রতর একটুও আপত্তি নেই—সংসার থেকে ওরা দূরে সরে আছে বলেই খুশি । ওরা মন নয়, ওরা শুধু দেহ—দেহের সম্মান-অসম্মান নিয়ে সবিতাব্রত কোনদিন খুব মাথা ঘামায় না ।

একদিনের হঠাৎ এই ব্যতিক্রম দেখে আজও যে ঘামালো তা নয় । যে মেয়ে দুঃসাহসিকার মত এ-ভাবে আগুন ছুটিয়ে গেল, তাকেও সে রাতারাতি অন্যদের থেকে খুব তফাত করে দেখল না । ধারণাটা একদিনেই বদলে গেল না—সম্মানের উঁচু আসনে বসিয়ে ফেলল না । যাদের দেখে আসছে তাদের তুলনায় একটু বৈচিত্র্যের সন্ধান পেল শুধু । যে বৈচিত্র্যের সঙ্গে আত্মমর্যাদার একটা যোগ কল্পনা করতে অন্তত ইচ্ছে করে ।

সেইটুকুই দুর্লভ এখানে । তাই ভালো লেগেছে । এই ভালো লাগাটুকুই সবিতাব্রতর ঠোঁটের ফাঁকে খেলা করছে ।

## ।। সাত ।।

যতখানি বলতে পারলে মালা বিশ্বাস অপমানের জ্বালা জুড়বে ভেবেছিল, তার থেকে বেশি ছাড়া কম বলে আসে নি । ক্যাপ্টেন নন্দীর মত পাইলটকে এ-রকম বলার দুঃসাহস আর কোনো এয়ার হোস্টেস কল্পনাও করতে পারে না হয়ত ।

কিন্তু বাড়ি ফেরার পরেও মনটা খুব সুস্থির হল না । রাগের স্বাভাবিক সঙ্গী ক্লান্তি । সেই ক্লান্তির সঙ্গে কেমন একটা বিষাদের ছায়া পড়ছে ভিতরে ভিতরে । খুব যে একটা দুঃসাহসিক কাজ করে এসেছে তাও ভাবতে পারছে না । সাধারণত বিদায়ী লোককে মানুষ একটু-আধটু ক্ষমা করে থাকে । ক্যাপ্টেন নন্দীও বিদায় নিয়েই যাচ্ছে । কিন্তু ক্ষমা দূরে

থাক, মালা বিশ্বাস তার সুযোগ নিয়েছে । ছুটি নিয়ে নিরাপত্তার দিকটা আগে দেখেছে । লোকটা চলে যাচ্ছে না শুনলে ঠিক এই ব্যবহার করতে পারত কি না জানে না । পারলেও চাকরি ছাড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই মুখোমুখি দাঁড়াতে হত । আগামী কাল ডিউটি করা হলেই এক সপ্তাহের ছুটি । ছুটিটা আনন্দদায়ক লাগছে না একটুও ।

আসলে তার মনের তলায় এই বিষণ্ণ ছায়াটা ছুটি নেওয়া বা ক্যাপ্টেন নন্দীর সঙ্গে ঝগড়া করে আসার দরুন নয় ।

এই ক'দিনে ক্যাপ্টেন নন্দী যে সব কথা বলেছে, যে ব্যবহার করেছে, যেভাবে অপমান করেছে– তার ভিতর দিয়ে নিজেদের ঠুনকো মর্যাদার দিকটা বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল তার চোখে । ডিউটি দিয়ে আর জৌলুসভরা হাসি-খুশির আনন্দে কাল কাটিয়ে হতাশার যে চিন্তাগুলো মালা বিশ্বাস মনের বাইরে ঠেলে সরিয়ে রেখেছিল, আজ তারা যেন অর্গল ভেঙে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে । চোখে আঙুল দিয়ে সেগুলো যেন জীবনের হিসেবের দিকটা দেখিয়ে দিচ্ছে তাকে । যেখানে শুধু ফাঁকি ছাড়া আর কিছু নেই । সঞ্চয় সেখানে এমন শূন্য যে, চোখে পড়লেও দম বন্ধ হবার উপক্রম হয় ।

তাই সে চোখ বুজে থাকে । কিন্তু আজ পারছে না চোখ বুজে থাকতে ।

...একই সংস্থার লোক, উচ্চশিক্ষিত সুপটু পাইলট, চাল-চলন হাব-ভাব পুরুষকার-ব্যঞ্জক—এই পেশার মেয়েদের সঙ্গে তারই যখন এ-রকম মনোভাব, অন্যের কাছ থেকে কতটুকু আশা করার আছে তাদের ? সে কি না বলেছে তাকে । বলেছে, পছন্দের লোক হলে ডিক্রুজের ব্যবহারের জন্যে মালা বিশ্বাসের আপত্তি হত না, বলেছে, তাদের মত মেয়েদের সে চেনে । বলেছে, হাসাটা ডিউটি তাদের—হেসে যাত্রীদের চোখ মন ভোলানো আর আনন্দ দেওয়া ডিউটি তাদের । ...আর আজও শ্লেষ আর বিদ্রূপের হুল ফুটিয়েছে, এখানে এই পাঁচজনের মধ্যে বসে বোঝা-পড়া করার ইচ্ছে বাতিল করে তাকে নিয়ে নিরিবিলি কোথাও যেতে চেয়েছে । সেই প্রগলভ আমন্ত্রণের অর্থ যেমন নগ্ন তেমনি স্পষ্ট । বলতে একটুও বাধেনি, এ-রকম বলেই অভ্যস্ত তারা ।

লোকটার মুখ আছে আর শক্তির দম্ভ আছে, তাই মুখ ফুটে বাসনা ব্যক্ত করতে বাধেনি । কিন্তু মুখে যারা বলে না, তারাও তো মনে মনে এই কথাই বলে, এ-ই ভাবে তাদের । তারা জীবনের সঙ্গিনী কেউ নয়; দু'দণ্ডের নিরিবিলির সঙ্গিনী, হাসিমুখে আনন্দ দেবার সঙ্গিনী ।

আর বাইরে ? বাইরের দুনিয়ার চোখেও কৌতূহল একটু-আধটু থাকলেও তারা একেবারে ছাপ-মারা মেয়ে !

ছাপ-মারা মেয়ে । এই চিন্তাটা আগেও বহুদিন ঘুরে ফিরে বিঁধেছে মালা বিশ্বাসকে । মন থেকে তাড়াতে চেষ্টা করেছে । না, কেউ বলেনি একথা । নিজেরই মনে হয়েছে, নিজেই বলেছে, আবার নিজেই তাড়াতে চেয়েছে ।

কিন্তু কত বড় বৈচিত্র্যের মোহ নিয়েই না এসেছিল একদিন এখানে ।

হাওযাই জাহাজে এযার হোস্টেসের চাকরি করতে চলল মেয়ে, শোনামাত্র তার মায়ের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল । চোখ মুখে নিষেধের ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছিল । মালা বিশ্বাস, না তখনো এই নামের সাজ পরেনি সে—নির্মাল্য বিশ্বাস গ্রাম্য-মায়ের ভাবনা দেখে হেসেছিল । হাওযাই হোস্টেসের চাকরি নিয়ে নির্মাল্য ছেঁটে মালা হয়েছে । শুধু অফিসের কাগজপত্রে

আর মাইনে বা টাকাকড়ি নেওয়ার সময় সে এখনো নির্মাল্য বিশ্বাস। ওর বাইরে নির্মাল্যর আর অস্তিত্ব নেই—বাকি সর্বত্র সে মালা বিশ্বাস।

কিন্তু নির্মাল্যর আর মালার সঙ্গে যত তফাত—জীবনের সঙ্গে এই বাস্তবও যেন ততখানিই তফাত হয়ে পড়েছে। মালা বস্তুটা শুচির বা নিবেদনের উপচার যেমন হতে পারে, আবার, যে-সে তার দিকে হাত বাড়াতেও দ্বিধা বোধ করেনা। কিন্তু নির্মাল্য ভিন্ন বস্তু। সেটাই যেন ছিল ভালো।

মাকে করুণার চোখেই দেখত ছেলেমেয়েরা। কতবড় কেতাদুরস্ত অফিসারের স্ত্রী—অযোগ্য ভেবে নিজেই সদা সংকুচিত হয়ে থাকতেন মহিলা। মা একজন আছেন, এই পর্যন্ত; ছেলে-মেয়েদের বাবাই আদর্শ, বাবাই সব। আধুনিক হাল-চাল দেখে মা যখন এক একসময় অবাক হতেন বা অখুশি হতেন—ছেলেমেয়েরা হাসত। সেই হাসির সঙ্গে বাবার প্রশ্রয়ও মিশত। এদিকে ভাই বোনের সংখ্যা কম নয়। দিল্লীতে থাকত তারা, বাবা সেক্রেটারিয়েটের বড় অফিসার একজন। কিন্তু বড় পরিবার নিয়ে বড় চাকরির আদব-কায়দা নিষ্ঠা সহকারে বজায় রেখে চলতে হলে পুঁজি বলতে কিছুই থাকে না। তাই পড়া শেষ করেই চাকরির খোঁজে লেগে পড়তে হয়েছে অন্যান্য ভাইবোনদের। চাকরি পেয়েছে। তারাও বাপের অনুকরণে আদবকায়দা বজায় রেখেই চলতে চেষ্টা করেছে।

মালা সকলের ছোট। কিন্তু পাস করে বেরিয়ে কিছু একটা করে বা কিছু একটা হয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবার ইচ্ছেটা আদৌ ছোট ছিল না কারো থেকে। বোনদের মধ্যে সব থেকে সুন্দরীও সে। দিল্লীর বাতাসে এই রূপের কদর ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করেছে। আশেপাশের সভ্যভব্য কেতাদুরস্ত অল্প বয়সী ছেলেরা সর্বদাই ওদের বাড়ির কাছে ঘুর ঘুর করত। কতজন আলাপ করতে চেয়েছে, কতজন আলাপ করেছে। এক কলেজেপড়া ছোকরা তো তাকে নিয়ে যুগান্তকারী একটা সাহিত্য-পত্র বার করার জন্য ক্ষেপেই গিয়েছিল। নীরস গদাকারের একটা বস্তুই শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়ে উঠল না। টাকা...। সেটা যোগাড় হলেই আর কিছু বাকি থাকত না।

আর মালা নিজে দিল্লীর কলেজে পড়তে...?

কলেজে পড়তে সে শুধু অনুগ্রহ করেছে সকলকে—সকলকে। কি ছাত্র কি মাস্টার; এক অল্পবয়সী প্রফেসারের তো মাথা বিগড়বার ফলে চাকরি খোয়ানোর দাখিল। ভদ্রলোকের নাম আজও মনে আছে। অবিনাশ বসু রায়। বেশ পড়াত। নরমসরম লাজুক মানুষ। থার্ড ইয়ারের ছ'মাস না পেরুতে তার পড়ানো মাথায় উঠল। এমন হল যে, তার দিকে চোখ পড়লে ভদ্রলোক কি পড়াচ্ছে ভুলে যেত। উল্টোপাল্টা বলত। শেষে কারণ জানাজানি হতে আর বাকি থাকল না কারো।

বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। বিয়ে! কলেজের মাস্টারকে! যোগ্য লোকের অভাবে তার থেকে অনেক কম সুন্দরী বড় বোনেরাই তখনো বিয়ে করেনি। না সেই প্রস্তাব নিয়ে সে বা বাড়ির কেউই মাথা ঘামায়নি। মালা বি, এ পাস করে বেরুলো যখন, তখনো আশা ছাড়েনি ভদ্রলোক। নিজে ওর সঙ্গে দেখা করে আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু মালা বিশ্বাস তখন স্বপ্নের আকাশে উড়ছে।

এয়ার হোস্টেসের চাকরি নিয়ে সকলকে যতখানি তাক লাগিয়ে দেবে ভেবেছিল, ততটা

অবাকই হয়েছিল বটে সকলে। এইজন্যেই তলায় তলায় কত পরিশ্রম করেছিল সে কেউ যদি জানত। বোনেরা বাহাদুরি দিয়েছে, দাদারা বলেছে মন্দ কি, লাইফের অ্যাডভেঞ্চার আছে—বাবা বিব্রত বোধ করলেও আধুনিকতায় পিছিয়ে থাকার ভয়ে বাধা দেন নি। ব্যাকুল হয়েছিলেন শুধু মা। অনেক আশা নিয়ে সকলের মুখের দিকে তাকিয়েছেন, কেউ যদি নিষেধ করে, বাধা দেয়।

বি, এ পাস করার আগেই তার এক অবাঙালী সহপাঠিনী বান্ধবী এয়ার হোস্টেসের চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল। তার সঙ্গে একাধিক দিন দিল্লীর এয়ারপোর্টে এসেছিল মালা বিশ্বাস। সেই আসাই কাল হয়েছিল।

ওখানকার সবকিছুর বৈচিত্র্য তাকে হাতছানি দিয়েছে। ভেবেছে এই এক জীবন বটে। ভরপুর জীবন। চারদিকে শুধু আনন্দ ছড়ানো। যেদিকে তাকায়, সব চকচকে ঝকঝকে। যাত্রীরা, কাজ যারা করে তারাও। মালা বিশ্বাস তন্ময় হয়ে দেখত। দেখত আর মনে হত এক রহস্যের দুনিয়া, এই দুনিয়ায় প্রবেশের ছাড়পত্র যারা পেয়েছে তারা ভাগ্যবান। বান্ধবীর কাছে কতরকমের অভিনব গল্পই না শুনত। রোমাঞ্চকর মনে হত সব।

তখনই ঠিক করে ফেলেছিল সেও এয়ার হোস্টেস হবে। মজার চাকরি। বহু দেশে যাবে, কত নতুন নতুন জায়গা দেখবে, কত রকমের অভিজ্ঞতা হবে। মেয়েরা যদি নার্স হতে পারে তাহলে এয়ার হোস্টেস হতেই বা বাধা কি? নার্সদের দেখলে তার করুণা হয়, তাদের অনটন কোনো দিন ঘোচে না। আর বিনা খরচায় এয়ার হোস্টেসদের কি সব পোশাক-আশাক, দেখলে চোখ জুড়োয়।

চাকরির দরখাস্ত করে অনেক দিন একা একা এয়ার পোর্টের লাউঞ্জে গিয়ে বসে থেকেছে সে। দেখেছে, এয়ার হোস্টেসরা আসছে যাচ্ছে—মুখে মিষ্টি হাসি, কি স্মার্ট, কি তাদের ড্রেস! যারা শাড়ি পরে তাদের শাড়ির রঙ ধূসর, পাড় নীল—ব্লাউজের রঙে পাড়ের রঙে মিল, চকচকে জুতো, হাতে চকচকে কালো ব্যাগ—ঝকঝকে ব্যাজ আঁটা। দেখে চোখে পলক পড়ত না মালা বিশ্বাসের। মেয়ে-জীবনের সেরা ভাগ্য ওরাই করে এসেছে যেন। কোথায় যাচ্ছে? কত দূরে? আজ এখানে, কাল কোথায় কত দূরে ঠিক নেই। ওয়াণ্ডারফুল!

ভাবী এয়ার হোস্টেস মালা বিশ্বাস মাঝে মাঝে এয়ার পোর্টের রেস্তোরাঁয় গিয়েও বসত। এক পেয়ালা চা নিয়ে দেখত চেয়ে চেয়ে। খাওয়াব থেকে দেখার ভোজটাই বড় হয়ে উঠত। ক্যাপ্টেন, কো-পাইলট, রেডিও অফিসার, নেভিগেশন অফিসার, স্টুয়ার্ড—সব এক টেবিলে গোল হয়ে বসেছে। এমনিতে গম্ভীর মনে হয় সকলকে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে দিব্বি হাসাহাসি গল্পগুজব করে। আর খায় যে যা খুশি, যত খুশি। সব কোম্পানীর খরচে, মালা বিশ্বাস জানে। তার মনে হয়েছে এমন আনন্দের পরিবেশ আর হয় না। সে ওদের একজন হবে এমন ভাগ্য কি কোনদিন হবে? দীর্ঘ নিঃশ্বাসই পড়েছে কতদিন। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা সব একসঙ্গে আকাশে উড়বে—একজনের সঙ্গে আর একজনের যেন অবিচ্ছেদ্য নিবিড় যোগ। এতে এতটুকু মালিন্যের ছায়া পড়তে পারে মালা বিশ্বাস কল্পনা করতেও রাজি নয়।

দীর্ঘ আট মাস এয়ার হোস্টেস হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বসে ছিল মালা বিশ্বাস। না, পরবর্তী জীবনে রূপ দেখেই চাকরি দেবার জন্য পাগল হয়েছিল বলে ঠাট্টা করে সবিতাব্রত—সেটা ঠিক নয়। রূপসী এখানে বলতে গেলে সকলেই। তার ওপর তার চাকরির ব্যাপারে বাদ

সাধতে যাচ্ছিলেন একজন বয়স্ক বাঙালী অফিসার—যিনি অন্যতম প্রধান নিয়োগকর্তা। তার মত একটি বি.এ পাস বাঙালী মেয়ে এয়ার হোস্টেসের চাকরি করবে এটা ভদ্রলোকের পছন্দ ছিল না। কিন্তু মুখে সকলের সামনে সে-কথা বলেন কি করে ? বয়সে আটকায় না, কোয়ালিফিকেশন চাহিদার থেকেও বেশি ওর, চেহারা অপছন্দ করার জো নেই, সে স্মার্ট নয় এ-কথা শত্রুও বলবে না। শেষে শুধু ওজনের ব্যাপারেই খুঁত ধরে বসলেন ভদ্রলোক—লম্বার অনুপাতে তার ওজন একটু বেশি। বি, এ পাস করার পর মালা একটু মোটার দিকেই ঘেঁষছিল সত্যি কথা। তীরে এসে তরী ডোবার মত সে এক প্রাণান্তকর হতাশা !

এই ওজন কমাবার জন্যে কি প্রাণপাত পরিশ্রমই না করেছিল মালা বিশ্বাস। জিভে জল এলেও খাওয়া-দাওয়া ছেড়েছিল। তবু কি ছাই শরীরের ওজন কমে। কিন্তু একদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে বুঝেছে, আসলে তিনি নিতেই চাননা তাকে। খবর নেবার অছিলায় গোপনে একদিন তাঁর সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করতে গিয়েছিল সে। দেখা হয়েও ছিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, বি. এ পাস করেছ, বড় ঘরের মেয়ে তুমি, এ-চাকরিতে আসতে চাও কেন ?

কি জবাব দেবে ? বলেছে, এই চাকরি করবে তার বহুদিনের ইচ্ছে। বি. এ পাস করার আগে থেকেই।

ভদ্রলোকের অফিস ঘরটা যেন ছিল কাচের ঘর, চারিদিকে কাচের দেওয়াল। ভিতর থেকে বাইরের সব কিছুই দেখা যায়। আঙুল তুলে বাইরের দিকে ইঙ্গিত করলেন, তিনি। বললেন, ওই ওদিকে দেখো। বক্তব্য না বুঝে মালা ঘুরে তাকিয়ে দেখল, অদূরের এনকোয়ারীর কাছে কুলীগোছের একটা লোক দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোক বললেন, ওই লোকটাও তোমার প্যাসেঞ্জার হতে পারে—তাকেও সমান ওজনে অভ্যর্থনা করতে হবে, খাওয়া হলে ওরও উচ্ছিষ্ট নিয়ে যেতে হবে, পেয়ালা ধুতে হবে, ওরও গা গুলোলে তোমাকে সিক্-ব্যাগ দিতে হবে—পারবে ? ভালো লাগবে ?

সেই নোংরা কুশ্রী লোকটার দিকে চেয়ে মালা বিশ্বাস সেই প্রথম সত্যিই একটু ধাক্কা খেয়েছিল। কিন্তু চাকরি পাওয়ার লোভ আর মোহটাই বড় তখন। পারবে না বা ভালো লাগবে না বললে তো হয়ে গেল। তাই তক্ষুনি মাথা নাড়তে হয়েছিল, পারবে। বলতে হয়েছিল, ভালো নার্স হতে হলেও তো এ-সব শিখতে হয়। আর মেয়েরাই তো এ-সব করে থাকে।

ভদ্রলোক মুখের দিকে চেয়েছিলেন খানিকক্ষণ। চাউনিটা একটুও সদয় মনে হয়নি তাঁর। কিন্তু আর বাধাও দিতে চেষ্টা করেন নি। বলেছেন আচ্ছা, পাবে চাকরি, যাও।

তারপর যে-ক'দিন না চিঠি এসেছে, মালা বিশ্বাস হাওয়ায় ভেসেছে। তখনো বাড়িতে বলেনি কিছু। উদ্দীপনায় মন চঞ্চল। বন্ধুদের দেখে অনুকম্পা বোধ করেছে মনে মনে। জন্মটাই বুঝি বৃথা ওদের। বাঁধা-ধরা ছকে পা ফেলে ফেলে দিন কাটাতে হবে। কি নীরস জীবন ওদের কপালে ! সাধারণ রেস্তোরাঁয় বসে কাউকে খেতে দেখলেও ভেবেছে, বেচারীরা কি-ই বা খায়। খাওয়ার সেই পরিবেশ যদি দেখত..।

তারপর চিঠি এসেছে।

পরম আগ্রহ আর উত্তেজনা নিয়ে কাজে যোগ দিয়েছে। ট্রেনিংয়ে লেগেছে। স্বপ্নে ভরপুর তখনো। কোনো খবরই আর জানতে বাকি নেই তার। দু'শ পঁচাত্তর থেকে পাঁচশ টাকা মাইনে, তার ওপর যাবতীয় এলাওয়েন্স। ওদিকে ওভারটাইম ডিউটি করলে মাইনের দেড়া প্রাপ্তি। মাসে আশি ঘন্টা মাত্র বাঁধা কাজ—তার ওপর হলেই ওভারটাইম। ওপরে হওয়াটাও বাঁধা-ধরা নিযমের মধ্যে।

একমাসের মধ্যেই ট্রেনিং শেষ তার। অনায়াসে যোগ্যতার ছাড়পত্র মিলেছে। মিলবে যে জানাই ছিল। তাকে দেখে ছাড়পত্র দেবাব মালিকেরা অখুশি কেউ হন নি। প্রথম ক'টা দিনের রোমাঞ্চ ভোলবাব নয়। প্যাসেঞ্জারের লিস্ট নিয়ে প্লেনের দরজায় দাঁড়িয়েছে। দুরু দুরু বক্ষে প্রতিটি যাত্রীকে উইশ করেছে। গ্রাউণ্ড স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে কেটারিং লিস্ট নিয়ে গভীব নিষ্ঠায় বাসন চামচ কেক-এব বাক্স, স্যাণ্ডউইচের বাক্স, বিস্কিট টফি লজেঞ্জ সুপুরি সাজিয়ে রেখেছে। গোড়াতে ছোট ফ্লাইট, তাই লাঞ্চের হাঙ্গামা পোয়াতে হযনি।

কেউ ফিরে তাকালে ছুটে গেছে, কি চাই, বা কিছু চাই কি না। তার আগ্রহ দেখে কেউ খুশি, কেউ অবাক কেউ বা অস্বস্তি বোধ করেছে। কিন্তু সব যাত্রীকেই সমান যত্ন করতে ইচ্ছে করছে মালা বিশ্বাসেব প্রথম ক'টা দিন। পাছে কেউ অপছন্দ করে তাকে, সর্বদা সেই দুশ্চিন্তা, সেই উদ্বেগ। তাকে কারো ভালো লেগেছে মনে হলে কৃতজ্ঞ বোধ করত তখন।

কিন্তু ছমাস না কাটতে এই মোহ আর বাইবেব ছটা ফিকে হয়ে আসতে লাগল। ডিউটি যান্ত্রিক ব্যাপার হয়ে উঠল। এক অসার শূন্যতায় সব কিছু যেন শুধুই চাকচিক্যে মোড়া। বুদ্ধিমতী মেয়ে নিজের স্বল্প অভিজ্ঞতায় আর সহকর্মিণীদেব গল্পগুজবে এই জীবন যাত্রার স্বরূপটা যেন সে বড় তাড়াতাড়ি দর্পণে দেখতে শুরু করেছিল। বাস্তবের দর্পণে। ডিউটি ক্রমশ বিরক্তিকব ঠেকতে লাগল। কেউ বেশি কিছু চাইলে বা বারবাব ডাকলে বিরক্ত হত। ঠিক আর পাঁচজন এয়াব হোস্টেস যেমন হয়। হলেও হাসিমুখে সামনে এসে না দাঁড়িয়ে উপায় নেই। অন্যেব থেকে তাকে যেন জ্বালাতন আরো বেশি করে যাত্রীবা। কেন যে করে সেটা অনুভব করতে না পারাব কথা নয় তাব। যাত্রীদের আচরণের গল্প এয়াব হোস্টেসবা সর্বদাই কবে থাকে। মালা বিশ্বাসও ব্যতিক্রম নয়। শুনে সহকর্মিণীরা হাসে, বলে, তোমাকে বিরক্ত করবে না তো কাকে কববে!

সিট খালি থাকলে এক-একজন রসিক যাত্রী ডেকে তাকে পাশে বসতেও বলে। একবার এক ছোকরা একটি ছোট ছেলে নিয়ে যাচ্ছিল কোথায়। ছেলেটা, মিষ্টি, দুষ্টু, সেইজন্যেই তাকে একটু বেশি খাতির করছিল মালা বিশ্বাস। ছেলেটা সঙ্গের গার্জিয়ানকে অর্থাৎ সেই ছোকরাকে কাকা বলে ডাকছিল। আবার বাড়ির কথা উঠতে তার কাকীমার গল্পও করছিল—কাকীমার খুব আদরের বোঝা গেছে। তাতেই সেই ছোকরার মহাবিপদ, তাড়াতাড়ি তাকে জানিয়েছে, কাকীমা মানে আমার কেউ নয়, ইয়ে মানে আমার আর এক বউদি—ওর আর এক কাকা।

তার বোঝানোর আগ্রহ দেখে মালার মনে মনে রাগই হয়েছিল। তাই বুঝেছে যে, সেটা ফিরে বোঝানোর জন্য একটা ভালোরকম কটাক্ষই উপহার দিয়েছিল। দিয়ে ফেলে ছোকরার দশা দেখে এর পর মায়াই হয়েছিল তার। পাঁচ মাইল পথ ঠেঙিয়ে এরোড্রোমে

এসেও যে কতবার দেখা করতে চেষ্টা করেছে, আর হতাশ হয়ে কত চিঠি দিয়েছে তাকে ঠিক নেই।

এ-রকম আরো কত আছে। এক সর্দারজী পৌনে দুঘণ্টার ফ্লাইটে পাঁচ গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ খেয়েছিল। যত খাচ্ছিল চোখের তৃষ্ণা ততো বাড়ছিল। অনুকম্পায় লোকটার ওই চোখেই অরেঞ্জ স্কোয়াশ ঢালতে ইচ্ছে করছিল মালা বিশ্বাসের। নামার আগে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করেছিল, আর চাই কি না। সর্দারজীর চোখ দেখে মনে হচ্ছিল স্বপ্নের ভার আর তৃষ্ণার যাতনা আর সে বইতে পারছে না। কিন্তু হঠাৎ কি যে হল কে জানে। সর্দারজী রেগে গেল, বলে উঠল, না আর চাইনে, আমি বুদ্ধুর মত কেবল অরেঞ্জ স্কোয়াশই খেলাম।

ক্ষণিকের পরিচয়ে কত লোকের কাছ থেকে চিঠি, কার্ড, উপহার এসেছে ঠিক নেই। কত আমন্ত্রণ, কত আবেদন নিবেদন, 'ডেট' রাখার কত সনির্বন্ধ অনুরোধ। নতুন বছরের শুরুতে বা শেষে আকাশে উড়েও অব্যাহতি নেই। কত জনে কত কি দিতে চায়, দেয়। চোখের আড়াল হলে মালা বিশ্বাস ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে-সব। অন্য এয়ার হোস্টেসরা কত সময় ঈর্ষা করেছে তাকে, স্থূল রসিকতা করেছে। কিন্তু এক একসময় প্রায় দেউলে মনে হয়েছে নিজেকে মালা বিশ্বাসের। সব থেকে করুণ ব্যাপার—তার মোহ ভেঙেছে।

খাতির যত্ন সে একটু বেশি পায় বটে, কেন পায় তা আরো ভালো জানে। কিন্তু অন্যের সঙ্গে তার তফাৎ কতটুকু? ওরা সব যে-যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, যাত্রী দেখাশোনা করাটা গৌণ ব্যাপার, বিরক্তিকরও বটে। যাত্রীদের ক্ষণিকের অন্তর তুষ্টির ফলে সকলের সেরা সুন্দরী ভাবে তারা নিজেকে, তারা যেন হাওয়াই জাহাজের এক-একটি উজ্জ্বলতম তারকা বিশেষ। কিন্তু মনে মনে আর কেউ স্বীকার করুক আর না করুক, মালা বিশ্বাস করে—তারা নিজেরাই শুধু খুব বড় ভাবে নিজেদের আর কেউ ভাবে না—কেউ না। এক হাওয়াই জাহাজ ভর্তি যাত্রীর একজনও না। যেটুকু খাতির ওদের করে শুধু লোভের সামগ্রী ভেবেই করে।

সেদিনের সব মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা মনে হলে আজ হাসিই পায় মালা বিশ্বাসের। অভিজাত পাড়ায় দেড় ঘরের একটা ঝকঝকে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকে সে। অন্যান্য ভাড়াটেরা বেশির ভাগই কেতাদুরস্ত অবাঙালী। বাড়ির সামনের মোড়ের কাছে একটা পানের দোকান। পানঅলা বাঙালী। মালা বিশ্বাস মাঝে সাঝে পান খেত এই লোকটার কাছ থেকে। তাকে দেখলেই পানঅলা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠত—সকলকে ছেড়ে তাকে পান দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠত। তার চোখে শ্রদ্ধার আমন্ত্রণ দেখেও অনেকদিন সে পান খেতে দাঁড়িয়েছে। পান বেচে নয়, তাকে পান খাইয়েও কৃতার্থ বোধ করত ও। ভাবত কতবড় চাকরিই না জানি করে সে। যখন তখন ঝকমকে পিক-আপ এসে তুলে নিয়ে যায়, ফিটফাট বেশবাস করে যখন সে গাড়ীতে চেপে দোকানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, খদ্দের ভুলে সে হাঁ করে চেয়ে থাকত—যেন স্বর্গের পরী চলেছে আর ও দেখছে। সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে ওর ক্রেতারা পর্যন্ত কত সময় ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে, কে যায়।

একদিন ঢাকা ফ্লাইটে যাচ্ছে—সাজগোজ করা নিম্নশ্রেণীর একজন লোক উঠল। মুখখানা কেমন চেনা চেনা লাগল মালা বিশ্বাসের। কিন্তু ঠাওর করতে পারল না, কে। আর লোকটাও যেন তাকে দেখে বেশ অবাক হয়েছে। অবাক নয়, হতভম্ব হয়েছে। প্লেন ছাড়তে ট্রেতে চা ইত্যাদি নিয়ে অভ্যস্ত হাসি-হাসি মুখে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল মালা

বিশ্বাস । যেমন সকলের সামনেই এসে দাঁড়ায় আর, যে-রকম হেসে সকলকেই আপ্যায়ন করে । কিন্তু চায়ের ট্রের দিকে না তাকিয়ে লোকটা বিমূঢ় চোখে তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে যে ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বহুবারের দেখা এই মুখ মনে পড়ে গেল মালা বিশ্বাসের । চোখে না দেখলেও নিজের মুখের সেই চকিত বিভ্রম আর বিস্ময়ের কারুকার্য মালা বিশ্বাস অনুমান করতে পারে ।...মোড়ের কাছের সেই পানঅলা ।

স্বর্গের পরী কত বড় চাকরি করে সারাক্ষণ তারপর চেয়ে চেয়ে দেখেছে লোকটা । এখন আর পারতপক্ষে মালা বিশ্বাস ওই দোকানটার দিকে তাকায়ও না ।

আর একদিন ।

ডিউটিতে এসেই দেখে লাউঞ্জে বসে আছে এক ভদ্রলোক, পাশে তার সুশ্রী স্ত্রী । আর একটি ফুটফুটে ছেলেও । মালা বিশ্বাস যেখান দিয়ে যাবে তাকে কেউ দেখবে না এ-রকম বড় হয় না কিন্তু দেখা ছাড়া আর যা সচরাচর হয়না, তাও হল । ভদ্রলোক হঠাৎ সাগ্রহে দাঁড়িয়ে উঠল, আর কি হল মালার, একটা বিষম ঝাঁকুনি খেয়ে সর্বাগ্রে সে নিজের বাহুর ব্যাজটা আড়াল করল ।

দিল্লীর সেই প্রফেসার—অবিনাশ বসুরায় । যে তাকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল ।

কথা হল । স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল ভদ্রলোক । যাচ্ছে কোথায় জিজ্ঞাসা করল । মালা বিশ্বাস কোথায় যাচ্ছে বলেছিল মনে নেই । ভদ্রলোক কোথায় যাচ্ছে শুনে তার চক্ষুস্থির । ওই এয়ারক্রাফটেই ডিউটি তার ।

অতএব সেখান থেকে অফিস ঘরে এসেই 'সিক' । কারো সঙ্গে মুখ তুলে আর কথা পর্যন্ত বলতে পারা গেল না । ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছে হঠাৎ, ডিউটি করতে পারবে না ।

বাড়ি ফেরবার পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত ভিতরটা জ্বালা জ্বালা করেছিল । মালা বিশ্বাসের মনে আছে ।

চাকরি পাবার আগে দিল্লীর এয়ার পোর্ট রেস্তোরাঁয় ক্যাপ্টেন আর কর্মচারীদের সঙ্গে হোস্টেসদের বসে খেতে দেখে আর হাসাহাসি করতে দেখে একদিন যে চোখ-মন ভরে গিয়েছিল—আজ সেই চোখও গেছে, মনও গেছে । তাদের ওই ধরনের অবকাশকালে স্থূল হাসি-ঠাট্টাই আসল বিষয়বস্তু । কে কোন মেয়ের সঙ্গে ভিড়ল কে কি করল, কোন হোস্টেস বা কোন্ বন্ধুর সাম্প্রতিক মতিগতি কেমন—শুধু এই জটলা । এই জটলার দোসর তারা । শুনতে হয়, হাসতে হয়, ইন্ধন যোগাতে হয়, ছদ্ম প্রতিবাদের প্রগলভ অভিনয় করতে হয় । মালা বিশ্বাস অতটা করুক না করুক, যারা করে সেও তাদেরই একজন ।

একটু চিন্তা করলে ক্যাপ্টেনদেরও দোষ দিতে পারবে না মালা বিশ্বাস । সে লক্ষ্য করে দেখেছে, সবাই তারা প্রায় বড় ঘরের ছেলে, উচ্চশিক্ষিত । হাওয়াই জাহাজের সঙ্গে বহু জীবনের দায়িত্ব নেবার মতই সক্ষম, সবল । তাদের অন্তঃকরণও সাধারণত দরাজ । এই দরাজ অন্তঃকরণের অনেক নজির সে নিজের চোখেই দেখেছে । সেটা অস্বীকার করলে অবিচার করা হবে ! ছোটখাট আপদে বিপদেও তারা মাথা উঁচু করে এগিয়ে আসে। কিন্তু গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে থাকে সাধারণত তারাই—মেয়েরা । যাদের জীবনের পরিণতি বলে

কিছু নেই। বুকের তলায় তারা আশার আগুন জ্বালে, প্রশ্রয় দেয়, দিয়ে একটা নিরাপদ পরিণতিতে পৌঁছুবে ভাবে। সে-রকম সম্ভাবনা না থাকলেও খাতির পাবার আশায় বেশি খাতির করে। বস্ বলতে ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আনন্দ করতে পারাটাও অনেকে ভাগ্য মনে করে।

ফলে এই। ক্যাপ্টেনরা যদি এই আনন্দটুকু তাদের পাওনা-গণ্ডার মধ্যে ধরে নেয় দোষ দেবে কাকে? স্বভাবতই বেপরোয়া তারা। হিসেব করে চলতে জানে না। প্রশ্রয় পেলে রমণীর যৌবনের দিকে তারা হিসেব করে এগোবে এই আশা করা কেন?

মায়াদির গল্প জানে তারা। সকলেই জানে। মায়াদিকে চোখে দেখেওনি মালা বিশ্বাস। কিন্তু গল্প শুনেছে। অভাবী ঘরের মেয়ে। সুন্দরী তেমন ছিল না, কিন্তু অদ্ভুত স্মার্ট ছিল নাকি। স্মার্ট হওয়ার ব্যাপারে এক নতুন হাওয়া-ই নাকি এনে দিয়েছিল মায়াদি। কথা বলেই মরে মেয়েরা। মায়াদি কথা বলতই না, মুখের দিকে চেয়ে থাকত আর অল্প অল্প হাসত। পুরুষের হৃদয় বাজ্যে তাতেই নাকি লণ্ডভণ্ড কাণ্ড হয়ে যেত। ঘরে অনেক পোষ্য, তাই এই চাকরিতে এসেছিল। তিনবার তিন জায়গায় তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল—এয়ার হোস্টেসের চাকরি করে শুনেই বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। এদের মধ্যে একজন মায়াদিকে ছেলেবেলা থেকে জানত। তাব সঙ্গে বিয়ে হবে সহকর্মিণীরা ধবেই নিয়েছিল। সে এসে একদিন সরাসবি জানতে চেয়েছিল এই জীবন-যাত্রায় কতটুকু খাদ মিশেছে। সব জেনে শুনে উদার চিত্তে সে মায়াদিকে ঘরে নিতে রাজি আছে, কিন্তু না জেনে ঠকতে রাজি নয়, বোকা বনতে রাজি নয়।

এত বড় উদার মানুষকে মাযাদিও যেন ঠকাতে চাযনি, অনুতাপের মুখ করে নিজেকে প্রকাশ করেছে। বলেছে, ডজনখানেক লোকের সঙ্গে একটু আধটু গণ্ডগোল ঘটে গেছে, সেটা যদি ক্ষমার চোখে দেখে তাকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে ছায়ার মত পায়ে পায়ে লুটিয়ে থাকবে সে!

মায়াদির কতখানি লেগেছিল সেই মুখ দেখে তার অন্তরঙ্গ বান্ধবীরাও বুঝতে পারেনি। বান্ধবীদের কাছে ব্যাপারটা বলেছিল আর হেসেছিল। তারপর দেখতে দেখতে মায়াদি স্পোর্ট হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেনরা যেন তার হুকুমের নাগর। কাকে ছেড়ে কাকে বিয়ে করবে মায়াদি, এই সমস্যা তার।

কিন্তু শেষে দেখা গেল, বিয়ে করতে কেউ এগিয়ে এলো না। শেষের দিকে সঙ্গী যাকে ঠিক করেছিল সে পালিয়েই গেল বিদেশে। মায়াদি তখন সন্তানসম্ভবা। গোপনে পরিত্রাণ পেয়েছিল সে-যাত্রা, চাকরিটাও খোয়া যায়নি। কিন্তু দ্বিতীয়বারে আর পরিত্রাণ পেল না, চাকরিও গেল।

কিন্তু তবু মায়াদি এয়ারপোর্টে আসত, বসে থাকত ঘন্টাব পর ঘন্টা, বলত অমুক এযারক্রাফটএ অমুকের সঙ্গে তার ডিউটি। হাসত, কাঁদত।

শুনেছে, এখন কোন এক মানসিক হাসপাতালে আছে মায়াদি।

কিন্তু মালা বিশ্বাসের কেমন ধারণা হয়েছে, ওই মায়াদি একজন নয়। তাদের সকলের মধ্যেই একজন করে মায়াদি অবিবাম মাথা খুঁড়ছে বুঝি।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এয়ার হোস্টেসের বিয়ের নজিরও দেখেছে দু'চারটে। এই পেশার

এক মেয়ে তার অন্তরঙ্গ বন্ধুও ছিল। তার বিয়ে হয়ে গেছে। এখনো দেখা হয় মাঝেসাজে। কিন্তু মালা বিশ্বাসের কেমন মনে হয়, বিয়ের পরে মেয়েটা যেন রিক্ত হয়ে গেছে। একদিন বলেছিল, বড় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়, ওদের তো চিনি। চিবুনো ছিবড়ের মত কবে ফেলে দেয় ঠিক কি। মালা বিশ্বাসের ধারণা, কেউ ওরা সুখী হয়নি। এই মেয়েরা বিয়ের পরে আর চাকরি করে না বটে, কিন্তু এয়ারপোর্টে আসে যায়। সকলেই যেন ঠিক একই ধরনের সংশয়ে দিশেহারা। তাদের সাজগোজ আরো উৎকট, পুরুষের চোখ টানার চেষ্টা আরো বিসদৃশ। যে সম্বলে তারা ঘর পেয়েছে—সেই আকর্ষণের সম্বলটাই আরো বড় করে ধরে রাখতে না পারলে ঘর টিকবে কিনা—সর্বদাই সেই চিন্তা সম্ভবত।

এই ভাবনাগুলোকেই মন থেকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় মালা বিশ্বাস। চোখের কোণ দুটো অনেক সময়েই সিরসির করে ওঠে। সকলকে ছেড়ে অজ্ঞ অশিক্ষিত সেই গ্রাম্য মা-কেই মনে পড়ে হঠাৎ। কোন্ যাতনা কোন্ আশঙ্কার মধ্যে মা মুখ বুজে কাটিয়েছে সেটা আজ যেন অনুভব করতে পারে। চাকরিতে ঢোকার আগে কত জনে কত কি উৎসাহের কথা বলেছিল। মা শুধু বলেছিল, ভগবান যেন তোকে সুখী করেন, আমি আর কিছু চাইনে মা। দুর্নিরীক্ষ্য শূন্যের দিকে চেয়ে অনেক সময় মালা বিশ্বাসের বলতে ইচ্ছে করে, মেয়ের এই সুখ তুমি কোথাও থেকে দেখছ নাকি মা? দেখলেও দুঃখ কোরো না, তোমার মেয়ের যেটুকু পাওনা তাই পাচ্ছে।

## ।। আট ।।

পরদিন অফিসে সামনা-সামনি যার সঙ্গে দেখা, সে ক্যাপ্টেন নন্দী। সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল, মুখ গম্ভীর। ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, গুড মর্নিং ম্যাডাম! আই ওয়াজ জাস্ট এক্সপেক্টিং ইউ।

আজ যে সামনে দাঁড়িয়ে সে ক্যাপ্টেন অন্ ডিউটি, আর সে এয়ার হোস্টেস অন ডিউটি। এই দিনটা কাটলে সাত দিন ছুটি—মালা বিশ্বাস নিশ্চিন্ত ছিল। রাতারাতি হঠাৎ এই একদিনের ডিউটি বদল হল কি না জানে না। শঙ্কা গোপন করতে চেষ্টা করল প্রথমে। কিছু না বলে সেও মুখ তুলে তাকালো শুধু। চীফ এয়ার হোস্টেস মিস লরি বিশ্বাসঘাতকতা করল কি না মুখে সেই সংশয়।

কিন্তু আগের দিনের অপমান লোকটার গায়ে কোথাও বিঁধেছে মনে হয় না। গাম্ভীর্যের আড়ালে কৌতুকের আভাস অস্পষ্ট নয়। বলল, মিস লরির মুখে শুনলাম, আপনি আমার ভয়ে সাত দিনের ছুটি নিয়েছেন, আর এর মধ্যে আমি এখান থেকে চলে যাব আশা করছেন। বাট্ আই অ্যাম ভেরি সরি, রিয়েলি ভেরি ভেরি সরি। আই উইশ আই কুড গো জাস্ট টু প্লীজ ইউ। এরা কেউ জানে না আমার বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা মাস কয়েকের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে—আপাতত আমি এখানেই আছি।

মাথা নুইয়ে আর এক দফা সৌজন্য প্রকাশ করে সে চলে গেল। যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্পর্কে দু'চার কথা বলে গেল।

মালা বিশ্বাসের পায়ের তলায় মাটি নড়ে উঠল, ! ঘাড় ফিরিয়ে ফ্যালফ্যাল করে সে দেখছে লোকটাকে ।...একবারও ফিরে তাকালো না, লম্বা লম্বা পা ফেলে চোখের আড়াল হয়ে গেল । পরে প্রথম অনুভূতিতে মালা বিশ্বাসের মনে হল সবাই যেন ষড়যন্ত্র করেছে তার সঙ্গে । করছে । ষড়যন্ত্র করে এই পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তাকে ।

পায়ে পায়ে অফিসঘরে এলো । মিস লরি লাফিয়ে উঠল তাকে দেখে । অন্য মেয়ে যারা ছিল তারাও উৎসুক । জটলা কি নিয়ে, তাদের দিকে এক নজর তাকিয়েই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে । মিস লরি বলল, কি ব্যাপার, কাল নাকি তুমি ক্যাপ্টেন নন্দীকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ল্যাশ করেছ ?

আর একজন সংশোধন করল, তোমার ভাষা-ব্যবহার ঠিক হল না মিস লরি, আই মিন রিপোর্ট ঠিক হল না । ক্যাপ্টেন বলেছে তুলোধুনো করেছে—

ওপাশ থেকে আর এক মেয়ে বলল, গোড়াতেই তোমাকে নিশ্চিন্ত করে রাখি, জিতটা আসলে তোমারই হয়েছে, তোমার শত্রুর মুণ্ড ঘুরেছে মনে হয়, তোমার তেজ দেখে ক্যাপ্টেন মহা খুশি ।

ব্যাপারটা জানার আগ্রহ সকলেরই । ক্যাপ্টেন নন্দীকেও যা-তা বলতে পারে যে মেয়ে, তার প্রতি একটু সম্ভ্রমের উদ্রেকও হয় বই কি। যা শুনছে সত্যি হলে কান পেতে শোনার মতই খবর । কিন্তু সকলকে নিরাশ করে মালা বিশ্বাস চুপচাপ একটা চেয়ার টেনে বসল । কারো কথার বা আগ্রহের জবাব দিল না ।

মিস লরি জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু ক্যাপ্টেন তো এখান থেকে যাচ্ছে না, তুমি কি একধার থেকে ছুটিই নিয়ে যাবে নাকি ? নিজের সমস্যাটারই আগে সমাধান চায় মিস লরি ।

তার চোখে চোখ রেখে মালা বিশ্বাস চেয়ে রইল একটু । তারপর জবাব দিল, না ছুটি ক্যানসেল করব ।

কাগজ টেনে খসখস করে ছুটি নাকচের দরখাস্ত লিখে মিস লরির হাতে দিল ।

গুড । এটা মিস লরির কাছে সত্যিকারের খুশি হবার মত সিদ্ধান্ত বটে । শুনে এবারে সানন্দে আপ্যায়ন করতে চেষ্টা করল একটু, কার সঙ্গে ডিউটি চাই, বলো—

যার সঙ্গে খুশি । ঘড়ি দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, তার সময় হয়ে গেছে ।

মালা বিশ্বাস এ নিয়ে আর ভাবতে রাজি নয়, যা হবার হবে । আর কিছু না হোক শেষ উপায় তো তার হাতেই আছে, দরকার হলে চাকরি ছাড়বে—দেখা যাক স্পর্ধার দাপট কোন পর্যন্ত ওঠে । যেতেই যদি হয় এখান থেকে, নিঃশব্দে যাবে না । সকলে জানবে যে একটা মেয়ে গেছে এখান থেকে । যেতে যদি হয়ই এয়ার হোস্টেসদের মর্যাদা সে কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে যাবে । তারা যে খেলার পুতুল নয় এটা যেমন করে হোক বুঝিয়ে দেবে ।

মালা বিশ্বাস প্রস্তুত বটে কিন্তু একে একে দশ বারো দিন কেটে গেল, ডিউটি নিয়ে মিস লরিকে কোনরকম কারসাজি করতে দেখা গেল না । এমন কি বান্ধবীদের প্রতীক্ষিত উত্তেজনাও মিইয়ে যেতে লাগল । ক্যাপ্টেন নন্দীর সঙ্গে হলএ করিডোরে অথবা রেস্তোরাঁয় তিন চারদিন দেখা হয়েছে মালা বিশ্বাসের—তাকে লক্ষ্য করেছে সে, হেসেছে মৃদু মৃদু । সেই সঙ্গে তার সঙ্গী-সাথীরাও ফিরে ফিরে তাকিয়েছে তার দিকে। নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করেছে । মালা বিশ্বাসের মনে হয়েছে বিড়াল যেমন ইঁদুর ছেড়ে দিয়ে মজা দেখে,

তেমনি মজা দেখছে লোকটা। সুযোগ পেলেই সে-যে তাকে অপমান করবে তাতে একটুও সন্দেহ নেই। অথচ, সে-রকম কোনো লক্ষণ দেখছে না। সুযোগ চাইলে সুযোগ পেতে ক্যাপ্টেন নন্দীর বেগ পাওয়ার কথা নয়।

আর, আরো আশ্চর্য, লোকটা যে বিদেশে চলে যাচ্ছে না সে-জন্য মালা বিশ্বাস আর একটুও উদ্বিগ্ন নয়। উল্টে কি হয় তাই দেখারই প্রতীক্ষা।...সে যে ছুটি ক্যানসেল করেছে তাও জেনেছে নিশ্চয়! মিস লরি সর্বদাই দু'কূল বজায় রাখতে ওস্তাদ। দেখা যাক।

কিন্তু ওপরঅলার চক্রান্ত অন্যরকম। হঠাৎ এরই মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলাফল মালা বিশ্বাসের এই মানসিক অবস্থার অনুকূল। বিধাতা নিতান্ত সদয় না হলে এমন বড় ঘটে না। প্রতিশোধ আবার যেন সে-ই নিতে পারে।

ঘটনার মূলে ক্যাপ্টেন ডিক্রুজ। আর ঘটনাটাও বলতে গেলে ন্যক্কারজনক। মালা বিশ্বাস অভিনেত্রী নয়। কিন্তু তাকে অভিনয় করতে হয়েছিল। সেই অভিনয়ে হাওয়াই জাহাজ ভরতি যাত্রীকে সে বিষম ত্রাস থেকে রক্ষাই করেছিল। আর তার ফলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপার যা দাঁড়াল তার জন্য ডিক্রুজের ওপর রাগ করবে কি তাকে ধন্যবাদ দেবে, মালা বিশ্বাস জানে না।

কুচবিহার থেকে যাত্রী নিয়ে কলকাতায় আসছিল হাওয়াই জাহাজ। সন্ধ্যা হয় হয় তখন। মেজাজপত্র কি কারণে সেদিন খারাপ ছিল ডিক্রুজের কেউ জানে না। এয়ারক্রাফটএ এসে উঠল যখন তার মুখ দেখে সকলেরই কেমন সন্দেহ হয়েছিল। মালা বিশ্বাসেরও। এই মুখ সে চেনে। ডিক্রুজের এই বিশৃঙ্খল হাবভাব, এই ঘোলাটে চাউনি সে অনেক দেখেছে। কো-পাইলট বিড়ম্বিত মুখে ক্যাপ্টেনের কানে কানে কি বলতে গিয়ে একটা কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে সরে গেল। ক্যাপ্টেনের মেজাজ উঁচু পরদায় বাঁধা।

হাওয়াই জাহাজ বাতাসে ভাসল।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ত্রাস সকলের। মালা বিশ্বাসেরও। এ কি কাণ্ড! সর্বরকমের স্বাভাবিক নিরাপত্তা বোধের মধ্য দিয়েই হাওয়াই জাহাজ আকাশে উড়েছে। কোনো দুর্যোগ নেই, আকাশে মেঘটুকুও নেই, কিন্তু এয়ারক্রাফট এমন অস্থির কেন! দাঁড়িয়ে থাকা ছেড়ে বসে থাকাও যাচ্ছে না, যেন তুমুল অশান্ত নদীর মধ্যে নৌকা ওলট-পালট খাচ্ছে একটা। শশব্যস্ত হয়ে যে যার বেল্ট বেঁধে নিয়েছে, কিন্তু তবু লণ্ডভণ্ড অবস্থা সকলের!

টাল সামলাতে সামলাতে কোনরকমে ককপিটের দিকে ছুটল মালা বিশ্বাস। সেখানে ক্যাপ্টেনকে নিয়ে হিমসিম অবস্থা কো-পাইলট আর ক্রুদের। তারা তাকে কিছুতেই চালকের আসন থেকে তুলে আনতে পারছে না—ক্যাপ্টেন গালিগালাজ করে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে তাদের। তারপরেই হা-হা শব্দে হেসে উঠছে! সকলকে ভয় পেতে দেখেই যেন তার ফূর্তি ধরে না। মহা আনন্দে নানারকম কসরত দেখাতে দেখাতে এরোপ্লেন চালাচ্ছে সে। কারো নড়াবার সাধ্য নেই তাকে।

ডিক্রুজের মেজাজ এত খারাপ ছিল যে, কাজে আসার আগে এক পেট মদ গিলে এসেছে। আর হাওয়াই জাহাজ বাতাসে ভাসার খানিকক্ষণের মধ্যে মেজাজ এত ভালো হয়ে গেছে যে ফূর্তির চোটে খেলনার মত নানা-রকম কসরত দেখাতে শুরু করেছে হাওয়াই জাহাজ নিয়ে। যত দেখাচ্ছে ততো ফূর্তি বাড়ছে তার। সেই ফূর্তির জের সামলাতে প্রাণান্ত

অবস্থা সকলের !

মালা বিশ্বাস ছুটে আবার বাইরে এল । যাত্রীদের মধ্যে ততক্ষণে সোরগোল পড়ে গেছে । তাদের আশ্বাস দিতে চেষ্টা করল সে—কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে নিজেই আছাড় খাওয়ার দাখিল । যাত্রীদের একজনের গায়ের ওপর পড়তে পড়তে সামলে নিল । কি বোঝাতে এসেছিল বা বলতে এসেছিল ভুল হয়ে গেল ।

ওদিকে সহকর্মীরা প্রমাদ গুনছে । বেশি জোর করে তাকে তুলে আনতে চেষ্টা করলে যন্ত্রপাতি নিয়ে কি বিপদ ঘটিয়ে বসবে ঠিক কি । ওখান থেকে তাকে তুলে আনতে না পারলে জোর করবে কেমন করে ? নিজের সীট আঁকড়ে বসে আছে ডিক্রুজ, সহকর্মীদের মতলবও বুঝতে পারছে ।

নেভিগেটর এসে মালা বিশ্বাসকে আবার ককপিটে ধরে নিয়ে গেল । ধরে নিয়ে গেল তার কারণ, এমনি হাঁটতে গেলে পতনের সম্ভাবনা । কো-পাইলট ডেকেছে তাকে—এক্ষুনি । কো-পাইলট শিবলাল ইশারায় মিনতি জানালো, কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা দেখুন —নইলে বিপদ অনিবার্য ।

কো-পাইলট শুধু ডিক্রুজের আড়ালে দাঁড়াল ; অন্য সকলে সরে গেল । শিবলালই তাদের সরে যেতে ইঙ্গিত করেছে । তারা জানে এই ত্রাসের মুহূর্তে কি দরকার । মালা বিশ্বাস থমকালো দুই এক মুহূর্ত, ইঙ্গিতটা বুঝেছে । প্রাণের দায় । তার একার নয়, অনেকের । মালা বিশ্বাস কি করবে ? ভাববে ? কিন্তু ভাবনার অবকাশ কোথায় ?

হাসি—হাসি চাই, হাসা যে এত কষ্টসাধ্য কে জানত । কি রকম হেসেছিল, কতটা হেসেছিল কে জানে । শিবলাল অবশ্য ওই হাসির অনেক প্রগলভ বিস্তার বিশ্লেষণ করেছে পরে । হাসিমুখে মালা বিশ্বাস ক্যাপ্টেনের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুঁকল মুখের কাছে ।

ডার্লিং, কি করছ, মারবে নাকি সকলকে ?

বিস্ময়ে আনন্দে এমন চমকেছে ডিক্রুজ যে, তাতেও এয়ারক্রাফট ডিগবাজি খাওয়ার উপক্রম । কিন্তু অভ্যস্ত হাতেই সামলে নিল । কিন্তু তবু সে জেগে আছে কি স্বপ্ন দেখছে কি মদের নেশা ধরেছে ভেবে পাচ্ছে না । জিজ্ঞাসা করল, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট হিয়ার ।

ওয়ান্ট ইউ টু লিভ—এরই মধ্যে মরার সখ কেন ? উঠে এসো !

বাট ইউ হেট্ মি ! ডিক্রুজের সংশয় ঘোচে না তবু ।

পাগল নাকি, আই অ্যাডোর ইউ । তুমি একটি আস্ত বোকা তাই বোঝনা । মালা বিশ্বাসকে আরো ঝুঁকতে হয়েছে, অভিনয় আরো নিটোল নিখাদ করে তুলতে হয়েছে । মদের ঝাঁঝে বিষম অস্বস্তি বোধ করছে সে, কিন্তু ঝুঁকে তার গালে গাল ঠেকাতে হয়েছে ।

রিয়েলি ? ডিক্রুজ অবাক ।

রিয়েলি ডার্লিং ।

ডিক্রুজ উৎফুল্ল, দেন, লেট্ আস্ ডাই, উইল ইউ ?

নো ! মালা বিশ্বাস আঁতকে উঠল, মরব কেন, আনন্দ করে বাঁচব— কি চালিয়েই চলেছ সেই থেকে, আমার কাছে চলে এসো বলছি ! সেই থেকে মুখ সেলাই করে বসে আছি —এসো বসে একটু গল্প করি ।

সানন্দে এবার ঘাড় ফেরাল ডিক্রুজ। কো-পাইলট ওদিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। বিপদ ভুলে হাঁ করে শিবলালও অভিনয় দেখছে। তার এই দেখাটা মালা বিশ্বাসের লক্ষ্য করার কথা নয়, করেও নি। ডিক্রুজ হাঁক দিল, ইউ ব্লাডি ফুল। কাম অন, টেক চার্জ।

চমক ভেঙে আত্মস্থ হল কো-পাইলট। সে উঠতে চালকের আসন নিয়ে বাঁচল।

মালা বিশ্বাসের কাঁধ জড়িয়ে ধরে ডিক্রুজ ককপিট থেকে বেরিয়ে এলো। সে সত্যিই হাওয়ায় ভাসছে, তার আনন্দ ধরে না। প্লেন তখন ঠাণ্ডা হয়েছে। একজন অসুস্থ লোককে যেন নিয়ে আসছে তেমনি করে তাকে ধরেই নিজের সিটের দিকে অর্থাৎ ল্যাজের দিকে নিয়ে আসা হল। ইশারায় মালা বিশ্বাস যাত্রীদের আশ্বস্তও করল একটু। তারা হতভম্ব, কিছুই বুঝছে না।

জায়গায় এসে সামনের ক্লোকরুম দেখিয়ে দিয়ে অস্ফুট গলায় ডিক্রুজকে বলল, কি-সব ছাই-ভস্ম খেয়েছ, আগে ভিতরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসো ভালো করে।

ডিক্রুজ হাসিমুখে ক্লোকরুমে ঢুকতেই বাইরে থেকে ছিটকিনি টেনে দিল সে। ঘেমে নেয়ে গেছে ততক্ষণে। শ্রান্ত। একটা প্রাণান্তকর ধকল গেল যেন তার ওপর দিয়ে।

অন্য ক্রুরা তখন যাত্রীদের বোঝাচ্ছে, একটা এঞ্জিনে সামান্য একটু গোলযোগ হয়েছিল, তার ওপর ক্যাপ্টেনও হঠাৎ বেজায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কারো কিছু ভাবনা নেই, এবার নির্বিঘ্নে পৌঁছুনো যাবে।

যাত্রীরা কি বুঝল তারাই জানে। নিজেদের প্রাণের ভাবনায় ব্যাকুল তারা, ক্যাপ্টেন অসুস্থ হয়েছে, কো-পাইলট কেমন চালায় সেই চিন্তা আর সেই প্রশ্ন তাদের। ওদিকে এরোপ্লেনের গর্জনে ক্লোকরুমের ভেতরে দরজা ধাক্কা-ধাক্কির আওয়াজ তেমন শোনা যাচ্ছে না। মোট কথা, সব মিলিয়ে গোটা ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হবার আগেই, অর্থাৎ পরের আধঘন্টার মধ্যে এয়ারক্রাফট নির্বিঘ্নে এযারপোর্টে ল্যাণ্ড করেছে।

তারপর তাড়াতাড়ি যাত্রীদের নামিয়ে বিদায় করার জন্য ব্যস্ত হয়েছে সকলে। শেষে এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ডিক্রুজকে।

নতুন উত্তেজনা আর উদ্দীপনার খোরাক পেল সকলে। এ বৈচিত্র্যের তুলনা নেই। ফিরে আসার পর ব্যাপারটা সেই রাতেই রটে গেল। আর পরদিন কর্মচারীদের মধ্যে সরগরম জটলা শুরু হয়ে গেল। দুর্নিবার কৌতূহলে হাওয়াই হোস্টেসরা সব মালা বিশ্বাসকে পাল্লা দিয়ে জেরা করতে লাগল।

ককপিটে প্রেম? একেবারে প্রচণ্ড প্রেম নাকি!

সে কেমন?

সে কতখানি?

সে কতক্ষণ?

রঙ ফলিয়ে ঘটনাটা জীবন্ত করে তুলেছে কো-পাইলট শিবলাল। প্রহসনের একেবারে প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা সে-ই। ডিক্রুজকে তুলে আনার পর বিমান সে নিরাপদে চালিয়ে এনেছিল। ছোকরার বয়েস বড়জোর পঁচিশ, মিষ্টি চেহারা, মুখ না খোলা পর্যন্ত লাজুক লাজুক ভাব। আর মুখ খুললে কথার সাগর! মধ্যপ্রদেশে বাড়ি, নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে শিভ-অ লাল।

কেবল নিজের নামটা ছাড়া বাঙালীর মতই গড়গড় করে বাংলা বলে ।

সেই শিভ্-অ লালের শুধু যে মুখ খুলে গেল তাই নয়—রাতারাতি সে পরম ভক্ত হয়ে পড়ল মালা বিশ্বাসের । পরদিন সকাল দশটা না বাজতে সে একেবারে তার বাড়ি এসে হাজির । মালা বিশ্বাস ততক্ষণে বান্ধবীদের গোটা পাঁচেক টেলিফোনের জেরা সামলেছে ।

শিবলাল তার বাড়িতে আর কখনো আসেনি, এই প্রথম । সংকোচ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল, কিন্তু সামনাসামনি এসে মুখের নরমসরম লাজুক ভাব চট করে কাটিয়ে উঠতে পারল না । ছেলেটাকে সকলে পছন্দ করে, বয়স্ক সঙ্গীরা ওকে নানাভাবে জব্দ করে মজা দেখে । জব্দ হবার মত ইন্ধন শিবলাল নিজেই জোগায় ওদের । সে-সব হাসি কৌতুকে মালা বিশ্বাস যোগ দেয় অনেকসময় । সিনিয়ার লোকদের আগ্রহের ভিড় ঠেলে ইচ্ছে থাকলেও এতদিন ছোকরা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি । ফাঁক পেলে আড়ে আড়ে দেখে তাকে । সে লক্ষ্য করেছে, ছদ্ম ভ্রূকুটিও করেছে এক-আধ সময়, আর তখুনি শিবলাল লজ্জায় অধোবদন হয়েছে । মালা বিশ্বাস অবশ্য গায়ে মাখেনি, এ-সবে ভ্রূক্ষেপ করলে আর চাকরি করতে হত না ।

শিবলাল ঘরে ঢোকামাত্র মালা বিশ্বাস চোখ পাকালো, তুমি কি বলে বেড়াচ্ছ চারদিকে —অ্যাঁ ?

প্রথমেই জবাব দিতে পারল না, লাজুক মুখে হাসল শুধু । সম্ভব হলে গতকাল রাত্রিতেই সে ছুটে আসত এখানে । আজ অনেকক্ষণের চেষ্টায় মনে বল সংগ্রহ করে শেষে এসেই পড়েছে ।

তারপর, হঠাৎ কি মনে করে ?

বলল, কাল থেকেই কেবল তোমার কথা ভাবছি, তুমি অদ্ভুত কাণ্ড করেছ কাল, সিম্প্‌লি ওয়াণ্ডারফুল—এতগুলো লোক তোমার জন্যই প্রাণে বাঁচল ।

হুঁ ? আর সেই কৃতজ্ঞতায় সকলের কাছে তুমি যা-তা বলে বেড়াচ্ছ ?

কি যা-তা ? শিবলাল হাসতে লাগল, আমি ঠিক কথাই বলেছি । ডিক্রুজের যেটুকু লাভ হয়েছে সেই টুকুর লোভেই ক্যাপ্টেনরা সব মদ খেয়ে ককপিটে বসতে পারে এর পর থেকে । অবশ্য যদি তুমি সেই হাওয়াই জাহাজে থাকো ।

এই কথাই বলে বেড়াচ্ছে ও । সেটা মালা বিশ্বাসেরও কানে এসেছে । সত্যি সত্যি চোখ পাকালো, খুব পেকেছ দেখছি, বয়স কতো ?

পঁচিশ । গো-বেচারী মুখ শিবলালের ।

ধমকের সুরেই মালা বিশ্বাস বলল, এখনই এই, পুরোদস্তুর ক্যাপ্টেন হলে কি করবে ? হাসল, তোমার থেকে কম করে তিন বছরের বড় আমি, মনে রেখো ।

কিন্তু শিবলালের মনে রাখার ইচ্ছে নেই খুব । হাসতে লাগল সেও, বলল, কোম্পানীর খাতায় নিশ্চয় ঠিক বয়েস লেখোনি, সেটা খুললে হয়ত দেখব তুমি সত্যি কথা বলছ না । আমি চোখে দেখে বয়েস আন্দাজ করি, অন্য বয়েস বিশ্বাস করি না ।

মালা বিশ্বাস বিরক্ত হল মনে মনে, সত্যি কথা বলেছে বলে নয়, তার এই অভিভূত হাব-ভাব দেখে । আর, এখনো চেয়ে চেয়ে দেখছে—যেন এমন আর ভূ-ভারতে দেখেনি ।

ডিক্রুজের সঙ্গে কাল কপট প্রেমের প্রহসন দেখেই মুণ্ডু আরো ঘুরেছে সন্দেহ নেই ।

মুখে কথাও ফুটেছে ।

জিজ্ঞাসা করল, ডিক্রুজের খবর কি ?

ডিক্রুজ প্রসঙ্গ বিস্তারের খুব একটা উৎসাহ বা আগ্রহ নেই শিবলালের । বলল, কি আর খবর, ডিটেনশনে আছে ! বিচার হবে, চাকরি যেতে পারে, জেলও হতে পারে ।

এর থেকে বেশি কিছু হলেও মালা বিশ্বাস দুঃখিত হবে না । গত সন্ধ্যার কথা মনে হলে এখনো গা ঘিনঘিন করে তার । লোকটার সুরাসিক্ত ঠোঁটের চকিত স্পর্শে এখনো যেন একদিকের গালটা জ্বলে যাচ্ছে । তার বাহুবেষ্টনে ককপিট থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বমুহূর্তের লোলুপ স্পর্শ আরো নিবিড় হয়ে উঠতে চেয়েছিল । বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ ধরে চান করতে হয়েছে । তবু রাগ পড়েনি, জ্বালা জুড়োয়নি । কাল যদি শুনত ফাঁসী হবে ডিক্রুজের, তবু বোধহয় মন নরম হত না ।

ওদিকে শিবলাল নিজেই প্রস্তাব করল, এক পেয়ালা চা খাওয়াবে ?

অর্থাৎ তার চট করে ওঠার বাসনা নেই । মালা বিশ্বাস তার চোখে চোখ রেখে হেসে ফেলল ।—অগত্যা । স্টোভ ধরাবার উদ্যোগ করতে করতে আবার বলল, চা খেয়ে চটপট সরে পড়ো, আমার অনেক কাজ, এক্ষুনি বেরুব ।

শিবলাল হৃষ্টচিত্তে বলল, আর কিছুদিন বাদে পুরোদস্তুর পাইলট হলে আর একটু বেশি খাতির পাব বোধহয়, এখন এইটুকুই যথেষ্ট ।

তারপর আরো কত কথা বলে গেল সে ঠিক নেই । যেমন গত কালের ওই ব্যাপারটা একটা কাগজে ছাপিয়ে নিয়ে সকলকে বিলি করলে ঠিক হয় । গত কাল থেকে এই এক ঘটনা সকলকে বলতে বলতে মুখে ব্যথা ধরে গেছে তার । আর বলাটাও ঠিক এক রকম হচ্ছে না । হবে কেমন করে, ককপিটে মিস বিশ্বাস যা করেছে কাল, সে-কি হাজার রকম করে বললেও ঠিক বলা হয় । ক্যাপ্টেনের আসনে বসার পর শিবলালের হাতেই যে আবার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়নি সেটাই আশ্চর্য ।

মালা বিশ্বাস শুনেছে, হেসেছে, ভ্রূকুটি করেছে । কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে ! ডিক্রুজের জেল হতে পারে শোনার পর সে এখন অন্য কথা ভাবছে । ভাবছে আর একজনের কথা । মনে মনে এক ধরনের আনন্দই হচ্ছে তার । প্রাণের বন্ধুর এই বিপদ কানে যায়নি ? ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী এখন কি করছে ? সকলকে ছেড়ে তার মুখখানাই এখন একবার দেখতে ইচ্ছে করছে মালা বিশ্বাসের ।

দেখা গেল পরদিনই । এই বাড়িতে । এই ঘরে । মালা বিশাস এ-জন্যে একটুও প্রস্তুত ছিল না ।

পরদিন একটু সকালেই ঘুম ভেঙেছিল মালা বিশ্বাসের । ডিক্রুজের সম্পর্কে আজ তাকে স্টেটমেন্ট দিতে হবে । সব কর্মচারীরই লিখিত স্টেটমেন্ট তলব করা হয়েছে । হাত মুখ ধুয়ে মালা বিশ্বাস একটা খসড়া করবে ভাবছিল, অন্য ক্রুরা কি লিখল তাও জানা দরকার ।

জানলা দিয়ে উল্টো দিকের তিনতলা বাড়িটার ছাদের দিকে চোখ পড়তেই বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল । বছর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের একটি বাঙালী ভদ্রলোক রোজ সেখানে দাঁড়িয়ে

হাওয়া খায়, আর জানলার পর্দার ওপরে আধ-বিঘত ফাঁক দিয়ে ড্যাবড্যাব করে এই ঘরের দিকে চেয়ে থাকে। এ-বাড়িতে আসার পর থেকে দিনের পর দিন এই একই দৃশ্য দেখে আসছে। ভদ্রলোক কোথায় ভালো একটা চাকরি করে শুনেছে, কিন্তু বিয়ে করেনি। আলাপ থাকলে তাকে বলে দিত, এই রোগের থেকে এখনো বিয়ে জোটে কি না সেই চেষ্টা দেখা ভালো। মালা বিশ্বাস অনেক দিন ভেবেছে একটা বড় পর্দা কিনে জানলাটা গোটাগুটি ঢেকে দেবে। কিন্তু কেনা হয়ে ওঠেনি, তাছাড়া দেখতেও বিচ্ছিরি হয়। লোকটা ওখানে দাঁড়াবার আগে উঠে জানলা বন্ধ করে আবার শোয়া নৈমিত্তিক কাজ তার।

উঠে বসে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জানলাটা বন্ধ করবে ভেবেও শেষ পর্যন্ত করল না। শুধু অপমান করা ছাড়া এখন আর জানলা বন্ধ করার কোনো মানে হয় না —দেখুক গে। হাত-মুখ ধুয়ে চায়ের ব্যবস্থায় মন দিল সে।

সবে তৈরি চায়ের পটটা নিয়ে বসেছে, সিঁড়িতে ভারী পায়ের আওয়াজ। মালা বিশ্বাস কান খাড়া করল, শব্দটা পরিচিত মনে হল না। আজও ওই শিবলালই আসছে ভাবল। এ-সময় কে আর আসবে। বিরক্তি চেপে দরজার দিকে তাকালো সে।

ভিতরে আসব? দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী।

মালা বিশ্বাস হকচকিয়ে গেল কেমন।—আসুন। অস্ফুট আহ্বান জানালো।

সুপ্রভাত! চায়ের পট দেখে খুশি যেন।—সুসময়েই এসে গেছি, পাব তো?

হাসতেও পারা গেল না, জবাব দিতেও না। উঠে আর একটা পেয়ালা নিয়ে এলো শুধু। এমন অপ্রত্যাশিত আগমনের হেতু অনুমান করতে পারছে মালা বিশ্বাস। ভিতরটা কঠিন হয়ে উঠছে, আবার অজ্ঞাত অস্বস্তিও কেমন। চা ঢেলে পেয়ালাটা তার দিকে এগিয়ে দিল। একটা ডিশে খান কয়েক বিস্কুটও। তারপর নিজের জন্য চা ঢালল। শোনার জন্য প্রস্তুত।

সহজমুখে হাত বাড়িয়ে সবিতাব্রত পটের ঢাকনা তুলে উঁকি দিল একবার। আরো একটু চা আছে। বলল, আপনি অনেক চা খান দেখছি, আজ ভাগাভাগি হয়ে গেল।

সে-রকম মেজাজী কথাবার্তা নয়। মালা বিশ্বাসের ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস উঁকিঝুঁকি দিয়েও দিল না। কালই রাত্রিতে ভাবছিল দেখা হলে ভালো হত। আজই দেখা হয়ে গেল। এই সহজতা খুব স্বাভাবিক মনে হল না তার। হঠাৎ বাড়ি বয়ে আসার উদ্দেশ্য কিছু আছেই। সামনের দিকে তাকাতেই তিনতলার ছাদের লোকটার দিকে চোখ গেল। আর বিরক্তিতে চোখমুখ কুঁচকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আগন্তুক দেখে ছাদের লোকটা উদ্‌গ্রীব মুখে বেশ কসরত করে ঘাড় উঁচিয়ে পর্দার ওপর দিয়ে নিরীক্ষণ করতে চেষ্টা করছে।

সম্মুখবর্তিনীর হঠাৎ এই মুখবিকৃতি দেখেই ঈষৎ বিস্ময়ে সবিতাব্রত তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফেরাল। বেগতিক দেখে ছাদের লোক সরে গেল।

কি ব্যাপার, লোকটা কে?

মালা বিশ্বাস মুহূর্তের জন্য থতমত খেল একটু। কিন্তু পরক্ষণে হাসতেও পারল। বলল, আমার একটি ভক্ত। রোজ ওখানে দাঁড়িয়ে চুপচাপ আমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ইচ্ছে করেই বলল। হাওয়াই হোস্টেসদের যে চোখে দেখে এই ক্যাপ্টেন, সেই চোখেই দেখালো নিজেকে।

আপনারা আছেন বেশ ।

এবারের কণ্ঠস্বর বা হাসিটুকু একেবারে শ্লেষশূন্য মনে হল না মালা বিশ্বাসের । চায়ের পেয়ালার ওপর দিয়ে দেখে নিল এক নজর ।—হ্যাঁ । তা আপনি হঠাৎ এ-সময়ে যে ?

এলাম একটু বিশেষ দরকারে । পেয়ালাটা শেষ করে নামিয়ে রাখল ।—আপনার ঘুম ভেঙেছে কি না ভাবতে ভাবতে আসছিলাম । এর বেশি কোনরকম ভনিতা না করে এ-সময়ে আসার উদ্দেশ্যটা সোজাসুজি ব্যক্ত করল । বলল, ডিক্রুজকে একটু সাহায্য করা দরকার, আচ্ছা বিপদ বাধিয়েছে ।

শোনামাত্র আবার একটা কঠিন প্রস্তুতি শুরু হল মালা বিশ্বাসের ভিতরে ভিতরে । কিন্তু এই মুহূর্তেই সেটা বুঝতে দেবার ইচ্ছে নেই । আগে আরো শোনা দরকার কি বলে । নির্লিপ্ত ঠাণ্ডা গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল, আমি কি করতে পারি ?

আপনি অনেক করতে পারেন । আর সব যারা ছিল তাদের আমি অনেকটা ঠিক করে এসেছি । এ-টুকু বলে সবিতাব্রত হাসিমুখে মহিলার নিস্পৃহ অভিব্যক্তিটুকু লক্ষ্য করে নিল একবার । তারপর সুপারিশের চেষ্টায় এগলো—ডিক্রুজের মেজাজপত্র আর শরীরও খুব ভালো ছিল না ঠিকই, ওর পকেটে ডাক্তারের অ্যালকহল মেশানো মিক্সচারের প্রেসক্রিপশনও ছিল । গাধাটা ভাবলে তাহলে আর ওষুধ খেয়ে কি হবে, নির্ভেজাল জিনিসটাই গলায় ঢেলে তাজা হওয়া যাক । একবার খেতে আরম্ভ করলে ওর মাত্রাজ্ঞান থাকে না । এয়ারক্রাফটএ আর যারা ছিল তারা সত্যিই খুব পছন্দ করে না ওকে, তবু হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এ-কথাই লিখতে রাজি হয়েছে তারা । কো-পাইলট শিবলাল অবশ্য শর্ত করে নিয়েছে, আমার এয়ারক্রাফটএ টেনে আনতে হবে তাকে—আমার কাছে কাজ শেখার খুব শখ তার ।

মালা বিশ্বাস গম্ভীর প্রশ্ন ছুঁড়ল, আমিও এ-রকম কোনো শর্ত করব ভাবছেন ?

সবিতাব্রত অপ্রস্তুত । —ও নো । হেসে উঠল সে, ওটা কথার কথা বললাম ।

কিন্তু ও-রকম একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন অপদার্থ লোকের জন্য আপনি এই অন্যায় চেষ্টা করছেন কেন ?

না করলে বেচারার চাকরি যাবে, জেলও হতে পারে ।

মালা বিশ্বাসেরই যেন দিন আজ । অনেক কিছুর জবাব দেবার দিন । বলল, ওই লোকটা বেচারা একটুও নয়, ওরকম পাইলটের চাকরি যাওয়াই উচিত, জেল হওয়াও উচিত । এতগুলো লোকের প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে খেলা নাকি !

সবিতাব্রত গম্ভীর । ঈষৎ অসহিষ্ণুও । বলল, দেখুন উচিত অনুচিত সময়-বিশেষের ব্যাপার, সময়ে অনুচিত কাজ করতে হয় । আপনি যে-ভাবে ওকে ভুলিয়ে তুলে এনেছেন শিবলালের মুখে শুনেছি—সময় বিচার না করলে ওই কাজও তো অনুচিত । কিন্তু অবস্থার ফেরে আপনার ওই অনুচিত কাজটাই একমাত্র উচিত কাজ হয়েছে তখন । হয়নি ?...এখন ওকে সাহায্য করাটাও অনেকটা সেই রকম ব্যাপার ।

বলল বটে, কিন্তু মালা বিশ্বাসের মনে হল একটুও শ্রদ্ধা নিয়ে বলল না । কথার ভাবে মনে হবে, অবস্থার ফেরে তাদের মত মেয়েরা অনায়াসে সকলের চোখের ওপর দিয়ে নগ্ন প্রণয়ের এ-রকম অভিনয়ও করে উঠতে পারে যখন, তখন দোষটা বড় করে না দেখে এটুকুই বা করতে বাধা কি । সেই সন্ধ্যার প্রহসন শিবলাল খুব ঘটা করেই বিস্তার করেছে

বোধহয় ।

উষ্ণ জবাবই দিল । বলল, না, সে-রকম ব্যাপার নয় । সেখানে বাঁচা-মরার প্রশ্ন ছিল ।

এখানেও বাঁচা মরারই প্রশ্ন । সবিতাব্রত হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক একটু । কিছু ভাবছে মনে হল । তারপর ডিশ থেকে একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে ডিশের ওপরেই ওটা দিয়ে ঠুক-ঠুক শব্দ করল কয়েকটা । তারপরে বলল, ডিক্রুজ এক নম্বরের ব্লাডি সোয়াইন, আমি জানি । ...কিন্তু ওর একটা বউ আছে ভারি ভালো, আর বাচ্চা মেয়ে আছে একটা—সো সুইট । ক্ষতিটা ওদের হবে, চাকরি গেলে এ লাইনে আর কাজ পাওয়া শক্ত হবে । আমি শুধু তাদের কথা ভেবেই ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করছি ।

মালা বিশ্বাস বিস্মিত হল একটু । কিন্তু কি এক অজ্ঞাত উষ্ণ অনুভূতিই বড় হয়ে উঠল পরমুহূর্তে । এই উক্তির মধ্যেও তাদের প্রতি কিছু একটা তির্যক ইঙ্গিত আবিষ্কার করা গেল যেন । ব্যঙ্গভরা দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর রাখল ।—আপনাব মতে তাহলে ভালো বউ আর মিষ্টি মেয়ে থাকলে খুন করেও রেহাই পাওয়া যেতে পারে ?

নিজে বাড়ি বয়ে অনুবোধ করতে এসেছে, ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী এটুকুই যথেষ্ট ভেবেছিল । তা'ছাড়া এরোড্রোম রেস্তরাঁয় সেদিনের সেই ভালোলাগাটুকুর ওপরেও নিজের অজ্ঞাতে একটু নির্ভর করেছিল হযত । প্রশ্নের ছলে এই অকরুণ উক্তি শুনে চিরাচরিত অসহিষ্ণুতায় গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল সে । বলল লিসন্ ম্যাডাম, এখানে এসে আপনাব সঙ্গে নীতির আলোচনা করাটা আমার ঠিক উদ্দেশ্য নয়, ডিক্রুজের কিছু হবে না বলেই আমার বিশ্বাস—অন্য সকলের মত আপনিও যদি অসুস্থতার কথা লিখে দেন তো খুশি হই ।

মালা বিশ্বাস তক্ষুনি জবাব দিয়েছে, আমি আপনাকে খুশি করার কথা ভাবছি না, আমি নীতির দিকটাই ভাবছি ।

কয়েক মুহূর্তের নিঃশব্দ্ দৃষ্টি-বিনিময় । ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত হাসিমুখেই উঠে দাঁড়াল : —ভাবুন তাহলে । ভাবনার পর আপনার ডিসিশনটা যদি অনুকূল হয় তা'হলে কষ্ট করে আমাকে জানাতে চেষ্টা করবেন একটু ।

উঠে দরজার দিকে এগলো । এই পদক্ষেপও দাম্ভিক মনে হল মালা বিশ্বাসের । অপ্রসন্ন দৃষ্টিটা দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করে ফিরে এলো । কর্তৃপক্ষ আর অন্যান্য ক্রুদের হাত করে থাকলে তার একলার স্টেটমেন্টএ কিছু ক্ষতি হবে না হয়ত কিন্তু হোক না হোক, মালা বিশ্বাস খাতির করবে না—যা ঘটেছিল তাই লিখবে । মদ খেয়ে মত্ত মাতাল হয়েছিল ডিক্রুজ, তাই লিখবে । আরো বেশি কিছু লেখা যায় কিনা তাও ভাববে ।

কিন্তু এয়ার পোর্টে পৌঁছে দেখল, সংকল্পের জোর আর তেমন নেই । নেই বলেই নিজের পরে উষ্মা । মুখে যা-ই বলুক ক্যাপ্টেন নন্দী, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তার করায়ত্ত হয়নি । তাদের এয়ারক্রাফটএর পাইলট শুধু বদলেছে আজ, অন্য সকলে ঠিকই আছে । এদের মধ্যে ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার আর রেডিও এঞ্জিনিয়ার ডিক্রুজের ওপর রীতিমত বিরূপ । ডিক্রুজের এই ব্যাপার নিয়েই আলোচনা চলছে তাদের মধ্যে । ক্যাপ্টেন নন্দীর অনুরোধ তারা রাখবে কি রাখবে না তখনো ঠিক করে উঠতে পারেনি ।

একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি তো এই রঙ্গমঞ্চের প্রধান, আপনি কি করছেন

মিস বিশ্বাস ? ক্যাপ্টেন নন্দী আপনাকেও নিশ্চয় কোনরকম অনুরোধ করেন নি ?

কি ভেবে মালা বিশ্বাস মুখে জবাবটা আর দিল না । হাসল শুধু । যা বোঝবার একটু আগের আলোচনা থেকেই বুঝে নিয়েছে । সে চেষ্টা করলে এদের তাতিয়ে তুলতে পারে মনে হল ।...আর ওই কো-পাইলট শিবলাল—যার ওপর ক্যাপ্টেন নন্দীর সব থেকে বেশি ভরসা—তাকে নিয়ে আধ ঘণ্টা রেস্তোরাঁয় গিয়ে নিরিবিলিতে বসলেই মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারে—মুণ্ডু ঘুরেই আছে । ওকেই অনায়াসে সব থেকে নির্দয় করে তোলা যেতে পারে হয়ত । কত বড় ক্যাপ্টেন ওই ক্যাপ্টেন নন্দী, সেটা বোঝাপড়া করে নেবার আগ্রহটা কয়েক মুহূর্তের জন্য অদম্য হয়ে উঠল মালা বিশ্বাসের ।

কিন্তু আগ্রহটা কেন যে দমন করল শেষ পর্যন্ত সেটা নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় খুব । তার জবাব শোনার জন্য সব থেকে বেশি উৎসুক কো-পাইলট শিবলাল । হাসিমুখে খানিক চুপ করে থেকে মালা বিশ্বাস নির্লিপ্ত জবাবই দিল । বলল, কি আর লিখব যা দেখেছি তাই লিখব—প্লেন চালাতে চালাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, আর আপনাদের নির্দেশে তাকে তুলে এনে ঘাড়ে মাথায় মুখে চোখে জল দিতে হয়েছিল—

ফ্লাইট এঞ্জিনীয়ার নিখাদ-বিস্ময়ে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ । তারপর সহাস্যে টিপ্পনী কাটল, ও আর কিছু দেখেন নি বা করেননি ?

হাসিমুখেই মালা বিশ্বাস চোখ কপালে তুলেছে ।—আর আবার কি ! পরে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মন্তব্য করেছে, কি হবে ঝামেলার মধ্যে গিয়ে । তাছাড়া শুনলাম তার ঘরে ভালো বউ আছে মিষ্টি মেয়ে আছে একটা । এ-টুকু দোষ ক্ষমা করাই উচিত ।

ফ্লাইট এঞ্জিনীয়ার অগত্যাই যেন মনের বাসনা বাতিল করে দিয়ে ঘোষণা করল, লেট্ আস দেন্ ফলো আওয়ার লেডী—সী ইজ্ দি সিম্বল অফ ট্রুথ অ্যাণ্ড বিউটি অ্যাণ্ড কাইণ্ডনেস । আঙুল দিয়ে শিবলালকে দেখিয়ে দিল সে, কিন্তু ওই ছোঁড়া বলেছে ও পাকাপোক্ত ক্যাপ্টেন হলে আর আপনি ওর হাওয়াই জাহাজে এয়ার হোস্টেস থাকলে ককপিটে বসে মদ খাবেই ও । আর. ডিক্রুজের থেকেও চারগুণ বেশি আদর না খেয়ে উঠে আসবে না, তাতে এয়ার-ক্রাফটই যাক আর জীবনই যাক আর চাকরিই যাক ।

শিবলাল তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল । মালা বিশ্বাস ছদ্মকোপে তাকালো তার দিকে, তারপর বলল, আপনাদের পাল্লায় পড়ে ও-ও অকালপক্ক হয়ে উঠেছে ।

রাত্রিতে শুতে যাবার আগে টেলিফোন বেজে উঠল । কোন ইমারজেন্সি ডিউটির কল্ এলো কিনা ভেবে শঙ্কিত চিত্তে রিসিভার তুলল মালা বিশ্বাস । ঠোঁটের ফাঁকে বক্র হাসির রেখা স্পষ্ট হল পরক্ষণে । কি এক উদ্‌গত আনন্দ দমন করল যেন । কিন্তু ঠোঁটের হাসিটুকু সমস্ত মুখে ছড়াতে লাগল ক্রমশ ।

তার সাড়া পেয়ে দরাজ গলায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী । বলছে, ফ্লাইট থেকে নেমেই শিবলালের মুখে শুনলাম খবরটা, অনেক অনেক ধন্যবাদ, ডিক্রুজকে আপনার অনুগ্রহের কথা জানাবো ।

মালা বিশ্বাস নির্দ্বিধায় জবাব দিয়ে বসল, অনুগ্রহটা ঠিক ডিক্রুজকে করা হয়নি ।

তাহলে আমাকে ! হা-হা হাসির শব্দ । এত জোরে রিসিভার সরাতে হল কান থেকে—তারপর খুশির উচ্ছ্বাস শোনা গেল । সো লাকি ! আরো অনেক অনেক ধন্যবাদ । বলেন

তো কালও একবার চা খেতে যাই ।

হাসছে মালা বিশ্বাসও । আর তার এতটুকু রাগ নেই ক্ষোভ নেই বিদ্বেষ নেই । কোথায় যেন একটা সম্ভ্রমজনক পরিবর্তন ঘটে গেছে । বলল, আসবেন, পটে চিরতার জল গুলে রেখে দেব ।

রিসিভার সে-ই আগে নামিয়ে রাখল । মুখের হাসি একসময় মিলিয়ে গেল বটে । কিন্তু তার পরেও ঠোঁটের ফাঁকের হাসিটুকু লেগে থাকল অনেকক্ষণ পর্যন্ত ।

।। নয় ।।

বাইরে থেকে বিচার করলে এর পরেও তেমন ব্যতিক্রম কিছু চোখে পড়বে না । মনে হবে জীবন এক স্রোতেই বয়ে চলেছে । কিন্তু বাইরের বিচারটাই সব নয় । জীবনের গতি যেন এক পারম্পর্যবিহীন শূন্যতার গহ্বর থেকে উঠে এসে কোনো নির্দিষ্ট কক্ষপথের দিকে ধীর মন্থর অথচ অমোঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ।

এই পরিবর্তনটুকু মালা বিশ্বাস সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে । মাঝে মাঝে সচকিত হয় । কখনো বা বিমনা হয় । নিজেকে দেখে । আর, যে দেখা দেয়, তাকে দেখে ।

মাস ঘুরে এসেছে । ডিক্রুজের সঙ্গে তার আর ডিউটি পড়েনি । কিন্তু এ নিয়ে লোকটা মিস লরিকে আর উত্যক্ত করেনি । অর্থাৎ, মালা বিশ্বাসকে তার হাওয়াই জাহাজে ডিউটি দেবার জন্য আগের মত আর পীড়াপীড়ি করেনি । তার চালচলন অনেকটা বদলেছে । বিপাকে পড়ে কিছুটা নম্র-সম্র হয়েছে । চুপি চুপি এসে মালাকে কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছে একদিন । বলেছে, ক্যাপ্টেন নন্দী আমাকে ওয়াইলড় মাংকি বলেছে, আর বলেছে মাংকিদের ওপর তোমার একটু সহানুভূতি আছে বলেই এ-যাত্রা বেঁচে গেছি ।

কিন্তু মালা বিশ্বাস সত্যি সত্যি তাকে ক্ষমা করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ । সে বিদায় হতে হাঁপ ফেলে বেঁচেছে ।

ক্যাপ্টেন নন্দীর কো-পাইলট প্রমোশন পেয়েছে । তার জায়গায় শিবলাল কো-পাইলট এখন । ক্যাপ্টেন নন্দী কথা রেখেছে । শিবলাল খুশি । নতুন করে আবার যেন হাওয়াই জাহাজ চালানোর পাঠ নেওয়ার আনন্দে মেতেছে সে । মালা বিশ্বাসের কাছে গল্প করেছে, ওই ক্যাপ্টেন গুণের একটি আস্ত খনি, কত যে শেখার আছে তার কাছে ঠিক নেই—এমন ব্যক্তিত্বই তো আর কারো দেখলাম না । এই ব্যক্তিত্বই মালা বিশ্বাসের সান্নিধ্যে এগিয়ে আসছে । ইচ্ছে করলে মালা বিশ্বাস হাত বাড়িয়ে এবারে তাকে আরো কাছে টেনে আনতে পারে বোধহয় । কিন্তু পারা কঠিন, ছেঁটে দেওয়া আরো কঠিন । লোকটার হাব-ভাব, ব্যবহার তেমন বদলায়নি । কিন্তু যে আচরণ একদিন দম্ভ বলে মনে হয়েছিল, আজ আর ঠিক তা মনে হয় না । হলেও সেই দম্ভকে বশীভূত করার মধ্যে এক ধরনের আনন্দ আছে । কিন্তু এই আনন্দ সম্বল করে কতদূর এগনো চলে ? মালা বিশ্বাস ভাবতে চায় না, কিন্তু ভাবনার ওপর দখল নেই তার । সেটা আপনি আসে । ভাবতে হয় ।

এই এক মাসের মধ্যে অনেক বার দেখা হয়েছে সবিতাব্রতর সঙ্গে । ব্যস্ত থাকলে হেসে চলে গেছে, অবকাশ থাকলে কাছে এসেছে, গল্প করেছে । না, এয়ার হোস্টেসদের

মর্যাদাবোধ নিয়ে তেমন কটূক্তি করেনি কখনো । হাসি মুখে বরং উল্টো কথা বলেছে। মেয়েদের মেজাজের আকাশে এক নতুন তারকার সন্ধান পেয়েছে বলে ঠাট্টা করেছে।

বাড়িতেও এলো আর একদিন । মালা বিশ্বাস সবে তখন চান করে উঠেছে । আর খানিক বাদে বেরুবে। ডিউটি আছে চেনাজানা সকলেই জানে সেটা । তাই এ-সময়ে কেউ আসতে পারে আশা করেনি। একে তো নয়ই । কারণ, যতদূর জানে তারও ডিউটি আছে। জিজ্ঞাসা করল, আপনার ফ্লাইট নেই আজ ?

ছিল ! ক্যানসেল করে দিয়েছি । নিশ্চিন্ত অবকাশের আনন্দে চেয়ার টেনে বসল। দু'চোখ তার মুখের ওপর থমকালো একটু ! এই মাত্র চান সেরে এসেছে সেটা খেয়াল করল । হাসি মুখে বলল, বছরের মধ্যে এই একটা দিনের তারিখ মনে থাকলে আমি সব ডিউটি বাতিল করে দিয়ে থাকি ।

মালা বিশ্বাসের কৌতূহল হল একটু । জিজ্ঞাসা করল, কিছু একটা আনন্দের দিন বুঝি ?

না, খুব দুঃখের দিন ।

কিন্তু আপনাকে দেখে তো দুঃখের দিন মনে হচ্ছে না ?

না । তেমনি সাদাসিধে জবাব দিল, দুঃখের দিন বটে, কিন্তু দুঃখ করলে যাঁর সঙ্গে এই দিনের যোগ তিনি আরো বেশি দুঃখ পাবেন মনে হয়—তাই এ-দিনটাও আমি আনন্দেই কাটাতে চেষ্টা করি । শুধু ফ্লাই করি নে, ব্যস, আর কিছু না ।

বিয়োগান্ত প্রেমের চিরাচরিত স্মৃতি কিছু শুনবে কিনা ভেবে বিস্মিত হচ্ছিল মালা বিশ্বাস । আর, এ-রকম ব্যাপাব তার এত জানা আছে যে শোনারও খুব আগ্রহ নেই । কিন্তু না, ও-প্রসঙ্গের সেখানেই শেষ । সবিতাব্রত জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আপনার ডিউটি আছে তো ?

হাঁ ।

বাতিল করে দিন না ।

প্রস্তাব শুনে মালা বিশ্বাস অবাক, আমি ডিউটি বাতিল কবব কেন ?

আমি অনুরোধ করছি বলে । মুখে না হোক চোখে হাসির আভাস, চাকরি তো করছেন অনেক কাল ধরে, ক্যাপ্টেনের অনুরোধ হেলাফেলা করতে নেই এও জানেন না ? গম্ভীর ।

অস্বস্তি গোপন করে মালা বিশ্বাস তেমনি হালকা সুরে পাল্টা জবাব দিল, অনেক কাল চাকরি করলেও এ-রকম অনুরোধ শুনতে খুব অভ্যস্ত নই । হাসল, আমি এ-রকম অন্যায় অনুরোধ করলে আপনি রাখবেন ?

বলতে পারি না, একদিন করে দেখুন । আই উইল ইগারলি ওয়েট ফর দ্যাট সর্ট অফ অনুরোধ । কিন্তু মেয়েরা সচরাচর তা করে না, তারা হিসেবী । হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল, আপনি ওদের জানাবেন, না আমি বলে দেব ?

সে ডিউটিতে যাবে না এই ফয়সালা যেন হয়েই গেছে । বিব্রত বোধ করলেও মালা বিশ্বাস এই নিয়ে কেন যে আর কথা বাড়ালো না, নিজেও জানে না । তাছাড়া ভেবে কিছু বলারও সময় নেই, রিসিভারটা তাড়াতাড়ি হাত থেকে নিয়ে নিল, এই লোক তার হয়ে ছুটি চাইলে ঢি-ঢি পড়ে যাবে । এ-সব ব্যাপারে তিল শুনলে তাল করতে ওস্তাদ সকলে । কানে কিছু গেলেই হয় । কিন্তু নম্বর ডায়েল করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ল আবার । জিজ্ঞাসা করল,

কি বলব ?

বলে দিন, এত শরীর খারাপ যে নড়তে পারছেন না, বিছানায় উঠে বসারও ক্ষমতা নেই ।

বিব্রত মুখে মাথা নাড়ল, এত মিথ্যে বলতে পারব না, শরীর আমার এত সহজে খারাপ হয় না ।

বলার সঙ্গে সঙ্গে থমকালো একটু মালা বিশ্বাস । তার এই উক্তি যেন দুটো চোখের দৃষ্টি তার শরীরের দিকে আমন্ত্রণ করে আনল, একটু আগেই ওই একাগ্র দৃষ্টি তার মুখের ওপর বার কয়েক সংবদ্ধ হতে চেষ্টা করছিল । তাড়াতাড়ি নম্বর ডায়েল করতে লাগল মালা বিশ্বাস ।...পুরুষের এই দৃষ্টি, এই চোখ সে চেনে । এই লোকের গোপনতার চেষ্টা নেই, নগ্নতার মধ্যেও পৌরুষের অভিব্যক্তি প্রবল, এটুকুই যা তফাত ।

সবিতাব্রত সানন্দে দ্বিতীয় রাস্তা বাতলে দিল, তা হলে বলুন, ক্যাপ্টেন নন্দী আটকে দিল ।

মালা বিশ্বাস আবার ফিরে তাকালো তার দিকে । অনায়াসলভ্য ভেবে লঘুচিত্ত ক্যাপ্টেনরা অনেক সময় যে দাপটে এগিয়ে আসতে চায়, এও সেই গোছের কিনা বুঝতে চেষ্টা করল । সে-রকম মনে হল না । তবু মনে হল, সে যেন দু'নৌকোয় পা দিয়েছে । টেলিফোনের রিসিভার হাতে তুলে নেবার পর এখন আর অফিসে যাবে বলতে পারছে না, আবার এ-ভাবে ডিউটি কামাই করতেও ইচ্ছে করছে না । অথচ ইচ্ছের বিরুদ্ধেই যেন করতে হচ্ছে ।

ডিউটিতে যাবে না শুনে ও-ধার থেকে মিস লরি সতের প্রশ্ন জুড়ে দিল । মালা বিশ্বাস শুধু বলল, বিশেষ কাজে আটকে গেছে, যাবার উপায় নেই, একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে । কি ব্যবস্থা করবে না করবে সেই দুশ্চিন্তা অবশ্য নেই মালা বিশ্বাসের । ক্যাপ্টেন নন্দী ফ্লাই করছে না যখন কমলা ব্যাস চীফ এয়ার হোস্টেসের হাতের কাছে মজুত আছে জানে ।

ফোন রেখে বলল, মিস লরি রেগে আগুন—

হৃষ্টচিত্তে সবিতাব্রত জবাব দিল, আগুন হলেও আপনাকে কিছু বলবে না । রাগ হলে ক্যাপ্টেন নন্দীকেও আপনি নীচ, ছোট, অভদ্র, ইতর বলে সম্ভাষণ করেন শোনার পর আপনাকে আর সে ঘাঁটাতে সাহস করবে না ।

মালা বিশ্বাস হেসে ফেলল । বলল, আপনি আমাকে কম বলেন নি ।

সবিতাব্রত হাসছে মৃদু মৃদু । খোঁচা খেলে এই মুখ দেখতে কেমন হয় জানে । সেই লোভেই সাদাসিধেভাবে বলল, আপনি আমাকে যা বলেছেন তা নিছকই রাগের কথা, আপনি নিজেও তা বিশ্বাস করেন না । কিন্তু আমি যা বলেছি সেটা রাগের কথা নয়—ঠিক কিনা আপনি ভেবে বলুন ।

মালা বিশ্বাস মনে মনে ধাক্কা খেয়েছে । সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার উপক্রম প্রায় । ছুটি বাতিল না করলেই ভালো হত মনে হয়েছে । এই কথা থেকেই এই লোকের মেয়েদের সম্বন্ধে মনোভাব বোঝা যায় । অর্থাৎ সে বিশ্বাস করে তাদের মত মেয়েদের দাপট শুধু রূপের দাপট, আসলে তারা অন্তঃসারশূন্য । ঠোঁটের ডগায় কি একটা জবাব যেন এসেই গিয়েছিল । সামলে নিল । কথা কাটাকাটি করে কেন যেন তার তিক্ততা বাড়াতে ইচ্ছে করল না ।

দিনটা ভালই কেটেছিল ।

সিনেমায় গেছে, গঙ্গার ধারে বেড়িয়েছে, দেশ-বিদেশের পাইলটের গল্প শুনেছে, আবার হাল্কা ঝগড়াঝাটিও একটু-আধটু করে ফেলেছে । ভদ্রলোক যে ইচ্ছে করেই অনেকবার তাকে রাগাতে চেষ্টা করেছে সেটা বোঝা গেছে । ফলে লঘু বিতণ্ডার পরিমাণ হাসির রাস্তায় গড়িয়েছে । রেস্তরাঁয় খাবার সময় এরোড্রোমের রেস্তরাঁর প্রসঙ্গ তুলে আরো বেশি জ্বালাতন করতে চেষ্টা করেছে তাকে । কিন্তু বাড়ি ফেরার পর আবার সেই একই চিন্তা মাথায় এসেছে মালা বিশ্বাসের । লোকটা কোন্ টানে এগিয়ে আসছে তার দিকে ? মেয়েদের সম্পর্কে তার মনোভাবের কি কিছুমাত্র তফাত হয়েছে ?

কথায় কথায় আজও বলছিল, আপনার সঙ্গে এরোড্রোমের অন্য সব মেয়েদের মেজাজের অনেক তফাত ।

শুধু মেজাজের তফাত । আর কোনো তফাত ভাবে না বোধহয় । অন্তত বলেনি । উল্টে সিনেমায় পাশাপাশি বসে পুরুষের সেই চেনা-দৃষ্টির আঁচ অনেকবার অনুভব করেছে । অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে দুটো চোখ ছবির পরদা থেকে অনেকবার তার দিকে ফিরেছে । মালা বিশ্বাস লক্ষ্য না করতেই চেষ্টা করেছে । আবার না করে পারেও নি । লক্ষ্য তার পরেও অনেকবার করেছে । গঙ্গার ধারেও । আর এ-ও উপলব্ধি করেছে, এই লোক ডিক্রুজ নয়, এ বেপরোয়া হলে নিজেকে রক্ষা করা খুব সহজ নয় ।

সে-ও কি ওই রোজা গ্র্যাণ্ড, মিস ইয়ং, পার্বতী রাণ্ড, কমলা ব্যাসের সঙ্গে এক সারিতে এসে দাঁড়াল ? তার কি পরিণাম ? এই একজনের প্রতি ওরা ভিতরে ভিতরে এত বিরূপ কেন ? কি দিয়েছে তারা আর কি পায়নি ?

অদেখা কোন্ এক মায়াদির মুখ পর্যন্ত মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে । একটু চেষ্টা করলেই সেই মুখ যেন কল্পনা করা যায় । একদিন হাসপাতালে গিয়ে তাকে দেখে আসার ইচ্ছাটা মনে জাগল কেন কে জানে । সে যেন হেসে হেসে বলেছে, দেখো দেখো, খুব ভালো করে আমাকে দেখে নিয়ে তার পর এগোও ।

একা নিরিবিলি ঘরে বসে মালা বিশ্বাসের মুখের ওপর একের পর এক কঠিন রেখা পড়েছে ।

কিন্তু দৈনন্দিন কাজের মধ্যে আবার তা সহজও হয়ে গেছে । মেলা-মেশাটা আরো সহজ হয়েছে । আর সকলের চোখেই পড়েছে সেটা । মাসখানেক বাদে ক্যাপ্টেন নন্দীর এয়ারক্রাফটএ তার ডিউটি পড়ল, এটাও বিচ্ছিন্ন করে দেখল না কেউ । চাকরির স্বাভাবিক রীতি ভাবল না । ডিউটি বদল হয়েই থাকে, আগেও হয়েছে । এমন কি মালা বিশ্বাসও খুব ভালো করেই জানে, এর পিছনে, সক্রিয় ইচ্ছা বা ইঙ্গিত ছিল না কারো ।

আনন্দে লাফালাফি করে উঠেছিল শুধু কো-পাইলট শিবলাল । বলেছে, মিস লরি দীর্ঘজীবী হোক ।

এই এক ছোকরাকে নিয়ে একটু মুস্কিল হয়েছে মালা বিশ্বাসের । দিনকে দিন বাচাল হয়ে উঠছে । সকলে ভালবাসে, ক্যাপ্টেন নন্দীর প্রিয়পাত্র । ফলে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সে । কাজ ফেলে দশ বার করে ককপিট থেকে বেরিয়ে মালার কাছে চলে আসবে।

আড্ডা দেবে, খুনসুটি করবে। যাত্রীরা ফিরে ফিরে তাকায়, মালা বিশ্বাস চাপা রাগে ওকে নিজের জায়গায় গিয়ে বসতে বলে। কিন্তু ও ভ্রূক্ষেপও করে না। সবিতাব্রতও ধমকেছে ওকে একদিন, এরকম করলে হয় তোমাকে সরাবো নয়তো তোমার ওই লেডীকে সরাবো।

শিবলাল হেসে সারা, বলে, দুজনকে একসঙ্গে সরান দাদা, অবশ্য এক জায়গাতেই।

ওর ওপর রাগ হয় কিন্তু সেই রাগ জিইয়ে রাখা শক্ত। এমন মুখ করে তোয়াজ শুরু করবে বা এমন কিছু কাণ্ড করে বসবে যে শেষে হাসি সামলানো দায়। তবু মান্যগণ্য যা একটু ওই ক্যাপ্টেনকেই করে। মালা বিশ্বাসের কাছে সবিতাব্রত মন্তব্য করেছে, ছোকরার হাত ভালো, কিন্তু ওর কাজের মন আপনারাই খেয়েছেন দেখছি।

মালা বিশ্বাসের সেটা মানতে আপত্তি।—কি রকম?

কি-রকম আবার কি, পাইলটের কাজ ছাড়িয়ে ওকে এখন আপনার পাশে স্টুয়ার্ডের কাজ দিলেও বোধহয় খুশি হয়।

নিস্পৃহ মুখে মালা বিশ্বাস জবাব দিয়েছে, একটা ছেলের ক্ষতি করে কাজ কি, তাহলে আমাকেই সরান। মিস লরিকে আপনি একবার মুখ ফুটে বললেই হবে।

সবিতাব্রত বলেছে, হবে। কিন্তু তাতে আবার আমার ক্ষতি।

মালা বিশ্বাস হাসতে গিয়েও হাসতে পারেনি। বাক্যালাপের এই সরাসরি অন্তরঙ্গ দিকটা সে এখনো কেন যেন সন্তর্পণে পরিহার করে চলতে চায়।

শিবলাল ফাঁক পেলে মালা বিশ্বাসের বাড়িতেও আসে। জোর করে তাকে না ওঠালে উঠতে চায় না। মালা বিশ্বাস ধমকায় তাকে আর দু'দিন বাদে পুরো-দস্তুর ক্যাপ্টেন হবে তুমি, একটা এয়ারক্রাফটের সর্বেসর্বা হবে, তারপর আরো কত বড় হবে—তোমার এই মতি কেন? কাজে মন দাও।

শিবলাল হাসি মুখে পাল্টা চোখ পাকিয়েছে, তুমি জানো ছেলেবেলা থেকে আমি এই মতির চর্চা করে আসছি? এতে কোনরকম পরীক্ষা-টরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে এ ব্যাপারে কেউ আমার নাগাল পেত না।

অতঃপর সোৎসাহে নিজের মতি-বিশ্লেষণ শুরু করেছে। গোড়াতেই বাড়ির কথা বলেছে। পাঁচ ভায়ের সব থেকে ছোট সে। মা খুব আসকারা দিত আর বাবা পিটত। তাই নিয়ে মায়ের সঙ্গে বাবার তুমুল ঝগড়া বেধে যেত। ফলে বাবা জাতীয় লোক অর্থাৎ পুরুষদের সঙ্গে আদৌ মিশত না সে, সর্বদা মেয়েদের পিছনে ঘুর ঘুর করত। বার-তের বছর বয়েস না হতে কত লোকের দিদি বউদি এমন কি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী মাসি পিসিকেও যে ভালবেসে ফেলেছিল ঠিক নেই। ওই বয়েস থেকেই মেয়ে-ঘেঁষা ছেলে বলে তার অপবাদ রটেছিল।

আর চৌদ্দ বছর বয়সে এক দশ বছরের ফ্রকপরা মেয়ের প্রেমে পড়ে তো একেবারে হাবুডুবু। কাছাকাছি একটা বাড়িতেই থাকত মেয়েটা, মনে মনে তাকেই বিয়ে করার সঙ্কল্পটা একেবারে পাকা। কিন্তু বিয়ে করবে কি করে। একটা দাদারও তখন বিয়ে হয়নি। আর ইস্কুলে পড়া ছেলের বিয়ের ইচ্ছে জানলে বাবা চড় কষাবে গালে। একমাত্র উপায় ওই মেয়েটাকে নিয়ে পালানো। অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে চিঠি পত্রে অনেক রকম লোভ-টোভ দেখিয়ে পালানোর ব্যাপারে মেয়েটাকে রাজি করানো গেল। পাঁচটা টাকা আগেই যোগাড়

করে রেখেছিল, তাই সম্বল করে দু'জনে পালাল ।

দুপুরে পালিয়েছে কিন্তু বিকেল হতে না হতে মেয়েটার সে কি কান্না ? তখন তারা বাড়ি থেকে পাঁচ মাইল দূরে নিরিবিলিতে একটা গাছের তলায় বসে। বিকেলে কি করবে শিবলাল সেটা ঠিক করে উঠতে পারছিল না, তার ইচ্ছে ছিল খেয়া নৌকোয় নদীর ওপারে গিয়ে তারপর যা-হয় ভাবা যাবে । সেখানে কেউ চিনবে না তাদের । কিন্তু মেয়েটা কেঁদে সব ভণ্ডুল করে দিল । কত আদর করতে গেল, কত ভালো কথা বলতে গেল তাকে, কিন্তু মেয়ের এক বায়না সে বাড়ি যাবে । বাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না দেখে রেগে মেগে যাচ্ছেতাই গালাগাল করতে লাগল তাকে ।

বেগতিক দেখে শেষে একটা উপায় মনে পড়ে গেল শিবলালের । একটা বিলিতি ছবিতে দেখেছিল একটা ছেলে একটা মেয়েকে জাপটে ধরে চুমু খাচ্ছে । সেই মেয়েটা আগে একটুও পছন্দ করত না ছেলেটাকে । কিন্তু জোরজার করে মেয়েটাকে চুমু খাবার পর দেখা গেল আস্তে আস্তে দু'জনে বেশ ভাব হয়ে গেছে । তখন থেকেই তার ধারণা মেয়েরা এ ব্যাপারটা খুব পছন্দ করে ।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই বুদ্ধিটা খাটাতে গিয়ে ফল সাংঘাতিক হয়ে উঠল । মেয়েটা রাগের চোটে প্রথমে আঁচড়ে কামড়ে দিল, তার পরেও জোর করতে দু'হাতে শিবলালের ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে ঝুলে পড়ল একেবারে । প্রাণান্ত অবস্থা শিবলালের । দু'মুঠো চুল একেবারে উপড়ে নিয়ে যে-দিকে দু'চোখ যায় ছুট দিল মেয়েটা ।

অবশ্য বাড়ির রাস্তার দিকেই ছুটেছিল । অগত্যা প্রেমের আশা ছেড়ে শিবলালও বাড়িমুখো হল । ইতিমধ্যে মেয়ের খোঁজে ও-বাড়ির লোক এ-বাড়িতে যে অনেকবার এসে গেছে জানে না । খেলা দেখতে গেছল বলে মাকে ভাঁওতা দিল শিবলাল । তবু ভয়-ভয় করতে লাগল, যদি বাবা টের পেয়ে যায় তা হলে বিপদ ।

সন্ধ্যার পরে মেয়েটার মা এলো তাদের বাড়িতে । মা-কে চুপি চুপি কি বলল, আর তার হাতে কি দিয়ে গেল । খানিক পরে মা তাকে একটা কাগজ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, এ চিঠি সে লিখেছে কি না ।

প্রেমিকাকে অনেক লোভ টোভ দেখিয়ে হাতে হাতে যে চিঠি দিয়ে এসেছিল—সেই চিঠি । ভয়ে ভয়ে শিবলাল মা-কে পরামর্শ দিল ওটা তক্ষুনি ছিঁড়ে ফেলতে, বাবা যেন না দেখে ।

কিছু না বলে মা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করতে লাগল । শিবলাল অবাক ।

তারপর কি মার কি মার । যে মাকে কোনদিন একটুও ভয় করেনি, সেই মা-যে এমন মারতে পারে কল্পনাও করেনি । মেরে মাটিতে শুইয়ে দিল একেবারে । তবু মার থামে না । শিবলালের মনে হল একেবারে মেরে ফেলার আগে মা আর থামবেই না ।

মুখ গম্ভীর করে শোনা দায় । মালা বিশ্বাস চেষ্টা করেছে । তবু, এর পরেও মতি-গতি বদলালো না তোমার ?

কিছুকাল বদলেছিল, তারপর আবার বিগড়ে গেল । তারপর অপেক্ষাকৃত পরিণত প্রেমের আর এক অধ্যায় ফেঁদে বসল সে ।

—কলেজে পড়তে বয়সে বছর চারেকের বড় এমন এক মহিলার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে

গিয়েছিল তার। মহিলা দিব্বি ফাই ফরমাস খাটাত তাকে, আবার আদর যত্ন করে খেতে টেতেও দিত। ক্রমে প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খেতে লাগল শিবলাল, পড়াশুনা মাথায় উঠল। শেষে আর থাকতে না পেরে বিয়ের প্রস্তাব করে বসল একদিন। মহিলা প্রথমে হাঁ একেবারে, তারপর হেসে বাঁচে না। অত হাসি দেখে শিবলাল ভাবল প্রত্যাশিত প্রস্তাব শুনে খুব খুশি হয়েছে। ভাববে না-ই বা কেন, মহিলা রাগ করা দূরে থাক, হাসি থামিয়ে সদয় মুখ করে ঠিক চল্লিশ দিন পরের একটা তারিখ জানালো তাকে। বলল, ওই তারিখে সন্ধ্যার পরে শিবলাল যেন অবশ্য তাদের বাড়ি আসে—ফয়সালা যা হবার সেদিনই হয়ে যাবে। না যদি আসে তাহলে কোনদিন আর মুখ দেখবে না। বিশেষ কারণে এই চল্লিশটা দিন সময় নিচ্ছে সে—কিন্তু খবরদার ওই তারিখে সন্ধ্যার আগে শিবলাল যেন কক্ষনো আর তাদের বাড়ি মুখো না হয়—হলে সব ভেস্তে যাবে।

চল্লিশটা দিন নয়ত, চল্লিশটা বছর যেন। এই চল্লিশ দিন যে কি করে কেটেছে এক শুধু শিবলালই জানে। যাক, দিন একদিন কাটল তবু। সকাল থেকে মিনিট গুনে গুনে সন্ধ্যা হল।

তারপর শিবলাল বেরুল। দুরু দুরু বুক।

বাড়ির সামনে এসে অবাক। মহিলার বাড়িটা আর বাড়ি নয় শুধু, বিয়ে বাড়ি। আলো সাজানো হয়েছে, বাজনা বাজছে, লোকজন আনাগোনা করছে। কি ব্যাপার! শিবলাল ঘাবড়েই গেল, একেবারে বিযের ব্যবস্থাই করে রাখা হয়েছে নাকি! ঘাড় ধরে এক্ষুনি তাকে একেবারে বিয়ে করিয়ে ছাড়বে? শিবলাল বিয়ের প্রস্তাবটাই আপাতত পাকা করতে চায়, একেবারে বিয়ে করার জন্য তো আদৌ প্রস্তুত নয়।

পরিচিত কেউ কেউ তাকে দেখে ফেলল, আগেই বলা ছিল বোধহয়, সরাসরি বগলদাবা করে তারা তাকে একেবারে কনের কাছে নিয়ে হাজির করল।

দেখা গেল বিয়েই বটে, আর সেই মহিলারই বিয়ে। তবে বর সে নয়, দশাসই চেহারার আর একজন গুঁপো ভদ্রলোক।

কিন্তু প্রেমিকার ওব জন্য দুঃখ হযেছিল যে তাতে ভুল নেই, সেই দুঃখের চোটে সে তাকে সামনে বসিয়ে জোর-জবরদস্তি করে একগাদা খাবার না খাইয়ে ছাড়েনি।

এই শোনার পরেও মালা বিশ্বাস রাগ করবে, না হাসবে?

আর তার পরেও সমঝে দিতে চেষ্টা করলে শিবলাল হাসে, বলে, অন্য ক্যাপ্টেনরা যেমন আমিও তাই হব।

মালা বিশ্বাস রাগ করে, বাজে বোকো না, তুমি ক'দিন আর এসেছ, ক'জনকেই বা দেখছ, তোমার মত তরলমতি ক্যাপ্টেন এক আঙুলে গোনা যায়। আমি এমন ক্যাপ্টেন দেখেছি যাঁরা বড় ভাইয়ের মত, বাপের মত ব্যবহার করে এয়ার হোস্টেসদের সঙ্গে। তোমাদের মত বাজে ছেলেরা এসেই গণ্ডগোল বাধাচ্ছে।

এর থেকেও বেশি কিছু বললে শিবলাল গোমড়ামুখ করে উঠে যায়, দুই একদিন হয়ত মুখ ভার করেও থাকে, তারপর আবার যে কে সেই। উল্টে ওই দুই একদিনের নিঃসঙ্গতার খেদ দ্বিগুণ উল্লাসে ভরাট করে তুলতে চায়!

কিন্তু ইদানীং তার হাবভাবও একটু বদলেছে। তার আদর্শ ব্যক্তি ক্যাপ্টেন নন্দীর মনের

হদিস সে-ও হয়ত একটু আধটু পেয়ে থাকবে। মালা বিশ্বাসের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন আকর্ষণের যোগটা শিবলাল আবিষ্কার করেছে মনে হয়। এ-রকম মনে হওয়ার কারণ আছে। ছুটির দিনের এক সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে একটা ইংরাজি সিনেমা দেখার জন্য রীতিমত আবেদন জানিয়েছিল। মালা বিশ্বাস গম্ভীর মুখেই নাকচ করেছে। বলেছে, কাজ আছে। মুখ ভার করে একাই ছবি দেখতে গেছে শিবলাল। ছবি ভাঙতে রাগটা প্রকাশ করার জন্যেই হোক বা যে জন্যেই হোক দোতলায় উঠে সোজা এই ঘরে চলে এসেছিল। রাত তখন ন'টা বেজে গেছে।

ঘরে ঢুকেই শিবলাল বিমূঢ় একেবারে। ইজি চেয়ারে গা ছেড়ে প্রায় শুয়ে আছে ক্যাপ্টেন নন্দী, আর মালা বিশ্বাস শয্যায় কোলের ওপর দুটো বালিশে কনুই ঠেস দিয়ে বসে গল্প করছে।

তাকে দেখে একটু অবাক সবিতাব্রতও। জিজ্ঞাসা করেছে, কি ব্যাপার হে, এ সময়ে যে?

আমতা আমতা করে শিবলাল বলেছে, সিনেমা দেখতে গেছলাম, তারপর এমনিই এলাম একবার।

সবিতাব্রত হেসে টিপ্পনী কেটেছে, সিনেমার গল্পটা শোনাতে?

শিবলালের সেই মুখ দেখে মালা বিশ্বাসের একটু ভয় ধরেছিল, সেও না জানি পাল্টা ঠেস দিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে বসে। সত্যিই বলেনি কিছু, যেমন ধূমকেতুর মত এসে হাজির হয়েছিল তেমনি চলে গেছে। সবিতাব্রত হাসি মুখে পিছন থেকে ডেকেছে দু'চার বার, কিন্তু সে আর ফিরে তাকায়নি।

এরপর দুজনকে কথা বলতে দেখলে ও কেমন সচকিত হয়ে ওঠে। অফ ডিউটিতে রেস্তোরাঁয় বসে চা খেতে দেখলে দূরে চঞ্চল প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে, কখনো আবার হন্ত দন্ত হয়ে ভিতরে ঢুকে অদূরের কোনো টেবিলে চা খেতে বসে যায়। কাছে ডাকলেও আসে না।

সবিতাব্রত ততটা নয় তার এই একটু-আধটু পরিবর্তন শুধু মালা বিশ্বাসই লক্ষ্য করেছে।

অন্য দিনের সঙ্গে সে দিনটার এত তফাত হবে কেউ ভাবেনি।

দুপুরের দিকে ফ্লাইট ছিল। প্লেন যাবে গৌহাটি। এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের মেয়াদ। ওড়ার আগে অন্য দিনের মত রেস্তোরাঁয় সকলে গোল হয়ে বসে চা-টা খেয়েছে, গল্পগুজব করেছে। আগের দিনের এক ভি, আই, পি প্যাসেঞ্জারের ব্যবহার নিয়ে হাসি-ঠাট্টা চলছিল। ভদ্রলোকের মেজাজ গরম হতে ক্যাপ্টেন নন্দীকে উঠে এসে তাঁকে একটু সমঝে দিতে হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গেই শিবলাল চা খেতে খেতে বলছিল, আপনি ভুল করেছেন দাদা, মিস বিশ্বাসকে ভার দিলেই সে ভদ্রলোকের মেজাজ একেবারে হিমালয়ের চূড়ায় নিয়ে তুলতে পারত।

সকলেই হাসছিল। সবিতাব্রতও। মালা বিশ্বাস শুধু চেষ্টা করে গম্ভীর। একজন ইন্ধন জোগালো, মিস বিশ্বাসকে তুমি এত বড় সার্টিফিকেট দিচ্ছ কি দেখে?

কি দেখে ! সাড়ম্বর উচ্ছ্বাসে শিবলাল সেই পুরানো স্মৃতির মধ্যেই ফিরে এলো আবার। ডিক্রুজকে যে কি-ভাবে একটা কাদার তাল বানিয়ে ফেললে তা যদি দেখতেন ! দেখে পর্যন্ত আমার মনে আর শান্তি নেই।

তবু গম্ভীর দেখে একজন মালা বিশ্বাসকেই উস্কানি দিল, কি ম্যাডাম, ছোকরা এ-ভাবে বলে যাচ্ছে আপনি জবাব দিচ্ছেন না যে ?

মালা বিশ্বাস বলল, ও আমাকে দিদি না ডাকা পর্যন্ত ওর কোনো কথার জবাব দেব না।

দিন তিনেক আগে শিবলালের কি একটা ঠাট্টায় রাগ করে মালা বিশ্বাস বলেছিল, তোমার বড় বাড় বাড়ছে—এবার থেকে দিদি ডাকবে আমাকে।

শিবলাল ফিরে প্রতিবাদ করেছে, দু'দিন বাদে যে আমার এয়ারক্রাফটএর হোস্টেস হবে, তাকে দিদি ডাকব মানে ?

এয়ার হোস্টেস দিদি হতে পারে না ?

শিবলাল অম্লান বদনে জবাব দিয়েছিল, হলে সব মাটি।

আজ মালা বিশ্বাসের এই উক্তির ফলে শিবলাল জিজ্ঞাসা করল, দিদি ডাকলে আদর পাব ?

পাবে, কানমলাও পাবে।

অন্য সকলের হাসাহাসির মধ্যে সবিতাব্রত পরামর্শ দিল শিবলালকে, মগজে বুদ্ধি বলে যদি কিছু থাকে এক্ষুনি রাজি হয়ে যাও হে শিবলাল—আদর বলো আর কানমলা বলো কোনোটাই তো দূর থেকে হয় না।

তারপর সময় হয়েছে। ঘড়ি দেখে যে যার উঠে পড়েছে। চৌদ্দজন প্যাসেঞ্জার নিয়ে এয়ারক্রাফট আকাশে উড়েছে। তাদের যেদিকে গতি সেদিকের আবহাওয়ার সংবাদ খুব ভালো না হলেও ততটা খারাপও কিছু ছিল না।

প্রায় এক ঘণ্টা নির্বিঘ্ন যাত্রার পর রেডিও অফিসার রিপোর্ট করল রেডিওর স্ট্যাটিক আওয়াজ থেকে জোরালো থাণ্ডার স্টর্মেব আভাস পাচ্ছে সে—সামনে ব্যাড ওয়েদার।

মালা বিশ্বাসও তখন ককপিটে। কি দরকারে শিবলাল তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। খবরটা শোনামাত্র সে-ও দাঁড়িয়ে গেল। হাওয়াই জাহাজ নিয়ে কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে অভ্যস্ত চোখে নিমেষে সেটা ধরা পড়ে। পাইলট আর ক্রু-দের মুখে এক অনাগত আশঙ্কার ছায়া এঁটে বসে। মালা বিশ্বাস দেখল সকলের মুখ গম্ভীর। ক্যাপ্টেন নন্দী ফিরে একবার রেডিও অফিসারের দিকে তাকালো শুধু। তারপর নিজের কাজে মন দিল।

কেবলমাত্র এই জিনিসটিকেই ভয় করে দুর্ধর্ষ পাইলটরাও। ঝড়ের মুখে কুটোর মত অবস্থা হয় এয়ারক্রাফট থাণ্ডার স্টর্মের মধ্যে পড়লে। থাণ্ডার স্টর্ম কিনা মালা বিশ্বাস সঠিক জানে না তখনো। কিন্তু এদের মুখ দেখে সেই রকমই মনে হল। জিজ্ঞাসা করল না। জিজ্ঞাসা করা রীতি নয়। বিপদ এলে স্নায়ুর ওপর দখল চাই শুধু, আর কিছু না।

দেখতে দেখতে সেই প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝার মধ্যেই পড়ে গেল তারা। জিঘাংসু মৃত্যু যেন খেলায় মেতে উঠল বিমানখানা নিয়ে। ইচ্ছে করলেই এই ঝড়ের গ্রাস থেকে পেরিয়ে আসা যায় না। গতি বদল করা যায় না। এই ঝড়ের আওতায় একবার পড়ে গেলে বেরিয়ে

আসা না আসা শুধু বিধাতার মর্জি বুঝি । মানুষ সেখানে অসহায় ।

সকলে ব্যতিব্যস্ত । কি একটা আঁকড়ে ধরে মালা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই । আর ওই গ্রাসোদ্যত মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেখছে ক্যাপ্টেনের । এই মুখ আলাদা, এই মূর্তি আলাদা । চোয়ালটা শক্ত হয়ে এঁটে আছে শুধু, এ-ছাড়া ওই সংগ্রাম-তন্ময়তায় ভয় বা ত্রাসের আর এতটুকু ছায়া পর্যন্ত পড়েনি । এই মুখ দেখলে একবারও মনে হবে না যে-কোনো মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যেতে পারে । ধীর স্থির ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে সে যেন মৃত্যুর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে । সকলে উদ্গ্রীব সশঙ্ক-নেত্রে ফিরে ফিরে তাকেই দেখছে । নীচে পাহাড় । ঝড়ের দাপটে হিসেবের ভুলে উচ্চতার তারতম্য ঘটলেও পলকা খেলনার মতই এয়ারক্রাফ্ট্ ভেঙে গুঁড়িয়ে খান খান হয়ে যেতে পারে ।

রেডিও অফিসারকে কি বলার জন্য ক্যাপ্টেন একবার ঘাড় ফেরালো । পরমুহূর্তে মালা বিশ্বাসের দিকে চোখ পড়তে প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল সে ।—হোয়াই আর ইউ হিয়ার ! জাস্ট গেট্ আউট্ এনিহাউ অ্যাণ্ড লুক আফটার ইওর মেন ! সি ইফ দে আর প্রপারলি স্ট্র্যাপ্‌ড় !

মালা বিশ্বাসের সম্বিত ফিরল যেন ।...তাই তো, এ-সময়ে সে এখানে দাঁড়িয়ে কেন । ঠিক সেই সময়েই বুঝি ঝড়ের মুখেও প্লেন স্থির হয়েছিল একটু । এটা ওটা আঁকড়ে ধরতে ধরতে বেরিয়ে এলো সে ।

রাগ করার সময় নয় এটা, রাগ করার কথাও নয় । এই গর্জন পুরুষেরই গর্জন, আর উচিত গর্জন । রেডিও অফিসারের কথা শোনামাত্র তার বেরিয়ে আসা উচিত ছিল । যাত্রীদের মাঝে এসে দাঁড়ানো উচিত ছিল । স্ট্র্যাপ বাঁধা না থাকলে হাওয়াই জাহাজের মধ্যেই যে-কোনো যাত্রী গুরুতর আহত হতে পারে । আসন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলে সেই আঘাতে মৃত্যুও হতে পারে ।

প্যাসেঞ্জার কেবিনে কান্নাকাটি পড়ে গেছে । বেল্ট বেঁধে যে যার পাংশু বিবর্ণ মুখে বসে আছে। কাঁপছে থরো থরো। সকলের মুখে মৃত্যুর ছায়া । অনেকে কাঁদছে, আবার অনেকে ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছে । এ-রকম দৃশ্য মালা বিশ্বাস আর দেখেছে কিনা মনে পড়ে না ।

একটা সীট আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে সে হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড করল । সে হাসল সকলের দিকে চেয়ে, প্রায় চেঁচিয়েই বলল, আপনারা ভয় পাচ্ছেন কেন, এমন লোকের হাতে আমরা আছি যিনি এই বিপদ গ্রাহ্য করেন না, আমাদের কোনো ভয় নেই । এ-রকম হামেশা হয়, আমরা ঝড়ের থেকে বেরিয়ে এলাম বলে ।

কোনোরকমে নিজের জায়গায় এসে বসেছে তারপর । স্ট্র্যাপ বেঁধেছে । তারপর প্রতীক্ষা করেছে । কিসের প্রতীক্ষা জানে না ।

ভয় ? না, আর যাই হোক মালা বিশ্বাসের ভয় করছে না । এক মানুষের যুদ্ধমগ্ন দৃঢ় মূর্তিটা শুধু তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে । নিষেধ অমান্য করে উঠে আবার সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে ।

যুদ্ধই করছে সবিতাব্রত । শক্ত স্থির দুই হাতে মৃত্যুকে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু এ ঝড় আর বুঝি থামবে না । ঝড়ের সঙ্গে লড়াইয়ের ফলে প্লেনের তেল পুড়ছে

হু-হু করে—ডানা দুটো বুঝি এক্ষুনি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে ।

দুঘণ্টার ওপর লাগল এই মৃত্যুর গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে । জীবনের আশ্বাস ফুটল সকলের চোখে মুখে । মালা বিশ্বাসের আবার ছুটে যেতে ইচ্ছে করল ককপিটে । না গিয়ে পারল না । এলো । ক্যাপ্টেনকে দেখল । একখানা পাথরের মত বসে আছে। ঘামে জবজব করছে সমস্ত মুখ । শরীরের সমস্ত রক্ত বুঝি ঘাম হয়ে ঝরছে ।

কিন্তু একটু বাদেই টের পেল আরো বড় অনিশ্চয়তা সামনে মুখব্যাদান করে দাঁড়িয়ে ।

রেডিও বেয়ারিং নিয়ে তখনি রেডিও অফিসার ক্যাপ্টেনকে জানাচ্ছে কোথায় আছে তারা এখন, যেখানে আছে তার ধারে কাছে এয়ারপোর্ট নেই । অর্থাৎ গন্তব্য পথ থেকে তারা বহু দূরে ছিটকে পড়েছে । আর পর মুহূর্তে এ যে এয়ারপোর্টে যাওয়ার মত তেল নেই—তেল যেটুকু বেশি ছিল ঝড় তা নিয়ে গেছে । ঝড় সব তেল খেয়ে দিয়েছে ।

ক্যাপ্টেনের এই গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে শঙ্কা বোধ করল মালা বিশ্বাস । চুপি চুপি শিবলালই তাকে এই দুঃসংবাদটা জানালো । পেট্রোল নেই, বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে নামতে হবে—যে-কোনো জায়গায় ।

মালা বিশ্বাসের বুক কেঁপে উঠল ।

রেডিও অফিসারের উদ্দেশে ক্যাপ্টেনের হুকুম শুনল সকলে, ইনফর্ম অল্ স্টেশন —রানিং শর্ট অফ ফুয়েল, ভিটি...হ্যাভিং ফোর্সড় ল্যাণ্ডিং উইদিন টুয়েণ্টি মিনিটস—সার্চিং ফর এ ফিল্ড অর রিভার বেড—স্টিল ব্যাড ওয়েদার, পুওর ভিজিবিলিটি ।

মালা বিশ্বাসের দিকে চোখ পড়ল ক্যাপ্টেনের । মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক । তারপর শান্ত মুখে তাকেও নির্দেশ দিল, শোনো, প্যাসেঞ্জারদের বেশি কিছু বলে কাজ নেই, শুধু জানিয়ে দাও আমাদের একটা জায়গা খুঁজে নামতে হবে এক্ষুনি, তাদের প্যানিকি হতে বারণ করো—লেট আস হোপ ফর দি বেস্ট !

মালা বিশ্বাস চলে এল । আপনি ছেড়ে এই প্রথম নিজের অগোচরেই তাকে তুমি বলল ক্যাপ্টেন । কিন্তু এই ব্যতিক্রম অনুভব করার মত সময় নয় এটা । মালা বিশ্বাস যাত্রীদের ভরসা দেবে কি, নিজেই যেন আর ভরসা পাচ্ছে না । স্নায়ুর শক্তিতে মৃত্যু ঠেকানো যায়, কিন্তু পেট্রোল জোগানো যায় না ।

আধ মিনিটের মধ্যে ক্যাপ্টেন নিজেই উঠে এলো । নিজেকে সংযত করে মালা বিশ্বাস তখনো কাউকে কিছু বলার অবকাশ পায়নি । ক্যাপ্টেন এলো, কারণ, নামার আগে ভিতরের অবস্থাটা নিরীক্ষণ করে নেওয়া দরকার । সামনের দিকে বেশি লোক বা বেশি মাল থাকলে চলবে না ।

তেমনি স্থির ঠাণ্ডা মুখে চার দিক চেয়ে দেখে নিল ক্যাপ্টেন নন্দী । তারপর যাত্রীদের দিকে ফিরল । দশজন যাত্রীর মধ্যে তার চোখ গিয়ে আটকালো এক বর্ষীয়সী মহিলার দিকে । মহিলার কপালে মস্ত বড় জ্বলজ্বলে একটা সিঁদুরের টিপ । মালা বিশ্বাসের মনে হল মহিলাটি চেনা কেউ হবে তার । কারণ তাঁর দিকে চেয়েই সবিতাব্রত কাছে এগিয়ে এলো একটু । মৃদু হেসে আশ্বাস দিল 'কিচ্ছু ভয় নেই শক্ত করে বেল্ট বেঁধে থাকুন—আমাদের এক্ষুনি নামতে হবে একটু ।'

চলে গেল । আবার চকিত বিস্ময় আর শঙ্কার ছায়া পড়ল সকলের মুখে । কেউ কেউ

স্ট্র্যাপ খুলে ফেলেছিল । সচকিত হয়ে তারা ক্যাপ্টেনের নির্দেশ পালন করল । আশ্বাসের আশায় তারা হোস্টেসের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে । সকলের চোখেই বোবা প্রশ্ন । কোথায় নামছে প্লেন ? কেন নামছে ?

নিজের জায়গায় গিয়ে বেল্ট বেঁধে বসল মালা বিশ্বাস । গা সিরসির করছে । প্লেন নামছে । কোথায় নামছে জানে না । কেউ জানে না । শুধু ক্যাপ্টেন জানে বোধহয় । সে কি করছে এখন ? দুই চোখের সমস্ত শক্তি দিয়ে নামার জায়গা খুঁজছে হয়ত । মালা বিশ্বাস ঘড়ি দেখবে ? না থাক । বিশ মিনিটের কতক্ষণ কেটেছে না জানাই ভালো ।

সহসা প্রচণ্ড ধাক্কা একটা, বেল্ট-এ আটকানো দেহগুলো যেন ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইছে । সে-ও আর্তনাদ করে উঠেছে কিনা জানে না—প্রচণ্ড শব্দে কিছুই শোনা যাচ্ছে না । বার বার আঘাত লাগছে, কি করে লাগছে কোথায় লাগছে কে জানে । এই গতি কোথায় কার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত হবে, তাই বা কে জানে । আর কতক্ষণ, আর ক'টা মুহূর্ত ?

হঠাৎ স্থির সব কিছু । না, কিছু হয়নি । তারা বসেই আছে যে-যার জায়গায় । প্লেন থেমে আছে ।

বেল্ট খুলে লাফালাফি করে উঠে পড়ল সকলে । অল্প-বিস্তর আঘাত লেগেছে সকলেরই, কিন্তু সদ্য পাওয়া জীবনের তাপে সেদিকে কারো হুঁস নেই । তারা বেঁচে আছে, তারা মাটিতে আছে । এর থেকে বড় খবর আর কি আছে ।

ভিতর থেকে মই বার করে দেওয়া হল । সকলে নামল । শীতকালের সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমেছে । তা সত্ত্বেও বোঝা গেল, শুকনো একটা নদীর চরে নেমেছে তারা ।

নামার পরে ফার্স্ট এড নেবার আর দেবার তাড়াহুড়ো পড়ে গেল । অল্প বিস্তর আহত হয়েছে সকলেই তাও খেয়াল হয়েছে নেমে আসার পরে । মালা বিশ্বাস আর শিবলাল বার তিন চার ওঠা-নামা করে ভিতর থেকে শুশ্রূষার প্রাথমিক সরঞ্জাম নামিয়ে এনেছে । ওদিকে কিছু কিছু গ্রামের লোকজন ছুটে আসছে ।

মালা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ । কপালের সেই বড় সিঁদুরটিপ পরা মহিলা দুই হাত পিছনে দিয়ে মাটির ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে ! আর তার সামনে প্যান্টের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী । দেখামাত্র মনে হল, একজন পুরুষ...একজন পুরুষ মানুষই দাঁড়িয়ে আছে বটে । তার কপালের কাছটা বেশ খানিকটা কেটে গেছে, কাঁধের একটা দিকে জামা ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়ছে । কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই । মহিলাকে কি বলছে আর হাসছে মিটিমিটি । মালা বিশ্বাস কেন চোখ ফেরাতে পারছে না জানে না । তার মনে হচ্ছে স্বয়ং বিধাতা যেন সকলের প্রাণটি হাতে ধরে ফিরিয়ে দিয়ে এখন মজা দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ।

দু' পা এগিয়ে আসতে কথাও কানে এলো । মহিলার উদ্দেশ্যে সবিতাব্রত বলছে, মায়ের জন্য ছেলেদের একটু ভাবনা-চিন্তার সুযোগ দেওয়াই উচিত; শুধু আপনারাই ভাববেন, ছেলেরা ভাববে না ? কাল আপনার ছেলের কেমন আনন্দ হবে সেই কথা চিন্তা করুন । সত্যিই তো আর বিপদে পড়েন নি...

আর পাঁচ জনকে দেখাশুনা করে মালা বিশ্বাস আয়োডিন তুলো ইত্যাদি নিয়ে ক্যাপ্টেনের

দিকে এগলো। জামার আস্তিন দিয়েই বার দুই সে কপাল মোছার ফলে জামাটায় চাপ চাপ রক্তের দাগ লেগেছে। ওষুধের সরঞ্জাম নিয়ে কাছে আসতেই সে আঙুল তুলে সেই মহিলাকে দেখিয়ে দিল, ওই ওঁর একটু দেখাশুনা করুন, আই অ্যাম অলরাইট। তারপর তাকেই ভালো করে লক্ষ্য করল একটু, আপনার কোথাও লাগেনি তো?

ঘাড় নেড়ে মালা বিশ্বাস মহিলার দিকে এগলো। লাগেনি। লাগলেও এই পুরুষের কাছে সেটা ব্যক্ত করতে লজ্জা করত বোধহয়। ক্যাপ্টেন তুলোতে ডেটল ভিজিয়ে নিজেই নিজের কপালে আর কাঁধে ঘষে দিল একবার। তারপর সহকর্মীদের দিকে এগলো। কপালের ক্ষত এভাবে হেলাফেলা করাটা একটুও পছন্দ হল না মালা বিশ্বাসের। কিন্তু কিছু বলার জো নেই। সকলের সামনে হয়ত ধমকেই উঠবে আবার।

দর্শকের ভিড় জমে গেছে। একটা বড় রকমের বিপদ ঘটেছে সকলেই বুঝেছে। গাঁয়ের লোকজনের আগ্রহে রাতের মত আধ মাইল দূরের দুটো কুঁড়ে ঘরে থাকার ব্যবস্থা হল সকলের। এয়ারক্রাফটএ খাবার-দাবার যা ছিল, তারাই বয়ে নিয়ে গেল। পায়ে হেঁটে সেই কুঁড়ে ঘরে গিয়ে উঠল সকলে।

ব্যবস্থার নামে এক-রকম হৈ চৈয়ের মধ্য দিয়েই ঘন্টা দুই কেটে গেল। গাঁয়ে বেশ রাত্রি তখন। আসল সংকট কেটে যেতে এখন রাত যাপনের দুশ্চিন্তা, এবং কালও কি-ভাবে এখান থেকে নড়া যাবে সেই-ভাবনা ক্রমে বড় হয়ে উঠতে লাগল সকলের। ক্যাপ্টেন ঘুরে ফিরে বার কয়েক বড় সিঁদুরের টিপ পরা মহিলাটির কাছে এসেছে, হালকা আশ্বাসে তাঁর ভাবনা চিন্তা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। তাঁর প্রতি ক্যাপ্টেনের সদয় ব্যবহার দেখে মালা বিশ্বাস এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল তাকে, ভদ্রমহিলা আপনার চেনা নাকি?

জবাবটা অদ্ভুত মনে হয়েছিল, হেসে বলেছিল, আমার কেন, সকলেরই তো চেনা উচিত, কোনো সংসারের কর্ত্রী হবেন, কারো স্ত্রী হবেন আর কারো মা হবেন—এ গুড ওয়াইফ অ্যাণ্ড এ রিয়েল মাদার—চাকুরে ছেলের শরীর খারাপ বলে তার কাছে যাচ্ছিলেন উনি। কাল কিছু একটা ব্যবস্থা না করা গেলে ভদ্রমহিলা আরো কাতর হয়ে পড়বেন।

ঘন্টা দুই বাদে সকলের ভাবনা-চিন্তা আর উত্তেজনা একটু ঠাণ্ডা হতে মালা বিশ্বাস এদিক সেদিক খোঁজ করেও সবিতাব্রতকে দেখল না। অথচ খানিক আগেও ছিল, তার কপালে শুকনো রক্তের দাগ জমাট বেঁধে উঠতে দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছিল এবং একটু অবকাশের ফাঁক খুঁজছিল। রক্তেব দাগ মুছে পরিস্কার করে দেওয়া দরকার আর ধুলো-বালি না পড়ে সেই ব্যবস্থাও করা দরকার।

এই শ্রান্তি আর দুর্ভাবনার পর রেডিও এঞ্জিনীয়ার, ফ্লাইট এঞ্জিনীয়ার ওরা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। ঘুমিয়েও পড়েছে বোধহয়। দুই ঘরে ভাগাভাগি হয়ে আছে সকলে—যাত্রীরা বেশির ভাগই এক ঘরে যে-যার মাথা গোঁজার মত একটু জায়গা করে নিয়েছে। সেই প্রৌঢ়া মহিলাটি দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঝিমুচ্ছে।

মালা বিশ্বাস বাইরে এসে দেখল, অন্ধকারের দিকে চেয়ে সিগারেট টানছে শিবলাল। অনেকক্ষণ তাকে দেখেনি বটে! সে কাছে থাকলে তার গলাই সব থেকে বেশি শোনা যায়। সাড়া পেয়ে ফিরল।

তোমাদের ক্যাপ্টেন কোথায়?

কি জানি । শিবলাল নিরাসক্ত ।

কি জানি মানে, লোকটা উবে গেল নাকি ? কপালটাও ওইভাবে থাকল—

সিগারেট মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে শিবলাল চুপচাপ দেখল একটু তাকে । কতটা উতলা হয়েছে তাই লক্ষ্য করল যেন । তারপর তেমনি নিস্পৃহ মুখে বলল, বোধহয় এয়ারক্রাফটএ গেছে, ফিরছে না যখন, রাতটা ওখানেই থাকবে মনে হচ্ছে ।

মালা বিশ্বাস অবাক ।—এই ঠাণ্ডায় এয়ারক্রাফটএ । চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তি, দোষটা যেন শিবলালেরই ।—কেন, একটা রাত এখানে কাটানো যেত না ! রাগ করেই চলে গেল ।

একটু বাদে ফিরে এলো । শিবলাল পাছে কিছু চটুল মন্তব্য করে বসে সেই ভয়ে মুখখানা একটু বেশি গম্ভীর । অর্থাৎ তাগিদটা কর্তব্যের । হাতে শিশি তুলো ব্যাণ্ডেজ আর একটা টর্চ । বলল, আমার সঙ্গে আসবে একটু ?

শিবলাল বুঝে নিল কোথায় যেতে হবে । কিন্তু নড়ার নাম নেই, চেয়েই আছে । বিরক্তির ভাবটা আরো স্পষ্ট করে তুলল মালা বিশ্বাস, আসবে না কি ?

হাত বাড়িয়ে টর্চটা নিল শিবলাল, তারপর আবছা অন্ধকারে পাশ ঘেঁষে সঙ্গে সঙ্গে চলল ।

মালা বিশ্বাস কথা বলতে বলতে পথ ভাঙছে, কত বড় ফাঁড়া কেটেছে আজ, কোন যাত্রীর কি অবস্থা, ইত্যাদি । একসময় খেয়াল হল, কথা সে একাই বলে চলেছে, শিবলাল একটা সিগারেট ফেলে আর একটা ধরিয়েছে—কথাবার্তা বলছে না । কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ এগলো সে-ও । বেশি ঘাড় না ফিরিয়ে আবছা অন্ধকারে মুখখানা দেখতে চেষ্টা করল ।

তুমি হঠাৎ এত গম্ভীর যে ?

অন্ধকারেও শিবলালের মুখে এবার হাসি লক্ষ্য করল মালা বিশ্বাস । সে জবাব দিল, বেশি কথা বলে যারা বোকা তারা; আমি এবার থেকে শুধু দেখে যাব ঠিক করেছি ।

কি দেখবে ?

শিবলাল জবাব দিল না । তার মুখের এবারের হাসি বিরক্তিকর লাগল ।

কাছাকাছি আসতে অন্ধকার সত্ত্বেও এয়ারক্রাফটা দেখা যাচ্ছে । নদীর চড়ায় অতিকায় একটা সাদাটে পাখি ডানা মেলে বসে আছে যেন । যত কাছে আসছে, মালা বিশ্বাসের সঙ্কোচ ততো বাড়ছে । সিঁড়ি লাগানোই আছে, ভিতরে আলো জ্বলছে না । মুখ উঁচিয়ে মালা বিশ্বাস ওপরটা দেখল একবার ।

ডাকো— ।

শিবলাল বলল, ডাকতে হবে না, আমি জানি ওখানেই আছে ।

তা'হলে ওঠো ।

শিবলাল জ্বলন্ত টর্চটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল । আলোর ছটা সরাসরি মুখের ওপর পড়তে মালা বিশ্বাসের দু' চোখ ধাঁধিয়ে গেল । সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেলল । ইচ্ছে করেই শিবলাল জ্বলন্ত টর্চটা তার মুখের ওপর ফেলেছে । হাসছে সে । মাথা নেড়ে বলল, আমি না, আমাকে দেখলে ক্যাপ্টেন খুশি হবে না, তা'ছাড়া আমি কারো শুশ্রূষা করতে আসিনি । ...তুমি ফিরছ এখন, না আমি যাব ?

মালা বিশ্বাস চাপা গলায় ধমকে উঠল, বড্ড ফাজিল হয়েছ । আমার পাঁচ মিনিটও

লাগবে না।

শিবলাল ঘড়ি দেখল।—দশ মিনিট অপেক্ষা করব, তারপর ফিরে গিয়ে ঘুমুব, ঘুম পাচ্ছে।

মালা বিশ্বাস এক লহমায় আপাদমস্তক দেখে নিল তার। টর্চটা তার হাত থেকে নিয়ে গম্ভীর মুখে ওপরে উঠে গেল।

টর্চের আলো পড়তে ভিতরের লোক যে চমকে উঠেছে সেটা তার কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল।—হু ইজ্ দেয়ার ?

আমি, মালা। আপনি কাউকে কিছু না বলে এখানে চলে এসেছেন কেন ?

জবাব না দিয়ে ছড়ানো হাত-পা গুটিয়ে সোজা হল ক্যাপ্টেন নন্দী, তারপর উঠে আলো জ্বালল। কিছু খবর দিতে এসেছে ভেবে উতলা হয়েছিল, পরক্ষণে মালা বিশ্বাসের হাতের শুশ্রূষার সরঞ্জাম লক্ষ্য করল। আগমনের হেতু বুঝে সেখানে দাঁড়িয়েই মৃদু মৃদু হাসতে লাগল সে।

মালা বিশ্বাস ছোটখাট একটা ধাক্কাই খেল যেন। তার এই আসা লোকটা সরল চোখে দেখছে না। যেমন শিবলাল দেখেনি। এই মুখ থেকে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধরত সেই মুখ একেবারে মুছে গেছে। সেই মুখের অস্তিত্বও বুঝি কল্পনা এখন। তাকে দেখামাত্র এই দৃষ্টি যেন শুধুই ভোগাতুর হয়ে উঠল।

মালা বিশ্বাস মুখে হাসি টেনে তবু এগিয়ে গেল। বলল, বসুন; সন্ধ্যে থেকে যা করে বেড়ালেন, এক মুহূর্ত সময় পেলাম না। কপালে তো এখনো রক্ত শুকিয়ে আছে।

সবিতাব্রত বসল। কেউ শুশ্রূষা করতে চাইলে আর একটুও আপত্তি নেই যেন। ক্ষুদ্র মন্তব্য করল, তা শুকোলেও বুকের রক্ত লাফালাফি করছে।

মালা বিশ্বাস গম্ভীর। শিশি তুলো নিয়ে ব্যস্ত সে। সবিতাব্রত দেখছে তাকে, ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস দেখা যায় কি যায় না। বলল, আমি শুয়ে শুয়ে তোমার কথাই ভাবছিলাম, আর ঠিক তুমিই এ-ভাবে একা চলে এলে ?

এই দ্বিতীয় দফা তুমি শুনল। প্রথম বারের সঙ্গে কত তফাত ঠিক নেই। সঙ্কটের সময় কাজের গাফিলতি দেখে সেই পুরুষের গর্জন এবং তার খানিক বাদে তুমি বলে কাজের নির্দেশ দেওয়া এক ব্যাপার। এখন সম্পূর্ণ আর এক পরিস্থিতি। কানের কাছটা গরম হয়ে উঠেছে মালা বিশ্বাসের। ঠাণ্ডা মুখে জবাব দিল, একা আসিনি। নিচে বডি-গার্ড অপেক্ষা করছে, দশ মিনিট মাত্র সময় দিয়েছে—

সঙ্গে সঙ্গে মুখভাব বদলাল সবিতাব্রতর, তারপর জিজ্ঞাসা করল, কে শিবলাল নাকি ?

হ্যাঁ, ঠিক হয়ে বসুন!

ঠিক হয়ে বসার বদলে সবিতাব্রত উঠে দরজার কাছে এলো। অন্ধকারের দিকে চেয়ে হাঁক দিল, কই হে শিবলাল, তুমি নিচে দাঁড়িয়ে কেন ?

নিচের থেকে গম্ভীর জবাব এলো তক্ষুনি, আসতে চেয়েছিলাম—মিস বিশ্বাস নিচেই দাঁড়াতে বলল।

মালা বিশ্বাসের মুখ লাল। বলে উঠল, কত বড় পাজী দেখেছেন! ওকেই আগে উঠতে বলেছিলাম, সাফ জবাব দিল পারবে না, ওকে দেখলে ক্যাপ্টেন খুশি হবে না—

বলে ফেলে আরো লাল হয়ে উঠল সে ।

সবিতাব্রত হাসছে । রমণীর মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না । নির্লজ্জ চাউনি, নির্লজ্জ হাসি । বলল, শিবলাল ইজ্ এ জেম্ । সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পড়তে বাইরের দিকে তাকালো আবার, ওহে শিবলাল, প্যাসেঞ্জারদের কারো কাছে একটু ওষুধপত্র আছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখেছ ? ফিলিং গিডি—

চটপট জবাব এলো, খোঁজ নিয়েছি, নেই ।

মালা বিশ্বাস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল । যেমন গুরু তেমন শিষ্য । কোন্ ওষুধের খোঁজ করা হল জানে । ক্যাপ্টেনকে ও-সব ছাইভস্ম খেতে বিশেষ দেখেনি—কিন্তু গুণে কম যায় না কেউ বোঝা গেল । হতাশ মুখ করে সবিতাব্রত ফিরে এসে বসল । মালা বিশ্বাস শুশ্রূষায় মন দিল । খুব কাছে, কপালের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াতে হয়েছে তাকে । পুরুষের অনাবৃত দৃষ্টি তার সর্বাঙ্গে বিচরণ করছে তাও টের পাচ্ছে ।

দু' মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ করে সে টর্চ হাতে নিয়ে ফেরার জন্য প্রস্তুত হল । তার আগেই সবিতাব্রত খুব সাদাসিধেভাবেই প্রস্তাব করল, তুমি বোসো না আর একটু, আমিই না-হয় পৌঁছে দেব'খন । শিবলালকে যেতে বলে দিই ।

মালা বিশ্বাসের ঠাণ্ডা দুই চোখ তার চোখের ওপর এসে থামল । একটা অজ্ঞাত উষ্মা এতক্ষণে যেন ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল । এখানে আসার পিছনে এক পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার তলায় তলায় কিছুটা আকর্ষণও ছিল সেটা মিথ্যে নয় । কিন্তু সেই আকর্ষণ অসুন্দর মনে হয়নি তার । শিবলালের হাব-ভাব তখন সেই জন্যেই একটুও ভালো লাগেনি তার । কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এসে যেন খানিকটা পুঁজি খুইয়ে গেল, আসাটা কদর্য হয়ে গেল । এখান থেকে বেরিয়ে এর পর শিবলালকে মুখ দেখানও আর বুঝি সহজ হবে না খুব ।

রাগ চেপে প্রায় ব্যঙ্গ করেই জবাব দিয়ে বসল, না, আর বসে কাজ নেই, দয়া করে একটু শুশ্রূষার সুযোগ দিয়েছেন এই জন্যেই আমি কৃতজ্ঞ । আপনি মস্ত ক্যাপ্টেন, ঝড়ে দুর্যোগে যুঝতে পারেন, কিন্তু আপাতত আপনার বিবেচনায় একটু ভুল হয়েছে । গুড-নাইট !

## ।। দশ ।।

ক্যাপ্টেন ডিক্রুজ আর ক্যাপ্টেন সবিতাব্রতর প্রবৃত্তির মূলে হয়ত কোনো তফাত নেই, কিন্তু বেগে অনেক তফাত । যত দিন যাচ্ছে এই তফাতটা বেশি উপলব্ধি করছে মালা বিশ্বাস । বেগ প্রতিহত হলে তার আলোড়ন আরো বেশি হয় । সবিতাব্রতরও তেমনি বাধা অতিক্রম করার অশান্ত ঝোঁক বাড়ছে। ফলে আত্মসমর্পণ নয়, আত্মরক্ষার দায়ে মালা বিশ্বাস ভিতরে ভিতরে সদা ব্যতিব্যস্ত । সেটা যে এই লোক না বোঝে তা নয়, কিন্তু বুঝেও অবুঝ । ডিক্রুজের জন্য কোনদিন তার মনে সমস্যার উদয় হয়নি কিন্তু এই একজনকে নিয়ে তার মনের কোণে একটা সমস্যা পুষ্ট হয়ে উঠছে ।

সেদিনের সেই নদীর চড়ায় প্লেন নামানোর অঘটন শুধু যেন এই মানুষটাকেই অনেক কাছে এনে দিয়েছে মালা বিশ্বাসের । গোটা মানুষটাকে নয়, সে অনেক দূরে । সেই দূরের মানুষকে সে দেখেছে প্লেনের সেই অঘটনের সময় । দেখেছে যখন, চুপচাপ বসে লোকটা

ভাবে কিছু কিন্তু সে কাছে এলে তার মধ্যে আর একজনকে দেখে মালা বিশ্বাস। শুধু প্রবৃত্তিতাড়িত এক মানুষকে।

তাদের সাম্প্রতিক হৃদ্যতা অগোচর নয় এখন কারো। কমলা ব্যাস পুরোপুরি সরে দাঁড়িয়েছে, যেমন একে একে সরে দাঁড়িয়েছিল রোজা গ্র্যাণ্ড, মিস ইয়ং, পার্বতী রাণ্ড। কিন্তু সরে দাঁড়ানোর আগে কমলা ব্যাস এক সন্ধ্যায় তার কাছে এসেছিল। মুখের দিকে চেয়ে হেসেছিল। বলেছিল, উইশ ইউ ভেরি ভেরি গুড লাক্। ...কিন্তু এয়ার হোস্টেসের লাক্ জিনিসটা বড় দূরের বস্তু বন্ধু। ইট্ ইজ্ অল্ রাইট সো লং ইউ পে অ্যাণ্ড ডোণ্ট মাইণ্ড।

মালা বিশ্বাস তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করেছে তাকে। ওই হাসির আড়ালে কতটা কান্না জমে আছে দেখতে চেষ্টা করেছে। কতটা দিয়েছে কমলা ব্যাস বুঝতে চেষ্টা করেছে। ওরা ধরে নিয়েছে, কমলা ব্যাস সরল, এবারে সামনে এসেছে মালা বিশ্বাস। ওরা অন্তত কোনো তফাত দেখছে না।

কিন্তু তারা জানে না, তারাই মালা বিশ্বাসকে জ্ঞান দিয়েছে, বুদ্ধি জুগিয়েছে, হাতছানি উপেক্ষা করতে শিখিয়েছে। শুধু তারা কেন, মায়াদিও—যে মায়াদিকে সে কখনো চোখে দেখেনি। সহজ মেলামেশার মধ্যেও মালা বিশ্বাস এক জায়গায় একটা নিষেধের গণ্ডি টেনে দিতে পেরেছে। কিন্তু এই পারাটা যে কি প্রাণান্তকর শুধু সে-ই জানে। বাধা পায় বলেই যেন নেশা লোকটার, ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে এক-একসময়, টের পায়। অথচ, অসহিষ্ণু যে হয়ে ওঠে, জীবনের অন্য ক্ষেত্রে সেই লোকই শক্তির প্রতীক। এইখানেই মালা বিশ্বাসের দুর্বলতা। এই দুর্বলতার সঙ্গে নিজেরই যুঝতে হয় অনেক সময়। যুঝতে পারে, যখন ওদের কথা মনে হয়, যখন মায়াদির কথা মনে হয়, যখন ক্যাপ্টেনকে বিয়ে করা সেই এক পুরানো বান্ধবীর কথা মনে হয়।

আপনি ছেড়ে এখনো, এই হৃদ্যতার পরেও, মালা বিশ্বাস তুমি বলে না ক্যাপ্টেন নন্দীকে। এখানকার রীতিতে এইটুকু খুব সামান্য ব্যতিক্রম নয়। আরে, সবিতাব্রত কখনো স্থূল ঠাট্টা তামাসা করে বসলে সে চোখ পাকায়, মেয়েদের আপনি একটু সম্মান করতে শিখবেন কবে ?

...সবিতাব্রত একদিন যে জবাব দিয়েছিল, আর কেউ হলে মালা বিশ্বাস তার মুখ দেখত কিনা সন্দেহ। লুব্ধ দুটো চোখ তার মুখে আর বুকে ওঠা নামা করে মুখের ওপরই স্থির হয়েছিল। বলেছিল, মেয়েদের ব্যর্থ যৌবনে পুরুষের পদার্পণটাই তো এক বড় সম্মানের ব্যাপার। অসম্মান কোথায় করলাম ?

মালা বিশ্বাস ধাক্কা খেয়েছিল। ব্যঙ্গ করে বলেছে, ব্যর্থ যে সে খবরটা আপনাকে কে দিয়েছে ?

সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল শক্ত হয়েছে লোকটার। মুখের হাসি মিলিয়েছে। তার কথার যে এমন নগ্ন অর্থ ধরে নিতে পারে তা বলার সময় মালা বিশ্বাস কল্পনাই করেনি। সবিতাব্রত জবাব দিয়েছে, ব্যর্থ যদি না হয় তাহলে আমি আর কি দোষ করলাম, যারা এসে গেছে তারা কি আমার থেকে উঁচু দরের লোক ?

রাগ করতে গিয়েও মালা বিশ্বাস হেসে ফেলেছিল। বলেছে, মুখ সামলান, কোন্‌দিন আপনারও না ডিক্রুজের দশা হয়।

সেদিন কথায় কথায় সবিতাব্রত সখেদে বলল, আবার একদিন নদীর চড়ায় এয়ারক্রাফট নামাতে হলে মন্দ হয় না—

কি হয় ?

হাসছে সবিতাব্রত । জবাব দিল না । কিন্তু না দিলেও বুঝতে কষ্ট হল না । কি হয় সেটা ত্যর চোখেই লেখা ।

মালা বিশ্বাস রাগ করে বলে, আর একদিন তাই পরখ করে দেখুন তাহলে—দৃষ্টি খুলেও যেতে পারে আপনার । এতদিন যাদের নিয়ে কাটালেন, আমাকে কি তাদের একজন মনে হয় নাকি ?

সবিতাব্রত হাসে মৃদু মৃদু । তারপর বলে, আমি কোনোদিন কাউকে নিয়ে কাটাইনি, তবে তুমি ওদের মত নও বটে, তুমি ওদের থেকে অনেক চালাক, আর তোমার দাপটও অনেক বেশি । আর তোমার...

শেষ করল না । হাসছে অল্প অল্প । তার দেহতটে কথার খেই হারানো এই চোখের বিচরণ আরো অনেকদিন লক্ষ্য করেছে । আর কি বলতে যাচ্ছিল তাও জানে মালা বিশ্বাস । তার রূপের জোর বেশি, দেমাকও বেশি । ব্যস, এইটুকুই শুধু তফাত তার চোখে। নিজেকে সে ধরে রাখতে জানে বলে অন্য মেয়ের থেকে সে শুধু বেশি চালাক, আর কিছু নয় । সে বেশি চালাক আর বেশি রূপসী বলেই তার আকর্ষণ, আর কিছু নয় ।

লোকটার মনটাকে মালা বিশ্বাস অনেক দিন ধরতে চেষ্টা করেছে । কর্মরত ক্যাপ্টেন নন্দীর মন এর থেকে অনেক প্রাঞ্জল, অনেক স্পষ্ট । দেখলে শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় । বিপদের সময় কাউকে দিশেহারা হতে দেখলে যেভাবে গর্জন করে ওঠে, ভাবতে গেলেও ভালো লাগে । কিন্তু এই মনের সঙ্গে মালা বিশ্বাসের আপস নেই । সেদিনের সেই বড় সিঁদুরের টিপপরা মহিলাকে যতবার মনে পড়েছে ততোবার অবাক হয়েছে সে । ক্যাপ্টেনের সেই আচরণ বিস্ময়কর লেগেছে তার । আত্মীয়া হলেও কথা ছিল, মহিলা তার পরিচিতাও নয় । অথচ বিদায়ের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যেন তার ভাবনাতেই অস্থির ।...কিন্তু অল্প বয়সী মেয়েদের সঙ্গে এই লোকেরই এমন ব্যবহার কেন !

ইচ্ছে করলে মালা বিশ্বাস এখন কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে বোধহয় । বিয়ের ধাপে এসে পৌঁছুতে পারে । বহু এয়ারহোস্টেসের যা কাম্য । নিষেধের গণ্ডি ঘোচানোর জন্য ওই লোক এখন বিয়ে করতেও আপত্তি করবে বলে মনে হয় না । কিন্তু মালা বিশ্বাস কি পাবে ? কে আসবে তার কাছে ? যে আসবে সে কোন্ মন নিয়ে আসবে ? মালা বিশ্বাসকে ? সে কি শুধু দেহ ? শুধু এই দেহতট? পুরুষের ওই চোখে একদিনের জন্যেও কি সে স্নেহ দেখেছে ? প্রীতি দেখেছে ? ভালবাসা দেখেছে ? না, প্রকৃতির বাসনাতপ্ত অসম্মান দেখেছে, অসহিষ্ণু তাড়না দেখেছে ? তার কাছ থেকে কি পাবে সে ? কত দিন পাবে ? সঙ্গে সঙ্গে সেই বান্ধবীর মুখখানা মনে পড়েছে । সে লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছিল। অর্থাৎ ক্যাপ্টেনকে বিয়ে করতে পেরেছিল । আর তারপর, সদা সংশয় আর আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটে যার ।

সকালে ঘুম ভাঙতেই জানলার পরদার ওপর দিয়ে সামনের বাড়িটার ছাদের দিকে

চোখ পড়তে মনটা খারাপ হয়ে গেল মালা বিশ্বাসের ।

আর উঠে পরদা টেনে দিতে হবে না বা জানলা বন্ধ করতে হবে না । উল্টো দিকের বাড়ির ছাদের সেই ভদ্রলোক আর ওখান থেকে এই ঘরের ভিতরে দৃষ্টি চালাবে না । কোনদিন না । কাল লোকটা একটা ট্রাকের ধাক্কা খেয়ে চোখ বুজেছে । মালা বিশ্বাস দেখেনি, শুনেছে। রাস্তা দিয়ে একটা পাগলী গান করতে করতে যেত । সেই পাগলীকেও অনেক দিন দেখেছে। খুব খারাপ লাগত, এক একদিন রাগই হত । অভিজাত পাড়ায় কেন আসত কে জানে, কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাতো না । ট্রাকের নিচে তারই পড়ার কথা ; চোখের সামনে অনিবার্য অঘটন হয় দেখে লোকটা নাকি মুহূর্তের ঝোঁকে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গিয়ে নিজে চাপা পড়েছে ।

মালা বিশ্বাস ভাবছে । লোকটাকে কখনো ভালো মনে হয়নি তার ; আজও ভালোমন্দ বিশ্লেষণ করছে না । তার দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু তলায় তলায় কি একটু আশাও হচ্ছে । নিজের অগোচরেও সব মানুষেরই একটা মন থাকে হয়ত, সব মন্দের মধ্যেও যে মন এক মুহূর্তে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে । ওই শূন্য ছাদটার দিকেই চেয়ে ছিল মালা বিশ্বাস । ভদ্রলোককে যদি আজও সেখানে দেখা যেত তাহলে বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, সে বোধহয় উঠে হাসিমুখে এই জানলায় গিয়ে দাড়াতে পারত । সাদরে তাকে ঘরে এনে বসাতেও পারত একদিন ।

কিন্তু তা আর হবার নয় ।

মাঝে দু'মাস আড়াই মাস এক ধরনের শান্ত শূন্যতার মধ্য দিয়ে কেটে গিয়েছিল, ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী বিদেশে চলে গিয়েছিল । অনেকদিন ধরে যাবে যাবে করছিল, কিন্তু যায়নি কেন, মালা বিশ্বাস তাও অনুমান করতে পারে । তারপরে হুট করে একদিন চলে গেছে । যাত্রার আগের সন্ধ্যায় এসেছিল । বলেছে, কাল যাচ্ছি ।

উড়োজাহাজের কর্মীরা সাগর পারাপারের ব্যাপারটাও কলকাতা-দিল্লী করার মতই সহজ চোখে দেখে । আগে থেকে এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনায় রোমাঞ্চ তেমন বোধ করে না । সবিতাব্রত তো নয়ই । তাই সে-যে যাচ্ছে এটুকুই আগে জানিয়েছিল তাকে, কবে যাচ্ছে সেটা মাত্র আগের সন্ধ্যায় শুনল ।

বুঝেও প্রায় নির্লিপ্ত মুখেই সে জিজ্ঞাসা করেছে, কোথায় ?

সবিতাব্রত দুষ্টুমি করে জবাব দিয়েছিল, রেজিষ্ট্রি অফিসে নয়—

এ-ধরনের আলাপচারীতে নিজেও কম যায় না । নিরীহ মুখে আবার জিজ্ঞাসা করেছে, তার থেকেও কাছাকাছি কোথাও ?

সবিতাব্রত হাসছিল মিটিমিটি । চেয়ারে না বসে শয্যায় তার পাশেই বসেছিল ।—তাহলে তুমি বলতে চাও রেজিষ্ট্রি অফিসটা কাছে নয় খুব ?

মালা বিশ্বাস একটু ভেবে জবাব দিয়েছে, ডালহৌসি স্কোয়ারে একটা আছে শুনেছিলাম, ঢুকলেই ঘুষ-ঘাস দিতে হয় নাকি ।

বলে বিপদে পড়েছিল । উৎফুল্ল মুখে সবিতাব্রত এগিয়ে আসার উপক্রম করেছিল । বলেছে আমি ঘুষ দিতে রাজি আছি—শুধু রাজি আছি না, ঘুষ দেবার জন্যে একেবারে হাঁস ফাঁস করছি ।

ভিতরে ভিতরে বিচলিত মালা বিশ্বাস, ভাব-গতিক ভালো ঠেকেনি । কিন্তু বাইরে আরো

গম্ভীর ।—ঘুষ যে দেয় আর ঘুষ যে নেয়—দুই-ই আসামী ।

সবিতাব্রত মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করেছে, সে-তো ধরা পড়লে—

ধরা পড়েছেন, আসামীর প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নেই । বেগতিক দেখে সে-ই উঠে এসে চেয়ারে বসেছিল ।

ব্যবধান রচনার এই চেষ্টা বা চাতুরীটুকু সবিতাব্রতর না বোঝার কথা নয় । ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসছিল তেমনি । আর, মালা বিশ্বাস অস্বস্তি বোধ করছিল । কিন্তু অবাধ্য প্রবৃত্তি শেষ পর্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল না । দূরে যাচ্ছে বলে প্রত্যাশা আরো নিবিড় করে তুলতে চাইল না দেখে, মনে মনে হাঁপ ফেলে বাঁচল মালা বিশ্বাস ।

শুধু বলেছিল, আচ্ছা ঘুরে আসি, ততদিনে আর কারো ওপরে যেন সহানুভূতিশীলা হয়ে প'ড়ো না ।

প্রথম ক'টা দিন মালা বিশ্বাসের ফাঁকা ফাঁকা লেগেছিল সন্দেহ নেই । সংগোপনে প্রতীক্ষাও করছিল হয়ত । কিন্তু সে ফিরে আসার পর এই একমাস ধরে আবার যেন আরো খরতর বেগের সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে তাকে । সে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাঝের একটানা অনুপস্থিতি মুছে গেছে । এসেই বলেছিল, এবারে শুধু সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই ।

এদিকে অবকাশ একটু বেড়েছে মালা বিশ্বাসের । যে আকাশে তারা নির্বিঘ্নে চলা-ফেরা করত, সেই আকাশে হঠাৎ যুদ্ধের মেঘ দেখা দিয়েছে এক টুকরো । দেশের শান্তি নাড়াচাড়া খেয়েছে এক প্রস্থ । চীনের হামলা শুরু হবার পরে সিভিল অ্যাভিয়েশনের কিছু এয়ারক্রাফট সৈন্যদের সরবরাহের কাজে টেনে নেওয়া হয়েছে । ফলে এদিকের সার্ভিসের সংখ্যা কমেছে। তাদেরও ওভারটাইম ডিউটি কমেছে । মালা বিশ্বাসের কাজ থাকলেও অশান্তি, না থাকলেও অশান্তি ।

সেদিন শিবলাল এসে জানিয়েছিল, সে মিলিটারী এয়ার সার্ভিসে ঢুকে পড়ার কথা ভাবছে । এখন সেখানে অনেক লোক দরকার, এ-সময়ে একটু চেষ্টা করলেই পেয়ে যাবে। এখানকার শুকনো নীরস জীবন ভালো লাগছে না তার । এ-ভাবে বেঁচে থেকে লাভ নেই, দেশের কাজে প্রাণ গেলেও সান্ত্বনা থাকে একটু । কি আশা করে এসেছিল সে কে জানে, ভেবেছিল মিস বিশ্বাস বুঝি বকে ঝকে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করবে ।

কিন্তু বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়ে উল্টে মালা বিশ্বাস উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল । বলেছিল, খুব ভালো, কি একঘেয়ে কাজ এখানে, আমাকে নেয় না ?

শিবলাল বিরস মুখে বলেছে, চেষ্টা করে দেখতে পারো, কিন্তু তোমাকে দিয়ে তাদের কোন কাজ হবে ?

দিদি একদিনও ডাকেনি, উল্টে দিব্বি বেখাপ্পা ধরনের ফাজলামী শুরু করেছে ও সম্প্রতি । মালা বিশ্বাস হেসে ফেলেছিল, কিছু কাজ হবে না, না ?

এয়ার হোস্টেস নিয়ে কেউ যুদ্ধ করতে যায় না—তবে তোমাকে পেলে তারা লুফে নিতে পারে ।

শিবলালের কথাবার্তা, আচরণ আরো বেশি বিরক্তিকর লাগে আজকাল । মাঝে রীতিমত বাড়াবাড়িই শুরু করেছিল । ক্যাপ্টেন নন্দী ফিরে আসার পর একটু ঠাণ্ডা হয়েছে ।

টেলিফোন বেজে উঠল। এই সাত সকালে কে আবার ! শুয়ে শুয়েই রিসিভার টেনে নিয়ে সাড়া দিল মালা বিশ্বাস।

ওদিকে কথা বলছে ক্যাপ্টেন নন্দী, সকালের কাগজ দেখে এয়ার হোস্টেসরা সব এতক্ষণে নাচ-গান জুড়ে দিয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করছে। কাগজ এখনো দেখিনি শুনে ঠাট্টা করল, সে-কি, শিগগীর দেখো, এয়ার হোস্টেসরা বিয়ে করতে পারবে সেই আইন পাসের তোড়জোড় চলছে, তোমাদেরই তো আনন্দের দিন এখন।

কিছুকাল ধরেই এ-রকম একটা দাবির হাওয়া উঠেছে বটে। সমস্ত সংস্থার এয়ার হোস্টেসরা মিলিত দাবি পেশ করেছে, চাকরির শর্ত বদলাতে হবে, তাদের সংসারে প্রবেশের অধিকার দিতে হবে। মালা শ্লেষ দিয়ে বলল, আনন্দটা তো আপনারই বেশি মনে হচ্ছে।

আমার ! প্রতিবাদের সুরটা জোরালো শোনালো।—কর্তাব্যক্তিরা আমার পরামর্শ নিলে আমি বাধা দিতাম। এখানকার এই মেয়েরা বিয়ে করলে কতগুলো লোকের ঘর গেল আমি সেই হিসেব করছিলাম। রসিকতা করছে কি সত্যি সত্যি ক্ষোভ প্রকাশ করছে, সঠিক বোঝা গেল না। আরো বলল, তবে আইন পাস হতে হতে তোমাদের চুল পাকবে এই যা ভরসার কথা।

এই ধরনের উক্তি শুনলে মালা বিশ্বাসের রাগ হয় বলেই বেশি করে বলে কিনা কে জানে। জিজ্ঞাসা করল, তা এখন টেলিফোন কেন, এই ভরসার কথাটা শোনাবার জন্যে ?

না। আজ ওভারটাইম নাওনি তো ?

নিইনি না, পাইনি।

গুড। আমারও এক্সট্রা ডিউটি ক্যানসেল করে দিতে পারি, যদি বলো—।

বলি না।

এখন থেকে রাত পর্যন্ত প্রোগ্রাম করার ইচ্ছে ছিল।

করুন। আমার অন্য প্রোগ্রাম আছে। তাছাড়া সন্ধ্যায় ঘোষালের বিয়ের নেমন্তন্ন না ?

হ্যাং ইট, আবার বিয়ে। ঝপ করে টেলিফোন নামিয়ে রাখার শব্দ। এ-ধরনের অসহিষ্ণুতাও নতুন কিছু নয়।

মালা বিশ্বাস উঠল। সামনের বাড়িটার দিকে চোখ পড়তে মনে হল, ওই শূন্য ছাদের কাছটা থেকে কি-যেন একটু আশার ইঙ্গিত আসছে। বাইরে থেকে মানুষকে যেমন দেখা যায় সেইটুকুই সব নয় !...ওখানকার ওই লোকটা বিকৃত মস্তিষ্ক একটা মেয়ের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়েছে। আশ্চর্য। দরজার ফাঁক থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে এক নজর দেখে নিল। তাদের প্রসঙ্গেই একরাশ লেখা বটে, আন্তর্জাতিক প্রস্তাবনা। মালা বিশ্বাসের তেমন উৎসাহ নেই খুঁটিয়ে পড়ার।

সবিতাব্রতকে একেবারে বাজে কথা বলেনি। হাতে কাজ কিছু আছে বটে। একেবারে স্নান-টান সেরে বেরুবে। নিজের কতগুলো কেনাকাটা আছে। তা'ছাড়া ভালো দেখে একটা উপহারও কিনতে হবে। বিয়ের উপহার। অফিসের অ্যাকাউন্টস-অফিসারের বিয়ে, অনেক করে বলেছে যাবার জন্য। এ-সব সামাজিকতা রক্ষা করা বড় হয়ে ওঠে না তাদের। তবু অফিসের লোক, কথা দিয়েছে যাবে।

সমস্ত দিন শুয়ে বসেই কাটাল একরকম । লোকটাকে বিমুখ করার পর নিজের মেজাজও খুব প্রসন্ন নয় । মন থেকে বিমুখ কবতে পারে না বলেই বিরক্তি । যা কবে আত্মরক্ষার তাগিদে করে । কিন্তু এই তাগিদ সব সময় বড় হয়ে ওঠে না বলেই মেজাজ বিগড়য় আবার ।

সন্ধ্যার পর বিয়ে বাড়িতে হাজির হল ।

কিন্তু না এলেই বুঝি ছিল ভালো । যার বিয়ে তার আদর আপ্যায়নে ত্রুটি হয়নি কিন্তু বাড়ির লোকের উৎসুক হাবভাব দেখে বড় অস্বস্তি বোধ করছিল মালা বিশ্বাস । আরো কয়েকজন এয়ার হোস্টেস এসেছে । এত মেয়ে পুরুষের মধ্যে তারা সেই ক'জন যেন এক বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী । বাড়িব মেয়েরা এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছে তাদেব । তারা যেন সাধারণ নয়, আবার খুব সম্মানিত অসাধারণও নয় । সমাজেব মেয়ে নয় যেন তাবা, অথচ সমাজে এসেছে । তাই তাদের সম্পর্কে কৌতূহল । মুখ দেখে তাদেব ভিতরের জটিলতা আঁচ করার চেষ্টা ওদের ।

ওদেব ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত এবং অন্যান্য পাইলটদের প্রতি সকলে একটা ভারী শ্রদ্ধার ভাব দেখলে সে । আগ্রহে বোকার মত কে কত রকম প্রশ্ন করছে ঠিক নেই । ওরা যেন সাংঘাতিক পর্যায়ের অভিযাত্রী এক একটি—কত রকম আপদ বিপদ ঝড় ঝঞ্ঝাব মধ্যে পড়তে হয় সেই খোঁজ নিচ্ছে । আর আত্মমর্যাদায় ডগমগ করছে ক্যাপ্টেন সব ।

এখানে এসে সবিতাব্রতর মেজাজ ভালো হয়েছে । খুশি ভরা দুই চোখ অনেকবার মালা বিশ্বাসের দিকে ফিরেছে ।

বাড়ির পথ । সবিতাব্রত ড্রাইভ করছে । ড্রাইভ যখন কবে, কত স্পীড-এ করে ঠিক খেয়াল থাকে না । মালা বিশ্বাস পাশে বসে । চুপচাপ খানিক দূবে এসে হঠাৎ ফিবে তাকালো – আস্তে চালান, এটা এবোপ্লেন নয় । এত আনন্দ কিসের ?

সবিতাব্রত হাসি মুখে বলল, বড় ভালো লাগল ওদের, আসব না ভেবেছিলাম, না এলে ঠকতাম ।...বউটা বেশ, ঘোষালেব• মুখে হাসি ধরে না । তোমার কেমন লাগল ?

আমাদেব আর লাগা না লাগাব কি, আপনাদেব মত তো আব আদর অভ্যর্থনা পাই না, যেখানে যাই সকলে চেয়ে চেয়ে দেখে, আমাদের মত মেযেরা কেমন । আমরা হলাম ছাপ-মারা মেয়ে, বুঝলেন ?

উক্তির মধ্যে ঝাঁঝ ছিল । সবিতাব্রত ঘাড ফিরিয়ে দেখল একবার । তারপর নিস্পৃহ মন্তব্য করল, একেবারে তো মিথ্যে নয় ।

এ-ধরনেব বিরূপ মন্তব্য অনেক শুনেছে, কিন্তু আজ হঠাৎ ভিতরটা এমন তিক্ত হয়ে উঠল কেন নিজেও জানে না । জবাব দিতে গিয়েও দিল না । ঈর্ষাদগ্ধ মেয়ের অকারণ ঝগড়ার মত শোনাবে । বিযে বাড়িতে এই লোককে এত খুশি না দেখলে এই মেজাজে ফিরত কিনা সে-কথা ভাবতেও আপত্তি । সরোষে আবার সামনের দিকেই মুখ করে বসে রইল সে ।

পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে বাড়ি এসে গেল । সবিতাব্রতও নেমে পড়ল তার সঙ্গে । নামবে জানাই ছিল ।

ঘরে এসে বসল । ক্লান্ত লাগছে । বিয়ে বাড়ির জামাকাপড বদলাতে পারলে ভাল

লাগত। একটাই ঘর, আপাতত তা সম্ভব নয়। তার এই একটু বাড়তি সাজসজ্জা যে ওদিকে মনে ধরেছে বেশ, মালা বিশ্বাস তাও অনুভব করতে পারে।

গা-ছেড়ে ইজিচেয়ারে বসে সবিতাব্রত আর একবার যেন খুঁটিয়ে দেখে নিল তাকে। তারপর বলেই ফেলল, তোমাকে আজ অন্য রকম লাগছে, এই সাজে তোমাদের দেখিনে বলেই হয়ত এত ভালো লাগছে।

এই ভালো-লাগা আগেও গোপন ছিল না, এখনো না। মালা বিশ্বাস তেতে উঠল তক্ষুনি।—ছাপ-মারা মেয়ের মত লাগছে না, না?

মাথা নাড়ল। লাগছে না। পা নাচিয়ে হাসছে অল্প অল্প, চোখ দুটো যেন তার মুখখানাকে আঁকড়ে আছে। হঠাৎ বলল, দেখো, এই সব বিয়ে টিয়ে দেখে আমিও একটা বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করেছি।

মালা বিশ্বাসের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হল কয়েক মুহূর্তের জন্য। সে জানে, ভাবতে শুরু করেছে। আর কেন শুরু করেছে, তাও জানে। না ভাবলে যদি চলত তাহলে ভাবত না। মিস ইয়ংয়ের বেলায় ভাবেনি, রোজা গ্রাণ্ডের বেলায় ভাবেনি, কমলা ব্যাসের বেলায় ভাবেনি—শুধু তার বেলায় ভাবতে শুরু করেছে। বক্র চোখে দেখল একবার, বক্র সুরে বলল, ভাবনাটা কি কোন ছাপ-মারা মেয়েকে নিয়ে?

হ্যাঁ।

তাহলে ছাপ-মারা মেয়েরও একটা ভাবনার দিক থাকতে পারে। আপনারা তাদের চোখে অন্তত অবতার কিছু নন। আপনি ভাবছেন বলেই কি সকলে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হবে?

সবিতাব্রতর মুখে ছদ্মগাম্ভীর্য।—না, তা হওয়া উচিত নয়, আর তা তারা হয়ও না। তারা লাভ ক্ষতি তলিয়ে দেখে। যাক, ছাপমারা মেয়ের ভাবনার দিকটা শোনা যাক।

মালা বিশ্বাস হাসল।—ও কথা থাক এখন। কিন্তু এমন মেয়ে বিয়ে করলে আপনার ঘর যাবে যে!

ঘরের থেকে আপাতত অন্য লোভ বড়।

মালা বিশ্বাসও গম্ভীর।—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। হাসল, এখন উঠুন আপনি, এরপর এ-বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা আমাকে তাড়াবে।

সবিতাব্রতর ঠোঁটে হাসি কিন্তু ভুরু কোঁচকানো।—তুমি আমাকে এত অপমান করতে সাহস করো কি করে — সবসময় খেয়াল করি না, পরে ভেবে দেখি, ফাঁক পেলেই যা খুশি বলে বসে থাকো তুমি। আর আমিই বা গাধার মত আজকাল সহ্য করি কেন ভেবে পাই না।

সে হাসি মুখেই বিদায় নিয়েছে এরপর। মালা বিশ্বাসও হাসি মুখেই বিদায় দিয়েছে।

কিন্তু তারপরেই গম্ভীর। জানত এই প্রস্তাব এলো বলে। যে সমস্যার নিপীড়নে এতদিন ভুগছে, আনন্দের বদলে সেটাই দ্বিগুণ হল।...বিয়ের পর এয়ার হোস্টেসের চাকরি যাবে। ইচ্ছে করলে আর বরাতে থাকলে বড়জোর সে অফিসে গ্রাউণ্ডেড হতে পারে। কিন্তু ঘরণী এ-সব সামান্য চাকরি করলেও ক্যাপ্টেনদের মান খোয়া যায়।

মোটকথা, বিয়ে হয়ে মালা বিশ্বাস এ-ভাবে আর আকাশে উড়বে না। ক্যাপ্টেনের

সঙ্গে তখন অন্য এয়ার হোস্টেস উড়বে । বাইরে যাবে, রাত কাটাবে । রোজা গ্র্যাণ্ডের মত, মিস ইয়ংয়ের মত, পার্বতী রাণ্ডের মত,.কমলা ব্যাসের মত আবার কেউ কাছে আসবে । অনেক আসবে । অন্তরঙ্গ হবে । সে-ক্ষেত্রে তার প্রতি নিছক এই মোহ কতদিন থাকবে ? ঘরে বসে মালা বিশ্বাস তখন কোন্ শূন্যতা নিয়ে অপেক্ষা করবে ? তখন কি সে এই লোকের করুণার প্রত্যাশায় চেয়ে থাকবে, বিশীর্ণ ভিক্ষার প্রতীক্ষায় অবসর গুণবে ? রোজা গ্র্যাণ্ড, মিস ইয়ং, পার্বতী রাণ্ড, কমলা ব্যাস, এমনি কি অদেখা মায়াদির থেকেও এমন কি ভালো অবস্থা হবে তার ? ভালো হলেও সংশয়ের বিষ সে কাটিয়ে উঠবে কেমন করে । অনেক দেখে চোখ বিষিয়েছে তার । অবিশ্বাস অকারণে উঁকিঝুঁকি দিলেও তো দুঃসহ যন্ত্রণা । শেষ পর্যন্ত কোন্ সম্বল নিয়ে ঘর করার আশায় আজ নিশ্চিন্তে সাড়া দিতে পারে সে ?

...প্রেম প্রীতি ভালবাসার বিয়ে নয় । দেহের বিয়ে । লোকটা কি চোখে দেখে তাদের মর্মে মর্মে জানে ।

তবু আশা, এই জানাটাই হয়ত শেষ জানা নয় । অন্ধকারে জানলা দিয়ে উল্টোদিকের ছাদটার দিকে চোখ গেল মালা বিশ্বাসের ।

চীনের হামলা ঘোরালো হয়ে উঠতে ফ্লাইট সিডিউলে ও ডিউটিতে পরিবর্তন ঘটেছে । অবশ্য এটা সাময়িক । সকলেই আশা করছিল, এক কালে যারা বন্ধু ছিল, তারা সত্যিই এতটা অবুঝ হবে না, ততো হিংস্র হয়ে উঠবে না । তাদের সুবুদ্ধির উদয় হবে । আর তখনই আবাব সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে ।

এক সপ্তাহের জন্য মালা বিশ্বাসের ডিউটি বদল হয়েছিল । সে স্বস্তিবোধ করেছিল তাতে । ভেবেছিল ঠাণ্ডা মাথায় একটা ভাবনা-চিন্তার অবকাশ মিলবে । মিলে ছিল, কিন্তু তাতে ভাবনার অবসান কিছু হয়নি ।

এই ক'টা দিন সবিতাব্রতকে একরকম এড়িয়েই চলেছিল সে । দিন দুই দেখা হয়েছে মাত্র । কথাও সামান্যই হয়েছে । রাত্রিতে অ্যাপয়েন্টমেন্টও করতে চেয়েছিল তার সঙ্গে। বলেছিল, কথা আছে । মালা বিশ্বাস এটা সেটা বলে কাটান দিয়েছে । সবিতাব্রত কিছু আঁচ করেছে হয়ত, তাকে স্পষ্টই অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে দেখা গেছে । সেদিন হেসেই টিপ্পনী কেটেছিল, মেয়েরা একটু খেলাতে ভালবাসে বোধহয়, কিন্তু পাত্র বিবেচনায় ভুল হলে গণ্ডগোল বেধে যায় । এমন কি নিয়ে ব্যস্ত তুমি ?

মালা বিশ্বাসও সাফ জবাব দিয়েছিল, মেয়েদের সম্পর্কে কিছু আর জানতে বাকি নেই আপনার । আমি কি নিয়ে ব্যস্ত তার জবাবদিহি আপনার কাছে করা খুবই দরকার ভাবছেন আপনি ?

মুখের দিকে চেয়ে উষ্মার কারণ বুঝতে চেষ্টা করেছিল সবিতাব্রত । তারপর বলে উঠেছে, তোমার রাগ দেখতে আমার যদি অত ভালো না লাগত, তাহলে এতদিনে গণ্ডগোলের ব্যাপার হয়ে যেত কিছু...

মালা বিশ্বাসও হেসেই ফেলেছিল ।

এক সপ্তাহ বাদে আবার তার এয়ারক্রাফটএ ডিউটি পড়েছে ।

সবিতাব্রতর তখন মাদ্রাজ যাতায়াতের ডিউটি । দিন তিনেক নিরুপদ্রবে কেটেছে ।

সেদিন সকালে ওড়ার আগেও বেশ হাসি-খুশি স্বাভাবিক দেখেছে তাকে । ওড়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফুর্তিতে ছিল । মালার উদ্দেশে হালকা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে সহকর্মীদের আনন্দ দিয়েছে ।

কিন্তু হঠাৎ একসময়ে চুপ একেবারে ।

তার এই পরিবর্তন সকলেই লক্ষ্য করেছে । শিবলাল প্রায় অকারণেই ধমক খেয়ে বাইরে এসে গজগজ করেছে । রেডিও এঞ্জিনীয়ার, এক ফাঁকে মালাকেই জিজ্ঞাসা করেছে, ক্যাপ্টেনের মেজাজ বিগড়লো কেন হঠাৎ ? ভয়ানক গম্ভীর...

মালা বিশ্বাস কফি নিয়ে এসে সাড়া না পেয়ে ফিরে গেছে । এই মুখ দেখে বিরক্ত করতে ভরসা পায়নি সেও ।

সন্ধ্যায় ফেরার কথা । কিন্তু বিকেলের আগে হোটেলে বসেই খবর পেল, ক্যাপ্টেন ফ্লাইট ক্যানসেল কবেছে । সামান্য কি একটা কল বিগড়েছে না কি বিগড়াবার মত হয়েছে । মোট কথা, ক্যাপ্টেনের কিছুই মনঃপূত হচ্ছে না, কল-কব্জা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে, ফিরতি ফ্লাইট বাতিল করেছে । আবার এ নিয়ে বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে রেগেও যাচ্ছে ।

এ-সব বড় এয়ারক্রাফটএর ফ্লাইট নাকচ করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েই থাকে। যাত্রীদেব জন্যে অন্য ব্যবস্থা করতে হয় । তাই বিশেষ কারণ ভিন্ন এভাবে ফ্লাইট বাতিল কেউ করে না । কিন্তু এই বিশেষ কারণটাই সহকর্মীরা অন্তত ঠাওর করতে পারছে না । ক্যাপ্টেনের আচরণ তাদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকছে । কাছে যেতে ভরসা পাচ্ছে না বটে, কিন্তু সকলেই লক্ষ্য করছে তাকে । তার সিদ্ধান্তের ওপর কাবো কিছু বলার নেই আর ছুটি মিললে তার মতে সায় দিতেই বা আপত্তি কি ।

তবু নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় ফ্লাইট এঞ্জিনীয়ারের সংশয়োক্তি কানে এসেছে মালা বিশ্বাসের, এঞ্জিনেব কল বিগডলো কি ক্যাপ্টেনেব মেজাজের কল বিগড়লো কে জানে !...ও হে শিবলাল, ব্যাপারটা কি চুপি চুপি তোমাব লেডীকেই একবাব জিজ্ঞাসা করে দেখো না।

মালা বিশ্বাস হঠাৎ অতিবিক্ত সচেতন হয়ে উঠল কেন জানে না । সবিতাব্রতর সামনে সে এর পরেও অনেকবার এসেছে । কেমন অন্যমনস্ক মনে হয়েছে তাকে । অন্যমনস্কের মত সবিতাব্রত তাকে লক্ষ্য করেছে কয়েকবার । মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ভেবেছে । এই ভাবনাও আত্মকেন্দ্রিক মনে হয়েছে ।

মালা বিশ্বাস অস্বস্তি বোধ করতে লাগল । অনেকদিন বাদে হঠাৎ ডিক্রুজের কথা মনে হল তার । সঙ্গে সঙ্গে এক অবাঞ্ছিত স্মৃতি নতুন করে গ্রাস করতে এগিয়ে এলো তাকে। মাদ্রাজে, এই হোটেলেই সেই লোকটা বেপেরোয়া হয়ে উঠেছিল, রাত্রিতে তার ঘবের দরজা ঠেলেছিল । আর আজ এই লোকটার কি হয়েছে ? অস্বস্তি স্বত্ত্বেও মুখে কঠিন রেখার আঁচড় পড়তে লাগল মালা বিশ্বাসের ।

বিকেলের দিকে ওরা সিনেমায় গেল সকলে দল বেঁধে । ফাঁক পেলে হাওয়াই জাহাজের কর্মীরা ফুর্তি করেই সময় কাটিয়ে থাকে । তাকেও ডেকেছিল । মালা বিশ্বাস একবার ভাবল যাবে। এ-রকম ভাবার কারণ শুধু একলা থাকার দায়িত্ব এড়ানো । কিন্তু কি ভেবে আবাব গেল না । সবিতাব্রত যাবে না জানে । সে নিজের ঘর থেকে বেরোয়নি বড় । সেই থেকে

চুপচাপ ঘরে বসে কি করছে কেউ জানে না ।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল ।

মালা বিশ্বাস একসময় নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলো ।

এই সন্ধ্যাটা অন্যরকম লাগছে মালা বিশ্বাসের । ঝিরঝিরে বাতাস বইছে । ও-ধার থেকে কি একটা ফুলের মিষ্টি গন্ধ আসছে নাকে । সোনার থালার মতো গোটা চাঁদ উঠেছে আকাশে। জ্যোৎস্না ঢেলে ঢেলে সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে চেয়ে যেন অন্ধকার মুছে দিচ্ছে ।

মালা বিশ্বাসের মনে হচ্ছে এই রাতটার মধ্যে কি এক সর্বনাশা ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে। যত ভাবছে, অজ্ঞাত ষড়যন্ত্রটা যেন ততো ঘোরালো মনে হচ্ছে । সে যখন আত্মপ্রকাশ করবে তখন আর সুন্দর কিছু থাকবে না । আকাশের এই জ্যোৎস্না তখন বোধহয় কুৎসিত লাগবে ।

ঘাড় ফিরিয়ে ওই দূরের কোণের দিকে তাকালো ।

চারটে ঘর তাদের । হাওয়াই জাহাজের কর্মচারীরা এলে একধারের ওই চারটে ঘরই পায় । ক্যাপ্টেনের ঘরের সামনে ছোট বারান্দা একটা । এদিক থেকে তার ঘর দেখা যায় না ।

মালা বিশ্বাস উঠল । পায়ে পায়ে সেদিকে এগুলো । কিন্তু কাছে আসতেই থমকাতে হল । বারান্দায় শিথিল দেহ ছেড়ে দিয়ে সবিতাব্রত চেয়ারে বসে আছে । তার সামনের ছোট টেবিলে মদের বোতল, সোডার বোতল । গেলাসে মদ । মালা বিশ্বাসের চমকাবার কথা নয়, অনেক দেখেছে । মদ যারা খায় সকলেই তারা ডিক্রুজের মত নয় । সবিতাব্রতকে এই প্রথম খেতে দেখল না । তবে খুব কমই খায়, আর খেলেও পরিমিত খায় ।

মালা বিশ্বাস তবু থমকালো । কারণ, এই দিনটা আর সব দিনের মত লাগছে না । কারণ, এই দিনের এক অজ্ঞাত ষড়যন্ত্র তার মনের তলায় ছায়া ফেলেছে ।

এসো— ।

দ্বিধা কাটিয়ে সহজ পদক্ষেপেই কাছে এসে একটা চেয়ার টেনে বসল সে । ভালো করে কিছু দেখে নেওয়ার বাসনা, কিছু বুঝে নেওয়ার তাগিদ ।

সাদাসিধে ভাবেই সবিতাব্রত বলল, একলা হোটেলে বসে কি করছ, ওদের সঙ্গে বেরুলে না কেন ?

এই শান্ত স্বাভাবিক উক্তির মধ্যেও ফাঁক খুঁজছে মালা বিশ্বাস । লক্ষ্য খুঁজছে, ছলনা খুঁজছে । অথচ সত্যি অন্যরকম লাগছে মুখখানা, দরদী ক্যাপ্টেনের মত লাগছে । ঈষৎ হেসে ইঙ্গিতে টেবিলের বোতল গেলাস দেখিয়ে জবাব দিল, আপনি এ-রকম একলা আছেন জানলে এসে ব্যাঘাত ঘটাতুম না ।

সবিতাব্রত খেয়াল করল না তেমন, তেমনি সাদাসিধে ভাবেই বলল, ও...এটা, আমি তো সামান্যই খাই !

মালা বিশ্বাসের ইচ্ছে করছিল উঠে আলো জ্বেলে দিয়ে মুখখানা ভালো করে দেখে । এমনিতেও দেখা যাচ্ছে অবশ্য । তবু । আলো জ্বেলে ফুলের গন্ধ জড়ানো এই জ্যোৎস্না তাড়াতেও মন সরে না । তবু ।

মনের মধ্যে এতবড় একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ চেপে রেখে মালা বিশ্বাস সাধারণ আলাপে মগ্ন হতে পাবল না। বাসনাব হীন অনাবৃত দিকটা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তো পড়ুক। এই সংশয় দুর্ভব। বিনা ভনিতায় ঝপ করে জিজ্ঞাসা করে বসল, আজ ফ্লাইট বন্ধ করে দিলেন কেন?

সবিতাব্রত এবারে সচকিত হল একটু!—কেন, ওরা কিছু বলেছে?

ঘুবিয়ে জবাব এড়ালো।—কাজ বন্ধ হয়েছে বলে ওরা খুশি হয়েছে। আমি জিগ্যেস কবছি। এঞ্জিনে কি সত্যি কিছু গলদ বেরিয়েছে? দুই চোখ তাব মুখের ওপর সজাগ, তীক্ষ্ণ।

কিন্তু সবিতাব্রত ঠিক লক্ষ্য করল না এটুকু। প্রশ্নটাই শুধু শুনেছে। জবাব দেবার আগে গেলাসটা তুলে নিল। দুই ঢোক খেয়ে আবার রাখল। তারপর শান্ত মুখেই বলল, না।

মালা বিশ্বাস এই স্পষ্ট জবাব শুনে চমকালো মনে মনে। নিজের অগোচবের আশাটুকুও নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। দৃষ্টিটা তাব মুখের ওপব তেমনি বিঁধে আছে—তাহলে?

কিন্তু লোকটা যেন আবার সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। ভাবছে কিছু। মালা বিশ্বাস দেখছে আর প্রতীক্ষা কবছে। আব নিজের অগোচরে অবাক হচ্ছে একটু একটু করে। কোনো ছলনা চোখে পড়ছে না, কোনরকম আত্মগোপনের চেষ্টা চোখে পড়ছে না। এমনকি, ওই মুখে বহুদিন যে লোভ অবাধ্য হয়ে উঠতে দেখেছে তার ছিটে ফোঁটাও চোখে পড়ছে না। এ যেন সেই চঞ্চল, দুর্দম মানুষ নয়।

বেশ একটু সময় নিয়ে সবিতাব্রত বলল, অনেক দিন আগে তোমাকে বলেছিলাম, বছরের একটা দিন আমি ফ্লাই করি না, আজ সেইদিন।...আশ্চর্য, আসাব সময় কি করে যে একেবারে ভুলে গেলাম। মাঝ রাস্তায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল—

মালা বিশ্বাস হতভম্ব। এতক্ষণ যে ষড়যন্ত্রের কথা ভেবে অস্বস্তি ভোগ করছিল, সেটা যেন এক মুহূর্তে ফিকে হয়ে গেল। চুপচাপ চেয়ে বইল খানিক।

দিনটা কি?

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এই দিনে আমাব মা চোখ বুজেছিলেন।...এই দিনটা আমার কখনো ভুল হয় না, আজ এ-বকম একটা ভুল হয়ে যাওয়াব জন্যেই মনটা খারাপ ছিল।

মালা বিশ্বাস চেয়েই আছে। মনে হচ্ছে, কানের ভিতর দিয়ে সমস্ত বুকেব ভেতবটাই যেন ভরে যাচ্ছে তার। চিন্তা গেছে, ভাবনা গেছে। এমন অনায়াসে এতবড় এক সঙ্কট পার হয়ে আসাব ভাগ্য যেন আব কারো নয়। এর পবে না হয় মালা বিশ্বাস নিজেকে দুষবে, নিজের প্রতি কটূক্তি করবে। এই মুহূর্তে শুধু শান্তি আর কিছু অনুভব করছে না সে।

একদিনের নদীর চড়ায় প্লেন নামানোর অঘটনে সেই বড় সিঁদুরের টিপ-পরা মহিলাটিকে মনে পড়ে গেল হঠাৎ। আজ যেন সবিতাব্রতব সেদিনের আচরণ আর উক্তির তাৎপর্য স্পষ্ট লাগছে তার। চেয়ারটা ছেড়ে উঠে কাছের একটা চেয়ারে এসে বসল সে। কি বলতে গিয়েও গেলাস আব বোতলের দিকে চেয়ে থমকে গেল। নরম করে বলল, আজকের দিনে

তাহলে এগুলো বাদ দিলে ভালো হত না ?

সবিতাব্রত শব্দ করেই হাসল এবারে একটু। বলল, মা বেঁচে থাকলেও এ-সবের জন্য কিছু মনে করতেন না হয়ত, আমাকে খুব ভালো করেই চিনতেন তিনি। আচ্ছা বললে যখন, থাক্—।

গেলাসের মদটা বসে বসেই গেলাস দুলিয়ে অদূরের বাগানের দিকে ফেলে দিল। এ জিনিসের প্রতি তেমন আকর্ষণ থাকলে ঠিক এ-ভাবে ফেলে দিতে পারত কিনা মালা বিশ্বাস জানে না। বেয়ারা ডেকে সবিতাব্রত সরঞ্জামগুলো নিয়ে যেতে বলল।

সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকল মালা বিশ্বাস, মায়ের গল্প বলুন শুনি। খুব ভালবাসতেন আপনাকে ?

তা তো জানি না। হাসতে গিয়ে সুদূর স্মৃতির মধ্যে ডুবল যেন।—তবে তিনি অনেকখানি জুড়ে ছিলেন বটে, আর মনে মনে আমার জন্যে বড় অস্থির হয়ে থাকতেন সর্বদা।

মালা বিশ্বাস ছদ্ম বিস্ময়ে বলে উঠল, বলেন কি, যে স্থির স্বভাবের লোক আপনি, তার জন্যে চিন্তা !

কথায় কথায় তার ছেলেবেলার অনেক কথা শুনল। কেমন করে ওড়ার নেশায় পেয়ে বসল, মা কত দুশ্চিন্তা ভোগ করতেন নিঃশব্দে। মায়ের চিন্তা দেখেই সবিতাব্রতর ইচ্ছে করত এই নেশা ছাড়তে। কিন্তু পারত না। ওড়ার ব্যাপারে চট্ করে নামও হয়ে গেছল যে।

গভীর একটা পরিতাপের ছায়া নামল মুখে ! বলল, এ লাইনে এলাম বলে মা'র সর্বদা একটা ভয় ছিল।...ভয়ের ধাক্কাটাই সামলে উঠতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত। আমি এ-পথে না এলে মা বোধহয় আর কিছুকাল বাঁচতেন।

মালা বিশ্বাস কোমল সুরে বলল, এর ওপর কি কারো হাত আছে।...তাঁর এত আপত্তি ছিল যখন, ছেড়ে দিলেন না কেন ?

আবার কিছু মনে পড়েছে বোধহয়। সেই দূরের স্মৃতির দিকে চোখ রেখেই হাসছে যেন। মাথা নাড়ল, আপত্তি ছিল না। বলল মায়ের মনে ভয় ছিল বটে, কিন্তু তিনি যে কতবড় শক্তির উৎস ছিলেন আমার, জানো না। আমার দিকে চেয়েই নিজের ভয়কে প্রশ্রয় দেন নি তিনি।...একটা মজার ঘটনা বলি শোনো। মায়ের কথা ভেবে আমি সর্বদা খুব সাবধানে এরোপ্লেন চালাতাম বলে গোড়ায় গোড়ায় অন্য পাইলটরা আমাকে খুব ঠাট্টা ইসারা করত—কাপুরুষ ভাবত। মাকে আমি একদিন সে-কথা বলেছিলাম। মা চুপ করে শুনেছিলেন শুধু, কিছু বলেন নি। এর অনেকদিন পরে, মায়ের দুশ্চিন্তা দেখে মনে মনে একবার আমি ঠিকই করে ফেলেছিলাম এ চাকরি ছেড়ে দেব। এক মা ছাড়া সে-কথা আর কেউ জানে না।

শুনে মা জিজ্ঞাসা করলেন, ছাড়তে তোর কষ্ট হবে না ?

বললাম, হবে। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি কষ্ট হয় তোমার চিন্তা দেখে।

মা হেসে বললেন, না ভেবে পারি না বলে ভাবি। কিন্তু আমার চিন্তাটা যে মিথ্যে তুই তো জানিস, তাহলে ছাড়বি কেন ? তারপর একটু ভেবে আবার বললেন ছাড়তে হবে

না, একটু সাবধানে চালাস শুধু, গোঁয়ার্তুমি করিস না। এখন কাজ ছাড়লে ওরা সকলে শুধু ভীতু বলেই জানবে তোকে, আর কিছু জানবে না।

অদ্ভুত ভালো লাগছিল শুনতে। তন্ময় হয়ে শুনছিল মালা বিশ্বাস। পায়ের শব্দে ফিরে তাকালো।

ঠোঁটে সিগারেট দেখেই বুঝল, শিবলাল। পিছনে আর দু'জন। কাছে এসে শিবলাল বক্র দৃষ্টিতে তাদের দেখে নিল একবার তারপর সবিতাব্রতকে জিজ্ঞাসা করল, এনি নিউজ ক্যাপ্টেন, কাল ফিরছি, না কালও এঞ্জিন ঠিক হবে না ?

হবে।

ওকে...। হাল্‌কা শিস দিতে দিতে চলে গেল সে।

মালা বিশ্বাসের সবুর সইছিল না। আরও শোনার আগ্রহ তাব। এবারে তার দিকে চেয়ে অল্প অল্প হাসছে সবিতাব্রত। বলল, মাকে যত বেশি মনে পড়ছিল, তোমাকেও কেন যেন ততো বেশি দেখলাম আজ। অনেকবার ভেবেছি মা তোমাকে দেখলে কেমন দেখতেন।

মালা বিশ্বাস হেসে উঠল, বলল, গাছ থেকে নেমে আসা সদ্য একটি পেত্নী দেখতেন। তারপব বলুন, মাযেব মুখে ওই কথা শোনার পর একেবারে লিণ্ডবার্গ হবার নেশা চেপে গেল বুঝি আপনাব ?

সবিতাব্রতর হাসি মুখে পবিবর্তন দেখা গেল একটু। জিজ্ঞাসা করল, লিণ্ডবার্গ কেন ?

ও-মা, আমরা তো সেই কবে থেকে আপনাব সম্বন্ধে এই এক কথাই শুনে আসছি, আপনি হলেন লিণ্ডবার্গ অফ্‌ দি ইস্ট, লিণ্ডবার্গই আদর্শ আপনার।

মুখ থেকে হাসি সম্পূর্ণই মিলিযে গেল সবিতাব্রতর। গম্ভীর। ঈষৎ অসহিষ্ণুও। যে উক্তি করল, মালা বিশ্বাস কেন—শুনলে সকলেই আকাশ থেকে পড়ত। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ সে বলে উঠল, আই হেট্‌ দ্যাট্‌ ম্যান—আমি ওই লোকটার ভাগ্যকে ঘৃণা করি।

মালা বিশ্বাস বিমূঢ়, সে কি !

হ্যাঁ। ঈষৎ অন্যমনস্কের মত আস্তে আস্তে বলে গেল, অতবড় পাইলট হয় না ; ষ্টিল্‌ আই হেট্‌, এত আদব এত সম্মান পৃথিবীর আর কোনো পাইলট পায়নি—ষ্টিল আই হেট্‌ হিজ লাক ! যেখান দিয়ে সে হেঁটে যেত লোকে বুক পেতে দিত—ষ্টিল্‌ —আমি লিণ্ডবার্গ হতে চাই না, ওর মত ভাগ্য চাই না !

মুখটা লালচে দেখাচ্ছে। মালা বিশ্বাস হাঁ করে চেয়ে আছে। সবিতাব্রত একটু থেমে আবার বলে গেল, অমন দুর্ভাগা আব কেউ আছে—ছেলের শোকে পাগলের মত হয়ে গেছল লোকটা। কোটি টাকার মালিক তবু সে কি অসহায় ! তার প্রথম ছেলে, ফুটফুটে একটা তিন বছরের শিশু—টাকার লোভে তাকে চুরি করে নিয়ে গেল কে। সমস্ত কাগজে ছড়িয়ে পড়ল সে খবর, বেবি লস্ট্‌। কে বেবি, কার বেবি আর বলতে হয় না—সকলেই জানে। গোটা দেশটাই তোলপাড় করে খুঁজে বেড়াল সেই বেবিকে ! লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করল লিণ্ডবার্গ, ছেলে পাওয়ার আশায় কত দুর্জন তার টাকায় লাল হয়ে গেল, কিন্তু কাগজে রোজ সেই এক খবর, বেবি নট্‌ ইয়েট ফাউণ্ড। তখন আধ-পাগল অবস্থা লিণ্ডবার্গের। শেষে একদিন কাগজের বড় বড় শিরোনামা শেলের মত বিঁধল সকলের বুকে,—বেবি ফাউণ্ড, বাট কিলড়্‌।

মালা বিশ্বাস আঁতকে উঠল । মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদের মত বেরুল একটা ।

ধীর গম্ভীর মুখে সবিতাব্রত বলল, যারা নিয়েছিল, বেগতিক দেখে তারা ওই শিশুকে হত্যা করে এক জায়গায় ফেলে রেখে গিয়েছিল । আই হেট্ লিগুবার্গ, আই হেট্ হিজ লাক্, ওর মত বাপের ভাগ্যকে আমি ঘৃণা করি । এ-কি শুনল মালা বিশ্বাস ? এ-কি শুনছে সে ! মালা বিশ্বাস বিশ্বাস করবে, কি করবে না ? লিণ্ডবার্গের হৃদযবিদারী কাহিনীর ভিতব দিয়ে এ কি দেখতে পেল সে ? যাকে সে এতদিন দেখে এসেছে, তার বদলে এ কোন দুর্লভ মানুষ তার সামনে বসে ? যাকে সে এতদিন খুঁজছিল, যে মনটাকে ধরার জন্যে সে এতদিন হাতড়ে বেড়াচ্ছিল—কল্পনারও কত শত গুণ বড় হয়ে আজ সে এ-ভাবে ধরা দিল তার হাতের মুঠোয় । কি ছাই ভাবছিল মালা বিশ্বাস এতদিন ? কোন্ অনিশ্চয়তার ভাবনায় অস্থির হয়েছিল ? এই মাত্র যে মানুষ ধরা দিয়েছে তাব চোখের সামনে, এর পর আব কিসের ভয় তার কোন ভবিষ্যতকে ভয় ?

বুকের ভিতরটা এ-ভাবে ফুলে ফুলে উঠছে কেন তার, আনন্দে সে কি কেঁদে ফেলবে ।

সচকিত হল মালা বিশ্বাস । উত্তেজনা সংযত করে ধীর শান্ত পায়ে সবিতাব্রত ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে । মালা বিশ্বাস দেখছে । দেখছে দেখছে দেখছে । নির্নিমেষে দেখছে ।

কোন রকমে রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে ঢুকল সে । শিবলাল, রেডিও এঞ্জিনীযাব, অনুসন্ধিৎসু চোখে বার বাব তাকাচ্ছিল তার দিকে । সবিতাব্রতও । এই দুটো ঘণ্টায় জীবনের কোন্ আলোর সন্ধান পেয়েছে মালা বিশ্বাস তা শুধু সে-ই জানে । নিভৃতের সেই আলোর বন্যা সারাক্ষণ যদি তার চোখ মুখ চড়াও করে বসে থাকে তো সে নাচার । ক'টা মুহূর্তের মধ্যে বুকের তলায কি-যে ঘটে গেল, এ সে কাকে জানাতে পারে ? এই সন্ধ্যা, এই রাত অজানা ফুলের গন্ধে মেশা এই বাতাস, যদি বুকের তলায এভাবে দোলা দিতে থাকে মালা বিশ্বাস কি করতে পারে ? ওরা সব ফিরে ফিরে দেখছে মনে হতে মুখ আরো বেশি লাল হয়েছে । পালাবার ফাঁক খুঁজছে সে ।

ঘরে এসে দরজা বন্ধ করেও কি ভেবে ছিটকিনিটা লাগালো না । পরে লাগাবে'খন । মালা বিশ্বাসের মনে হল, ঘুম এই রাতে আর একজনের চোখেও চট করে আসবে না । সবিতাব্রত আবার আসতে পারে, বসতে পারে, দু'দণ্ড গল্প করতে পারে । মনে হল, আবেগের মুহূর্তে উঠে চলে গিয়েছিল তখন, নইলে আরো কথা বলত আরো কিছু শুনতে পেত সে ।

..আসবে না হয়ত, আবার আসতেও পারে । সবিতাব্রতর এই দিনটা তো অন্য দিনের মত নয়—আসতেও পারে । ফিরে ফিরে কতবার যে সবিতাব্রত লক্ষ্য করছিল তাকে খাবার সময়, ঠিক নেই । মালা বিশ্বাস মাথা গুঁজে খাচ্ছিল, তবু দৃষ্টি এড়ায়নি । সহকর্মীদেরও এড়ায়নি । কিছু একটা ঘটেছে তাদেরও মনে হয়েছে । তারাও মুখ চাওয়া চাওয়ি করছিল, হাসি চাপছিল । সন্ধ্যার কথাবার্তার পর সবিতাব্রতর মনের ভাব অনেকটা যে হালকা হয়েছে মালা বিশ্বাস মুখ দেখেই অনুভব করেছে ।... দুটো গল্প করতে এসে এরই মধ্যে দরজা বন্ধ দেখে যদি ফিরে যায়, তাহলে যেন তারই লোকসান । বহুবার এসে এই হোটেলের এই ঘরেই রাত্রি যাপন করেছে মালা বিশ্বাস কিন্তু এমন নিঃশঙ্ক আর কখনো বোধ করেনি । আজই কিনা সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত অবিশ্বাসে মন ছেয়ে ছিল তার, সব কিছুর মধ্যে ষড়যন্ত্রের

ছায়া দেখছিল ! দরজায় ছিটকিনি না লাগানোটা এই অগোচর নিভৃতের পরিতাপ জনিতও হতে পারে ।

ঘরের জোরালো আলো ভালো লাগছে না । বেডসুইচটা জ্বেলে বড় আলোটা নিবিয়ে দিল । শুয়ে শুয়ে আবার এই সন্ধ্যাটাকেই ফিরে ভাবতে শুরু করল মালা বিশ্বাস । ভাবা যাচ্ছে না, এই আলোটাও বিবক্তিকর । ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে নিবিয়ে দিল । ঘর অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে বাইরের একফালি জ্যোৎস্না ঘরের মেঝেতে লুটোপুটি খেতে লাগল । উপুড় হয়ে শুয়ে মালা বিশ্বাস সেদিকে চেয়ে রইল খানিক ।

..কথাগুলো যেন কানে লেগে আছে এখনো । কানে কেন, কোথায় যে লেগে আছে সে ঠাওর করতে পাবছে না । সর্ব অনুভূতির মধ্যে যেন ছড়িয়ে আছে । ছেলেবেলার কথা আর মায়ের কথা, মাযেব কথা আব ওড়ার কথা, ওড়াব কথা আব এই লিণ্ডবার্গের কথা । কথা ? কথা এ-বকমও হয় '... আই হেট হিজ্ লাক্, ওব মত বাপের ভাগ্যকে আমি ঘৃণা করি ! সেই মর্মান্তিক দুর্ভাগ্যেব কথা মনে হলে চোখে জল আসে, গা শিউরে ওঠে । মালার চোখেও জল এসেছিল । গাযে কাঁটা দিয়েছিল । ব্যাকুল মুখে সে কানে আঙুল দিতে যাচ্ছিল । কিন্তু একজনের ওই দুর্ভাগ্যের খনি খুঁড়েই আর একজনের মনের নাগাল পেয়েছে সে । সেই বিদেশী পাইলটের দুর্ভাগ্যেব দর্পণে আসলে যাকে দেখা গেছে সে বিদেশী কেউ নয়, সে খুব কাছেব একজন —কাছে পেয়েও যাকে দেখতে পাচ্ছিল না, সেই একজন ।...সে ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী ।

অন্ধকার ঘবে নামটা মালা বিশ্বাসের ঠোঁটের ফাঁকে যেন বাব বাব খেলা করতে লাগল ।

কতক্ষণ বা ক'ঘন্টা কেটে গেছে জানে না । বাত কত হতে পারে ধাবণা নেই । আবেশে দু'চোখ লেগে এসেছিল । ঘুমিয়েই পড়েছিল কি না তাও জানে না ।

চমকে উঠে তাকালো হঠাৎ । জ্যোৎস্না সবে যাওয়ায ঘরটা অন্ধকাব লাগল। সমস্ত স্নায়ু এক মিনিটে সজাগ হয়ে উঠল মালা বিশ্বাসের । হৃৎপিণ্ডের ওপব সজোরে ঘা পড়তে লাগল মুহুর্মুহু । এই মাত্র কিছু একটা ঘটেছে ।...ঘবে কেউ ঢুকেছে, দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়িযেছে ।

হাত বাড়িযে বেডসুইচ জ্বালাতে ইচ্ছে করল মালা বিশ্বাসেব, কিন্তু হাত আড়ষ্ট । ...আসবে, আসবে জানাই তো ছিল । আসতে পাবে যে, সে আভাস তো মুখে লেখাই ছিল । ওই ক্যাপ্টেন এত দেখতে পায়, এই সন্ধ্যায—এই রাতেও কি তাব ভেতর দেখতে পায়নি সে । আসুক—আসতে যে পারে, সেই অভ্যর্থনায় মালা বিশ্বাসের সমস্ত মন তো অধীর আগ্রহে অপেক্ষাই কবছিল খানিক আগেও । কিন্তু তবু এই দিনে, এই ঘুমের ফাঁকে, এই নিষিদ্ধ নিভৃতে, ঠিক এই ভাবে আসবে ভাবে নি ।

এ-ভাবে এই সময় না এলেই যেন ভালো হত । এভাবে আসা এই লোককে অন্তত মানায় না । মালা বিশ্বাস কি করবে ? কি কববে এখন ।

দু'চোখ বুজে ফেলে অবশ হয়ে পড়ে রইল সে । বার বার তার বলতে ইচ্ছে করল, যে তাড়না তাকে এমন চুপিসাড়ে টেনে এনেছে এটা সেই দিন নয় । কিন্তু যে এলো তাকে ফেরাবার জোর এমন করে হারিয়ে বসল কেমন করে জানে না । এখন শুধু প্রতীক্ষা ! যেমন এসেছে তেমনি নিঃশব্দে ফিরে যদি যায় সেই প্রতীক্ষা, আবার না যদি যায় সেই

প্রতীক্ষাও ।

গেল না । বসল যেন । আর পরক্ষণে সমস্ত দেহ কেঁপে কেঁপে উঠতে চাইল মালা বিশ্বাসের । প্রাণপণে সংবরণ করল ।...মুখে গালে কপালে হাতের স্পর্শ ।

মালা বিশ্বাস কাঠ হয়ে পড়ে আছে, এই স্পর্শের প্রলেপ বুঝি সর্বাঙ্গ অবশ করে দেবে তার—মুখ থেকে গলায় বাহুতে বুকের দিকে বিচরণ করছে একটা অবুঝ হাত । মালা বিশ্বাস আর কি করবে, যে-মানুষটা ক্রমেই মুখের ওপর ঝুঁকে আসছে টের পাচ্ছে, নিজেই দুটো হাত দুর্জয় বাধা অতিক্রম করে যদি তার দুই কাঁধ বেষ্টন করে তাকে অভ্যর্থনা করে নেয়--সে কি করবে ?

পুরুষের দুটো সবল হাত অধিকার বিস্তার করছে ক্রমশ । অধরে তৃষিত উষ্ণ ঘন দুই ঠোঁটের নিবিড় নিষ্পেষণে মালা বিশ্বাস হারিয়ে যেতে লাগল ।...বিস্মৃতি, এখন বিস্মৃতির গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া শুধু ।

কিন্তু কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র ।

অকস্মাৎ কি এক চেতনা বুঝি সজোরে আঘাত করল তাকে । বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত নিস্পন্দ এক নিমেষে । পর মুহূর্তে মুখ সরিয়ে বাহুবন্ধন ছিঁড়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে মালা বিশ্বাস লোকটাকে ঠেলে দিল । আধা-আধি মাটিতেই ছিল, আচমকা ধাক্কা খেয়ে দূরে ছিটকে পড়ল সে । তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ।

বিছানায় উঠে বসেছে মালা বিশ্বাসও । অন্ধকার ফুঁড়ে দু'চোখ টান করে দেখছে । পরক্ষণে ঝুঁকে বেডসুইচ টিপে দিল ।

সামনে দাঁড়িয়ে শিবলাল । নিষ্পলক চেয়ে আছে ।

নিষ্পলক মালা বিশ্বাসও । কেমন করে অনুভব করেছে জানে না, সিগারেটের গন্ধেও হতে পারে, সবিতাব্রত সিগারেট খায় না । আবার কোনো অদৃশ্য অনুভূতির ফলেও হতে পারে ।

তুমি..! অস্ফুট আর্তনাদ প্রায় ।

পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মুখ শিবলালের, সেই সঙ্গে কাপুরুষের মুখও । দু'চোখ জ্বলছে । —হ্যাঁ । তুমি কে ভেবেছিলে ?

মালা বিশ্বাস চেয়ে আছে । গা কাঁপছে এখনো, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় সংযত করতে চেষ্টা করছে নিজেকে ।

কাল মুখ দেখাবে কি করে ? এর আগে গলায় দড়ি দিতে পারো কিনা দেখো ।

শিবলাল নির্নিমেষে চেয়ে আছে । চেয়ে আছে নয়, দুই চোখে এক রমণী-দেহ নিঃশেষে গ্রাস করছে যেন ।—দেখবো । কিন্তু দড়ি বোধহয় দুটো দরকার ।

দরজার দিকে এগিয়ে গেল । আর ফিরে তাকালো না । দরজা খুলে চলে গেল সে। মালা বিশ্বাস মূর্তির মত বসে ।

।। এগারো ।।

এক দুঃসহ অস্বস্তির মধ্যে কেটে গেল একে একে তিনটি দিন ।

দুর্যোগ কি আগে থাকতেই তার ছায়া ফেলে ? সেই থেকে মালা বিশ্বাসের সমস্ত মন এভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে কেন, কে জানে । তার কেবলই মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটবে । মাদ্রাজের এক দুর্লভ সন্ধ্যায় হঠাৎ যে আলোর বার্তা তার বুকের তলায় এসে পৌঁছেছিল সেটা বুঝি তেমনি হঠাৎই আবার নিবে যাবে । যা সে পেয়েছিল সে বুঝি স্বপ্ন ।...মরীচিকা ।

নিবে গেল । স্বপ্নের মতই, মরীচিকার মতই দূরে সরে গেল ! অন্তত, তখনকার মত সেই রকমই মনে হয় ।

প্রত্যাবর্তনের পর এ দু'দিন শিবলালের দেখা মেলেনি । ডিউটিতে আসেনি । কোনো খবরও দেয়নি । বাড়িতে পিক্ আপ গিয়ে ফিরে এসেছে । তার দেখাই মেলেনি ।

হাওয়াই জাহাজের চাকরির বাঁধা-ধরা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে এ-রকম ব্যতিক্রম বড় দেখা যায় না । সকলে আলোচনা করেছে ওকে নিয়ে, মাদ্রাজ থেকে ফেরার সময়েই নাকি ওর হাব-ভাব কি-রকম মনে হয়েছিল সহকর্মীদের । মালা বিশ্বাস নির্লিপ্ত উদাসীন তখনো ।

চীনের হামলায় হিমালয়ের শান্তি নড়েচড়ে ওঠার ফলে এদিকের ডিউটির মাথামুণ্ডু নেই । চার দিনের দিন অন্য এযাবক্রাফট-এ শর্ট ফ্লাইট ডিউটির পর এয়ারপোর্টে ফিরে এসেই মালা বিশ্বাস যে খবরটা শুনল, হৃৎপিণ্ডটা বুঝি বুক্ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে লাফিয়ে উঠতে চাইল ।

প্রথমে শুনল, গত রাত্রিতে শিবলাল আত্মহত্যা করেছে । বিষ খেয়েছে । রাতে কেউ টের পায় নি । সকালে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাকে ।

মালা বিশ্বাস নিশ্চল, নিস্পন্দ, স্তব্ধ । বাড়ি ফেরার কথা ভুলে রেস্তোরাঁয় এসে বসল চুপচাপ ।

তার কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার শুনল, আগের খবরটা ভুল । মারা যায়নি, এখনো বেঁচে আছে সে, তবে অবস্থা খুব খারাপ । ডাক্তাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ।

মালা বিশ্বাস তখনো স্তব্ধ, বাহ্যজ্ঞান রহিত ।

ধড়মড় করে উঠল একসময় । কোনো চেনা মুখের সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো । বিশেষ করে সবিতাব্রতর সঙ্গে । সে কোথায় এখন, ডিউটিতে কিনা, খবরটা শুনেছে কি না, কিছুই জানে না । মালা বিশ্বাস পরে ভাববে, বাড়ি গিয়ে ভাববে !...সবিতাব্রত এই ছেলেটাকে স্নেহ করে, ভালবাসে । তার কিছু সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক । দেখা হলে হয়ত কিছু জিজ্ঞাসা ও করবে । কিন্তু না, এখন আর কিছু ভাববে না মালা বিশ্বাস ।

যন্ত্রচালিতের মত বাড়ি ফিরল । তার পরেও নিস্পন্দ মূর্তির মত বসেই রইল চুপচাপ । জামা কাপড় বদলাবার কথাও মনে থাকল না ।

চমকে উঠল একসময় । সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে কে । চেনা শব্দ ।

. সবিতাব্রত । দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে তাকে দেখল একটু । স্বাভাবিক দেখা নয়, থমথমে গম্ভীর মুখ । আবারও চমকালো মালা বিশ্বাস, তাহলে কি হয়ে গেল সব ! শিবলালের মৃত্যুর খবরটাই সে শুনবে এখন ! জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না, ব্যাকুল চোখ মেলে চেয়ে

রইল শুধু ।

সবিতাব্রত ঘরে এলো । বসল । আবার তেমনি করেই তাকালো তার দিকে । মালা বিশ্বাস ধাক্কা খেল, মুখ দেখছে না, ভেতব দেখছে যেন । কি দেখছে !

শুনেছ তা'হলে ?

এই কণ্ঠস্বরও যেন চমকে ওঠার মতই । মালা বিশ্বাস চেয়েই আছে । শুনেছে যে সে-তো বুঝেইছে, তাবপর কি ? কিন্তু হয়ে গেছে ? কিছু জিজ্ঞাসা করা গেল না । গলা দিয়ে স্বর নির্গত হল না ।

সবিতাব্রত থেমে থেমে বলল, বেঁচে আছে এখনো । ডাক্তাররা বেঁচেই যাবে আশা করছে । আমি হাসপাতালে গেছলাম, বেহুঁশ দেখলাম ।

মালা বিশ্বাসের বুকের ওপর থেকে যেন জগদ্দল পাথর সরে গেল একটা । স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চেষ্টা কবল সে । কিন্তু স্বস্তি বোধ করল না একটুও । তাহলে এই মূর্তি কেন, এই চাউনি কেন, এই কণ্ঠস্বর কেন ?

নিস্পলক দৃষ্টিটা তার মুখেব ওপর আটকে রেখেছে সবিতাব্রত । তেমনি খুব ধীর, খুব শান্ত মুখে আবাব বলল, শিবলাল বেঁচে উঠবে ভেবে আত্মহত্যা করতে যায়নি, পবদিন আমরা তার মৃতদেহ দেখব ভেবেছিল । তাই আগের দিন ডাকে সে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল । চিঠিটা আজ সকালে পেয়েছি ।

দৃষ্টিটা বিঁধেই আছে মুখের ওপর, মালা বিশ্বাস আর বুঝি ফিবে চেয়ে থাকতে পারছে না । তেমনি ধীর স্থিব কঠিন মুখে সবিতাব্রত পকেট থেকে খাম বার কবল একটা । এগিয়ে দিল ।—দেখো ।

হাত বাড়ানো গেল না । শক্তিও নেই যেন । মালা বিশ্বাস অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কি লিখেছে— ।

তার মুখের ওপব থেকে দৃষ্টিটা নড়ছে না একটুও । থমথমে গলায় জবাব দিল, লিখেছে, তুমি গলায় দড়িও দিতে বলেছিলে দড়িটা তার পছন্দ নয়, অন্য রাস্তা বেছে নিচ্ছে ।—আর লিখেছে, মাদ্রাজের হোটেলে সেই বাত্রিতে তোমার ঘরে ও না গিয়ে আমি গেলে তোমার আপত্তি হত না, অন্ধকারে গোড়ায় আমিই তোমার ঘরে এসেছি ভেবে ওকে তুমি বেশ অভ্যর্থনাও জানিয়েছিলে । কি-রকম অভ্যর্থনা তাও লিখেছে ।...তারপর ভুল টের পেয়ে তুমি তাকে গলায় দড়ি দিতে বলেছ ।

মালা বিশ্বাস নির্বাক, পাংশু ।

গলার স্বর বদলালো হঠাৎ । ঝুঁকল তার দিকে একটু ।...এ-ব্যাপারটা তুমি আমাকে এ ক'দিনের মধ্যে বলোনি কেন ?

নিরুত্তর । দুই চোখের উদগত ঘৃণা আর বিদ্বেষ যেন মুখে এসে লাগছে মালা বিশ্বাসের ।

তেমনি ধীর কঠিন স্বরে সবিতাব্রত আবার প্রশ্ন করল, হোটেলের ঘর, একা ছিলে, রাতে তোমার ঘরের দরজা বন্ধ থাকার কথা ।...দরজা খোলা ছিল কেন ?

জবাব নেই তবু ।

চাপা গলায় প্রায় গর্জন করে উঠল সবিতাব্রত । স্পীক ! আমি কিছু শোনার জন্যে এসেছি । কেন দরজা বন্ধ করোনি ? ও যা লিখেছে, তাই ঠিক বলে, কেমন ?

মালা বিশ্বাস যেন ধীরে ধীরে আত্মস্থ হল এইবারে । সেদিনের সবকিছুর মধ্যে যা ছিল একান্ত সুন্দর—সেটাই নির্মম হাতে কাটাছেঁড়া করলে এমন কুৎসিত একটা সত্য আত্মপ্রকাশ করতে পারে, কে জানত । এই নগ্ন কুৎসিত দিকটাই যে একমাত্র সত্য নয় এ বোঝার মত কিছুই কি আর অবশিষ্ট আছে । এতবড় আঘাত মালা বিশ্বাস আর জীবনে পায়নি । এই আঘাতের ফলে এবারে জবাব দেবে সে । নিজের অগোচরে সোজা হয়ে বসল আস্তে আস্তে ।

মুখের দিকে চেয়েই জবাব দিল ।—হাঁ । ঠিক ।

তা'হলে ওই একটা সেন্টিমেন্টাল ইডিয়টকে তুমি ওই রাস্তা দেখালে কি করে ? কেউ আসবে বলেই তো অপেক্ষা করছিলে তুমি । তোমরা কি আর কেমন জেনে লোভের বশে ও যদি এসেই থাকে, তাকে এতবড় বিবেকের কথাটা বলতে তোমার মুখে আটকালো না ?

না । মালা বিশ্বাসের দৃষ্টিও স্থির, নিষ্পলক ।

আরো অসহিষ্ণু রোষে সবিতাব্রত বলে উঠল, ডিক্রুজও তোমাকে একদিন এই অপমান করতে এসেছিল, আর সেটা বড় ভয়ানক অপমান বলে মনে হয়েছিল তোমার । তখন তোমাকে আমি বলেছিলাম, পছন্দমত লোক হলে এই অপমান তোমাদের গায়ে লাগে না, বরদাস্ত করতে আপত্তি হয় না । মনে আছে ?

আছে ।

আর বসে থাকা সম্ভব হল না, অসহিষ্ণু ক্ষোভে সবিতাব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল । অশান্ত পদক্ষেপে ঘরময় পায়চারি করল কয়েকবার । মালা বিশ্বাসের নিশ্চল দৃষ্টি নিঃশব্দে অনুসরণ করছে তাকে ।

দাঁড়াল সবিতাব্রত । দেখল । কাছে এলো । যে চেয়ারে মালা বিশ্বাস বসে আছে তারই ওপর একধারে একটা পা তুলে দিয়ে দুই হাতে হাতল ধরে তার মুখের ওপর ঝুঁকে ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, রেজিষ্ট্রি অফিসে নোটিস দিতে হবে, আমাদের বিয়ে হচ্ছে কবে ?

খুব কাছাকাছি দু'জোড়া চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি বিনিময় । একটা উষ্ণ নিশ্বাস মালা বিশ্বাসের নাকে মুখে এসে লাগল । তেমনি ধীর স্বরেই জবাব দিল, আগে তোমার মাথা ঠাণ্ডা হোক তার পরে চিন্তা করা যাবে ।

এই প্রথম তুমি বলল । কিন্তু নিজেও খেয়াল করল না, সবিতাব্রতও না ।

সবিতাব্রত সোজা হয়ে দাঁড়াল একটু । দেখল কয়েক নিমেষ । বলল, মাথা আমার ঠাণ্ডা আছে । তোমাদের এই রূপ আমি নতুন দেখছি না, আমার অনেক আগে থেকেই দেখা আছে, জানা আছে । সামান্য আনন্দের লোভে তোমাদের মত মেয়ে মা হবার পরও ছেলে ফেলে চলে গেছে এমন ঘটনা আমি । ‹খছি, রোগের যন্ত্রণায় একটা শিশুকে আমি আর্তনাদ করে মরে যেতে দেখেছি—সেই কান্না আমার এখনো কানে লেগে আছে । মাথা আমার খুব খুব খুব ঠাণ্ডা আছে । কথা বাড়িও না, যা জিজ্ঞাসা করছি, জবাব দাও ।

দেহের রক্ত মুখে উঠে আসছে টের পাচ্ছে মালা বিশ্বাস ।—সরে দাঁড়াও ।

হুকুমে নয়, ভব্যতার খাতিরে চেয়ার থেকে পা নামিয়ে সামান্য সরে এলো সবিতাব্রত ।

ঈষৎ তপ্ত ব্যঙ্গস্বরে মালা বিশ্বাস বলল, এত দেখা চেনা জানার পরেও আমার মত এ-রকম একটা মেয়েকে তোমার বিয়ে করতে আপত্তি নেই বলছ ?

না। গলার স্বর অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা এবারে।—ওই ডিক্রুজ আর ওই শিবলালের থেকে আমার অবস্থাটা খুব তফাৎ নয়। তা ছাড়া নিজের কদর তুমি ভালই জানো, খুব ভালো করে জানো। জানো বলেই আমার তাড়া, বিয়ের পর ওখান থেকে সরে এলে ভবিষ্যতে এ-রকম বিপদের সম্ভাবনা যতটা কমে। আমার কথা শুনতে আজ ভালো লাগবে না তোমার, কথায় কাজ নেই, রেজিষ্ট্রি অফিসে নোটিস কবে দেওয়া হবে?

মালা বিশ্বাস এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। সর্বাঙ্গ কাঁপছে, তবু ঝলসে উঠল যেন! বলল, নোটিস দেওয়া হবে না, বিয়ে হবে না। আর কথায় কাজ নেই, তুমি যেতে পারো এখন।

মালা!

আস্তে! এটা তোমার এয়ারক্রাফ্‌ট নয়, বাড়ি। আর পাঁচজন লোক থাকে এখানে। তোমার এত দেখা এত চেনা এত জানার পরেও আরো কিছু দেখতে চিনতে জানতে বাকি আছে যদি মনে হয় কখনো, তখন এসো, ভেবে দেখব।

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা বুঝি ঘরের বাতাস পর্যন্ত টেনে নিল, শুষে নিল। তারপর সবিতাব্রত দরজার দিকে ফিরল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

পায়ের আওয়াজ কানে আসছে...তারপর মিলিয়ে গেছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে মালা বিশ্বাস দরজার কাছে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ করল। নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল আরো কিছুক্ষণ। জামা কাপড় বদলানো হয়নি। আর হলও না। শয্যায় এসে বসল। হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিল।

অন্ধকার। এমনি অন্ধকারের গহ্বরে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিল সে।

## ।। বারো ।।

অনিশ্চিত এক কালো ছায়া দেশের বুকে অনড় হয়ে বসেছে। আকাশ বাতাস, দেশের মানুষের সামগ্রিক মন অস্থির চঞ্চল। চীনের লোভ নীতির সীমা আর অধিকারের সীমানা ছাড়িয়েছে।

স্থির হয়ে আছে শুধু মালা বিশ্বাস। একটা একটা করে দিন কেটে যাচ্ছে।

সংকটজনক পরিস্থিতির সঙ্গে যোঝবার জন্য অসামরিক এয়ারক্রাফটগুলো প্রায় সবই টেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এও যথেষ্ট নয়। ছকে বাঁধা ফ্লাইট সিডিউল আপাতত স্থগিত রেখে সরবরাহের কাজে লাগানো হয়েছে প্রায় সমস্ত এয়ারক্রাফটগুলোকে। বিপজ্জনক এলাকা থেকে নাগরিক অপসারণের দায়িত্বও নিতে হয়েছে।

ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দী স্বেচ্ছায় এই কাজ আর এই দায়িত্ব নিয়ে চলে গেছে। মালা বিশ্বাসের কানে এসেছিল ইণ্ডো-বার্মা বর্ডারের দিকে আহার-নিদ্রা ছেড়ে সরবরাহ আর ত্রাণের কাজে মেতে আছে সে। পরিচিত একজন রেডিও অফিসারের মুখে প্রথম এই খবরটা পেয়েছিল।

ইণ্ডো-বার্মা বর্ডার ...অর্থাৎ বিপদের বড় মঞ্চটাই বেছে নিয়েছে। খবরটা শোনার পর ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়েছে মালা বিশ্বাস সে-কথা অস্বীকার করবে কি করে? তারপর থেকে থেকে কেবলই মনে হয়েছে, তার কোথাও একটা ভুল হয়ে গেল, বড় গোছের ভুল

কিছু । এক দুর্দম অশান্ত অবুঝকে বুঝতে হলে যে শান্ত স্থৈর্যের দরকার—সেইখানে ঘাটতি পড়েছে যেন । মালা বিশ্বাস খুঁজছে, নিজেরই অন্তস্থল আঁতিপাতি করে খুঁজছে ভুলটা কোথায় । সমরাঙ্গনের ওই দিক থেকে কেউ এলেই উদগ্রীব হয়ে ওঠে কোনো খবর মেলে কি না ।

খবর মেলে না ।

কি ভেবে সেদিন হাসপাতালে এলো শিবলালকে দেখতে । মৃত্যু না হোক, মৃত্যুর বড় কাছাকাছি পৌঁছেছিল সে । এই ধকল কাটিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগবে । তারপরেও অন্য ধকল আছে । পুলিসে টানা-হেঁচড়া করবে, কৈফিয়ত নেবে । চাকরিতেও অনেক প্রশ্ন উঠবে ।

কে এলো শিবলাল দেখছে । দেখে অন্য দিকে ফিরে ঘাড় গোঁজ করে আছে সে । মালা বিশ্বাস দেখছে দাঁড়িয়ে । বুকের ভিতরটা টনটন করছে তার ।...শরীর একেবারে অর্ধেক হয়ে গেছে শিবলালের । সেই তরতাজা জীবনী-শক্তিও ।

এগিয়ে এসে শয্যার এক পাশে বসল মালা বিশ্বাস । কয়েক মুহূর্তের সঙ্কোচ কাটিয়ে কাঁধে পিঠে মাথায় হাত বুলালো । শিবলাল অন্যদিক ফিরেই আরো বেশি করে বালিশে মুখ গুঁজল । কাঁদছে মনে হল ।

মালা বিশ্বাস হাসতে চেষ্টা করছে । হাসতে পারল । আশ্চর্য, আর যেন এতটুকু জ্বালা নেই তার, যাতনা নেই । ছেলেটার জন্য এক অপরিসীম স্নেহ ছাড়া আর কিছুই অনুভব করছে না । বলল, এই ক্যাপ্টেন দেখলে ভবিষ্যতে কেউ আর মানবে না, এদিকে ফেরো ।

শিবলাল মাথা নাড়ল শুধু । মুখ দেখাবে না । তার কাঁধ ধরে মালা বিশ্বাস নিজের দিকে টানল একটু, বলল, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি, না দেখে চলে যাব ?

ফিরল একটু বাদে । চোখ লাল ।

মালা বিশ্বাস চুপচাপ দেখল একটু । এই নিষ্প্রভ মুখ দেখে বুকে মোচড় পড়ল আবারও । বলল, তুমি অনেক অনেক বড় হবে শিবলাল, আর তখন আমিই বোধহয় সব থেকে বেশি খুশি হব ।

শিবলাল দাঁতে করে নিজের ঠোঁট চেপে রইল খানিক, তারপর বলল, আমি আরো অন্যায় করেছি, ক্যাপ্টেন নন্দীকে একটা চিঠি লিখেছিলাম...

মালা বিশ্বাস তার মুখের দিকে চেয়ে এবারও হাসতে পারল বলল, ভালো করেছিলে, ওই চিঠি লিখে তুমি আমার অনেক দায় বাঁচিয়ে দিয়েছ ।

শিবলাল বিমূঢ় মুখে তার দিকে চেয়ে কি দেখছিল সে-ই জানে । আগে যেমন দেখত সে-রকম দেখা নয় । মালা বিশ্বাস আবার আসবে কথা দিয়ে উঠে এসেছে ।

পরদিন এয়ারপোর্টে ডিক্রুজের সঙ্গে দেখা । যোগাযোগ কম হলেও তার মতিগতি কিছুটা বদলেছে মনে হয় ! আগের মত অতটা চপলতা আর নেই । তাকে দেখে ডিক্রুজ নিজেই এগিয়ে এলো । জিজ্ঞাসা করল, ফ্লাইং এনিহয়্যার ?

মালা বিশ্বাস মাথা নাড়ল ।

ডিক্রুজ বলল, তেজপুর থেকে এলাম, ক্যাপ্টেন নন্দীর সঙ্গে দেখা হল । মুখের দিকে চেয়ে সকৌতুকে অপেক্ষা করল একটু । তারপর জিজ্ঞাসা করল, তাকেও বেশ ভালো রকম

এক ডোজ দিয়েছ মনে হচ্ছে ?

ভিতরে অস্থিরতা দমন করতে চেষ্টা করল মালা বিশ্বাস। শোনামাত্র ভিতরটা অশান্ত হয়েছে বুঝতে দিল না। নির্লিপ্ত সুরেই জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছে ?

ফাইন। গত সাত দিনের মধ্যে সাত ঘণ্টাও বিশ্রাম করেনি বোধহয়, এ পারফেক্ট হ্যাগার্ড নাও—সে-ও জিজ্ঞাসা করছিল তুমি কেমন আছ। তাকেও বললাম, ফাইন, ভেরি গ্রেভ অ্যাণ্ড ভেরি ফাইন।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে শুনল মালা বিশ্বাস। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তুমি আবার কবে যাচ্ছ ওদিকে ?

জানি না, সপ্তাহে একটা করে সিভিল ফ্লাইট দিচ্ছে, নেক্সট্ উইকে যেতে পারি।

এক সপ্তাহ। দীর্ঘ এক সপ্তাহের প্রতীক্ষা। মালা বিশ্বাস যে ভুলটা খুঁজছিল তা যেন ধরা পড়েছে। তার দিক থেকে তো সব সংশয় মাদ্রাজের সেই হোটেলে, সেই সন্ধ্যায়ই ঘুচে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এমন ধারণার পুঁজি সম্বল করে বসে আছে যে আর একজন, এই লোককে ধরে রাখবে কেমন করে মালা বিশ্বাস ভেবে পায়নি বলেই এই বিচ্ছেদ। কিন্তু মানুষটার ওই বিকৃত ধারণাই যদি একমাত্র সত্যি হবে, তাহলে তার এই চলে যাওয়াটা নিজের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার মত লাগছিল কেন ? প্রতিশোধ লোকে কার ওপর নেয় ? ওই ধারণাটাই একমাত্র সত্যি হলে, মাদ্রাজে মায়ের চিন্তায় বিভোর হয়েছিল যেদিন, সেদিনই বিশেষ করে ফিরে ফিরে তাকেই দেখছিল কেন ? কেন ভাবছিল, এই মেয়েকে দেখলে মায়ের কেমন লাগত ? ...আর, এত ঘৃণাই যদি করে, দূরে গিয়েও তাকে ভোলেনি কেন ?

তার কারণ, তার সম্পর্কে অন্তত মেয়েদের প্রতি ধারণার এই বিকৃতির মধ্যেও আশা উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল।

পরেব ছ'টা দিনও কাটল একে একে।

মালা বিশ্বাস ইতিমধ্যে ব্যবস্থা করেই বেখেছিল। মিক্সর্ড ফ্লাইট। সরবরাহের সবঞ্জাম যাচ্ছে, আবার বিশেষ ধরপাকড় করে কয়েকজন ব্যবসায়ী যাত্রীও চলেছে। যাচ্ছে বটে, কিন্তু সকলের চোখে মুখেই উদ্বেগ, অজ্ঞাত আশঙ্কা। মালা বিশ্বাসের দিকে চেয়ে চেয়ে ডিক্রুজ অনেকবার হেসেছে। সে সাহায্য না করলে তার আসা হত না। মালা বিশ্বাস আজ কৃতজ্ঞ তার কাছে। অটো পাইলট অন্ করে তার কাছে এসে ডিক্রুজ ঠাট্টাও করেছে, যাচ্ছ তো, সে-যে ওখানেই বসে আছে তোমাকে কে বলল ?

জবাব দেয়নি। মালা বিশ্বাস শুধু আশা করছে।

দেখা হল।

সবিতাব্রত ইতিমধ্যে আবার এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে পড়েছে। চতুর্দিক থেকে লোক তখন ভয়ে ত্রাসে দিশেহারা হয়ে তেজপুর এরোড্রোম ছেয়ে ফেলেছে। শত্রু এগিয়ে আসছে। যতটা সত্য, রটনা তার চতুর্গুণ। পালানোর হিড়িক পড়ে গেছে। ক'দিন ধরে দূর দূরান্ত থেকে লোক আসছিল। এখন কাছের লোকও আসছে। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয় বুঝছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হয়ত সরকারী ইভাকুয়েশানের অর্ডার বেরুবে। ডিক্রুজের

এয়ারক্রাফট ল্যাণ্ড করার অনুমতি পেত না, যদি না, ওতে সরবরাহের সামগ্রী থাকত। গত দুদিন ধরে এয়ারক্রাফট বোঝাই করে ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত ওই পলায়মান মানুষগুলোকে নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দিয়ে এসেছে। আহার নেই, নিদ্রা নেই, অবিরাম এই করেছে।

এরই মধ্যে সবিতাব্রত যে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছে সেটা কেউ জানত না। লোক পৌঁছে দেওয়ার ফাঁকে গত সন্ধ্যায় চোখ পড়ল একটা ছেলের দিকে, বছর চারেকও বয়স হবে না। শেডের এক কোণে নিস্পন্দ কাঠ হয়ে বসে আছে। ফ্যালফ্যাল করে দেখছে সকলকে। ফুটফুটে ছেলে, কিন্তু কেমন করুণ বেদনার্ত বোবা চাউনি। এ-রকম নীরব ব্যাকুলতা কোনো শিশুর মুখে সবিতাব্রত বুঝি আর দেখেনি। অন্য একটা এয়ারক্রাফটএ তাড়াহুড়ো করে আশেপাশের অনেক লোক চলে গেল, কিন্তু ছেলেটা তেমনি বসে। তার দিকে কারো লক্ষ্য নেই। কারো দিকে কারোর লক্ষ্য রাখার সময়ও নয় এটা। পালানোর তাগিদে সকলেরই দিশেহারা তৎপরতা।

সবিতাব্রত অনেকবার দেখল। তারপর থমকালো একসময়।

আরো যারা ছিল এদিক-ওদিক তাদের মধ্যে কে ওর বাবা বা কে মা ঠাওর করতে পারল না। কেমন মনে হল, এরা কেউ ওর আপন কেউ নয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল অনুমান সত্যি, আগের ব্যাচে যারা চলে গেল, তারা নাকি দূরের জঙ্গলের পথ থেকে ছেলেটাকে কুড়িয়ে এনেছে, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ওর মা জঙ্গলে মরে পড়েছিল, আর ছেলেটা তার পাশে বসে কাঁদছিল। শত্রু কাছেই আছে ভেবে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এসেছে।

কিন্তু নিজেদেরই প্রাণের দায়ে: কে কার ভার বহন করবে?

সবিতাব্রত হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। অস্থির হয়ে উঠল। অস্থিরতা দমন করতে না পেরে ছেলেটাকে একসময় তুলে নিয়ে গেল। এখানে এরোড্রোম বলতে বড় একটা শেড, আর পলকা ব্যবস্থার ছোট একটা অফিস ঘর। সেই অফিস ঘরে এনে বসালো তাকে। ছেলেটা ভয়ে আবার থরথর করে কাঁপছে তার দিকে চেয়ে, সাহস করে কাঁদতেও পারছে না।

সবিতাব্রতর ভিতরে ভিতরে একটা কাটা-ছেঁড়া শুরু হয়েছে সেই থেকে। ডাকসাইটে ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দীর এ কি হল! সে-কি নিজে ওই মা হারা অসহায় শিশু নাকি!... মা-কে জঙ্গলের মধ্যে গুলি করে মেরেছে, কিন্তু কার মাকে? সবিতাব্রত এত কাঁপছে কেন! তাড়াতাড়ি তাকে খেতে দিল কিছু। ছেলেটা লোলুপ হয়ে উঠল, কিন্তু তবু ভয়।

সবিতাব্রত খুব চেষ্টা করে হাসল। খাবার তার মুখে গুঁজে দিল। ছেলেটা এবারে ভরসা পেল একটু। গোগ্রাসে খেতে লাগল। সবিতাব্রত তাকে উৎসাহ দেবার জন্য আবার হাসল। সেই চেষ্টা করতে গিয়ে চোখে জল এসে যাচ্ছে তার। তবু এবারে ছেলেটাও চেষ্টা করল একটু হাসতে।

কাজে না বেরুলে চলবে না, এমারজেন্সি ডিউটি। কিন্তু ছেলেটাকে কার কাছে রেখে যাবে? নিরাপদ স্থানে যাবার জন্য কোনো না কোনো দল অপেক্ষা করছেই। এদেরই কারো হেপাজতে রেখে গেল। এ সময় ক্যাপ্টেনের অনুরোধ হেলাফেলা করার সাহস কারো নেই। তারা সযত্নেই রেখেছে। কাজ শেষ করে সবিতাব্রত অস্থিরচিত্তে ছেলেটার কাছে ফিরে এসে

দেখে সে নিঃশব্দে কাঁদছে । কারণ জোরে কাঁদার সাহস নেই । শুনল প্রায় সারাক্ষণই কেঁদেছে ।

সবিতাব্রতকে দেখা-মাত্র তার কোলে ঝাঁপিয়ে চলে এলো ছেলেটা । তারপর এবারে জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল । সে-ও যেন ওকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল — সেই অব্যক্ত ভয় আর অভিমান আর অভিযোগ ।

নিজেকে এত অসহায় আর কখনো মনে হয়নি সবিতাব্রতর । তার রাগই হচ্ছে । নিজের ওপর রাগ, ছেলেটার ওপব রাগ, এই দুর্যোগের পরিস্থিতির ওপর রাগ । সবিতাব্রত স্নায়ু শক্ত করল । কিছু করা দরকার । সামনে রাত্রি । দলে দলে আবার লোক আসছে, সকালের প্রতীক্ষা করছে । সকাল হলে নড়তে পারবে কিনা সেই আশঙ্কা সকলের চোখে মুখে । ছেলেটাকে কোলে নিয়ে সবিতাব্রত ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল তাদের । কার কাছে ছেলেটা আশ্রয় পেতে পারে শুধু চোখে দেখেই সেটা বুঝে নিতে চেষ্টা করছে ।

এরই মধ্যে নিজের মানসিক অস্থিরতার দিকে চোখ পড়তে ভিতরে ভিতরে অবাকই হয়েছে একটু । মাঝে কি অনেক—অনেকগুলো বছর কেটে যায়নি ? নামজাদা ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত নন্দীর কি বয়েস বাড়েনি ? নতুন বয়সে পাড়ার বাচ্চা ছেলেগুলোকে নিয়ে সে খেলা করত, হৈ-চৈ করত, তাদের লজেঞ্চ্ চকোলেট দিত—সেই স্নেহ সেই আবেগ নিয়ে ঠিক সেই রকমই আজও কে তার মধ্যে বসে আছে ।

দেখে দেখে একটা দলকে তার পছন্দ হল । কাউকে না কাউকে করতেই হবে, কারো না কারো হাতে ছেলেটাকে সঁপে দিতেই হবে । ছেলে বুড়ো জনা-কতককে নিয়ে এখান থেকে নড়ার আশায় বসে আছে এক প্রৌঢ়া মহিলা । তার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বলল । ছেলেটার ভার নিলে সকালের প্রথম ট্রিপেই সে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবাব প্রতিশ্রুতি দিল । টাকা যা লাগে তাও দেবে জানালো ।

প্রৌঢ়াটি সঙ্গে সঙ্গে রাজি । নিরাপত্তার হাতছানিই সব থেকে বড় প্রলোভন এখন । রাজি সকলেই হবে । সবিতাব্রত নিশ্চিন্ত বোধ করতে চেষ্টা করল ।

কিন্তু রাতের মতও ছেলেটাকে এই দলের কাছে রেখে যাওয়া গেল না । সে যাবে না, আর কারো কাছে থাকবে না । চেষ্টা করতে গেলে ভয় পায়, কাঁদে ।

সবিতাব্রত ভাবল রাতে ঘুমুলে এসে দিয়ে যাবে । কিন্তু দিয়ে যাওয়া আর হল না । তাকে বুকে করেই একটা রাত কাটালো । দুশ্চিন্তায় ভিতরটা আচ্ছন্ন । তার কেবলই মনে হল, ওরা তাড়াতাড়ি এখান থেকে যেতে পারার লোভে শুধু একে নিতে রাজি হয়েছে । তারপর আর দেখবে না, ফিরেও তাকাবে না । পরিণামের দৃশ্যটা যেন সবিতাব্রতর চোখের সামনে ভাসছে । ছেলেটা যেন নিঃশব্দে আর্তনাদ করে চলেছে ।...তার মা'কে খুঁজছে ।

রাতের অন্ধকারে চমকে চমকে উঠেছে সবিতাব্রত । শিশুর এই কল্পিত বোবা কান্নার মধ্যে সে-যেন শুধু অঞ্জুদির ছেলের কান্না শুনেছে ।

সকাল ।

মন শক্ত করে সবিতাব্রত শিশুকে নিয়ে এয়ারক্রাফটএ উঠল । সেই প্রৌঢ়া মহিলার হেপাজতে তাকে রাখল । মাঝে মাঝে উঠে এসে সবিতাব্রত তাকে নিয়ে ককপিটেও এলো দুই একবার । সে সঙ্গে আছে বলেই হয়ত ছেলেটা আগের মত ততো ঘাবড়ে যায়নি ।

কিন্তু ফেরার সময় এক বিষম পরিস্থিতি। সবিতাব্রতই তাকে কোলে করে এয়ারক্রাফট থেকে নেমেছিল। প্রৌঢ়া মহিলা তাকে নেবার জন্য হাত বাড়ালো। দলে দলে লোক যাচ্ছে। কোন্ অনুভূতি দিয়ে ছেলেটা এই মুহূর্তটা উপলব্ধি করল কে জানে। সবিতাব্রতর গলা আঁকড়ে ধরে সে মাথা নাড়ল, যাবে না।

সবিতাব্রত যেন অসহায়, পঙ্গু। ওরা টানাটানি করছে ছেলেটাকে ধরে—আর বলির পশুর মত ও প্রাণপণে তার গলা আঁকড়ে আছে। শিশুর বুকের দিশেহারা ত্রাসের ধুকপুকুনি সবিতাব্রতর বুকে এসে মুগুরের মত ঘা দিচ্ছে।

সবিতাব্রতর মাথায় রক্ত উঠল যেন হঠাৎ। এক ঝটকায় ছেলেটাকে ছাড়িয়ে নিজের মুখের সামনে ধরল। মনে হল, সে বুঝি মেরেই বসবে এবার ওকে। কিন্তু না, শুধু দেখল দু'চার মুহূর্ত। তারপর আবার তাকে কাঁধে ফেলে হন হন করে ফিরে চলল।

ডিক্রুজ আর মালা বিশ্বাস ঘরে ঢুকে দেখল, একটা ছেলেকে কোলে বসিয়ে খাওয়াতে চেষ্টা করছে ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত। অপটু হাতে খাওয়াচ্ছে। দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য।

মালা বিশ্বাসকে দেখে সবিতাব্রত বিস্মিত হঠাৎ। মুখে কথা নেই। এ-রকম সম্ভাবনা কল্পনাও করেনি। দেখছে। ছেলেটাও হাঁ করে চেয়ে আছে। মালা বিশ্বাসের মুখে কোনো বিশেষ অভিব্যক্তিই স্পষ্ট নয়। ডিক্রুজ হাসছে মুখ টিপে।

বেশী চিন্তা করার পরিস্থিতি নয় এটা। হঠাৎ যেন আশার ছোঁয়া লাগল সবিতাব্রতর মুখে। সে যেন পথ পেল, সহায় পেল, সম্বল পেল। কেন এলো, কি করে এলো তা নিয়ে একবারও মাথা ঘামালো না। একটা দ্রুত চিন্তা শুধু মাথায় খেলে গেল। যে প্লেনে ওরা এসেছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওটা আবার ফিরে যাবে রিফিউজি বোঝাই করে। সেইরকম ব্যবস্থা হয়ে আছে।

সবিতাব্রত মালা বিশ্বাসের দিকে তাকালো। দৃষ্টিটা গভীর, ক্লান্ত। জিজ্ঞাসা করল, একটা কথা রাখবে ?

মালা বিশ্বাস নিঃশব্দে চেয়ে আছে। কোটরাগত চোখ দেখছে, মুখের পোড়খাওয়া রঙ দেখছে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখছে।

সবিতাব্রত বলল, এই ছেলেটার মা জঙ্গলে গুলি খেয়ে মরেছে, বাপ আছে কি নেই জানি না, বোধহয় নেই...থাকলে ওর মা একা পালাচ্ছিল কেন। একে নিয়ে যাবে, তোমার কাছে রাখবে, খরচপত্র যা লাগে আমি গিয়ে দেব।

মালা বিশ্বাস আর্ত চোখে ছেলেটার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল, শেষের কথা কানে যেতে তার দিকে দৃষ্টি ফেরালো।

সবিতাব্রত বেরিয়ে গেল। মালা বিশ্বাস আস্তে আস্তে ছেলেটার কাছে গিয়ে বসল। দু'চোখ টান করে ছেলেটা সেই থেকেই নিরীক্ষণ করছে তাকে। মালা বিশ্বাস হাত বাড়াতে সে ভয়ে ভয়ে সরে যেতে চাইল। কিন্তু সে ততক্ষণে ওকে ধরে ফেলেছে। কোলে টেনে নিয়েছে। আর কিছু না পেয়ে নিজের হাতের সুন্দর ব্যাগটাই তার হাতে গুঁজে দিল তাড়াতাড়ি। ছেলেটা আবার ঘাড় উঁচিয়ে দেখতে লাগল, বিশ্বাস করা যায় কিনা।

কিন্তু ঘণ্টাখানের মধ্যে ডিক্রুজ এক কাণ্ড করল। হঠাৎ ঘোষণা করে বসল, সে বেজায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে, টেরিবিলি সিক্—পেটে অসহ্য যন্ত্রণা, তার নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

এখানে সিকরুম নেই, অতএব এই ঘরেরই এক টেবিলে কম্বল মুড়ি দিয়ে দস্তুরমত কাতরাতে লাগল সে ।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা এখানে । সাত পাঁচ ভাবার সময় নেই । অপেক্ষা করার সময় নেই । আপাতত আর বাড়তি ক্যাপ্টেনও নেই এখানে । হুকুম হল, ডিক্রুজের রিফিউজি বোঝাই প্লেন নিয়ে ক্যাপ্টেন নন্দীকে ফিরতে হবে । নির্দেশ ।

শোনা মাত্র লম্বা লম্বা পা ফেলে ক্ষিপ্ত রোষে সবিতাব্রত ঘরে এলো । এক হ্যাঁচকা টানে ডিক্রুজের মুখের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে গর্জে উঠল, হেই, ব্লাডি ফুল ! ডোন্ট ব্লাফ, ফ্লাই ইয়োর মেসিন ব্যাক ! আই সে গেট আপ ! তোমার কিছু হয়নি, ইট ইজ ব্লাডি ইয়োর রেসপন্সিবিলিটি—

বিকৃত মুখে ডিক্রুজ তিক্ত জবাব দিল, আমার কাছে এসো না, এলে বক্সিং এর একটা কিছু মার ঠিক ঝেড়ে দেব—ইউ গো টু হেল উইথ দ্যাট মেসিন, ডোন্ট ডিসটার্ব মি !

সবিতাব্রত নিরুপায় । মালা বিশ্বাস নির্বাক দ্রষ্টা ।

ওড়ার সময় হল ।

একসময় আবার ঘরে ঢুকে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে সবিতাব্রত হন হন করে বেরিয়ে গেল ।

ডিক্রুজের মুখ কম্বলে ঢাকা । মালা বিশ্বাস দরজার কাছাকাছি গিয়ে ফিরে দাঁড়াল । না ফিরে পারল না । কিছু তার দেখার আছে, কিছু তার করার আছে । দেখল, কম্বল সরিয়ে ডিক্রুজ তার দিকে চেয়ে আছে । হাসছে । তার দিকে চেয়ে ডিক্রুজ নিঃশব্দে হাসছে ।

আপনা থেকেই মালা বিশ্বাসের দুই হাত যুক্ত হল, কপাল পর্যন্ত উঠল না বুকের কাছে এসে থেমে রইল । হাসিমুখে দুই হাত জোড়া করে আছে ডিক্রুজও । দুই জোড়া যুক্ত হাত ..দু'জনে দুজনের দিকে চেয়ে আছে । মালা বিশ্বাস মনে মনে প্রণাম জানাচ্ছে, আর ডিক্রুজ হাসছে ।

হাওয়াই জাহাজ আকাশে উড়েছে । লোক বোঝাই । সংখ্যা এখন নিয়মে বাঁধা নেই । এরই মধ্যে ওই ছেলেটা একটা ভিন্ন আসনে বসে আছে । ক্যাপ্টেনই তাকে বসিয়ে বেল্ট বেঁধে দিয়েছে । মালাকে শুধু বলেছে, চোখ রেখো ।

চোখ সারাক্ষণই রেখেছে মালা বিশ্বাস । ছেলেটা চঞ্চল । ক্রমশঃ তার ভয় কমে আসছে । সে-যেন কি করে বুঝেছে আর তার ভয়ের কিছু নেই । বারবার উঠে তার কাছে আসতে চেয়েছে । মালা বিশ্বাস বার কয়েক নিয়ে এসেছে, আবার বসিয়ে দিয়েছে। ক্যাপ্টেনও দুই একবার এসে এসে দেখে গেছে তাকে ।

নামার সময় হল । ডেসটিনেশন অ্যাপ্রোচ নামার নির্দেশ দিয়েছে ।

কিন্তু হঠাৎ একটা চকিত হাবভাব দেখা গেল কো-পাইলট আর ফ্লাইট এঞ্জিনীয়ারের । এই ব্যস্ততা আর এই মুখ চেনে মালা বিশ্বাস । এই মুখ দেখলে মনে আপনা থেকেই ডাক দেয় । তাদের আনাগোনা স্বাভাবিক লাগল না একটুও ।

পায়ে পায়ে ককপিটের ভিতরে এলো । যা বুঝলে তাতে চক্ষুস্থির । এয়ারক্রাফটএর চাকা বেরুচ্ছে না, ভিতরে কোনো কারণে জ্যাম হয়ে থাকবে । আণ্ডার কার্ট লিভার ডাউন করা সত্ত্বেও চাকার দেখা নেই । এয়ারক্রাফট রানওয়ের উপরে চক্কর খাচ্ছে, ক্যাপ্টেন আর

ক্রুরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে যদি চাকা বার করতে পারে । কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা ।

বেতারে অ্যাপ্রোচকে জানানো হল, বিপদের বার্তা । এখন একমাত্র উপায় চাকাশূন্য অবস্থায় বেলি-ল্যাণ্ডিং । বুকে নামব এয়ারক্রাফট । সত্বর ব্যবস্থা করা হোক ।

সবিতাব্রতর সমস্ত মুখ কঠিন, চোয়াল দুটো যেন এঁটে বসে গেছে । এই মূর্তি মালা বিশ্বাস আগেও দেখেছে ।...না ঠিক এই মূর্তি দেখেনি । দেশের এই অশান্ত বিপর্যয়ে একটানা অনেক দিনের অনিয়মে যেন ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা । মালা বিশ্বাস নিষ্পলক চেয়ে আছে ।

ঘাড় ফিরিয়ে সে বোধহয় তাকেই খুঁজল । থমথমে গলায় নির্দেশ দিল, প্যাসেঞ্জারদের বেল্ট বেঁধে সতর্ক হয়ে বসতে বলো, আর, টেক কেয়ার অফ দ্যাট বয়, বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল । কীপ্ হিম উইথ্ ইউ, উইল ইউ ?

মালা বিশ্বাস চলে এলো । নির্দেশ পালন করল । ছেলেটাকে তুলে এসে নিজের সিটে কোলে বসিয়ে একসঙ্গে বেল্ট বাঁধল ।...বাঁ চোখটা তার এমন কাঁপছে কেন থর থর করে ? বিপদেব কি শেষ নেই, অশান্তির কি শেষ নেই ? সব থেকে ভয়ের কারণ কি ক্যাপ্টেনের, সে জানে । এয়াবক্রাফট এত বোঝাই বলেই বেশি ভযেব । নামার সময় এরোপ্লেনের মুখ নিচের দিকে হয়ে গেলে সবই ফুরালো বোধহয় ।

ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে এবোপ্লেন । কম করে আরো আধ ঘণ্টা এমনি আকাশে পাক খেতে হবে এখন—ট্যাঙ্কের পেট্রল সব নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত নামার উপায় নেই । ট্যাঙ্কে পেট্রোল থাকলে শেষ সংঘাতে সব জ্বলে যাবে ।

সবিতাব্রত উঠে এসে ভিতরটা দেখে গেল । ভিতরের অবস্থা দেখে তার চোখের হতাশা গোপন থাকল না । মাল-পত্র বেশি হলে না হয় ফেলে দিতে পাবত । কিন্তু মানুষগুলোকে কি করবে ? কাছে এসে ছেলেটাকে দেখল নির্নিমেষে। মুখ দেখে মালা বিশ্বাসের মনে হল, এই একজনের জন্যই তার যত কিছু চেষ্টা, যত শঙ্কা । এই ভাবে নিজের সঙ্গে ছেলেটাকে বেঁধে নিয়ে বসাটা তাব মনঃপূত হয়েছে বলে মনে হল ।

সময় যেন বুকের ওপর হাতুড়ির মত বেজে চলে । ছেলেটা মালা বিশ্বাসের বুক আঁকড়ে ঘুমুচ্ছে । অদ্ভুত লাগছে । মালা বিশ্বাসেরও মনে হচ্ছে, এই ছেলেটা বাঁচলে আর কিছু চায় না । বুকের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে বেখে বসে আছে সে ।

হঠাৎ আর একবার মুখ তুলে দেখে সবিতাব্রত সামনে দাঁড়িয়ে । শেষ বারের মত দেখে যেতে এসেছিল বোধ হয় । কিন্তু ছেলেটার এই বুক আঁকড়ে ধবে ঘুমনোর দৃশ্যটা থেকে যেন চোখ ফেরাতে পারছে না । নির্নিমেষে দেখছে । ওই ছেলেটার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন কাকে পেয়েছে । আশায় আনন্দে জ্বল জ্বল করছে মুখ ।

চলে গেল । ক্যাপ্টেন সবিতাব্রত ককপিটে ঢুকল । কত গুণ বেশি শক্তি আর বিশ্বাস নিয়ে আসনে বসল ঠিক নেই ।

শেষের মুহূর্ত এগিয়ে আসছে ।

আরো, আরো । মাটি এগিয়ে আসছে। নিচে যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত সকলে, দেখা যাচ্ছে ।

মাটি এগোচ্ছে । সে তাদের গ্রহণ করবে কি গ্রাস করবে কেউ জানে না । ক'টা মুহূর্ত...।

জীবন-ছোঁয়া মুহূর্ত...মৃত্যু-ছোঁয়া মুহূর্ত । কোন্‌টা ? কোন্‌টা আসছে ?

কান বিদীর্ণ করা হেঁচড়ানো শব্দ একটা ।...মাটি স্পর্শ করল বোধহয় । সবিতাব্রত জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে ? প্রথমেই মনে হল, ছেলেটা ঠিক আছে কিনা খবর করা দরকার । কিন্তু বাঁ পায়ের দিকটা যেন একটা ইলেকট্রিক শক খেয়ে কেমন হয়ে গেল ।...নড়ানো যাচ্ছে না, টেনে বার করা যাচ্ছে না । কি আবার হল ? ঘুম পাচ্ছে...অনেকদিন ঘুমোয়নি সবিতাব্রত । ঘুমের ঘোরে যেন অনেক লোকের কোলাহল শুনছে সে । ঘুমে চোখ জড়িয়ে যাচ্ছে । ঘুমের সঙ্গে যুঝে লাভ কি ঘুম...ঘুম...

হাসপাতালে জ্ঞান ফিরল পাঁচদিন পরে । সকালে । মাঝে জ্ঞান হলেও ওষুধে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে । বাঁ পায়ের দিকটায় অসহ্য যন্ত্রণা । এই যন্ত্রণাতেই ঘুম ভেঙেছে বোধহয় ।

মালা বিশ্বাস মুখের কাছে ঝুঁকে এলো ! ব্যাকুল মুখে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ ?

যন্ত্রণা ভুলে সবিতাব্রত অবাক । কোথায় সে এখন ? এখানে কেন । পায়ে এত ব্যথা কেন ? কি-যেন হয়েছিল ! বেলি-ল্যাণ্ডিং করতে হয়েছিল । ঠিকই তো নেমেছিল...। সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে পড়ল কি । জবাব না দিয়ে উদ্‌গ্রীব মুখে জিজ্ঞাসা করল, সেই ছেলেটি ?

মালা বিশ্বাস তাড়াতাড়ি আশ্বাস দিল, তার একটুও লাগেনি । আমার কাছে আছে । ভাল আছে ।

সবিতাব্রত আবার চোখ বুঝল । ঘুম পাচ্ছে এখনো । কিন্তু বড় যন্ত্রণা.. আর বড় শান্তিও ।

বিকেলের দিকে আর একটু সুস্থ বোধ করল । কিন্তু ব্যথার উপশম হচ্ছে না । আরো মনে পড়ছে কি ।...পায়ে যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছিল একটা, কিসের সঙ্গে আটকে গেছল, পা তুলতে পারেনি । নার্সকে ইশারা করতে সে ছুটে এলো । ক্যাবিনেই ছিল । সবিতাব্রত তাকেই দেখল একটু । তারপর শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, আমার বাঁ পায়ের নিচের দিকটা কি কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে ?

নার্স ফাঁপরে পড়ল । পাশে বসে তাড়াতাড়ি মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কষ্ট হচ্ছে খুব ?

সবিতাব্রত আবার জিজ্ঞাসা করল, কতটা কাটা হয়েছে ?

ও কিছু না । হাঁটুর কাছ থেকে । আপনি কিছু ভাববেন না । আজকাল অনেক রকম ব্যবস্থা আছে, এমন জুড়ে দেবে যে সামনের থেকে দেখলেও কেউ টের পাবে না ।

সবিতাব্রত আর কিছু বলল না ।

একটু বাদে মালার সঙ্গে নার্সের দেখা দরজার মুখে, বারান্দায় । নার্সই তাড়াতাড়ি কাছে এসে চাপা গলায় বলল, টের পেয়েছেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা, কতটা কাটা হয়েছে—অথচ এখন ঠিক টের পাওয়ার কথা নয় ।...আর আশ্চর্য সহ্য-শক্তি, আপনি যান, আমি ডাক্তারকে খবর দিয়ে আসি ।

মালা বিশ্বাস তবু নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত । শক্তি দাও, ভগবান শক্তি দাও, আর কিছু চাইনে । নিজেকে শক্ত করে ঘরে ঢুকল সে ।

সবিতাব্রত যেন তার প্রতীক্ষাতেই ছিল । মালা বিশ্বাস শিয়রের দিকটায় বসল । খুব

কাছে । হাসিমুখে ঝুঁকে তার মাথাটা প্রায় বুকের কাছে এনে বলল, বাঃ, গুড বয়, কেমন আছ ? খুব ভালো তো ?

সবিতাব্রত ঈষৎ ঘাড় উঁচিয়ে মুখখানাই দেখছে তার । সামান্য হাসতে চেষ্টা করে বলল, ভালো ।

বলল বটে, কিন্তু মুখের দিকে চেয়েই ভিতরের যন্ত্রণা বোঝা যাচ্ছে । শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে এক-একবার, দাঁত কামড়ে যন্ত্রণা সহ্য করছে, তারপর দেখছে তাকে । আর একটু চেয়ে থেকে সবিতাব্রত জিজ্ঞাসা করল, ছেলেটা কেমন আছে, কান্নাকাটি করছে না তো ?

একটুও না । খুব ভালো আছে । কি মনে হতে মুখ লাল হয়ে উঠল তার । কিন্তু মালা বিশ্বাস লজ্জা করবে না, এই কথা এই লোককে এখনই শোনাবার সময় । এই মুহূর্তেই । হাসতে লাগল । যা শোনাতে যাচ্ছে তার জন্য হাসাও দরকার । হালকা করেই বলল, ও আমাকেই ওর মা ভেবে বসে আছে, মা ডাকতে শুরু করেছে ।

বলতে বলতে হাসিভরা সমস্ত মুখ এবারে টকটকে লাল হয়ে উঠল । সবিতাব্রতর চোখে পলক পড়ে না । দেখছে । দু'চোখ ভরে দেখছে । যন্ত্রণা ভুলে গেছে ।

তাড়াতাড়ি করে মালা বিশ্বাস আবার বলল, ওর জন্যে তুমি কিছু ভেবো না, ও আমাদের কাছেই থাকবে—ভবিষ্যতে ওকে কতবড় এক ক্যাপ্টেন বানিয়ে দিই দেখো না ।

সবিতাব্রত চেয়েই আছে । একটা দুর্বল হাত নিজের অগোচরে মালা বিশ্বাসের পিঠের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে । না, সে কিছু ভাবছে না । তার পিঠে হাত বুলিয়ে জীবনের এক পরম মুহূর্তকে অনুভব করছে শুধু । একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমিও কিছু ভেবো না, আই উইল ফ্লাই এগেইন, আমারও ওড়া বন্ধ হবে না ।

মালা বিশ্বাস হাসছে । চোখের জলে দুই গাল ভেসে যাচ্ছে । হাসিভরা মুখ থেকে সেই চোখের জল সবিতাব্রতর গালে ঘষে মুছে নিচ্ছে । ছাইয়ের চোখে এ জল যেন আর ফুরোয় না ।

• • • •

কাহিনীর এখানেই শেষ । ওদের ওই বড় ছেলে সুব্রতর প্রতি দুজনেরই একটু পক্ষপাতিত্ব কেন, সেটা আজ অন্তত অনায়াসে অনুমান করতে পারি । তাদের ধারণা, দুজনের মাঝে সমস্ত সংশয়ের সেই হাঁ-করা ফাটলটা সেদিনের এই এক শিশুকে কেন্দ্র করেই এমন নিটোলভাবে ভরাট হয়ে উঠতে পেরেছে ।

ওরা ফেরেনি এখনো । হয়ত দু'চার দিনের মধ্যেই ফিরবে । ফিরে মালা বিশ্বাস -—মালা বিশ্বাস বলি কেন—মালা নন্দী সকোপে ঘোষণা করবে, এরপর শিগগীর আর নড়ছে না কোথাও । সবিতাব্রত হাসবে, আর পাল্টা কিছু টিপ্পনী কেটে তাকে রাগাতে চেষ্টা করবে ।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, হাসপাতালে সবিতাব্রতর সেদিনের সেই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে মালা নন্দীরও স্থিতির শিকড়টা কেটে গেছে ।

ওড়া ওদের দু'জনেরই এ জীবনে বন্ধ হবে বলে মনে হয় না ।

# গ্রন্থ-পরিচিতি

১। 'চলাচল' উপন্যাস প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫১ সালে, প্রকাশক — ম্যানাসক্রিপ্ট, ৬০/১বি; হবিশ মুখার্জি বোড, ভবানীপুব, কলিকাতা। পবে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে মার্চ ১৯৫৫ সাল। মিত্র ও ঘোষ থেকে তা প্রকাশিত ২১ মার্চ ১৯৬৩। চতুর্থ মুদ্রণ হইতে বচনাবলী মুদ্রিত হয়েছে। 'চলাচল' চলচ্চিত্রায়িত হয ১৯৪৬। পবিচালক — অসিত সেন।

২। 'সাত পাকে বাঁধা' উপন্যাস প্রথম সংস্কবণ প্রকাশিত হয মিত্র ও ঘোষ থেকে, ১৪ মার্চ ১৯৬০ সালে। এই উপন্যাসেব বীজ-গল্প 'সেলিমচিস্তিব কবব' (শাবদীযা দৈনিক বসুমতী ১৯৫৮ সাল)। একাদশ মুদ্রণ, হইতে বচনাবলী মুদ্রিত হযেছে। 'সাত পাকে বাঁধা' চলচ্চিত্রায়িত হয ১৯৬২। পবিচালক — অজয কব।

৩। 'বলাকাব মন' উপন্যাস প্রথম সংস্কবণ প্রকাশ ভবন থেকে প্রকাশিত হয মার্চ ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৩ সালেব শারদীযা বেতাব জগৎ-এ প্রথম প্রকাশিত হয। সপ্তম মুদ্রণ হইতে বচনাবলী মুদ্রিত হযেছে।

*অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়*